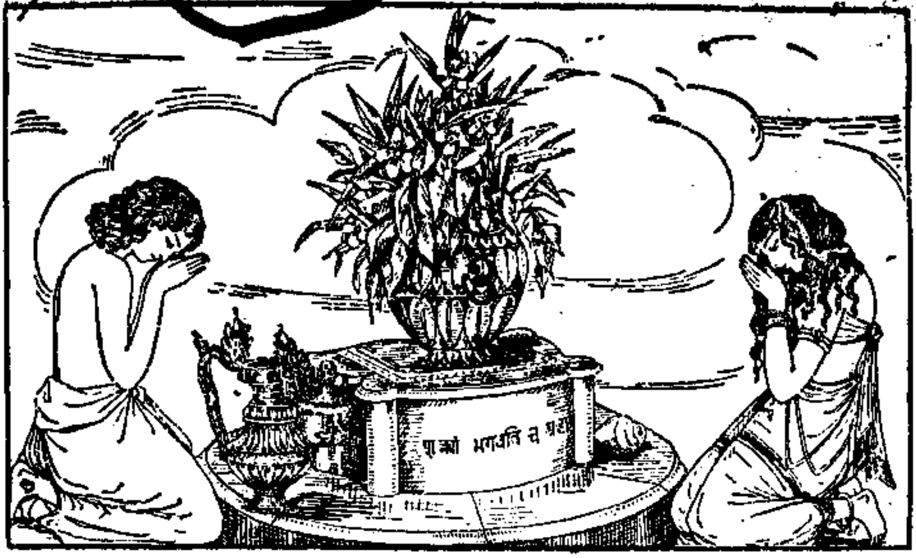


শিব-পার্ব্বতী

(কাংড়া শিল্প)



১৬শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

বৈশাখ,
১৩৩৮।

যুগধর্ম্মী

—:০:—

বর্ত্তমানের বুকে ভবিষ্যতের সৃষ্টি গড়িয়া উঠে। তাই বর্ত্তমানকে যে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহার অস্তিত্ব শূন্যে শূন্যেই ভাসিয়া বেড়ায়, মাটীর বুকে পা রাখিতে পারে না—এ এক প্রকার মানুষের অবস্থা। অতীতের স্মৃতি বহিয়াও একদল মানুষকে নিঝুম হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহাদের না আছে স্বপ্ন, না আছে বর্ত্তমানের প্রতি মমতা; সব কিছুকে নাকচ করিয়া, আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য কবচ প্রাচীন রীতি নীতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা স্থবির হইয়া বসিয়া থাকে। ব্যক্ত জীবনের পক্ষে তাই মধ্যনীতি যে বর্ত্তমান, তাহার উপর দাঁড়াইয়াই আমরা দুই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারি। জগতের যাহা কিছু শ্রেয়ঃ ও কল্যাণ, এইরূপ যুগ-পুরুষদের জীবন আশ্রয় করিয়াই তাহা বিকশিত হয়।

আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। উহা হইতেছে এই, যে অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে সৃষ্টি ক্রমবিকাশমান হয়, ঐ অব্যক্ত ক্ষেত্রে নিজেকে লয় করিয়া সৃষ্টিটাকে টানিয়া টানিয়া আনা এবং ইহাই মহাপুরুষদের কাজ বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়, যে এই স্বপ্নলোকের

মানুষ স্বপ্নেই শেষ হয়, যদি বর্ত্তমানকে লইয়া একটা তুমুল আলোড়ন তাহার জীবনে সম্ভব না হয়। সৃষ্টিকে যাঁহারা নব নব ভাবে ও রসে ঐশ্বর্য্যময় করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনই তাই সংঘাতে সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। ইহা যে প্রকট বর্ত্তমানের সহিত সংঘাতের নিদর্শন তাহা না বলিলেও চলে।

বর্ত্তমানকে তাই আমরা নমস্কার করি। বর্ত্তমানের কুরুক্ষেত্রে যে বীর অটলপদে দাঁড়ায়, তাহার কণ্ঠেই গীতার বাণী নিঃসৃত হয়। অতীতকে পায়ের তলায় নিক্ষেপ করিয়া, বর্ত্তমানকে বীর বাহুদ্বয়ে সাপটাইয়া, দৃষ্টি যার সুদূরপ্রসারিত, ভবিষ্যতের সৃষ্টি-লোকের অভ্রান্ত ছবি তাহারই তুলিতে আঁকিয়া উঠে। বীর যে সেই তো ত্রিকালদর্শী। সে একাধারে দ্রষ্টা, স্রষ্টা, সৃজনের বিশ্বকর্ম্মা।

আমরা এইজন্য উদীয়মান তরুণ জাতিকে এই চক্ষু দুটা বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে রাখিয়া অগ্রসর হইতে বলি। বর্ত্তমান যদি চক্ষু এড়াইয়া যায়, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে।

বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইলে, আমাদের একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; সমস্ত ঘটনার মূলে অখণ্ড সত্যটা যেন হারাইয়া না যায়। সত্যের বিভক্ত রূপ দ্বন্দ্ব সৃজন করে। তাই ঘটনা-বৈচিত্র্যে সত্যের বিকৃতি চিত্ত বিচলিত করার কারণ হয়। প্রকৃত কর্ম্মীকে তাহার জন্য সতত সতর্ক থাকিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে, রাষ্ট্র হইয়াছে ভারতের কেন্দ্র-স্থান। অসংখ্য নারী পুরুষের প্রাণ এইখানে সমষ্টিবদ্ধভাবে একত্র হইয়াছে। রাষ্ট্রকে ধর্ম্মাঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া আর সম্ভব নহে। মহাত্মা ভারতের সত্যকেই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া মূর্ত্ত করিতে চাহেন। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহাত্মার প্রয়োজন ফুরাইলে তিনি বিদায় লইয়া পূর্ব্বতন নেতৃবৃন্দের মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে চাহেন না, অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার অর্থ—ধর্ম্মের প্রভাব তাঁহাকে এই ক্ষেত্রে এমনই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে তিনি শ্রেয়ঃ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে ধর্ম্মনীতিক কোন আদর্শবাদ না থাকিলেও, ভারতের একদল লোক মুক্তির লক্ষ্যে অকাতরে প্রাণ দিতে কুণ্ঠাহীন হইয়াছেন। পরার্থে, দেশহিতে এই আত্মদান স্বার্থকলুষিত আত্মহত্যা নহে; স্বধর্ম্ম-সাধনের মহাযজ্ঞে উৎসর্গের বলিস্বরূপ আপনাকে দিয়া দেশ ও জাতিকে বড় করিয়া তোলা। আজ ভারতের এই বর্ত্তমান, জগতের ধর্ম্মযুগ আনয়নের কেন্দ্র ক্ষেত্র। এইজন্যই বলি—অনভিজ্ঞ ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিবে; সত্যদর্শী ইহার মাহাত্ম্য দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

ভারতের এই রাষ্ট্রসাধনা ব্যতীত বর্ত্তমানে আর এমন কিছু নাই, যে দিকে মানুষ দৃষ্টি দেয়। অন্য যাহা কিছু তাহা ভীরুর বড়াই। এই মহা-বর্ত্তমান বিদীর্ণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহার সূচনা মাত্র দেখা গিয়াছে। রাষ্ট্রগুরু মহাত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়া ইউরোপীয় মনীষিমণ্ডলী এখন হইতেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—

"Mahatma Gandhi, strange combination of the Christ and George Washington of India, holding the political fate......... Visionary, Mystic, Prophet, Lawyer, Statesman, Teacher, he is the personification to-day of the soul-force of India ......with none of the panoply of power, no wealth, no army, no navy, yet leader

of a new might as powerful as it is intangible and invisible—soul-force of a nation".

এমন অসংখ্য প্রকার স্তুতিবচন শুনা যাইতেছে। ইংরাজ শক্তি সুদানের মাহাদি বিপ্লব অস্ত্র বলে নিবারণ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ দমন করিতে ইংরাজকে অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। ভারতের সেনাবল লইয়া ভারতের রাজসিংহাসন ইংরাজ অটলপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। কিন্তু আজ ভারতের অধ্যাত্মশক্তি এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা নিঃশেষ করার বলবুদ্ধি ইংরাজের নাই। রিক্ত, নিঃস্ব, অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী আজ মাটী-পাথর-নদী-বনময়ী এই মৃণ্ময়ী দেশপ্রতিমার মুক্তি-উদ্দেশ্যে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন, যাহার উপর পশুবল প্রয়োগ করিলে সভ্য জগৎ শিহরিয়া উঠে, কারাগার তাহার শক্তিকে গুণান্বিত করিয়া তুলে—ইংরাজ তাই বলে মহাত্মাই ভারতের আত্মা, ভারতের প্রাণশক্তি।

এই যে ভারতের অধ্যাত্মশক্তির সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি, ইহা মহাত্মার তপস্যাজনিত, তাঁর ভারত-ধর্ম্মে অনুরাগ ও নিষ্ঠার পরিণাম। আজ হয়তো সত্যের বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ ভীমবেগে এই নবপ্রজ্জলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করিতে জগতের ধূলি উড়াইয়া আনিবে; কিন্তু ইতিহাসের বুক হইতে এই রেখা মুছিয়া দেওয়া আর সম্ভব হইবে না। আমরা দেখিতেছি, রাষ্ট্রকে আশ্রয় করিয়া ভারতের ধর্ম্ম আজ কি ভীম মূর্ত্তি লইয়া আবির্ভূত!

আজ সমাজ-সংস্কার ম্লান। বঙ্গজগৎ স্তম্ভিত। ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ম্রিয়মান। সবই যেন কি একটা বস্তুর অভাবে ভিক্ষাপাত্রহাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আজি তারা আত্মস্পর্দ্ধায় জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পথ যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। যাহা সত্য, যাহা শাশ্বত, যাহা অক্ষয়, তাহাই যে সকল সম্পদের মূল, এবং সে বস্তু যে ব্যক্তির বা সমষ্টির ধারণায় বন্দী নহে—জগতের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে স্পষ্ট দিবালোকের মত আত্মপ্রকাশ করিয়া সকল ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দেয়—তাহা জগৎ অস্বীকার করিতে আজ অসমর্থ হইতেছে।

ভারতের প্রাণ আজ যে নীতি আশ্রয় করিয়াছে, তাহা ব্যতীত ভিন্ন নীতির মূলে কি সত্য আছে, তাহাও দেখিবার বিষয়।

আমরা দেখি—মহাত্মা আত্মহারা রুদ্র। এই রুদ্রত্ব তিনি লাভ করিলেন, শনৈঃ শনৈঃ আত্মধর্ম্মে আপনাকে সম্যক্ প্রকারে লয় করিয়া, ভিন্ন কামনায় বলি দিয়া। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর-কামকে বক্ষে ধারণ করিয়া অমর হইলেন। অন্যত্র এই লয়ের সাধনা নাই; আছে বৈজ্ঞানিকের এটম-বাদের একটা ক্ষুদ্র থিয়োরী, অর্ব্বাচীন যুগের ব্যক্তিবাদ। সম্মুখের যুগে, এই শিবত্বের সহিত সমষ্টিবদ্ধ জীবত্বের একটা সংঘর্ষ আছে। ভারত-সভ্যতার চরম বস্তু আবিষ্কার করার পথে রাষ্ট্র লইয়া বিদেশীর সহিত সংগ্রামের ভিতর আত্মকলহের বীজও বর্ত্তমান। দেশের মুক্তি তাই বাহিরের দিক্ দিয়াই সম্ভব নহে। অতীতে ঘরের লোকই যেমন দেশ-মাতৃকার কণ্ঠে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া অভিশপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও সে শৃঙ্খলমোচন ব্যাপারে ঘরাঘরি একটা বুঝাপড়া আছে। সে অভিশাপক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত দেশাত্মাকেই করিতে হইবে। এই দেশাত্মা —দেশের সহিত যুক্ত প্রাণ যিনি তিনি, অন্যে নহেন। তাই দেখি, মহাত্মা আজ দেশের মুক্তিব্রতীর হাতেই নির্য্যাতন হাসিমুখে বরণ করিতে উদ্যত; তাঁর লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই, অপমান নাই, নৈরাশ্য নাই * জীবের হয় অবস্থান্তর,

শিবের অবস্থা অচল সনাতন। তাই সকল অন্তর এইখানে আঘাত খাইয়া লয়ের সমুদ্র সৃষ্টি করে—সে অমৃত পারাবারে অভিষিক্ত হইয়া জগজ্জন কৃতার্থ হয়।

ভারতের এই বর্ত্তমান সংগ্রাম প্রতিদিন ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—অনাগতকে আত্মসাৎ করিয়া বর্দ্ধিতকলেবর হইতেছে। প্রতিপক্ষ কেবল দেশবিরুদ্ধ শক্তি নহে, আত্মশক্তির বিদ্রোহও সঙ্গে সঙ্গে শেষ করিয়া চলিতে হইবে। ইহা যে কি মহাকুরুক্ষেত্র, ভাবুক ভিন্ন অন্যে বুঝিবেন না।

আজ যে স্বপক্ষে, কাল যে সে বিরোধী হইবে না, তাহা নহে। কিন্তু জয়ী হইবে—যাহা শাশ্বত, যাহা সনাতন। সে শত সহস্র লক্ষ বৎসর অবনত হইয়া থাকিলেও, তাহার পুনরুত্থান হইবে। ভারতের এই যে বর্ত্তমান যুগ, ইহা সত্যই অভিনব। কল্প-স্বপ্নের মূর্ত্ত রূপ অতীতে কেহ দেখে নাই। কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধও নররক্তের প্রবাহ সৃজন করিয়াছিল। মহাত্মা বলেন—হিংসা, অধর্ম্ম, অসত্য, এই সকল দিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা পবিত্র ও স্থায়ী বস্তু নহে, তাহা দিব্য সম্পদ্ নহে। আমরা স্বর্গরাজ্য চাহিয়াছি; কিন্তু পশুবল প্রয়োগ করিয়াই তাহা পাইতে অগ্রসর হইয়াছি। ভবিষ্যতে ভারতের কৃতযুগ আনিবার জন্য যে স্বপ্ন রচনা করা হইয়াছে, তাহাও খর করবাল হস্তে তুরঙ্গপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে কালান্তক যমের কল্পনাই করিয়াছি। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভেই ছিল। এ স্বপ্ন কৈ কেহ তো দেখে নাই! সত্য, অস্তেয়, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য—আত্মমুক্তির অধ্যাত্মসাধনা। এমন বর্হির্জনের জীবনে এই বীজের সঞ্চার করিয়া, জাতির ঐশ্বর্য্যরূপে ইহাকে পাওয়ার বিধান আর কোথায় কে দিয়াছে?

তবে এত ভাবিলাম কি? বর্ত্তমানকে ডিঙ্গাইয়া এই ভারতের স্বপ্নদর্শন—ইহার মূল্য যে আজ আর একটী কাণা কড়িও নহে; স্বপ্নের কথা তাই আর কেহ শুনিতে চাহে না।

স্বপ্ন বর্ত্তমানের বুকে আত্মজয়ী বীরের হস্তে আকার লইয়া ধরা দেয়। স্বপ্নের মানুষ প্রশ্রয় সে যুগেই পায়, যে যুগে জাতি পঙ্গু হইয়া পড়ে, কর্ম্মশক্তিহীন হয়। আজ ভারতের প্রাণ জাগিয়াছে, তাই স্বপ্নের আদর নাই। মানুষের প্রতিদণ্ডের আয়ুঃ আজ কত যে মহার্ঘ হইয়াছে, সময়ের মূল্য কত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। কালকে জয় করার এই যে রীতি, ইহা কোথায় এতদিন গোপন ছিল? ব্যর্থ অন্বেষণে চক্ষু আমাদের মুদিয়া আসিতেছিল, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িতেছিল—আজ সব যেন সজাগ হইয়া উঠে। ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর সবখানিই যদি জড় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিবে একজন মানুষ—যদি সে মানুষ পৃথিবীর বুকে যে অনন্তশক্তি আছে, তাহার সহিত যুক্তি পায়। আজ দ্বিষষ্ঠি বৎসর বয়সের বৃদ্ধের প্রাণে এত বল কোথা হইতে আসিল, তাহা অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে।

প্রাণ দিয়াই প্রাণ পাইতে হয়। হিংসানীতিতেই যে প্রাণ বলি পড়ে, তাহা কে বলিল? পণ্ডিত মতিলালের আয়ুঃশেষ অস্ত্রবিপ্লবী বলিয়া হয় নাই। অহিংস সংগ্রামীর মহাপ্রয়াণ চক্ষুর সম্মুখে দেখিলাম। বলিবার কথা অন্য কিছু নয়—মানুষ আজ কথা বন্ধ করুক। কথায় আর কেহ বুঝিতে চায় না। কয়েক বৎসরের মধ্যে মানুষের অধ্যাত্মসম্পদ্ পৃথিবীর বুকে আকার লইয়া জন্ম

লইল, এখানে আর কথা নাই—সিদ্ধ সত্যের দেদীপ্যমান্ মূর্ত্তি কেহ কি আর অস্বীকার করিবে?

ভারতের যুগধর্ম্ম বর্ত্তমানকে লইয়া। ভবিষ্যতের ক্রন্দন সম্মোহন। আজ বর্ত্তমানকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের অনাগতের বুকে যে স্বপ্ন এখনও ধূমায়মান, তাহাকে রেখায় রেখায় পৃথিবীর বুকে আঁকিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা সত্যাশ্রয়ী হইব। আমরা অহিংস-ব্রতী হইব। আমরা কাহাকেও উত্তেজিত করিব না; নিজেও কোন কারণে উত্তেজিত হইব না। আপনার মাঝে আপনাকে পাইয়া, চক্ষে সোণার আলো লইয়া অগ্রসর হইব। আমাদের গতির ছন্দে তালে তালে দেশ ছুটিবে। দেশের নারী পুরুষ মাতিয়া উঠিবে। আমাদের গতির ব্যাখ্যা দিতে কত শাস্ত্র, কত পুরাণ রচিত হইবে। আমরা মৌন, নির্ব্বাক্—আমরা চরম বুঝিয়াছি, চরম পাইয়াছি। আমাদের প্রতীক্ষা নাই, শূন্যতা নাই—আমরা পরিপূর্ণ ঋতময়। এই যে আনন্দঘন ভারতপ্রাণ, তাহা জগতের আশাকেন্দ্র। সেই শিক্ষা-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা মানসে নূতনভাবে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। আজ সত্যই আমরা কামনার কুহকে ইহার বিরুদ্ধাচারী হইলে কালকে দীর্ঘ করিব মাত্র। যৌগিক বিধানে আসন্ন মুক্তিকে অনাচারে দূরে ফেলিব। ভারতের তরুণ, তোমরা আত্মস্থ হইয়া কি ইহা বুঝিবে না!

আমাদের সম্মুখে আসল কাজের হিসাব দিয়া বক্তব্য শেষ করি। সংগ্রাম জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা। যেখানে দ্বেষ-বিদ্বেষের হলাহলে মানুষ জর্জ্জরিত, সে ক্ষেত্রে সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে জয় উপস্থিত হয়, তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝে না। কিন্তু এই ত্রিগুণী সত্যাশ্রয়ী সেনাদল তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়া নূতন জগৎ গড়িতে উদ্বুদ্ধ। এখানে অস্পষ্টতা, অন্ধকার, ভাবের হেঁয়ালী, কথার মারপ্যাচ কিছুই থাকে না। যেখানে 'হাঁ' সেখানে তাহা 'না' হয় না। এইরূপ একটী চরিত্রের প্রকাশে অসাধারণ শক্তিশালী ব্রিটিশ-রাজ্য বিকম্পিত। হে ভারত, হে ত্যাগী-তপস্বীর সন্তান, ঘরে ঘরে এই আদর্শ-চরিত্র গঠনের মহাযজ্ঞ যে আরম্ভ করিতে হইবে।

এ যুদ্ধ কি কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী, করাচীতে শেষ হইবে? এ যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে না। পৃথিবীতে যতদিন অধ্যাত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্ মানুষ থাকিবে, ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বন্দ্ব থাকিবে, জগতে অন্ধকার আলোকের খেলা চলিবে, ততদিন এ যুদ্ধ অবিরাম চলিবে। ইহা একটা নিত্য-সংগ্রাম বলিলেও অসঙ্গত হয় না। পৃথিবীর মোহ ধর্ম্ম-সেনানীদের বিমূঢ় করিয়া, অন্ধকারের রাজ্য চিরযুগ দীর্ঘ করিয়াছে। আজ কি ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যাশ্রয়ী সেনা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া বিপ্লবদলের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিয়া, কৃতযুগকে পৃথিবীর বুকে স্থায়ী আসন দিবে না? মধ্যকেন্দ্র হইতে পাপ বিদূরিত হইলেও, সীমান্ত প্রদেশে তাহারা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বাস করে। রাজ্যের সীমান্ত রক্ষায় রাজন্যবৃন্দ তাই সর্ব্বদা বিচলিত। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ও রক্ষণ—ইহার জন্য নিত্য সেনাদল রক্ষার ব্যবস্থা চাই।

এই শিক্ষা-সাধনার অনাহত ধারা রক্ষা করিবে কে? রণস্থলে অগণিত সেনা প্রেরণের ভার লইবে কে? আজ সত্যাগ্রহী সেনাই যদি রণরঙ্গে যোগ দিত, তবে সেনাপতির শির লক্ষ্য করিয়া মুক্তি-ব্রতীর আঘাত উদ্যত হইবে কেন? যতক্ষণ ধর্ম্ম-যুদ্ধে মিশ্রসেনা থাকিবে, ততদিন অমিশ্র ফল-লাভ হইবে না। ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহীদলকে

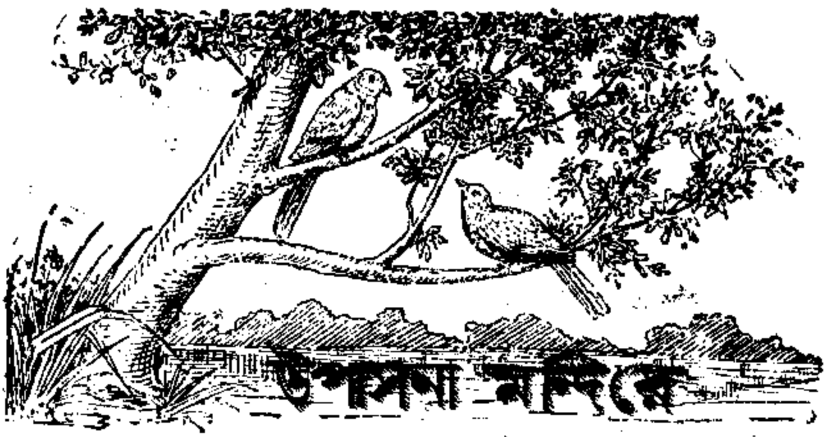
ভারতের ধর্ম্ম স্থাপন ও রক্ষায় সতত উদ্যত থাকিতে হইবে। আমাদের স্বভাব হইয়াছে শ্রমের পর ক্লান্তি, কর্ম্মের পর অবসাদ; কেননা, জীবন আমাদের মিশ্র। অমিশ্র সদ্‌গুণাশ্রিত জীবন-গঠনের নীতি লইয়া আজ হাজার হাজার চারণকে পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বিচরণ করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ জাগাইতে হইবে। সত্য ও অহিংসাব্রতে অসংখ্য নরনারীকে দীক্ষা দিতে হইবে। ভাগবত-চেতনায় জাতির প্রাণকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহারা অবজ্ঞাত; লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্ত্তমানকে সর্জ্জাগ করিয়া চলিবে। তবেই তো ভবিষ্যতের সৃষ্টি দোষলেশ-হীন ঋতময় হইবে। হে নির্ম্মাণ-যজ্ঞের ঋত্বিক্, আজ আদর্শবাদের কুহকে স্বপ্ন লইয়া কালহরণ করিও না। বর্ত্তমানকে মুঠায় লইয়া, ভবিষ্যৎকে রূপ দাও। তোমরা জনে জনে বিশ্বকর্ম্মা হও।

গিয়াছে সেদিন

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী]

গিয়াছে সেদিন যেদিন পরাণ সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ
করেছে কামনা,
আজিকে উন্মনা
নবজন্মান্তরে,
তোমারে পরাণ ভরে দিতে তব
কামনার ধন,
হইতে ইন্ধন
জীবনের হোম হুতাশনে,
আনন্দ উদ্যোগ পর্ব্বে ব্যথা নিরসনে।
কোন্ মন্ত্রবলে বলো আর একবার, লাবণ্য সম্ভার
পুঞ্জীভূত করি কায়মনে,
ত্বরিত গমনে,
যাব তব পাশে?

তব মন যাহা ভালবাসে,
করি দেব নিবেদন,
হাসি গান আবেগ বেদন,
সেবা লাগি অঞ্জলি ভরিয়া,
আমার সম্পূর্ণ তব, সমুখে ধরিয়া!



সত্য আমার এত বৃহৎ—যে পথ, যে অবস্থাই জগৎ বরণ করুক, আমার সত্যকে সে অতিক্রম করতে পারবে না। এই জন্য গতিকে আর নিয়ন্ত্রিত করি না। সে সচ্ছন্দে অসচ্ছন্দে, ঋজু বক্র গতিতে ছুটুক—আমার সত্য দিয়ে তার সবখানিকে ছেয়ে দেব। আমি কুণ্ঠাহীন বিরাট্—আমার মুক্তির আনন্দ জগৎ আর ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

জগৎ চল, তোমার স্বভাবগতি ধরে'ই চল। তুমি আপনার স্বভাব-বশে যে পথেই ছুটবে, আমি তোমার সম্মুখে সম্মুখে অবস্থান করবো। তোমায় আর আমায় অনুসরণ করতে হবে না, ব্যথিত হ'তে হবে না। তুমি আত্মবশেই অগ্রসর হও, আমি তোমায় সত্য দিয়ে সতত রক্ষা করব।

এমন দিন আসবে যেদিন তোমার অবাধ গতি আপনি স্তব্ধ হবে। আজ আত্মগতি ধরে' চলতে চলতে অকস্মাৎ আমার দিকে চেয়ে স্তম্ভিত বিমূঢ় হও। একদিন তুমি অচল হয়ে আমার সঙ্কেত প্রার্থনা করবে। সেই দিন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেইদিন বুঝবে—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল গতির চেয়ে নিয়ন্ত্রিত অনুগত হয়ে চলায়, তোমার সার্থকতা, পরম তৃপ্তি।

আজ আমি নীরব, মৌন, উদ্দেশ্যহীন। আজ আমি অন্তরে বাহিরে নিঃস্ব, নিঃস্বার্থ। আজ আমার স্বপ্নজগৎ প্রলয়-জলে নিমগ্ন। কর্তৃত্ব, দায়িত্ব তোমার ভিতরেই লুপ্ত। এ অনন্ত গতির ধারা তোমার সাধ্যের সীমায় যেদিন স্তম্ভিত হয়ে উঠবে, সেইদিন আমিই তোমায় মুক্তি দিব। আমার অনুসরণে তুমি ব্যথিত—আমি তোমায় অনুসরণ করব। তুমি চিন্তাহীন স্বচ্ছন্দ জীবনচ্ছন্দে ছুটে চল—সত্যের দিগ্বিজয়ী শক্তি তোমার গতি ঋতময় করবে।

* * * * *

সুস্থ হও, সবল হও, আত্মস্থ হও। নির্ভরতার যুগ শেষ হয়েছে। নিজের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমার যতটুকু শক্তি, সেইটুকুর মতই ক্ষেত্র সৃষ্টি কর। তোমার পিছনে যে সীমাহীন বৃহৎ শক্তি, সে তোমায় শনৈঃ শনৈঃ বৃহতেই পরিণত করবে। তুমি যতটুকু শক্তি অধিকার করতে পার, তার জন্য উদ্যত হও, অগ্নিমুখী হও।

এই জীবনেই আর একটা যুগ আসছে, সে বৃহতের প্রকাশ। যেখানে যে নির্দ্দেশ তা' পরিপূর্ণভাবে পালন কর। তুমি—"তুমি" হয়েই দাঁড়াও; তবেই তো বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের অনুভূতি বস্তুতঃ মূর্ত্ত হবে। নিজেকে গলিয়ে দিয়ে যে একাকার, সেটা সাধনা; নিজেকে পেয়ে যে অটুট সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা, সেইটাই সিদ্ধি, সেইটাই সনাতন ধর্ম্ম।

এই গলিয়ে দেওয়ার কথাই তোমরা শুনেছ। এই মিলিয়ে দেওয়ার পথের সন্ধানই তোমরা পেয়েছ। লয়, মোক্ষ, নির্ব্বাণ—এই সব তারই অভিব্যক্তি। কোথায় দেখেছ বিনা লয়ে, বিনা নির্ব্বাণে, বিনা মুক্তিতে আত্মস্বরূপ লাভ হ'তে? যেখানে সাধনা কেবল বাণী, সেখানে শব্দের ঝঙ্কার ভিন্ন অন্য কিছু নাই; যেখানে সাধনার সমাপ্তি, সেইখানেই ভারতের স্বরূপ সিংহগর্জ্জন তুলেছে।

হঠযোগ, রাজযোগ—এই সব দিয়ে যে লয়, আত্মসমর্পণ যোগেও সেই লয় হয়, সেই মোক্ষ, সেই নির্ব্বাণ পাওয়া যায়; এবং যথার্থ লয়ে, মোক্ষে, যে নব জন্ম তা' অতীতের মত এবারও স্বরূপকে প্রকাশ করবে। তবে অভিনব এইটুকু—এবার একটা সমষ্টির স্বরূপ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। মূলে ভাগবত ইচ্ছা—এই জন্য ইহা অকাট্য, অব্যর্থ। তুমি দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর। সম্মুখে প্রলয়-ঝড়; কিন্তু ইহাই নবাঙ্কুর গর্ভে নিয়ে উপস্থিত—প্রলয়ের ভিতরেই সৃষ্টির ভিত্তিপাত করতে হবে।

* * *

খেয়ালের খাতা

—:০:—

সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

"নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ
নইলে জপ করে' যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাক্ষী।"

মানুষ এই সব কথার মর্ম্মবোধ করে, কিন্তু এমন নির্ভরতা রাখিতে পারে না। তাহাকে অনেক কিছু করিতে হয়, করার বিধি বিধানেরও অন্ত নাই। কেহ জপ করে; কেহ আসন, প্রাণায়াম অভ্যাস করে—কেহ হবিষ্যান্ন ভোজন করে। কি একটা অজানাকে পাওয়ার বিরাট্ তপস্যায় আমাদের দেশ ছেয়ে আছে!

*　　*　　*

কিন্তু ভাবিবার কথা—আত্মপ্রসাদ লাভ সর্ব্বত্রই, অথচ সন্তোষের যে স্বচ্ছন্দ শ্রী, তা' কেন কোথাও দেখি না? কেন জড়তা, অস্পষ্টতা, কেন মোহ, কেন বন্ধন, কেন এমন ধর্মনিষ্ঠ জাতির আজ এইরূপ দুর্দ্দশা? রোগ আরাম হইয়াছে বলিলে কি প্রত্যয় হয়, যদি নীরোগ শরীরের কান্তি প্রকাশ না পায়? এ জাতি দিন দিন কিরূপ কদাকার, বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? সরল, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুতাপ করিয়া বলেন—এত ধর্ম্ম, এত তীর্থ, মন্দির, বার মাসে তের পার্ব্বণ, তবুও কি মনে হয়, এ জাতির ধর্ম্ম আছে; একজন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ভারতের অতীত স্মৃতিটুকুই ধর্ম্মের লক্ষণ। বস্তুতঃ ভারতের মত আদর্শে আচারে জড়বাদী আজ পৃথিবীর কোন জাতিকেই দেখিবে না। অন্যান্য জাতি যেন ভোগক্লান্ত হইয়া অপ্রাকৃত কিছুর প্রত্যাশায় সরল প্রাণেই হাত বাড়াইয়াছে; আর এ জাতির দৈন্য রাখিবার স্থান নাই। এমন ব্যাকুল বুভুক্ষু হইয়া জগতের বিভব বিলাসের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, দেখিলে দুঃখ হয়! ওরে হতভাগা জাতি! এ বসুন্ধরাও বীরভোগ্যা, আর ধর্ম্মলাভ বীরের পক্ষেই যে সম্ভব! আজ বীর্য্যহীন অপদার্থ জাতি যে দুকুলহারা হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

*　　*　　*

ধর্ম্ম-সাধনার পথে প্রাণ ঢালিতে গিয়া জগতের দৈন্যই চক্ষে পড়িল। জীবের যে প্রচণ্ড লালসা, ভোগপ্রবৃত্তি যে অন্তহীন—কেন সেখানে ত্যাগ বৈরাগ্যের নিষ্ঠুর উপদেশ, কেন নিবৃত্তির মহিমা-সঙ্গীত, কেন অপ্রাকৃত তত্ত্বের দিকে তর্জ্জনীসঙ্কেত? মানুষকে মুক্তি দাও, কামনার আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে দাও, জীবনের ধর্ম্মে ভারতকে উদ্বুদ্ধ কর। যদি সে আত্মস্বার্থরক্ষায় কোন দিন যোগ্য হয়, কোনদিন ভোগের পঙ্কিল কূপ হইতে আত্মবলে রক্ষা পায়, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বন্ধনমুক্ত হইতে পারে—তাহাকে আর ভাগবতবাণীর প্রতিধ্বনি শুনাইতে হইবে না, সে প্রত্যক্ষভাবেই তাহা কর্ণগোচর করিবে। সে দিন সে সুরে সে আত্মহারা উন্মাদ হইবে, মত্ত কুরঙ্গের মত মরণকে শ্রেয়ঃ করিয়া অমৃতসাগরে সিনান করিবে। আজ শিক্ষা দাও ভোগের, শিক্ষা দাও পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসার। সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবী লুটিয়া

যে জাতি আজ বৃহৎ, শক্তিশালী, যাহাদের জ্ঞান, প্রতিভা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যাহারা ধর্ম্ম বুঝে, বিজ্ঞান বুঝে, জাতীয়তা বুঝে, আত্মস্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় রক্ষায় ঔদাসীন নয়, সেই জাতিই তো আজ আমাদের আদর্শস্বরূপ! পরাজয়ের চরম হইলেই, আমাদের হয় প্রকৃত জয়যাত্রার পথ আবিষ্কৃত হইবে, নয় আমরা এই বৃহৎ আদর্শের মাঝে ডুবিব, নূতন আকারে নব জন্ম লইব—সত্যই সে দিন সিদ্ধ হইবে মর্ত্ত্যের ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম ব্রিটন ও ভারত যুগল অশ্বের ঘাড়ে চাপাইয়া পৃথিবী জয়ে বাহির হইয়াছে। মানুষ তো বোঝা বহিবার জন্যই জন্মিয়াছে; সে কেবল উত্তম খোরাকের দাবী করিতে পারে, তাহা দিতে কে অস্বীকার করে? কেন ভারত, তোমার অস্পষ্ট জীবন-নীতির বিরুদ্ধে এমন বিপরীত আদর্শবাদ, কেন এক-দল পাগলের কথায় এমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলে? আজ যদি মানুষের মতই বাঁচিতে হয়, তবে মানুষের ধর্ম্মই গ্রহণ কর। ধর্ম্মকে জীবনের উপরে উঠাইয়া ধরিলে, পৃথিবীর বুক হইতে যে নিশ্চিহ্ন হইতে হয়।

* * *

কিন্তু আজ এই ধর্ম্মের প্রভাবই মানুষ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পৃথিবীর শক্তি যেন মাথা নত করিয়া বলে—আত্মশক্তির বিগ্রহ ভারতের খ্রীষ্ট, ভারতের ওয়াশিংটন আমাদেরও নমস্য। এখানে অনাঘ্রাত জীবনকুসুমের সৌরভ পৃথিবী প্রমত্ত করে নাই; একটা মানুষের হাড়ভাঙ্গা বস্তুতন্ত্র জীবন-নীতি সকল ভোগপ্রবৃত্তির ভিতর দিয়া ভারতের যত ধর্ম্ম-পথ আছে, তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দমনে ভগবান বলিয়া কোন বস্তুর আবির্ভাববাণী যদি সত্য বলিতে হয়, তবে আজ তাহা প্রকট; পৃথিবীর ধর্ম্ম বিজয়মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। অপ্রাকৃত জীবনের ধর্ম্ম তো ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী গ্রহণ করিয়াছে—কেন সেখানে এ মহিমা প্রকটিত হইল না। আত্ম-প্রসাদের কূপমণ্ডুক যাহারা, তাহারা আপনাকে আপনি বড় করিয়া বসিয়া থাকুক; বিশ্ব যেখানে মাথা নীচু করে, সেখানে অতি বড় বিদ্বেষীই আমাদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে কি স্বীকারোক্তি বাহির হইবে না—"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!"

কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের ধর্ম্ম যথার্থরূপে আজ প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আর যাহা কিছু, সবই ধর্ম্মকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছু করিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্মের অঙ্কুর অনুকূল অবস্থায় শাখাপল্লব বিস্তার করে। যেখানে করার বাহাদুরী, সেখানে মূলে আছে অহঙ্কার; আর যেখানে স্বচ্ছন্দ জীবনের তালে কিছু গড়িয়া সেখানে নিরাসক্তিই সত্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ভারতের ধর্ম্ম একদিন যেমন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বাহির না হইয়া, ক্ষত্র-নরপতি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, আজ তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্মপ্রভাব, বৈশ্যকুলচূড়ামণি মহাত্মার জীবনরাগিণীতে প্রকাশিত হইল। ধারা দেখিয়া মনে হয়, ভবিষ্যতে কি সত্যই শূদ্রযুগ আসিতেছে! অথবা বিধাতা বুঝি প্রমাণ করিতে চাহেন, ভগবানের রাজ্যে জাতি ধর্ম্মের ভেদ নাই—যেখানে নিষ্ঠা, তপস্যা, পবিত্রতা, সেইখানেই নূতন বেদ উদ্গীত হয়।

* * *

পৃথিবী মহাবিপ্লব-ক্ষেত্র। এখানে ব্রহ্মণ্য-প্রভাব রক্ষার জন্য যতই শাস্ত্রজ্ঞ হই, আচারী হই, নিষ্ঠাবান্ হই, কোথা দিয়া ধর্ম্মের অব্যর্থ বীর্য্য প্রকাশ পায়—যাহা আর অস্বীকারের উপায় থাকে

না—তখন সব আয়াস ব্যর্থ হয়, আত্মসংশয়ে সবখানি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভারতের ব্যথা ঘুচাইতে যুগে যুগে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের চরণেই তো মানুষের মাথা চিরযুগ নুইয়া পড়ে। আত্ম-সাধনার ঘুর্ণিপাকে যে চুবান খায়, তাকে আশ্রয় করে কয়জন মানুষ! দেশ ও জাতির মুক্তি-গঙ্গা যে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিয়া বহিয়া আনে, মানবজাতি তাহারই চরণ বন্দনা করিবে —ইহা তো কোন বিচিত্র কথা নহে!

* * *

মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি বিচার করিতে বসিবে, কিন্তু ভারতের ব্রাহ্মণ আজ কি ম্রিয়মাণ নয়? ভারতের প্রতিভা আজ কি ম্লান হইয়া পড়ে নাই? ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্যের গৌরব-নিশান আজ কি অনাদৃত নহে? ভারত এই সকল নিশানার দিকেই তো আশায় চাহিয়া থাকে; কিন্তু যে পথ দিয়া জাতির সুদিন উপস্থিত হয়, সে পথের মর্য্যাদা কে উপেক্ষা করিতে পারে? তাই ব্যাস, বশিষ্ঠ, কশ্যপের উক্তির চেয়ে ক্ষত্রবীর শ্রীকৃষ্ণের বাণী জাতির অধিক আদরণীয় বরণীয় হইয়াছে। গীতার ছন্দে ভারতের কণ্ঠ মুখরিত; এখানে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নাই। আকাশের সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, তাহা স্বতঃই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবরমতী যে আজ ভারতের পুণ্যতীর্থ, এ কথা কাহারও অস্বীকার করার উপায় থাকিল না। ইহাই তো অধ্যাত্মশক্তির যথার্থ প্রকাশ!

মানুষ, ভুলিও না, মোহগ্রস্ত হইও না। জীবনের পথ ভগবান এমন করিয়াই প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শন করেন; আত্মম্ভরিত্ববশতঃ ইহা ঢাকা দিয়া আমরা খেয়াল চরিতার্থ করি। ভারতের ব্রাহ্মণও যেমন নমস্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও অনাদর উপেক্ষার নহে; কেননা এক অখণ্ড ভাগবত-তত্ত্বই ইহার মধ্যে তুল্যরূপে অবস্থিত। ভারতের ত্যাগী তপস্বীই প্রণম্য নহেন, গৃহস্থ কর্ম্মযোগীরও শ্রেষ্ঠ স্থান আছে; কেননা ভগবান কোথায়, কখন ভর করিয়া দাঁড়াইবেন তাহার ঠিকানা নাই। তিনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করিবেন, সন্ন্যাসীকেই ভর করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন, এমন কোন চুক্তি করেন নাই, তবে আমাদের জাতি, বর্ণ, আভি-জাত্যের গর্ব্ব কেন? ইহাই কি মরণের লক্ষণ নহে! আমরা আজ, সন্ন্যাসী হই, গৃহী হই, ব্রাহ্মণ হই, শূদ্র হই অন্তর্য্যামীকে কোথাও অহঙ্কারে, কোথাও বা তামসিক বিনয়ে যেন ক্ষুদ্র না করি। আপনার উপর অশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা জনে জনে নারায়ণ-স্বরূপ যেন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি। মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দেবত্বের প্রকাশে। সে প্রকাশ অস্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সম্ভব নহে। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনেই অধিক প্রকাশ পায়। ভারতের অতীতে এই প্রমাণই লক্ষ্যপথে থাকিত। মরণকে সম্মুখে দেখিয়া ভীরু জাতি ধর্ম্মের নামে নানা রঙ্গ করিতেছে। রঙ্গ দেখিয়া যেন আমরা সত্য দর্শনে বিমুখ না হই।

* * *

এই স্বভাবজীবনের ছন্দ এক ভাবেই যে দেখা দিবে, তাহা নহে। কেহ গৃহস্থ-সংসারে থাকিয়া ঐশীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন। তাঁর স্বভাব-কর্ম্মকে সতত হেয় চক্ষে দেখার মানুষ বহু হইলেও, গৃহী যেন আত্ম-ধর্ম্মে কোনদিন অনাস্থা না করেন। জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন এই সকল ভোগ ও সংস্কারের ভিতর দিয়াই তিনি ঈশ্বরের দুয়ারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

* * *

সবখানিই অমিশ্র হওয়া চাই। সন্ন্যাসীর অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞান যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হয়, তবে সে ব্যাভিচারের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপই গৃহীর স্বকর্ম-সাধনের সঙ্গে, ইহা পাপ ও অন্যায় বা মায়া বলিয়া যে ঔদাসীন্য, তাহা যে কত বড় অধঃপতনের কারণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সকলেই স্বধর্ম পালন করুক। এই বহু বৈচিত্র্যের মাঝে যে ঐক্য ও অদ্বয় চেতনা, তাহার কেন্দ্র রক্ষার ভার, একজনের আছে। তাঁর স্বরূপ কি? তিনিই সৎ, এক অদ্বয়তত্ত্ব; জগতের সব বৈচিত্র্য তাহাতে আশ্রয় পায়। মানুষের অবস্থাবিশেষের ভালমন্দ বিচার—ভ্রান্তি, মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে!

* * *

আমরা এই অপূর্ব্ব জীবননীতির কথা ধারাবাহিক বলিবার জন্য আজ কেবল মুখবন্ধই করিয়া রাখিলাম। ধর্ম্ম আমাদের জীবনকে অস্বীকার করিয়া নহে। জ্ঞান যেমন অখণ্ড, কিন্তু বিচিত্র অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তদ্রূপ আমাদের অভ্যুত্থাননীতি একই গৃহী, যতি, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী—পরস্পর বিভক্ত বিভিন্ন আকারে পরিস্ফুট হইলেও, সে নীতি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কেহ কোন অবস্থায় হেয় নয়, তুচ্ছ নয়। স্ব-ভাব-প্রকাশের জন্য বিচিত্র জীবনধারাই সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। তুলনায় এককে অন্যের সহিত আমরা ছোট বড় করি, তাহার একমাত্র কারণ—যে গৃহী সে দায়ে পড়িয়া সন্ন্যাসী, আবার যে সন্ন্যাসী সে গৃহবাসী হইয়াছে। স্বভাবের ব্যাভিচারে আমরা কেহই তৃপ্ত নই, তবুও যে হাসি মুখে দেখ, তাহা দেঁতো হাসি; সন্তোষ ও বীর্য্যের যে রূপ, সে কি কোনদিন অস্বীকারের বস্তু হয়!

গান

('মন-কুসুমের রংভরা এই পিচ্‌কারিটি রাখে'—সুরে গেয়)

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

এই জীবনের দুখ্ দাগা হায় বল্‌বো আমি কারে!
বাড়্‌ছে কেবল মনের আগুন আকুল আঁখির ধারে!
দুখ বল্‌বো আমি কারে!!

প্রাণের জ্বালা যায় না বলা হাটের লোকের মাঝে,
দরদীকে কইবো একা আঁধার-জীবন-সাঁঝে;
আজ্‌কে আমি দিবস যামি খুঁজ্‌ছি একাই তারে!
দুখ বল্‌বো আমি কারে!!

বৌ-কথা-কও নীলাকাশে আজ কাহারে চাহে!
তানপুরাটি বাজায় ঝিঁঝিঁ, বনের পরী গাহে!
চিত্ত-চকোর চায় সুধা তার গোপন অভিসারে!
দুখ বল্‌বো আমি কারে!!

* * *



পল্লী-কথা

অনেকে বলেন—টাকায় কাজ হয় না, খাটী মানুষই কাজ করে। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। টাকার অপচয় হয়, কিন্তু মানুষের প্রাণ-শক্তির অপচয় নাই; যেখানে ইহা ঢালা হয়, সেখানে সাফল্যের অঙ্কুর দেখা দেয়। দেশে এখনও প্রাণ দিয়া কাজ করার যুগ আসে নাই, প্রাণ গড়ার আয়োজন চলিয়াছে।

কাজের মানুষ তৈরী হওয়ায় যত বিলম্ব হইবে, ততই আমরা মরিব। কেননা জাতির মুমূর্ষু অবস্থা—অতি শীঘ্র একদল মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আপনাকে গড়ার বিধান অন্য কিছু নয়, বাসনা ও অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। কাজটা বড় শক্ত বোধ করিয়া আমরা অকারণ সময় নষ্ট করিতেছি। কাজ কঠিন বলিয়া যাহাদের ধারণা তাহারা না হয় বাসনার ক্ষেত্রেই রহিল; সাড়ে চার কোটী বাঙ্গালীর জীবন ছানিয়া সৈনিকের মত হাজার মানুষ কি বাহির করা যায় না! এই কাজটাই সর্ব্বপ্রথমে করিতে হইবে।

অহঙ্কার ও কামনার ধর্ম্ম—কর্ম্মসিদ্ধি নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা। আমার দ্বারা যদি দেশের স্বাধীনতা না আসে, তাহা হইলে উহা না আসাই ভাল; অন্যের ভিতর দিয়া কোন বড় কাজ সিদ্ধ হউক, ইহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। খুব কৃপণ আমরা, খুব সঙ্কীর্ণ আমরা!

এই ভাবটা ত্যাগ করিতে হইবে। দেশের কাজ এত—যাহা একজন দশ জনের সাধ্যে সম্ভব নয়; হাজার জনের সমবেত চেষ্টায়, ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এইজন্য কোটী কোটী মানুষ ক্ষুদ্রত্বের বন্ধন লইয়া থাকুক, এক হাজার বাঙ্গালী পুরুষ নারী একত্র হও, সঙ্ঘবদ্ধ হও, একযোগে কর্ম্ম কর। গোড়া আল্‌গা রাখিয়া দেশের স্থায়ী উন্নতি কোনদিন সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে আমরা কাজের সুযোগ পাইতে পারি, কাজ করার মানুষ আমাদের গড়িয়া লইতে হইবে।

কাজ হইবে লক্ষ্য—উহা সিদ্ধ করিতে হইলে নিজেকে যদি পুরোভাগে দিতে হয়, খ্যাতি যশের মালা গলায় দুলাইয়া আগাইতে হইবে, আর যদি পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয়, লোকচক্ষের অগোচরে থাকিলে কাজের সুবিধা হয়, একান্ত অজ্ঞাতে আত্মগোপন করিয়াই প্রাণ ঢালিতে হইবে। অবস্থা-বিশেষে প্রাণ জাগে, আবার অবসাদগ্রস্ত হয়—এ ঘূর্ণধারা প্রাণে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। চাই সরল উদার নিঃস্বার্থ চিত্ত। কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও নিরাসক্তি ও চাঞ্চল্যশূন্য অবস্থা হইবে; যেন কিছুই করি না, এই মুক্তভাবে স্বভাব দৃঢ় করিতে হইবে—কর্ম্ম করিতেছি, এই অহঙ্কার কর্ম্ম-সাফল্যের পথে ঘোরতর অন্তরায়।

আজ এই কাজের মানুষ গড়ার জন্যই জাতীয়

শিক্ষা-মন্দিরের প্রয়োজন, গুরুগৃহের প্রয়োজন। লক্ষ্য অস্পষ্ট রাখা ভাল নয়;* আসক্তিহীন হইলেই যে নৈষ্কর্ম্ম্য আশ্রয় করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? প্রাচীন মৃতপ্রায় ভারতের আদর্শ আমাদের যেন না পাইয়া বসে! আমার কেহ নাই, এইজন্যই তো আমি সকলের। জগদ্ধিতায় আমার জন্ম। আমার তৃপ্তি, রস, ভোগ সবই আছে; জীবের কল্যাণকল্পে আমি নিয়ত কর্ম্ম করি। কিন্তু কর্ম্ম আমার কল্পনা নয়, যাঁকে অন্তরে রাখিলে— "কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে"—সেই অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে যদি না রাখ, তবে গীতা পড়িয়া লাভ কি?

গীতার জীবন লইয়াই ভবিষ্য যুগের অপূর্ব্ব সৃজন সম্ভব হইবে। এই সৃষ্টির রসে যাদের হৃদয় উদ্‌বুদ্ধ, তারাই নির্ম্মাণের ঋষি। এই ঋষিসঙ্ঘ বর্ত্তমান যুগের পরিত্রাতা। সঙ্ঘশক্তিই তাই এই যুগের আশ্রয়।

বৃহৎ কাজ সম্ভব হইবে—যেদিন সঙ্ঘচক্র এক বৃহত্তর আকার লাভ করিবে। মানুষের আপন বলিয়া বস্তুর লয় না হইলে, কোথাও কেন্দ্রকে ঘিরিয়া বৃহত্তর বৃত্ত গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। আপনি মরিয়া এই সঙ্ঘ-চক্রকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হয়। কুণ্ঠা যতক্ষণ ততক্ষণ আত্ম-সাধনা শ্রেয়ঃ। হৃদয় সকল বিষয় হইতে উঠাইয়া লওয়ার সামর্থ্য যদি কোথাও জাগিয়া থাকে, তবে সেইখানেই আমরা একত্র হইতে চাহি; তোমার আমার জন্য কাজ বাকী পড়িয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

যদি কোথাও পাঁচজন একত্র হইয়া থাক, কাজ কর; আর পাঁচজনের সহিত হিসাব নিকাশ লইয়া মিশিতে চাহিও না, অন্তর্যোগে যুক্ত হও। দশজন গুণান্বিত আকারে শতজন হও। কেবল আপনাকে ছাড়িয়া অগ্রসর হও। কপট, ধূর্ত্ত, স্বার্থপর তোমার বৃত্ত মধ্যে টিকিবে না। কর্ম্মচক্রের নিরন্তর বেগে অলস তামস প্রকৃতির মানুষ ছিট্‌কাইয়া যাইবে। সেদিকে লক্ষ্য রাখিও না, কর্ম্ম কর। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের স্বরূপ বোধ যদি করিতে চাও, কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। শক্তির সন্ধান সর্ব্বাগ্রে। শক্তি-সংযোগ না হইলে সৎ'এ পৌছিতে পারিবে না। ভারতের নৈষ্কর্ম্ম্য তামসপ্রকৃতির মানুষ জড়ত্ব রূপে নির্ণয় করিয়াছে। আমার নৈষ্কর্ম্ম্য—কর্ম্মযোগেই রুদ্রের জাগরণ; ইহাতেই আমি ইন্দ্রিয়জয়ী—অর্থাৎ আমার সকল যন্ত্রে ভগবানের সুরই বাহির হয়, ভাগবত-শক্তিই আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আমি নিষ্কাম হইলাম বলিয়াই তো কামনার ঠাকুর জীবন-রথের সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিলেন। এই প্রবল বৈদ্যুতিক প্রাণের স্ফুরণ বুদ্ধিদোষে হারাইয়াছি। ভারতের ধর্ম্মবলের কি তুলনা আছে! ভগবান্ "সর্ব্বভূতানাম্ ঈশ্বরঃ"—আমাদের মধ্যে নারায়ণ জাগ্রত হইবেন; আমাদের এই শরীরের আশ্রয়ে ভাগবত-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা দিগ্বিজয়ী হইব—আমাদের কি উচ্চ কামনায় জড়ের মত এক বিন্দু বসিয়া থাকা উচিত?

প্রথম কাজের মানুষ হও—কথায় নয়, বস্তুতন্ত্র জীবনে। ইহার জন্য নিরলস হওয়ার সাধনা কর; অভ্যাস কর, কাল-জয় যাহাতে করিতে পার, —তাহার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হও। নিয়ম পালন দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থোপায়ের ক্ষেত্রে কেরাণী হইয়া যথাসময়ে যাইতে পার, যথাবিহিত কর্ম্ম করিতে পার, আর ভগবানের কাজে এত বিশৃঙ্খলা কেন! গৃহস্থের জীবনে যে প্রাণ, যে শক্তি দেখি, আশ্রম-জীবনে গুরুগৃহে সে প্রাণ এমন বিষণ্ণ হয় কেন? কে তোমায় এখানে ডাকিয়াছে! যেখানে প্রাণে একটুও আগুন জ্বলে, সেখানে গিয়াই দাঁড়াও, তবুও জীবনের আস্বাদ লাভ করিবে। আশ্রম-জীবন

বা গুরুগৃহ, বা জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্র—এখানে শতগুণ শক্তি ও সামর্থ্য দিবারই স্থান। এখানে আরাম প্রচণ্ড ফাঁকি; আদর্শের হেঁয়ালী যেখানে চলে, সেখানে গিয়া দাঁড়াও। পৃথিবীর মানুষ এখনও ইন্দ্রজাল দেখিয়া খুসী হয়, ভগবানের রাজ্যে করুণা-বঞ্চিত কেহ নহে; ভাবনা কাহারও নাই—কোথাও নিরুপায় বলিয়া আশ্রয় লইও না। বিশেষ, আশ্রমে, সঙ্ঘে, দেবতার মন্দিরে, গুরুগৃহে—এইখানেই আজ বিশ্বজয়ী প্রাণ প্রকাশ করিতে হইবে। এখানে নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, চিন্তার অবকাশ নাই; —আছে একটা সচেতন প্রবাহ। রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ হইতে শয়ন পর্য্যন্ত স্রোতের টানে সাঁতার কাট। যদি ভাঙ্গিয়া পড়, ডুবিয়া মর; কিন্তু প্রাণের ভয়ে তীরের দিকে মুখ ফিরাইও না। তবেই বুঝিব—তুমি যোগী, তুমি প্রেমিক, শক্তির বরপুত্র।

এমন তোমরা কয়জন হইয়াছ—দুইজন হইলেই চলিবে। যদি তবুও ভরসা না হয়, যেখানে দশজন সেখানে গিয়া যোগ দাও, বার জন হইবে। অন্তরে অন্তরে এমন মিলন যদি সিদ্ধ হয়, এখানে কার্য্য হইবে শত জনের। প্রাণ গলিয়া প্রাণের সাগর যদি সৃষ্টি হয়, শক্তি গুণান্বিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। তাই তো বলি, আজ না হয় সোভায়েট রুশ বিশ লক্ষ হইতে চল্লিশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে; যখন তাহারা সঙ্ঘচক্র আরম্ভ করে, তখন তাহারা কয়জন ছিল! প্রাণের রসায়নে পাঁচ সাত জনে তের চৌদ্দ কোটী রুশকে নূতন জন্ম দিল। আর আজ বাঙ্গালী তোমরা, আশ্রম-জীবনের গর্ব্ব কর, বিনাইয়া বিনাইয়া সঙ্ঘের মর্ম্মকথা প্রকাশ কর, গুরুগৃহের মহিমা-কীর্ত্তন কর—ঠিক তোমাদের কথার মত যখন কাজ করিতে পার না, তখন কথা না হয় বন্ধই করিলে!

আজ এমন দশজন মানুষ চাহি, যাহাদের আপন বলিতে কিছু নাই; কথায় উঠিবে, কথায় বসিবে—হউক ইহা দাসমনোবৃত্তি। যদি এই দশ জনের মন একজনের কথায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠা না করে, আঘাতে ম্রিয়মাণ না হয়, অন্তরে নৈরাশ্য না জাগে, কথা শুনাই যদি ধর্ম্ম হয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে কোন আসক্তিই না রাখে, তবে এই দশচক্রে যদি ভূতের আবির্ভাব হয়, তবুও আনুগত্যের রসে সে ভূত ভগবান হইয়াই বৃহৎ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে। কিন্তু সে দশ জনের প্রাণ আজও কি কোথাও সুরে ভিড়িয়াছে!

গৌরচন্দ্রিকা করিতেই অনেক কথা বলিতে হইল, কাজের কথাই বলি। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও—এ যুগে ব্যক্তির কাজ কোনকালে দাঁড়াইবে না; চাই একটা সংহতির কাজ, সঙ্ঘের কাজ, অপূর্ব্ব ঐক্যবদ্ধ জীবনের কাজ। দুই জন হইতে আরম্ভ করিবে। যদি চক্ষু কর্ণ বুজিয়া দশজনে ঝাঁপ দিতে পার দিও, নতুবা অক্লান্ত শ্রম ঢালিয়া যাও; তোমাদের দুইজনের প্রাণ দেশে অমর জীবন সৃজন করিবে। মানুষকে আশ্রয় করিয়া যে প্রাণ অনাহত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, সে যদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে হিমালয়ে ঘা দেয়, আকাশভেদী মহাপর্ব্বত গুঁড়া হইয়া ধরাতলে ছড়াইয়া পড়িবে। একনিষ্ঠ প্রাণশক্তিই মহাপ্রাণে পরিণত হয়।

কাজ আজ রাষ্ট্রে, আরও বৃহত্তর কাজ—জাতি-গঠনের ক্ষেত্র বাংলার সমাজে, বাংলার পল্লীতে। সহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে দৃষ্টি দাও; জাতির সমস্তখানি প্রাণশক্তি সেইখানে মূর্চ্ছিত। তাহাদের হাত ধরিয়া উঠাও। তাহাদের কানে ত্রয়ীযোগের সিদ্ধমন্ত্র দাও। তাহারা মানুষ হোক। একই শিক্ষার ছন্দে সকলের কণ্ঠে যদি উদ্গান তুলিতে পার, তবে সমস্বরেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উঠিবে।

অহমিকা আত্মপ্রসাদ চায়, এইজন্ত যেটুকু কাজ তাহাও স্বতন্ত্র আদর্শ লইয়া প্রবর্ত্তিত হয়—তাহাতে গোলযোগ বাধিবে কত, তাহা কি বুঝ না! ভারতে দুই শত বাইশ প্রকারের ভাষা আছে; তাহাতে যত ক্ষতি না হইবে, শিক্ষা-বৈচিত্র্য ততোধিক আমরা পরস্পর হইতে পরস্পর ভিন্ন হইব। ইংরাজী শিক্ষায় এখনও আমাদের তত ক্ষতি হয় নাই, তাহার কারণ—এখনও শতকরা দুইজন লোকও ইংরাজী-ভাষায় অভিজ্ঞ নহে। আমাদের ভাষা উর্দ্দু হউক, হিন্দী হউক, তামিল, তেলেগু, কেনারী হউক, বাংলা, মারাট্টি, গুজরাটী হউক, আমরা ভারতীয় ভাবের শিক্ষাই বিচিত্র ভাষার সাহায্যে পাই; তাই হিন্দুভারত ভিন্ন-ভাষাভাষী, ভিন্ন আব্‌হাওয়ায় বিচিত্র সমাজধর্ম্মে পড়িয়া থাকিলেও, একটা অখণ্ড হৃদয়ের আস্বাদে আমরা এক জাতি, এক ভগবান্ বলিয়া গর্ব্ব করি। ইংরাজী-শিক্ষায় যে হৃদয়, যে ভাব, যে চরিত্র গড়িয়া তুলে, তাহা অ-ভারতীয়। ইহা এখনও ত্রিশ কোটী নরনারীর জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করে নাই বলিয়াই রক্ষা; আর এই প্রভাববিশিষ্ট মানুষ যদি কর্ম্মের নেশায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জাতিটাকে শিক্ষা দিতে চায়, তবে যে যে কি গণ্ডগোল বাধিবে তাহা ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। আমাদের আজ বৃহত্তর মিলন সম্ভব নয়, তবুও খণ্ড খণ্ড ভাবে যে প্রাণ জাগিয়াছে, সেই প্রাণটুকু দিয়া আমরা যেন ভারতের জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেমের আঁকর মানুষের হৃদয়ে আঁকিয়া তুলিতে পারি। আমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, আমাদের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, আমাদের ব্যাস, বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, আমাদের হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট, আমাদের কাশী, কুরুক্ষেত্র, রামেশ্বর, আমাদের গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, প্রভৃতি আদর্শ নারীপুরুষ, নদীপর্ব্বত, তীর্থ প্রভৃতির মহিমা দিয়াই আমরা যেন জাতির প্রাণ জাগাইয়া তুলিতে পারি। প্রত্যেক কর্ম্মীকে এই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আর একটা প্রধান শিক্ষা দিতে হইবে—জীবনের শিক্ষা। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ কর্ম্ম। সৎ, সত্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্, যে তার পরকালের দুর্ভাবনা নাই। শিক্ষার প্রভাব প্রাণকে জাগাইয়া তুলে। পাপ ও অন্যায়ে জর্জ্জরিত জীবন অন্তকালে সান্ত্বনা চায়, তা' সে ব্যক্তিই হউক, আর জাতিই হউক—তার কানে শেষের কথা, পরলোকের কথা শুনায় ভাল। যে জীবনের দিন গণিয়া যায় উপাসনার মন্ত্রে, জীবন যার যোগ-যজ্ঞ—তার এই সকল দুর্ভাবনা কোথা! আশা ও আনন্দ তার জীবন ছাইয়া রাখে। শিক্ষায় এই ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হয়।

শিক্ষা কোথায় দিতে হইবে, এইবার সেই কথাটাই বলি। শীতের তখনও শেষ হয় নাই, অতি প্রত্যুষে গিয়া দেখি—মাঠের মধ্যে একখণ্ড জমির উপর গোটা পাঁচেক ডোবা। ঘন বাঁশবন। ভেরেণ্ডা, বাব্‌লা, শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল ঘিরিয়া কয়েকখানা পড়ো ঘর, গৃহস্থের কানাচ দিয়া সরু পথ। দুই পার্শ্বে গোময়স্তূপ। রৌদ্রপথ বন্ধ করিয়া যে নিবিড় বন তাহার ভিতর দিয়া ডোবার দূষিত বাষ্প উঠিতেছে। গরুগুলি নিঃশব্দে রোমন্থন করিতেছে। গ্রামবাসী সুপ্ত। সাড়া শব্দ নাই। পূর্ব্ব আকাশে রঙ্ ধরিয়াছে। বিহগের কণ্ঠে কাকলী উঠিয়াছে। মানুষের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই, উঠিবে কি, জড়তায় গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে খিল ধরিয়াছে। ঘরের মট্‌কায় রৌদ্র আসিয়া গৃহস্থদের জাগাইল। বেলা বাড়িতেছে। মাঠে একমাস ধরিয়া মসুর, তেওড়া কাটা হইয়া পড়িয়া আছে। মাঘের শেষে আকাশ ঘনাইয়া যদি বৃষ্টি আসে, সব পণ্ড হইবে। কৃষক হুঁকা হাতে বাহির হইল, প্রকাণ্ড প্লীহা লইয়া দেশের

ভবিষ্য বাঙ্গলার শিশুপুত্র দাওয়ায় পড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিল—গৃহিণী বিমনা হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া হাই তুলিল—প্রভাতের সজীবতা কৈ ?

গ্রামে ত্রিশ ঘর লোক। এক ঘর ব্রাহ্মণ, এক ঘর সদ্গোপ, বাকী সব মাহিষ্য। পার্শ্বে মাঠ। পুরুষ শ্রম করে, নারী ঘর গুছায়, ছেলেগুলি রোগে ভুগিয়া অর্দ্ধেক মরে। দশবছর পরে ত্রিশ ঘর পাঁচ ঘরে দাঁড়াইবে। অতীতের কাহিনী ইহাই বলে—গ্রামে পূর্ব্বে বারোয়ারী পূজা হইত, ফকির মণ্ডলের বাড়ীতে পূজায় ঢাক বাজিত; কিন্তু ক্রমে সব শেষ হইয়া আসিতেছে। ঐ একঘর ব্রাহ্মণ শুধু পেটের দায়েই আজ নির্ব্বংশ হইতে বসে নাই। পূজা পার্ব্বণে মন্ত্র উচ্চারণ করিত, প্রাঙ্গণে পাঠশালা বসাইয়া ধারাপাত, শুভঙ্করী, দাতাকর্ণ পড়াইত; কিন্তু গ্রাম উৎসন্ন হইল। যাহার সামান্য সংস্থান আছে সে ভিন্ন গ্রামের পাঠশালায় ছেলেদের পড়াইতে পাঠায়। ডোবার জল খাইয়া পূর্ব্বে মরণকে নিত্যসঙ্গী করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে একটা নলকূপ বসিয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়, কৃষকরা বলে ঐ পাইপের ডগায় চামড়া আছে, উহার জল পান করিলে ধর্ম্ম যাইবে—তোমরা বলিতে পার, ইহাদের ধর্ম্ম কি ?

দ্বিতীয় নম্বর গ্রামের অবস্থা কিছু ভাল—বাগান বাগিচা আছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি কষ্টে একটী পাঠশালা চালান—ছাত্রসংখ্যা প্রায় কুড়ি জন। তিনি বলেন—ছেলেরা কাঠাকালি, বিঘাকালি পড়িলেই মাঠের কাজে লাগিয়া যায়, লেখা পড়ার দিকে তেমন ঝোঁক কৈ ? অন্ততঃ কুড়িটী টাকা না হইলে তাহার সংসার চলিবে কেন ? কাজেই অন্য পথ শীঘ্রই দেখিতে হইবে। যেটুকু আলো চক্রবর্ত্তী মহাশয় জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন তাহা নিভিলে, পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচখানি গ্রাম একেবারে অন্ধকারে ডুবিবে; যদিও দেশের খবর রাখার সময় ইহাদের নাই, তবুও দস্তখৎ করিতে জানে—ইহা লইয়া ভারতে শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা দশজন!

তৃতীয় গ্রামখানিতে গিয়া একটু আশা হইল। উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া ভেদে গ্রামটী দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণ মণ্ডল, হীরু মণ্ডল যথাক্রমে দুই পাড়ার মাথাধরা মানুষ। গোস্বামী মহাশয়ের পাঠশালা আছে, হরিসভা আছে। গ্রামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ, ছয় সাত ঘর সদ্গোপ, বাকী সবই মাহিষ্য। লোকসংখ্যা নারীপুরুষ মিলিয়া দুইশত হইবে। গোস্বামী মহাশয় গ্রামখানিকে জমাইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মণের কাজ ঠিকই চলিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানতঃ নহে—সংস্কারবশে। এখানে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, ওলাউঠায় প্রতিবৎসরই লোকসংখ্যার হ্রাস হয়। জলকষ্ট দূর করার সামর্থ্য না থাকায় একটা মজা নদীর পেঁকো জল খাইয়া গ্রামবাসী দিন কাটাই-তেছে। গোস্বামী মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহারা কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছে, "চৈতন্যচরিতামৃতের" আস্বাদ পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত জগতের কোনই খবর রাখে না—স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি জানে না, জল গরম করিয়া খাওয়ার কথা বলায় তাহারা হাসিয়া বলিল—"বাবু ভগবান মা বাপ, তিনি রক্ষা করেন—বিষ খেয়েও বাঁচবো!" ইহার উপর আর কথা নাই।

নদীর পাড়ে পাড়ে গ্রাম—পাঠশালা নাই, পানীয় জল নাই, ডাক্তার নাই; ঠিক যেন অন্ধকার গর্ত্তে মানুষ বন্দী রহিয়াছে। যে গ্রামে শত শত মানুষ স্বাস্থ্য ও আনন্দে বসবাস করিত, এক্ষণে সেখানে দশ-বিশ ঘর অধিবাসী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিষণ্ণ মনে দিন যাপন করিতেছে। ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠায় দেশ উৎসন্ন গিয়াছে। বাগ্দী পল্লীতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শতাধিক ঘর অধিবাসী ছিল, এখন একজন বিধবা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সহর হইতে একজন ক্যাম্বেল-পাশকরা চিকিৎসক আনিতে হইলে গাড়ীভাড়া,

দর্শনী, ঔষধাদিতে দশ টাকা পড়িয়া যায়। মরণ আসন্ন না হইলে কেহ আর ডাক্তার ডাকে না।

শাক সব্জীর অভাব নাই—মাঠে আলু, কপি, কলাইশুঁটীর ক্ষেত, দূরে দিগন্ত প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র, মজানদীর পাড়ে আনারস, কলা, পেঁপে, আম, কাঁঠালের বাগান, দুগ্ধ টাকায় ৭।৮ সের, খাদ্যাদির অভাব নাই, অভাব প্রাণের—গ্রাম হইতে প্রাণ কাড়িয়া সহরে জমা হইয়াছে, সে প্রাণ কি দেশের, সে প্রাণ কি জাতিকে রক্ষা করিবে?

কোন কোন গ্রামে পরাণ মণ্ডল, রতন ধাড়া পাঠশালা খুলিয়াছে। এখানে ব্রাহ্মণের কাজ মাহিষ্য, বাগদী মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। ধাড়া মহাশয়ের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রতি বৎসরে উৎসব হয়; বাড়ীতে নিত্য-সঙ্কীর্ত্তন, গীতা ও মহাভারত পাঠ হয়—রতন ধারার আগ্রহে গ্রামে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই রতন ধাড়া গ্রামখানিকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' ইহা কতটুকু! এই পাঁচ সাতখানি গ্রামে নারীপুরুষের সংখ্যা ৭০০।৮০০ শত হইবে। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় প্রতি পাঁচখানি গ্রামের একজন পঞ্চায়েৎ-প্রতিনিধি আছে। দেশের দিক্ হইতে যদি দশখানি গ্রাম লইয়া একজন আত্মদান করে, তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে যে কি কাজ হয়, তাহা আর বলিবার নহে।

এখানে টাকার কোন কথা নাই—দশখানা গ্রামের লোককে ভারতীয় ভাবে শিক্ষায়, স্বাস্থ্য-নীতি প্রচারে যদি সেবা করা যায়, একজন কেন, পাঁচজন লোক গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে—কিন্তু সে কাজের মানুষ কৈ?

এইখানে আমাদের কথা বলিয়া রাখি—স্থায়ীভাবে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইবার জন্য, এতদিন ধরিয়া যে মানুষ তৈরী হইয়াছে, তাহাদের জীবন মূলরক্ষায় অবকাশহীন; এক্ষণে দরকার, নূতন শিক্ষার্থী আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করা। এখানে আমার বলিয়া বস্তু রাখিলে চলিবে না, "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" কিছু কোন মানুষের নয়, একটা জাতির সম্পত্তি—ইহা রক্ষা করাও বড় কম কাজ নয়, এই কাজেই জীবন ভোর হইল। এক্ষণে যদি স্বামীজীর কণ্ঠ কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া থাকে তবে একখণ্ড বস্ত্র কটিতটে জড়াইয়া ভারতের মহিমা কীর্ত্তন করার ব্রতধারী যারা তারাই সাড়া দিবে। এমন হাজার লোক চাই, তাহাদের কিছুই ভাবিতে হইবে না—কেবল দেশচেতনায় তন্ময় হইয়া থাকিবে। দেশকে তুলিতে হইলে, এইরূপ একদল লোকের কথাই আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি। এখানে ভারতের সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চেয়ে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ভোগকামনার মত মোক্ষ-বাঞ্ছাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। গীতার মানুষই ভবিষ্য দেশগড়ার বিশুদ্ধ যন্ত্র। সর্ব্বপ্রথমে সেই চরিত্রলাভ, তারপর দেশের কাজে লাগা। দেশ গড়ার ডাক প্রথম নয়. চরিত্রগঠন ইহার মূল নীতি। একবার যদি হাজার মানুষ গড়িয়া উঠে, যাহারা কোন দায়ে আর মুখ ফিরাইবে না, আমি অঙ্গীকার করিয়া বলিতে পারি আগামী—দশ বছরের ভিতর বাংলা প্রকটভাবে গড়িয়া উঠিবে—যাহা আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। বাংলায় এই জাতিগঠনযজ্ঞে আত্মদান করার স্পর্দ্ধা যদি কোথাও থাকে, তবে আমরা তাহার সাড়া পাইব।



সম্ভবামি

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

দুনিয়ার আর-পাঁচজন যেমন করিয়া মরে, শশীশেখরের মাও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই মরিল।

মরিতে সে চায় নাই।

শশীশেখরের বয়স তখন মাত্র ছয় কি সাত। নিতান্ত অসহায় ওই শিশু সন্তানটিকে রাখিয়া মাতার মৃত্যু তেমন সহজও নয়।

তবু তাহাকে মরিতে হইল।

সংসারে লোক মাত্র তিনজন। বালক শশীশেখর, তাহার বিধবা মাতা এবং এক বৃদ্ধা পিসিমা। পিসিমা তাহার চোখে ভাল দেখিতে পায় না, কানে একটু কম শোনে, কুঁজো হইয়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া দিবারাত্রি দুনিয়ার সমস্ত অশুচি সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া কোনোরকমে বাঁচিয়া আছে মাত্র।

দুপুরে সে শয্যাপার্শে গিয়া একবার বৌকে ডাকিয়াছিল,—'কিগো, কেমন আছ?'

'উঁ' বলিয়া অতিকষ্টে চোখ চাহিয়া বৌ যা' জবাব দিয়াছিল তাহা সে শুনিতে পায় নাই।

সেই অবধি বুড়ী আপনমনেই চীৎকার করিতেছে,—'ঝাড়ু মারো মুখে, অমন বৌ'এর মুখে ঝাড়ু মারো! তিরকুটি করে' প'ড়ে আছে, মাগী ডাকলে সাড়া দেয় না।'

শশীশেখর বাড়ী ছিল না। বুড়ী একবার দরজা পর্য্যন্ত গিয়া এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাইয়া ছেলেটার সন্ধান করিয়া আসিল। বলিল,—'ছেলেটাও যে এসময় কোথায় গেল......বাবা রে বাবা! যেমন দস্যি মা, তার তেম্‌নি দস্যি ছেলে!'

ছেলে তখন গ্রামের দয়াল কবিরাজের বৈঠকখানায়। বুড়া কবিরাজ প্রকাণ্ড একটা পাথরের খলে তেমনি একটা মোটা নুড়ি দিয়া ঔষধ মাড়িতেছে, আর হাঁ করিয়া শশীশেখর তাহার চোখের সুমুখে বসিয়া আছে।—কোঁকড়ানো কালো একমাথা চুল, সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, ঢলঢলে আয়ত দুইটি চক্ষু, নিটোল সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব! বৃদ্ধ দয়াল একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল।—'কিহে, তোমার মা কেমন আছে?'

পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে।

দিনের আলো কমিয়া আসিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া শশীশেখর কি যে বলিল বুড়া ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'ভাল আছে? বেশ, বেশ, ভাল থাকলেই ভাল।' বলিয়া আবার সে হেঁটমুখে খলের উপর নুড়ি চালাইতে লাগিল।

শশীশেখরের চোখদুটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। চোখের জল মুছিয়া ঢোঁক গিলিয়া আবার কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওটা কিসের ওষুধ কোব্‌রেজ্‌-দাদা?'

'কিসের ওষুধ?' বলিয়া বালকের প্রশ্নে ঈষৎ হাসিয়া কবিরাজ বলিল, 'খুব ভালো ওষুধ।'

শশীশেখরের ইচ্ছা করিতেছিল—সে বলে, খুব ভাল ওষুধ ত' আমাকে একটুখানি দাও না, মাকে খাইয়ে দিইগে—কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা জোগাইল না। রাগ হইল বুড়ী পিসিমার উপর। তাহাদের গ্রামের এই বুড়া কবিরাজের কাছে খুব ভাল ভাল ঔষধ নিশ্চয়ই আছে, খাইলে মা তাহার সারিয়াও উঠে, অথচ পিসিমা তাহাকে ডাকে না কেন? কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—গোবর্দ্ধনদের বাড়ীতে সেদিন সে দেখিয়াছে, বুড়াকে ডাকিলে পয়সা দিতে হয়। এবং তাহার পিসিমা সেদিন একটা গামছা কিনিয়া বাগাল তাঁতীকে পয়সা দিতে পারে নাই, তাহাও সে জানে। বোধহয় সেইজন্যই সে ডাকে না।……সুমুখে সারি-সারি তিনটি শিবের মন্দির। বহুদিনের পুরানো। ফাটলে অশ্বত্থের গাছ গজাইয়াছে। শশীশেখর দেওয়ালের কাছে সরিয়া গিয়া মন্দির তিনটির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিল,—আচ্ছা, এমন হয় না! সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়ী ফিরিতেছে, চারিদিক্ অন্ধকার, হঠাৎ ওই নিকুঞ্জদের পোড়ো বাড়ীটার কাছে বাবা শিব তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—এয়া লম্বা লম্বা জটা, পরণে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল! বলিল, 'কি চাই?' আমি বলিলাম, 'মায়ের ওষুধ।' বাস্, যেই বলা আর অমনি শিব তাহার ঝুলি হইতে একমুঠা ছাই বাহির করিয়া বলিল, 'নে ধর্! মাকে তোর খাইয়ে দিগে যা, এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে।'

এমন সময়ে অদূরে পিসিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—'ওরে ও, কে যাচ্ছিস্ বাছা? আমাদের ছেলেটা যদি ওদিক্ পানে কোথাও……'

'যাচ্ছি পিসিমা' বলিয়া শশীশেখর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কবিরাজের চালা হইতে নামিয়া ছুটিয়া একদৌড়ে পিসিমার কাছে গিয়া বলিল, আমায় ডাকছিলে পিসিমা?'

পিসিমা রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'না, তোকে ডাক্‌ব কেন? ডাক্‌ছিলাম—তাঁতীদের হরেকেষ্টকে।'

বলিয়াই কিয়ৎক্ষণ থামিয়া চলিতে চলিতে সে আবার আরম্ভ করিল, 'কি ছেলেই না হয়েছিস্ বাবা! চব্বিশঘণ্টা খেলা আর খেলা! ওদিকে যে মায়ের অসুখ, শিয়রের কাছে বসে থাকলেও ত' কাজ হয়।—যা বোস্‌গে যা! আমি জল আন্‌তে চল্‌লাম। বুড়োই হই আর অথর্বই হই—পিণ্ডি গিল্‌তে যখন হবে……'

বুড়ী অমন কত বলে। সে কথায় শশীশেখর কান দিল না। মা'র কাছে গিয়া ডাকিল, 'মা!'

কোনও সাড়া না পাইয়া সে আবার ডাকিল, 'মা!'……

কিন্তু এবারেও মাকে তাহার চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শশীশেখর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কোব্‌রেজ-দাদাকে ডেকে আন্‌ব মা? পিসিমা এই সময় বাড়ী নেই।'

তখনও তাহার মা শুধু তাহারই মুখের পানে অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে অথচ সাড়া দেয় না।

শশীশেখর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে অন্যদিন হাত বাড়াইয়া মা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়, আজ কিন্তু তাহার সে রক্তহীন অস্থিচর্ম্মসার হাত দুইটি বিছানার উপর সোজা হইয়া যেমন পড়িয়া ছিল তেম্‌নি পড়িয়াই রহিল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে অথচ কথা কহিতে পারে না,—চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল......

শশীশেখর তাড়াতাড়ি আসিয়া ডাকিল, 'পিসিমা! পিসিমা!'

কিন্তু কোথায় পিসিমা!

সে তখন ছোট পিতলের কলসীটি কাঁখে লইয়া পুকুরে জল আনিতে চলিয়া গেছে। বেশীদূর হয়ত' সে এখনও যায় নাই, কিন্তু মাকে ফেলিয়া সে-ই বা তাহার পিছু পিছু ছোটে কেমন করিয়া! শশীশেখর আবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

দিনের আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে কোনও বস্তুই আর ভাল করিয়া দেখা যায় না। মা'র মুখখানিও ক্রমশ অন্ধকারে মিলাইয়া আসিতেছিল। শশীশেখর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখখানি তাহার মা'র মুখের কাছে লইয়া গিয়া ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়া মা'র চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। নিঃশ্বাসের বাতাস তাহার মুখে আসিয়া লাগিতেছে। কিন্তু চোখের জল কিছুতেই আর সে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। যত মুছে ততই আবার অশ্রুর ধারা দর্ দর্ করিয়া গড়াইয়া আসে।

মা তাহার চোখ চাহিয়া রহিয়াছে অথচ কথা কয় না কেন?

শশীশেখরের কান্না পাইতেছিল। নিস্তব্ধ গৃহপ্রান্তে মুমূর্ষু মাতার শিয়রে বসিয়া মুখখানি তাহার ধীরে ধীরে নাড়িয়া দিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সে আবার ডাকিল, 'মা!'

সাড়া দিতে গিয়াই বোধকরি মা'র গলার ভিতরটা ঘড়্ ঘড়্ করিয়া উঠিল, নিশ্বাস যেন আরও জোরে জোরে পড়িতে লাগিল।

একাকী সেই অন্ধকার ঘরে বসিয়াই একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া সেও তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনা দিবার জন্ত মা তাহার হাতও তুলিল না, কথাও বলিল না, পা এবং হাত দুইটা বার-কতক থর্ থর্ করিয়া নাড়িয়া হঠাৎ সে চুপ হইয়া গেল।

গলার আওয়াজটাও যেন থামিয়াছে। নিঃশ্বাসের বাতাসটাও আর যেন পাওয়া যাইতেছিল না।

শশীশেখর ভাবিল, মা বুঝি তাহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ভাল করিয়াই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া অন্ধকারটাকে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া মা'র মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই দেখিল,—না, চাহিয়া রহিয়াছে ত!

—'মা! মা!'

পিসি কোথায় দিয়াশলাই রাখিয়া গেছে কে জানে। প্রদীপটা কোথায় আছে তাহাও সে জানে না।

এমন সময় পিছনে ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেই শশীশেখর চমকিয়া উঠিল। দেখিল, পিসি তাহার কাঁকাল হইতে জল ভর্ত্তি পিতলের কলসীটা মেঝের উপর নামাইয়া ডাকিল, 'শশী!'

শশীশেখর উঠিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'মা কেন কথা কইছে না পিসিমা?'

বুড়ী হাঁ হাঁ করিয়া একটুখানি পিছাইয়া গেল। —'ছুঁস্‌নে বাছা ছুঁস্‌নে—আমার কাচা কাপড়। দাঁড়া, দেখি—আগে সন্ধ্যে দিই।'

বলিয়া অন্ধকারেই বুড়ী আন্দাজি একটা কুলুঙ্গির উপর হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া দিয়াশালাই বাহির করিয়া প্রদীপটা জ্বালিতে গিয়া বলিল, 'কিগো বৌ, কেমন আছ? ঘুমোচ্ছ নাকি?'

বৌ-এর কাছ হইতে কোনও জবাব আসিল না। প্রদীপটা জ্বালিয়াই সেটা আঁচল ঢাকা দিয়া বুড়ী তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইতে গেল। দেবতাদের সন্ধ্যা দেখাইয়া প্রণাম করিয়া তুলসীতলার একটু-খানি মৃত্তিকা হাতে লইয়া শশীশেখরকে বলিল, 'নে, হাঁ কর্।'

শশীশেখর হাঁ করিয়া একটুখানি মৃত্তিকা খাইয়া বলিল, 'মাকে দেবে না?'

কথাটা পিসিমার ভাল লাগিল না। বলিল, 'কেন, তোর মাকে কোনোদিন দিই না নাকি? অপবাদ দিচ্ছিস্ কেন রে ছোঁড়া?'

বলিয়া দুইটি আঙুলে আরও একটুখানি মৃত্তিকা লইয়া বুড়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্।'

শশীশেখর আগে আগে তাহার মা'র শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হাঁ কর মা, তুলসীতলার কিত্তিকে নাও।'

হাঁ সে করিয়াই ছিল। ভিজা কাপড়ে বুড়ীর আর বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব। প্রদীপটা পিলসুজের উপর নামাইয়া দিয়া আপনমনেই বলিতে লাগিল, 'ছোঁব বিছানাটা? তা আর কি করি বল।—কই গা, বলি অ-বৌ, একবার হাঁ কর ত বাছা।'

বলিয়া তাহার দুই আঙুলের-ডগায়-ধরা মৃত্তিকা-টুকু সে হাত্‌ড়াইয়া তাহার মুখের ভিতর ফেলিয়া দিতে গিয়া দেখিল, শরীরটা তাহার ঠাণ্ডা হিম। —'না কই জরজ্বালা কিছু ত' নেই, তবে আর এ সন্ধ্যেবেলা ঘুমোচ্ছ কেন বাছা?'

বলিতে বলিতে সে তাহার কপালে হাতে গায়ে মাথায় হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া কেমন যেন চমকিয়া উঠিল।

শশীশেখর বলিল, 'না, কই মা ত ঘুমোয় নি পিসিমা, চেয়ে রয়েছে যে!'

বুড়ী চোখে ভাল দেখিতে পায় না, তাই সে যথাসম্ভব ঝুঁকিয়া পড়িয়া একবার নাকের কাছে একবার বুকের উপর হাত রাখিয়া একবার শশী-শেখরের দিকে একবার তাহার মা'র দিকে তাকাইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, শশীশেখরকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আয়।'

শশীশেখর বলিল, 'কোথায় পিসিমা?'

'আয় না!' বলিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে ধরিয়া বুড়ী ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। থমকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া পাশের বাড়ীর উঠানে গিয়া ডাকিল, 'সুরেন আছে বাড়ীতে, কালিদাসী? ভূতনাথ?'

সকলেই বাড়ীতে ছিল। বুড়ীর ডাক শুনিয়া সুরেন বলিল, 'কিগো দিদি, কি বলছ?'

'একবার আয় ত' বাছা আমাদের বাড়ীতে! তোরা সবাই আয়। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে।'

বৌ-এর অসুখের খবর তাহারা সকলেই জানিত। কালিদাসী, ভূতনাথ, সুরেন—সকলেই ছুটিয়া আসিল এবং দরজা খুলিয়া প্রদীপের

আলোকে বৌ-এর শয্যাপার্শ্বে গিয়া যাহা দেখিল সে-দৃশ্য দেখিবার আশঙ্কা কেহই করে নাই।

কালিদাসী একরকম জোর করিয়াই অতিকষ্টে শশীশেখরকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বুড়ী কাঁদিয়া সেইখানেই আছাড় খাইয়া পড়িল। সুরেন ও ভূতনাথ সজলচক্ষে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌ মরিয়াছে।

কিন্তু মরিলেই ত' আর হাঙ্গামা চুকে না। মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে।

এদিকে শশীশেখরকে ধরিয়া রাখা দায়। পিসিমার কান্না সে শুনিতে পাইতেছিল। কালিদাসী যতই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়, ছেলেটা ততই কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, ছুটিয়া ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করে।—মাকে তাহার সে শুধু একটিবারের জন্য দেখিয়া আসিবে। মা ছাড়া তাহার আর কে-ই বা আছে! বুড়ী তাহাকে ভালবাসে না।

পুরোহিত বলিল, 'না না, ধরে' রাখ্‌লে চল্‌বে কেন? অত বড় ছেলে রয়েছে, মুখাগ্নি করতে হবে যে!'

স্থির হইল, ছেলেটাকে আর শ্মশানে লইয়া গিয়া কাজ নাই, গ্রামের বাহিরে জোড়া আম-গাছের তলায় মৃতদেহ নামাইয়া শশীশেখরকে দিয়া মুখাগ্নি করাইয়া তাহাকে আবার কোলে করিয়া গ্রামে লইয়া আসিলেই চলিবে।

জোড়া আমতলায় খাটিয়ার উপর মৃতদেহ নামানো হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শশীশেখরকে কোলে লইয়া সুরেন সেইখানে উপস্থিত হইল। শ্মশান-যাত্রীরা মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার রাত্রি। মিট্‌ মিট্‌ করিয়া মাত্র একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলিতেছিল।

শশীশেখর কি যে ভাবিতেছিল কে জানে। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা জীবনে বোধকরি তাহার এই প্রথম। মাকে তাহার তালপাতার চাটাই বিছানা ও মাদুর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছল-ছল চোখে নিতান্ত অসহায়ের মত সেই দিক্‌ পানেই সে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। পুরোহিত আর দেরি করিতে পারিল না। চাটাই ছিঁড়িয়া মৃতদেহের মুখখানা বাহির করিয়া দিয়া মন্ত্র যাহা বলিবার সে নিজেই বলিল। তাহার পর শশীশেখরের হাতে জ্বলন্ত একটি পলিতা ধরাইয়া দিয়া পিছন ফিরাইয়া বলিল, 'এম্‌নি করে' দাও ত বাবা ওই পল্‌তেটা তোমার মা'র মুখের উপর ফেলে'।'

কিন্তু জ্বলন্ত পলিতা সে তাহার মা'র মুখের উপর ফেলিবে কেমন করিয়া! শশীশেখর ইতস্ততঃ করিতেছিল। পুরোহিত এক রকম জোর করিয়াই সেটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিল। মৃতদেহের উপর পড়িয়া সেটা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ছেলেটা আবার তাহা হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, সুরেন তাহাকে তাহার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিল।

পুরোহিতের ইঙ্গিতে শ্মশান-বন্ধুরা আর মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ খাটখানা কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

অত বড় ছেলেকে বারে-বারে কোলে নেওয়া বড় সহজ কথা নয়; সুরেন্দ্রনাথও শশীশেখরের মাথায় হাত দিয়া বলিল, 'চল্‌।'

কিন্তু শশীশেখর কিছুতেই যাইবে না।

তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুরেন গ্রামের দিকে ফিরিল।

শশীশেখর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—চারিদিক্ অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারের মাঝখানে সামান্ত একটুখানি লণ্ঠনের আলোক,—অস্পষ্ট কতকগুলি লোকের স্কন্ধে তাহার মাতার মৃতদেহ এবং মাঝে মাঝে তাহাদের সমস্বরে চীৎকার—"হরি-বোল!"

সুরেন কি ভাবিল কে জানে। ডাকিল—'শশী!'

'উঁ।'

'মাকে ওরা নিয়ে গেল, অসুখ করেছে কি না, গঙ্গায় স্নান করিয়ে আবার ফিরে' নিয়ে আস্‌বে।'

শশীশেখর একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

সুরেন আবার তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'তুমি কেঁদো না শশি! বুঝ্‌লে? কাঁদ্‌তে নেই। কাঁদ্‌লে মা রাগ কর্‌বে।'

কোনও জবাব না দিয়া শশীশেখর আবার পশ্চাতের অন্ধকারের দিকে সজলচক্ষে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

(ক্রমশ)

উদ্বোধন

[শ্রীফণিভূষণ মৈত্র]

হয় তো তুমি ভাব্‌ছো—"কিছু নয়!"
এক-নিমেষের চোখের চাওয়া
ঘনায় বুকে অখণ্ড-প্রলয়—
এ'তে তোমার এতো কী বিস্ময়?
তবুও কি বুঝ্‌বে নাকো কিসে এমন হয়!

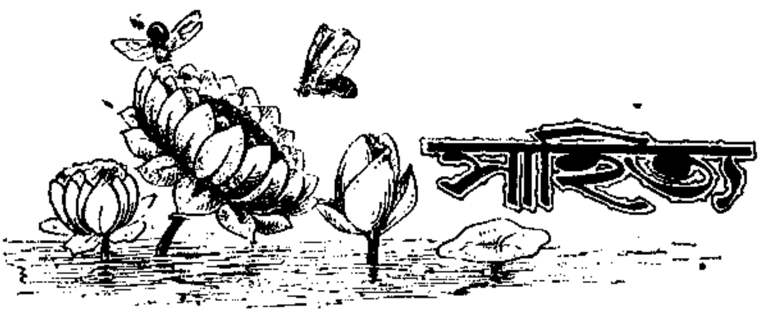
বিজলী ওই মেঘের কোল থে'কে—
আচম্‌কা তা'র চুম্‌কি দোলায়
পথের রেখা নেয় মেঘে ঢে'কে,
পথিক-চোখে কাজলতা এঁ'কে
আঁধা-বুকে আঁধার ঢালে ঝুল্‌-কালি মেখে!

এক-নিমেষের একটুখানি ভুল—
তাপস-বীরের যাগ ভাঙালো
জন্মালো তায় শকুন্তলা-ফুল,
একটুখানি পাখী সে বুল্‌বুল্
পিউ-পিয়া-পিউ ডেকে' বুকে লাগায় বিষের হুল!

একটুখানি নয়তো এতোটুক্—
ছায়ায় কায়ায় জড়িয়ে আছে
এইটুকুনে এম্নোটা ভুলচুক্,
চাকার মতো ঘুর্‌ছে সুখ-দুঃখ
এইটুকুনের আড়াল দিয়ে হয় সে সর্ব্বভুক্!

ছোট্ট যে চোখ ছোট্ট কভু নয়—
ছোট্ট-চোখের কটাক্ষে তা'র
ঘটতে পারে 'ক্ষিতি-খিতি-লয়',
ছোট্ট হাতের স্পর্শ পে'লে হয়
বুকে বুকে ব্যাকুলতার মর্ম্ম-বিনিময়!

* * *



দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

[পূর্ব্ব দুই সংখ্যাতেই লিখিয়াছি, যে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে এ সময়ে বিশেষ জোরের সহিত ভারতবর্ষে এবং বিলাতে আলোচনা ও আন্দোলন নিতান্ত প্রয়োজন। বড় বড় আতসবাজী বিদ্যুৎপাত সদৃশ নয়ন-মন-ধাঁধা আলোকচ্ছটায় এ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, অথচ জাতীয়-জীবনের নিতান্ত গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কথা চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়িতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-নির্য্যাতনের নব ব্যবস্থা পুনরায় কেপ্ পার্লামেণ্টে ঘনাইয়া উঠিতেছে। একদিকে ভারতবাসীর প্রতি ন্যায় বিচারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, অপর দিকে প্রবাসী ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি ঘোরতর অবিচারের সূচনা—ইহা অসহনীয় এবং ইহার বিশেষ প্রতিকার প্রয়োজন। অতএব এ আলোচনা ও আন্দোলন এখন হীনবল হইলে চলিবে না। রেভারেণ্ড এণ্ড্রুস প্রভৃতির চেষ্টায় এ কথা দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং আপাততঃ নির্য্যাতন ব্যবস্থা স্থগিত রাখিবার উপক্রম হইয়াছে। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই :—

"It is stated in the official organ *Die Burger* that the Government of South Africa has decided to postpone the Transvaal Asiatic Land Tenure Bill until next year.

The newspaper declares that this decision has been taken in view of the fact that preliminary arrangements have been made between the Governments of India and South Africa for holding a conference in September in order to revise the present Indian agreement, which will shortly terminate.

The Transvaal Asiatic Land Tenure Bill, which is being sponsored by Dr. T. Malan has been bitterly opposed by Indians in South Africa, who alleged that it seeks to deprive them of all the rights of possession gained after many years' struggle."

ইহা মন্দের ভাল। যে আন্দোলনের ফলে এই "ভাল" সূচনা হইয়াছে, তাহা কোন মতেই কমিতে দেওয়া হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশের উপযোগিতা আছে। Ceylon'এর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার হারবার্ট ষ্টেন্‌লী দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। Ceylon'এ স্থানীয় অধিবাসিগণের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ কল্পে যে তুমুল চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছে, স্যার হারবার্ট ষ্টেন্‌লী তাহার বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁহাকে এই কর্ম্মত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার পদে অভিষিক্ত হইয়া যাইতে হইতেছে, এইজন্ত তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। বিলাতের

"এম্পায়ার লীগ্ সঙ্ঘ" (Empire league) তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকা গমনের পূর্ব্বে এক ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারত-প্রেমিক লর্ড বাক্সটন্ সেই ভোজ মসলিসে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই কথার সমালোচনা সেই ভোজেই হয়। লর্ড বাক্সটনের ভ্রাতা পার্লামেণ্টের মেম্বার মিঃ বাক্সটনের সহিত আমার গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভা 'লীগ অফ নেসন্স' সভায় দেখা হয়। সেই সময়ে মিঃ বাক্সটনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের কথা অনেক হইয়াছে। এখনও তাঁহার সহিত আমার পত্র-ব্যবহার চলে। তিনি তাঁহার লর্ড ভ্রাতাকে এ বিষয়ে সবিস্তার জানাইয়াছিলেন। লর্ড বাক্সটনের সভাপতিত্বে ভোজ-সভায় স্যার হারবার্ট ষ্ট্যান্লী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়-গণের কোন কথা সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এসিয়া-বাসিগণের অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আশাপ্রদ অনেক কথা কহিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার হাই কমিশনাররূপে অবস্থিতির সময়ে ভারতীয় প্রবাসীদিগের কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে।

পুরাতন সন্ধির সর্ত্ত-সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নূতন সন্ধি স্থাপিত হইবে—এ কথায় আশাও আছে, ভয়ও আছে। আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্য প্রেরণ করিবার সময়ে লর্ড রেডিং ভূয়ো ভূয়ো বলিয়া দিয়াছিলেন—দেখিবেন, যেন জোর করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া ভারতবাসী ঔপনিবেশিকদিগের দক্ষিণ-আফ্রিকাচ্যুত না করা হয়।" আমি লর্ড রেডিং'এর আফিস ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, সেই সময়েও দরজা পর্য্যন্ত তিনি উচ্চৈঃস্বরে আমায় এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া-ছিলেন। আমিও সকল সময়ে সে কথা সকলকে স্মরণ করাইয়াছি; কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। জোর না হউক, প্রলোভনের দ্বারা এক লক্ষ ষাট হাজার ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকাচ্যুত করিয়া এ সমস্যার সমাধান-চেষ্টা বিলক্ষণ চলিতেছে। নূতন সন্ধির সর্ত্তে বিচার ও বিবেচনার সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় জনসাধারণ, ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট, দক্ষিণ-আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট, হাই কমিশনার ও প্রবাসী ভারতীয়-ঔপনিবেশিকদিগকে সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া সমীচিন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনী সেই কথাই বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিবে।—লেখক]

জাঞ্জীবার এবং ডার্বনের মধ্যে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে আর দুইটী প্রধান বন্দর আমাদের পথে পড়িল—বায়রা (Beira) এবং ডেলাগোয়া বে (Delagoa Bay)। ডেলাগোয়াবে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থান, তাহার অপর নাম লরেঞ্জোমার্ক (Lourenco Marques)। বায়রা পৌছিলাম ২৫শে ডিসেম্বর। ঐ দিন বায়রা বন্দরে সকল জাহাজে উৎসব পড়িয়া গেল। নানারূপ পতাকা-শোভিত, আনন্দে উন্মত্ত যাত্রীদের নৃত্য-পানভোজনে মুখরিত জাহাজগুলি একটা নূতন দৃশ্য ধারণ করিল। আমাদের মন কিন্তু একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিশেষ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। বন্দরের অতিকায় পেট্রল ট্যাঙ্ক ও তৈলের ট্যাঙ্কে আগুন লাগিয়া যেন লঙ্কাকাণ্ডের মত হইয়া উঠিল। আমাদের ঠিক সম্মুখে একখানি জার্ম্মান জাহাজে আনন্দের উত্তাল-তরঙ্গ যেন কিছু অধিক—নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভোজন ও নিমন্ত্রণের ছড়াছড়ি। আমাদের জাহাজেও, কে কি গান গাহিবে, কে কি বাজাইবে, নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

কিন্তু সম্মুখে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমাদের জাহাজের কতিপয় বিশিষ্ট যাত্রী এই আমোদ-প্রমোদ হইতে আপাততঃ বিরত হইবার জন্য ইচ্ছা জানাইলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাত্রীগণ আমাদের জাহাজে বাহ্যতঃ নৃত্য-গীত ইত্যাদি বন্ধ রাখিলেও, এই দুঃসময়ে অন্য জাহাজে যাইয়া যথারীতি আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিলেন। শ্রীভগবানের কঠিন অঙ্গুলী হেলনে এইভাবে গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করা সত্ত্বেও মানুষের চৈতন্য হয় না। তাই কি বলে—"ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে!"

নিখিলচন্দ্রের অশীতিবৎসরবয়স্ক সহযাত্রী বন্ধুগণ মিঃ মিলার, মিঃ পোর্ট প্রভৃতি এই স্থানে নামিয়া গেলেন। প্রথমে এই সকল ভদ্রলোকগণ ভারতবাসীকে বিশেষ বিষ-নজরে দেখিতেন, আমাদের কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, জাহাজের ডাক্তার নিখিলকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহারা ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠেন। এই সূত্রে তাঁহাদের সহিত ভারতীয় নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হওয়ার ফলে ভারত-বিদ্বেষ তাঁহাদের মন হইতে দূরীভূত হয়। তাঁহারাও তখন স্বীকার করিলেন যে, ভারতবাসীর উপর তাঁহাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা ছিল, এখন হইতে তাঁহারা সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন। খোলাখুলি কথায় কাজ বেশী পাওয়া যায়, এই আমার ধারণা।

অনেক যাত্রী এইখানে শীকার করিবার উপলক্ষে নামিলেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা আছে। সিংহ বধ করিলে ৫,০০০ রিয়েস্ (Reis), চিতা-বাঘ বধে ১৫০০ রিয়েস্, কুমীর বধে ১০০০ রিয়েস্, সর্প ইত্যাদি বধে ৫০ রিয়েস্ পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু হস্তিনী বা পাঁচ কিলো কম ওজনের গজদন্তওয়ালা হস্তী-বধ নিষেধ।

বন্দরে অবস্থিতি-স্থান উভয়ক্ষেত্রেই অল্প, বন্দরে দেখিবার জিনিষও অল্প। এই উপকূলের সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণে যাইতে যাইতে বামে বহুদূরে ম্যাডাগাস্কার (Madagascar) দ্বীপ, বহুদূরে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া যাইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাস পল ও ভার্জ্জিনিয়া (Paul and Virginia) এই দ্বীপের অংশ বিশেষের দৃশ্য অবলম্বনে লিখিত। পূর্ব্বে আখ, গুড় ও চিনির ব্যবসা সম্পর্কে ভারতীয় কুলীর কল্যাণে এই দ্বীপের সহিত উপনিবেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এখন সে কুলী যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ হইয়াছে, অতএব সে সম্বন্ধ লুপ্ত। বায়রা এবং ডেলাগোয়াবেতে ভারতীয় বণিক্ অনেক আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আছে তাহাদের অভাব এবং করুণ ক্রন্দন; সর্ব্বত্র সেই ক্রন্দন শুনিলাম। সে ক্রন্দন পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ডেলাগোয়াবেতে অপেক্ষাকৃত অল্প; তাহার কারণ সেখানে "কালা-ধলা" পার্থক্য অল্প। বায়রা ছিল পূর্ব্বে জার্ম্মাণ অধিকারে, এখন ভার্সেলি সন্ধি (Verseille treaty) অনুসারে তাহা ব্রিটিশ মেণ্ডেটের (Mandate) অধীন। জার্ম্মানী তাহার পূর্ব্ব অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মহাযুদ্ধের স্মৃতি-সূচক জার্ম্মাণ ডুব-জাহাজের অনেক গূঢ়-কাহিনী গল্পচ্ছলে অধিবাসিগণের নিকট হইতে শুনিলাম। বন্দরে ঢুকিবার পথে এখনও জলমগ্ন জাহাজের ভগ্নাংশ দেখা যায়। জুডারজি (Zuderzee) নৌ-বিদ্যা প্রণালী অনুসারে বন্দরে আর কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে জার্ম্মাণ নৌ-বিদ্যাবিশারদগণ এড়োএড়ি ভাবে বন্দরের মুখে জাহাজ ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন;

কিন্তু ইংরাজ নৌ-বিদ্যাবিশারদগণের কৌশলে তাহাতে ফললাভ হয় নাই। যে জার্ম্মাণ জাহাজ এম্‌ডেন্ (Emden) একাকী মান্দ্রাজ ও কলিকাতা ভীতি ও ত্রাস সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রধান আশ্রয় স্থান ছিল—এই সুরক্ষিত বায়রা বন্দর।

এই বায়রা সহরের রাস্তাঘাট বালুকাময়। সহরের পথে সাধারণ যান-বাহন ব্যাপারে নিতান্ত অসুবিধা; তাই সেই বালুকাময় পথে পাতা লোহার ট্রাম লাইন, আর ছোট ছোট ট্রলি গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া বেড়ায় কুলী মজুরে। মাঝে মাঝে আছে টার্ণ-টেবিল; বিপরীত দিকের গাড়ী আসিয়া পড়িলে, সেই টার্ণ-টেবিলের সাহায্যে উভয় দিকের গাড়ীর যাতায়াত সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। সহরের বাহিরে রাস্তায় বালির উপদ্রব নাই, সুন্দর উদ্যান ও আবাসস্থান আছে। সেই সকল পথে মোটর গাড়ীতে গতিবিধি হয়।

বায়রা সহরে ভীষণ মশকের ভীষণতর উৎপাত, সেইজন্য আবাসগৃহের দ্বারে নেটের ডবল দরজা ব্যবহারের নিয়ম আছে। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া তবে ভিতরের দরজা না খুলিলে, মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সিন্ধুদেশীয় বিখ্যাত বণিক্ পুরুষলের সমুদ্রতীরে সুরম্য আবাস-বাটী আছে। আমরা সেখানে আতিথ্য-লাভ করিয়াছিলাম। আফ্রিকার সকল বন্দরেই এবং বোম্বাই প্রভৃতি নগরে উহাদের বিস্তৃত কারবার আছে। ভারতবাসী যে কেহ এই সকল বন্দরে যায়, তাঁহারা এই বণিক্-প্রধানের প্রভূত আতিথ্য লাভ করে। শুধু পুরুষলী কেন, ভারতপ্রবাসী সকল বণিক্ ও সাধারণ লোক, ভারতবর্ষ হইতে সমাগত সকল লোকেরই যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন।

বায়রা হইতে দক্ষিণে ডেলাগোয়াবে। জাহাজ বায়রা ছাড়িবার পর এক আশ্চর্য্য রহস্যজনক ঘটনা ঘটিল। নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে, সেই ব্যাপার বিশ্বাস করা অসম্ভব। আমাদের কমিশনের অন্যান্য মেম্বার ও সেক্রেটারী পনর দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের ডার্ব্বান সহরের কার্য্য শেষ হইয়াছে; পিটারমারিট্‌সবার্গ (Pietermirtizburg) প্রভৃতি ছোট ছোট



মশক নিবারণের জন্য জাল দেওয়া বাটী

সহরের কাজও শেষ হইয়াছে, তাঁহারা এখন স্বর্ণ-খনির কেন্দ্রভূমি জোহেনেস্‌বার্গে (Johenasburg) অবস্থিতি করিতেছেন—সমুদ্র-মধ্যে বিনাতারে এই সংবাদ পাইলাম। সভাপতি প্যাডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতটা পথ ভাটিয়া ডার্ব্বান গিয়া সেখান হইতে পুনরায় দুইদিন রেলওয়ে যাত্রার কষ্ট না করিয়া ডেলাগোয়াবে হইতে বরাবর জোহেনেস্‌বার্গ যাইলেই ভাল হয়; তাহাতে সময়-সংক্ষেপও হইবে এবং কমিশনের কার্য্যেরও সুবিধা হইবে, এই কথা লিখিয়াছেন। কথাটা আমার বড় মনঃপূত বোধ হইল না, কারণ এইরূপ ব্যবস্থায়

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্বার্দ্ধ দেখা আমার ঘটে না; ডার্ব্বান অধিবাসিদিগের সহিত পরিচয় হয় না এবং নেটাল প্রদেশের ভারতবাসী সংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্য ও বিশেষ তথ্যের পর্য্যালোচনার সুবিধা ও অবকাশ ঘটে না। তাহার উপর নিখিলের অসুস্থতার জন্য ডেলাগোয়াবে বন্দরে নির্দ্ধারিত দিবসে নামা ও বরাবর জোহেনেস্‌বার্গ যাওয়া নিতান্ত অসুবিধা-জনক বলিয়া বোধ হইল। এই সকল কথা ডেলাগোয়াবে বন্দর পৌঁছিবার পূর্ব্ব রজনী ভাবিতে ভাবিতে, রজনীপ্রভাতের উপক্রম সময়ে আধ-জাগা, আধ-ঘুম, আধ-তন্দ্রার সময়ে কেবিনের বাহিরে চলাচল-পথে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম। সুর করিয়া জাহাজের ছোক্‌রা খান্‌সামা কি একটা নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছে, নামটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এই লোকটা ডাকিয়া ডাকিয়া হায়রান হইতেছে, কেহই সাড়া দেয় না। তখনও আধতন্দ্রা ঘুচে নাই, চোখের উপর ভাসিতে লাগিল একখানা বিনাতারের সংবাদ। প্রথম দুই ছত্র স্পষ্টরূপে চোখের উপর ভাসিতে লাগিল, স্পষ্ট পড়িতে পারিলাম—আমাদের জোহানেস্‌বার্গের পথে যাওয়া বন্ধ। নিখিলকে জাগাইয়া এই আশ্চর্য্য সংবাদ বলিলাম; তাহার বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে সেই বিকট শব্দ আমাদের কেবিনের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। দ্বারে করাঘাত করিয়া ভৃত্য ডাকিল এবং বিনাতারের লেফাপা হাতে দিল।

সেই শিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত ইংরাজের মুখে আমার নামটা সহজে উচ্চারণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রহস্যপ্রিয় আমার এক প্রবীণ ফিরিঙ্গী মক্কেল পুরাকালে নামটা "সব্‌জীকারী" এই আকারে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন। বোধহয় সব্‌জীকারী তাঁহার অতি উপাদেয় বস্তু ছিল। আর সহজে যাহাকে ঠকাইতে পারা যায়, ফিরিঙ্গী মহাপ্রভুরা তাহাকে সবুজ বা 'গ্রীন' বলে। এই মক্কেল-পুঙ্গব আমাকে ঠকাইবার বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তিনি পিতৃদেবের পুরাতন "রোগী" (Patient), অতএব নিতান্ত ঠকিলেও তাঁহাকে কিছু বলিতাম না। এই অধিকারেই বোধহয় তিনি নামটা "সব্‌জীকারী" আকারে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। জাহাজের ভৃত্য এইরূপ নামের একটা 'জগাখিচুড়ী' বানাইয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যূষ-নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল বলিয়া, বিনাতার (Wireless) পাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

প্যাডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, যে ডেলাগোয়াবে পর্ত্তুগীজ রাজ্যে সাময়িক বিদ্রোহ হেতু, তথা হইতে জোহেনেস্‌বার্গের রেলপথ আপাততঃ নিরাপদ্ নহে; অতএব পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে জাহাজে ডার্ব্বানে গিয়া, সেখান হইতে রেলপথে জোহানেস্‌-বার্গ আসাই শ্রেয়ঃ। সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এবং সংবাদের পূর্ব্বাভাস অদ্ভুত উপায়ে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আশ্চর্য্য হইলাম। এইরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার আমার জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে। একবার মধ্যাহ্নের ট্রেনে মধুপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেছি। আন্দাজ বেলা চারিটার সময়ে বিলক্ষণ তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পাইলাম—প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, অথচ কোন্ বাড়ী, কোথায় বাড়ী, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বারান্দায় বিস্তর লোক চেঁচামেচি ও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একটা বিপুল হুলুস্থুল ও গোলযোগ চলিয়াছে, বারান্দায় ও সিঁড়িতে রক্তারক্তি। তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ী পৌঁছিয়াও কোন

সংবাদ পাই নাই, মন বড় উদ্বিগ্ন রহিল। সকালে খবরের কাগজে পড়িলাম, পূর্ব্বদিন বেলা ৪।৪।০টার সময়ে—আমারই সেই উত্তরাকর্ষণের সময়ে হাইকোর্টের বারান্দায় একজন বিশিষ্ট মুসলমান পুলিশ কর্ম্মচারী আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।



৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (চাটুয্যে মহাশয়)

আর একবার, পিতৃদেবের দারুণ পীড়ার সংবাদ পাইয়া সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে লইয়া মধুপুরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যাহাকে যাহাকে দেখিতে চান, বোধ হইল তাহারা হয় সব সঙ্গে যাইতেছে, না হয় পূর্ব্ব হইতে মধুপুরে রহিয়াছে। কেবল নাই, তাঁহার আবাল্যসুহৃদ্ ও আমাদের চির প্রিয়কামী কাশীবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—সর্ব্বাধিকারী বংশের আদরের ও শ্রদ্ধার "চাটুয্যে মহাশয়"। "ইউরোপে তিন মাস" ও "প্রবাসপত্রে" তাঁহার কথা অনেক বলিয়াছি, অতএব তাঁহার কথা এখানে পুনরুক্তি করিব না। গত বৎসর আমার জেনেভা যাইবার সময়ে সেই অশীতিপর, স্থবির, চির-শুভেচ্ছু ব্রাহ্মণ নিতান্ত রুগ্নদেহেও এবং নিষেধ সত্ত্বেও হাওড়ার ট্রেনে আমায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইলাম না, তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। এ হেন চাটুয্যে মহাশয়কে পিতৃদেবের শেষ শয্যার পার্শ্বে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে মধুপুরে আসিবার জন্য তার 'দিই দিই' করিয়া কলিকাতায় দেওয়া হইল না, হাওড়া ষ্টেশনে দেওয়া হইল না, বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দেওয়া হইল না, এমন কি মধুপুর ষ্টেশনেও দেওয়া হইল না। মধুপুর বাটীতে মধ্যরাত্রে পৌঁছিয়া প্রথমেই দেখিলাম—সেই চাটুয্যে মহাশয় ম্লানবদনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম—তিনি পিতৃদেবের রোগবৃদ্ধির কোন তার পান নাই, কেবল হৃদয়ের আবেগে তিনি কাশীধাম হইতে মধুপুরে চলিয়া আসিয়াছেন। এই অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর ব্যাপারের তথ্য নির্ণয় করিতে কে সমর্থ? সেই চাটুয্যে মহাশয়ের সহায়তায় পিতৃকৃত্য সম্পন্ন হইল। তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে শীতাতপ-ক্লিষ্ট শ্মশান-যাত্রীর সাহায্যকল্পে মধুপুর শ্মশানে পিতৃ-স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ "সূর্য্যঘাট" নির্ম্মিত হইয়াছে। মধুপুরের এই মহাশ্মশান আমাদের মহাতীর্থ।

ডেলাগোয়াবে বন্দরে নামিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পর্ত্তুগীজ গভর্ণরের প্রতিনিধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জাহাজে আসিয়া বিস্তর আদর আপ্যায়ন করিলেন,

এবং আমরা সেই পথে যাইব না শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি অভয় দিয়া বলিলেন, যে আমাদের জন্ম স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত আছে এবং আমাদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা বিশেষ কৌতুকজনক। স্থানীয় বিদ্রোহে রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিনায়করূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের ছয় জনকে আমাদের স্পেশাল ট্রেণের ইঞ্জিনের পিছনের গাড়ীতে বাঁধিয়া রাখা হইল। পথে যদি স্পেশাল ট্রেণের উপর গুলিগোলা চলে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিপদ্‌পাত হয়, তাহা হইলে এই বিদ্রোহী অধিনায়কেরা আগে মারা পড়িবে, তারপর আমাদের যা হয় হইবে। এই প্রণালীতে আমাদের রক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হইল না এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্‌ ডার্ব্বানের পথে জাহাজে যাওয়াই স্থির করিলাম।

উভয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সাগ্রহ আমন্ত্রণে সহর ও বন্দর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিলাম। স্থানীয় টাউনহলে আদর আপ্যায়ন এবং অভিনন্দনের ব্যবস্থা ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে যথারীতি হইয়াছিল। সহর নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত, বন্দর হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের উপরে প্রকাণ্ড হোটেল, স্নানাগার, সভ্যতাপ্রণালী প্রণোদিত নানারূপ আমোদ আহ্লাদের উপযোগী বিচিত্র ভবন, ক্লাব ও উদ্যান প্রভৃতির সমাবেশ সমুদ্রতীরে যথেষ্ট আছে। ভারত মহাসাগরের উত্তুঙ্গ সময়ে সময়ে পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গ আসিয়া কূলে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য কমনীয়-ভীষণ! বায়রা, মোজাম্বিক কিম্বা জাঞ্জীবার বন্দরের নিকট খোলা সমুদ্রের পরিসর অল্প; অতএব এ বিরাট্‌ দৃশ্য-সম্ভার সেই সকল স্থানে উপভোগ্য নহে। সহরে স্থানীয় অধিবাসী, পর্ত্তুগীজ অধিবাসী এবং ভারতীয় অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই বাস করে। সাধারণ-তন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পর্ত্তুগীজ অধিকারের মধ্যে বর্ণভেদ-বাহুল্য বিশেষ নাই; বরং ধর্ম্মভেদ-বাহুল্য সময়ে সময়ে কষ্টের কারণ হয়। ভারতবাসিগণের আবাস, আহার ও সামাজিক ব্যবস্থা ইংরাজী ধরণে না হইয়া অনেকটা পর্ত্তুগীজ ধরণে অনুপ্রাণিত। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট আছে, অধিকাংশ বাণিজ্য ভারতবাসীরই হাতে। অধিকতর শ্রীবৃদ্ধির আশায় পর্ত্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বন্দর হইতে জাহাজে মাল তুলিবার এত বড় বড় ক্রেন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমি অন্য কোন বন্দরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কয়লা বোঝাই প্রমাণ আকারের রেলওয়ে ওয়াগন্‌ রেল হইতে ক্রেন সহযোগে উঠাইয়া, সেই গাড়ী সমেত উল্টাইয়া কয়লা জাহাজের গহ্বরে খালাস করার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে কুলীর প্রয়োজন নাই, ঝোড়াঝুড়ি, বস্তার প্রয়োজন নাই; নিমিষের মধ্যে কয়লা খালাস করিয়া গাড়ী রেলে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। ট্রেন্সভাল প্রদেশের সমস্ত কয়লা এই পথে রপ্তানী হইবে, এই প্রত্যাশায় এই বিরাট্‌ ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু সে সাধে বাদ পড়িয়াছে। আফ্রিকার কয়লা বোম্বে, করাচী প্রভৃতি প্রদেশে যথেষ্ট কাটতি হইতেছে। ভারতবর্ষে রেলওয়ের ভাড়ার "বাহুবলী"তে ভারতবর্ষের কয়লা করাচী, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশে যে দামে বিক্রয় হওয়া সম্ভব, বহুদূর হইতে আনীত আফ্রিকার কয়লা বোম্বে, করাচীতে তাহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। আফ্রিকার রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানী আফ্রিকার কয়লাব্যবসায়ীর প্রতি বিশেষ সদয়, তাহারা সস্তা দরে মাল পৌঁছাইতে পারে। ভারতীয়

রেলওয়ে বিভাগ ভারতীয় কয়লাব্যবসায়ীর প্রতি যেমন নির্দ্দয়, তেমনি অযথা বিচার করেন। ভাড়া চড়াইয়া রাখাতে ব্যবসায়ীরা অল্প মূল্যে মাল বোম্বে, করাচীতে বিক্রয় করিতে পারে না। মালের গুণাগুণের উনিশ বিশে এ ভীষণ সমস্যা উঠে নাই—ইহাকে যাদুকরী বলিব না ত কি বলিব! দক্ষিণ আফ্রিকান গভর্ণমেণ্ট যদি প্রবাসী ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার না করেন, তাহা হইলে কাউন্সিল-অফ-ষ্টেটে আমার প্রবর্ত্তিত আইন (Reciprocity Act) অনুসারে এই আফ্রিকার কয়লার উপর বিশেষ মাশুল চড়িবে। একথা আমাদের কমিশনের বিচার্য্য এবং বিবেচ্য। পরে পশ্চাতে যাহা হয় হইবে, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আফ্রিকার কয়লা পূর্ব্বকল্পিত প্রণালী অনুসারে ডেলাগোয়াবের পথে পর্ত্তুগীজ বন্দর হইতে রপ্তানী করিতে দিবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। যদিও ডার্ব্বান ও কেপ্ টাউনের পথে রেল ও জাহাজের মাশুল অনেক অধিক পড়িবে, তাহারা সেই পথেই আফ্রিকার কয়লা রপ্তানী করা স্থির করিয়াছেন। ফলে ডেলাগোয়াবে বন্দরে যে অতিকায় ক্রেন (Crane) ও অন্যান্য সময়োপযোগী বিশিষ্ট রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আর এ কাজে লাগিবে না। বন্দুক গোলাগুলির যুদ্ধের অপেক্ষা ব্যবসায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এই যে আন্তর্জাতিক গুরুতর সমর-নীতির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার ফল জাতি-বিশেষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে ও করিবে। ডেলাগোয়াবে বন্দরে এই কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোম্বাসা ছাড়িয়া জাঞ্জীবার পৌছিবার পূর্ব্বে আমরা ইকোয়েটার (Equator) পার হইয়াছি। এই কাল্পনিক রেখা ভূগোলজগতে উত্তর পৃথিবী হইতে দক্ষিণ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উত্তর পৃথিবীতে যখন শীত, দক্ষিণ পৃথিবীতে তখন গ্রীষ্ম। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ প্রণালী ভেদে শীতাতপের প্রভেদ। ডিসেম্বর মাস। উত্তর গোলকার্দ্ধে শীতকাল প্রবল, ইহা চিরদিনের জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা। ইকোয়েটার পার হইয়া দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে সেই ডিসেম্বর মাসেই গ্রীষ্মকাল, কোথাও দারুণ গ্রীষ্মকাল। যত দক্ষিণে যাইতেছি, তত গরম বাড়িতেছে। ডিসেম্বর মাসে বড় গরম। হা-হুতাশে উত্তর গোলকের অধিবাসিগণ বাতুল মনে করিবে; কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মই এইরূপ। একই পৃথিবীতে, একই সময়ে কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও শীত, কোথাও অন্ধকার, কোথাও আলো, কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখ, কোথাও আশা কোথাও নিরাশা।

এই ইকোয়েটার পার হইবার সময়ে পূর্ব্বে জাহাজে এক রহস্যজনক অভিনয় হইত, বড় বড় জাহাজে এখনও হয়। ডেকের উপর এক প্রকাণ্ড কেম্বিসের স্নানাগার স্থাপিত হয়; সমুদ্র-জলে তাহার চৌবাচ্চা পরিপূর্ণ হইলে, সমুদ্রাধিপতি নেপচ্যুনের (Neptune) সিংহাসন স্থাপিত হয়। দীর্ঘ শ্মশ্রু, সমুদ্রজ উদ্ভিদের প্রস্তুত জটাজূটশোভিত ভীম-কমনীয়কান্তি নেপচ্যুন্ (বরুণ আকারের ধারণা আমাদের এমন নয়) ত্রিশূল হস্তে সেই সিংহাসনে উপবেশন করেন, আর যাত্রীদিগকে সমুদ্রের জলে পরিপূর্ণ সেই চৌবাচ্চায় বারম্বার ডুবাইয়া চুবাইয়া তাহাদের উপর নেপচ্যুনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। কর, মাশুল, মাথট আদায় হইলেই যাত্রী অব্যাহতি পায়।

কিছু পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন সম্বন্ধে গমনকালে লোকপ্রিয় প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মুক্তপ্রাণে এই উৎসবে যোগদান দিয়াছিলেন।

ইকোয়েটার পার হইবার পর হইতেই রজনীতে দক্ষিণ আকাশে সাউদার্ণ ক্রশ (Southern Cross) বা সপ্তর্ষিমণ্ডল নয়নগোচর হইতে লাগিল। অনুকূল বায়ু ক্রমশঃ আমাদিগকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)



তন্ত্রশাস্ত্রে ভাব-ভেদ

[শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্-এ বি-এল্]

তন্ত্রশাস্ত্রে মানুষের ভাব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। কোন কোনও তন্ত্রে ইহার প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা আছে এবং কোথাও এ সম্বন্ধে যদিও প্রকাশ্য বিচার নাই, তথাপি ভাব-ভেদ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। "ভাব চূড়ামণি" নামে একখানি তন্ত্র আছে। উহাতে এ বিষয়ে বিশেষ বিচার আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমগ্র পুস্তকখানি পাওয়া যায় নাই। "রুদ্রযামল" "মায়াতন্ত্র", "বিশ্বসার" "নিরুত্তর" প্রভৃতি অনেক অনেক তন্ত্রে এই ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। "বিশ্বসার" তন্ত্রে শিব বলিতেছেন :—

"ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ।
স জনঃ সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তঃ স এব হি॥"

অর্থাৎ হে দেবি, যে জন ভাবত্রয়ের অন্তর্গত সপ্ত আচার জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত।

যদি এ কথা সত্য হয়—আর একথা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে "ভাব" শব্দের অর্থ এবং ত্রিবিধ যে ভাবের কথা তন্ত্র বলিয়াছেন, উহা জানা যে আবশ্যক, ইহা অত্যুক্তি মাত্র। তন্ত্র সপ্ত আচারের কথা যে বলিয়াছেন উহাও জানা নিতান্ত আবশ্যক, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু "ভাব" শব্দের অর্থ কি? তন্ত্র বলিতেছেন—"ভাবস্তু মনসো ধর্ম্মঃ।" ভাব মনেই উৎপন্ন হয় এবং মনেই লীন হয়। 'মনস্যুৎপদ্যতে ভাবো মনসি হি প্রলীয়তে।' যেরূপ গুড়ের মাধুর্য্য রসনা জানিতে পারে, সেইরূপ ভাব মনই জানিতে পারে।

"যথেক্ষু গুড়ো মাধুর্য্যং রসনা জায়তে প্রভো,
তথা ভাবো মহাদেব মনসা পরিভাব্যতে॥"

একথা তো বলা হইল; কিন্তু ভাব যে কি বস্তু, তাহা তো ব্যক্ত হইল না। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। একটী শাস্ত্রোক্ত বচন আছে, উহা এইরূপ—"ভাবেন চুম্বিতা কান্তা ভাবেন দুহিতাননম্"। যে ভাবে মানুষ কান্তার মুখ চুম্বন করে ও যে ভাবে দুহিতার মুখ চুম্বন করে, উহা এক প্রকার নহে। সুতরাং এখানে ভাব-ভেদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজকালকার দিনে অনেকে আমাদের ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে পান যে, ঐ শাস্ত্রে সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে। উহা অবলম্বন করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সমাধান হইতে পারে। আবার এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিসতাস্থ। উহার ইতিহাস মাত্র জানিতে পারিলেই সব জানা হইল; সুতরাং তাঁহারা কোনও পুঁথির প্রথম ও শেষ পাতাটী দেখিয়া উহার সময় নিরূপণ করিতে ব্যগ্র—উহাতে কি যে আছে তাহা জানিবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত নহেন।

এই দুই শ্রেণীর লোক একই ভাবে যে শাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাহা কি বলা যাইতে পারে? এই প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিব। আমরা কয়েকজন একবার এক তীর্থস্থানে গিয়াছিলাম। মন্দিরটী একটী পাহাড়ের উপরে। আমি যাঁহাদের সহিত গিয়াছিলাম

তাঁহাদের মধ্যে একজন বৈজ্ঞানিক—তিনি পাহাড়ের কতক দূর উঠিয়াই দেখিলেন, যে পাথরগুলি ঈষৎ লাল রঙের ; সুতরাং উহাতে লৌহ আছে। তিনি সমস্ত সময় হিসাব করিতে লাগিলেন, যে ঐ পাহাড় যদি কোন ব্যবসায়ীর হাতে পড়িত, তাহা হইলে কত লাভ করিতে পারিত। আর একজন স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ঐ পাহাড়ের এক অংশে যে অতি প্রাচীন গুহা আছে, সেই বিষয়েই নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আর দু' একটি লোক মন্দিরের দেবতার ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। উহার মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরের ভিতরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন না। এখানে দেখা যাইতেছে, যে একই যাত্রায় পৃথক্ পৃথক্ ফল হইল। উহা ভাব-ভেদে। আবার অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঘটনাটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের মনে আঘাত করে। উহার কারণ, আমাদের সকল সময়ে একই ভাব থাকে না। যাঁহারা সাধনার বলে নিজ ভাব বদ্ধমূল করিয়াছেন, যাঁহাদের মন বিক্ষিপ্ত হয় না, তাঁহারাই এক জিনিষকে সব সময়ে এক ভাবে দেখিতে পারেন।

"সর্ব্বোল্লাস" তন্ত্রে প্রথমে চতুর্ব্বিধ ভাব লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যাহারা অধম তাহারা দেহ-ভাবনাই করিয়া থাকে, যাহারা মধ্যম তাহারা জীবের ভাবনাতেই ব্যস্ত, যাহারা উত্তম তাহারা মোক্ষের ভাবনায় ব্যস্ত এবং যাহারা উত্তমোত্তম তাহারা ভাবাতীত। ঐখানে আবার উক্ত হইয়াছে, যে যাহারা অধম তাহারা স্ব-কুলাচারে লিপ্ত, যাহারা মধ্যম তাহারা শ্রুত্যাচারে লিপ্ত, যাহারা উত্তম তাহারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য লিপ্ত, যাহারা ভাবাতীত তাহারা স্বেচ্ছাচারী, অধম প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে, মধ্যম জপ ও স্তোত্রাদি পাঠ করে, উত্তম মানসী পূজা করে এবং যিনি উত্তমোত্তম তিনি 'সোহম্' ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। অধম ইহলোক দেখিয়া থাকেন, মধ্যম পরকালের কথা ভাবেন, উত্তম মোক্ষের ভাবনা ভাবেন, উত্তমোত্তম কোন ভাবনাই ভাবেন না। অধম কর্ম্মভীত, মধ্যম ভক্তিভীত, উত্তম মোক্ষভীত এবং উত্তমোত্তম নির্ভীক। এই বচন সর্ব্বানন্দ কোথা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই। "সর্ব্বোল্লাস" তন্ত্র-খানি মহাসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত সংগ্রহ-গ্রন্থ। তিনি সর্ব্বত্রই যে গ্রন্থ হইতে বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন ; কিন্তু এ বচনটী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ নাই। বোধহয় ইহা "ভাবচূড়ামণির" বচন ; কিন্তু যে অংশে এই বচন আছে সংগৃহীত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি "ভাবচূড়ামণি"র যাহা আমরা পাইয়াছি—উহা অসম্পূর্ণ। "কুলার্ণব" তন্ত্রে এইরূপ চতুর্ব্বিধ ভাব-ভেদের কথা অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে। সেখানে শিব বলিতেছেন :—

"অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং ;
প্রতিমাস্বপ্রবুদ্ধানাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাং॥"

"ভাবচূড়ামণি"তে দেবী বলিতেছেন—

"ভাবস্তু ত্রিবিধো দেবো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
গুরবস্ত্রিবিধাঃ স্যুশ্চ তথৈব মন্ত্রদেবতাঃ।
আদ্যভাবো মহান্ শ্রেয়ান্ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
দ্বিতয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয় সর্ব্বনিন্দিতঃ॥"

এই কথা বলিয়া দেবী পুনরায় উক্তি করিতেছেন—

"ন ভাবেন বিনা দেব তন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ।
কিং পীঠপূজনেনৈব কিং কন্যাভোজনাদিভিঃ॥
ন যোষিৎ প্রীতিদানেন কিং পরেষাং তথৈবচঃ।
কিং জিতেন্দ্রিয় ভাবেন কিং কুলাচারকর্ম্মণা।
যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা নস্যাৎ কুলপরায়ণঃ।
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলবর্দ্ধণ॥"

এইরূপ অনেক প্রকারে "ভাবচূড়ামণি" "সময়াচার" "কুমারীতন্ত্র" "জ্ঞানদীপ" প্রভৃতি তন্ত্রে ভাবের কথা আছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে, উহা আবার এইরূপ—এই মতে ভাবকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ তিন শ্রেণী—দিব্য, বীর ও পশু। অর্থাৎ মানুষ এই তিন ভাবের মধ্যে একের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

পশু-ভাব বলিতে কোনও প্রকার নিন্দাবাদের আভাস নাই। পশুভাবান্তবর্ত্তী লোক বলিতে যে সে ব্যক্তি অসৎ কিম্বা কোন প্রকারে দোষী, ইহা বুঝায় না। আর পশুভাবস্থিত ব্যক্তি যে চিরকালই পশুভাবে থাকিবে, তাহাও নহে। মানব মাত্রেই পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

"জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তঃ জ্ঞানহীনঃ পশু প্রিয়ে।
নিদ্রাদিমৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ ॥

সুতরাং প্রাণিমাত্রেই পশু। তবে এই পশু-জীবন হইতে উন্নত জীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকলেই "মানব" উপাধি পাইবার অবসর পান না। কেননা, জ্ঞানবান্ না হইলে "মানব" উপাধি লাভ করা যায় না। "জ্ঞান" শব্দের অর্থ মোক্ষমতি। "জ্ঞান" শব্দের অর্থে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন নহে। মোক্ষেধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ—এইরূপেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ভেদ দেবভাষায় করা হইয়াছে। শিল্পজ্ঞান কিম্বা মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না। আমাদের দেশে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন সময় আসিয়াছে, যে শিল্পজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, ক্রীড়া কৌতুকের বাহাদুরী দেখাইতে পারিলে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে যদি ক্রীড়া কৌতুকের কথা না লিখিতে পারেন, তাহা হইলে সংবাদপত্র অঙ্গহীন রহিল, যাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীতে থাকিতে পারেন তাহা তাঁহারাই জানেন। অনেকে হয়ত বলিবেন, যে ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে ঐরূপ সংবাদ থাকে; সুতরাং দেশী সংবাদপত্রেও না করিলে ভাল দেখায় না। ভারতবাসী এত নিজস্ব হারাইয়াছেন, যে পাশ্চাত্য জাতি যাহা করিবেন উহাই করিতে হইবে। আহার বিহার সব বিষয়েই ঐরূপ। ইহাই পশুভাবোচিত। পশুর দেবতাও এইরূপ এবং মহাপশু হইবার মন্ত্রও এই। যাঁহারা পশু ভাবাশ্রিত গুরু, তাঁহারা বলেন—আমি যাহা বিশ্বাস করি, উহাই একমাত্র উপায়। আমার যেরূপ আচার ব্যবহার, উহাই শিষ্ট আচার ও ব্যবহার। যাহারা মাত্র পশু, তাহাদের এইরূপ ধারণা। এদেশে অনেক ধর্ম্মযাজক আছেন, তাঁহারা এইরূপে সকল লোককে ভয় দেখান, যে আমার ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলে নরকে যাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটী ঘটনা আমার মনে হইতেছে। যখন এদেশে—এখন যাহাকে স্ত্রী-শিক্ষা বলে, তাহা প্রচলিত হয় নাই, যখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ স্বধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে এদেশে কতক-গুলি মিশনারী স্ত্রীলোক লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া বিদ্যা দান করিয়া আসিত। ঐরূপ একটী ইংরাজ যুবতী এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটি বালিকার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, আর সেই উপলক্ষে ঐ বালিকার পিতামহীকে নরক হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিতা হইয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধা মহিলা এখনকার হিসাবে অশিক্ষিতা; কিন্তু তাঁহার সহিত ঐ মিশনারী স্ত্রীলোকের একদিন যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। মিশনারী স্ত্রীলোকটী বোধহয় অনেকদিন হইতেই

নানা কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি কেবল পরকাল ও যীশুর কথা বলাতে বৃদ্ধা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি তো খৃষ্টান ছিলেন না, তাঁহাদের কি গতি হইয়াছে? মিশনারী স্ত্রীলোকটী উত্তর দিলেন—'নরক'। এইরূপে তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজন যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের সকলকেই ঐ এক জায়গায় পৌঁছিবার খবর দিলেন। বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "যদি বাছা তাহাই হয়, তবে আমার আপনার জন যেখানে আছে, আমি সেইখানেই যাইব। সেই আমার স্বর্গ। তোমাদের গোখাদক ও মদ্যপায়ীদের স্বর্গে যেতে আমার একটু ইচ্ছা নাই।" মিশনারী স্ত্রীলোকটী স্তম্ভিতা; কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা যে উত্তর দিলেন তাহাতে উষ্ণতা নাই, কোনরূপে তিনি বিচলিত হন নাই। এখন যে কারণে হউক, উঁহাদের আবির্ভাব তত বেশী হয় না; কিন্তু উঁহাদের আবির্ভাব না হইলেই বা কি? আমাদের ঘরের অনেক লক্ষ্মী কুমীর হইয়াছেন।

আমাদের দেশের কোন একজন নামডাকওয়ালা ভদ্রলোকের বিশ্বাস এই, যে আমাদের দেশের উন্নতির মূল কারণ খৃষ্টীয় মিশনারীরা। তাঁহার কোন আত্মীয় মিশনারীদের সহিত মেশামিশির কথা লইয়া প্রতিবাদ করায় তিনি বলেন, "ভায়া হে, তুমি যে এই প্রতিবাদ করতে পারছ, ইহাও এই মিশনারীদের প্রসাদে।" তাঁহার ধারণা এই, যে আমাদের বিচার করিবার শক্তি পাশ্চাত্য বিদ্যার ফল। তিনি জানেন না, যে Alexander the Great তাঁহার গুরু Aristotleকে ভারত হইতে ন্যায়দর্শন পড়াইয়া দিবার পর Aristotle তাঁহার logic রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য যে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তিনি বোধহয় বিদিত ছিলেন না। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে আমাদের দেশে পশু ভাবের প্রশ্রয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলা যে কিছুই হৌক, পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাতে আমাদের যেখানে পতন হইতেছে, আমরা সেখানে মনে করিতেছি—আমাদের উন্নতি হইতেছে। যদি কেহ আত্মোন্নতির পথে যান, তাঁহাকে আমরা বিদ্রূপ করি। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পশু পশুই থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই। মোটকথা, পশু স্থূলদর্শী। তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত কোন পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারেন না। তবে কালক্রমে এ শক্তি অর্জ্জন করা অসম্ভব নয়। সেইজন্যই বলা যাইতে পারে—পশু চিরকালই পশু থাকিবে না। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে, যে পশু ত্রিবিধ। যখন পশুর মনে উচ্চ ভাবের ছায়া পড়ে, তাহাকে স্বভাব-পশু বলে এবং ঐ ছায়া যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে, তখন যে অবস্থা তাহাকে বিভাব-পশু বলে। ইহার পর বীর-ভাব। বীর-ভাবও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রিবিধ। এইরূপে ষড়বিধ ভাব পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও তন্ত্রের মতে, পশু দ্বিবিধ ও বীরও দ্বিবিধ। এই ভাব-ভেদে সাধকের আচার-ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। এ স্থানে কেহ বলিতে পারেন, যে এই সব শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ দেখিয়াই তো শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না। এ আপত্তির উত্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নহে, স্থানান্তরে ইহা প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের উদ্দেশ্য এই, যে শাস্ত্রে যেরূপ বিভাগ করিয়াছেন উঁহারই বর্ণনা করা। "মহানির্ব্বাণতন্ত্রে" স্বভাব-পশুর যে বর্ণনা আছে, সে পশু এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে কথিত হইয়াছে, যে পশু-ভাবাপন্নদের কর্ত্তব্য, যে পত্র-পুষ্প-ফল-জল প্রভৃতি

স্বয়ং আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না এবং মনে রমণীচিন্তা স্থান দিবে না। যখন পশু-ভাবেরই অভাব, তখন দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি তো থাকিতেই পারে না। "কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ—একথা কিন্তু সকল তন্ত্রে মানেন না।" "কৌলাবলী"তে উক্তি এই, যে পশুভাব অবলম্বন করিয়া পশুভাবোচিত আচার প্রতিপালন করিয়া বীর-ভাব ও পরে দিব্যভাবে সাধক উন্নীত হইতে পারেন। যে যখন যে ভাবে থাকিবে, সে তখন সেই ভাবেই মনোনিবেশ করিয়া থাকিবে এবং নিজের ভাবোচিত আচার প্রতিপালন করিবে। পশুর প্রতি নিষেধ, যে তিনি বীরোচিত আচার হইতে বিরত হইবেন এবং বীরের সংসর্গ করিবেন না এবং বীরের প্রতিও নিষেধ, যে কোন কারণে পশুর সহিত সংসর্গ করিবেন না। এমন কি পশু-শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। যদি পশু মন্ত্রের সাহায্যে তিনি কোন পূজা করেন, সে পূজা ব্যর্থ; যদি তাঁহার নিজোচিত পূজায় পশুর দৃষ্টিপাত হয়, সে পূজা পণ্ড। তিনি পশুর মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবেন না এবং আপন ধর্ম্মকথা পশুর নিকট ব্যক্ত করিবেন না। বীরের পক্ষে জপকালের নিয়ম নাই। তিনি যখনই জপ করিবেন, ফল পাইবেন। তবে যদি কোন নির্জ্জন স্থানে—শ্মশানে, বনে নিঃশঙ্ক হইয়া জপ করিতে পারেন, অধিকতর ফল পাইবেন। তাঁহার পূজা জপের সহায় দিব্যভাবাপন্ন কেহ হইতে পারেন; কিন্তু পশু কখনও তাঁহার সহায় হইতে পারেন না। বীরকে যে বীর বলে, তাহার কারণ এই, যে সে নিয়তই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য বদ্ধপরিকর হইয়া দমন করিবার চেষ্টা করে। এই ষড়্‌রিপু—ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই দিব্যভাবে উপনীত হইতে পারা যায়।

কাম'এর অর্থ—"স্ত্রীভোগাদ্যভিলাষঃ"

ক্রোধের অর্থ—"সত্ত্বাদিজিঘাংসা"

ধনাদি তৃষ্ণা—লোভ

তত্ত্বাজ্ঞান—মোহ

আমি সুখী, আমি ধনী, আমি বিদ্বান্, এরূপ গর্ব্ব—মদ

অশুভদ্বেষ—মাৎসর্য্য

এই ছয়রিপুকে দমন করিবার উপায়—অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাচার, শৌচ।

কাহাকেও আঘাত করিব না, এই আভাস-প্রবণতা অহিংসা। কখনও মিথ্যা বলিব না, এই আভাসপ্রবণ চিত্ত সত্য।

চৌর্য্যনিবৃত্তি—অস্তেয়।

স্ত্রীভোগেচ্ছানিবৃত্তি—ব্রহ্মচর্য্য।

প্রাণি মাত্রে ক্রূরবুদ্ধিনিবৃত্তি—কৃপা।

চিত্তকৌটিল্যনিবৃত্তি—আর্জ্জব।

আক্রমণকারীর প্রতি ক্রোধের নিবৃত্তি—ক্ষমা।

ইষ্টবস্তু প্রাপ্ত না হইলে মনঃক্ষুণ্ণতা না হওয়ার নাম—ধৃতি।

ক্রমপরম্পরায় শরীরস্থিতি মাত্র আহার অভ্যাস করা—মিতাহার

চিত্ত যাহাতে নির্ম্মল হয়, ঐরূপ আচরণের নাম—শৌচ।

অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে কাম-জয় হয়। কৃপা ও ক্ষমা অবলম্বন করিলে ক্রোধের জয় হয়। অস্তেয়, সত্য ও আর্জ্জব অবলম্বনে লোভ-জয় হয়। মিতাচার, শৌচ দ্বারা মোহ-জয় হয়। ক্ষমা ও আর্জ্জব দ্বারা মদের জয় হয়। অহিংসা, কৃপা, আর্জ্জব ও ক্ষমা অবলম্বনে মাৎসর্য্য-জয়। কিন্তু মুখের কথায় কিম্বা কেবল মাত্র উপদেশের দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। সেইজন্যই সপ্ত আচারের কথা

পূর্ব্বোদ্ধৃত "বিশ্বসারতন্ত্র" বচনে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রের উপদেশ এই, যে এই ষড়রিপু দমন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই। সংসারের থাকিয়াই এই সপ্ত আচার প্রতিপালন করা যাইতে পারে।, এই সপ্ত আচারের কথা পরে বলিব। এখানে কেবল নাম মাত্র বলিয়া রাখি। উহা—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। এই সপ্ত আচার যথাবিধি প্রতিপালন করিতে পারিলে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। যিনি দিব্য তিনি কর্ম্মত্যাগী, তবে কর্ম্মত্যাগী শব্দের অর্থ এই যে—অহং-ভাব ত্যাগ করিয়া যদি কার্য্য করা যায়; যদি এই দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে, যে আমি কেহ নই; ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, আমি সাক্ষী মাত্র—তাহা হইলে কর্ম্মের ফলাফলে আমি লিপ্ত হইতে পারি না। যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ, জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী, তিনিই কর্ম্মত্যাগী। মমতা বন্ধনের কারণ, নির্ম্মমত্ব মোক্ষের কারণ। যে কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন হয়, উহা অবিদ্যা; যাহাতে বন্ধন নাই তাহা বিদ্যা। জপ, হোম, অর্চ্চন, তীর্থ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের হেতু মাত্র। যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তাহার এ সকলে কি হইবে! যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ তিনিই দিব্য। এখানে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই বলিলাম। ইহার পরে আচার সম্বন্ধে বলিবার সময়ে ইহা হইতে বিস্তৃতভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

বৈদিক যুগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি]

ঋঃ ৩।১৬।১৪ মন্ত্রে অথর্ব্বার পুত্র দধীচি অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। ঋঃ ৬।১৫।১৭ মন্ত্রে ঋত্বিক্‌গণ অথর্ব্বার ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। ঋঃ ১।৮৩।৫ মন্ত্রে অথর্ব্বা যজ্ঞদ্বারা প্রথমে পথ বাহির করিয়াছিলেন। ঋঃ ১০।৯২।১০ মন্ত্রে অথর্ব্বা নামা ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন, দেবতারাও ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন। ঋঃ ১।১৩৯।৯ মন্ত্রে দধীচি, অঙ্গিরা, অত্রি ও কণ্ব প্রাচীন বলিয়া স্তুত। এই দধীচির অস্থির দ্বারা ইন্দ্রের বজ্র তৈয়ার হইয়াছিল এবং এই দধীচি ব্রহ্মবিদ্যা বা মধুবিদ্যা অশ্বিনীযুগলকে দান করায় জন্য ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদে চত্বারিংশৎ অধ্যায়—যাহা ঈশোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই মহর্ষি দধীচির দৃষ্ট মন্ত্র বটে। অথর্ব্বা বা দধীচির দৃষ্ট কোন মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। এই অথর্ব্বা ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া মণ্ডুকোপনিষদে পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা হইতে আগত, এইরূপ লিখিত আছে। পারসীক গ্রন্থে অথর্ব্বার নাম আছে এবং তন্মতে অথর্ব্বা শব্দের অর্থ অগ্নি পুরোহিত। ঋঃ ১০।১৪।৬ মন্ত্রে অঙ্গি অথর্ব্বা এবং ভৃগু আমাদের পিতৃলোকগণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টৃগণের মধ্যে "ভেষজ ও বৃহদ্দিব" নামা অথর্ব্বা বংশীয় ঋষিগণের নাম পাওয়া যায়। অঙ্গিরা বংশীয় সপ্তর্ষ, নবগ্ব ও দশগ্বগণ অতি প্রাচীন এবং

পিতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য। ইঁহারা যথাক্রমে সাত, নয় ও দশ মাসে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেন। তাঁহারা যে দেশে বাস করিতেন, তথায় ঐরূপ দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রি সংঘটিত বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। ঋগ্বেদে অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতি বহু স্তোত্র রচনা করেন, উল্লেখ করেন। (ঋঃ ১০।৬০।১২) বর্ত্তমান ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭১ সূক্তে এগারটী মন্ত্র মাত্র অঙ্গিরস বৃহস্পতির দৃষ্ট পাওয়া যায় এবং উক্ত মণ্ডলের ৭২ সূক্ত অপর এক বৃহস্পতির দৃষ্ট বটে। উক্ত বৃহস্পতি অঙ্গিরস নহেন, লৌক্য। ইহাতে বুঝা যায়, লোকায়ত মতবাদের স্রষ্টা এই লৌক্য-বৃহস্পতি বটেন। লোকায়ত মতবাদকে সাধারণতঃ চার্ব্বাক্ মতবাদ বলে; সুতরাং অঙ্গিরস বৃহস্পতি দৃষ্ট অন্য মন্ত্র যে কোন কারণে হউক লোপ পাইয়াছে। এই লৌক্য বৃহস্পতির দৃষ্ট মন্ত্রে "অসতঃ সদজায়ত" বাক্য আছে, যাহার প্রতিবাদ সামবেদীয় ব্রাহ্মণান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "কথম্ অসতে সদজয়তে ইতি" মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০।১৭২ সূক্তের দ্রষ্টা সংবর্ত্ত; ইনি অঙ্গিরস বংশীয় বৃহস্পতির ভ্রাতা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মরু অবিক্ষিৎকে রাজসূয়যজ্ঞে অভিষেক করেন।

ঋঃ ৯।৫০-৫২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা উতথ্য বা উচথ্য ও অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতির ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। এই উতথ্যতনয় মামতেয় দীর্ঘতমা ঋগ্বেদে ১।১৪০—১৬৪ সূক্ত পর্য্যন্ত মন্ত্রের ঋষি। ইঁহার মাতা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন (ঋঃ ৬।১০।২ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)। ইঁহার মন্ত্রসকল অতি গভীর ও রহস্য-সংযুক্ত। ইহাতে ঋষি অধ্যাত্মবিদ্যার যে সূত্রপাত করিয়াছেন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয়। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র তাঁহার দৃষ্ট। ঐ মন্ত্র দৃষ্টেই "জীব, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি" স্বতন্ত্র থাকার উক্তি কোন কোন সম্প্রদায় করিয়া থাকেন। অনেক মন্ত্রে ঋষি প্রশ্নচ্ছলে তত্ত্ব বলিয়াছেন। যে ১৬৪ সূক্তে উক্ত মন্ত্র বর্ণিত, তাহারই নিম্নের চারিটী মন্ত্রের দ্বারা উক্ত মন্ত্রের যে শঙ্কা অর্থাৎ প্রশ্ন উঠাইয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া পশ্চাৎ এক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, রাজসূয় যজ্ঞকারিগণের বর্ণনা করিতে গিয়া এই মামতেয় দীর্ঘতমা দৌষন্তি ভরতকে অভিষেক করেন, বর্ণিত আছে। অঙ্গিরা-তনয় বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। ইনি ঋগ্বেদের প্রায় সমগ্র ষষ্ঠ মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি ঋগ্বেদোক্ত সপ্তর্ষিগণের মধ্যে একজন এবং গোত্রপতি। পুরাণাদি মতে পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মরীচি, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অত্রি, ইঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কীর্ত্তিত হন, ঋগ্বেদে পুরাণোক্ত সপ্তর্ষিগণের মধ্যে কেবল অত্রি ও বশিষ্ঠের নাম পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি ও অত্রি, ইঁহাদিগকে বেদে সপ্তর্ষি বলা হয়।

পূর্ব্ব-বর্ণিত দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবান্ রাজ্য পাইয়াছিলেন এবং তিনি অতি প্রাচীন বলিয়া বহু মন্ত্রে উক্ত আছে। ইনি ঋগ্বেদের ১।১১৬-১২৫ সূক্তের ঋষি। ইঁহার কন্যা ঘোষা ও পুত্র শবর ও সুকীর্ত্তি এবং ঘোষার পুত্র সুহস্ত; ইঁহারাও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই কক্ষিবান্ আপনাকে উশীধ-পুত্র ও প্রজ্রকলোদ্ভব বলিয়াছেন। প্রজ্র অঙ্গিরা বংশের নামান্তর। (ঋঃ ১।১২৬) সিন্ধাবধি দেশবাসী অর্থাৎ সিন্ধুদেশবাসী (সপ্ত-সিন্ধুদেশবাসী নহেন) ভারদ্বাজ রাজপুত্র স্বনয় নিজ কন্যা কক্ষিবান্ ঋষিকে বহু ধনসহ দান করেন। অঙ্গিরস বংশীয় কুৎস কক্ষিবানের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। কুৎস ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রে কক্ষিবান্ ও

কক্ষিবান্ ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রে কুৎসের নাম পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববর্ণিত ঋগ্বেদোক্ত সপ্তর্ষিগণের মধ্যে মহর্ষি গোতমের নাম উল্লিখিত হয়। উক্ত গোতমের পিতা রহূগণ ঋঃ ৯.৩৭।৩৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই রহূগণ অঙ্গিরস বংশীয় বটেন, কিন্তু অঙ্গিরা হইতে কত দূরে স্থিত, তাহা নিশ্চয় করা যায় না। রহূগণের পৌত্র বামদেব ঋঃ ৪.২।১৫ মন্ত্রে "আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা" এইরূপ বলিয়াছেন, দৃষ্ট হয়। প্রাচীন রাজগণের মধ্যে কেবল ত্রিতের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে ত্রিত (আপ্ত) প্রাচীন ছিলেন বলা যায়। মহর্ষি গোতম মরুপ্রদেশে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণার্থ অশ্বিনীদ্বয় কূপ উঠাইয়া আনিয়া কূপের তলদেশ উপরে রাখিয়া গোতমের তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন (১।৮৫।১১ এবং ১।১১৬।৯ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)। ইনিও প্রাচীন এবং ঋঃ ১।৭৪-৯৩ সূক্ত ও ৯।৩১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বটেন। ইঁহার মন্ত্রে মরীচি, অথর্ব্ব ও অঙ্গিরার নাম মাত্র পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে, ইনি সদানীরা (গণ্ডকীতক) গমন করেন, বর্ণিত আছে। ইহার দৃষ্ট ঋঃ ১।৮৪।১৫ মন্ত্রে সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত হইয়াই চন্দ্রে রশ্মিরূপে পরিদৃষ্ট হয়, এইরূপ লিখিত আছে। ঋঃ ১।৮৯।১০ মন্ত্রে অদিতি দেবমাতা, ইহার উল্লেখ থাকায় অদিতি অধিষ্ঠিত পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে সত্র আরম্ভ হইত বুঝা যায়। ইহার মন্ত্রে অগ্নিকে অঙ্গিরা বলা হইয়াছে। ইহার পুত্র বামদেব। মহর্ষি বামদেব ঋগ্বেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি। বামদেব দৃষ্ট ঋঃ ৪।৪।১১ মন্ত্রে গোতম ইহার পিতা থাকায় ও তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করার উক্তি আছে। মহর্ষি বামদেব সংসাররূপ প্রকৃতি-গর্ত্ত হইতে শ্যেনবেগে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বনে আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব—"আমিই সেই আত্মা সর্ব্বস্বরূপ", ইহা অনুভব করেন, তাহা ঋঃ ৪।২৬।২৭ সূক্তে পাওয়া যায়। মন্ত্র যথা—"অহং মনুরভবং সূর্য্যাশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষি রস্মি বিপ্রঃ। অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেহং কবিরুশনা পশ্যতামা"। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মন্ত্রই উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বটে। উক্ত মন্ত্র হইতে হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কক্ষিবান্, কুৎস, উশনা কাব্য, ইহারা বামদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। রামায়ণে রাজা দশরথের মন্ত্রীকে বামদেব দৃষ্ট হয়। দশরথ নামটী বেবিলিয়নের রাজগণের তালিকায় পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি প্রাচীন বুঝিতে পারিলেও ঋগ্বেদের যুগ হইতে তিনি বহু অর্ব্বাচীন। সুতরাং এই উভয় বামদেব এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। অশ্বত্থের দর্শক (অশ্বত্থনীতি) কি তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই তদ্দৃষ্ট ঋগ্বেদের ৫।২ সূক্তে 'দিতি' ও 'অদিতি' শব্দের প্রয়োগে পাওয়া যায়। বামদেব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—"ঋঃ ৪।১৫ ৪ মন্ত্রে দেববাতের পুত্র সৃঞ্জয় ও ঋঃ এবং ৬।৪৭।২২ মন্ত্রে 'প্রস্তোক' নামক সৃঞ্জের এক পুত্রের উল্লেখ আছে। ঋঃ ৪।১৫.৭ মন্ত্রে সহদেবের পুত্র কুমারের নাম দৃষ্ট হয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টে বুঝা যায়, সহদেব সৃঞ্জয়-পুত্র। নারদ ও পর্ব্বত ঋষি সহদেবপুত্র সোমককে রাজসূয়ে অভিষিক্ত করেন। ঋগ্বেদ যুগ খৃঃ পূঃ ৭৫০০ অব্দে শেষ হইলে, ইনি তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক। ইহাঁর দৃষ্ট মন্ত্রে বিদীথির পুত্র ঋজিশ্বা, প্রিপ্রু ও মৃগয়কে বধ করেন ও ৫০০০ কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেন, লিখিত আছে। ঋঃ ৪।১৯।৩ মন্ত্রে পৌর্ণমাসীতে বৃত্রবধ হয়। ঋঃ ২।১২।১২ গৃৎসমদমন্ত্রে শরৎ ঋতুর ৪০ দিন গতে বৃত্রবধ বর্ণিত আছে। ঋঃ ৪।২৬.৪ ও মন্ত্রে সুপর্ণ দেবগণকে ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মনুর জন্য সোমরূপ

মধুর হব্য আনয়ন করেন। ইহার সহিত পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত গরুড়ের অমৃত হরণের সাদৃশ্য আছে। ঋঃ ৪।২৭।৪ মন্ত্রে ভূজ্যু যে দ্বীপ জয় করিতে গিয়া নৌকাডুবি হন, তাহা ইন্দ্রবান্ দেশের সন্নিকটে ঘটে; যথা হইতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে নিজ রথে বহন করিয়া লইয়া আসেন। ইন্দ্রের স্থান পুরাণে সুমেরুতে অবস্থিত দেখা যায়। ঋঃ ৪।৩০।১৮ মন্ত্রে সরযূ নদীতীরে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করার বিবৃতি আছে। ঋঃ ৪।৩০।২১ মন্ত্রে দভীতির জন্য ৩০০০০ দাস বধের উক্তি আছে। ইহাতে ঐ সময়টী আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের বিশেষ সংঘর্ষণ চলিয়াছিল বুঝা যায় এবং জ্ঞানচর্চাও সবিশেষ হইয়াছিল। সুহোত্র, পুরুমিহ্ল ও অজমিহ্ল ঋঃ চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি। ইঁহাদের নাম মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৯৪ অঃ ভরতের পুত্র প্রপৌত্রাদি স্থলে দৃষ্ট হয়। অজামিহ্ল হইতেই কুশিক পঞ্চাল ও কুরুগণ পৃথক্ হয়। ঋঃ ৬।৩১-৩২ সূক্ত অঙ্গিরসে সুহোত্র দৃষ্ট। সুতরাং সুহোত্রবংশীয়গণ ভারত হইতে পারে না। ঋঃ ভরত বংশীয়গণের পুরোহিত বিশ্বামিত্র আপনাদিগকে ভারত বলিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের পিতা পিতামহ প্রভৃতির নাম ঋগ্বেদে আছে, তন্মধ্যে ভরতের নাম দেখিতে পাই না। ঋঃ ৮।৮৮-৯০ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা গোধা এবং তদীয় পুত্র একদ্যূ যিনি ঋঃ ৮।৮০ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁহারাও গোতম। মহর্ষি বামদেবের পুত্র অংহমুখ ঋঃ ১০।১২৬ সূক্তের ঋষি ও অপর পুত্র বৃহদুক্‌থ ঋঃ ১০।৫১-৫৬ সূক্তের ঋষি। ইনি পঞ্চালরাজ দুর্ম্মুখকে রাজসূয়ে অভিষেক করেন। এরূপ ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে।

ঋঃ ১০।৫৬ সূক্তের ঋষি স্বীয় মৃত পুত্রের তেজাংশ অগ্নিতে, পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে ও বায়ুর বায়ুতে'ও জ্যোতির্ম্ময় আত্মা সূর্য্যে প্রবেশ করুক, বর্ণিত আছে। বেদে সূর্য্য আত্মাবাচী। আত্মার সূর্য্যে প্রবেশ অর্থ—তাহাতে একীভূত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। এই মন্ত্রদৃষ্টে ঋষি বৃহদুক্‌থ অদ্বৈত ব্রহ্মবেত্তা থাকা দৃষ্ট হয়। অঙ্গিরাতনয় বৃহস্পতির মহর্ষি ভরদ্বাজ ব্যতীত, সংযু, অগ্নিপাবক ও তপমূর্দ্ধা এই তিন পুত্র। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি ভরদ্বাজের গর্গ, নর, খাস, বায়ু, পায়ু, শিরি, ঋজিশ্ব যবক্রীত, সত্য বাহ, সপ্রথ ও সুহোত্র-পুত্রগণ ও রাত্রি নামা এক কন্যার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সুহোত্রের পুত্র পুরুমিঢ় ও অজমিঢ়, ইঁহারাও ঋঃ মন্ত্রদ্রষ্টা। অঙ্গিরা বংশের শুনিহোত্র-পুত্র শৌনহোত্র ভৃগুবংশীয় সুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। তাহাতে তাঁহাকে শৌনক গৃৎসমদ বলা হয়। ইনি সমগ্র দ্বিতীয় মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। অঙ্গিরা বংশের বহু ঋষি ঋঃ মন্ত্রদ্রষ্টা আছেন; তন্মধ্যে কুৎস, প্রিয়মেধ, হিরণ্যস্তূপ, ঘোর ও কৃষ্ণাদি প্রসিদ্ধ বটেন। ঋগ্বেদের দেবতাদি বিষয়ে বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থ শৌনক প্রণীত এবং নৈমিষরাণ্যে দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠানকারীও শৌনক বটেন। প্রাগুক্ত কৃষ্ণ ঘোরশিষ্য দেবকীপুত্র। তদীয় পুত্র বিশ্বাপু। এই কৃষ্ণ ঘোর-পুত্র কণ্বের সমসাময়িক। দেবকীপুত্র হইলেও, বৃষ্ণিবংশীয় দেবকীপুত্র কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বটেন। নতুবা ঋগ্বেদ মহাভারতের পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কৃষ্ণও বৃষক, উভয়েই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষি বিশ্বক স্বীয় মৃত পুত্র যমলোক হইতে আনয়ন করেন, ইহা বহু শ্রুতিতে উক্ত আছে। এই আখ্যানের পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের যমলোক হইতে দেবকীর মৃত পুত্রগণের আনয়নের ইতিবৃত্তের সহিত সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস অয়াস্য ঋষি ঐক্ষ্বাক হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে উদ্গাতা ছিলেন। ঐ যজ্ঞে যূপবদ্ধ শুনঃশেপের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদে ১।২৪ সূক্তে

বর্ণিত আছে। উক্ত ঐক্ষ্বাকের রাজসূয়ে হোতা বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মা বশিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এইরূপ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত আছে। আর্জ্জুনেয় কুৎস রাজা ছিলেন। ঋ: ১।৯৪—৯৮ ও ৯।১৭ মন্ত্র তদ্দৃষ্ট। ইঁহার পুত্র সুমিত্র ঋ: ১০।১০৫ সূক্তের দ্রষ্টা। ইন্দ্রের সাহায্যে তিনি বহু শত্রু পরাজয় করেন, এইরূপ ঋগ্বেদের বহু স্থানে উক্ত আছে। ঘোর-পুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের ১।৩৬—৪০ ও ৯।৯৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। পুরাণে ঋষি কণ্ব দুষ্মন্ত-পত্নী শকুন্তলার পালকপিতা।

এই দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মেন। যাহা হইতে সুপ্রসিদ্ধ ভারত বংশ প্রবর্ত্তিত। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কন্যা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত। বিশ্বামিত্র ভরতের পৌত্র দেবরাত ও দেবশ্রবার পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক। তিনি দেবরাত-পৌত্র মহারাজ সুদাস পরিচালিত ভারত-গণের পৌরহিত্য করিয়াছেন, কিন্তু ভরতের নহে। সুতরাং পৌরাণিক আখ্যানের শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কন্যা হইয়া ভারতের মাতা হইতে পারেন না এবং পৌরাণিক কণ্বও ঘোরপুত্র কণ্ব হইতে পারেন না। কারণ ঋগ্বেদের মহর্ষি কণ্ব দৃষ্ট ১।৩৬।১৮ মন্ত্রে "তুর্ব্বশ যদু ও উগ্রদেবকে দূর দেশ হইতে আহ্বান করে", এইরূপ প্রার্থনা আছে এবং ঋ: ১।৪২।৮ মন্ত্রে "শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়"—এই প্রার্থনায় বিশ্বামিত্রের ন্যায় কণ্বও দেশান্তর হইতে আসিতেছেন। সুতরাং কণ্ব বিশ্বামিত্রের সম-সাময়িক বুঝা যায়। বিশেষ, ৬।২৭।৭ মন্ত্রে ভরতের পৌত্র দেবরাততনয় সৃঞ্জয় তুর্ব্বশকে বশীভূত করেন। ঋগ্বেদে অঙ্গিরাবংশীয় গোত্রপতি কণ্বের বংশে মেধাতিথি, প্রস্কণ্ব প্রগাথ, বিমদ, সুপর্ণ, মেধ্য, কৃশ, সৌভরি ও ত্রিশোক প্রভৃতি বহু ঋষিগণের নাম পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। অঙ্গিরসবংশীয় গোতম-গোত্রে বীতহব্য ঋ: ৬।১৫ ঋষি। তাঁহার পুত্র অরুণ ঋ: ১০।৯১ সূক্তের ঋষি। অরুণপুত্র মহর্ষি উদ্দালক ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা না হইলেও, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে তাঁহার কার্য্য অতুলনীয়।

অদ্বৈতবাদ বটবীজে বটবৃক্ষবৎ ঋকসংহিতায় অবস্থিত। উহার সবিশেষ স্ফুরণ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে মহর্ষি ঔদ্দালক আরুণি দৃষ্ট মন্ত্রে হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্র সূত্রাদির উহাই মূল এবং সেই জন্য তাঁহার বাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইঁহার পুত্র শিষ্য শ্বেতকেতু, যিনি "তত্ত্বমসি" বাক্যের শ্রোতা। তিনি কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আচার্য্য শ্রেণীভুক্ত এবং ইঁহারা পিতা পুত্র উভয়ে পরমহংস পদবী গ্রহণ করেন, এইরূপ উপনিষদাদিতে বর্ণিত আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ও আখ্যাতা বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার শিষ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণ, তাহাতে উঁহার নাম দৃষ্ট হয়।

ভৃগুবংশীয়গণ ভার্গব নামে পরিচিত। বরুণ-পুত্র ভৃগু ও তাঁহার ভ্রাতা সত্যধৃতির নাম ঋগ্বেদে আছে। ঋষি সত্যধৃতি ১০।১৯৫ সূক্তের দ্রষ্টা। ভৃগুবংশীয়গণের মধ্যে - উশানাকাব্য জমদগ্নি ও শৌনক গৃৎসমদ অতিশয় সুপ্রসিদ্ধ। ঋ: ২য় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তগুলি ইঁহার ও তৎপুত্র কূর্ম্মের দৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)



চটকল ও শ্রমিক বিভ্রাট

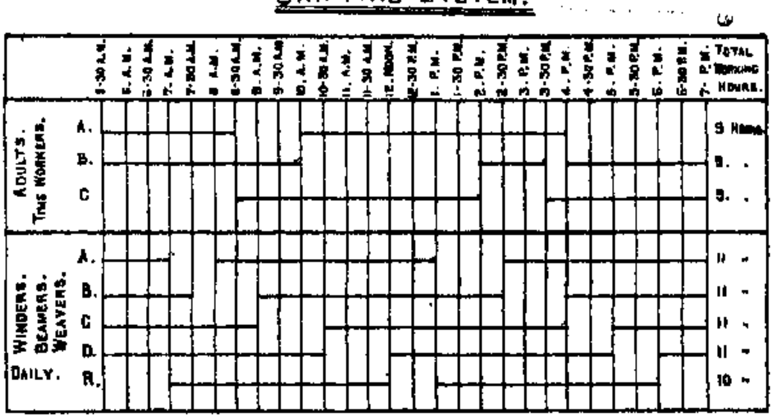
(প্রাপ্ত)

সম্প্রতি চটকলের মালিকে ও শ্রমিকে একটু গোলযোগ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পৃথিবীর সাধারণ ব্যাবসা ও বাণিজ্য মন্দা হওয়ার দরুণ চটের বাজারও অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে শত গজ পাটের দাম ২০।২২৲ টাকা ছিল, এখন তাহারই দাম হইয়াছে ৯।১০৲ টাকা। এই সকল কারণে অনেক চটকল কয়েক মাস ধরিয়া কিছু কিছু লোকসানও দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চটকলের অংশের দাম কমিয়াছে এবং অংশীদারদের Dividend'এর পরিমাণও কমিতে বাধ্য হইয়াছে। এই লোকসানের কারণ দেখাইয়া কলের মালিকেরা মিলিয়া যাহাতে লোকসান না দিতে হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইতেছেন। পূর্ব্বে একবার বাজারের অবস্থা খারাপ হয়; সেই সময়ে Mill Association'এর নির্দ্দেশ-ক্রমে মিলগুলি কম সময় কাজ করিয়া চটের বাজার তুলিবার চেষ্টা করে। অবশ্য গঙ্গার দু' ধারে যতগুলি চটকল আছে, সমস্তগুলিই Mill Association'এর ভিতর নাই। কয়েকটি American ও কয়েকটি দেশীয় লোক পরিচালিত কল Association-এর বাহিরে থাকিয়াই কার্য্য করে এবং তাহারা Association-এর নির্দ্দেশ শুনিতে বাধ্য নয়। যাহা হউক, Association-এর ভিতরের কলগুলি (বলা বাহুল্য, ইহারাই বাজার Control করিবার পক্ষে যথেষ্ট) কিছুদিন কম সময় কাজ করিয়া আবার বেশ লাভবান্ হইতে লাগিল এবং বেশ মোটা Dividendও দিতে লাগিল। পাট কলের মোটা লাভ দেখিয়া দেশীয় ধনীরাও পাটকল প্রভৃতির দিকে মন দিল। গঙ্গার দুই পার্শ্বে আরও ২।৪টি মিলও খাড়া হইয়া উঠিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া ইউরোপিয়ানদের এই একচেটিয়া ব্যবসাটী দেশীয়রাও দখল করে দেখিয়া ভীত হইয়া Association ঠিক করিল—আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না। এইবার নূতন কল তৈয়ারী

Check করিতে হইবে ; তা' না হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের তল্পিতল্পা গুটাইতে হইতে পারে। পুরাতন কলগুলি যুদ্ধের সময় হইতে প্রচুর লাভ করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদের কিছুদিন লোকসান দিলে কিছু যায় আসে না। তাহারা ভাবিয়াছিল—short time ভাঙ্গিয়া দিয়া বাজার আবার যখন প্রচুর stock হইয়া যাইবে, তখন আবার বাজার খারাপ হইয়া গেলে নূতন কলগুলি ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ফেল পড়িতে পারে এবং নূতন কল-প্রস্তুতির দিকে একেবারেই ঝোঁকও থাকিবে না। এই মতলব করিয়া তাহারা আবার short time ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই সময়ে যদি Government-এর সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী Factory চালাইতে পারিবে না, এই নিয়ম না থাকিত, তবে যুদ্ধের সময়ের মত ৬ দিন পূরাদমে কাজ করাইয়া নিজেদের মতলব সফল করিত। অবশ্য তখন বাজারের অবস্থা যে নিজেদের হাত-ছাড়া হইয়া যাইতে পারে (এখন যেমন হইয়াছে) তাহারা ততখানি ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। আবার নূতন মিলগুলিকে Association-এর ভিতরে আনিয়া New enterprise check করিয়া পুনরায় short time কাজে বাজার উঠাইবার মতলব ফাঁসিয়া গিয়াছে। এখন সত্যই চিন্তার বিষয় হইয়াছে—কি করিয়া লোকসান বন্ধ হয়, কিছু লাভের মুখ দেখা যায়। প্রথম নির্দ্দেশ আসিল—সমস্ত কল মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখ এবং বন্ধের সপ্তাহের দরুণ মজুরদের সামান্য একটী ভাতা দাও।

"খোরাকী" এই কথা লইয়া পূর্ব্বে অনেক গোলমাল হওয়ায় "খোরাকী" কথাটী পর্য্যন্ত ব্যবহার আর যাহাতে না হয়, তার চেষ্টাও হইল। এক সপ্তাহ বন্ধ দিয়াও বাজার যখন উঠিল না, তখন আরও নূতন নূতন নির্দ্দেশ আসিতে লাগিল। Whitely Commission একটু recommend করিয়া গিয়াছিল—Scotland'এ যেমন Single shiftএ কল চলে, এখানেও যাহাতে Double shift তুলিয়া দিয়া সেইরূপ Single shift এ কাজ হয়। Double shift নাকি তাঁহারা পছন্দ করেন নাই। Shifting

SHIFTING SYSTEM.



system'এর chartএ দেখিতে পাই, সাধারণ দিন মজুরকে ৯ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয় এবং ফুরন হিসাবে যাহারা কাজ করে, তাঁতী ইত্যাদি মজুরদের ১১ঘণ্টা খাটিতে হয় ; কিন্তু single Shift systemএ দিন মজুরদিগকে ১১ ঘণ্টা ন্যূন পক্ষে ১০ ঘণ্টা খাটিতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, Whitely Commission মজুরীর হার (Rate) সম্বন্ধে কোনও recommend করিয়া যান নাই। Association বলিল—সমস্ত Double Shift মিলগুলিকে Single shift কর। ইহার মানে, যেখানে তিনজন লোক, পাল্‌টাপাল্‌টি কাজ করিয়া

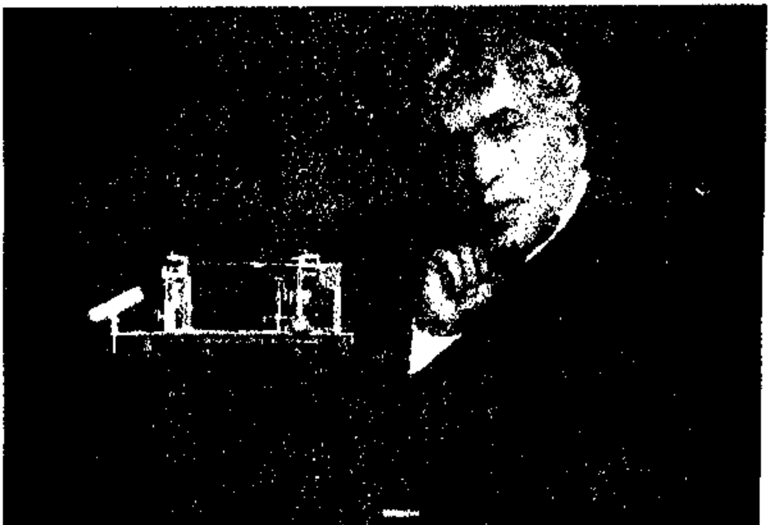
সর্ব্বসময়ে দুইজন থাকিত, এখন সেই জায়গায় তিন জনের বদলে দুই জনকেই কাজ করিতে হইবে; তবে খাবার জন্য কল দ্বিপ্রহরে কয়েক ঘণ্টা একেবারে বন্ধ থাকিবে। Double shift ভাঙ্গায় single shift করায় হাজার হাজার লোকের জবাব হইল। দ্বিতীয় নির্দ্দেশ আসিল —শতকরা ১৫টী তাঁত বন্ধ করিয়া দাও। তাঁত বন্ধ হইলে শুধু তাঁতী ছাড়া Batching, Preparing, Spinning ইত্যাদি প্রত্যেক Department হইতেই কিছু কিছু লোককে জবাব দিতে হইল। তৃতীয় নির্দ্দেশ আসিল—খোরাকী বন্ধ করিয়া দাও। চতুর্থ নির্দ্দেশ—ঠিক নির্দ্দেশ বলা চলে না, Double shift মিলগুলি Sacking বা মোটা sideএ ৮৫ গজের cutএ অভ্যস্ত, তাহাদিগকে Single shift Mill'এর ন্যায় ১০৫ গজের cutএ কাজ করিতে বলা হইল এবং Rate যা দেওয়া হইল, তাহাও পূর্ব্বেকার গজের অনুপাত হিসাবে কিছু কম দাঁড়াইল। এই সকল নানা কারণে মজুরেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া এবং মালিকদের কাছে আবেদন নিবেদনে কিছু ফল না হওয়ায়, তাহাদের হাতের একমাত্র অস্ত্র ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিতেছে। কিন্তু কার্য্য বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া না খাইয়া কতদিন কাটাইবে? কলওয়ালাদের যখনই লোকসান হইতেছে, (যদিও সামান্য কয়েক মাস) তখনই মজুরদের ভাতে হাত পড়িতেছে; কিন্তু এত বৎসর মোটামুটি লাভ করিয়া কলগুলি ফাঁপিয়াছে, তখন মজুরদের ভাগ্যে কিছুই পড়ে নাই। মজুরদের দিকটা একেবারে না দেখিলে বাস্তবিক তাহারাও মারা যাইবে! সাধারণ মজুর এক সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে মাত্র ২॥।৩৲ টাকা; তাহার ভিতর হইতে যদি আরও ৵০ আনা ।০ করিয়া কাটা হয়, তবে তাহাকে ত আধপেটা খাইয়াই থাকিতে হয়, সে পূর্ণোদ্যমে কাজই বা করে কেমন করিয়া! আর একটী কথা আমরা বলিয়া শেষ করিব। চটের দর যেমন অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে, পাটের দরও অর্দ্ধেকের বেশী নামিয়া গিয়াছে। ৯।১০৲ টাকার পাট ৩।৪৲ টাকায় বিকাইতেছে। ২।৩ মাস কিছু লোকসান হইলেও, ভবিষ্যতে Hessian Market একটু উঠিলেই কলগুলির প্রভূত লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক মিলই প্রচুর পরিমাণে এই বৎসর সস্তায় পাট খরিদ করিয়া গুদাম ভরিয়া রাখিয়াছে। একদিকে চাষীর হাহাকার, অন্য দিকে পাটকল শ্রমিকেরও হাহাকার—ইহার প্রতিকার কি? শ্রমিকেরা এখন চায়, যে তাহাদের ভিতর যাহাদের কাজ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা আবার কাজ করুক; এক কথায় Double shift আবার চলুক। তবে মিল-ওয়ালাদের যদি Production কম করা ইচ্ছা হয়, তবে শ্রমিকগণ সপ্তাহে চার দিনের জায়গায় তিন দিন কাজ করিতেও রাজী আছে। প্রত্যেকে পারিশ্রমিক কম পাইলেও, সকলেই যাহাতে খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা চায়। তাহারা চায় না, তাহাদের অন্যান্য ভাইরা অভুক্ত থাকুক এবং ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত দাবী। মিলের মালিকগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কি না জানা যায় নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট হইতে একটী Central Jute Bureau প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যাইতেছে। গভর্ণমেণ্টের লোক, Council'এর সদস্য এবং মিলের মালিকদের লইয়া ইহা গঠন করা হইবে এবং পাটের দর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অনেক কিছু করা হইবে। কতদূর কি ফলপ্রসূ হয়, দেখিবার জন্য আমরা চাহিয়া রহিলাম।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

[শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত]

চক্ষের সম্মুখে একটা অদৃশ্য রাজ্য প্রসারিত হইল। যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই তাহাই দেখিয়া আসিলাম, যাহা পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই তাহাই ভাবিতে শিখিলাম। অল্প কয়েকটা ঘণ্টার পরিচয় মাত্র! পরিচয় যাঁহার সঙ্গে তিনি আমাদের গুরু ও নেতা—আমাদের প্রাণ-সর্ব্বস্ব। আমরা কয়েকজন সহতীর্থ মিলিয়া শ্রোতৃ-রূপেই সেই আলাপ-স্থলে উপস্থিত ছিলাম।



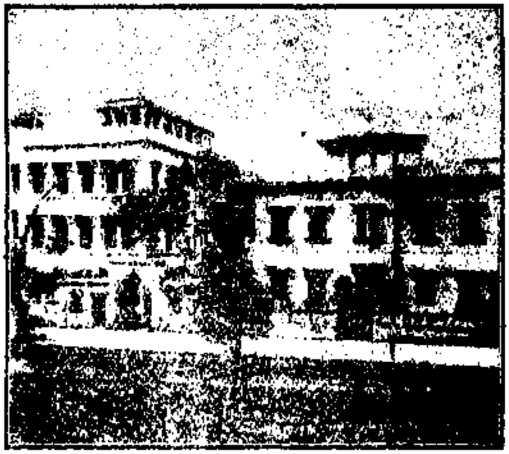
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

দেখিলাম—আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে। যেটুকু দূর ব্যবধানে আমরা বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোনা যাইতেছিল না। আলাপের সকল প্রসঙ্গ লিপিযোগে রেখাঙ্কণ করিয়া লইবার মত প্রস্তুত হইয়া কেহই যই নাই। কথাস্রোতঃ এমন-ভাবে মোড় ফিরিবে, তাহারও জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিলাম না। মানস-পটে যে অসম্পূর্ণ স্মৃতিলিপি অঙ্কিত হইয়া গেল, তাহা সেই মহাপুরুষের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিয়া দেখাই—এ ইচ্ছা প্রবল হইলেও, পাছে সেই জগদ্বরণীয় মহামনীষার প্রতি অজ্ঞাতসারেও অবিচার করিয়া বসি, এই ভয়ে কঠোর হইয়াই পূজাতুর হৃদয়কে দমন করিয়া লেখনীকে নিষেধ

করিলাম। শোনা কথা কিছুই লিখিব না। আচার্য্যের ভাব-মূর্ত্তি আমার ধ্যাননেত্রে ভাসিতেছে —ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। এই মনশ্চক্ষে দৃষ্ট ছবিখানিও কি তাঁহারই ভাব ও ভাষার তুলিকা সাহায্যে আঁকিয়া তুলিবার অধিকার পাইব না! উপর দিক্ হইতে কোনও শুরু-নিষেধবাক্যই যে হৃদয় এখানে মানিতে চাহে না!

আচার্য্যকে দেখিলাম বলিলেও বলা বুঝি ঠিক হইল না। বাহিরের রূপ আঘাত দিয়া ভিতরের মণিকোটায় কোন্ এক চির ধ্যানারাধ্য গূঢ়-রহস্যাবৃত মহনীয় স্বপ্নদেবতাকে জাগাইয়া তুলিল। সে কি অজানা অচেনা—না একান্ত সুপরিচিত! আমাদেরই ভারতমূর্ত্তি! ভারতের স্বরূপাত্মা যেন বজ্রনির্ঘোষে অন্তরে সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। শাস্ত্রে পড়িয়াছি—ভক্তের পূজায় ভগবানের পূজা সিদ্ধ হইতে পারে। কেন না, ভক্ত ও ভগবান যে অভেদ। অনুভূতির বেদেও এ সিদ্ধ-বাণী চিরদিন গভীর হইতে গভীরতর সত্যানুভব রূপেই উপলব্ধি করিতেছি। এই পরিচয়ের ঋক্‌ই যে ভারতের সনাতন যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র। অজ্ঞাত ঘটনাসূত্রে সহসা কে এক একজন আসিয়া চির পরিচিত শুভ-সংস্পর্শে অন্তরের সুপ্ত স্বপ্নময় দেবতাকেই নানা বাণী মূর্ত্তিযোগে প্রবুদ্ধ ও উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। মনে হয়—এ যে চেনা—বড় চেনা! এ তো কোনও অচেনা অনাত্মীয়ের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হই নাই! ভারতীয় জ্ঞানের চাবী—ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা একটী মুহূর্ত্তের দর্শনে মিলনেও অসম্ভব নয়। হৃদয় যদি প্রস্তুত থাকে, তবে ভাবের ঠাকুর যোগ্য নামে রূপেই যথাকালে আবির্ভূত হইয়া সে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসেন। ঋষি জগদীশচন্দ্রই আমাদের শিখাইয়াছেন —"ভারত-ভারতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোণার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম।"

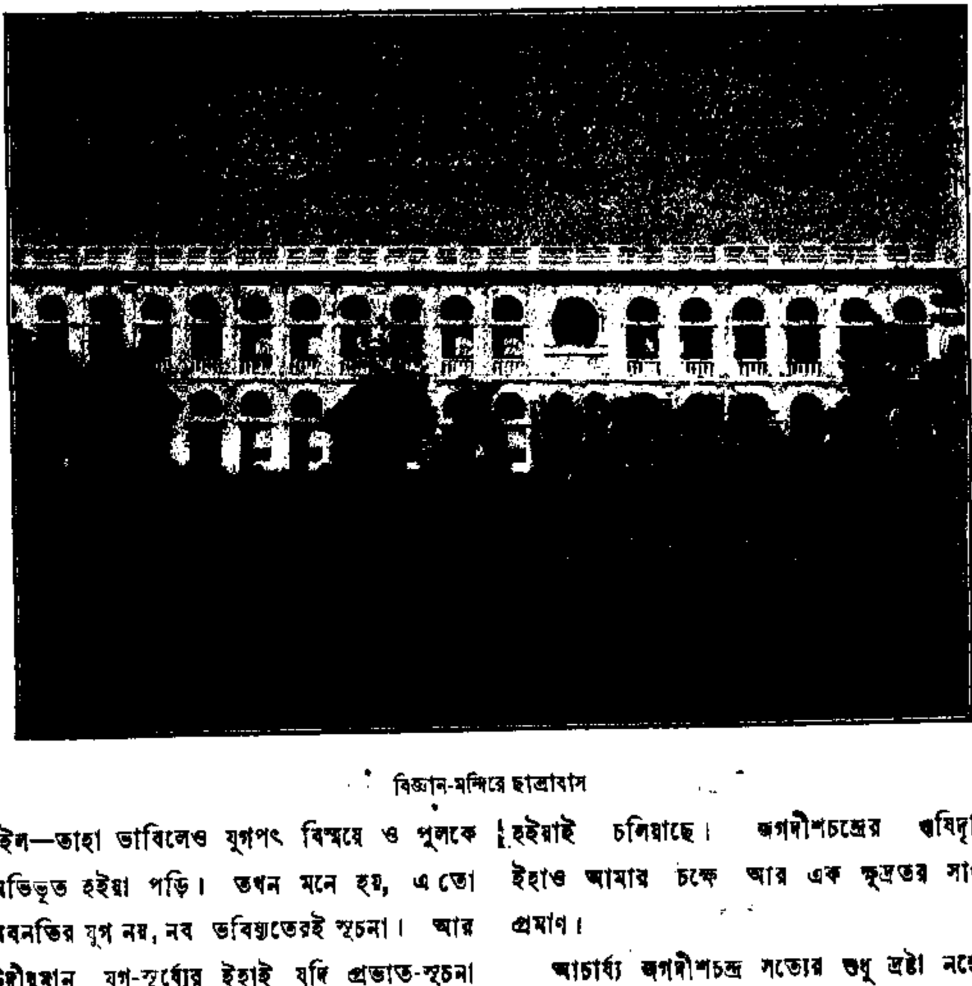
অখণ্ড ভারত—না সমস্ত বিশ্বমানব ঋষি জগদীশচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া পূজা দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক হইলেই ঋষি হয় না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ঋষি—কেন না, তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক নহেন, সত্য মন্ত্র-দ্রষ্টা। জ্ঞান-রাজ্যের এক মণিময়-কোটা তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শে খুলিয়া গিয়াছে। ভারতীর মন্দিরে তিনি সিদ্ধকণ্ঠে আর একবার



সংলগ্ন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাটী

উচ্চারণ করিয়াছেন—"যেন নহে—এই সেই"—এ সবই যে এক। বহুর মধ্যে সেই একেরই চিরন্তন বেদধ্বনি তিনি জাগ্রত উপলব্ধির পথে অবিশ্বাসী জগৎকে শুনাইয়াছেন। সংশয় ও জড়বাদের যুগে, জড়বাদীরই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঋষি জগদীশচন্দ্রের এই বীরবেশে অভিযান—সনাতন ভারতেরই জগজ্জয়ের অভিনব কৌশল মাত্র। বিশ্বের দুর্দ্দিনে ভারতের যে সকল যোগ্য পুত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভার অবদান

লইয়া ভারতীয় সত্য প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের নাম কালের পারম্পর্য্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরেই স্মরণীয়। এই ঘোর পরাধীনতার বুকেও, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী—পর পর এতগুলি প্রতিভার ভাস্বর ভারত-গগনে কেমন করিয়া অদূর কালে সমুদিত



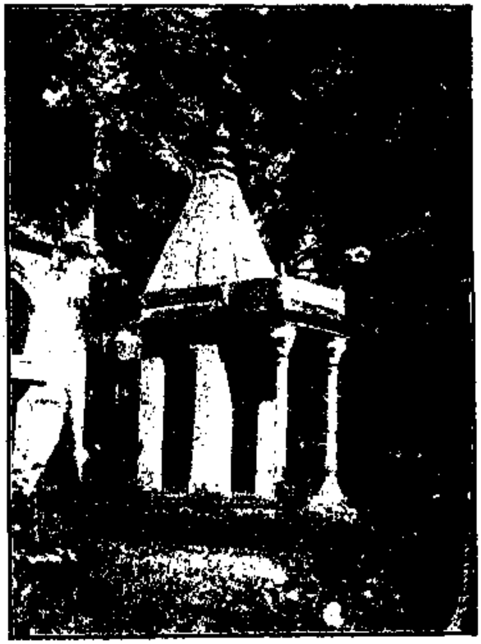
বিজ্ঞান-মন্দিরে ছাত্রাবাস

হইল—তাহা ভাবিলেও যুগপৎ বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইয়া পড়ি। তখন মনে হয়, এ তো অবনতির যুগ নয়, নব ভবিষ্যতেরই সূচনা। আর উদীয়মান্ যুগ-সূর্য্যের ইহাই যদি প্রভাত-সূচনা মাত্র হয়, তবে সে নয়নবিভ্রান্তকারী জ্যোতির্জ্জ্বল মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের দ্যুতি-বিলাস কি প্রকার তাহা আর চিন্তা না করিলেও চলে! যুগান্ত পূর্ব্বে যখন আচার্য্য কহিয়াছিলেন—"আমি দেখিতে পাইয়াছি, যে এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।"—তখন তাঁহার ধ্যাননেত্রে কি দৃশ্য প্রভাসিত হইয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য, বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠ সেদিন যে ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদিত হইয়াই চলিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের ঋষিদৃষ্টির ইহাও আমার চক্ষে আর এক দৃঢ়তর সার্থক প্রমাণ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সত্যের শুধু দ্রষ্টা নহেন, তিনি সিদ্ধ-শিল্পী। তিনি একাধারে ঋষি ও কবি, আবার অসাধারণ কৃতকর্ম্মী। "কবির্মনীষী পরিভূঃ" —উপনিষদের ঋক্ মানুষের জীবন দিয়াই মূর্ত্ত না

হইলে তাহার সম্যক্ মর্ম্ম নির্ণয় হয় না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তিনি সারাজীবন অন্তরের উপলব্ধ সত্যকে পৃথিবীর জ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন, বীরের ন্যায় তিনি অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতিকূল বাধা-স্রোতকে সবলে ফিরাইয়া অনুকূল প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন, বার বার বিরুদ্ধ আক্রমণে ও বিপর্য্যয়ে হৃদয়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিরাশ বা সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই, কোনদিন পরাভব স্বীকার করেন নাই, পরিশেষে অদম্য বিক্রমে সত্যের মহাবীর্য্য প্রকাশে পরাজয়কেই জয়ে পরিণত করিয়াছেন—এই যে জ্ঞানবীরের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম, ইহা জগদীশচন্দ্রের জীবনে যেমন প্রকটিত, এ দেশে এমন অত্যল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায়; কিন্তু এই নিরন্তর সংগ্রাম-শীলতা তাঁহার চিত্তের সরসতা ও নবীনতা একটু মাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবন চির মহত্ত্বানুপ্রাণিত বীরযোগীরই প্রবল ও দিগ্বিজয়ী জীবন—কিন্তু তাহাতে তিক্ততার কীটাণু জয় পরাজয়ের আস্বাদকে কোনদিন বিষাক্ত করিয়া তুলে নাই, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ-মমতা ও অপরিমেয় সহানুভূতির ক্ষীর-সমুদ্র এখনও প্রথম যৌবনেরই ন্যায় ভরাট ও উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিয়াছে—সে শান্ত-শীতল আপূর্য্যমান সঞ্চয় আজও বুঝি তেমনি স্নিগ্ধ রসোচ্ছ্বাস ও সান্ত্বনার প্রলেপে আমাদের সবখানি মধুসিক্ত করিয়া দিল। স্পষ্টই উপলব্ধি করিলাম—আচার্য্যের সৌম্যোজ্জ্বল অন্তর হইতে বীর্য্যেরই জয়গান ভারতের বিজয়ী প্রাণকে পরশে পরশে প্রবুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করিতে চাহিতেছে। তাঁর অমর প্রাণের এই চির আকাঙ্ক্ষা কি জাগ্রত ভারত অস্বীকার করিতে পারে?

আচার্য্যের সাধনা—দেশের জন্য, জাতির জন্য। মহামানবের তিনি পুরোহিত, কিন্তু ভারতভারতীর দেব-মন্দিরে তাঁর অচল অটল যোগাসন চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই মহাতীর্থের রেণুই তিনি জয়লক্ষ্মীর আশীষতিলকরূপে আজীবন ললাটে ধারণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক রণযাত্রার এই আনুপূর্ব্বিক মর্ম্মকাহিনী একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে—



বিশ্বদেবতার মন্দির

"……যে সকল বাধার কথা বলিলাম, তাহার পশ্চাতে যে কোন এক অভিপ্রায় আছে, তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি—সত্যের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্ব্বলতা ঘটে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের ীয় অশ্বের মত সমস্ত শত্রুরাজ্যের মধ্য

গিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে, যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য অন্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া গৌরব করা কর্ত্তব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরাট্ রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যেরূপ দুর্ণাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারতবাসীর সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারম্বার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম হইবে। কিন্তু ঘোরতর নৈরাশ্যের মধ্যেও আমি অভিভব স্বীকার করি নাই। তৃতীয়বার পশ্চিম সমুদ্র পার হইলাম এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। এই সুদীর্ঘ পরিশ্রমে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করিতেছি।"

সত্যই জাতির জন্য আন্তরিক দরদ ও সমবেদনাই যদি জাতীয়তার স্বরূপ হয়, তবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে সেই জাতীয়তার স্বরূপই আজীবন বহন করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রত্যেক বাণী ও সমগ্র জীবন-সাধনার মধ্য দিয়াই জলন্ত বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী। ইহাই মানবজীবনের মৌলিক মহাসাধনা বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাই মানবের পক্ষে দেবত্বলাভ অসম্ভব নহে। এমনই গভীরতম দৃষ্টিবলেই তিনি জাতির দুর্ভাগ্য-তিমিরজাল বিদীর্ণ করিয়া দিব্য আশার আলো চক্ষে ধরিয়াছেন। তিনিই তো এ জাতিকে শুনাইলেন—"মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে, সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের এই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই।"

গঠন ও ধ্বংস—জাতীয় অভ্যুত্থানের এই যুগল প্রেরণা কি উদার ভঙ্গীতে তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—এই সুস্পষ্ট সঙ্কেত জাতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে, পন্থা লইয়া অনেক গণ্ডগোল কি অচিরেই দূর হইতে পারে না?

ভারতের প্রতি এই অসীম দরদই তাঁহার গভীর স্বচ্ছ ভূয়োদৃষ্টির সহিত সংযুক্ত হইয়া যে প্রখর সতর্কতার বাণী তাঁহাকে বারম্বার উচ্চারণ করাইয়াছে, অপরিণামদর্শী জাতি যদি আজও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারে, তবে সে আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিব?

আমাদের আজ খুবই সজাগ ও উদ্যত হইতে হইবে—নহিলে কঠোর জীবন-সংগ্রামে অনুদ্যত যে তাহার উচ্ছেদ অনিবার্য্য। দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকের এই অভিজ্ঞতার রুদ্রঝঙ্কার তাই জাতিকে নূতন করিয়াই প্রণিধান করিতে বলি—"জীবন-সংগ্রামে যে কেবল শক্তিমান্ই জীবিত

থাকে, দুর্ব্বল নির্ম্মূল হয়, এ কথা কেবল নিম্নজীবের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে, এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি—বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্ব্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না, যে আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।"

জড়ত্বই যে আমাদের কাল হইয়াছে চন্দ্র বলিতেছেন—"আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন, তবে জানিবেন—তাহা সর্ব্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও, তবে কষাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখ।"

বিজ্ঞানের গবেষণা অনেকেই তো করিয়া থাকেন—কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিকশিরোমণিকে যখন তাঁহার আলোচ্য প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রত্যেক মর্ম্মশিক্ষাটী পর্য্যন্ত জাতি-সাধনার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মোহমগ্ন দেশ-বাসীর চেতনাসঞ্চারে উদ্যুক্ত দেখি, তখন সত্যই কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বুক ভরিয়া যায়। আহত উদ্ভিদ্ যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তায় স্বস্থান আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে প্রয়োজন-মত বর্জ্জনে ও গ্রহণে অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তির সামঞ্জস্য করিয়া লয়, যে স্মৃতির ছাপ বুকে বহিয়া সে বীজগত স্বরূপ-প্রকৃতি অটুট ভাবে রক্ষা করে ও বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়, তাঁহার চেয়ে কি অধম হতভাগ্য সে নয় যে মানুষ হইয়া স্বদেশের মাটীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হয়, পর অন্নে ও কৃপায় লালিত পালিত হয়, স্বজাতির মহিমা ও স্মৃতি ভুলিয়া যায়? আচার্য্যপ্রবর বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই দেখাইলেন—বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার অবধারিত পরিণাম! নিরাশকে, চিরবঞ্চিতকে অভয়মন্ত্র শুনাইলেন—"মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার দ্বারা সে বহির্জ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশদ্বার কখনও



পদ্মসরোবরোত্থিতা দেবী ভারতী দীপহস্তে বিজ্ঞান-মন্দির আলোকিত করিতেছেন

উদ্ঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এই-রূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্ত্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান্ হইবে। বাহিরের সর্ব্ব বিভীষিকার সে অতীত হইবে। অন্তর-রাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।"

এই স্বেচ্ছা—মানুষ ও জাতির অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে বলিয়াই আমাদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা নয়। ভারতে যে অসহযোগ যুগ খরস্রোতে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মূলে গভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। আচার্য্যদেবের কথায় সেই যুক্তি বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ হইয়াই আমাদের চক্ষে ধরা দেয়। আমাদের বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে ; ইহা যে জীবনেরই ধর্ম্ম।



বিজ্ঞান-কাননের একাংশ

যে মহাশক্তি সকল জীবনের মূলে, তাঁহারই জাগরণে শুধু এ জাতির অভ্যুদয় নয়, মানব দানবত্ব পরিবর্জ্জন করিয়া দেবত্বের পদবীতে সমুন্নত হইবে—তাঁহার এ অমর স্বপ্ন ভারতের পুণ্য মৃত্তিকায় সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধ হইবে। ভারতের বিধিনির্দ্দিষ্ট মহানেতা আসিয়া বস্তুতন্ত্র জীবনে যে নূতন মুক্তিসংগ্রামের সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে আর কি ব্যষ্টিগত, কি সমষ্টিগত দেবজীবন লাভের স্বপ্ন আজ আর আদর্শ মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশ্বের ইতিহাসে ভারতের সাধনা স্তরে স্তরে নব নব অধ্যায় রচনা করিয়া চলিয়াছে, ইহা যে প্রত্যক্ষ সত্য।

বিজ্ঞান যে শুধু জড়বাদ নয়, আচার্য্যের জীবন ও আবিষ্কার তাহার জাগ্রত সাক্ষ্য দান করিতেছে! আচার্য্য স্বয়ং অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী। কোন্ অজানা লোক হইতে আদেশ ও অনুপ্রেরণা পাইয়াই তাঁহার জীবনসাধনার সূত্রপাত, ইহার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও বিবরণ তাঁহার বাণী ও লেখার মধ্য দিয়াই স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধ নহেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষার সাহায্যে নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত যে মহাসত্য তাহাকে লাভ করিতে হইলে বিশ্বাসই একমাত্র উপায়। তাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"কেবল মাত্র বিশ্বাসের বলেই আমি চলিয়াছি।" সারা জীবনের পরীক্ষিত সত্যের দৃঢ় ভূমিকায় দাঁড়াইয়াই তিনি বলিতে

পারেন—"যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর তাহা কেবল বিশ্বাসের বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটী ঘটনার দ্বারা হয় না; তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। ……একটী মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা সমগ্র বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

ভবিষ্যতের তরুণকে তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জীবনের আদর্শ দেখাইয়া উপদেশ দিয়াছেন—"মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনও উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।" দেশসেবকের উন্মার্গ দৃষ্টি ঘরে ফিরাইতে তিনি আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া কহিয়াছেন—"তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে, সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে—পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট রোগে শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়! অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।" তিনি দেশকে অমরমন্ত্র শিখাইতে চাহিয়াছেন—"ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তার ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।"

তীব্র কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—"দ্যূত-ক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন, পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না! হয় জয় কিম্বা পরাজয়!"

বিধাতাকে ধন্যবাদ—তাঁহার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে জাগ্রত ভারত আজ কটিবন্ধন করিয়া অগ্নিময় কর্ম্মক্ষেত্রেই আগুয়ান হইয়াছে – এবার জীবন দিয়াই অগ্নি-পরীক্ষায় হয় উত্তীর্ণ হইয়া আসিবে, নতুবা মৃত্যুকেই বরণ করিবে। হে আচার্য্যদেব! তুমি তো কাজের কষ্টিপাথরেই দেশের শক্তিকে মাপিয়া



মায়াপুরী—দার্জ্জিলিঙ

দেখিতে চাহিয়াছ। সে দেশের কি সাড়া পাও নাই? তাই তোমার জীবনসন্ধ্যায় আজ মহাভারতের নব সূর্য্যোদয় দেখিয়াই বুঝি এতখানি উল্লাসিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ—দেখিয়া আসিলাম। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? অর্ব্বাচীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয়। বিশ্বের বিজ্ঞানময় মহাক্ষেত্রে "বেদ-উপনিষদ্-রচয়িতার বংশধর" হে ভারতীয় সিদ্ধসাধক, তুমি জড়ে, প্রাণে, মনে একই মহাসত্যের সাক্ষাৎকার করিয়া পদার্থবিদ্যা,

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও মনোবিদ্যা এককেন্দ্রে সম্মিলিত ও জ্ঞানের যে মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহার ধারা-রক্ষার কি আয়োজন করিয়া গেলে? কলিকাতা মহানগরীর বুকে তোমার চিন্তার বিজয় যে মর্ম্মরমূর্ত্তির মধ্য দিয়া স্বপ্নকে বাস্তব, অদৃষ্টকে দৃশ্যরূপে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্র তাহার চিহ্ন—তাহার মূলে, কক্ষে কক্ষে, ভিত্তিগাত্রে, দেওয়ালের প্রতি প্রস্তরখণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম দেওয়ারই প্রেরণা আগুনের ন্যায় ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করিতেছে, যেন বলিতেছে—

"দাও শুধু ফিরে নাহি চাও
স্বার্থহীন প্রেমই সম্বল—"

শুধু বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য আমাদের জীবন—জ্ঞানেরও হৃদয়ে এত শ্রম, এত প্রেম, এত করুণা, এতখানি নিবিড় উচ্ছল বিশ্বাসের মহাস্বপ্ন উৎসরূপে সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছিলে, আগে তো তাহা জানিতাম না। তাই ঐ অর্দ্ধ আমলক মাত্র অর্ঘ্য হস্তে ভবিষ্যতের কোন চিন্তাসম্রাটের আগমনপ্রতীক্ষায় মহামন্দিরের শূন্যাসন পাতিয়া রাখিলে, তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন অবসন্ন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন শুধু তোমারই শুভ্রসৌম্য জ্ঞানদীপ্ত ঋষি-মূর্ত্তিই ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিয়া আলোর রেখার ন্যায় আমাকে এই সান্ত্বনাটুকুই যোগাইয়া আশায় উদ্বুদ্ধ করিল—

"তুমি আসিবে আবার,
তুমি আসিবে আবার,
নব যুগে হয়ে পুনঃ নব অবতার।"

জীবন সাঁঝে

[শেখ ইস্‌মাইল হোসেন]

কাজ্‌লা মেঘের বাদ্‌লা হাওয়ায় তুলে দিয়ে পাল,
ভাবুক নেয়ে যাচ্ছিস গেয়ে তরীটি সামাল।
উজন জলে দিচ্ছিস পাড়ি,
পারে যাবি তাড়াতাড়ি;
ডুব্‌লো বেলা শেষের খেলা ফুরিয়ে গেল কাল।

জীবন ভ'রে বেচা-কেনার লাভ-লোকসানের পালা,
ঠিক করে নে সময় থাক্‌তে যুচাস যদি জ্বালা।
সের, ছটাক, পোয়াগুলি,
নেরে সবায় যত্নে তুলি;
এবার মহাজনের মালের হিসাব দেওয়ার এল পালা।

তোর রতি, মাষা, কম বেশীর পাকা, কাচার মাপ,
পড়্‌বে ধরা তাঁর নিকৃতিতে থাকে যদি পাপ।
কষ্টিপাথর কস্‌বে সোণা,
গিনি, কামি যাবে চেনা;
টুটিয়ে যাবে ধর্ম্মের বাঁধন লাগ্‌লে পাপের তাপ।



কংগ্রেস প্রসঙ্গ

পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত

কংগ্রেস আজ জাতির রাষ্ট্রীয় সাধনার প্রকৃত কেন্দ্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও কর্ণেল অলকট প্রবর্ত্তিত থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রভাবানুপ্রাণিত মিঃ হিউম প্রমুখ ভারতহিতৈষী ইংরাজ বন্ধুর উদ্যোগে ও তদানীন্তন ভারত-প্রতিনিধি লর্ড ডফরিণের অনুগ্রহদৃষ্টিলাভে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মিলিয়া বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার প্রবর্ত্তন করেন, তখন বাংলার সুরেন্দ্রনাথকে "রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের ভয়ানক ছেলে' ("Enfant terrible" in Indian politics") বলিয়া সে মহাসভায় পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয় নাই। সে দিন কংগ্রেস এক প্রকার রাজনৈতিক ছেলেখেলা করিবার জন্যই জন্মলাভ করিয়াছিল। রাজনীতির ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারতের ছায়াপুরুষগণ বৃটনের দুয়ারে বর্ষে বর্ষে আবেদন নিবেদন ও কখন কখনও প্রতিবাদমূলক বাক্যের ঝুলি (Pray, Please and Protest) লইয়া উপযাচকের বেশে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু ইংরাজগুরুর এই মন্ত্রশিষ্যমণ্ডলী তখনও জানিতেন না, এই রাজনীতির অভিনয় ক্রমে কতখানি খাঁটি সত্যময় হইয়া উঠিবে ও রূপান্তর পরিগ্রহ করিবে। লর্ড ডফরিণ এই সম্ভাবনীয়তার বিষয় দূরদৃষ্টি-বলে অচিরেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অনুগ্রহের শিশু যাহাকে "His Majesty's permanent opposition" এই সাধের নাম দিয়া তিনি প্রথমে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহাকেই দুই তিন বৎসরের মধ্যে "অনির্দ্দেশ্যের যাত্রী" (A jump into the unknown) ও "ভারতের কণিকা পরিমাণ নগণ্য সম্প্রদায়ে'র (A microscopic minority of the Indian people) কীর্ত্তি মাত্র বলিয়া উপেক্ষার বস্তুরূপে পরিগণ্য করিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে মিঃ হিউমের প্রস্তাবে সুরেন্দ্রনাথকে সদলবলে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু সেদিন মুসলমান নেতা সৈয়দ আহ্মেদ সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু হইয়াও মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগদান করিতে দেন নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রভাবে "Patriotic Association"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ তৃতীয় কংগ্রেসে মিঃ তায়াবজীকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই মাদ্রাজ কংগ্রেসেই বরিশাল নেতা অশ্বিনীকুমার ৪৫০০০ লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া (ইহার মধ্যে কৃষক শ্রেণীর লোকও ছিল) বিরাট আবেদনপত্রে ভারতশাসন-পরিষদের সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসে গণশক্তি স্পর্শের ইহাই প্রাথমিক সূচনা মাত্র। ইহা আগুন লইয়া খেলা—তাই গবর্ণর স্যার অকল্যাণ্ড

কর্জন কংগ্রেসের বিপজ্জনক গতির বিরুদ্ধে তখনই তীব্র কণ্ঠে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন। কংগ্রেস-নেতৃগণ তদবধি শ্রেয়ঃ-বোধে এই আগুন লইয়া খেলা হইতে নিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষে, স্যার অকল্যাণ্ডের শাসনক্ষেত্র এলাহাবাদেই স্যার জর্জ্জ উলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পঞ্চম কংগ্রেস হয় বোম্বাই সহরে—মিঃ চার্লস ব্র্যাডলফ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা সভাপতি হন। এই বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ কংগ্রেসে না যোগদান করে, এই নিষেধবার্ত্তা প্রচার করেন। কংগ্রেসও এইরূপ প্রতিরোধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে প্রচারকার্য্যের উপর অধিকতর ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেন। রাজনীতির শান্তিময় কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে ঘোরতর সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ১৮৯৭ খৃঃ পুণায় প্লেগ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তদুপলক্ষে জনমণ্ডলীর উত্তেজনার ফলে দুইজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী ও দেশীয় গোয়েন্দা পুলিশ গুপ্ত ভাবে নিহত হন এই সময়ে মহারাণীর মর্ম্মরমূর্ত্তিও বিধ্বস্ত হয় লোকমান্য তিলক ও অন্য দুইজন সংবাদপত্র-সম্পাদক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হন। সেক্রেটারী-অফ্-ষ্টেট লর্ড হ্যামিল্টন প্যার্ল্যামেণ্টে গভীর কণ্ঠে ব্যক্ত করেন—যে ভারতে ইংরাজ বারুদের গাদার উপরে বাস করিতেছেন। গান্ধীজি ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ কংগ্রেস এই বিষয়ে প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন।

তাহার পর, লর্ড কার্জ্জন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি হইয়া আসিলেন। তাঁহার সুগভীর ভেদনীতি ভারতের ভাগ্যে শাপে বর হইল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে যুগান্তরকরী ঘটনা। অখণ্ড বঙ্গ অভিনব ভাব ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল—অভিনব শক্তি-সাধনার সন্ধান পাইল। বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিমন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ও উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন-চন্দ্র ও অরবিন্দের মধ্য দিয়া যে কলগর্জ্জন তুলিল তাহাই নূতন বাংলাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিল। "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ"—একটা সবল, স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠ নবীন জাতীয় বোধ ও নূতন কর্ম্ম-প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়ায় কংগ্রেসের আজন্মবর্দ্ধিত ভিক্ষামূলক রাষ্ট্রনীতির সহিত নূতনের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বাংলার এই নবজাগরণের ইতিহাস জাতির নূতন জীবনবেদের ন্যায় শত শত পৃষ্ঠায় বলিয়া ফুরাইবার নহে। স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় দমননীতির প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা নামাইয়া আনিল। রুদ্রের প্রলয়-নৃত্যে সারা বাংলা টলমল করিয়া উঠিল। বারাণসীধামে একবিংশ কংগ্রেসে মিঃ গোখেলের সভানেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ ও দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং বাংলার প্রবর্ত্তিত ব্রিটিশ-পণ্য বর্জ্জননীতি সমর্থন করা হইল। লালা লাজপত বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রসাধনার যুগপ্রবর্ত্তকরূপে অভিনন্দন করিলেন; কিন্তু তিলক ও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাংলার চতুরঙ্গ সংগ্রাম-নীতি কংগ্রেসকে পরিগ্রহণ করাইতে পারিলেন না। দ্বাবিংশ অধিবেশনে ভারতের মহাস্থবির রাষ্ট্র-ধুরন্ধর দাদাভাই নৌরজী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"স্বরাজই কংগ্রেসের আদর্শ।" তাই এই অধিবেশন "স্বরাজ-কংগ্রেস" নামে প্রসিদ্ধ। সুরাটের দক্ষযজ্ঞে, মৃদুপন্থী ও চরমপন্থী বিভক্ত হইয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ নাগপুরে স্বতন্ত্র কন্‌ফারেন্স আহ্বান পূর্ব্বক জাতীয় দল গঠন করিলেন। মৃদুপন্থী-

নেতৃচালিত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মাত্র ২৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইল। মহামতি গোখ্‌লে দক্ষিণ আফ্রিকার "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" নীতির সমর্থন করিলেন। পর বৎসর বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল—দিল্লীর রাজদরবারে স্বয়ং সম্রাট্‌ নির্দ্দিষ্ট বিধান অনির্দ্দিষ্ট (Settled fact unsettled) করিয়া লোকপক্ষের জয় স্বীকার করিলেন। পরবৎসর, মোস্লেম-লীগ "স্বায়ত্ত-শাসন" প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খৃঃ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। গান্ধীজী ইংলণ্ডের বিপৎকালে ভারতকে মিত্রপক্ষের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এই বৎসর মিসেস্‌ বেসান্ত কংগ্রেসে যোগদান করেন। ৩০শ অধিবেশনের সভাপতি স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (ভবিষ্যতে লর্ড সিংহ) গভর্ণমেণ্টকে ভারত সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট নীতির ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৯১৬ খৃঃ ভারত ব্যবস্থাপরিষদের ১৯ জন ভারত- সভ্য শাসন-সংস্কারের দাবী পেশ করিয়া এই অনুরোধকে আরও দৃঢ় করিলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রবীণে ও নবীনে আবার মিলন হইল। মোস্লেমলীগও আসিয়া কংগ্রেসের পার্শ্বে হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯১৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে ভারত সম্বন্ধে বিখ্যাত নীতি পার্লামেণ্টে ঘোষিত হয়। এই বৎসরেই মাদ্রাজে হোমরুল-লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবৎসর, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ও রাউলাট রিপোর্ট যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া ভারতের রাষ্ট্রজীবনে হর্ষ-বিষাদের সঞ্চার করিল। দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মালব্য মার্কিণ রাষ্ট্রপতি উইলসনের ১৪শ নীতির অনুসরণে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন দাবী স্পষ্টতর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। রাউলাট রিপোর্ট সম্বন্ধেও আতঙ্ক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়া, আবার মৃদুপন্থীগণ কংগ্রেসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। হোমরুল-লীগের পক্ষ হইতে স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার এই সময়ে মার্কিণ রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করেন। হোমরুল-লীগের সভ্যসংখ্যা এ সময়ে দাঁড়াইয়াছিল—৩,৪০,০০০। অতঃপর, কুখ্যাত রাউলাট বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয়। সমগ্র দেশে প্রতিবাদের সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই মহাত্মা গান্ধী ভারতে আসিয়া সবরমতী-তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও আপনাকে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের জন্যই প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ, রাউলাট বিলের প্রতিবাদ স্বরূপ ভারতের পক্ষ হইতে মহাত্মা সত্যাগ্রহ মন্ত্র ঘোষণা করিলেন। বিদ্যুতের ন্যায় এই নূতন মন্ত্র সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল ৩০শে মার্চ্চ প্রথম হরতাল ঘোষিত হয় ও ৬ই এপ্রেল অখণ্ড ভারতে উপবাস ও প্রার্থনা সম্পন্ন হয়। বাংলার জাগরণ এইভাবেই ব্যাপকভাবে সারা ভারতের বুকে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস উৎপীড়নের রক্ত-স্রোতঃ ছুটিল, তাহাই ভারতে নবযুগের সূচনা। কবি রবীন্দ্রনাথও পঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বীয় উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়া জাতির মর্ম্মবেদনায় ভাষা দিয়া এই নব-যজ্ঞের উদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসেও মিঃ মণ্টেগুকে শাসন-সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু এই বৎসরেই খলিফৎ ও পঞ্জাব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের অন্তরপ্রেরণায়

উদ্বুদ্ধ মহাত্মা তাঁহার অহিংস-অসহযোগ-নীতির উত্থাপন করেন। সারা ভারত উত্তেজিত কণ্ঠে মহাত্মার এই যুগান্তকারী নীতির অনুমোদন করেন।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে, মহাত্মার নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান সংযুক্ত হৃদয়ে অহিংস অসহযোগ-নীতি রাষ্ট্রীয় সাধনার ব্রহ্মাস্ত্ররূপে বরণ করিয়া, কংগ্রেসের জীবনস্রোতের সঙ্গে ভারতের জীবনস্রোতঃ একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। পর বৎসর নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের স্বরাজ-লক্ষ্য ও সাধন অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিয়া কংগ্রেসকে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লওয়া হইল।

ভারতের অস্ত্রক্ষেপে গবর্ণমেণ্ট রুদ্র নীতি প্রচণ্ডতর মূর্ত্তি লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ একে একে প্রায় সকলেই অবরুদ্ধ হইলেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বাহ্ণেই সপরিবারে বন্দী হইলেন। সমগ্র দেশ উদ্বেলিত হৃদয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মিঃ মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এই কংগ্রেসে পরিত্যক্ত হয়।

বারদোলীর রণযাত্রা সহসা স্থগিত হইল। চৌরীচোরার রক্তময় দুর্ঘটনাই ইহার উপলক্ষ কারণ। কিন্তু সত্যই দেশ তখনও প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। অগ্রগামী দল মহাত্মার ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তিতা আশঙ্কা করিয়া উৎক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। এদিকে উৎপীড়ন-নীতি রুদ্ধ রহিল না। সহসা মহাত্মা বন্দী হইলেন ও মিঃ মণ্টেগু সমকালেই পদত্যাগ করিলেন। গয়া কংগ্রেসে কারামুক্ত দেশবন্ধুর সভানেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় মহাত্মার অসহযোগ-নীতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বরাজ্যদল গঠিত হইল। কাউন্সিলের মধ্যেও অসহযোগ সংগ্রাম পরিচালন করিয়া, ত্রিবিধ বর্জ্জননীতি সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দলাদলি কোন রকমে এড়াইয়া কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতি মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠন-পন্থী ও স্বরাজ্যদল উভয়ে কংগ্রেসের কাজ ভাগাভাগি করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯২৪ খৃঃ মহাত্মাজী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে, আকালী সংগ্রামে মহাত্মার ভাবই ভারতের হৃদয়াগ্নিরূপে প্রধূমিত হইতেছিল। মহাত্মার বহিরাগমনে, নেতৃবৃন্দ আবার সম্মিলিত হইয়া বিখ্যাত "স্বরাজ প্যাক্ট" প্রতিষ্ঠা করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেম। স্বরাজ্যদলের সংগ্রামনীতি বহুক্ষেত্রে—বিশেষ বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে অনেকখানি সাফল্যমণ্ডিত হইল। ৪১শ কংগ্রেসে এই মিলন নীতি আরও সুদৃঢ় হইল

১৯২৭ খৃঃ সাইমন কমিশন ঘোষিত হইল। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী, স্বরাজী ও খাঁটি অসহযোগী—সকলে অখণ্ড হৃদয়ে এই কমিশনের বিরুদ্ধ অভিযানে উদ্যত হইলেন। মাদ্রাজে ৪২শ অধিবেশনে কংগ্রেস স্বাধীনতা লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে সর্ব্বদল-সম্মিলনে "নেহেরু রিপোর্ট" সমর্থিত হয় ও গবর্ণমেণ্টকে ইহার প্রস্তাবানুযায়ী এক বৎসরের মধ্যে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" দিবার জন্য সময় দেওয়া হয়। তরুণদলের আগ্রহাতিশয্যে মহাত্মাজী প্রতিশ্রুতি দিলেন—"৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে সদুত্তর না পাইলে, আমি পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী হইব।"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মহাত্মা ঘড়ির কাঁটার ন্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ১৯৩০ খৃঃ ১লা জানুয়ারী কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি জহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সমুদয় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মভার অর্পণ

করিয়া, মহাত্মা পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের মহামন্ত্র সাধনে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

৪ঠা মার্চ্চের তাঁহার সন্ধি-পত্র প্রত্যাখ্যাত হইলে, ১২ই মার্চ্চ তিনি জগতের চিরস্মরণীয় লবণ-সংগ্রামে জয়যাত্রা করিলেন। বিংশ শতাব্দীর এই নূতন রামায়ণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে চিত্রিত।

ভারত-সংগ্রামে সন্ধি-পর্ব্ব

এইরূপে দীর্ঘ এক বৎসর হইল, ভারতব্যাপী কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অভিনব ধর্ম্মযুদ্ধ সূচিত হয়, গত ২০শে ফাল্গুন বুধবার (৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩১ ইং) অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময়ে সেই বিরাট্ মহাসমরের প্রথম অঙ্কে যবনিকাপাত হইয়াছে। একদিকে ভারতের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া, অন্য পক্ষে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিরূপে লর্ড আরউইন এই সাময়িক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমরানল অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও নির্ব্বাপন করিলেন। জগতের ইতিহাসে এ অপূর্ব্ব ঘটনার সত্য সত্যই তুলনা নাই, নিদর্শন নাই। একটী তপস্বীর বিদ্যুন্ময় আত্মদানে সারা ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে যে তেজোবীর্য্যের আগুন, যে অপার্থিব আত্মাহুতির প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও যেমন অভিনব, অপূর্ব্ব ঘটনা, তেমনি সেই তপস্যার মূর্ত্ত লক্ষণ অপ্রত্যাশিত বিজয়গৌরবে মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর চক্ষে এই হিংসাহীন বিপ্লবের অজ্ঞাতপূর্ব্ব সিদ্ধি ও সম্ভাবনীয়তা এক মুহূর্ত্তে ফুটাইয়া তোলায় নিগৃহীত, প্রপীড়িত, অবনত মানবজাতি যে দেশে, যেখানে ব্যথায় নাভিশ্বাস শ্বসিতেছিল, আজ সকলেরই হৃদয়ে নূতন আশা, নূতন উল্লাসের সঞ্চার হইল। এ একটা নূতন নির্দ্দেশ, মুক্তি-সাধনায় অভিনব সংগ্রাম নীতি ও সিদ্ধ-প্রণালী—মানবজাতির এ এক নূতন দীক্ষা। মহামানবের দীক্ষাগুরু মহাত্মা গান্ধীকে তাই আজ আমরা শ্রদ্ধানত হৃদয়ে অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

এই অলোকসামান্যচরিত্র মহাতপাঃ ঋষি-নেতার সিদ্ধ অঙ্গুলীচালনে পর্ব্বে পর্ব্বে যে নূতন মহাভারত চক্ষের সম্মুখে রচিয়া উঠিল, তাহার প্রত্যেক চিত্র স্মৃতিপটে গৌরবের আলেখ্যরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অভিনব সংগ্রামের পরিকল্পনায় ও অনুষ্ঠানে স্তরে স্তরে যেমন তাঁহার অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও সর্ব্বব্যাপী তাপস প্রভাব অলঙ্ঘনীয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছিল, তেমনি এই সন্ধিবার্ত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র-দূতরূপে তাঁহার গভীর সংযম, মহানুভবতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়েও বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছে। এই লোকবিশ্রুত সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুবাদ আমরা "প্রবর্ত্তকে"র বুকে জাতীয় ইতিহাসের স্মরণীয় পর্য্যায় রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম :—

মহাত্মা-আরউইন সন্ধিপত্র

সন্ধি-পত্র রচনা শেষ হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে :—

গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা

"সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য সপারিষদ্ গবর্ণর জেনারেল জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

(১) বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে স্থির হইয়াছে; যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হইবে এবং

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি কার্য্য করিবেন।

(২) ভারতের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যে সমস্যা উঠিয়াছে তৎসম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে এই বলা যাইতেছে, যে ভবিষ্যতের আলোচনার বিষয় হইবে—গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত রাষ্ট্ররূপ সম্পর্কে অধিকতর বিবেচনা করা।

বৈঠকে যে রাষ্ট্ররূপ মোটামুটি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সংযুক্ত রাষ্ট্র একটী প্রয়োজনীয় বিষয়—ভারতবাসীর হস্তে কর্ত্তৃত্ব প্রদান এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, ভারতের আর্থিক সঙ্গতি এবং ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি বিষয়ে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা —এই দুইটী বিষয়ও অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুসারে শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নের ভাবী আলোচনার সময়ে যাহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন, তাহার উদ্দেশ্যে বিহিত ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলী সম্পর্কেই এই বন্দোবস্ত করা হইল।

(৫) আইন অমান্য:আন্দোলন কার্য্যতঃ বন্ধ করা হইবে এবং গভর্ণমেণ্টও তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। কার্য্যতঃ আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার অর্থ এই, যে আইন আমান্যের সহায়ক কার্য্যাবলী—তাহা যে কোন উপায়েই সম্পাদিত হউক না কেন—তৎসমস্তই বন্ধ করিতে হইবে। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির কথা মনে রাখিতে হইবে—

(ক) সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন আইনের কোন বিধান অমান্য করা চলিবে না।

(খ) ভূমি-রাজস্ব এবং অন্যান্য আইনসঙ্গত দেয় কর বন্ধের আন্দোলন বন্ধ করিতে হইবে।

(গ) আইন অমান্য আন্দোলনের :সমর্থনে কোন প্রকার অননুমোদিত সংবাদপত্র কিম্বা ইস্তাহার বাহির করা যাইবে না।

(৪) সামরিক ও বে-সামরিক সরকারী কর্ম্মচারী এবং গ্রাম্য কর্ম্মচারিগণকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যাইবে না, কিম্বা তাহাদিগের পদত্যাগের জন্য প্ররোচনা দেওয়া চলিবে না।

(৫) বিদেশী পণ্য বর্জ্জন সম্পর্কে বক্তব্য এই, যে ইহার মধ্যে দুইটী কথা আছে। যথা :—

(ক) বয়কটের প্রকৃতি এবং

(খ) তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য অবলম্বিত পদ্ধতি।

এই সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বক্তব্য এই, যে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট ইহা অনুমোদন করেন। এই উদ্দেশ্যে যেটুকু উৎসাহ, প্রচারকার্য্য ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়, তাহাতে যদি শান্তি ও শৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন না ঘটে এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যে অ-ভারতীয় পণ্য (বিদেশী পণ্য) বর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহা সকল দিক্ দিয়া না হইলেও প্রধানতঃ বৃটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই এই বৃটিশ বয়কট অবলম্বিত হইয়াছে।

বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের রাষ্ট্ররূপ সম্পর্কে বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণের মধ্যে সরলভাবে ও বন্ধুভাবে যে আলোচনার কথা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উপরোক্ত প্রকারের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বয়কট প্রচার করা কংগ্রেসের পক্ষে শোভনীয় নহে।

অতএব স্থির হইয়াছে, যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার অর্থই নির্দ্দিষ্টরূপে বৃটিশ পণ্য বয়কট পরিত্যাগ করা। অতঃপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আর এই বৃটিশ পণ্য বয়কট করা চলিবে না। ফলে যাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সময়ে বৃটিশ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে দিতে হইবে; অতঃপর তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং তাহাতে কোনই বাধা দেওয়া চলিবে না।

(৬) ভারতীয় দ্রব্য (বিদেশী দ্রব্য) পরিহারের জন্য এবং মাদক দ্রব্য ও মদ্য নিবারণের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কথা এই, যে এমন কোন কাজ করা চলিবে না – যাহা 'পিকেটিং'-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়িতে পারে। তবে দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন-অনুমোদিত উপায়ে পিকেটিং করা চলিবে। এই পিকেটিং কিছুতেই আক্রমণমূলক, বিরক্তির উৎপাদক কিম্বা ভীতিজনক হইতে পারিবে না; অধিকন্তু ইহাতে বাধা প্রদান, অত্যাচার, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সর্ব্বসাধারণের কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন—ইত্যাদি কিছুই থাকিতে পারে না। উপরোক্ত কোনও উপায়ে যদি কোথাও পিকেটিং চলে, তাহা হইলে তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(৭) পুলিশের আচরণ সম্পর্কে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি জানাইয়াছেন, যে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান অবস্থায় এই পন্থা অবলম্বন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট প্রবল অন্তরায় দেখিতেছেন এবং মনে করিতেছেন, যে ইহাতে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত হইলে এবং শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন হইবে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী রাজী হইয়াছেন, তিনি এই বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি করিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য

(৮) আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হইলে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন, তাহার বিবরণ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হইল:—

(৯) আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহা রহিত করা হইবে। ১৯৩১ সালের ১নং অর্ডিন্যান্সটি বিপ্লববাদ-মূলক অপরাধ সম্পর্কে জারী করা হইয়াছিল; সুতরাং ইহা প্রত্যাহার করা হইবে না।

(১০) ১৯০৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধিত বিধান অনুসারে সভাসমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল নোটীশ প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি যদি আইন অমান্য সম্পর্কে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎসমস্ত নোটীশই প্রত্যাহার করা হইবে। তবে সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধিত বিধান অনুসারে যে নোটীশ জারী করিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(১১) (ক) যে সমস্ত মামলার শুনানী চলিতেছে, তাহাদের অভিযোগ যদি আইন-অমান্য

সম্পর্কিত হয় এবং হিংসামূলক অপরাধ কিম্বা হিংসামূলক অপরাধের প্ররোচনাদায়ক না হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইবে। হিংসামূলক অপরাধ সম্পর্কে কথা এই, যে কেবল আইন অনুসারে যাহা হিংসামূলক, কিন্তু কার্য্যতঃ হিংসামূলক নয়—তাহা এক্ষেত্রে হিংসামূলক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

(খ) ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে সদ্ভাবে থাকিবার জন্য জামিন মুচলেকা চাহিয়া যে সকল মামলা রুজু করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করা হইবে।

(গ) আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে আইন ব্যবসায়িদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন কিম্বা অপর আদালতে মামলা রুজু করিয়াছেন। এই সমস্ত আইনব্যবসায়ীর আচরণ যদি হিংসামূলক অথবা হিংসার প্ররোচনামূলক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত আবেদন ও মামলা ইত্যাদি প্রত্যাহার করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে পুনরায় দরখাস্ত করিবেন।

(ঘ) সৈন্য অথবা পুলিশের বিরুদ্ধে উপরস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করার জন্য যদি কোন মামলা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইবে না।

বন্দীদের মুক্তি

(১২) (ক) হিংসামূলক অপরাধে অথবা হিংসার প্ররোচনা দান সম্পর্কিত অপরাধে যাঁহারা অপরাধী নহেন, সেই সমস্ত আইন অমান্যকারী কারাদণ্ডিত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে, হিংসামূলক অপরাধ বলিতে এস্থলে কেবল আইন অনুসারে হিংসামূলক অপরাধ হইলেই চলিবে না, কার্য্যতঃ হিংসামূলক অপরাধ হওয়া চাই।

(খ) উপরোক্ত "ক" ব্যবস্থার মধ্যে উল্লিখিত কয়েদীগণের মধ্যে কেহ যদি আবকারী সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং অপর কোন হিংসামূলক অপরাধ তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কারাসংক্রান্ত আইন অমান্যের জন্য যদি কাহারও বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন থাকে, তবে সেই মামলাও প্রত্যাহার করা হইবে।

(গ) সামান্য কয়েকটী স্থলে পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কিন্তু মুক্তি দেওয়া হইবে না।

জরিমানা ও মুচলেকা

(১৩) যে জরিমানা আদায় করা হয় নাই, তাহা মকুব করা হইবে। জামিন মুচলেকা—বাজেয়াপ্তের নোটীশ দেওয়ার পর যদি এপর্য্যন্ত তাহা আদায় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও রেহাই দেওয়া হইবে; কিন্তু যে জরিমানা এবং যে জামিন মুচলেকার টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে তাহা আর ফেরত দেওয়া হইবে না।

(১৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যদি কোনও স্থলে অধিবাসিদের নিকট হইতে গৃহীত ব্যয়ে পিউনিটিভ পুলিশ মোতায়েন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পুলিশ উঠাইয়া লওয়া হইবে। এই সম্পর্কে যে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃত ব্যয় বাদ দিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা ফেরত দিবেন না। তবে পিউনিটিভ ট্যাক্স যদি অনাদায়ী কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা রেহাই দেওয়া হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি ফেরত

(১৫ ক) যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি রাখা বে-আইনী নহে, তাহা যদি আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে অর্ডিন্যান্সে বা অন্য আইন বলে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে (যদি তাহা সরকারের নিকট থাকে।)

(খ) ভূমি-রাজস্ব বা অন্য কোন দাবীর জন্য যদি কোন অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করা হইয়া থাকে, তবে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে; কিন্তু যদি জিলার কলেক্টর মনে করেন, যে প্রজা জিদ করিয়া উপযুক্ত সময়ের মধ্যে খাজনা দিবে না, তবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে বিবেচনার সময়ে কলেক্টর দেখিবেন, প্রজা খাজানা দিতে সত্যই ইচ্ছুক কি না এবং সেজন্য সময় চায় কি না। প্রয়োজন হইলে, কলেক্টর খাজনা মাপ করিয়া দিতে পারেন।

(গ) কোন জিনিষ নষ্ট বা খারাপ হইয়া গিয়া থাকিলে সেজন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

বিক্রয় বা হস্তান্তর

(ঘ) যেখানে সরকার অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন, সেখানে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করা হইবে না। বিক্রয়লব্ধ টাকা দেওয়া হইবে না। তবে যদি আইনতঃ প্রাপ্য টাকার অধিক দামে উহা বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(ঙ) যদি ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করার কার্য্য বে-আইনী বলিয়া মনে হয়, তবে যে কোন লোক সে বিষয়ে আদালতে নালিশ করিয়া তাহার জন্য বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

৯নং অর্ডিন্যান্সের ফল

(১৬ ক)—১৯৩০ সালের ৯নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে।

(খ) খাজনা বা অন্য টাকার জন্য সরকার যে সকল জমি বা অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করিয়া দখল করিতেছেন, তাহা ফেরত দেওয়া হইবে; তবে জেলার কলেক্টর যদি মনে করেন, যে প্রজা জিদ করিয়া উপযুক্ত সময়ের মধ্যে খাজনা দিবে না, তবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে বিবেচনার সময়ে কলেক্টর দেখিবেন, প্রজা খাজানা দিতে সত্যই ইচ্ছুক কি না এবং সেজন্য সময় চায় কি না; প্রয়োজন হইলে, কলেক্টর খাজনা মাপ করিয়া দিতে পারেন।

(গ) যেখানে অস্থাবর সম্পত্তি অপর লোককে বিক্রয় করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে সরকার ঐ সকল বিষয়ে আর কিছু করিবেন না।

মহাত্মার উক্তিতে অসম্মতি

দ্রষ্টব্য :—মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানাইয়াছিলেন—তিনি জানেন, যে অনেক স্থানে বে-আইনী ও অন্যায়ভাবে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু বড়লাট ঐ উক্তি ঠিক বলিয়া মানিয়া লন নাই।

(১৭) যদি ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করার কার্য্য বে-আইনী বলিয়া মনে হয়, তবে যে কোন লোক সে বিষয়ে আদালতে নালিশ করিয়া তাহার জন্য বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

তদন্তের ব্যবস্থা

(১৮) সরকারের বিশ্বাস, যে খুব কম স্থানেই বে-আইনীভাবে খাজনা আদায় করা হইয়াছে। যদি কোন স্থানে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা প্রাদেশিক সরকারকে জানাইলেই তাঁহারা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্ত করিতে বলিবেন এবং কার্য্য বে-আইনী বলিয়া প্রমাণ হইলে, অবিলম্বে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

পদত্যাগ

(১৯) যে সকল স্থানে সরকারী কর্ম্মচারিদের পদত্যাগের পর শূন্য পদগুলি স্থায়ীভাবে পূর্ণ করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে সরকার পুরাতন লোকদিগকে পুনর্নিযুক্ত করিতে পারিবেন না—অন্য স্থানে পুরাতন লোক পুনর্নিয়োগ করা হইবে। সরকারী কর্ম্মচারী বা গ্রাম্য কর্ম্মচারী যিনিই আবেদন করুন না কেন, সরকার তাঁহার পুনর্নিয়োগের সময় কোনরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিবেন না।

লবণ আইন

(২০) সরকার লবণ আইন ভঙ্গের ব্যাপার উপেক্ষা করিবেন না এবং দেশের বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের সময় লবণ আইন পরিবর্ত্তন করিবেন না। তবে দরিদ্রলোকদিগকে সুবিধা-দানের জন্ত কোন কোন স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল স্থানে লবণ সংগ্রহ করা যায়, সেই সকল স্থানে ঘরে ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করা চলিবে এবং ঐ লবণ ঐ সকল গ্রামে বিক্রয় করা চলিবে, তবে ঐ এলাকার বাহিরে ঐ লবণ বিক্রয় করা চলিবে না।

(২১) যদি কংগ্রেস এই সন্ধির সর্ত্তমত কাজ না করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের রক্ষার জন্ত এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্ত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(স্বাঃ) এচ, ডবলিউ, এমার্সন,
ভারত সরকারের সেক্রেটারী।

পক্ষান্তরে, নিখিল-ভারত-রাষ্ট্র মহাসমিতি হইতে উক্ত সন্ধিপত্রের চুক্তি অনুসারে জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ মামুদ সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির নিকট অবিলম্বে তার করিয়া নিম্ন মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন :—

নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সমিতির ঘোষণা

"আইন অমান্ত আন্দোলন এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করিতে হইবে। শুধু ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জ্জন বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সমস্ত বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং করা চলিবে। ঐরূপ পিকেটিংএ কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি, ভীতি প্রদর্শন বা বাধা দেওয়া চলিবে না। যেখানে এই সব মানিয়া চলা হইবে না, সেখানে পিকেটিং বন্ধ করিতে হইবে।

বিদেশী পণ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী প্রচার করা চলিবে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা চলিবে না। যে সব অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় বা তৈয়ারী করা যায়, সেই সব অঞ্চলের লোকেরা লবণ সংগ্রহ করিতে বা তৈয়ারী করিতে পারিবে। সেই সব লবণ তাহারা ঘরে খাইতে পারিবে বা সেই অঞ্চলেই বিক্রয় করিতে পারিবে—বাহিরে বিক্রয় বা ব্যবসায় করিতে পারিবে না। বে-আইনী সংবাদ বন্ধ করিতে হইবে। করদাতৃগণকে রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। আর্থিক দুরবস্থা হইলে বা রাজস্ব দিতে অসমর্থ থাকিলে, রাজস্ব হ্রাস করিতে বা তাহা দেওয়া বন্ধ করিতে অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

বন্দীগণ যাঁহারা মুক্তি পাইবেন, তাঁহারা যাহাতে করাচী-কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে।"

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে—

"ভারত সরকারের সহিত কংগ্রেস পক্ষের মহাত্মা গান্ধীর সন্ধির যে সর্ত্ত স্থির হইয়াছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তাহা বিবেচনা করিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং সকল কংগ্রেস কমিটিকে তদনুসারে এখনই কাজ করিতে বলিয়াছেন। কমিটি আশা করেন, যে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্ধিতে যেরূপ বলা হইয়াছে, দেশবাসী তদনুরূপ কার্য্য করিবেন এবং মনে করেন, যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই সর্ত্তানুসারে কাজ করিলেই পূর্ণ স্বরাজের দিকে ভারত অগ্রসর হইবে।"

সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে তারযোগে এই খবর জানান হইয়াছে।

অর্ডিন্যান্স বাতিল

৬ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় (১) ১৯৩০ সালের বে-আইনী সমিতি অর্ডিন্যান্স (২) ১৯৩০ সালের ভারতীয় প্রেস ও সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স ও (৩) ১৯৩০ সালের বে-আইনী প্ররোচনা অর্ডিন্যান্স (২য়) বাতিল হইয়াছে।



প্রতিকার

— ১ —

এত দারিদ্র্য কল্পনা করা যায় না। ঘটকদের বৈঠকখানায় রবিবারের আড্ডা জমে। হরকান্ত চিরদিন যোগ দেয়, তাস পিটে, গানের সঙ্গে হারমোনিয়মের সুর দেয়, দরকার হইলে ঠেকা দিয়া বন্ধুদের মন রক্ষা করে; কিন্তু তার পেটে যে অর্দ্ধেক দিন ভাত পড়ে না, সে খোঁজ সেও কাহাকে জানায় না, অন্যেও খোঁজ রাখে না। আড্ডা যখন খুব জমিয়া উঠে, গানের লহর ছুটে, হরকান্ত তবলায় জোর চাটি দিয়া তেহাই দেয়, বাহবা পড়িয়া যায়; তারপর হরকান্ত যে সব দিকে ওস্তাদ, এই খাতির কথা কহিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া যায়। হরকান্তের স্বপ্ন ভাঙে; কিন্তু সে তবুও বিরস বদনে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে। ভবতোষ ঘটক তাহাকে বলে—"ভাব্‌ছ কি হে, আবার ও-বেলা এসো!" হরকান্ত চমকিয়া ভবতোষের মুখের দিকে চাহিয়া একবার মনে করে, কিছু চাহিয়া বসি; কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যায়, সে নীরবেই বাড়ী ফিরে।

বড় ভাই হরকান্তের বোঝা বহিতে রাজী নহে, সে পথ দেখিয়াছে। ছোট অবস্থা বুঝিয়া দেশান্তরী হইয়াছে। গত বছর সে হাফ্‌প্যান্ট ও খাটো কোট্‌ গায়ে একবার উপস্থিত হইয়াছিল। ভ্রাতৃবধূ হাসিয়া দেবরকে বসিতে আসন দিল। চারিদিক চাহিয়া সে বুঝিল, ইহাদের হাঁড়ী এখনও বাতাসেই নড়ে। হরকান্ত ভাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কর্‌ছিস্!" সে বলিল—"বায়স্কোপে কাজ করি।" হরকান্ত—"পাও কি!"

পেটের খোরাক আর দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া উপায় হয় অতিরক্ত। মুখের শ্রী দেখিয়া হরকান্ত বুঝিল—ভাইটা অধঃপাতে গিয়াছে; একবার বলিল, "বড়দার কাছে থাক্‌তে পারিস্ না!"

সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"এ বেশ আছি, দাদা, কারু মুখ নাড়া সইতে হয় না। তোমার অবস্থা তো আরও খারাপ দেখ্‌ছি।"

হরকান্ত নীরব রহিল। সম্মুখে বিষণ্ণমুখে ভ্রাতৃজায়া, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কাকার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মনে হইল—কি একটা ভীষণ চাপে তার হাড় যেন গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। পকেট হাতড়াইয়া দেখিল, গোটা কতক বিড়ি পড়িয়া আছে। তাহার মনে পড়িল, ম্যানেজারের কাছ থেকে যে বারটা পয়সা সে কাল রাত্রে চাহিয়া লইয়াছিল, তাহা একটা দমকা খরচায় বাহির হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার অনুশোচনা হইল, সে ছাই-ভস্ম একটু না খাইলে আজ বুভুক্ষু এই কয়টা ছেলে মেয়ের হাতে দু'টা করিয়া পয়সা দিতে পারিত। দুর্ভাগ্যের সংসারে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার ভাইপো ভাইঝির নিষ্ঠুর প্রতীক্ষা অস্বাভাবিক নহে। সে অড়সড় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর চরণে একটা করিয়া প্রণাম ঠুকিয়া বিদায় লইল। এ বাড়ীতে মানুষও আর পা

বাড়ায় না—ছোট ভাইকে দেখিয়া কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকিলেও, একটা আশার আলো যেন অন্তরে দেখা দিয়াছিল, হঠাৎ তাহা নিভিল—উঃ, সে কি ভীষণ অন্ধকার!

নারায়ণী মাথা নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল। স্বামীর দিকে সে চাহিতে ভরসা করিল না, কেবল চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল হরকান্ত ধমকিয়া উঠায়, সে নির্ব্বাক্ রহিল। বড় ছেলেটী দূরে গিয়া এক টুক্রা কাগজ কুড়াইয়া ঠোঁটের ডগায় রাখিয়া বংশীধ্বনি জুড়িয়া দিল, অন্তগুলি হরকান্তকে জড়াইয়া বলিল—"বাবা খিদে!"

হরকান্ত বলিল—"মেজ বৌ, আজকে একবার শীলেদের বাড়ী গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে এসো, রাত্রে একটা ব্যবস্থা কর্‌বোই।"

নারায়ণী উঠিল না। হরকান্ত ভাবিল, রাত্রের কাজটা এখনই সারিয়া আসি; শীলেদের বাড়ী হইতে কতবার চাওয়া যায়! সে বিনাবাক্যে বাড়ী হইতে বাহির হইল। নারায়ণী ধরায় ছিন্ন অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিল। ছেলেমেয়েগুলি অনর্থক আব্‌দারে বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল।

— ২ —

ভবতোষ হরকান্তের গলা পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। দক্ষিণ হস্ত মাথায় বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কি হে হঠাৎ ফিরলে যে! হরকান্ত তৈলের আঘ্রাণ পাইল। সৌগন্ধে চারিদিকে আমোদিত হইতেছিল। হরকান্ত মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না; ভবতোষ অনুমানে অবস্থা বুঝিয়া লইল, নিজেই বলিল—"আচ্ছা এখন থাক, এখন থাক, ওবেলা আবার আসছ তো! রাত্রে যতীন বাড়ুয্যে আস্‌ছে, বেশ টপ্পা গায় হে, রাত্রে এইখানেই—বুঝেছ!"

হরকান্তের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিল—"তেল মেখে বেশীক্ষণ থাকলে মাথা ধরে। রাত্রে এসো, তোমার হাত বড় মিষ্টি হরকান্ত, তোমার ঠেকা না হ'লে গান জম্‌বে না। হরকান্তের মুখে কথা বাহির হইয়াও অস্পষ্ট রহিল। ভবতোষের যেটুকু বুঝিতে বাকী ছিল তাহা সে বুঝিল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল—"আচ্ছা! আচ্ছা! সে ওবেলা দেখ্‌বো, স্নানটা সেরে নিই; আবার বুঝেছ—খেতে দেরী হ'লে, গৃহিণী একেবারে রণচণ্ডী!" ভবতোষ সনাৎ করিয়া দোর ভেজাইয়া প্রস্থান করিল।

হরকান্ত মেলাতলায় বায়স্কোপ কোম্পানীর তাঁবুর সম্মুখে গিয়া খোঁজ লইল—"রমাকান্ত কোথায়!" একজন লোক দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—"খুঁজে দেখুন না, মহাশয়! আপনার খেচম্ভ খাটতে তো আসি নি।"

তার মেজাজ্ দেখিয়া হরকান্ত কোন কথা বলিতে ভরসা করিল না। পার্শ্বে একটা ছোট তাঁবু পড়িয়াছিল, পরদা সরাইয়া উঁকি মারিল। লোকটা অধিকতর বিকৃতস্বরে বলিল—"ম্যানেজার! ম্যানেজার! কোথাকার অভদ্র লোক আপনি!"

হরকান্তের দৃষ্টিটুকু ব্যর্থ হয় নাই। বাহিরের লোকটী ধমক দিতেই সে সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে কি দেখিল—রমাকান্ত একজন হৃষ্টপুষ্ট বাবুর পা দুটা কোলে লইয়া তৈল মর্দ্দন করিতেছে। তাহার মাথা টলিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল "মেজদা!"

মনে হইল—তাহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিবে না কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—পেটের জালায় সে গোলামী করে, এমন গোলামী তাহার জুটিলেও সে আজ পশ্চাৎপদ নয়। তাহার চক্ষের সম্মুখে নারায়ণী ও ছেলেমেয়েদের শীর্ণ ক্ষুধাতুর ম্লান মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। রমাকান্তের দিকে চাহিয়া

বলিল "দেখ্‌তে এলুম ভাই, হঠাৎ চ'লে এলি কেন, এক বেলা কি থাকতে নেই!"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া ভায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে স্পষ্টই বুঝিল, এই উদ্দেশ্য লইয়া মেজদা' নিশ্চয় আসেন নাই; কিন্তু আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, সে ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না। রমাকান্ত বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরকান্ত বলিল—"যাও, তোমার মুনিব আবার রাগ করবে—তুমি বুঝি ভৃত্যের কাজ কর!"

রমাকান্ত কথার উত্তর দিল না। হরকান্ত বলিল—"লজ্জা কি ভাই, তোমার মুনিবকে ব'লে আমায় একটা চাকুরী দিতে পার—বেকার থাকার চেয়ে এ ভাল!"

রমাকান্ত বলিল—"মেজদা, আপনি তো আমার মত মূর্খ নন, আমি যে লেখাপড়ার ধার দিয়েও যাই নি, তাই তো উঞ্ছবৃত্তি নিয়ে দু'বেলা পেট ভরাই! এমন ঘৃণ্য কাজ কায়স্থের ছেলে কখন করে কি? আপনি অন্য চাকুরী দেখুন না!"

হরকান্ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। চাকুরী সবাই করে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে জুটে কৈ? সে যে কথা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা বুঝি আর বলা হয় না। শুধু হাতে বাড়ী ফেরার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। হরকান্ত বলিল—"কান্ত! একটা কাজ কর্‌বি!"

সে আগ্রহ করিয়া বলিল—"কি মেজদা!"

হরকান্ত—"আমায় গণ্ডা চ্যারেক পয়সা দিতে পারিস্‌!"

রমাকান্ত হাঁ করিয়া মেজ্‌দার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"উঃ, বড় শক্ত মেজ্‌দা! কাল বারটা পয়সা দিয়েছি, আজ চাইলে ঝাঁটা খেতে হবে।"



ম্যানেজার রমাকান্তকে এক পদাঘাত করিল

রমাকান্তের কণ্ঠদেশ বাহুর বন্ধনে জড়াইয়া হরকান্ত একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিল—"কান্ত, আমরা অনাহারে মরি, আজ দু'দিন পেটে ভাত নেই। তোর বৌদি বোধহয় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে—কি করি বল্‌ দেখি!"

রমাকান্তের চক্ষু ফাটিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল বাহির হইল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ

তাঁবুর বাহিরে ভুঁড়ি উঁচু করিয়া লুঙি পরিধানে ম্যানেজার বাবু আসিয়া দাঁড়াইল—বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "ছোঁড়া বড় হতভাগা তো! আবার কার সঙ্গে ইয়ারকী দেওয়া হচ্ছে, নচ্ছার, পাজী!" রমাকান্ত সহোদরের দিক্ হইতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইল। ম্যানেজার বাবু তাহাকে নিকটে পাইয়া এক পদাঘাত করিল। রমাকান্ত বিনাবাক্যে তাঁবুর ভিতর গিয়া ঢুকিল, বাবু কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতে দিতে তাহার অনুসরণ করিল। হরকান্ত মনে করিল, পৃথিবী কি তাহাকে মাটীর সহিত মিশাইয়া লইতে পারে না!

— ৩ —

"মেজ্‌দা!! মেজ্‌দা!!"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাহিরে রমাকান্তের ডাক শুনা গেল।

পেটের জ্বালায় নিদ্রা কাহারও ছিল না। নারায়ণী এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল, ছেলেগুলি অকারণ কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল; ধমক শুনিয়া তাহারা একবার থামে, আবার ককাইয়া কাঁদিয়া উঠে। হরকান্ত রমাকান্তকে দুয়ার খুলিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার প্যাণ্টের পকেট হইতে দশগণ্ডা পয়সা হরকান্তের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"দোহাই মেজদা, এই আমার প্রথম চুরি, ধরা প'ড়লে মার খেয়ে গতর যাবে। এমন কত লোক করে, আমার বড় ভয় চোর ব'লে না ধরা পড়ি! কালই আমরা চ'লে যাচ্ছি, হতভাগা ছোট ভাইয়ের অপরাধ নেবেন না।"

পয়সা কয় গণ্ডা হাত নিজের স্বভাবের দায়ে মুঠা করিয়া লইল, মন বলিল—ছিঃ ছিঃ! কিন্তু রমাকান্ত তখন চক্ষের বাহিরে। হরকান্তের সে রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল, এ পয়সা ফিরাইয়া দিতে যাওয়ায় কান্তের বিপদ আছে। ইচ্ছা হইল, সম্মুখের জলাশয়ে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু প্রভাতের আলোয় পত্নী ও পুত্র কন্যাদের যে মুখশ্রী দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বেলা হইলে দশগণ্ডা পয়সার চাউলাদি বাজার করিয়া নারায়ণীকে দিলে, তিন দিন পরে আজ হরকান্তের সংসারে সকলের এক বেলা পেট ভরিয়া অন্ন জুটিল।

তারপর! ভবতোষ কথা কানেই আনে না। বড়দাদা সূর্য্যকান্তকে বিনয় করিয়া পত্র দিল, উত্তর আসিল না। এই দরিদ্র পরিবার কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে, তাহার কোনই কূলকিনারা নাই। নারায়ণী ভাবে, পুরুষ মানুষ এমন অসহায় কেমন করিয়া হয়! এ কথা বহুবার বলিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছে; রাগের মাথায় জীর্ণ শরীরের উপর নিষ্ঠুর আঘাতও পাইয়াছে। সে আর কথা বলে না, দারিদ্র্যরাক্ষসীর কোলে ঝাঁপ দিয়াছে, প্রতিদিন রক্তশোষণ হয়। নিজের অন্ন যত না বাধা সুকুমার পুত্র কন্যাগুলি যে অন্নুরে শুখায়! চক্ষে অশ্রু ঝরে, আর আকাশ পানে চাহিয়া বলে—"হা ভগবান্, বিধবা নই, স্বামী বিদ্যমান তবুও তো দুঃখ ঘুচে না!"

হরকান্ত ভাবে—করিবার কি আছে চাকুরী —কিন্তু দিবে কে? চাকুরী না জুটিলে, মানুষ এমন নিরুপায় হইয়াই মরিবে। ভবতোষ আর লগিন্ কোম্পানীর বড়বাবু, বেতন পায় মোটা; উহার ভাবনা কি! পাড়ার সকলেই তো চাকুরী-বৃত্তি করিয়া খায়, সবাই বেশ আছে; তাহার একটী চাকুরী জুটিলে জীবনের সমস্যা আদৌ থাকিত না। মানুষের লক্ষ্য খুব ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এইটুকুই সিদ্ধ হয় কৈ? পেটে ক্ষুধার জ্বালা, আর মাথায় চিন্তার আগুন— সে যেন পোড়া কাঠ হইয়া গেল।

পিতৃপিতামহের বসতবাটী ইষ্টকনির্ম্মিত, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়ার মত অবস্থা হইয়াছে। সে প্রতি রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া জানালা কপাটের মাথার খিলান শাবলের গুঁতায় ফাঁক করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। ছেলে মেয়ে উৎসাহে বাপের কর্ম্মে সহায়তা করিল। নারায়ণী বলিল—"কর কি গো, সব যে হুড়মুড় ক'রে প'ড়বে, এ তোমার কি বাতিক হ'লো!" হরকান্তের মুখে যে হাসি দেখা দিল, তাহা বিষ-মিশ্রিত ভয়ঙ্কর বিকৃত। নারায়ণী ভয় পাইল, কোন কথা বলিল না; মেঝেয় শুইয়া সে স্বামীর এই অদ্ভুত কর্ম্ম নীরবেই নিরীক্ষণ করে।



হরকান্ত তাহার বসতবাটীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে

সে দিন খুব বৃষ্টি। প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। হরকান্ত পত্নীকে বলিল—"আয় বাহিরে আয়, আজ বনিয়াদের ইট বেচে দশদিন পেটের ভাত যোগাড় করবো।"

নারায়ণী অবাক হইয়া চাহিল। হরকান্ত ছেলেগুলিকে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিল; তাহারা বিকট চীৎকারে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। নারায়ণীর নড়া ধরিয়া ঘরের বাহির করিল; তারপর গাঁতি লইয়া ভিতের গোড়ায় চাড়া দিবা মাত্র দেওয়াল টলিয়া উঠিল। উন্মত্তের ন্যায় সে খুব জোরে শাবলের ঘা দিতেই হুড়মুড় করিয়া ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তুমুল শব্দে প্রতিবাসীমণ্ডলী বুঝিল, বর্ষায় হরকান্তের পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃকালে দুয়ারে সকলে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। হরকান্ত হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—"তাই তো ভাই, এখন থাকি কোথা! আর এসব সরিয়ে ফেলাও আমার সাধ্যে নাই, করি কি!"

ভবতোষ পরামর্শ দিল—"বাড়ী ভাঙ্গা কেনার লোক আছে, তাদের কারবারই এই; ফুরিয়ে দাও, কিন্তু সে পয়সায় তো বাড়ী হবে না ভাই! একটু চুণ বালি দিতে পারলে এখনও বিশ বছর দেখ্‌তে হ'তো না।"

হরকান্ত অধরে দশন চাপিয়া বিকৃতকণ্ঠেই বলিল—"আমি তো অফিসের বড়বাবু নই, আড্ডায় আমোদ জোগাতে আছি, দু' পয়সার

সাহায্যে নেই।" কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই অস্পষ্ট বলিয়াছিল। ভবতোষের পরামর্শ তাহার জানা ছিল, সে লজ্জায় বক্তব্যটা এইভাবে বিকৃত করিতে পারে নাই। এখন নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়া সে লজ্জার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ঘর করিয়া পুরাতন ইট কাঠ প্রভৃতি বিক্রয়ে প্রায় দুইশত টাকা হাতে পাইল। ঘরের কোলে সরু বারান্দাটুকু সে ভাঙ্গিতে দিল না। কুকুর শৃগালের ন্যায় সকলে মিলিয়া সেইটুকুতে গিয়া আশ্রয় লইল। হরকান্তের সংসার আর অচল রহিল না।

—৪—

কলসীর জল গড়াইয়া খাইলে শীঘ্রই নিঃশেষ হয়। এমন করিয়া কয়দিন চলিবে? হরকান্ত চিন্তায় অস্থির হইল। ভবতোষের আড্ডা জমাইতে সে আর বাহির হয় না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে। বাড়ীর ইট কাঠ বিক্রয় করিয়া দুইবেলা অন্নের সংস্থান হওয়া নারায়ণী ভাল বলিয়া মনে করে নাই; ইহার পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া সেও কাঠ হইয়া যাইতেছিল। বিদ্যালয়ে বেতন দেওয়ার অভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও হয় না। যখন জীবনধারণের উপায়টুকুই ঘটিয়া উঠে না, তখন সংসার পাতিয়া দুঃখকে এমন করিয়া টানিয়া আনা কেন? স্বামীর উপর তাহার অভিমান হইত, কিন্তু কোন কথা সাহস করিয়া বলিত না। কটু তিরস্কার না হয় গা পাতিয়া সহা যায়, জীর্ণদেহ প্রহারে জর্জ্জরিত হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা করে!

ভবতোষ আসিয়া ডাক দিল। হরকান্ত বাহির হইয়া বলিল—"ক'দিন আর বাহির হই নি ভাই, গান বাজ্‌না চল্‌ছে তো!"

কথাটার মধ্যে একটু টিপ্পনী ছিল। হরকান্ত জানিত, তার মত একজন বেকার মানুষ না হইলে কাজের লোকেদের আমোদ যোগাইবার মানুষ নাই। তাহার অভাবে যে ঘটকদের আড্ডা আর তেমন জমিবে না, সে ভাল করিয়া জানিত; তাই এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ভবতোষ আমোদপ্রিয় লোক; বিশেষ, ছুটীর দিনটা হৈ চৈ করিয়া কাটাইতে পারিলে সে নিজেকে ধন্য মনে করিত। হরকান্তের অভাব সে বুঝিয়াছিল। বৈঠকখানা সরগরম রাখার জন্য হরকান্তকে খুবই দরকার। তবলায় চাঁটী, হারমোনিয়মে রাগ-রাগিণীর আলাপ, তাস পেটার কলরব, কাহাকেও না পাইলে হরকান্তের সহিত দাবা খেলায়ও সময় হু হু করিয়া কাটিয়া যায়। এ হেন হরকান্ত আজ মাসাবধি ঘটকদের বৈঠকখানা মাড়ায় নাই; ভবতোষ তাই এক ফিকির করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সে বলিল—"গান বাজ্‌নার জন্য ভাবি না ভাই, বলি তোমার চল্‌ছে কেমন? চাক্‌রী-বাক্‌রী তো নেই, একটা পরামর্শ আছে, যদি শোন তো বলি!"

অভাবের কষাঘাতে মানুষ যে কত ছোট হইয়া যায়, তাহা হরকান্ত অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল। পূর্ব্বে আমোদ যোগাইতে তাহার কুণ্ঠা হইত না, এখন সে বিনা কড়িতে কাহারও মুখে হাসি দেখিলে জ্বলিয়া যায়। কাহারও বিপদ্ হইলে সে পূর্ব্বে সেখানে সর্ব্বাগ্রে গিয়া দাঁড়াইত, এখন ডাকাডাকিতে সাড়া দেয় না। হরকান্তের সত্য প্রয়োজন যদি থাকে, তবে তাহার একটা মূল্যের দাবী ভিতর হইতে জাগিয়া উঠে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। লোকও বুঝে না, ভদ্রসন্তানের নিকট সামান্য সাহায্য লইতে হইলে যে কড়ি দিয়া তাহা খরিদ করিতে হয়, এ দেশে তাহা এখনও 'গা-সওয়া

হয় নাই। হরকান্ত কিন্তু বুঝিতেছিল, শীঘ্রই এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত; নতুবা কেবল কয়েকটা চাকুরী ভদ্র-সন্তানদের জীবনযাপনের একমাত্র ক্ষেত্র হইলে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে না। বিনা খরচায় অবৈতনিক আমোদ এ বাজারে অচল হওয়াই ভাল।

ভবতোষ তাহা বুঝিয়াছিল; তাই সে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। হরকান্ত বলিল—"কি পরামর্শ ভাই।"

"আমি বড়দা'কে ব'লে স্থির করেছি, তাঁর আট বছরের মেয়েটাকে পড়াবে, দাদা গোটা চার টাকা দিতে রাজী আছে। বোঝার উপর শাকের আঁটি, তবুও তো তোমার বাজার খরচটা চ'লবে। পরিশ্রম বিশেষ নেই, একবার রোজ যাওয়া আসা—কি বল?"

হরকান্ত ভবতোষের উপর যায়। পূর্ব্বে হইলে এই চারটী টাকা প্রতি মাসে সাহায্য-স্বরূপ পাইলে সে কৃতার্থ হইত, এখনও এইরূপ একটা টাকা পাওয়ার স্থিরতা হইলে সে রক্ষা পায়; কিন্তু হাসিয়া বলিল—"ক্ষেপেছ ভবতোষ, পড়াই যদি অমনিই পড়াব, টাকা দিতে হবে না। আমার সময় কৈ ভাই।"

ভবতোষ অবাক্ হইয়া হরকান্তের মুখের দিকে চাহিল। সে যে মোচড় দিতে শিখিয়াছে বুঝিয়া লইল। হরকান্তের সরল প্রাণে এমন আঁচর কেন পড়িল, তাহা কেহ দেখিবে না, ভবতোষও দেখিল না। তাহার প্রয়োজন ছিল হরকান্তকে, নতুবা আড্ডা নিঝুম হয়; নিতান্ত ব্যবসাদারীর মতই বলিল—"বন্ধুর যতটা পারি উপকার করার জন্যই আমার এই প্রস্তাব, চার টাকা না হয়, ছয় টাকা দেব; শুধু তো পড়ান নয়, এই অজুহাতে দু'হাত তাস্ পেটাও হবে।"

হরকান্ত নিমরাজী হইল। এই অবস্থায় এই সামান্য পরিশ্রমে ঘরে বসিয়া ছয়টা টাকা পাওয়া কম সুযোগ নয়, কিন্তু সে নীরব রহিল। ভবতোষ ক্ষুণ্ণমনেই প্রস্থান করিল।

কিন্তু সে অফিস হইতে আসিয়া রাস্তা হইতেই তবলায় চাটীর শব্দ শুনিল। পাড়ার গুইরাম খাম্বাজ রাগিণীতে আলাপ ধরিয়াছে, কানে সুধাবর্ষণ নাই করুক, ভবতোষের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে বাড়ী প্রবেশ করিবার সময়ে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাজিয়ে আর অন্য কেহ নয় স্বয়ং হরকান্ত।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে হরকান্ত বৈঠকখানায় বড় কর্ত্তার মেয়ে সুষমাকে পড়াইতে আসিয়া দেখিল, সে ফরাসের উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়িল, হাতের চক্‌চকে সোনার চুড়িগুলির উপর; কিন্তু সেগুলি এমন টাইট হইয়া হাতে বসিয়া আছে, মনে হইল—তাহা বাহির করা সুবিধা হইবে না। এরূপ মনে হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক বোধ হইল; কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার অন্তরে একটা বিকট রাক্ষস জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, এ সুযোগ ছাড়িতে নাই। তার তৎক্ষণাৎ মেয়েটীর কণ্ঠদেশে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল ভরি চারেকের স্বর্ণ-হার ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। টিপ্ কলে হাত দিয়া, হার গাছটার প্রান্তভাগ ধরিয়া টান দিল, সোটান সেটা তার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল—সে কি কুৎসিৎ দৃষ্টি চক্ষের কোণে কোণে সংশয় ও আতঙ্ক কালি লেপিয়া দিয়াছে। হারগাছটা হাতের মুঠায় লইয়া সে চোরের মত প্রস্থান করিল।

— ৩ —

ভোর না হইতেই দরজায় ঘা পড়ায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল—"কে?" ভবতোষ বলিল, "আমি, দোর খোল।"

হরকান্তের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে, দারিদ্র্যের নির্য্যাতন সহিয়া সে যে শক্ত মন পাইয়াছিল, আজ তাহা যেন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার ললাটে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল, শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তবুও সে তাড়াতাড়ি দরজার খিল খুলিয়া বলিল—"কে, ভবতোষ! এত সকালে!" বলিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল, সঙ্গে জমাদার। হরকান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, সে এমন ব্যাপার ঘটিবে ভাবে নাই। কণ্ঠে জড়তা লইয়া বলিল—"এ কি ভাই, আমায় কি চোর মনে করেছ!"

ভবতোষ ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কেন বল দেখি, চুরির কথা কিছু শুনেছ না কি!"

হরকান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কি যে জবাব দিবে স্থির করিতে পারিল না। তার ক্ষুদ্র গৃহটুকু খানাতল্লাস করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না, আর সোনার হার গাছটী তাহার মাথার বালিশ উঠাইতে গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভবতোষ হরকান্তের দিকে চাহিয়া বলিল—"শুয়ার! এমন হতভাগা হয়েছিস্!"

হরকান্ত একেবারে ভবতোষের পায়ে জড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার ছেলে মেয়েগুলি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, আর নারায়ণী সে মরমে মরিল। পাষাণপ্রতিমার মত দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জমাদার হরকান্তের হাতে হাতকড়া পড়াইয়া দিয়া, মালসমেত তাহাকে লইয়া গেল। হরকান্ত আর পশ্চাতের দিকে চাহিতে পারিল না, চক্ষে তার অশ্রু ঝরিতেছিল। সে যদি একবার পিছন দিকে চাহিত, তবে দেখিত—তার জীবন-সঙ্গিনীর চক্ষে, লজ্জায় ঘৃণায় যে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে, তাহা তাহাকে পুড়াইয়া ছাই করিতে পারে।


নারায়ণী দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

— ৬ —

"কান্ত, তোর এ দুর্দ্দশা কেন!"

"ফিলিম্ চুরি করেছিলুম, শালা ম্যানেজার রেহাই দিলে না।"

"তোর অভাব কি ছিল কান্ত, বংশে কালি দিলি!"

রমাকান্ত মেজদা'র মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিয়া লইল, বংশমর্য্যাদা সে রক্ষা করিতে পারিলেও মেজদা'র জন্যও ইহার উপর কালি পড়িত।

হরকান্ত রমাকান্তকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল—'আমার দুষ্কর্ম্মের কৈফিয়ৎ চাইছিস্! আমি নিরুপায়, চুরি ক'রবার প্রবৃত্তি কোথা থেকে আসে? নিজের দায় কতটুকু, কান্ত! দেশে উপায় করার ক্ষেত্র নাই, ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিতে সমাজ অকাতর। চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, কিছু বাদ দায় না। খেতে হবে, স্ত্রী পুত্রের খাওয়া যোগাতে হবে। আমি চোর—জেল থেকে ফিরি, এমন ফিকির ক'রে চুরি ক'রবো, আর ধরা পড়বো না। যার আছে, তার কাছ থেকে জোর করে নেওয়া ডাকাতি, চুরির চেয়ে ভাল কিন্তু সেখানে শক্তি চাই, লোক সংহতি চাই। আমায় চুরি ক'রতে হবে বাঁচ্‌বার জন্য, জুয়াচোর হ'তে হবে—তোর কি দরকার ছিল!"

কান্ত বলিল—"মেজদা, সংসারে স্ত্রী পুত্রই শুধু আপনার নয়, হৃদয়টা যতদূর গিয়ে পৌঁছায় সবখানি আপনার ক'রে নেয়। মানুষ এই অন্তঃকরণ নিয়েই বাঁচে, আর মরেও বটে। আমি মরেছি কেন, জানেন! যে দিন ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী গিয়ে দাঁড়ালুম, বৌদির কালি মুখ দেখে মনে হ'লো, আপনাদের অনাহার চ'লছে, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত শুকিয়ে ম'রছে, মন থেকে সব মুছে দিয়েই আবার সোজা পথে চলার উদ্যোগ করেছি। আপনার অভাব আমায় পাগল ক'রে দিলে, মনে হ'লো আপনাকে বাঁচাবো—কিন্তু মরণ যেমন আসন্ন, প্রতিকার তেমন ক্ষিপ্রবেগে সম্ভব হয় না। বাঁচ্‌তে হ'লে চুরিই ক'রতে হয়, কিন্তু ধরা প'ড়লে যে বিচার সেখানে চোরের শাস্তি হয়। যে অবস্থায় মানুষ চোর হয়, সে অবস্থার জন্য দায়ী যে, তার বিচার কেউ করে না। তুমি ঠিক ব'লেছ—চুরি করতে হবে, কিন্তু ফিকির জানা চাই; আর যদি দশজনে এক হই, যার ঘরে ধন কড়ি ধ'রে না, তার ঘরে ডাকাতি করাই শ্রেয়ঃ। বাঁচ্‌তে হবে মেজ্‌দা'—তোমার ক'মাস জেল!"

"ছ'মাস। তুই কবে বেরুবি!"

"আমার দেরী আছে, আঠার মাস ঠেলেছে। এখানে এসে ভবিষ্যৎ জীবনের আলোই পাচ্ছি। আর পরের লাথি খাবো না, এ আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি। আলাপ ক'রছি অনেকের সঙ্গে। আপনি একটু স্থির হ'য়ে থাকবেন—আমি বেরুই, অভাব আমি রাখ্‌বো না।"

হরকান্ত দেখিল, রমাকান্তের চরিত্র বেশ দৃঢ় হইয়াছে; তাহার কথাগুলি বীরত্বব্যঞ্জক। দেশে যদি সমরবিভাগে চাকুরী করার সুবিধা থাকিত, কান্ত একজন উত্তম সৈনিক হইত; কিন্তু সে এখন দস্যুই হইবে; হরকান্ত এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। হরকান্তকে বলিল, "আপনারা বুঝি দুই ভাই, বেশ কথা কইছেন; কিন্তু চোর ডাকাত হওয়ার চেয়ে আরও কাজও আছে—অন্ততঃ খাওয়া পরা চলে যাবে।"

হরকান্ত সবিস্ময়ে বলিল—"কি বলুন, দেখি!"

সে ভদ্রলোক পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিল, হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার খৈনী মলিতেছে; তারপর হরকান্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "আমিও বন্দী, তবে ক্লাস 'এ'—শ্রমিক আন্দোলনে ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হয়েছে। আমি তিন দিন পরেই বেরুবো, আপনি গরুটীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন। মনসাতলায় ভবতারণ চাটুয্যের নাম ক'রলে কানাও দেখিয়ে দেবে।"

হরকান্ত বলিল—"মৎলব কি, বলুন দেখি!"

ভদ্রলোক বলিল—"জেলে এসেই ভাল লোক পাই, বাহিরে মানুষ চেনা দায়। আপনাদের মত শিক্ষিত ভদ্রলোক যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, কর্ম্ম ফতে ক'রতে বেশীদিন যায় না, বুঝেছেন!

পেটের খাওয়ায় কত খরচ হয়, কেবল ঐটুকু bare-necesstiy হ'লে আপনাকে খুব চালিয়ে নেব।'

হরকান্ত—"আমার স্ত্রী আছে।"

ভদ্রলোক—"ভালই তো, তাঁরও কাজ আছে। আপনারা স্ত্রী-পুরুষে আমাদের দলে যোগ দিতে পারেন। না খেয়ে মরার চেয়ে যদি খোরাক পান, দেশের জন্য শ্রম দিতে রাজী আছেন তো!"

হরকান্ত বলিল—"এ হতভাগার জীবন দিয়ে যদি দেশের কাজ হয়, সৌভাগ্যবান্ মনে করবো। কিন্তু গুটীকতক ছেলেমেয়েও আছে।"

ভদ্রলোক—"কুচ পরোয়া নেই, তাদের বোর্ডিং-এ রেখে দেবেন। আপনারা দাঁড়া হাত-পা, স্ত্রী-পুরুষে কাজে লেগে যাবেন।"

হরকান্ত এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এতদিন কেবল উদরান্নের জন্য তার অশান্তির অবধি থাকে নাই, শেষে চৌর্য্যাপরাধে রাজদণ্ড মাথায় বহিতে হইয়াছে। সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে কর্কশকণ্ঠে শব্দ হইল—"শালে, শ্বশুরা বাড়ী আস্‌ছে। হারামজাদা শুয়ারকী বাচ্চা!"

রক্তচক্ষু ওয়ার্ডারের এই তিরস্কারবাণী শুনিয়া সে তাহার নিজের কাজে মন দিল। পশ্চাৎ হইতে শুনিল, ভদ্রলোক রুদ্র-গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "চোপ্ রাও রাস্কেল!"

যমও শক্তের কাছে বুঝি নরম হয়। ওয়ার্ডার বলিতেছে, "আপ্‌কো কুচ নেহি বোলা, হুজুর!"

রাষ্ট্রনীতিক রাজবন্দী অন্ধকার কারাগৃহে পিশাচের কণ্ঠ বুঝি চাপিয়া ধরিয়াছে, শীঘ্রই তাই তাদের স্বতন্ত্র স্থান করার ব্যবস্থা হইতেছে।

— ৭ —

মনসাতলায় হরকান্ত ভবতারণের বাসা সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিল। নীচে একজন ভীমরূপা নারী দাঁড়াইয়াছিল। হরকান্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভবতারণ বাবুর বাসা এই কি!"

"আজ্ঞে হাঁ, কোথা হ'তে আস্‌ছেন।"

"বলুন, অন্ত জেল থেকে হরকান্ত হাজির।"

"তেলিনীপাড়ার হাঙ্গামায় আপনারও বুঝি জেল হয়েছিল!"

"আজ্ঞে না, আমি চুরি ক'রে জেলে গেছ্‌লুম।"

সে নারী আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল।

ভবতারণ আসিয়াই, হরকান্তের গলা জড়াইয়া বলিল—"কম্‌রেড, আজ থেকেই আপনি আমাদের দলে ভর্ত্তি হলেন, কেমন!"

হরকান্ত কোন উত্তর দিতে পারিল না। অতি ক্ষুদ্র গৃহে ভবতারণের অফিস—একটা ভাঙ্গা টেবিলের চারপাশে বসিবার কেরোসিন তেলের গোটা কয়েক বাক্স, দেওয়ালে ভারতের শ্রমিক জীবনের দুঃখ ও উন্নতির পরিপন্থী বিষয় সকল বড় বড় অক্ষরে পিচ্‌বোর্ডে লিখিয়া টাঙ্গান আছে। ভবতারণবাবু একখানা ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দাঁড়ান, এক কাপ চা খেয়ে নিন্—কথা বেশী নয়, কাজই চাই। আপনাকে একেবারে কলের ভিতর যা হোক্ একটা কাজে লাগিয়ে দেব। কুলি-গিরি ক'রতেও গররাজী হবেন না, একটা কিছুতে লেগে থেকে কাজ করা চাই"—এই বলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"চা দিয়ে যাও!'

সেই স্থূলাঙ্গী রমণী দুই কাপ্ চা ও কয়েক টুক্‌রা পাউরুটী দিয়া গেল। ভবতারণ বলিল, "ইনি কয়েক বৎসর কলেই কাজ করেছেন, এখন আমার সাহায্যকারিণী শ্রমজীবী-সংহতির দক্ষিণ হস্ত ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না

তারপর চায়ের কাপে মুখ দিয়া বলিল—"এখনও দু' এক ফোঁটা দুধ মিলছে, রুটীর টুকরাও জুটছে; লেনিন্ কি করেছিল জানেন—একেবারে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে দেন নি, এমন কতদিন কাটিয়েছেন, তবে তো পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জগৎ উল্‌টে দিলেন। আপনি শিক্ষিত লোক, কলের শ্রমজীবিদের কানে কেবলই মন্ত্র দেবেন—তারা পরাধীন নয়, তারা কারু চাকর নয়, এই রাজ্যটা তাদেরই, তারাই বিচারক, তারাই শাসন-পরিষদের সভ্য, সচিব—তারা যদি একযোগে দাঁড়িয়ে উঠে, আর রক্ষা আছে!"

রুটীর টুকরা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—"জুড়িয়ে যাবে, আমাদের গরীবের মতই থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে সমান দুঃখ সইতে হবে, কি বলেন! মানুষ তো খাওয়ার জন্য বাঁচে না; মহাত্মা কথাটা খুব বড় ব'লেছেন, 'বাঁচার জন্যই খেতে হবে'। সে আর কতটুকু, খুব কষ্ট ক'রেই আজ আমাদের অর্থ সঞ্চয় করতে হচ্ছে; এই দেখুন না, এক একটা ষ্ট্রাইকে যে টাকা উঠে, বড় জোর তিন মাস তাতে কাজ চলে, আবার বাধ্য হয়ে ষ্ট্রাইক বাধাতে হয়। একটু উত্তেজনা সৃষ্টি না হ'লে, বাহির থেকে টাকাও পাওয়া যায় না। দেশের কাগজগুলো প্রোলিটেরিয়টের জন্য নয়, ও-সব সিটিজেনদের। দাঁড়ান না, মিলগুলো যদি একবার অরগেনাইজ্ ক'রে নিই, একখানা রেড পেপার বার ক'রে দেব—"

ভবতারণের অনুরোধে হরকান্ত চায়ের বাটী নিঃশেষ করিল। সে জেল হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতে ভরসা করে নাই; কি অবস্থায় সে পত্নীপুত্রদের রাখিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিত; পেটের খোরাকের জোগাড় হইলে, তবে তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে—ইহাই ছিল তাহার ইচ্ছা।

ভবতারণের সহিত শ্রমিক-সংহতির মেয়েদের ব্যারাকে গিয়া সে যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল—তাহার পত্নী এই অবস্থায় একদিনও থাকিবে না, বিষ খাইয়া মরিবে, ইহা অবধারিত। একটা টিনের ছাদ দেওয়া লম্বা ঘরে সুঁদরী কাঠের সারি সারি খান তিনেক তক্তাপোষ, বিছানার দুর্দ্দশা দেখিলে তাহার উপর পা রাখিতে ইচ্ছা হয় না; যেমন মলিন তেমনি দুর্গন্ধ; একজন নারী বসিয়া পান সাজিতেছিল, সে ভবতারণকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অভিবাদন করিয়া বলিল—"সুশীলা এই মাত্র কলে গেল, আড়াই শ' খিলি পান সেজে দিয়েছি—বেশ বিক্রি হচ্ছে; মেড়োগুলো কথা বুঝে না, তবে তাদের আগ্রহ বাড়ছে, এখানে দু' একজন আসতে সুরু করেছে; একটা দল শীঘ্রই গ'ড়ে উঠ্‌বে।"

ভবতারণ একটা বিছানায় বসিয়া বলিল, "বেশ! বেশ!! এই ভদ্রলোকের স্ত্রীও আসছেন, ইনি নিশ্চয় শিক্ষিতা—তোমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে, কি বল মল্লিকা!"

মল্লিকা অবাক্ হইয়া দেখিল—সে ভাবিতে পারিল না, তাহাদের কাজে ভদ্রসমাজের কোন নারী যোগ দিবে। ইহারা সকলেই পতিতা। কলে কাজ করিতে আসিয়াছিল, ভবতারণ শ্রমিক-আন্দোলন চালাইবার জন্য দলে ভিড়াইয়াছে।

ভবতারণ হরকান্তকে লইয়া তার পাশেই একটা ক্ষুদ্র খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। একজন বর্ষীয়সী নারী কয়েকটা শিশুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া ভীম চপেটাঘাতে একটাকে জখম করিয়া আর একটার প্রতি ধাবমানা হইয়াছে। তাহার করাল মূর্ত্তি দেখিয়া হরকান্ত ভীত হইয়া ভাবিল—শ্রমিক-সংহতির শিশু-রক্ষা বোর্ডিং'এ তার ছেলেগুলো

একদিনও প্রাণে বাঁচিবে না; না খাইয়া মরা ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ভবতারণ বলিল—"ষ্টেট্ হাতে যতদিন না আসে, ক্ষুদ্রভাবে সব রক্ষা করা চাই। ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র থাক্‌বে—পিতামাতাকে তার জন্য ভাব্‌তে হবে না। টাকার সুবিধা হ'লে, জিনিষগুলো খুবই বড় হয়। যে সব শিশু কলের কুলি লাইনে কুড়িয়ে পাই, তাদের এইখানে স্থান দিই। তা' ছাড়া গরীব যারা তাদের ছেলেদের মানুষ করার এই ব্যবস্থা। আপনাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না, আপনি আজ থেকেই লেগে যাচ্ছেন তো!"

হরকান্ত 'হাঁ' 'না' কোন কথাই বলিতে পারিল না। চতুর্দ্দিকে কুৎসিৎ কথা, সঙ্গীত, হাস্য-পরিহাস চলিতেছে; সমাজবন্ধন হইতে কেবল পেতর খাটাইতে আসিয়া এখানে মানুষ পশুর অধম হইয়াছে। সংসারে সমাজে অভাবের হাহাকার যদি ঘুচে, তবে সেইখানেই মানুষ যথার্থ মানুষ হইয়া উঠিবে। এইখানে দাঁড়াইয়া একটা দুঃস্বপ্ন সফল করার জন্য ভবতারণের যে ধৈর্য্য, তাহার প্রশংসা না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। সে ক্ষুণ্ণমনেই বলিল—"ভবতারণবাবু! আমার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বল্‌বো; তিনি রাজী হ'লে আপনার শরণই নেব। এখন আসি!"

সমাজের আক্রোশ পুরুষ মানুষের উপরেই অধিক। তাহার কারণ, পুরুষ মানুষ অকেজো হইয়া বসিয়া থাকিলে, সমাজাত্মা কোন সহানুভূতিই দেখায় না। হরকান্ত বাড়ী ফিরিয়া অবাক্ হইল। তাহার ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহটীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র খড়ের রন্ধন-গৃহ হইয়াছে, প্রাঙ্গন পরিষ্কৃত, তাহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ কন্যাটী বেশ পরিষ্কার একটী পেনী ফ্রক গায়ে দাঁড়াইয়া, সে অবাক্ হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

হরকান্ত রন্ধনগৃহে উঁকি মারিয়া দেখিল, নারায়ণী বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রন্ধনক্রিয়ায় ব্যস্ত। বাসনকোসন তাহার কিছুই ছিল না; কিন্তু রন্ধনগৃহের পারিপাট্য দেখিয়া তাহার মনে হইল, এই ছয়মাসে এত পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল!

পায়ের শব্দ পাইয়া নারায়ণী ফিরিয়া দেখিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া হরকান্তকে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল, বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে বলিল—"খালাস পেয়েছ! আঃ বাঁচালে—ব'সো, পায়ে হাতে জল দাও।"

একটা পিত্তলের ঘটীতে জল আনিয়া নারায়ণী নিজেই পা ধুয়াইয়া দিল। হরকান্তের মনে বড় কৌতূহল হইতেছিল, কিন্তু সে জিজ্ঞাসার ভাষা পাইল না। নারায়ণীই বলিল—"দেখ, পাড়া-প্রতিবেশীর চেয়ে আপনার কেউ নয়, আজ আমার কি দিন বল তো! অসহায়া ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে পথে পথে ঘুর্‌তে হ'তো। ভাগিস্ ঘটকরা, শীলেরা উপর-পড়া হ'লো, তাই তো দুঃখের দিন এমন ক'রে কাট্‌লো"—এই কথা বলিতে বলিতে খান পাঁচ সাত বাতাসা হরকান্তের হাতে দিয়া বলিল—"এক প্রহর বেলা হ'লো, জলটুকুও পেটে পড়ে নি, এক ঘটী জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও।"

হরকান্ত এক বেলা অন্ন জুটাইতে পারে নাই। আজ অতি সামান্য জিনিষ হইলেও, বাতাসা কয়খানি সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইল।

নারায়ণী এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই—বড় ছেলে এগার বছরের, সে কলে কাজ করে; নলিধরে কাজ—মাসে ছয় সাত টাকা পায়; শীলেদের দোকানে মেজ ছেলে কাজ শিখে, পাঁচ

টাকা দেয়। হরকান্তের অবর্ত্তমানে, প্রতিবেশী-মণ্ডলী একযোট হইয়া তাহাকে রক্ষা করার এই ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘটকদের বৈঠকখানায় পাঠশালা বসিয়াছে, মেয়ে তিনটে ও ছেলেটা রোজ পড়িয়া আসে। আর ছাই লেখা-পড়া শিখিয়াই বা লাভ কি! হরকান্তের বিদ্যা একেবারে যে কিছু নাই, তাহাও নহে; তবুও সে মাসে দশটা টাকা উপায় করিতে পারে নাই যে! ব্যবস্থার কথা শুনিয়া হরকান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভবতোষ আসিয়া দেখা করিল। হরকান্ত অধোবদন হইল, কিন্তু ভবতোষ বলিল—"লজ্জা কি ভাই, আমিই রাগের চোটে এক কাজ করে' ফেলেছি; মানুষের দশ দশা, কখন কি হয় কে জানে। এখন গান বাজনা ছেড়েছি, পাড়ার ছেলে-গুলোকে নিয়ে একটা দল গ'ড়ে তুলেছি। বৈঠকখানার পাঠশালাটা তুমিই নাও, সংসারটা চ'লে যাবে; তারপর, এ পাড়ায় পেটের দায়ে বন্ধুবিচ্ছেদ না হয়, এই দিকে আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে ভাই। আমরা সকলে যদি পাড়ায় ঐক্যবদ্ধ হই, একের দুঃখে দশজনে বহন করি, সেটা ভার না হ'য়ে একটা মুক্ত জীবনই এনে দেবে—এই ছয় মাসে অন্ততঃ আমি তার সন্ধান পেয়েছি।"

ভবতোষের মুখে আশার আলো জ্বলিতেছিল। হরকান্তের গরুটার কলের কথা মনে পড়িল। সমাজ থেকে বিযুক্ত মানুষের জীবন সেখানে পেটের দায়ে কাজের যাঁতায় কি নির্মমভাবে পিষিয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—ভবতারণ তাহার প্রাণ যদি সমাজের মূলে ঢালিত, তাহা হইলে বোধহয় দুঃখ বলিয়া পদার্থ কোথাও ঠাঁই পাইত না, আর এই সমাজই মানুষের মানুষ নামের যোগ্য হওয়ার উৎকৃষ্ট স্থান।

ভবতোষ হরকান্তকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিল—"এই পাড়ার কেনারাম দত্ত ছাড়া আমাদের সমবায়ে সবাই যোগ দিয়েছে। কাউকে জোর করার দরকার নেই; সংসার করতে হ'লে সুদিন কুদিন আছেই, এক সঙ্গে সকলের দুর্দ্দিন হয় না। যাক্ দুঃসময়ে প্রতিবাসীকে যদি দেখা হয়, ইহার একটা সুফল আছেই, তখন কেউ আর সমবায়ের দূরে থাক্‌বে না। বল দেখি হরকান্ত, এই দিকে যদি আমাদের প্রথম দৃষ্টি থাক্‌তো, বন্ধু হ'য়ে বন্ধুকে কি জেলে পাঠাতুম—বড় দুঃখ পেয়েছি ভাই!"

ভবতোষের চক্ষে জল আসিল। হরকান্ত বন্ধুকে বুকে লইয়া বলিল—"ভাই, পাপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত দূর হয় না। শাস্তি চুরির জন্ম নয়, আমার কর্ম্ম-বিমুখ জীবনের। আজ আমায় কাজ দাও, পল্লীর সেবায় জীবন ঢেলে যাবো, সে জীবনের ভার পল্লীই বহন ক'রবে, এ দৃষ্টি এতদিন পাপেই ঢাকা ছিল।

দুই বন্ধুর আলিঙ্গন—রন্ধনগৃহের আড়াল হইতে নারায়ণী দেখিয়া, তাহার চক্ষের কোণে এক বিন্দু আনন্দাশ্রু ঝরিল। যেখানে প্রেম, যেখানে ঐক্য, সেইখানেই কমলার হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া এমনই অমৃত বর্ষণ করে বটে! হিন্দুসমাজে বেকার জীবন এমন করিয়াই কাজে লাগাইয়া পল্লীর নূতন শ্রী আনিতে চাই। আজ বেকার জীবন আশ্রয় করিয়া ভারতীয় ভাবে জয়শ্রী ফুটিয়া উঠুক, আমরা ধন্য হই।



মত ও পথ

কংগ্রেস—

করাচীর কংগ্রেস যেভাবে সম্পন্ন হইল, তাহাতে ভারতের অখণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ভারতের জাতীয়তা আর অস্পষ্ট নয়; ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তি সমষ্টিভাবে ভারতের দাবী জ্ঞাপন করিয়াছে। কংগ্রেস হিন্দুজাতির নহে, ভারতবাসীর কেন্দ্র-প্রাণ—আজ ইহা অগ্নিরূপে মাথা তুলিয়াছে। তাই কংগ্রেসের প্রভাব দেখিয়া স্বার্থপর মানুষের কণ্ঠে যুক্তিহীন কলরব উঠিয়াছে। বিলাতের চার্চ্চহিল প্রমুখ ভারত বিদ্বেষিদের অন্যতম ফ্রাডক সাহেব বলেন—

"What is Congress! Whatever its origin it has become under the license that has been allowed it, a Soviet of Hindus led by Brahmins and Banias of Guzrat who are animated for various reasons with the most intense hatred of the British."



করাচি কংগ্রেসের তোরণদ্বার

কংগ্রেসের প্রতি এই বিদ্বেষের কারণ—ইহা আজ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে আজ একটা নূতন প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। অনেকের ধারণা হইয়াছিল, কংগ্রেসের উদ্বোধন যুগে, ভকৎ সিং প্রমুখ অন্য দুইজন তরুণের ফাঁসী হওয়ায়, তরুণদল মহাত্মার প্রভাবমুক্ত হইয়া একটা গণ্ডগোল পাকাইবে, কংগ্রেসের অখণ্ড প্রাণ চূর্ণ হইয়া শক্তিহীন হইবে,



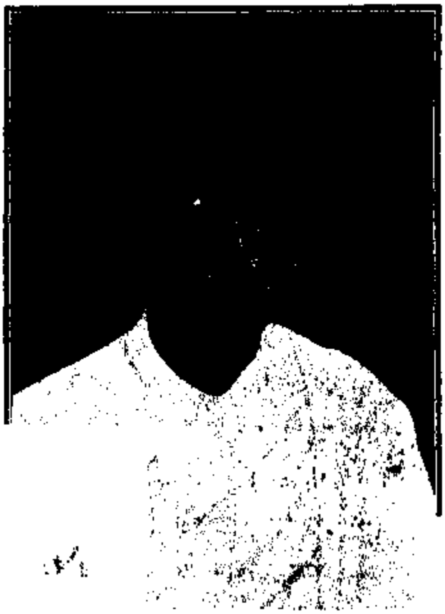
মহাত্মা গান্ধী

কিন্তু মহাত্মার অসাধারণ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। তরুণের চাঞ্চল্য যে ভাবেই প্রকাশ হউক, কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষায় তাঁহারা বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। নওজীবন ভারত সভার উত্তেজনা দেশের জাগ্রত প্রাণেরই পরিচয়। মহাত্মা সে শক্তি আত্মস্থ করিয়া অবাধে দেশের ভবিষ্যৎ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সভাপতি বল্লভভাই পেটেল সেনাপতির মতই কংগ্রেস-মধ্যে দাঁড়াইয়া কুড়িটী দাবী সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিয়াছেন। সেই দাবী কয়টী প্রত্যেক দেশবাসীর অন্তরে আঁকিয়া রাখা উচিত

১। দেশের সর্ব্বত্র সভাসমিতি স্থাপনের অধিকার।

(খ) স্বাধীন মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(গ) যাহার যে রুচি ও মত এবং ধর্ম্ম, তাহা অন্যের শান্তি-ভঙ্গের কারণ এবং



সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সাধারণের অপ্রিয় না হইলে, তাহা অবাধে করিতে দেওয়া।

(ঘ) সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সভ্যতা, আদর্শ, ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষা করা।

(ঙ) জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ ভেদে চাকুরী বা রাজকীয় বিশিষ্ট অধিকারের দাবী হইতে কেহ বঞ্চিত হইবে না।

(চ) নাগরিকের অধিকারে নারী পুরুষ ভেদ থাকিবে না।



ডাঃ চৈতরাম গিদওয়ানী

(ছ) পথ, ঘাট, কূপ সর্ব্বসাধারণের সমান ভাবে ব্যবহার করার অধিকার পাইবে।

(জ) শান্তিরক্ষার জন্য নিয়মাধীনে সকলেই অস্ত্র রাখার ও ব্যবহারে অধিকারী হইবে।

২। ধর্ম্ম বিষয়ে রাষ্ট্র-শক্তি নিরপেক্ষ থাকিবে।

৩। শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা, শ্রমের সময় নির্দ্দিষ্ট করা, কর্ম্মস্থলের স্বাস্থ্যরক্ষা, ধনীর ক্ষতিতে শ্রমিকের অভাব দূর করা, বার্দ্ধক্য, রোগ ও বেকার অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

৪। বেকার হইতে মানুষকে রক্ষা করা, দাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া।

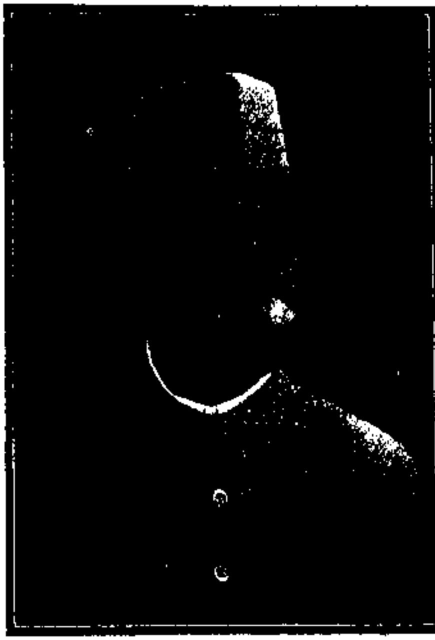
৫। নারী শ্রমিকদের রক্ষা করা ; গর্ভ অবস্থায় তাহাদের অবকাশ দেওয়ার ব্যবস্থা।

৭। স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে। শ্রমিক ও ধনীতে বিবাদ বাধিলে তাহা মিট্‌মাট করা।

৮। রাজস্ব ও জমির খাজনা হ্রাস করা; অনুর্ব্বর জমির খাজনা যতদিন মকুব করার প্রয়োজন, তাহা করার ব্যবস্থা।

৯। একটী নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর এবং নির্দ্দিষ্ট কৃষি আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করা।

১০। শ্রমিক হারে উত্তরাধিকার কর স্থাপন করা।



ডাঃ আনসারী

৬। স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বালক বালিকাকে কল কারখানায় যাইতে নিষেধ করা।

১১। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার।

১২। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

১৩। সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয় হইতে অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া।

১৪। দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও বেতন হ্রাস

করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই নির্দ্দিষ্ট বেতনের অধিক পাইবে না। নির্দ্দিষ্ট বেতন কোনমতে ৫০০৲ শত টাকার অধিক হইবে না।

১৫। দেশীয় কাপড় রক্ষা করার জন্য দেশ হইতে বিদেশী সূতা ও কাপড় বাহির করিয়া দেওয়া।

১৬। মাদক-দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া।

১৭। লবণের উপর কর থাকিবে না।

১৮। মুদ্রা বিনিময়ের হার সুনিয়ন্ত্রিত করা, যাহাতে ভারতীয় শিল্পের ও দেশের কোনরূপ ক্ষতি না হয়।

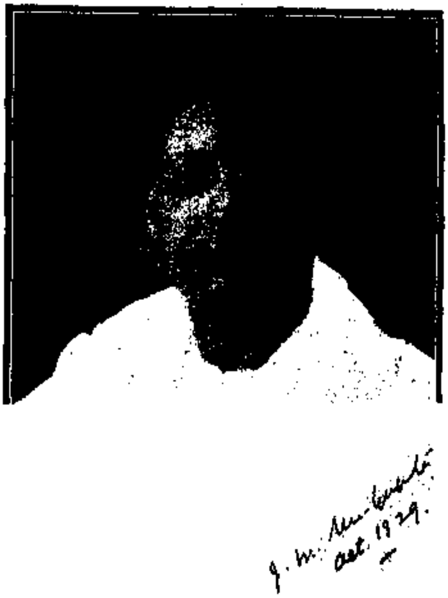


মৌলনা আবুল কালাম আজাদ

১৯। শিল্প ও খনিজ সম্পদ্ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২০। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্জ্জের সুদ লওয়ার নিয়ম বন্ধ করা।

এই কুড়ি দফা ভারত-রাষ্ট্রের ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইলে আমাদের দেশে ধনীর সহিত শ্রমিকের অথবা সম্প্রদায়গত ভেদে আমরা উৎসন্ন যাইব না। প্রত্যেকের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে



যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

হইলে এবং দেশের ধন-সম্পদ্ ও চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে উপরোক্ত ব্যবস্থা যে খুবই প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, কিন্তু জাতি ইহাতে প্রবৃদ্ধ হইবে। কংগ্রেস ভারতকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহে, এই কুড়ি দফা দাবী দেখিয়া অনুমান করা শক্ত নহে।

ভারতের দাবী—

ইংরাজের স্বার্থহানি—

সাম্রাজ্যলিপ্সা অপরিত্যাজ্য; কেননা, ব্রিটেনের ঐশ্বর্য্য এই অধিকারবাদের প্রতিষ্ঠায় সম্ভব হইয়াছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ব্রিটেনের

ঐশ্বর্য্য-নীতির উপর ঘা দেওয়ায় আজ আমাদের দাবী যে আর দীর্ঘদিন উপেক্ষা করা চলে না, এইরূপ মনোভাব অনেক চিন্তাশীল ব্রিটনবাসীর মধ্যে দেখা দিয়াছে; তাহারই ফল-স্বরূপ লর্ড আরউইনও মহাত্মার মধ্যে একটা সাময়িক নিষ্পত্তির ধুয়া উঠিল। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সকল দাবী যে পূরণ করা চলে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ।এমন কি ভগৎ সিং'এর



বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

মৃত্যুদণ্ড রোধ করা মহাত্মা প্রমুখ কংগ্রেস শক্তির সামর্থ্যে কুলাইল না। জাতি যে কত নিরুপায়, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

এইজন্ত কংগ্রেস যে কুড়ি দফা দাবী করিয়াছে তাহা অনায়াস-সিদ্ধ নহে, ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। মহাত্মা "পূর্ণ স্বরাজে"র দাবী করিতেছেন; কিন্তু তাহা বিলাতের গোল টেবিল সভা হইতে যে মিলিবে না তাহা স্পষ্টই বলিতে-ছেন—তবে ভারতের বর্ত্তমান বন্ধন দশার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে। বাঁধন কিঞ্চিৎ আল্‌গা হইলে ভবিষ্যতে চেষ্টা করিতে করিতে যদি বন্ধন-মুক্তি ঘটে, ইহাই আশা।

কংগ্রেস ভারত-রক্ষা ব্যাপারে স্বাধীনতা চায়, বৈদেশিক জাতির সহিত সম্পর্ক রক্ষায় ব্রিটনের মধ্যস্থতা অস্বীকার করে, আয় ব্যয়ের হিসাব স্বাধীন ভাবেই করিতে চায়। ইংরাজ এই বিষয়ে যে একমত হইবে না, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়; কিন্তু ইহা না হইলে ভারতের স্বরাজপ্রাপ্তি কথা মাত্র। কাজেই রাউণ্ড টেবিল সভায় ভারতের দাবী বীরের মত ঘোষণাই হইবে, কার্য্যতঃ ইহা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

তারপর কংগ্রেস মনে করে—ভারতের সীমান্ত-দেশ রক্ষা করার জন্য অর্থব্যয় অনাবশ্যক; কেননা ইংরাজের রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই ইহার মূলে বিদ্যমান। গোলযোগের ইহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ প্রমাণ করে। এই সীমান্ত-দেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, হিন্দুস্থান পাঠান, মোগল, তুর্ক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত, অপহৃত এবং শেষে পরাধীন হইয়াছিল। যুগ যদি ফিরিয়া থাকে, "সীমান্ত প্রদেশের গান্ধী" জফর আলি খাঁ যদি ভারতের প্রান্তসীমায় আদর্শ জাতি হয়, কংগ্রেসের এ যুক্তি সমীচিন বটে; কিন্তু ইংরাজ ইহা হাসিয়া উড়াইবে, এই প্রস্তাবও সমর্থনযোগ্য হইবে না।

তারপর, রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে কর্ম্মচারিদের বেতনের হার হ্রাস করার নীতি ভারতের পক্ষে শুভজনক। শাসন ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহার অর্দ্ধেক যদি জাতি-গঠন কর্ম্মে খরচ করার সুবিধা হয়, এ জাতির শ্রী ফিরিবে; শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, কৃষি-সম্পদে ভারত শ্রীনিকেতনে পরিণত হইবে। ইহাতে মোটা বেতন পাওয়ার পথ

বন্ধ হইবে। ইংরাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায়, ইহাতেও তাঁহারা রাজী হইবেন না, ইহা বলাই বাহুল্য।

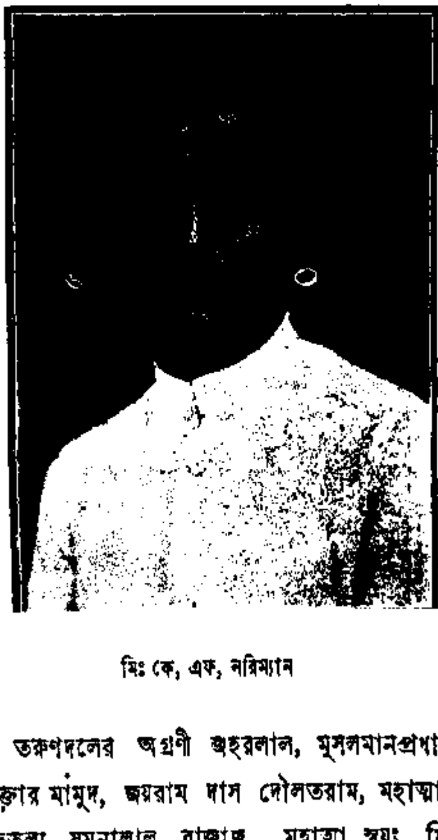
তারপর, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার নীতি যে ভাবে পালন করার কথা উঠিয়াছে, রাষ্ট্র-শক্তি হাতে থাকিলে তাহা সহজেই সম্ভব হইবে। ইংলণ্ড হইতে বিদেশী বস্ত্র দূর করা রাজবিধির দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল, দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নাই। বিদেশী কাপড় ও সূতা বিদায় করার ব্যবস্থা হইলে, ইংরাজের আর রহিল কি?

কংগ্রেসের দাবী সহজ নহে এবং ইহা পূরণ না হইলে কংগ্রেস নীরব থাকিবে না। কংগ্রেসের কর্ম্ম-চক্র যে ভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহা সামরিক পরিষদ্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে সঙ্কট অধিক হইবে বলিয়াই ধারণা করি; তবে একটা মধ্য পথ স্থির করিয়া মহাত্মা যদি দেশটাকে আর একটু ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তবে আমরা কিছুদিন শান্তির মাঝে গঠনকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে পারি; নতুবা ভারতে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াই আমাদের মৃত্যুপণে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং প্রাণ দিয়াই প্রাণ পাওয়ার নীতি ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ থাকিবে না। এই দিকে আমাদের সজাগ থাকাই শ্রেয়ঃ।

কংগ্রেসের কর্ম্মী-চক্র—

মহাত্মা বলেন, সভাপতি সর্দ্দার পেটেলের কর্ম্ম অবাধে নিষ্পন্ন হওয়ার জন্যই তিনি পঞ্চদশ জন নেতাকে কংগ্রেসের কর্ম্মকেন্দ্রে নিয়োজিত করিলেন। সর্দ্দারের সহিত অমিল করার মানুষ এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় না থাকে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং এই কর্ম্মের সকল দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়েই চাপাইয়া লইলেন।

এরূপ কথা দশ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের বেদীতে দাঁড়াইয়া বলার অধিকার আর কাহারও হইত না। দাস-মনোবৃত্তি, কর্ত্তাভজা, এই সব কথাগুলি ভারতের আকাশে সেদিন পর্য্যাপ্ত কলরব সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি এই সব ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃঢ়চিত্তে তর্জ্জনী-সঙ্কেতে এক নিমিষে বল্লভভাই পেটেলের সহকর্ম্মী রূপে এই কয়জনকে নিয়োজিত করিলেন। আজ ভারতের মেকি ডিমোক্রেসি নির্ব্বাক্, নতশির।



মিঃ কে, এফ, নরিম্যান

তরুণদলের অগ্রণী জহরলাল, মুসলমানপ্রধান ডাক্তার মামুদ, জয়রাম দাস দৌলতরাম, মহাত্মার পুত্রতুল্য যমুনালাল বাজাজ, মহাত্মা স্বয়ং, মিঃ এম্, এস আনে, ভারতের বিদুষী সরোজিনী, ডাঃ আলাম, বিহারের বীরেন্দ্রকেশরী রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পঞ্চনদের বীর শার্দ্দূল সিং, ভারতপ্রাণ ডাঃ আন্‌সারি, বিজ্ঞ আবুল কালাম আজাদ, বোম্বায়ের নরিম্যান ও বাংলার যতীন্দ্রমোহন।

কার্য্যকরী-সভায় একুশ জনের স্থানে পনের

জন্য সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া মহাত্মা বলেন—কর্ম্ম-সিদ্ধির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই ভাল কাজ হয়, এমন কোন কথা নাই। যুক্তিতর্ক না করিয়া নেতার অনুগত মানুষই আজ দরকার। দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি বাদ দিয়াছেন বলিয়া একটু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

"It was out of his abundant love for South India that he had safely omitted names."



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

বাংলার অন্যতম নেতা সুভাষচন্দ্রকে তিনি অন্তর দিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন—বুঝা শেষ হয় নাই বলিয়াই কংগ্রেসের কার্য্যকরী-সভায় তিনিও বাদ পড়িলেন। মন রাখার দায়েই আমাদের অতীত ব্যর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতের আশা—এমন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আহত হওয়ায় আশঙ্কার অপেক্ষা তাঁর আদর্শ ও অভিমত পালনের খাঁটী মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র অবাধ করা অধিক শ্রেয়ঃ স্থির করিয়াছেন। মহাত্মা আদর্শ নেতৃ-শক্তির বিগ্রহ। নেতার আসন এমনই অটল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি হঠকারিতা করিয়া ইহা করেন না, সকল পক্ষকে পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করার সুযোগও প্রদান করেন। মহাত্মা সুভাষের সহিত এই পরিচয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বাংলার সুভাষচন্দ্র বিধাতার আশীর্ব্বাদে, মহাত্মার স্নেহশীতল আশ্রয়ে রাহুমুক্ত শশীর ন্যায় বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করুন। বাংলা তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনই চায়; দেশাত্মার বাণী তার কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিবে।

"সীমান্তের গান্ধী"—

লাল কোর্ত্তার দল মহাত্মার করাচি প্রবেশ কালে ভকৎ সিংয়ের ফাঁসী হওয়ায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণমাল্যে অভিনন্দন করে। মহাত্মা ভকৎ সিংয়ের জীবনরক্ষার জন্য কিরূপ আন্তরিক চেষ্টা যে করিয়াছিলেন এবং তাহা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর প্রাণে যে কি আঘাত বাজিয়াছিল তাহা এই তরুণ দল জানিত না। মহাত্মা বিক্ষোভের মর্ম্ম বুঝিয়া তরুণের এই ব্যথার দান মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করেন। তারপর একদল সীমান্ত প্রদেশের লোক লাল কোর্ত্তা পরিধান করিয়া মহাত্মার শিবিরে হানা দেওয়ায় অনেকে ধারণা করিয়াছিল, ইহারা আবার কি বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে আসিয়াছে; কিন্তু এই লাল কোর্ত্তা দলের নেতা আবদুল গফুর খাঁ বলেন, তিনি মহাত্মার ভক্ত, অহিংস নীতির সাধক; তিনি বা তাঁর দল মহাত্মাকে কৃষ্ণমাল্য প্রদান করেন নাই, বরং মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেই আসিয়াছেন। তখন করাচিতে "সীমান্ত প্রদেশের গান্ধী"কে লইয়া ধুম পড়িয়া যায়। আবদুল

গফুর খাঁ বলেন, হিংসা-নীতি তাহারা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে গত নয় মাসে ব্রিটিশ জাতি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বোমা উড়ো জাহাজ হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, সীমান্ত দেশের অধিবাসী তবুও অহিংস নীতির দ্বারাই ইহার প্রতিকারে উদ্যত। এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটী মহাত্মার সহিত আলাপের সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বোম্বায়ে বিশেষ আয়োজন



সীমান্তের "গান্ধী"—আবদুল গফুর খাঁ

হইয়াছিল। তিনি অহিংস ধর্ম্মই প্রচার করেন; ভারতে মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুর মতানৈক্য সম্বন্ধে বলেন—"Slaves has no religion"—দাস-জাতির ধর্ম্ম নাই, একযোগেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিয়া আমাদের জয়শ্রী লাভ করিতে হইবে। আমরা খাঁ সাহেবকে ধন্যবাদ দিব কি মহাত্মার নামে জয়ধ্বনি করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

হিন্দু মুসলমান।—

কানপুরের ঘটনায় হিন্দু মুসলমান মিলন-সূত্র একত্র হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, অনেকেই এইরূপ মত প্রকাশ করেন। আমরা বলি, অংশতঃ ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু মূলতঃ ইহা উপলক্ষ। ভারতের রাষ্ট্র আন্দোলন যতদিন বীর্য্যহীন ছিল, ততদিন এই সম্প্রদায় হিন্দু জাতির সহিত একত্র হইয়া চলিয়াছিল; কংগ্রেসের পাশে পাশেই নিখিল-ভারত ইস্লাম সভা বসিত, কংগ্রেসের প্রস্তাব নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিত—অবশ্য কংগ্রেস হইতে বিভক্ত হওয়ার মূলে দুষ্ট-রাজনীতি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তবুও সেদিন হিন্দুর আশ্রয় ছাড়িতে ইস্লাম সমাজ ভরসা করে নাই। মহাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া আলি-ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফতের সুবিধা-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সে আশা মরীচিকা হওয়ার পর তাঁহারা একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেইদিন হইতেই আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ ভিন্ন রাগিণীতে গান ধরিয়াছেন। মহাত্মা কংগ্রেসের অখণ্ড-শক্তি শিরে বহিয়া মুসলমানের সহিত একযোগে বিলাতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নূতন দিল্লীতে নিখিল-মুসলমান-ভারত-সভায় যে ভাবে নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সে আশা তাঁহাকে ছাড়িতে হইবে। তবুও তিনি বলেন, বিলাতের সুবাতাসে মিলন সম্ভব হইতে পারে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জীবন লইয়া তাঁর যাওয়া হইল না। আমরা তাঁর এই আশার মূলে কি সত্য আছে জানি না; কিন্তু আমাদের ধারণা, তিনি যদি ইহাতে ব্যর্থ হন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলন-প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে কেহ যেন আর উত্থাপন না করেন। এই উভয় সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়াই চলিতে

আরম্ভ করুক। তাঁর এই কথাই যেন সত্য হইবে বলিয়া মনে হয়—

'Either it may perhaps end itself in the exhaustion or destruction of the one community or the other."

শওকৎ আলি ভারত-ইস্লাম-সভায় বলিয়াছেন —এই ভারত আমরা সাড়ে আট শত বৎসর শাসন করিয়াছি এবং আমাদের শাসননীতির নিন্দা করিবার কিছু ছিল না—আজ আমরা নতি স্বীকার



পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

করিব? মহাত্মা ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন আমাদের অমতে এবং প্রতিবাদে কাণ দিলেন না—এত বড় স্পর্দ্ধা! হায় মহাত্মা, তবুও তোমার কণ্ঠে মিলনের রাগিণী বাজে—

"Hindus will yield if demand of the Mussalmans be unanimous. Nationalist Mussalmans want joint electorate."

জানি না মহাত্মার এই কথা ভারতের হিন্দু সমাজ স্বীকার করিয়া লইবে কিনা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলায় মুসলমানদের সহিত খুব উদার ভাবেই আপোষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে কিছু ফলও লাভ হইয়াছিল; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। ব্রিটনের নিকট হইতে রাষ্ট্রাধিকারের সুবিধা করিতে গিয়া আমরা পুনরায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় যদি আপোষ করিয়া বসি, ভবিষ্যতে অধিক অনৈক্য ঘটিতে পারে! ইংরাজের সহিত হিন্দু ভারতের মিলন যদি সম্ভব হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা চাই। এই ঐক্য নেওয়া দেওয়ার হিসাব করিয়া সিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শওকৎআলি প্রমুখ ইস্লাম নেতৃবৃন্দের স্বার্থরক্ষণ-নীতি যদি এই মিলনের অন্তরায় হয়, তবে তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ই অধিকতর বিপন্ন হইবে।

তবে ভারতে এক শ্রেণীর মুসলমান আছেন, যাঁহাদের সম্প্রদায়-প্রীতির চেয়ে দেশ-প্রীতি প্রবল, যাঁরা ভারতকেই তাঁদের জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের সহিত কোনদিন মতানৈক্য ঘটিবে না, স্বার্থের হিসাব লইয়া কলহ বাঁধিবে না। মহাত্মা এই শ্রেণীর মুসলমানসমাজ দেখিয়া হিন্দু মুসলমান ঐক্য সিদ্ধ করার আশা পোষণ করেন। তাঁর এ বিশ্বাস এমন দৃঢ়, যাহা কিছুতেই টলিতে চাহে না। কিন্তু আমরা তাঁর বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়া বলি, ইহা কোন কালে সম্ভব হউক হউক আর নাই হউক, আমাদের এই দিকের সমস্যা ছাড়িয়াই দেশের মুক্তি-পথ প্রশস্ত করিতে হইবে।

মুসলমানসমাজ জিন্নার চৌদ্দ দফা ধরিয়া বসিয়া থাকুক, ব্যবস্থাপক সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদের দাবী করুক, যে প্রদেশে মুসলমানের

সংখ্যা অল্প, সেখানে তারা নিজেদের জবরদস্তি রক্ষায় তৎপর হউক, সিন্ধুদেশ বোম্বাই প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ইস্‌লাম-রাজ্য স্থাপন করুক, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনে উদ্যত হউক, পঞ্জাব ও বাংলায় সদস্য সংখ্যা অধিক লওয়ার জন্য চীৎকার করিতে থাকুক, আমরা ভারতের মেরুদণ্ড কংগ্রেসকে জাতীয় মুক্তি-



যমুনালাল বাজাজ

পথে সর্ব্বত্যাগী হইয়া আগাইতে বলি। আজ মহাত্মার সেনাপতিত্বে কংগ্রেসবাহিনী যদি পূর্ণ জয়ী হইয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে ইংরাজের সহিত সাময়িক রণশান্তির চুক্তিতে স্বাধীনতার হিসাব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইত না। এক দিকে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি, আর এক দিকে বিজয়ী জাতির নেতৃপুরুষ সোজাসুজি বসিয়া শান্তি-পত্রে স্বাক্ষরের ব্যবস্থা হইত। মেজোরিটী মাইনরিটীর সমস্যা সেখানে আদৌ স্থান পাইত না। এই বিষয়টা বুঝিবার জন্য আমাদের অধিক দূর যাইতে হইবে না—ক্ষুদ্র নেপালের ইতিহাস কি? ঐ ক্ষুদ্র দেশে গুর্খা, নেওয়ার, মাগার, ত্রিশুলী, কারণালি, লিম্বু, রাইস, ভুটিয়া কত সম্প্রদায় পরস্পরবিরোধী হইয়া গৃহ-বিবাদ করিত; কিন্তু এমন একটা ক্ষাত্র-শক্তির অভ্যুত্থান হইল, যাহার প্রভাবে আজও এই সকল



জয়রামদাস দৌলতরাম

স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নিঃশব্দে অখণ্ড রাজশক্তির বিধান মাথা পাতিয়া পালন করিতেছে। চাই ভারতে এমনই একটা ক্ষাত্র-শক্তির অভ্যুত্থান —তা সে শক্তি সাত কোটী মুসলমান সম্প্রদায় হইতেও জাগিয়া উঠিতে পারে। আজ যেমন আমরা ইংরাজের শাসন মানিয়া জীবন রক্ষা করিতেছি, সেদিন আবার ইস্‌লামের ছত্রতলে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইব; আর এই শক্তি যদি বিশ কোটী হিন্দুর জীবন মন্থন করিয়া

সৃষ্ট হয়, তবে অবধারিত ভারতের খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসিক, যত ভিন্নধর্ম্মী সম্প্রদায় থাকুক না, শাসন-দণ্ডের অধীনতা ছাড়া আজও যেমন তারা নিরুপায়, সেদিনও তাহার বিপরীত কিছু হইবে না। একথাটা সোজা করিয়া বলিলে, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

আমরা পাঞ্জাবের মন্ত্রী মল্লিক ফেরোজ খাঁন নুনের সর্ত্তবাণী শুনিয়াছি—'If the Congress has won the power by fighting the British, we shall fight the Congress."

ইহা কি মহাত্মা জানেন না। তবে ভারতের হিন্দু চরম না দেখিয়া বিরোধ সৃজন করে না। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য, দুর্য্যোধনের নিকট একটু মাথা রাখার ঠাঁই চাহিয়া যখন নিরাশ হইলেন, তিনিই কুরুক্ষেত্র বাধাইলেন। ভারতের প্রাণ আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সুবুদ্ধিজাগরণের প্রতীক্ষায় যাচকের বেশে তাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—আমরা তাঁদের চরম কথাই এবার শুনিতে চাই। মহাত্মার প্রয়াস ব্যর্থ হইলে, আর যুগান্তরেও মিলনের কথা উঠিবে না। ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী—

কানপুরের ঘটনা ধরিয়া মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—কংগ্রেস অহিংসার নামে হিংসার মূর্ত্তিই ধরিয়াছে। কাশীর ঘটনাও তাঁহারা উল্লেখযোগ্য মনে করেন। কিন্তু ঢাকায় ময়মনসিংহে কি নিদারুণ পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ মনে রাখেন নাই? ইহা কংগ্রেসের অপরাধ নয়, ভারতের জাতীয়তা ইহার জন্য দায়ী। ভগৎ সিং যদিও হিংসাধর্ম্মী, কিন্তু দেশের মুক্তিপ্রার্থী; এই জন্যই তাঁর ত্যাগ ও সাহসের মর্য্যাদা দিতে ভারতের প্রাণ উদ্বুদ্ধ; এইজন্যই একদেশবাসী বলিয়া হিন্দু মুসলমানের সহযোগিতা প্রার্থনা করে। মহাত্মার কথামত এই দিক্ দিয়া ভারতের মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সহিত কোনরূপ সংযোগ-সূত্র রাখিবেন না, এইরূপ একটা উক্তি পাইলেও আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি; কিন্তু মুসলমান-সমাজে এখনও ডাঃ আন্সারি, আবদুল কালাম আজাদ, সীমান্ত প্রদেশে জফর আলি খাঁ প্রভৃতির মত



৺গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী

সদাশয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আছেন বলিয়াই ইহার চেয়ে বৃহত্তর সান্ত্বনার প্রতীক্ষা আমাদের করিতে হয়।

কানপুরের ঘটনায় কংগ্রেসের প্রাণ কি আত্ম-পরিচয় দেয় নাই! কৈ সে কথা তো নিখিল-ভারত ইস্লাম সভায় কেহ উত্থাপন করেন নাই? কংগ্রেসের প্রতিনিধি গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী প্রচণ্ড আহবে রিক্ত হস্তে অহিংসার বাণী উচ্চারণ করিয়া উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে শান্ত করিতে গিয়া যে আত্মদান

করিলেন তাহা কি উল্লেখযোগ্য নহে! অহিংস ব্রতের এমন জলন্ত নিদর্শন অতিরিক্ত স্বার্থপর না হইলে কেহ অস্বীকার করে না! কত শত মুসলমান ভাইদের জীবন রক্ষা করিতে, কত আহত নাগরিকের শুশ্রূষা করিতে করিতে, এই দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ আজ নিষ্ঠুর ঘাতকের হস্তে শেষ হইলেন—ইহাও কি হিন্দুজাতি ভুলিতে পারে?

প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে মুসলমানই তো এই জীবন্ত লোকটীকে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তিন জন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক তাঁর সহায়তা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন নিহত, দুইজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। আমরা এই ইসলাম সহিদ্‌দের চিরদিন স্মরণে রাখিব, আর বীর গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলি—

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরিল ধরণীতে—

—তাহাও ব্যর্থ হইবে না। দেবতার পূজার অর্ঘ্য, তুমি আরও শক্তি, আরও দিব্য হৃদয় লইয়া ভারতীর মন্দিরে ফিরিয়া আইস! হে পূজারী, তোমার প্রতীক্ষায় আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকিব।

রাজবন্দী ও মহাত্মার আপোষ—

কতকটা বিদ্বেষ, আর কতকটা অজ্ঞানতা আমাদের দেশের বৃহৎ শক্তিকে অকারণ ক্ষুণ্ণ করিয়া জাতিকে বিপন্ন করিতে চায়। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, মহাত্মার সহিত আরউইনের যে চুক্তি তাহা উভয় পক্ষের সাময়িক রণক্ষান্তি, ইহা স্থায়ী শান্তি-সর্ত্ত নহে; এইজন্য আমাদের সকল দাবী ইহা দ্বারা পূরণ হওয়ার আশা দুরাশা।

ভকৎ সিংয়ের ফাঁসী মহাত্মার শত চেষ্টায় মকুব হইল না; মহাত্মা কতটা নিরুপায় ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন—অতএব বাংলা ও পাঞ্জাবের সকল রাজবন্দী যে বর্ত্তমান সর্ত্তানুসারে মুক্তি পাইল না, তাহার জন্য মহাত্মাকে দায়ী করা চলে না। উভয় পক্ষের মধ্যে বুঝা পড়া যদি একটা নিষ্পত্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন জাতির সকল দাবী পূরণ করিবার সুযোগ হইবে।



সর্দ্দার ভকৎ সিং

অনেকে মনে করেন, মহাত্মা সত্যাগ্রহীদের মুক্তিই চাহিয়াছেন, অন্যান্য রাজবন্দীদের জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ নাই। কিন্তু অহিংসব্রতী হইলেও দেশপ্রীতির মর্য্যাদা দিতে যে তিনি অকুণ্ঠ, তাহা ভকৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁর মর্ম্মাহত হওয়াই ইহা সপ্রমাণ করে।

রাজবন্দীদের মধ্যে সকলেই যে হিংসব্রতী, ইহার প্রমাণ নাই; বিনাবিচারে বন্দী বলিয়া এইরূপ যুক্তি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখিতে

হইবে, রাজশক্তি যে বিধানবলে বিনাবিচারে দেশের অন্যান্য তরুণকে কারাগৃহে বন্দী করার সুবিধা করিয়াছেন, সে নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে দেশে অনেক আলোচনা, আন্দোলন, প্রতিবাদ হইয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রতিকার হয় নাই। যাহাকে বন্দী করা যায়, রাজশক্তির নিকট তাহার অপরাধ পরিজ্ঞাত হওয়া এবং বন্দীকে সে বিষয় শুনাইয়া তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটকাইয়া রাখাই এই আইনের বলে সিদ্ধ হয়। এই হেতু আমরা



রাজগুরু

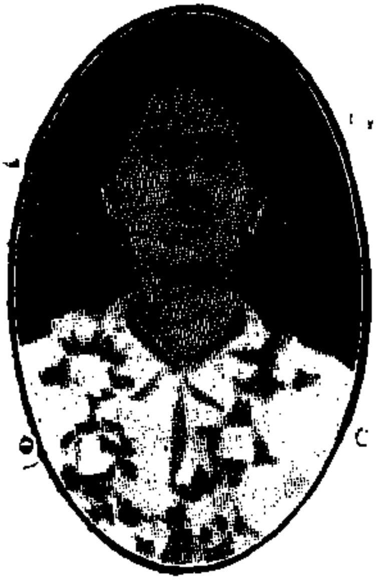
যতই বলি, বিচারে যখন সপ্রমাণ হয় নাই, তখন হিংসা অপরাধে কাহাকেও দায়ী করিয়া বন্দী করা যুক্তিসঙ্গত নহে—ইহা অরণ্যে রোদন মাত্র। এই আইন উঠাইতে হইলে, রাষ্ট্রশাসনের অধিকার আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। কংগ্রেস সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে হইবে।

এই অবসরে আর একটা কথা বলিবার আছে। মহাত্মার নিকট হইতে আমরা যেমন ভকৎ সিংহ প্রমুখ বিপ্লববাদীদের জীবনরক্ষায় দাবী করিতে পারি, মহাত্মার দিক্ হইতেও তদ্রূপ বিপ্লববাদীদের উপর একটা দাবী আছে, তাহা হইতেছে—তিনি যখন একটা নীতি ধরিয়া রাষ্ট্র-শক্তি অধিকারে অগ্রসর এবং এখনও পর্য্যন্ত ভারতের কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তখন বিপ্লব-পন্থীদেরও তাঁর কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য নয়। মহাত্মা যদি পরাজয় স্বীকার করিয়া ঘরে ফিরেন, তখন বিপ্লবীদলের কর্ম্ম অবাধ হউক—আপত্তি নাই। কংগ্রেস জাতীয় রাষ্ট্র-চক্র, সেই চক্রের কর্ণধার জাতির নেতৃ-স্বরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মহাত্মার প্রাণপাত প্রয়াস কোন দিক্ দিয়া ক্ষুণ্ণ না হয়, ইহা এক্ষণে সকল পক্ষ হইতেই দেখিতে হইবে।

বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়ার অজুহাতে চিরপ্রথামত প্রেণ্টীস সাহেব দেখাইয়াছেন—আগষ্ট মাস হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলায় তিপান্নটী বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। উপস্থিত বাংলায় ৫৩১ জন রাজবন্দী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১২জন কেবল পুলিশে তাহাদের বিষয় যথারীতি সংবাদ দিয়াই রেহাই পাইয়া থাকেন, সাত জনকে তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, পাঁচজন গ্রামে বন্দী আছেন, ৬ জনকে বাংলা হইতে নির্ব্বাসন করা হইয়াছে, কুড়ি জনের জন্য গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন, শীঘ্রই তাহাদের স্ব স্ব গৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইবে ; অবশিষ্ট ৩৮৬ জন জেলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বন্দী আছে।

ইঁহাদের মধ্যে ১৩৭ জনকে বক্সারে রাখা হইয়াছে, এবং ৯০ জনকে হিজলীতে বন্দী করা হইয়াছে। বিনা বিচারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"Case has been done for each and every one was personally satisfied." এবং এই

কথা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি হিসাবও দাখিল করিয়াছেন। একজনকে সোজাসুজি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; একজন বদ্ধ উন্মাদ, দুইজনের বিচার প্রকাশ্য আদালতে হইয়াছে, একজন পলাতক, দুইজনের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে, আর ৬৮ জন নিরপরাধ স্থির হওয়ায়, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।



শুকদেব

এই সকল মামুলি কথায় জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু নিরুপায় বলিয়াই আমাদের এখন নীরব থাকিতে হইবে। এই আইনের বিরুদ্ধে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আন্দোলন প্রতিবাদ চলিতেছে; ফল যখন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে—চীৎকার করিয়া লাভ নাই। কংগ্রেস যদি স্বায়ত্তশাসনে সমধিক অধিকার অর্জ্জন করে, তখন এ দাবী আমাদের যুক্তিসঙ্গত হইবে।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের বিরুদ্ধবাদ থাকিলেও এবং জনসাধারণের মনে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হইলেও, এই বিভাগে অতিরিক্ত ২৩১০০৲ টাকা খরচের বরাদ্দ হইয়া গেল। ইহার বিরুদ্ধে ৯৭ জন উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে ১৪ খানা ভোট পড়িয়াছিল। দরদের মূল্য কোথায়, তরুণদের একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি!

স্বদেশীর ফল—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাজারে ৮০,২৯০ কাপড়ের গাঁট বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৯৭,২৭৬ গাঁট বিক্রয় হয়; অহিংসসংগ্রাম-যুগে অর্থাৎ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৩০০০০ হাজার গাঁট মাত্র বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতে ব্রিটেনের ব্যবসায়ে অধিক ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ৪৫০০০ গাঁট আমদানী হইয়াছিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৫৬২৩ গাঁট কাপড় চালান আসিয়াছে।

অন্য পক্ষে, ভারতের কাপড়ের কাটতি কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১২,২১৮ গাঁট কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১৪,৩০০ গাঁট ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২০,৪০৩ গাঁট কাপড় বিক্রয় হইয়াছে।

যে সংগ্রামে জাতির ক্ষয়ই সবখানি নয়, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও পূরণ চলিতে থাকে, তাহাই দিব্য সংগ্রামনীতি। মহাত্মাপ্রবর্ত্তিত এই নূতন নীতিই ভারতের সকলকে আমরা একযোগে গ্রহণ করিতে বলি।



সঙ্কলন ও সমালোচনা

সঙ্কলন

বাংলার বেদ—

আমাদের স্থানাভাব—নতুবা "বাংলার প্রাণবস্ত"—(শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিত, প্রবাসী, চৈত্র) সবটুকুই এখানে সঙ্কলন করিয়া দিতাম। ক্ষিতিমোহন বাবুর মুখে বাংলার বেদই ফুটিয়াছে। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন :—

"দেশের যে গভীর স্তরে দেশের প্রাণবস্তুটী নিহিত থাকে, দীর্ঘকাল সেখানে বিচরণ করে' এইটুকু বুঝেছি, যে বাংলার সাধনার ধন হল—সহজ মানুষ। শাস্ত্র নয় বেদ নয়, প্রথা নয়, নিয়ম নয়—মানুষই হল তার সাধনার লক্ষ্য। এই মানুষের পরিচয় মেলে ভাবে, প্রেমে—ব্যবহারে বা সামাজিক প্রভৃতি কোন কৃত্রিম উপায়ে সে পরিচয় মেলে না; বরং প্রয়োজন ও ব্যবহারের তামসিক বাধায় মানুষের সহজ সাত্ত্বিক স্বরূপটী আরও আড়াল প'ড়ে যায়।

সহজ হতে পারেন নি বলে' বাংলার এই প্রাণবস্তুর সন্ধান শিক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকেরা বড় একটা পান নি। বাউলে যে বলেছেন—

যদি ভেট্‌বি সে মানুষে।
তবে সাধনে সহজ হবি, তোরে যাইতে হবে সহজ দেশে।"

এই সহজকে পাবার ব্যগ্রতায়, প্রবৃত্তির বেগে কাম ও প্রেম ভ্রমে বার বার বাঙ্গালী পথভ্রষ্ট হলেও সাধনার রূপ মলিনতার মধ্যে নেমে পড়লেও, তবু কি কখনও তার যাত্রায় বিরাম ঘটেছে? "সাধনার জগতে এই বিপদ্‌টাই ছিল বাংলার প্রধান সমস্যা।"

"ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্বের সব কৃত্রিম অভিমান ঠেলে ফেলে দিতে পেরেছিলেন বলেই তো চণ্ডীদাস মানবধর্ম্মের এই মহামন্ত্রটী উচ্চারণ করতে পারলেন—

শুনহ মানুস ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

সহজের খবর রাখে সহজ মানুষেই। শাস্ত্রে পুঁথিতে সে রহস্য ধরা পড়বে কেমন করে? বাউল নিতায়ের কথা—"কারু সংসারের জমা খরচের খাতা দেখে কি তার প্রাণের খবর কখনও মেলে?"

এই সব কারণেই বাংলা দেশের এই মর্ম্মের কথা ভারতের অন্য অংশের বেদ ও শাস্ত্রপন্থী আচারনিয়মনিষ্ঠ ভদ্রজনেরা কোন দিনই বুঝে উঠতে পারেন নি।"

কথাগুলি অভ্রান্ত সত্য।

ক্ষিতিবাবুর একথাও খুব আশ্চর্য্য সত্য—

"আমাদের দেশে বড় আস্‌বার কোণ হল উত্তর পশ্চিম বা বায়ুকোণ। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণটা হল তেমনি ভাব-বিপ্লবের কোণ।"

বাংলা তাই সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদ-বিদ্রোহের দেশ—বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা বেদ-দ্রোহী তৈর্থিক মতবাদের আশ্রয়ভূমি—নাথ, নিরঞ্জন, যোগী প্রভৃতির জন্মস্থান। "এখানেই গোপীচাঁদের গাথায়, আউল বাউলের গানে, বৈষ্ণবের কীর্ত্তনে, বৈদিক ধর্ম্ম ও আচারের শাসন কালে কালে খণ্ডিত হ'য়ে এসেছে।......গৌড় বঙ্গের চিন্তা ও সাধনার যা মৌলিকতা তা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, এই সব প্রাকৃত জনগণের মধ্যে, যাঁদের পণ্ডিতেরা মনে করতেন নিরক্ষর ছোট লোক।"

"ভদ্র ও পণ্ডিতজনেরা যাই মনে করুন না কেন, এই সব নাথ যোগী প্রভৃতি মতবাদীরা কিছুতেই তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেন নি—তাই পরে পুনরুত্থিত হিন্দু সমাজের বুকে তাদের স্থান হল হেয়।"

"উত্তর পশ্চিম, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের মরমিয়া সাধনার ভাষায় গৌড় বাংলার নাথযোগীদের ভাষার স্পষ্ট ছাপ আছে।" দাদূ ছিলেন নাথ-পন্থী। কবীর প্রভৃতি ভক্তদের লেখার যে হেঁয়ালী সব নাথপন্থের হেঁয়ালী। "গোরখ-ধংধা"ই হয়েছে শেষে "গোলক-ধাঁধা।"

"বাংলার সহজ প্রাণের প্রকাশই হল—দেওয়ায় ও নেওয়ায়; শাস্ত্রজ্ঞানহীন ছোট লোকেরা সহজেই দিতে পেরেছেন, নিতেও পেরেছেন, কারণ তাঁদের কোন কৃত্রিম বাধা বন্ধনের বালাই ছিল না।"

"সহজ ভাবের সাধক নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনেই ধরা পড়ে মহাপ্রভুর অসামান্য প্রতিভা; তাই চৈতন্যচরিতামৃত যে পরিমাণ বৈষ্ণব গ্রন্থ সেই পরিমাণ বাউল। এই বাউলরা নিজেদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটী তীর্থমন্দির বা ঠাকুর ঠোকর প্রভৃতি কিছুরই কাছে বিকিয়ে দেয় নি। তাই চিরদিন ভদ্র আচারনিষ্ঠ দলের তারা চক্ষুশূল। এই ঝগড়া বহুকালের পুরান।"

"ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বঙ্গ মগধের ভাষাকে বলা হয়েছে পাখীর কিচির-মিচির। ......বাংলার সাধকরা ছিলেন পাখীর মতই বাধাবন্ধহীন।"

বাংলার বাণী হ'ল—

"প্রণমহ কলি-যুগ সর্ব্বযুগ-সার।"

লেখক ইহা হইতে ঠিকই ধরিয়াছেন—

"অতীতকে অগ্রাহ্য করে' এমন সাহসে বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার বাণী অন্যত্র দুর্ল্লভ। অতীতের ধ্বংসস্তূপ আঁকড়ে পড়ে' থাকবার মত মনের ভাব তার নয়। খুব সম্ভব, তার আপন ভূমির কাছে এই দীক্ষাটী সে পেয়েছে। ......এখানকার নিত্য নব প্রাণে জীবন্ত ভূমির ইঙ্গিতটী বেদশাস্ত্রানুযায়ী ধরতে পারলেন না। এই দীক্ষাটী নিতে পারলেন তাঁরাই যাঁরা নিতান্ত ছোট লোক—এই ভূমিরই সন্তান যাঁদের কথা অথর্ব্ববেদে উচ্চারিত হয়েছে মহীসূক্তের মাতা ভূমি—ভূমির "পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ" (অথর্ব্ব ১২,১,১২)—এই বাণীতে। এই দীক্ষার সাহসে এঁরা মন্দির হইতে ঠাকুর ঠোকর উঠিয়ে দিয়ে বসালেন এনে মানুষকে। তাঁদের সাধনা হ'ল বিশ্বের সঙ্গে যোগ—তার চেয়েও বড় কথা নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও যোগস্থাপনা।"

"বাংলার ধর্ম্মে ও কর্ম্মে যেটুকু গোঁড়ামী তা এখানকার ঠিক নিজস্ব নয়—বাইরের গোঁড়া শ্রেণীর ভদ্র ও পণ্ডিতদের। এই নিত্য প্রাণ রসে জীবন্তভূমির সঙ্গে তাঁদের ঠিক খাপ খায় নি।"

"বাংলার ছোট লোকেরা সংস্কারমুক্ত। শাস্ত্রে আচারে তাঁদের বাঁধে নি। ......নাথপন্থী প্রভৃতি মতের সর্ব্বত্রই স্বাধীন মতবাদ দেখতে পাই। বাংলার তন্ত্রশাস্ত্রেও এই স্বাধীন মতবাদ বহুস্থানে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তাতেও বাংলার বাউলদের কুলালো না। এদেশের আউল বাউলেরা এমন একগুঁয়ে, যে এতদূর স্বাধীন এই সব মতবাদও বৃথা বন্ধন বলে' অনেক অংশেই দিলেন উড়িয়ে।"

নাথেরা কথাগুলি বড়ই সুন্দর ও রহস্যপূর্ণ। কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান নাই

বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গিয়াই লেখক শেষে এই পরমরহস্যের সন্ধান দিয়া ফেলিয়াছেন—

"সূচী যেমন নানা রত্নকে বিদ্ধ করে' এক সূত্রে গেঁথে ফেলে, ...সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবচক্র বা পদ্মকে বেধ করে' যে ঐক্য-সূত্রে সহস্রদল কমলের রসপান, তাই হ'ল কায়াযোগের গোড়ার কথা। কায়াযোগের প্রাচীন গুরুই বাংলা দেশ।"

এখানেও এই বিশিষ্টতা—

"মানুষের উপরেই এঁদের ভরসা; তাই বেদশাস্ত্র প্রথা সব অগ্রাহ্য করে' গুরু ও সাধকদেরই এঁরা স্বীকার করেন।"

"শাস্ত্রের হাতে মার খেয়ে খেয়ে শাস্ত্রের উপর ওদের ধরে' গেছে বিষম বিতৃষ্ণা।"

এঁরা বলেন—

"ভবিষ্যতে যে আবার মহোৎসব হতে পারে এই ভরসা যাদের নেই তারাই তো সব এঁটো পাতা কুড়িয়ে রেখে দেয় স্তূপ করে'। মহোৎসব করে' তোলবার ভরসা নেই—কেবল এঁটো পাতা কুড়িয়েই অহঙ্কার। আর কার কত বেশী স্তূপ, তাই নিয়েই শিয়াল কুকুরের ন্যায় পরস্পরে শুধু কামড়াকামড়ি।"

এত বড় উদারতার বাণী আধুনিক যুগের চরমতম মুক্তিপন্থীর মুখেও কি আমরা আশা করিতে পারি?

তারপর বাউল মদনের কথা—

"সহজে যদি বা পথ চিনতো, ধর্ম্মেই করেছে সর্ব্বনাশ। যে ধর্ম্মে ডুবে মানুষ জুড়াবার করে আশা, তাতেই লেগেছে আগুন। এখন উপায় কি?"

সত্যই এই তো যুগের সমস্যা। আর বাঙ্গালীই কি এই সমস্যার সমাধান করিবে না?

সমালোচনা

সনাতন হিন্দু—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ মাত্র।

কালধর্ম্মে বিশ্বজয়ী হিন্দু আজ আত্মবিস্মৃত, সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি। হিন্দুর সনাতনত্ব—তাহার জীবনের অচলায়তন গড়িয়া তুলে নাই; পরন্তু যুগে যুগে কালের গতির সহিত পরিবর্ত্তনকে বরণ করিয়া, সকল বিপ্লব ও অন্তর্বিদ্রোহকে কুক্ষিসাৎ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ স্বীয় কালজয়ী প্রভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বহুদিন হইতে এই সঞ্জীব জীবননীতি হারাইয়াই হিন্দু পঙ্গু ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, পণ্ডিত তর্কভূষণের ন্যায় হৃদয়বান্ মনীষী আন্তরিক সদ্ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই, স্বয়ং গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজ-জাত হইয়াও, উদার দৃষ্টি ও প্রাণের দরদ মিশাইয়া বাংলার হিন্দু সমাজকে সনাতন হিন্দুত্বের খাঁটি মর্ম্মকথা শুনাইতেছেন ও এই ঘোর যুগসঙ্কটে বাঁচিবার প্রকৃষ্ট পথ কি, তাহারই সঙ্কেত প্রদর্শন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গের কয়েকটী স্থানে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাই সঙ্কলন পূর্ব্বক এই উপাদেয় ভাব ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন।

বইখানি সকল দিক দিয়াই যুগোপযোগী হইয়াছে। ইহা যুগেরই বাণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের হিন্দু আজ জাতি হিসাবে যদি বাঁচিতে ও আত্মরক্ষা করিতে চায়, তবে সত্যই আর একবার "শাস্ত্রাণি শাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি"—শ্রুতি স্মৃতির নূতন ও খাঁটি ভাবেই মর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইবে। বৃহৎ ও ঋতময় জীবন অনুসরণ করিয়াই শাস্ত্রকে দেখিতে ও চিনিতে হইবে—হিন্দুর উন্নতি পতনের যে ইতিহাস, নূতন চক্ষেই তাহার আবার পাঠোদ্ধার করিতে হইবে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠ চিরিয়া এই মর্ম্ম-ভাষণ সেই নবজীবনেরই অনুপ্রেরণা যদি জাতির হৃদয়ে জাগাইয়া তুলে, তবেই তাঁহার আন্তরিক আশা পূর্ণ হয়। গ্রন্থখানি হিন্দু মাত্রের দৃষ্টি উন্মীলনে সহায়তা করুক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব-বারিধি এম্-এ প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, কিন্তু এই বিশ্বাস আত্মানুভূতিলব্ধ না হইলে অটল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। গ্রন্থকার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, অবতারবাদ, ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, দেববাদ প্রভৃতির আলোচনায় সুগভীর দার্শনিক মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। শুধু তত্ত্ব লইয়াই তিনি আলোচনা শেষ করেন নাই, ধর্ম্মের সাধনা লইয়া যত সমস্যা উঠিতে পারে, সে বিষয়েও একটা পূর্ণতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস করিয়াছেন। চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকা ইহার মধ্যে চিন্তার অনেক নূতন দিক্ ও উপাদান খুঁজিয়া পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।



প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া মেলা ও প্রদর্শনী—চন্দননগর

নবম বর্ষ

আগামী ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার (ইং ২১শে এপ্রিল) উৎসব আরম্ভ হইবে। ইহার সহিত একটী স্বদেশী প্রদর্শনীতে দেশের শিল্পাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ২০শে বৈশাখ ইং ৩রা মে শেষ হইবে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় উৎসব প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নহে, দেশের ও জাতির। প্রায় এক পক্ষকাল ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, রাষ্ট্র, সাহিত্য সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহাতে যোগদান করিয়া আমাদের ধন্য করেন। আমরা সুহৃদ্-মণ্ডলীকে, তরুণ বন্ধুদের ও সর্ব্বশ্রেণীর নারী পুরুষকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছি।

২১শে এপ্রিল, ৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকায় দ্বারোদ্ঘাটন—সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। আলোকচিত্রে বক্তৃতা "ইউরোপের অভিজ্ঞতা"—ডাঃ ডি, এন্, মৈত্র।

২২শে—৫॥০ ঘটিকায় আলোকচিত্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গোস্বামী।

২৩শে—ব্যায়াম কৌশল ও "সন্তানসঙ্ঘ" কর্ত্তৃক আলোকচিত্রে বক্তৃতা।

২৪শে—চরকা প্রতিযোগিতা ও আলোকচিত্রে 'ভারতে খাদি প্রচার' বক্তৃতা—সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

২৫শে—সভা—পরিচালক শ্রীযুক্ত সত্যকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোকচিত্রে বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী।

২৬শে—হিন্দু সভা—সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। সঙ্গীত সভা—ভারতপ্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র নিবাসী প্রোঃ হাফেজ আলী খাঁ স্বরদ বাজাইবেন।

২৭শে—মহিলা দিবস—সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা নাগ। "স্বপ্ন-ভঙ্গ" অভিনয়।

২৮শে—"কুটির শিল্প ও কৃষি" সম্বন্ধে বক্তৃতা—বক্তা—সভাপতি শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু।

২৯শে—কংগ্রেসের মর্ম্মকথা—সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। আলোকচিত্রে "ভারতে ধর্ম্ম-যুগ" বক্তৃতা।

৩০শে—ইসলাম সভা—সভাপতি মৌলবী আক্রাম খাঁ।

১লা মে—"আয়ুর্ব্বেদ ও দেশীয় ঔষধ" সম্বন্ধে ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, এম্-ডি কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

২রা মে—সাহিত্য সভা—সভাপতি রায় বাহাদুর জলধর সেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায়—পূর্ণিমা সম্মিলন ও তৎপর "জাতি গঠনের মূলে ভারতে ধর্ম্মের স্থান"—সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বক্তৃতা।

৩রা মে—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাতের "রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেন্সে"র তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

উৎসবের কয়দিনই মেলাক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান রেডিও করপোরেশন ভারতে প্রস্তুত 'ইরি' যন্ত্র দ্বারা বেতারবার্ত্তা জানাইবেন।

চট্টল প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

বিদ্যাপীঠ

দুই বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যার্থিভবন আরম্ভ হইয়াছিল, শিক্ষার্থীরা স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়িত, আশ্রমের পবিত্র আব্‌হাওয়ায় আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চরিত্র গঠনের সহায়তা লাভ করিত। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ প্রস্তুত করিতে শিক্ষার্থীর যে সময় ও শক্তি ব্যয় হয়, তার পরে উচ্চতর আদর্শে জীবন গঠনের নীতি সম্যক্ অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভবপর হয় না দেখিয়া এবার আশ্রমেই সঙ্ঘের নিজস্ব 'শিক্ষা-নিকেতন'—'প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাহাতে খাঁটি ভারতীয়

চরিত্রলাভ করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সাধনলব্ধ জ্ঞান এবং শক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিদ্যাপীঠের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্যনীতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সঙ্গীত, ব্যায়াম ইত্যাদি শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত কৃষি, গোপালন, বস্ত্রবয়ন, রং ও ছাপের কাজ প্রভৃতিও শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন একটি কাজ শিক্ষার্থী গ্রহণ করিবে। নিবিড় দেশপরিচয় শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ, এই বিশিষ্ট অঙ্গপরিপুষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর পল্লী-ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। তাহারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া পল্লীর ছোট ছোট বৈঠকে, সভায়, উৎসবে—সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, পল্লীর কথা আলোচনা—সূতা কাটা, খাদি প্রচার ইত্যাদির ভিতর দিয়া পল্লীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পায়। এজন্য বৎসরের মধ্যে একমাস নির্দ্দিষ্ট আছে, তা ছাড়া ছুটির সময়েও ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়।

এবার যে ত্রিশ বিঘা নূতন জমি কেনা হইয়াছে, সেখানেই গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করা হইতেছে। উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা হইলে আগামী বর্ষেই সেখানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বিদ্যাপীঠ স্থানান্তরিত হইবে।

পল্লী-গঠন বিভাগ

ইহার প্রধান কেন্দ্র—শাকপুরায়; লোকালয়ের অনতিদূরে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যেই আশ্রম। সম্মুখেই নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী। মৎস্য চাষের জন্য আরো দুটি পুষ্করিণী আছে। জলে প্রচুর মাছ পাড়ে, সবুজ সব্জী বাগান, আশ্রমের পার্শ্বেই কৃষিক্ষেত্র, গঠনব্রতী সঙ্ঘ-সাধকগণ নিজস্ব মাটী ও জল হইতেই আপনাদের অন্নমুষ্টি কোন প্রকারে সংগ্রহ করে। এখানে বহু কৃষকের বাস, তাদের কাটা সূতায় স্থানীয় তাঁতীরা ও খাদি প্রস্তুত করে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আশ্রমে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দরিদ্র কৃষক শিশুরাই এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার্থী। এবার পল্লী-গঠন বিভাগের একটা নূতন উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শতাধিক পরিবার লইয়া একটা আদর্শ পল্লী-গঠনের আয়োজন চলিতেছে।

পটিয়া কেন্দ্র

শাকপুরা হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে পটিয়া থানার মুন্সেফী কোর্ট। এখানে এবার পল্লী-গঠন বিভাগের নূতন কেন্দ্র হইল। সম্প্রতি এখানে সূতা ও খাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের কেন্দ্র আরম্ভ হইয়াছে।

কুতুবদিয়া কেন্দ্র

এখানে ব্যাপক খাদি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, তাঁতী, কৈবর্ত্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যও খুব ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপের বিশ সহস্র অধিবাসীর মধ্যে দেড় শতের অধিক বালক বিদ্যালয়ে যাইত না। আজ এখানে সঙ্ঘের গঠন-ব্রতীদের চেষ্টায় পঞ্চশতাধিক বালক বালিকা প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা লাভ করিতেছে। এখানকার আশ্রমেই অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। আশ্রমভূমি আজ হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষার্থীর পাঠধ্বনিতে মুখরিত। শিক্ষার জন্য এই দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আজ বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

খাদিপ্রচার

চট্টগ্রাম তুলা ও খাদি উৎপাদনের জন্য বাঙ্গলার প্রধানতম কেন্দ্র কিন্তু এখানে ভেজাল খাদির প্রচলনও যে নাই তাহা নহে; স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা মিলের মোটা সূতায় প্রস্তুত কাপড় খাদি বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রী করিয়া খাদির প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। খাদিপরিধানকারীদের এই স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর হাত হইতে রক্ষা করা দরকার। সঙ্ঘ এজন্য ব্যাপক খাদি প্রোপাগাণ্ডার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইতিমধ্যে তিন দল খাদিপ্রচারক প্রচুর খাদি লইয়া সন্দীপ, আকিয়াব এবং রাঙ্গামাটি গিয়াছে, আরও ২।৩ দল প্রচারক গ্রামের দিকে যাইবে।

পূর্ণিমা-সম্মিলনী—১৯শে বৈশাখ, ২রা মে শনিবার যথারীতি রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পূর্ণিমা-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

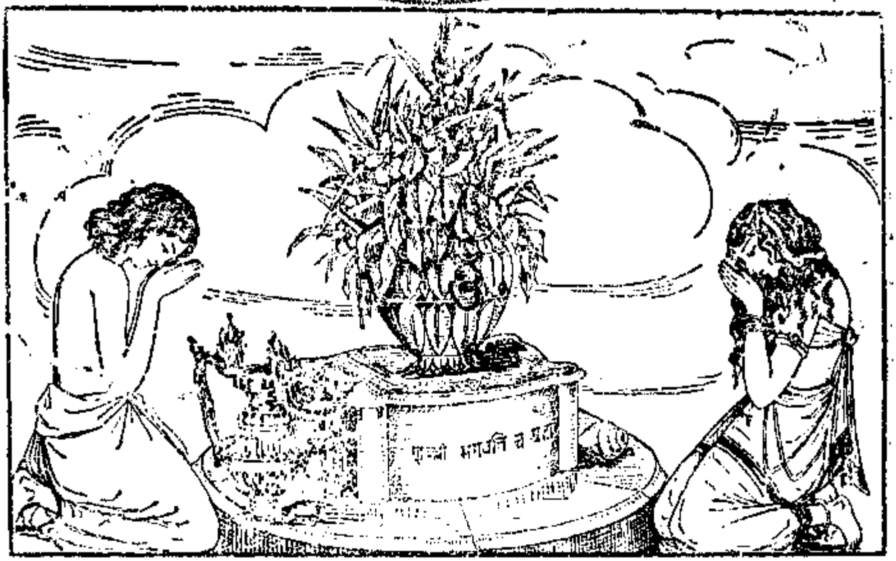
প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,
[illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



বরাহ-অবতার

চিত্রাধিকারী - ভারত চিত্র-কলা পরিষদ, কাশী।



১৬শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

জ্যৈষ্ঠ,
১৩৩৮।

গঠন-নীতি

—:•:—

দেশের রাষ্ট্রশক্তি যদি আমাদের করতলগত না হয়, তবে আমরা কোনদিকেই যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইব না; এইজন্য রাষ্ট্র-সাধনায় আজ জাতির জাগ্রত প্রাণের সবখানিই এক প্রকার নিয়োজিত হইয়াছে। মহাত্মার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ রাষ্ট্রগুরু রূপে আবির্ভূত হওয়ায় আমরা অচিরেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমধিক শক্তি অধিকার করিব, ইহা অবধারিত। প্রতিপক্ষও আজ এ কথা অস্বীকার করেন না।

কিন্তু পথের অন্তরায়গুলি আমাদের সকলকেই সাধ্যমত দূর করিতে হইবে। কংগ্রেস আজ যে শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা অসাধারণ; কিন্তু তবুও কংগ্রেসের দাবী উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কংগ্রেসের জয়যাত্রা যদিও ইহাতে রুদ্ধ হইবে না, কিন্তু অধিক শক্তি ও সময়ের ব্যয় হইবে, অধিক নির্য্যাতন, উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে, অধিক ত্যাগ তপস্যার প্রয়োজন হইবে। তাহার জন্য দেশের প্রত্যেক নরনারী প্রস্তুত হইয়া

উঠিতেছে। আরও অধিক বেগে আমাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই পথে জাতির শক্তি তবেই বিমুখ হইয়া ফিরিবে না। তবেই আমরা অব্যর্থ চরণে লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইব।

মুক্তির দিন যত আসন্ন হইয়া উঠে, ততই শ্রেয়ঃ। বিনাইয়া বিনাইয়া কালবিলম্ব করিলে আমাদের ক্ষতির মাত্রা অধিক হইবে। মানুষের মধ্যে জড়তা ও অস্পষ্টতা স্বাভাবিক। এই জন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে নিরন্তর ভাব ও কর্ম্মের প্রবাহ রক্ষা করিতে হয়, তামসিকতা প্রশ্রয় পাইলে জয়ের শুভক্ষণ বহিয়া যায়। ক্ষয় অধিক হয় বলিয়া জয়ের উল্লাস জাতিকে সবল শক্তিমান্ করিয়া তুলে না। যাহা চাই—তাহা এই মুহূর্ত্তেই ঘটাইয়া তুলিব, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ও নিবিড় সংবেগ নেতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে জাগাইয়া রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য দাবী এইরূপ উদ্যত জীবনের মূলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এই হেতু বৃহৎ কর্ম্ম সাধন করিবার যুগে, অসংখ্য নারীপুরুষ স্ব স্ব অভীষ্ট বস্তু হইতে বিরত হইবে। এই ত্যাগ ও তপস্যার প্রভাবে জাতি সার্থক হয়, দেশ বড় হইয়া উঠে।

কংগ্রেসের ক্রীড্ সহি করিলেই জাতির দাবী পালন করার অধিকার মিলে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আজ প্রত্যেক কর্ম্মীকে সৈনিকের ন্যায় নেতার আহ্বান মাত্র সমর-প্রাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বিগত আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রে অর্থাভাব হয় নাই; বরং অর্থবল কর্ম্মের সহায় হইয়াছিল। ভবিষ্যতে হয় তো এই সুবিধা পাওয়া যাইবে না। অসংখ্য কর্ম্মীর কিরূপ নিঃস্বার্থ চরিত্র-বল প্রয়োজন, ইহা হইতে বুঝিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। আজ স্বদেশবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ, অনৈক্য, পরশ্রীকাতরতা আদৌ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, তাহার জন্য সতর্ক হইতে হইবে। বিশেষ, বাংলা দেশ কয় বৎসর ধরিয়া যে মনের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে তাহাদের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। অতঃপর আত্মকলহের দায়ে বাঙ্গালী ভবিষ্য সংগ্রামে যেন অক্ষমতার পরিচয় না দেয়! বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতাসংগ্রামে অগ্রণী ছিল, আজ অন্যরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর আসন অনেক নীচে পড়িয়াছে, ইহার জন্য আমরাই দায়ী। নিজেদের চরিত্রবল বৃদ্ধি করিয়াই, আমরা জাতির পুরোভাগে বীরের মত দাঁড়াইব—এই সঙ্কল্প লইয়া আমাদের আত্মশুদ্ধির সাধনা করিতে হইবে।

জাতিভেদ উন্নতির পরিপন্থী। অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলিয়া যাহাদের উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহারা জাতির সাফল্যে নিজেদের কৃতার্থতা খুঁজিয়া পায় না, এইজন্য বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের সহিত সমগ্র জাতির প্রাণ ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমাদের আন্তরিকতা চাই, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়াই আমাদের সম্বন্ধকে দৃঢ় করিতে হইবে। বিশ কোটী হিন্দুর একুশ কোটী ধর্ম্মমত, সমাজমত হইলে, ছন্নছাড়ার যে দুর্গতি তাহা ব্যতীত অন্য কিছুর আশা নাই। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ভারতবাসীর অতুল সম্পদরূপে লাভ করিতে হইলে, নিখিল ভারতবাসীকে একই লক্ষ্যে, একই স্বার্থে সম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ তিন লক্ষ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের মত রাষ্ট্রে সমাজে স্বতন্ত্র দাবী উপস্থিত করিতে চায়; কত লক্ষ লক্ষ উপেক্ষিত হিন্দু একত্র হইয়া স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিবে, ইহা কিছু অযুক্তিকর নহে। গোড়ার গলদ আজ নিরঙ্কুশ ভাবে দূর করিতে হইবে। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দদের মধ্যে

যাঁহারা লক্ষ্ণৌ সভায় এক জাতি রূপে হিন্দুদের সহিত যুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সঙ্কটযুগে দেশের বিরাট্ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আজ হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান, ভারতের সকল সম্প্রদায়কে একযোগে অখণ্ড জাতি-শক্তি-রূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ মুক্তির পতাকা উড়াইবে; এই বিপুল দেশ, বিশাল জাতিকে বন্ধনদশায় রাখা কোন জাতির পক্ষে সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত না হইলে যখন আমরা কোন শ্রেয়ঃ অর্জ্জন করিতে পারি না, তখন ইহা সিদ্ধ করার পক্ষে অনুমত থাকিতে পারে না, অন্য কর্ম্মও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অন্তরায়গুলি দূর করার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আত্মশক্তির মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিব। ঐক্যবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল, সঙ্কল্পশক্তির অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তি পৃথিবীতে নাই। অহিংস-নীতির মত অব্যর্থ দিব্য সংগ্রাম-নীতি জগতে এ পর্য্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। পরদেশ-লুণ্ঠনকারী জগতে যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি আছে, তাহাদের হিসাবে পশুবলই বড় বল—তাই তাহারা সমরায়োজনে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া, গোলা বারুদ প্রভৃতি লোকধ্বংসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। তাহা যদি নিষ্ফল করা যায়, পরাধীন ভারতের জীর্ণ পঞ্জরে যে বজ্রের সৃষ্টি হইবে, তাহা নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত করিবে। ভারতের মুক্তির সঙ্গে জগতে শান্তির নির্ঝর ঝরিবে। স্বার্থপর, প্রভুত্বপরায়ণ একটা জাতি আজ জগতের বক্ষ নিঙড়াইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়; কিন্তু ইহা নিখিল মানবের রক্ত শোষণ করিয়া স্বার্থবুদ্ধি রূপ মহাপাপ। ভারতবর্ষ এই অনৃতের বন্ধন হইতে জগৎকে মুক্তি দিতে অভিযান করিয়াছে। সে পথে বিঘ্নসৃষ্টি করাও যেমন ক্ষতিজনক, বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া চলাও তেমনি ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হইবে।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়গত ভেদ দূর করার সঙ্গে অহিংসা ও হিংসা নীতির মধ্যে যে সংঘর্ষ, তাহা হইতেও আমাদের বিরত হইতে হইবে। মহাত্মা যে রণনীতি অবলম্বন করিয়া রাজশক্তির সহিত বীরের ন্যায় বুঝা পড়া করায় অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাহা হইতে বিমুখ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য নীতির অভিব্যক্তি আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। দেশ মুক্তি চায়। দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী মহাত্মা যে দিব্যনীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বিপ্লবী বন্ধুদের স্থির থাকার জন্য অনুরোধ করি। সম্প্রদায়গত বিরোধ যাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি না করে, তাহার জন্য আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃ-মণ্ডলীকেও উদ্বুদ্ধ হইতে দেখিতেছি। ঈদের অজুহাতে ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আগুন জ্বলিয়া উঠার আশা প্রতিপক্ষের মনে ছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণও যে প্রকারের হউক না, রাষ্ট্রনেতার নির্দ্দেশ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া জাতির মধ্যে কোন স্থানে যে অনৈক্য আছে, ইহা যেন সপ্রমাণ না করেন। আজ আমাদের একবাক্যে ঘোষণা করিতে হইবে, এক মত প্রবর্ত্তন করিয়া জগতকে জানাইতে হইবে— আমরা মুক্তি চাই। বিচ্ছিন্ন ধারা ও গতি জাতির শক্তি ক্ষুণ্ণ করে; এইজন্য বিশেষভাবেই আমাদের সতর্ক হইতে হইবে।

অন্তরায়গুলির পথ রোধ করিয়া মুক্তির অনুকূল অবস্থা সৃজন করিতে হইবে। একযোগে সৃষ্টির

অঙ্কুর বপন করার সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতে পারে কিনা আমাদের জানা নাই, এবং এ পর্য্যন্ত ইহাতে কেহ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া দেখাও যায় না। এক যুগের বা এক প্রশ্নের সৃজন অন্য যুগে, ভিন্ন ক্ষেত্রে, সংগ্রামের অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেই দেখা যায়। স্বাধীনতার সংগ্রামে কাল যত দীর্ঘ হইবে, সৃষ্টির ক্ষেত্র তত সুপ্রসারিত ও ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে, সংগ্রামকারীদের ততই গঠনমণ্ডলীকে দৃঢ় সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে। বিচক্ষণ যাঁহারা তাঁহারা বলেন—সংগ্রামক্ষেত্রে যাঁহারা গিয়া দাঁড়ান তাঁহাদের অপেক্ষা গঠন-ব্রতীদের অধিক ধৈর্য্য, অধিক সাহস ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ইহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। এমন কি, এই অহিংস-নীতিক সংগ্রামে যে সৈনিক প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, হিংসা-সংগ্রামের সৈনিক অপেক্ষা ইহাকে অধিক বীর, অধিক শক্তিধর হইতে হয়। এক মুহূর্ত্তে আত্মদানের অপেক্ষা তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করা কতখানি ধৈর্য্য ও তপস্যার ফল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সংগ্রামরত বীরের মত গঠন-ব্রতী হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দেশের সকল প্রতিকূল অবস্থা দূর করিতে করিতে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিয়া তুলে, দেশের তরুণ প্রাণকে উত্তেজনা ও আসন্ন ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত করিয়া হিমালয়ের মত দৃঢ় ও অচলভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে উপযোগী করিয়া লয়, দেশের প্রাণে আগুনের শিখা জ্বালাইয়া দেয়। যেখানে ব্যথা সেখানে সান্ত্বনা, যেখানে অবসাদ, উৎসাহবিহীন অবস্থা, সেইখানে রুদ্রশক্তি জাগাইয়া সে উদাত্তকণ্ঠে আশার গানে প্রাণে সঞ্চারবিধান করে। সে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়, গ্রামে নগরে, গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে চারণ-ব্রত পালন করিতে ছুটে, অসংখ্য কোটী মূকের মুখে ভাষা দেয়, বিরোধের ক্ষেত্রে হৃদয় ঢালিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, সেবার ডাক উপেক্ষা করে না। আমরা পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব আশ্রয় করিয়া দৃষ্টিহীন, তাই আজ এই স্বাধীনতার সংগ্রামে স্থির ও প্রশান্ত-চিত্তে লোক-দৃষ্টির অগোচরে যে গঠনশক্তি প্রবাহিত, তাহা দেখি না। প্রতিপক্ষকে আঘাত দেওয়ায় অভ্যাস বশতঃ নিজ পক্ষের মাথায় প্রহার করিয়া বসি। অনুকূল প্রতিকূল সকল বিষয় গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়া, বর্জ্জন ও গ্রহণ দ্বারা আমাদের প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। আজ সংগ্রাম ও গঠন নীতিকে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে হইবে, এবং ঈশ্বরের বিধান অমোঘ, অকাট্য, তাই দৃষ্টি যেখানে ঋজু ও স্পষ্ট, এই নীতি যে ক্রমে কিরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সেখানে আর অস্বীকৃত নয়।

স্বাধীনতার সংগ্রামে যে নেতা ঈশ্বরের সহায়তা মাত্র আশ্রয় করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন, তাঁর আহ্বানে সংযত শিক্ষিত সেনাবাহিনী যাহাতে সাড়া দেয়, সে ভার গঠন-ব্রতীর। ধর্ম্মসংগ্রামে সত্য ও তপস্যার সাধনায় সিদ্ধ জীবনেরই প্রয়োজন। ভারতসংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা মিশ্রিত সেনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু এই মিশ্রণ দীর্ঘ-দিনের জন্য শুভজনক নয়। প্রথম প্লাবনে জলস্রোতঃ আবর্জ্জনাযুক্ত থাকে, কিন্তু তারপর অনাবিল স্বচ্ছ প্রবাহ বহিয়া যায়; অতঃপর ভারতের কুরুক্ষেত্রে তদ্রূপ অহিংস সেনানীর মধ্যে মিশ্রণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অহিংস নীতি বলিয়া ইহা যুদ্ধ-নীতি ছাড়া যে অন্য কিছু, তাহা নহে। যুদ্ধ করিতে হইলে শিক্ষিত সেনাবাহিনী চাই। গোঁজামিল চিরদিন চলে না। এইজন্য ভবিষ্যতে যদি ভারতকে পুনঃ সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হয়, তবে সে সেনাবাহিনীকে অহিংস অস্ত্র ব্যবহারে সুনিপুণ করিতে হইবে।

গঠনের কার্য্য-তালিকায় ইহা যদি বাদ পড়ে, তবে সে বিযুক্ত গঠন-নীতি দেশের মাটীতে শিকড় নামাইতে পারিবে না। অন্যান্ত রাষ্ট্র-সংহতির স্থায় এইরূপ গঠন-শক্তি পরগাছার স্থায় অনাদৃত হইবে।

আজ দেশের সকল শক্তিকেই এক লক্ষ্যে কেন্দ্রগত হইতে হইবে। ভারতে যে শক্তি এই ধর্ম্ম-যুদ্ধের সহায় নয়, তাহা বিরুদ্ধ বোধে কেবল বর্জ্জন করিয়া যাওয়া নয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহিরের দিক্ হইতে মৃত্যুবাণ যত ভীষণ না হয়, আমাদের অভ্যন্তর মধ্যে এই যে নিরপেক্ষ নিরীহ অসংখ্য সংহতির অস্তিত্ব, এইখান হইতেই তাহা ভীষণতর হইয়া আমাদের মূল উপড়াইয়া দেয়।

গঠন-ব্রতীদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কঠিন কার্য্য হইতেছে—রণোন্মত্ত সৈনিক জীবনে যে সংশয়ের যবনিকা ঝুলিয়া পড়ে, সংঘর্ষের মধ্যে যে নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে, যে ভেদ ও দ্বন্দ্বের আবরণ আসিয়া পড়ে, তাহা নিরন্তর দূর করা। আহত সৈনিকের সেবার মতই অন্তরের মলিনতা দূর করার জন্ত, তাহাদের উদাত্তকণ্ঠে দেশ ও জাতির মহিমা, রণজয়ের উৎসাহবাণী, ভাগবত অমৃতের ঝারি লইয়া সতত উদ্যত থাকিতে হইবে। ক্ষুদ্রতার অঙ্কুর উদ্গম মাত্র তাহা উৎপাটিত করিতে হইবে। ঈশ্বরবিশ্বাসের বিশুদ্ধ অনল জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। মানুষের কর্ণে যে বাণী, যে ভাষা প্রবেশ করিয়া মর্ম্ম গড়িয়া তুলে, সে বাণী, সে ভাষায় বীর্য্য দান করিতে হইবে; দেশের সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত রণরঙ্গের উপযোগী করিয়া তুলিবে, গঠন-ব্রতীর প্রতিভা বিদ্যুৎধারার মত সবখানি ছাইয়া রাখিবে। এই দুর্লভ চরিত্র গঠনের কত বৃহৎ আয়োজন যে আজ প্রয়োজন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

আজ আমরা নিরুপায়, প্রতীক্ষার সময় নাই। আজ যে প্রেমিক বরবেশে বিবাহের অভিযান করিয়াছে, তাহার যাত্রা স্থগিত করিতে হইবে। যে বিরাগী পুরুষ সংসারবিমুখ হইয়া অরণ্য পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা সুরু করিয়াছে, তাহাকে আজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আজ মানুষের ব্যষ্টিত্বের যত সাধ, যত স্বপ্ন, যত আদর্শ, অভিলাষ, সব বর্জ্জন করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মানুষের অসংখ্য সূক্ষ্ম বৃত্তির অনুশীলননীতি জাতির জয়কাল পর্য্যন্ত রুদ্ধ রাখিয়া দেশের সমগ্র শক্তির একমুখী গতির উপরেই ভারতীয় ভাবে, পৃথিবীর বুকে এই প্রাচীন জাতিটার জয় নির্ভর করে। এখানে জাতিভেদ নাই, সমাজ-সম্প্রদায়ভেদ নাই। দেশে এই ভাব ও এই আলো স্বচক্ষে দেখিয়া আশা হইয়াছে। নিখিল ভুবন অন্ধকারাবৃত বটে; কিন্তু পূর্ব্ব আকাশে যে রক্ত-পতাকা উড়িয়াছে, সে দিব্য উষার আবির্ভাব প্রচণ্ড সূর্য্যপ্রকাশের সূচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আজ জাতির জাগরণচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। হে তরুণ— জাতির ভাগ্য-সূত্রে আমরা সকলেই আবদ্ধ। এই সহস্র বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, পরাধীনতার ব্যথা কেবল নাগরিক জীবনেই মোচর দেয় নাই, গিরি গুহাবাসী সন্ন্যাসীকেও অধীর করিয়াছে। দেশে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাধনা, সমাজ, বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম—আমাদের সব গিয়াছে। ব্যষ্টিজীবনের নিরাপদ্ ক্ষেত্র ভগবানের করুণারাজ্যে বড় কথা নহে; একটী জাতির পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া তুলিতে হইবে। আজ স্বাধীনতা-সাধনায় আমাদের সকলের জীবনই উৎসর্গ করিতে হইবে। কেবল কংগ্রেসসেবীই জয়ের তোরণদ্বার

মুক্ত করিবে না, এখানে যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পি বৈজ্ঞানিক সকলকে একযোগে বিচিত্র কর্ম্মশালায় উদ্বুদ্ধ প্রাণে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে।

হে দেশ, হে জাতি! ভোগের মোহ দূর কর, ত্যাগের মোহ দূর কর। আত্ম-বৈশিষ্ট্যের গর্ব্বহীন হও। নিজের পাওয়া বলিয়া বস্তুর প্রতীক্ষায় দেশের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিও না। আজ এস একযোগে ঝাঁপ দিয়া, জাতির মুক্তি-প্রবাহ দুর্জ্জয় করিয়া তুলি, প্রবল করিয়া তুলি।

প্রভাতী*

ভৈরব চৌতাল

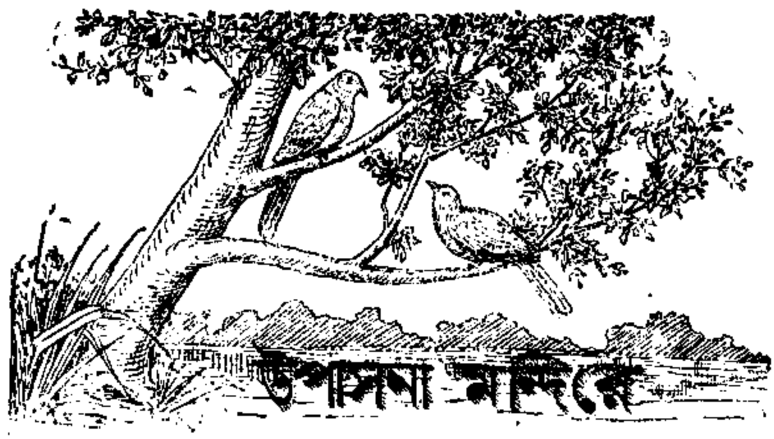
প্রাণারাম জ্যোতিঃ জাগে
জাগে নব নব রাগে।
নাম-রস সুধাপানে
ভাসে চিত্ত আনন্দমগন॥

যুগপ্রভাতী গাহি ঘরে ঘরে
শুনাই মোরা গান যত পুরজনে।
মহারাসে মিলি প্রাণে প্রাণে প্রাণে
জাগ জাগ রে নরনারায়ণ।

ভক্তজন নিরবধি গাহে জয় জয় রব মহিমা
অন্ত নাহি নাহি পায় রে।
মাগে করুণা শ্রীপদে তব
দাও হে আস্বাদ নব নব নব
আনন্দঘন অমৃতনিলয় হে।
তুমি সকল দারিদ্র্যহরণ॥

* * *

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অষ্টম তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে প্রভাত-ফেরীর সঙ্গীত।



উপাসনা মন্দিরে

জড়তা সবচেয়ে আজ বড় শত্রু। ধর্ম্মের নামে যে আলস্য তা' আরও মারাত্মক। তোমরা নাস্তিকের ন্যায় জড়বাদী হয়ো না; আবার ধর্ম্মের নামে জড়সমাধিও চেয়ো না। তোমরা হও ভগবানের জাগ্রত বিগ্রহ, মূর্ত্ত নারায়ণ। দেশ তবেই স্বর্গ হবে। দেশের নরনারী ভাগবত জীবন লাভ করবে।

আজ জয় অথবা মরণ—তা' ছাড়া জীবনের প্রয়োজন কি। আত্মা নিত্যমুক্ত, শাশ্বত আনন্দ-ঘন। আত্মার আলয় এ দেহ। সেই চেতনা জাগ্রত কর। অমর হও। পৃথিবীর বুকে এমন কীর্ত্তি স্থাপন কর, অন্তর্য্যামীর জয় যেন চিরস্থায়ী হয়। হেয় উপেক্ষিত জীবনভার বহন করার দুর্গতি দূর হোক। তোমাদের মহিমা উজ্জ্বল দিগন্ত বিচ্ছুরিত হোক।

হে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ভগবানের চিহ্নিত নরনারী। আত্মকামপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা যে কালানল সৃষ্টি করে, তাতে তিলে তিলে পুড়েই তুচ্ছ ছাই হ'তে হয়। ভগবানের চাওয়া যার প্রাণে আগুন জ্বালে, সেখানে গগনস্পর্শী তাজমহল গড়ে ওঠে। সেখানে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বল, ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য থরে থরে বিকশিত হয়। তোমরা সৃজনের অমৃতাঙ্কুর—দেবকার্য্য সাধন কর। জগত্তীর্থে এ কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হবে।

*　　*　　*

বীজ যদি নির্ম্মাণের হয়, তবে সে আজ ম্রিয়মাণ কেন? সৃষ্টি তাকে করতেই হবে। ধ্বংসের শ্মশান-স্তূপে দাঁড়িয়ে তার কণ্ঠে যে শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হবে, সে ধ্বনির প্রভাবে নব তৃণাঙ্কুর দেখা দিবে। মরুভূমি শ্যাম-মূর্ত্তি ধারণ করবে।

চিন্তায় কালক্ষয় হয়। সৃজনশক্তি যার বুকে ঢল দিয়ে নেমেছে, সে বিশ্বের বুকে অনন্ত প্রবাহ নামিয়ে আন্‌বে। কেবল সৃজনের বাণী, কেবল নির্ম্মাণের উদ্‌গান তুল্‌তে হবে।

মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, লয়ের বিরুদ্ধে অভিযান, চিরযৌবন ধরে' রাখার অমর প্রাণ চাই। মুহূর্ত্তের নৈরাশ্য আপনাকে হত্যা করার হলাহল। বুকে অনির্ব্বাণ আগুন জ্বাল। পৃথিবীর সবখানি বর্ত্তমান তোমার বিরোধী হোক। বিপুল সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তো তোমায় বিজয়ী বেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অনুকূল অবস্থায় যে আশা ও উৎসাহ পায়, সে প্রতিকূল অবস্থায় কাতর হয়; মেরুদণ্ড তার ভেঙ্গে যায়। অবস্থার তারতম্য এই অনন্ত প্রাণশক্তির সম্মুখে তুল্যবোধেই গৃহীত হয়। দেশ, কাল, অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে তোমার গতি নিয়ন্ত্রিত নয়। তোমার চরণচ্ছন্দে কাল-বৈশাখীর প্রলয়-ঝড় উঠুক। কুহেলিকা অলীক। শান্ত, স্থির, সুনির্ম্মল চিত্তক্ষেত্রে শতদল শোভা বিকশিত হোক। মধু মধুময় অমৃতবর্ষণ, সৃজন নিত্য অমর অক্ষয়—চিদানন্দ স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তমের বিগ্রহমূর্ত্তি। যদি জীবের মুক্তি যুগ যুগের স্বপ্ন হয়, তবে তাকে এই অমৃত দিয়ে গড়ে' তোল। অমৃতস্য পুত্রাঃ, তোমাদের হৃদয়ের জড়তা ঘুচুক—উদাত্তকণ্ঠে সৃজনের বন্দনা কর।

* * * *

প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি জীবনে জেগে থেকো, তোমার কার্য্য তুমি সিদ্ধ করো মূর্ত্তি নিয়ে প্রত্যেকের ভিতর—ওঁ নারায়ণ।

সঙ্কেত

—:•:—

জাতির মন্ত্র—উৎসর্গ। যেখানে ত্যাগ, যেখানে তপস্যা সেইখানেই জাতির মহিমা বিস্ফুরিত হয়। মহিমা স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। উৎসর্গ যখন বিদ্যুন্মূর্ত্তি লইয়া সমষ্টিজীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই জাতীয়তার স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি-গোচর হয়। স্বার্থের বন্ধনে যে জাতীয়তা, তাহা কামমূলক বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু উহা জাতীয়তার সত্য ও নিত্য স্বরূপ নহে। এই সত্য জাতীয়তা-বস্তুর অনুভূতির জন্যই উৎসর্গমন্ত্রে সিদ্ধ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

*　　*　　*

জাতির স্বরূপ—জাতীয়তা। ইহা আত্মবস্তুরই ন্যায় তত্ত্ববস্তু। অতএব ইহা সাধনার ধন। কামের উৎসর্গে, কামের যে রূপান্তর তাহাই সাধনার মৌলিক প্রকরণ। জাতীয়তার সাধনায়ও এই কাম মূল করিয়াই সাধনার আরম্ভ হয়। কামের শুদ্ধি ও মুক্তির ফলেই ভুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা। ইহাই ভোগ ও স্বাধিকার রহস্য। জাতির জীবনে প্রকৃত ভোগ ও স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, খাঁটি সাধনার নীতি উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করা চলে না।

*　　*　　*

নীতি অর্থে বন্ধন নহে। অস্তিত্বের ধর্ম্মই নীতি-রূপে প্রকাশ পায়। অস্তিত্ব সতের—অতএব নীতিও সতেরই ধর্ম্ম। আমি সৎ—এই জ্ঞানের উপর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বার্থসিদ্ধি নির্ভর করে। তেমনি জাতিরও একটা আত্মপ্রত্যয় আছে। এই আত্ম-প্রত্যয়কে জাতির জীবনে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করাই জাতীয়তার নীতি ও ধর্ম্ম (Principle and policy of Nationalism)। জাতির জাগরণ এই নীতি ও ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই সহজে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠে।

*　　*　　*

জাতি জাগে—সৎ-রূপে। ভারত ভারতের জন্য—ইহা সত্যই; কিন্তু ইহা বড় বহির্দৃষ্টির কথা। ভারতের সত্তা আপনাকে পাইলেই, তাহার প্রকাশ অনিবার্য্য হয়। এই প্রকাশ খাঁটি ও নিজস্ব আপনারই সত্য প্রকাশ; তাই ইহার গতি অনিরুদ্ধ। পর-প্রভাব ও পারিপার্শ্বিকতার আবেষ্টনী বিদীর্ণ করিয়াই মুক্ত আত্মপ্রত্যয় স্বচ্ছ ও সুন্দর হইয়া বিকশিত হইতে পারে। জীবন-সংগ্রামে বিরোধ—পরস্পরের প্রভাব ও আক্রমণ হইতে আপনার অন্তর্নিহিত সত্য ও আদর্শটীকে রক্ষা করার জন্য। এই সংগ্রামই জীবনের ধর্ম্ম—কিন্তু ইহা আপেক্ষিক ও গৌণধর্ম্ম। আদর্শের গুণাগুণ পরীক্ষা দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। আদর্শ যতই সিদ্ধ হয়, ততই পরীক্ষার কষ্টিপাথরে বিরোধের ক্ষয়ে সংগ্রামনীতিরও উৎকর্ষ ও বহুল পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতের জীবনে আজ যে নব সংগ্রামনীতি প্রকৃষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্ত ভারতেরই নিজস্ব নহে, তাহা বিশ্বমানবের 'সাধনার' ও আবাহনের সামগ্রী। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া ভারতের যে আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় ও সার্থক হইয়া

উঠিতেছে, তাহা একান্ত ভারতের মৌলিক সম্পদ, তার সত্তাগত আত্মবৈশিষ্ট্য।

* * *

এই আত্মবৈশিষ্ট্য জোর করিয়া রক্ষা করিতে হয় না। সত্তার ধর্ম্মেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায়। জাতি যখন যে নীতি ধরিয়া জীবন-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা যুগের নীতিরূপেই পরিগ্রাহ্য হয়। কিন্তু সত্তার ধর্ম্ম সনাতন। ভারতে যে সনাতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে ইতিহাসে বিকশিত হইয়াছে, তাহা একদিকে যেমন অনন্যসাধারণ, তেমনি অপর দিকে অপ্রাকৃত ভাবসিদ্ধ বলিয়া অমূলক বস্তুতন্ত্রতা নহে। ভাবই বস্তুতন্ত্র রূপ লয়। এই আত্ম-প্রকাশের ধারা সাধনার দ্বারা অধিগম্য। ভারতে যে বস্তুতন্ত্র জাতি-রূপ গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে, তাহার মূলগত এই ভাববিকাশের ধারা সাধকদের অন্তর দিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে।

* * *

জাতি গড়ার তপস্যা---এই ভাবকে আশ্রয় করিয়াই জানিতে হয়। যাহারা ভারতের কর্ম্মে আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপে অতি সতর্কতার সহিত খাঁটি ভারতীয় ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ইহার জন্যই আত্মগঠন আবশ্যক। চরিত্র—শিক্ষা, দীক্ষা ও নৈরন্তর্য্যপূর্ণ অভ্যাসের ফল। ভারতীয় চরিত্রে এই শিক্ষা, দীক্ষা, অভ্যাসের নৈরন্তর্য্য রক্ষা আজ অতি সুকঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুগধর্ম্মে কঠিনও সহজ হয়। ভারত ভারত হইয়াই গড়িয়া উঠিতে চায়। এই হওয়ার নীতিই গঠন-নীতি। যেখানে নিছক গঠননীতি খাঁটি বিশুদ্ধ রূপে আশ্রয় পাইয়াছে, সেখানে ভারতের বিশেষত্বই দেহে, মনে, জীবনে মূর্ত্ত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে।

* * *

নীতি একই—প্রয়োগে বৈচিত্র্য। গঠন ও বিনাশ—জাতিসাধনার এ-পিঠ ও ও-পিঠ মাত্র। যে পথে চলিলে জাতির জীবনে শক্তির বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়, সে পথ শুধু ধ্বংসের পথ নহে। নির্ম্মাণেরও অগ্নিবীর্য্য বুকে লইয়া একদল লোককে ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় অগ্রণী হইতে হইবে। তাহাদের শিক্ষা হইবে ভারতীয় ও সনাতন। যুগধর্ম্মে ইহারা বিচলিত হইবে না। তপস্যা হইবে নিরচ্ছিন্ন উৎসর্গ—তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াই ইহাদের নির্ম্মাণের হোমানল চির প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে। আজ ধ্বংসের পূজারী যেমন নির্ম্মম রুদ্র বেশে কালস্রোতঃ স্তম্ভিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তেমনি তপোবলেই নব জাতির গতি-পথ মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নির্ম্মাণের সাধক যেমন আত্মজয়ী হইবে, তেমনি সে যদি বিশ্ববিজয়ী না হয়, তবে সে নির্ম্মাণ বীর্য্যহীন প্রস্তাব মাত্র। নির্ম্মাণও বস্তু হইয়া চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে, তবেই তো উহা সার্থক নির্ম্মাণ। নতুবা, শুধু বিনাইয়া বিনাইয়া কালহরণের অছিলায় নির্ম্মাণের সিদ্ধ মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করা লজ্জার কথা! জাতি-যজ্ঞে, হে নির্ম্মাণব্রতী---তোমাদের জীবন হইতে এই লজ্জার কালিমা অপসারিত হউক। আজ নির্ম্মাণের বিজয়পতাকা হস্তে অটুট বিশ্বাসের অধিকারী এক দল সাধক সাধিকা, তোমরা দেশকে ছাইয়া ফেল।

* * *

লজ্জা এইজন্য—যে তোমরা বীর্য্য লাভ করিয়াও শক্তিহীন। নির্ম্মাণ যে মহাবীর্য্য। ইহা ভাগবত প্রেরণা। ইহার অমোঘ প্রকাশ—জাতির বিজয়-মূর্ত্তি। জাতি যদি সিদ্ধ না হয়, তোমাদের নির্ম্মাণের সাধনা নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, তাহা তোমাদের জীবন দিয়াই প্রতিপন্ন কর।

জাতির কাণে এই অমর গানই গাও—যে তোমাদের আর কোনও ভয় নাই, বাধা নাই—তোমরা যে ভারতের সন্তান, তোমরা ভাগবত বিগ্রহ। ভারতের সাধনায় ভয়ের স্থান নাই। ইহা আনন্দের সাধনা। ইহা অমৃতলাভের পথ। অতএব, খাঁটি ভারত-তত্ত্বে বিশ্বাসী যে সে অবিচলিতপ্রাণ অভীঃ হইবে—সে অমৃতকামী হইবে। এই সহজ জীবন-ধারা যখন অপ্রাকৃত ভাবসিদ্ধ হইয়াও প্রকৃতিকে বর্জ্জন করে না, পরন্তু গ্রহণেই তাহাকে শুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিয়া লয়, তখন এই জীবনেই দেবজীবন লাভ সম্ভব হয়। প্রাকৃত কামের রূপান্তর হয়। ভারতের জীবনে এই রূপান্তরের সাধনা অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * *

রূপান্তর—কাম ও অহঙ্কারের। কাঁচা আমি যেমন সৎ হয়, তেমনি প্রাকৃত কামও পশুভাব হইতে দিব্যভাবে উন্নীত হইতে পারে। ইহা শুধু ভাবের পরিমার্জ্জন নহে, পরন্তু গুণান্তর। পশুর জীবনে যে লিপ্সা, তাহাও কামনা—আবার মানুষী-কামনাও কামনা। উভয়ের মধ্যে যে স্তরগত ভেদ তাহা অতি সামান্য। কিন্তু দেবজীবনে এই সামান্য ভেদ একেবারে অসামান্য হইয়া দাঁড়ায়। তাই দেবতার কামকে আর কাম বলা যায় না। উহাই তপঃ। সে তপোঽতপ্যত। বিশ্বোঽসৃজত। সেই আদিরসিক যে মূলরসে বিশ্বসৃষ্টি করিলেন, তাহাকে ভাষার অভাবে কাম বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা আপূর্য্যমান রস—বিশ্বের মৌলিক উপাদান। ইহাই আনন্দ-তত্ত্ব। সাধনায় এই আনন্দই ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে যুক্ত হয়। ইন্দ্রিয় তখন আর ইন্দ্রিয় থাকে না, হয় রস—এই রসপ্রবাহেই নব সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে এই রস-তত্ত্বের আবাহন সিদ্ধ হইয়াছে, তাই লোকোত্তরচরিত্র সিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতে এখনও নিঃশেষ হয় নাই। কিন্তু জাতিগত জীবনে এই রসময়ী সৃষ্টি ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত ও প্রচারিত হয় নাই। তাই ভারতে জাতির স্বরূপ অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে; জাতীয়তা মূর্ত্ত ও বস্তুতন্ত্র হয় নাই। যুগের আনুকূল্যে, আজ এই ব্যষ্টির সিদ্ধ প্রবাহ জাতির জীবনপ্রবাহে আসিয়া আপনাকে মিলাইয়াছে। এ যুগে তাই জাতিই গড়িতেছে, ভারতে জাতীয় জীবন এবার সিদ্ধ হইবেই।

* * *

তপঃ—তপঃ—তপঃ—ভারতের মর্ম্মমন্ত্র। জাতির বিরাট্ হৃদয়ে এই অনাহত নাদ ধ্বনি তুলিয়াছে। হে চিহ্নিত উৎসর্গ-যোগী, উদ্বুদ্ধ হও। জাতির স্বরূপ তোমারই উৎসর্গ-দানে সুসিদ্ধ করিয়া তোল।

হাজারিবাগ ভ্রমণ

—:•:—

হাজারিবাগ ষ্টেশনে যখন নামিলাম, তখনও রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ সহর ৪০।৪৫ মাইল হইবে। পূর্ব্বে হাঁটিয়া যাইতে হইত, এখন রাস্তা হইয়াছে। মোটর বাস দিবারাত্রই চলে, উটের গাড়ীও যাতায়াত করে। আমরা কিন্তু একখানিও উটের গাড়ী দেখি নাই।

একখানা মোটর ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথের দুই পাশে বিজন অরণ্য, দূরে গিরিশ্রেণী—দৃশ্য অতি মনোরম, মাঝে মাঝে পল্লী। উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের গাড়ী ছুটিল। বাংলায় এ বছর মাঘ মাসের শেষেই গরম পড়িয়াছে, কিন্তু এই মধ্যাহ্নকালে হাজারিবাগের পথে যে জোর বাতাস বহিতেছিল তাহা সুখকর ও শীতল। শোফার গলায় কম্ফাটর জড়াইয়া দিল, আমরাও গায়ে কাপড় দিয়া বসিলাম। হাজারিবাগ ছোটানাগপুরের স্বাস্থ্য-নিবাস সমুদ্রস্তর হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত এই সহরটী সুদৃশ্য তো বটেই; অধিকন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই হিতকর, তাহা কয়েকদিন বাস করিয়া বুঝিয়াছিলাম।

রেল ষ্টেশন হইতে এত দূরে জিলা টাউন কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা জানিবার কৌতুহল ছিল। বহুদিন নাগপুর বিভাগে দুটা নন্‌রেগুলেটেড প্রভিন্স ছিল। ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে মানভূম এবং সান্তালিয়া, উত্তরে মুঙ্গের ও গয়া, পশ্চিমে লোহারডগা ও গয়ার কিয়দংশ, দক্ষিণেও লোহারডগা। ইহার পরিমাণ ৭০২১ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা অল্পাধিক এগার লক্ষ হইবে।

হাজারিবাগ জিলার অন্তর্গত ৭৮৩১টী গ্রাম আছে। পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক। এক বর্গ মাইলে ১৪১'৭ জন মানুষের বাস এবং ১'১ খানি গ্রাম।



সেণ্ট কলাম্বস্ কলেজ—হাজারিবাগ

যে পথ দিয়া আমাদের ট্যাক্সি হাজারিবাগ সহরে প্রবেশ করিল, সে পথের ধারে সহরের বড় চিহ্ন ছিল না। সেণ্ট কলম্বাস কলেজের প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া মনে হইল, এই অশিক্ষিত সাঁওতাল জাতির ভিতর ইংরাজের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার এই ব্যবস্থা অতিশয় প্রশংসনীয়। কোল, ভীল জাতি শিক্ষার গুণে খ্রীষ্টান হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ কোল ও সাঁওতাল তরুণেরা হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়া

মাঠে হকি খেলিতেছে। হিন্দুজাতির শিক্ষায় ও আদর্শে ইহাদের তো উঠাইয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই! আজ ইহারা হিন্দুর অপেক্ষা খ্রীষ্টান জাতিকে অধিক আপনার মনে করে। রাজকীয় কর্ম্মবিভাগে উচ্চ শিক্ষিত কোলেরা বড় চাকুরী পাইয়াছে; তাহারা রাজশক্তির চক্ষে অনাদৃত নহে। হিন্দুজাতি বুনো ও অসভ্য জাতি বলিয়া ইহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল; যুগের প্রভাবে—আজ কোল ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, হাকিমের কাছে, বাঙ্গালী উকিল, মোক্তার মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়

হাটের মধ্যে ট্যাক্সি দাঁড়াইল। একদিন অন্তর হাট বসে। তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কয়েকটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলদেশে হাট বসিয়াছে। অসংখ্য নারী পুরুষ বেচাকেনা করিতেছিল। কিন্তু ইহা সহর বলিয়া বোধ হইল না। মনে হইল, সাঁওতাল পল্লীর কেন্দ্র-স্থান হাজারিবাগ বুঝি এমনই অনাড়ম্বর ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাশূন্য প্রকৃতির শ্যামমূর্ত্তিই হইবে; কিন্তু ভাবনাও হইল—আমাদের মত লোকের পক্ষে এখানে কয়েকদিন বাসের সুবিধা হইবে কিনা? ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, এই হোটেলে আপনারা থাকিতে পারেন; কিন্তু হোটেলের শ্রী দেখিয়া নামিবার ভরসা হইল না। হাজারিবাগ যদি ইহাই হয়, আবার ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ করিতে হইবে।

আরও ভাল হোটেলের সন্ধানে জানা গেল সাহেবদের জন্য একটা প্রকাণ্ড হোটেল ছাড়া অন্য হোটেল এখানে নাই। পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, রাঁচির মত হাজারিবাগও স্বাস্থ্য-নিবাস; কিন্তু লোকজনের থাকার স্থান কোথা! ট্যাক্সি ড্রাইভার বলিল, বাড়ী ভাড়া মিলে; কিন্তু আপনারা দশ পনের দিন থাকিবেন, এই অল্পদিনের জন্য বাড়ী পাওয়া শক্ত। আমার এক উকিলের কথা মনে পড়িল, তাহাকে তাঁহার নাম করিতেই সে ব্যক্তি গাড়ী ছুটাইয়া দিল। হাটের পথ ছাড়িয়া সহরের পথে গাড়ী আসিতেই দেখিলাম, সহর শুধু পর্ণকুটীরপূর্ণ নহে, সুরম্য হর্ম্ম্যরাজীশোভিত সহরটী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ বাটীই বাংলো আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। উকিল বন্ধুটীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, তবে তিনি আমার নাম জানিতেন মাত্র; মহা সমাদরে নিজের বাড়ীতেই স্থান দিতে চাহিলেন, কিন্তু একটু নির্জ্জনতার ভিতর থাকিয়া, অবিশ্রাম কর্ম্মের মাঝে অন্তরে যে বেসুরা সুর উঠিয়াছিল, তাহাই ঠিক করিতে ছুটিয়া আসা। এই হেতু এই পরিবার মধ্যে বাস করায় আপত্তি করিলাম। তিনি অগত্যা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এক বন্ধুর বাড়ী আমার হাতেই আছে, ভাড়া ৮০৲ টাকা, তবে আপনারা তো দু'দশ দিন থাকিবেন, অতো ভাড়া দেওয়া তো সম্ভব হইবে না"—যাহা হউক তিনি লোক দিয়া আমাদের এই বাড়ীতেই স্থান দিলেন, এবং ভাড়া স্বরূপ যাহা ইচ্ছা দিতে বলিলেন। বাড়ী তাঁহার নিজের হইলে কোন কথা থাকিত না।

বাড়ীটী সুন্দর, সম্মুখে ফুলের বাগান; অযত্নে শ্রীহীন হইলেও, গৃহ-স্বামীর পূর্ব্ব যত্ন ও শ্রমের চিহ্ন একেবারে লোপ পায় নাই। ঋতু-পুষ্পের বিচিত্র শোভা—স্থানে স্থানে গোলাপ মল্লিকা ফুটিয়া আছে। খানিকটা জমিতে গম ও সরিষার চাষ হইয়াছে, বাতাসে ঢেউ খেলিতেছে। পশ্চাতে প্রকাণ্ড জলাশয়। এক পাশে একটী অত্যুচ্চ হিন্দু মন্দির দেখা যাইতেছিল। তখন প্রদোষের পাতলা আঁধার পৃথিবীকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, বিশ্রামের আশায় আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। সঙ্গী এবার অধিক ছিল না। 'রা' বাজার হাট

করিতে বাহির হইল, কন্যাস্বরূপা শ্রীমতী—সন্ধ্যা-ভোজের ব্যবস্থায় অন্যত্র ব্যাপৃত হইল। গৃহে একা বসিয়া এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম।

জীবনে এমন অনুভূতি একাধিকবার ঘটিয়াছে এবং এইজন্যই মানুষের মৃত্যুতে তাহার সব যে শেষ হয় না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূতিও প্রমাণস্বরূপ।

ধূপ পুড়িয়া পুড়িয়া গৃহখানি সৌগন্ধে ভরাইয়া তুলিল। বাগান হইতে কয়েকটা গোলাপফুল তুলিয়া ধূপদানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হারিকেনের আলো অনুজ্জ্বল; একদৃষ্টে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া অন্তর্যামীকে খুঁজিবার আয়োজন করিতেছি; মনে হইল—বিনা চেষ্টায় কে যেন হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিল। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ-স্পর্শে অসীম শান্তির মাঝে যেন লয় হইয়া যাইতে চায়। শ্বাসে শ্বাসে অপার্থিব সৌরভ অনুভব করিলাম। চক্ষু আমার মুদিত ছিল, স্পষ্টই বোধ করিলাম—কে যেন নির্ব্বাক্-ভাষায় আমায় সহৃদয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। আজিকার এই নীরব উপাসনায় আমি একা নয়, আর একজনের পুণ্যময় মূর্ত্তি কোন আকারবিশিষ্ট না হইলেও, এইরূপ একটা অস্তিত্বের অনুভূতিঘন হইয়া আমায় অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিল।



শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাড়ী—এখানে মহেশবাবু থাকিতেন

অনেকক্ষণ পরে 'রা' বাজার করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলাম—এই ঘরখানি বড় পবিত্র শান্তিময়, এখানে কে যেন সস্নেহ বাহু বাড়াইয়া আমায় আলিঙ্গন দিল, আমায় অভিবাদন জানাইল—এমন অভাবনীয় অনুভূতি বহুদিন পাই নাই, জানি না এখানে কোন মহা-পুরুষের স্থান ছিল কি না!

'রা' আমার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া একবার তাকাইল, আমি গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলাম। বড় কৌতূহল হইতেছিল, এই অপূর্ব্ব অনুভূতির যুক্তিযুক্ত হেতু নির্ণয়ের জন্য। ইহার জন্য আমায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আমার উকিল বন্ধুটী দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আমার সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, উত্তম আশ্রয় দিয়াছেন, বিশেষ এ গৃহখানি বড় শান্তিপূর্ণ ও পুণ্যময় বলিয়া মনে হয়, আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি।

তিনি আগ্রহ সহকারে আমার অযথা গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—আপনার মত লোকের এই স্থানটী ভাল লাগিবারই কথা, এই ঘরে একজন বড় ধার্ম্মিক, দার্শনিক বাস করিতেন। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই সৎ ছিলেন; তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। এই গৃহে চল্লিশ হাজার টাকার

নানাপ্রকার দার্শনিক গ্রন্থ রক্ষিত হইত, কিন্তু জানিতে বুঝিতে হইলে আমাদের এইখানেই আসিতে হইত।

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, অতিশয় আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিনি কে বলুন দেখি!"

তিনি বলিলেন—"আপনি তাঁকে নিশ্চয় চিন্‌বেন। এই হাজারিবাগেই তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, গত জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। পাবনা জেলার সাহাজাদপুরে তাঁর জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু তিনি হাজারিবাগেরই মানুষ ছিলেন।"

আমার বুঝিতে আর বাকী রহিল না—"প্রবাসীতে" মহেশবাবুর পরলোকগমনের কথা পড়িয়াছিলাম, আমি উত্তর করিলাম—"কে বলুন দেখি—মহেশবাবু কি?"

উকিল বন্ধু বলিলেন—"হাঁ। এমন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ সহজে চক্ষে পড়ে না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু কারু সহিত তাঁর বিরোধ ছিল না। হাজারিবাগকে তিনি জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজ সে প্রদীপ নিভিয়াছে। গ্রন্থাগারই ছিল তাঁর প্রাণ—এমন মানুষ আর হয় না!"

আমি এই পরলোকগত মহাত্মার প্রভাব পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি, এবং আমার অনুভূতির মূলে যথারীতি কারণের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইলাম সান্ধ্য উপাসনায় যে ভাবের স্পর্শ পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে তাহা বলিলাম। তিনি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, ঐ যে একখানি টালির আকারে মেঝের উপর দাগ দেখিতেছেন, ঐখানেই তাঁর চিতাভস্ম রক্ষা করা হইয়াছে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে এই স্মৃতি-চিহ্নের দিকে চাহিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার জ্ঞাপন করিলাম। আমার মনে হইল—মহেশবাবুর পরমাত্মীয় ধীরেন্দ্রবাবুর এই গৃহখানি এমন ভাবে শূন্য না রাখিয়া তাঁর পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত একটী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হইলে ভাল হয়। হাজারিবাগবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালী বন্ধুদের এদিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত।


পরলোকগত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ভ্রমণের অভ্যাস রক্ষা করিলাম। সহরের চতুর্দ্দিকেই গভীর অরণ্য এবং

দুর্গম গিরিশ্রেণী। এইজন্য এখানে চাষবাসের তত সুবিধা নাই, তবুও হাজারিবাগের আশে পাশে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। সরিষা ও গমের ক্ষেতই অধিক। প্রত্যেক বাড়ীতেই ইন্দারা আছে, জল খুব ভাল, হাওয়ায় বোধহয় অমৃত আছে। এক ব্যক্তি বলিলেন, হাজারিবাগ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারি না, কলিকাতায় আমার একগুণ আহার করিয়াও পরিপাক হইত না, এখানে চতুর্গুণ নয়, অষ্টগুণ আহার করি, এমনই জল বায়ুর গুণ! আমরাও তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁর একথা যে একটুও অতিরঞ্জিত নহে, তাহা স্বীকার করিয়াছি।

কিন্তু হাজারিবাগ ক্রমে অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিবাসের ন্যায় নানা রোগের বীজাণুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কোন বাসা লইতে হইলে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হয়। ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আগমনে সহরের প্রায় অধিকাংশ বাড়ীই ভীতিজনক হইয়াছে। এমন অনেক বাড়ী পড়িয়া আছে, যাহার আর ভাড়া হয় না। ক্ষয় রোগের আতঙ্কে অনেকে শিহরিয়া উঠে।

হাটের দিন—বাজারে লোক ধরে না। এ বৎসর দ্রব্যাদির মূল্য খুবই হ্রাস পাইয়াছিল। কলিকাতার মত সহর অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে ভেজাল চলিয়াছে, এখানে তাহার আশঙ্কা নাই; খাঁটী সরিষার তৈল, গব্যঘৃত, জাঁতায় ভাঙ্গা ময়দা, তাজা শাকশব্জী প্রচুর পাওয়া যায়, বহুদূর হইতে লোকজন আসিয়া থাকে।

হাজারিবাগে পূর্ব্বে ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল; কিন্তু এখন ইহা নাই। সারি সারি অট্টালিকাশ্রেণী শূন্য পড়িয়া আছে। সহরের যাবতীয় সুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। কলেজ, হাঁসপাতাল, রেল রিফরমেটারি—কিছুর অভাব নাই। সহরের এক প্রান্তে কয়েকটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে, এইগুলিকে হ্রদ বলা হয়। ইহার ধারে ধারে যে রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে, ভ্রমণের পক্ষে তাহা খুবই উপযোগী। হাজারিবাগে দেখিবার বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু দৃশ্য বড় সুন্দর। সহরটী পরিপাটী, হাজারিবাগের রাস্তা বড় চমৎকার; কিন্তু মটরের উৎপাতে ক্রমে মন্দ হইতেছে

বাজারে একদল কোল রমণী দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আমাদের কথা বুঝে না। পরিচয় করিতে গিয়া তাহারা হাসিয়াই আকুল হইল। তাহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যেটুকু পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বুঝিলাম—তাহারা বেশ আছে। এই এগার লক্ষ অধিবাসী বনে জঙ্গলে বাস করে, পাহাড়ে নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। কৃষি ইহাদের সর্ব্বপ্রধান উপজীবিকা। গালার কাজও



হাটের পাশে হিন্দু-মন্দির

চলে, শিক্ষার ব্যবস্থা খ্রীষ্টান মিশনরীরা করিয়াছে। ইহার ফলে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়িতেছে। কোথাও হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা যায় না; কিন্তু গ্রামের ভিতর মিশনরীদের অসংখ্য চর ঘুরিয়া বেড়ায়। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি হিন্দু?" তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "হিঁতো!" বলিলাম "খ্রীষ্টান হবে?" তেমনই হাসিয়া উত্তর দিল "কেন না হবো!"

"তবে হিন্দু থাকবে না।"

"খ্রীষ্টানও হবো, হিন্দুও থাকবো।"

তাদের দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা যে উৎসবে পর্ব্বে গগনস্পর্শী বাঁশের ডগায় নিশান বাঁধিয়া, উঠানে পুঁতিয়া, মাদল বাজাইয়া গান করে তাহার বর্ণনা দিল, পারাবত বলি দেয় তাহা বলিল। ধর্ম্ম বলিতে তারা অনুষ্ঠানই বুঝে, তা' খ্রীষ্টান হইলেও এই অনুষ্ঠান বাদ পড়ে না। তবে মিশনরীদের শিক্ষার গুণে ইহাদের বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইতেছে, গ্রামের ভিতর চার্চ্চ হইতেছে। এই এগার লক্ষ অধিবাসী কেন, ছোটানাগপুরের সমস্ত কোল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতি অচিরকাল মধ্যে খ্রীষ্টান হইবে। আজও হিন্দুর সংখ্যা যে বিশ কোটী তাহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভারতবর্ষ ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টানধর্ম্মই গ্রাস করিবে, হিন্দুকে রক্ষা করিবেন নারায়ণ—হিন্দুর এই বিশ্বাস আত্ম-প্রবঞ্চনার কারণ হইয়াছে। হিন্দুর ভগবান যে ঘটে ঘটে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারায়ণের জাগরণ সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে—এই শিক্ষা আমাদের থাকিতেও আমরা আপনার উপর বিশ্বাস রাখিয়া দুর্জ্জয় হইলাম না।

হাজারিবাগ সহরে গোটা দুই শিব-মন্দির আছে। তাহাও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের জন্য নহে। সহরে উপার্জ্জন করিতে আসিয়া উত্তরপশ্চিমবাসী এবং বিহার ও বঙ্গদেশ হইতে বহুলোক আসিয়া চির-বাসিন্দা হইয়াছে। বহু প্রকাণ্ড অট্টালিকা গড়িয়া উঠিয়াছে। সহরের পুরাতন দিক্‌টায় ঘন বসতী আছে, এক্ষণে বিস্তৃত মাঠের উপর দূরে দূরে বসত-বাটীর নির্ম্মাণ হইতেছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে হাজারিবাগ খুবই উত্তম স্থান।

হাটের পাশেই একটী নূতন প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া নানা দেব-দেবতাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম যেন খেলার বস্তু, প্রাণহীন। মন্দিরে মন্দিরে ধর্ম্মপ্রাণের সাড়া যদি না পড়ে, তবে ইহা যে নিরর্থক তাহা আর বলিতে হইবে না। হাটের একদিকে ব্রাহ্ম-মন্দির ম্লান শ্রীহীন। একদিন এইখানে প্রাণের সাড়া তুলিবার প্রয়াস হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। এ জাতির তরুণ যাঁরা, তাঁরা বলেন, ধর্ম্ম দূর করিতে হইবে। আমরা বলি —তাহার জন্য করিবার কিছু নাই, জগতে খ্রীষ্টান ইস্‌লাম থাকিবে, তোমরাই নিশ্চিহ্ন হইবে। ধর্ম্মহীন জীবনের আকর্ষণ আত্মঘাতী হওয়ারই লক্ষণ।

জাতির কতটুকু অংশ আজ পরাধীনতার ব্যথায় ম্রিয়মান? এই পার্ব্বত্য অরণ্যময় স্থানে যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে, তারা তো আমাদেরই প্রতিবাসী, আমরা তো এক জাতি, ইহার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে? অর্থহীন বলিয়া কথা নহে, বাঁচিবার আকুলতা কৈ! হাজারিবাগে অনেক উকিল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া নিজেরা বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, তাহার নিদর্শন দেখা যায়; কিন্তু এই জাতিকে রক্ষা করার দরদ কোথা!

কয়দিন দূর দূর পল্লীতে ঘুরিয়া দেশের পরিচয় লইলাম। এ জাতি পরাধীন কে বলিল, কোথায় সে অনুভূতি, কোথায় সেই ব্যথার পীড়ন, কে ইহাদের প্রাণে সে আগুন জ্বালাইবে! খ্রীষ্টান জাতি কি

কেবল রাজ্যলিপ্সায় এমন অগ্নিপ্রাণ হইয়াছে? না। তাহারা পৃথিবীর সকল জাতিকে এক ধর্ম্ম-পাশে বাঁধিয়া একটা অখণ্ড খ্রীষ্টান জাতিই গড়িতে চায়; তাহাদের অন্তর্য্যামী এই পথের নির্দ্দেশই তাহাদের দিয়াছে। আর আমরা কি করিতেছি? কৈ তাহাদের মত সকল অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া, বনে জঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া বসিয়া ভারতের আদর্শ ও ধর্ম্ম তো প্রচার করি না! নিজেদের কপট ব্যবহারে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু কি জানি এই দুরবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে কেন আগুন জলিয়া উঠে; কেবল বলি, ভগবান এমন হাজার মানুষ গড়িয়া তোল, যারা আত্মস্বরূপের মোহে ছন্নছাড়া না হইয়া একটা অখণ্ড স্বরূপের বিচিত্র রূপে জাতিকে এক অখণ্ড ভাগবত তত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ জীবন দান করিবে। কোথায় সে নূতন যুগের মানুষ, তাহারা আজও কি নিশ্চেষ্ট থাকিবে, মোহগ্রস্ত হইয়া জাতির শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতন নীরবে দর্শন করিবে? মানুষ কি দেশ ও জাতির জন্য একটা জীবন অকাতরে দিতে পারে না—যারা দুঃখ বরণ করিয়া এই লক্ষ লক্ষ মূকের মুখে ভাষা দিবে, শূন্য হৃদয়ে ভারতের দেবতা প্রতিষ্ঠা করিবে। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ'' এই গঠনের কাজেই দেশের প্রাণকে ডাক দিয়া বলিতে চায়, "এস ভাই, এস ভগ্নী, তোমাদের হিসাব যুক্তি দূরে ফেলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দেশটাকে ছাকিয়া তুলি। ইহা ভিন্ন অন্য রস, অন্য আদর্শ একবার বিসর্জ্জন দাও। অনন্ত জীবন তোমাদের সম্মুখে, আজই সুখের মদিরা নিঃশেষে পান করার মোহ ত্যাগ কর। বাহির হইয়া জাতিটাকে গুছাইয়া লও। এখানে অর্থের প্রয়োজন নাই—চাই প্রাণ, চাই ঐক্যবদ্ধ জীবন।"

পল্লী-গঠনের কথা

[আশ্রমী লিখিত]

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ভাব, আদর্শ ও সাধনার সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত বাণীবনের ব্রাহ্ম-পল্লী ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য পূজনীয় মতিবাবুকে বহুদিন হইতেই অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার আকুল আহ্বান আসিয়া পৌছায়। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ'' বাণীবনে তাঁহাদের একটী শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-গঠনের কাজ আরম্ভ করেন।

তাঁহারা কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম, প্রায় ৩১ বৎসরের চেষ্টায় বাণীবনে বালিকাদের বিদ্যালয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, উপাসনা-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এখন দেশের নূতন ভাবের সহিত যুক্ত করিতে আকুল হইয়া তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতীয়তার একটী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে আগ্রহান্বিত। এইরূপ আকর্ষণে পূজনীয় মতিবাবু গত ১২ই এপ্রিল রবিবার অতি প্রত্যুষে চন্দননগর হইতে কয়েকজন সঙ্গীসহ বাণীবনে বেলা ৯টার সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের

সহিত "প্রবর্ত্তকে"র সাধনা ও জাতির সম্বন্ধে কিছু আলাপ হইয়াছিল। পরে শ্রীযুক্ত এককড়িবাবুর উদ্যোগে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে একটী সভা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বালিকাগণই প্রধান শ্রোত্রী ছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোক ও শিক্ষকগণ এবং উলুবেড়িয়ার কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন।

বাণীবনের প্রাণস্বরূপ এককড়িবাবু বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচয় দিয়া পূজনীয় মতিবাবুকে সভায় নেতৃত্ব করিতে অনুরোধ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীমতিলাল রায়ের উপদেশ

সুধীগণ এবং আমার কন্যাস্থানীয়া মহিলা ও বালিকাগণ! আমি এককড়িবাবুর আকর্ষণ ও অনুরাগে আজ এখানে এসেছি। এমন যে দেখ্‌ব তা' একেবারেই আশা করি নি। এখানে এসে আমি অতিশয় আনন্দিত। আমি সাধারণভাবেই জীবন আরম্ভ করেছি, আজ সেই কথাই আপনাদের বল্‌বো। বাহিরে আমার কোন বৃহৎ স্বপ্ন ছিল না; কিন্তু ভিতরে যে একটী বিরাট্ ভাব ধীরে ধীরে স্থান করে' নিচ্ছে তা' বহুদিন হ'তেই অনুভব করেছিলাম। ভগবান যে ব্যথার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করতে চাইছেন। একটী জিনিষ বুঝেছিলাম—এই দেশ, জাতি, এই যে এত লোক—এই ভারতে, তারা তো সংখ্যায় প্রায় সমস্ত পৃথিবীর একপঞ্চমাংশ—তারা কি জাগ্‌ছে? তাদের মধ্যে প্রেম নাই, মিলন নাই, ধর্ম্ম নাই, প্রীতি নাই। এত বড় একটী দেশ—এখানে কিছু নাই, এই ব্যথার অনুভূতি আমি পেয়ে এসেছি। আমরা ধর্ম্মকে বড় মনে করি, কিন্তু কই আমাদের সে ধর্ম্মজীবন! এখানে মসজিদ্ আছে কিনা জানি না। মসজিদে অতি ভোরে ডাক দিত, আহ্বান করত, আজানে বল্‌তো—এস নরনারী, কে কোথায় আছ এস, ভগবানের নাম লও—আমি শুন্‌তাম। দেখ্‌তাম—দলে দলে লোক মসজিদে চলেছে ভগবানের উপাসনা কর্‌তে—বিরোধ, কলহ, হিংসা, সব শেষ



বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়

ক'রে ভগবানের উপাসনা কর্‌তে চলেছে। আমরা হিন্দু, কই আমরা প্রতিদিন তো এমন একটী স্থানে মিশি না, মিশ্‌তে পারি না—কেন? আমি ভাব্‌তাম। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ, আমাদের জীবনের আচরণে সে ধর্ম্ম কই প্রকাশিত হচ্ছে! ধর্ম্মের আশ্রয়েও তো আমরা প্রতিদিন দ্বেষ, হিংসা, বিরোধ ভুল্‌তে পারি না—সে আশ্রয় কই? ভেবেছিলাম, পরাধীনতার শৃঙ্খল জীবনকে জড় ও তামস করে' রেখেছে, স্বাধীনতা যদি আসে তবে সমাধান

হবে। স্বাধীনতার দিকে ছুটেছিলাম, স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে' বিপ্লবযুগে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলাম—মুখ ফেরালাম চরিত্র দেখে। কোথায় সে চরিত্র—যা' একটী জাতির মুক্তি আনবে? চেষ্টা করে ঠিক ঠিক কাজ করতে, কিন্তু কোথা থেকে গোলমাল করে' ফেলে। চরিত্রের অভাব প্রবলভাবেই অনুভব করলাম। স্বভাবের সংস্কার আছে—মানুষের সে সংস্কার পরিবর্ত্তন করতে শিক্ষা কই? প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—একদল নারী ও পুরুষ যদি পাই যারা পরিপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে জীবন পণ করবে—ধর্ম্ম ও জাতির জন্য। এটা ১৯১৮ খৃঃ কথা। আস্তে আস্তে আমার এই স্বপ্ন মূর্ত্তি পেতে আরম্ভ করে। আমি কেবলই এই চেতনায় থাকতাম, কেমন করে' একদল নারী ও পুরুষ জীবনের সকল কিছুই এক লক্ষ্যে নিয়োজিত করবে, কেমন ক'রে এদের জগদ্ধিতায় জীবন হতে পারে। যারা নিজেদের জীবন এমন ক'রে গ'ড়ে তুলবে, যেখানে পাপ, প্রলোভন, হিংসা দ্বেষ প্রবেশ করতে পারবে না। আমার জীবন দিয়ে একটী বিশুদ্ধ চরিত্রগঠনের মহাযজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। নারী দ্বাদশ বর্ষের ব্রত পরিপূর্ণ করেছে, সেই চরিত্র গড়ার ক্ষেত্র সম্ভব হয়েছে। তারপর এক একটী করে' ২৫টী মেয়ে 'প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরে' এসেছে নিজেকে নিখুঁত করে, শক্ত, দৃঢ় করে' গড়ে তুলবে বলে'। কিছুতেই নারী বলে' অক্ষম পশ্চাৎপদ্ হবে না। যতক্ষণ না পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হবে, তোমার শিক্ষা ও আত্মগঠনের মূল্য কি?

আজ তোমাদের সামনে কি দরদ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, তা' কেমন ক'রে প্রকাশ করবো। নারীর জীবনকে শিক্ষায় সাধনায় পূর্ণ করে' তুলতে চলেছি। আমি তোমাদের মধ্যে সেই নারীর সত্তাকে দেখে এত কথা বলছি। আমি আমার সম্মুখে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখছি না তো। আমি দেখছি—বিরাট্ আত্মা। একটী হিয়া—একটী বিহঙ্গের দুই পক্ষ নারী ও পুরুষ—সেই হিয়া তো পৃথিবীর রসে তৃপ্তি পাবে না! সে চাতকের মত ঊর্দ্ধমুখ ক'রে আছে—সে আত্মার রসে সঞ্জীবিত হবে। যে মানুষটী তোমাদের দেহের পশ্চাতে রয়েছে, সে তো চায় না সংস্কার, আবর্জ্জনা-পুরীষ। নারীর হিয়া তো সংযমে ক্ষুণ্ণ হয় না। নারীর আত্মাকে জাগিয়ে তোল, নারীর আত্মা জাগ্রত হ'লে, সে নারীর তো কখনও পতন হয় না।

আজ পুরুষের এই অধঃপতনের প্রতিকার কি? নারী যদি মহাশক্তি নিয়ে পুরুষের পশ্চাতে দাঁড়ায়, নারী যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, একমাত্র তবেই পুরুষের দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়। সে জগতের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে। আমার হিয়া, আমার পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে নারীর পশ্চাতে আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে বলছি—নারী জাগবে। কি সে শিক্ষা, যাতে নারী আপনাকে চিনে নিতে পারে? আমি সেই শিক্ষার কথাই তোমাদের একটু বলবো। হয় তো তোমরা কিছু বুঝবে না; কিন্তু মনে রেখো, একদিন ইহা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমি একটী জিনিষের সন্ধান পেয়েছি। পুরুষ ও নারীর দিগ্বিজয়ী চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে। পুরুষের দিব্যহৃদয় সৃজন করবে নারী। পুরুষের হৃদয় নাই। নারীর দায়িত্ব কত বেশী। প্রেম ও ভালবাসাই সেই দায়িত্বকে সিদ্ধ করবে। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রেম বিনা হয় না। প্রেম না হ'লে দু'জনে এক হ'তে পারে না। প্রেম প্রয়োজন।

নারীর কেন্দ্র প্রেম—বিশুদ্ধ করবার কিছু নাই, সেখানে শুধু তাকে আপনার গতি নিয়ে অগ্রসর

হ'তে হবে। আমি বলে' যাই, তোমরা শুনে রাখ। এই হৃদয়ের প্রেমেই মানুষকে পাগল করে' রাখে। নারী এই হৃদয় দিয়েই পুরুষকে দেবতারূপে গড়ে তোলে। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ঘটের মধ্যে পটের কালীকে জাগ্রত দেখেছিলেন কি দিয়ে? কৈ এখনও তো সেই দক্ষিণেশ্বরে সেই কালী রয়েছে—কোথায় সে মহিমা? রামকৃষ্ণ আপন বিশুদ্ধ হৃদয় দিয়েই তো ঘটের মধ্যে, জড়ের মধ্যে কালীকে, মহা-শক্তিকে দেখেছিলেন।

স্বামী যে দেবতা, সে তো স্বামীর গৌরব নয়। সে যে নারীর আত্মদানের সৃষ্টি। নারীই তো তিলে তিলে আপনাকে ঢেলে দিয়ে স্বামীর মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করে' তুলে।

এই যে আত্মদানের কথা—এখানে একটী পূর্ণতা আছে, এই প্রেমের একটী আস্বাদ আছে। আমাদের প্রেমের সংস্কার আবৃত হয়ে আছে। আমরা সাধারণ জীবনে প্রেমের বিকৃত রূপই দেখি। আমাদের সেই সংস্কারই প্রবল, প্রেম বল্‌লে তাই আমরা সেই বিকৃত জিনিষটীকে বুঝি। যারা কদন্ন খায়, তাদের অতি সুন্দর অন্ন দিলেও তা তাদের ভাল লাগে না, তৃপ্তি পায় না—এমনই অভ্যাসও সংস্কার! কিন্তু প্রেমের সংস্কার আমাদের অন্তরে সিদ্ধ। যদি উর্দ্ধগতি পাও, যদি উপরের দিকে উঠ, তবে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

যদি গৃহিণী হতে চাও, যদি দেশসেবিকা হতে চাও, যদি ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী হতে চাও, তোমাকে এই প্রেমের আস্বাদ পেতেই হবে। আজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ভীম অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করে না কেন? এই প্রেমের সাধনা গেছে! আজ খুঁজে দেখ—কয়টী গৃহে প্রেমের আগুন জ্বলছে! তোমরা কতকগুলি বিদ্যুৎপুঞ্জ হ'লেই নির্ব্বাপিত যে প্রদীপ তা' জ্বালাতে পার্‌বে। একটু স্থির হয়ে দেখো—এইটী আত্মা। যদি ঠিক ঠিক ভালবাস, দেখ্‌বে ওই আলো দ্বিগুণ হয় কিনা—ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠে কিনা! যাহাতে ইহা না হয়, তাহা ফেলে দাও। ইহা নয়—ইহা নয়—এই 'নেতি নেতি' করে' যাহা তোমাদের অন্তরের অগ্নিকে জ্বালিয়ে দেবে তাই তোমরা বুঝো।

আমি পাগলের মত বলে' চলেছি, আমার আকুলতা তোমাদের জানাচ্ছি। তোমরা হয়তো ভাব্‌ছ—বিদ্যালয়ের বর্ণমালা শিক্ষার জায়গায় এসে এক পাগল সাধনার কথা বলেছ। সত্যিই আমি তোমাদের কাছে সাধনার কথাই বল্‌ছি। তোমরা হয়তো বুঝ্‌বে না, তাতে ক্ষতি নাই; আমি তোমাদের রূপ ও আকারের কাছে কিছু বল্‌ছি না, আমার আকুলতা তোমাদের আত্মায় গিয়া যেন পৌঁছায়। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, এই ত্রিধারায় জীবনকে প্রবাহিত কর্‌তে হবে।

শিক্ষার পর দীক্ষা। দীক্ষা কিরূপ? কিরূপে সাধনা কর্‌বো? এই যে বহির্ম্মুখী প্রকৃতি ইহাকে দীক্ষার ভিতর দিয়ে লয় করে দেবো। সাধনা কি—যখন শরীরের আকর্ষণ নাই, ভোগ নাই, বাসনা নাই, তখন আস্তে আস্তে জীবনে ভগবানকেই মূর্ত্ত করে' তুল্‌বো। এই ভাবেই আমাদের বুদ্ধি বুঝ্‌বে—আমার ভিতরে ভগবান বাস করছেন—এই বোধ যে তিনি এই মন্দিরে আছেন। এ মন্দিরে শুধু তুমি আর আমি, এই বোধই সাধনা।

যদি তোমরা এই হিয়া পাও, দেশ ফুটবে। সিষ্টার নিবেদিতা ও মীরা বেন্ ইংলণ্ডের মেয়ে; কিন্তু এই হিয়া পেয়েছেন, তারা আপনাদের বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। যদি হিয়া পাও, বাংলার প্রাণ সার্থক হবে। দেশকে সার্থক কর্‌তে পারবে। তোমাদের আচার্য্য সার্থক হবেন।

এই আকুলতা নিয়ে চন্দননগরে আমি শতাধিক পুরুষ ও ২৫ জন নারীর প্রাণ গড়ে' তুল্‌ছি।

মাতৃগণ, দুহিতাগণ,—তোমাদের মধ্যে পাঁচ জনও যদি এই শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা পাও, নারীত্ব সার্থক হবে, দেশ ও জাতির শ্রী ফিরবে। গৃহকে, দেশকে পূর্ণ ক'রে, জগতের সামনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করবে—ভারতীয় নারীর শক্তি কত বড়!

আশীর্ব্বাদ করি, বাণীবনে যে সাধনা চলেছে তা' সিদ্ধ হোক্। এদের শিক্ষার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হবার ব্যবস্থাও আছে, শুন্‌ছি—তাহা আগে ভাল করে' করা হোক্। তাদের জীবনে ভগবানের সহিত পরিচয়ের অবসর হোক। সে উপায়—উপাসনা। আমরা ক্ষুধা পেলে, কিরূপ বিরক্ত হই! শরীরের উপর এই ঝোঁক কেন—শরীরের ভোগ ভোজন-তৃপ্তি। কিন্তু যাকে জাগাতে চাইছি, তার জন্য কি করি? ভোজন কর কত আহ্লাদ ক'রে, ক্ষুধার সময়ে ভোজনের কথা কত তৃপ্তি দেয়। উপাসনা সে ততোধিক তাঁর নাম নেব, উপবাসী আমি নাম নিয়ে অভিষিক্ত হবো, কত পূর্ণতর আনন্দ।

আমাদের আশ্রমে চার বার উপাসনার ব্যবস্থা করেছি।

কি ভাবে উপাসনা করতে হবে? আর কিছু না—শুধু, প্রভু আমি তোমার সম্মুখে এসেছি; স্তব্ধ মৌন হয়ে স্মরণ করি যেন—প্রভু, আমি তোমার দুয়ারে এসেছি। হে ভগবান! আমি তোমায় ডাকছি। বাংলার সাধক বলেছে—যত শুনি কর্ণপুটে, সকলি মায় মন্ত্রে বটে ইত্যাদি এই ভাব। শুধু ভাববে—প্রভু আমি তোমার। আমি তোমার দ্বারে এসেছি। এই ডাকে সাড়া দাও। এই ভাবে তিনদিন উপাসনা কর। ডাইরীতে লিখে রেখে দাও, তিনদিন পরে দেখো। তোমার গতি লক্ষ্য করো। উপলব্ধি করো, অনুভব করো—আমি তোমাদের বড় দরদ দিয়ে বল্‌ছি। তোমাদের বড় দায়িত্ব, দায়িত্বকে সিদ্ধ কর। নারীত্বকে প্রতিষ্ঠা কর।

আহারে বিহারে সব সময়ে এক চেতনায় থেকো। পড়ার সময়ে ভেবো—অন্তর্য্যামী পড়ছেন। মানুষের কণ্ঠে ভগবানের রাগিণী বাজে। তুমি আছ তোমার কামনার জন্য নয়, ভগবানের জন্য। আমাদের প্রভাতী মন্ত্রে আছে—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—

নারী যদি ধীর, সংযত, একাগ্র হয়, সব পৃথিবী পরিবর্ত্তন করতে পারে। আর দুইটী কথা বলে' আমার কথা শেষ করি।

উপাসনার গৃহে সচেতন হয়ে যেও। তাঁর নাম করছি, এই বোধ। চেতনায় থেকো—একজন তোমার ভিতর জাগতে চাইছেন।

আমি এই ক্ষুদ্র পল্লীতে এসে অতিশয় তৃপ্ত হয়েছি। আমাদের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত এককড়িবাবুর একান্ত ইচ্ছা—আমরা বাণীবনে এসে পল্লী-গঠনের কাজ নিই। তিনি বার বার আমাদিগকে তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর কথার উত্তরে আমি তাঁদের এই গ্রাম হ'তে ৫ জন মাত্র ছেলে চাইছি, যারা কিছুদিন শিক্ষা করে' এসে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সহযোগিতায় এখানে শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে' কাজ আরম্ভ করবে। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' জাতির জাগরণের জন্য এই গঠনমূলক কাজ নিয়েছে; কিন্তু নূতন ক্ষেত্রে কর্ম্মপ্রসার করার জন্য সেই ক্ষেত্রের মানুষ না হ'লে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কাজও সুসম্পন্ন হয় না। আমার এই দাবী—যদি ২টী ছেলেও দিতে পারেন, আমরা এখানে কিছু কাজ আরম্ভ করতে পারি। এই গ্রামটি খুঁজে একটী ছেলেকেও কি পল্লী-গঠনের কাজে পাওয়া যাবে না?

মায়া কাজল*

(কাব্য-সমালোচনা)

[শ্রীঅমলচন্দ্র-হোম]

রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যে কবিগোষ্ঠী বাংলা-কাব্য-সাহিত্যে এক সময়ে আসর জমাইয়াছিলেন, জানি না কি কারণে, তাঁহাদের বীণাধ্বনি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতেই সে আসর যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে আসরকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্য যে নূতন রূপ লইয়াছিল, সে রূপও কতকটা বদলাইয়া গিয়াছে। এই কবি-গোষ্ঠী মানুষ ও প্রকৃতির সমগ্র রূপটিকে দেখিয়াছিলেন একটী কল্পলোক ও ভাবলোকের মধ্যে। বস্তুর রূপ তাঁহাদের সেই দৃষ্টির মধ্যে আত্মবিলাপে করিয়া এক নূতন কল্প-রূপ ধারণ করিয়াছিল।

'মায়া কাজলে'র কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর এই নূতন কাব্যখানির মধ্যে আমরা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ চিরন্তন আনন্দের স্পর্শ পাইয়াছি। অতি আধুনিক কবিতায় বস্তুর স্থূল রূপ যখন আমাদের দৃষ্টি প্রায় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তখনই কবিটি আমাদের চোখে 'মায়া কাজল' বুলাইয়া দিয়া অপরূপ কল্পলোকের মধ্যে, বস্তুর বস্তু-নিরপেক্ষ সত্য রূপ দেখাইয়াছেন। এই কল্পদৃষ্টির পরিচয় কবি নিজেই দিয়াছেন—

"মানস-তুলির আল্‌পনাতে রঙ্‌ ফলানো
যাহার কাজ—
সেই পরালো মায়া-কাজল কল্পনারো ভাঙলো লাজ।
উধাও হ'য়ে চিত্ত উড়ে আকাশ মরু সমুদ্রে!...
মায়া-কাজল খুল্‌ছে ব'সে অপরূপের রূপের ভাঁজ!

*　　*　　*

বুলিয়েছে রে মায়া-কাজল—চোখে তুলি বুলিয়েছে,
মরীচিকার মায়ার রঙে নিখিল ভুবন ভুলিয়েছে,
দু'কূলহারা অচিন পথে হঠাৎ দিয়ে হাতছানি—
যাদুকরের যাদুর মালা গলায় গেছে দুলিয়ে যে!"

—এ সেই দৃষ্টি যে দৃষ্টি স্বপ্নে এবং সত্যে কবির আঁখিকে রাঙাইয়া দেয়; বস্তুর বস্তু রূপে যে দৃষ্টির মন ভুলে না। হেমেন্দ্রলাল এই দৃষ্টিতেই বিশ্বভুবনকে দেখিয়াছেন এবং এই হেতুই প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি সব চেয়ে বেশী আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন; তাঁহার কল্পনাও বিচিত্র সৃষ্টির অবসর পাইয়াছে। "দীপালীর রাত্রিতে" তাই—

"আকাশের হাসি মর্ত্ত্যে নেমেছে—ফুটেছে
তারার ফুল,
রাতের আঁধার দিন হ'য়ে গেল বিস্ময়ে বিল্‌কুল!"

*　　*　　*

"কুঙ্কুমে আঁকা অশোকের থোকা হেথায় হোথায় লুটে,
রাঙা হ'য়ে উঠে পলাশের চুমা রাতের ওষ্ঠপুটে।
লাল করবীর বুকের স্বপন,
দুই হাতে আজ ছড়ায় পবন,
ধরার দুয়ারে দানা বেঁধে তারা দীপ হ'য়ে ওঠে ফুটে।"

সুন্দর! "মেঘের প্রেম" কবিতাটিতে রূপ পাইয়াছে একটি অপরূপ ভাব ও কল্পনা। দুটি প্রান্তর ঢাকিয়া দুইটী জল-ভরা মেঘ, যেন বিষাদে ভারাক্রান্ত। তাহারা—

"অতি অসহায় এ উহারে চায় মেলিয়া মলিন আঁখি।"

এমন সময়ে তাহাদের গায়ে লাগিল আর্দ্র বাতাসের কঠিন স্পর্শ; তখন—

"চির জীবনের মিলনরাগিণী হৃদয়ে উঠিল বাজি।"

তারপর ধীরে ধীরে—

"কাছে অতি কাছে, পাশাপাশি—শেষে পলকে
উভয়ে আত্মহারা,
মধুমিলনের মন্দির দীপ্ত আলোকে
ঝাঁপায়ে পড়িল তারা।
বিদ্যুতে আঁকা তৃষিত তপ্ত কর—
দু'জনা দোঁহারে বাঁধিল বক্ষ পর।
রুদ্ধ রোদন পুলকে পড়িল ভাঙিয়া,
চকিত হাস্যে ওষ্ঠ যে রাঙিয়া।
মুগ্ধ নয়ন প্লাবিয়া ঝরিল
মিলন অশ্রুধারা,
মিলন যখন ফুরালো তখন
নিমিষে মিলালো তারা।"

---

* মায়াকাজল—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় রচিত সাতচল্লিশটি কবিতার সংগ্রহ।

নানান ভাবে ও কল্পনায় প্রকৃতির বন্দনা "মায়া-কাজলের" অনেকগুলি কবিতায় ও সনেটে আছে। প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি বিশিষ্টতার ছাপ দেখিতে পাইয়াছি। 'বর্ষাবরণ' 'বর্ষায়' 'ভাদ্র মাসের গান', 'ফাগুন বরণ' 'কলাপী' কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ফাগুন বরণ' কবিতাটিতে কবির প্রতিভার চমৎকার বিকাশ দেখিয়াছি।

ফাগুন বরণে—

শীত শিশিরের মুখে সে দিয়েছে হাসির হিরণ টানি',
রাঙিয়া উঠেছে রভসে পেলব পলাসের পাণি-পানি।
রূপের বন্যা ঝরিছে আকাশে,
দোলে কাঞ্চন রৌদ্রে বাতাসে,
বুল্‌বুল্ আর দোয়েলের দলে হানাহানি কানাকানি।
ফাগুন এসেছে কমলের দলে হাসির ফোয়ারা হানি'!

মধুর! "সাগরিকা" কবিতাটি স্বপ্নের ইন্দ্রজালে বোনা; তুলির লেখা ছবির মতো—

"হাতছানি দিয়ে ডাকে সাগরিকা
সাগর-পারের বালা,
গলায় যাহার জড়ানো রয়েছে
নীল মুকুতার মালা,
যার কেশপাশ সুরভিয়া চলে
নীল আকাশের বাও,
তারি ঈশারায় আমি ভাসায়েছি
অকূলে আমার নাও!
ঝিনুকের নায় ক্ষ্যাপা দরিয়ায়
সাগরিকা দেয় পাড়ি।
তারি পথ চেয়ে নাও চলি বেয়ে
সে চলা কেমনে ছাড়ি!"

এমনি সুন্দর কল্পনার ছবি "মায়া-কাজলে" অনেক আছে।

অতি অস্পষ্ট একটি পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া "উর্ব্বশীর অভিশাপ" কবিতাটিতে হেমেন্দ্রলাল যে স্বপ্ন-কল্পনার গল্প-জাল রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। এই কথা-কবিতাটি ইংরেজ কবি Stephen Phillips-এর কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"মায়া-কাজলে" গুটি ষোলো সনেটজাতীয় চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। নারীদেহের সৌন্দর্য্য ও নরনারীর দেহের কামনা লইয়া এই চতুর্দ্দশপদীর যে কয়েকটি কবিতা রূপ পাইয়াছে, তাহা প্রকাশের ভঙ্গিমায় সরস ও সংযমে সুন্দর। একটি ("চিরন্তন") উদ্ধৃত হইল—

"বিদায়ের দূত এলো ঘনায়ে দুয়ারে—
তুমি লিখিয়াছ লেখা সারা দেহময়,
তাই তো পড়িনি ভেঙে বেদনার ভারে,
জাগেনি মর্ম্মের মাঝে মৃত্যুর প্রলয়!
বৃথা বিদায়ের বাণী—চকিত চঞ্চল,
এ চোখে তোমারি দিঠি হানে শিহরণ,
কত সে কালের ছোঁয়া—হয়নি শীতল,
উদ্যত তেমনি আছে উত্তপ্ত চুম্বন।
তোমারে বেসেছি ভালো—ভালোবাসি তাই
তোমার পরশে ছাওয়া এই তনুখানি,
এ তনুর তীরে তীরে কোথা তুমি নাই?
তাই তো একান্ত মিথ্যা বিদায়ের বাণী।
ঐ তব স্পর্শ আর এই আলিঙ্গন
আমার দেহের মাঝে এরা চিরন্তন।"

কিন্তু অংশ বা একটি দু'টি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া হেমেন্দ্রলালের কবিতার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতে গেলে কবির প্রতি অবিচারের আশঙ্কা আছে। তাঁহার "মায়া-কাজল" সার্থক সৃষ্টি। যাঁহারা তাঁহার কবিতার সহিত পরিচিত, "মায়া-কাজল" পাঠে তাঁহাদের পরিচয় আরও নিবিড় হইবে; যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহারা "মায়া-কাজল" পড়িলে আনন্দ পাইবেন এবং একটি সরস ও সহজ কবিপ্রতিভার স্পর্শে তৃপ্ত হইবেন।

"মায়া-কাজল"-এর ছন্দের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর। প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দরচনায় পাকা হাতের পরিচয় আছে। সে নিপুণতায় কষ্ট-কল্পিত অভিনবত্ব নাই, তাহা সহজ ও অনায়াস। হেমেন্দ্রলালের শব্দযোজনা ও ছন্দনির্ব্বাচন প্রায় সর্ব্বত্রই একটি মার্জ্জিত রুচির পরিচয়ে উজ্জ্বল।

সবশেষে একটি ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। দু' একটি কবিতা একটু অতিরিক্ত হাল্‌কা ধরণের হইয়াছে—ইংরেজীতে যাহাকে বলে trivial, যেমন "জ্যোৎস্নারাতে", "রাতের ইতিহাস।" এ দু'টি কবিতা বাদ দিলেই ভাল হইত।

গ্রহ, নক্ষত্র ও পঞ্জিকা

[শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি]

হিন্দুর বাড়ীতে পঞ্জিকার প্রয়োজন নিত্য। শুধু বার তারিখ জান্‌বার জন্তই যে পঞ্জিকা হিন্দুর কাজে লাগে তা' নয়, নিত্য নৈমিত্তিক নানা কাজে তার পঞ্জিকার দরকার। সকলেই যে পঞ্জিকার সব বিষয়ে খুব বেশী আস্থাবান্ তা' বলা চলে না; কিন্তু বিশ্বাস না থাকলেও পূর্ণিমা, অমাবস্তা, একাদশীর উপবাসে, পুত্র কন্তার অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহে, দুর্গাপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমীতে অবিশ্বাসীদেরও পঞ্জিকার মতে চল্‌তে হয়। আর যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদেরও উঠ্‌তে বস্‌তে পঞ্জিকার দরকার। প্রতিপদে কুমড়ো, ত্রয়োদশীতে বেগুন বর্জ্জন কর্‌বার জন্তও তাঁদের যেমন পাঁজি চাই, যাত্রায় অশ্লেষা-মঘা এবং শুভ কাজে বারবেলা কালরাত্রি এড়াবার জন্তও তেমনি তাঁদের পাঁজির দরকার। কিন্তু মজা এইটুকু, যে বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মধ্যে হাজার-করা একজনও জানেন কি না সন্দেহ, এই একাদশী পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি, বা অশ্লেষা-মঘা প্রভৃতি নক্ষত্র, এবং বারবেলা কাল রাত্রি প্রভৃতি ক্ষণ—এ জিনিষগুলি বাস্তবিক কি পদার্থ। একজন বিশ্বাসীকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম, যে তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা আছে কি না? উত্তরে তিনি বল্‌লেন—"অত শত জানিনে, মশায়। পাঁজিতে লেখা থাকে তাই জানি।"

আমি ফের প্রশ্ন কর্‌লুম, "যদি জিনিষগুলোই কি তা' না জানেন তা' হ'লে তা' মেনে চলেন কি ক'রে?"

এর উত্তর যা' পেয়েছিলুম তা' আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে।

"বাঃ! মেনে চল্‌বো না-তবে হিন্দু হ'য়ে জন্মেছি কি জন্তে?" এর উপর আর কথা চলে না। যা' জানি না যা' বুঝি না, তাই মেনে চল্‌বার জন্তই যে আমাদের হিন্দু হয়ে জন্মানো, এই সত্য আমাকে নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করাতে পেরেছেন মনে করে' সে ভদ্রলোক বোধ করি সেদিন যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে একবার এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম। তিনি স্পষ্টই বল্‌লেন, যে তিনি ও সব কিছুই মানেন না; তবে মেয়ের বিবাহ প্রভৃতিতে যে পাঁজির দিন দেখে কাজ করেন, তার কারণ ঐ নিয়ে কে মিছে হাঙ্গামা পোহায়! তিথি নক্ষত্র জিনিষগুলি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ একই উত্তর দেন "অত শত জানি নে—জান্‌বার দরকারও মনে করি নে।"

সব চেয়ে বড় মজার ব্যাপার এই, যে যাঁরা এই নিয়ে রাত দিন নাড়াচাড়া কর্‌ছেন, যাঁদের কথার উপর সব ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ভর, যাঁরা এর 'অথারিটি' সেই পুরোহিত দৈবজ্ঞদেরও বেশীর ভাগই জানেন না—গ্রহ নক্ষত্র পদার্থগুলি কি? অথচ পঞ্জিকা দেখে ক্ষণ নির্ণয় ক'রে ব্যবস্থা দিতে এঁরা মোটেই পেছপা নন।

বাস্তবিক তিথি নক্ষত্র জিনিষগুলি যে কি, তা' জানা যে খুব বড় একটা কঠিন ব্যাপার তা'ও নয়।

এমন কি স্কুলের ছেলেদের বোঝালে, তারাও বোধ হয় খুব সহজেই এগুলি বুঝ্তে পারবে। আসল্ দোষ হয়েছে, যে এগুলি জানাবার বা বোঝাবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেউ করেন নি। হিন্দুর সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অনেকখানি পঞ্জিকার লিখিত ব্যাপারগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু এই ব্যাপারগুলি যে বাস্তবিক কি এবং পঞ্জিকার সঙ্গে এই ব্যাপারগুলির যে কি রকম সম্বন্ধ, তা' হিন্দু বালককে স্কুল কলেজে ত শেখানো হয় না—স্কুল কলেজের বাইরেও শেখাবার কোন উদ্যোগ নাই।

পঞ্জিকা সংস্কারের জন্ত বহু বৎসর ধরে' বাংলা-দেশের বহু মনীষী চেষ্টা করে' আস্‌ছেন ; এ নিয়ে মাঝে মাঝে সাধারণ সভা এবং সমিতিও গঠন করা হ'য়েছে। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মহৎ ব্যক্তিদের নায়কত্বে কয়েকটি সভা বহুদিন পূর্ব্বে করা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এ নিয়ে সাময়িক পত্রগুলিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধও লিখে থাকেন। তবুও পঞ্জিকাসংস্কারের কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নি। বরঞ্চ পণ্ডিতদের মধ্যে এ নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যাঁরা পঞ্জিকা সংস্কার করতে চেয়েছেন তাঁরা ভুল পন্থা অনুসরণ করাতেই তাঁদের চেষ্টা বিফল হয়েছে এবং পণ্ডিতদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হ'য়েছে। পঞ্জিকাসংস্কার-প্রয়াসীরা যদি পঞ্জিকার সংস্কার নিয়ে সাধারণের অবোধগম্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সময় নষ্ট না ক'রে পঞ্জিকার ব্যাপারগুলি যে কী তা' আবাল-বনিতাকে না হোক্, অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন এবং এইগুলি স্কুলে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতেন, তা' হ'লে পণ্ডিতদের মধ্যে হা-হুতাশ, আস্ফালন, বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতির কোন অবকাশই থাকৃত না এবং পঞ্জিকাব্যবসায়ীদের "আমার পঞ্জিকা ঠিক, অন্যের পঞ্জিকা ভুল" ব'লে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা মনেই হ'ত না। কারণ, পঞ্জিকার লিখিত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝ্তে পারতেন—পঞ্জিকা কী হওয়া উচিত ; কাজেই পঞ্জিকার সংস্কার আপনা আপনিই হ'য়ে যেত।

এইখানে আমি পঞ্জিকার ব্যাপারগুলির একটা মোটামুটি ধারণা দিতে চাই ; আমার মনে হয়, তা' হ'লে আমার বক্তব্য সকলের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌বে। পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পঞ্চাঙ্গ সম্বন্ধে জন সাধারণকে জানানো। যেমন Almanac ছাপানোর উদ্দেশ্য লোককে বার ও তারিখ ঠিক ক'রে জানানো, তেমনি পঞ্জিকার উদ্দেশ্য কোন তারিখে, কোন বার, কোন তিথি, কোন নক্ষত্র, কোন করণ, কোন যোগ তাই জানানো। বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ এবং যোগ—এই পাঁচটী জিনিষকে পাঁচটী অঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ বলা হয়ে থাকে। বার সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নেই কেন না এটা আকাশের কোন ব্যাপার নয়। তিথি নক্ষত্র, করণ এবং যোগে—চারিটি জিনিষ যে কি, তাই আমাদের জানা দরকার।

একটা জ্যোতিষ্ক গোলক (Astronomical globe) নিয়ে বোধ হয় দু' চার মিনিটের মধ্যেই এ চারিটী ব্যাপার একজন বালককেও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কথায় প্রকাশ করতে একটু বেশী সময় লাগাই সম্ভব। তিথি, নক্ষত্র, করণ এবং যোগ— এই চারিটি জিনিষ আকাশে সূর্য্য এবং চন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। নক্ষত্রটি শুধু চন্দ্রের অবস্থান থেকেই জানা যায় এবং তিথি,

করণ ও যোগ সূর্য্য এবং চন্দ্র এই দুইটীর অবস্থান থেকে নির্ণয় করতে হয়।

যাঁদের ভূগোল সম্বন্ধে একটু জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন, যে আকাশে সূর্য্যের একটা গতি-পথ আছে, যার পারিভাষিক নাম ক্রান্তিবৃত্ত, ইংরাজীতে এক্লিপটিক্। এই ক্রান্তিবৃত্তের দু পাশে অনেক নক্ষত্র-পুঞ্জ আছে। সেইগুলিকে একটা চওড়া পটির মত কল্পনা করলে আকাশের পূব থেকে পশ্চিম পর্য্যন্ত নক্ষত্রখচিত একটা চওড়া পটির চাকা পাওয়া যাবে, যা' আকাশের গা দিয়ে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রয়েছে বলে' মনে হবে। এই চওড়া পটির চাকাটিই রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্তটি একটি লাইন মাত্র। এখন যদি মনে করা যায়—রাশিচক্রের নক্ষত্রপুঞ্জগুলি একটি একটি গ্রাম বা নগর এবং ক্রান্তিবৃত্তটি একটি রেলের লাইন যা ঐ সব গ্রাম বা নগরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র দুটি রেলওয়ে ট্রেণ ঐ লাইনের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে—তা' হলে যে কোনদিন যে কোন সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্রের অবস্থান আমরা ঐ নক্ষত্রপুঞ্জগুলি দিয়েই বলতে পারব, যদি নক্ষত্রপুঞ্জগুলিকে আমরা চিনতে পারি।

যাঁরা আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা এই ক্রান্তিবৃত্তের দু' পাশে সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে তাদের নাম দিয়েছেন অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের গোড়া থেকেই তাঁরা রাশি-চক্রের গোড়া ধরেছেন। এ ছাড়া আগাগোড়া সমস্ত রাশিচক্রটাকে সমান ১২ বারটা ভাগে ভাগ ক'রে প্রত্যেক ভাগের মেষ, বৃষ প্রভৃতি আলাদা আলাদা বারটা নাম দিয়েছেন। এ ভাগও তাঁরা করেছেন অশ্বিনী নক্ষত্রের গোড়া থেকে।

যাঁরা জ্যামিতি পড়েছেন তাঁরা জানেন, যে অংশ কলা দিয়ে বৃত্তের বা বৃত্তাংশের পরিমাপ করার একটা নিয়ম আছে। ক্রান্তিবৃত্ত একটি বৃত্ত, কাজেই ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের বা চন্দ্রের অবস্থান সে নিয়মেও নির্ণয় করা যায়। একটি পূর্ণ বৃত্তের মাপ ৩৬০ অংশ—মেষ বা অশ্বিনীর গোড়া থেকে সূর্য্য বা চন্দ্রের স্থিতি-বিন্দুটি পর্য্যন্ত বৃত্তাংশটি যদি মাপা যায়, তা'হলেই ক্রান্তিবৃত্তে তাদের সঠিক অবস্থান জানা যাবে। এই মাপকে স্ফুট বা অবস্থান বলা হয়। সে কথা অন্যত্র বলব।

আগে যে রেল লাইনের উদাহরণ নিয়েছি তারই যদি অনুসরণ করা যায় এবং প্রত্যেক নক্ষত্র-পুঞ্জকে যদি একটি ক'রে গ্রাম বা নগর ব'লে মনে করা যায়, তা' হ'লে প্রত্যেক রাশিকে আমরা এক একটা পরগণা বলে মনে করতে পারি; এ-ও মনে করতে পারি, যে জরিপ করে' প্রত্যেক নক্ষত্র ও রাশির সীমানা নির্ণয় করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যে ক্রান্তিবৃত্তের লাইনের ১৩°—২০´ কলা ক'রে গেছে এবং প্রত্যেক রাশির মধ্য দিয়ে ক্রান্তিবৃত্তের লাইনের ৩০ অংশ করে গেছে।

এই লাইনের উপর দিয়ে সূর্য্য চন্দ্র চলেছে। চন্দ্র এই লাইনের উপর দিয়ে যেতে যেতে যখন যে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আসেন সেইটেকেই তখনকার নক্ষত্র বলা হয়। পঞ্জিকাতে যে লেখা থাকে অমুক দিন অমুক নক্ষত্র এতক্ষণ পর্য্যন্ত আছে, তার মানে আকাশে চন্দ্র ততক্ষণ পর্য্যন্ত অমুক নক্ষত্র-পুঞ্জ মধ্যে থাকিবে। এই হচ্ছে পঞ্চাঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ নক্ষত্রের আসল মানে।

তিথিটা গণনা করা হয়—চন্দ্র সূর্য্য থেকে যত দূরে আছে তাই নিয়ে। সূর্য্য যেখানে আছে সেইখান থেকে ক্রান্তিবৃত্তের লাইনের প্রত্যেক ১২ অংশকে যদি এক একটা আলাদা আলাদা ভাগ ব'লে মনে করা যায় এবং তাদের যদি প্রথম, দ্বিতীয়, এই হিসাবে নাম দেওয়া যায়, তা' হলে সেই ভাগ-

গুলোর মধ্যে যেটাতে যখন চন্দ্র থাকবে তখন সেইটে থেকে তিথি ঠিক করতে হবে। একটা উদাহরণ নিলে এ জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একই সময়ে একটা জায়গা থেকে দুটো গাড়ী ছাড়ল। একটা ঘোড়ার গাড়ী আর একটা মোটর। মোটরটা নিশ্চয় ঢের এগিয়ে যাবে এবং এদের কার কত গতি তা' যদি আমাদের জানা থাকে, তা'হলে আমরা ঠিক বলতে পারব—কোন সময়ে মোটরটা ঘোড়ার গাড়ীটা থেকে কত মাইল দূরে আছে। এ'ও ঠিক তাই। প্রত্যেক ১২ অংশকে আমরা যদি একটা ক'রে মাইল বলে' মনে করি, তা' হ'লে চন্দ্র যদি সূর্য্য থেকে ১২ অংশের মধ্যে থাকে, তবে আমরা বলতে পারব—চন্দ্র প্রথম মাইলে আছে। ১৬৮ থেকে ১৮০ অংশের মধ্যে থাকলে বলতে পারব - পঞ্চদশ মাইল আছে। মাইল না বলে' এ গুলোয় যদি তিথি নাম দেই, তা' হলে চন্দ্র সূর্য্য থেকে ১ম তিথিতে আছে, এ কথাও বলতে পারি। এই তিথিগুলির যদি অন্য রকম নাম দেওয়া হয়—যথা প্রথম তিথির নাম যদি দেওয়া হয় পূর্ণিমা, ষোড়শ তিথির নাম যদি দেওয়া হয় কৃষ্ণা প্রতিপদ, ত্রিংশ তিথির নাম যদি দেওয়া হয় অমাবস্যা, তা' হলেও যে কোন সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থান জানলে তখন কোন তিথি তাহা সহজেই বলা যায়। আসলে তিথির মানে হচ্ছে যে কোন সময়ে সূর্য্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব—প্রত্যেক ১২ বার অংশকে unit ধরে'। এই গেল পঞ্চাঙ্গের তৃতীয় অঙ্গ তিথির ব্যাপার।

তারপর চতুর্থ অঙ্গ—করণ। করণ ব্যাপারটা নির্ভর করে তিথিরই উপর। প্রত্যেক তিথির প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ ভেদে এক একটা নাম দেওয়া হয়। সেইগুলিই হচ্ছে করণ। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপর, যোগ। যোগ একটী গণিতিক বিন্দু এবং এ-ও নির্ভর করে সূর্য্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর। চন্দ্র মেষের আরম্ভ থেকে যত দূরে আছে, সূর্য্যের অবস্থান থেকে ঠিক ততদূরে যদি একটী বিন্দু কল্পনা করা যায়, তা' হলে সেই বিন্দুটী যে নক্ষত্রপুঞ্জে পড়বে সেই হিসাবে যোগেরও নাম হবে। বিন্দুটী যদি অশ্বিনী নক্ষত্রে পড়ে, যোগের নাম হবে বিষ্কুম্ভ। যদি ভরণীতে পড়ে তা' হ'লে তার নাম হবে প্রীতি। যদি মঘায় পড়ে, তার নাম হবে গণ্ড। যদি রেবতীতে পড়ে, তার নাম হবে বৈধৃতি ইত্যাদি।

বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ—এই পাঁচটী জিনিষ হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মে নিত্য প্রয়োজন বলে' পাঁজিতে এগুলি দেওয়া দরকার। পাঁজি দেখলেই লোকে যেন বুঝতে পারে—কবে কোন বার, কতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন তিথি। কখন থেকে কখন পর্য্যন্ত কোন নক্ষত্র বা যোগ ইত্যাদি। উপরে যা' বলা হয়েছে তা' থেকে এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, যে তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ, এগুলি আকাশের কতকগুলি ব্যাপার। পঞ্জিকায় শুধু দেখানো হয়ে থাকে—কখন কোন ব্যাপারটা ঘটছে অর্থাৎ রেলওয়ের 'টাইম' দেখে যেমন আমরা বুঝতে পারি কখন কোথায় কোন্ ট্রেণ যাবে, এও ঠিক তাই। পঞ্জিকা হচ্ছে আকাশের কতগুলি ঘটনার 'টাইম টেবল' মাত্র।

আগে সাধারণের জন্য যে পঞ্জিকা লিখিত হ'ত তাতে এই পাঁচটী জিনিষই প্রত্যহ দেওয়া হ'ত; কিন্তু এখন বাংলা দেশে যে পঞ্জিকাগুলি পাওয়া যায় তাতে এসব ব্যাপারগুলি তো থাকেই, তা' ছাড়া আকাশের আরও অনেক ব্যাপারের প্রাত্যহিক উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের অবস্থান ও চন্দ্রের অবস্থান দেওয়া থাকে; চন্দ্র সূর্য্য ছাড়া অন্য গ্রহদেরও দৈনিক অবস্থান

দেওয়া হয়। সূর্য্যের উদয়, অস্ত প্রভৃতির উল্লেখও থাকে।

বাংলা দেশে অনেকগুলি পঞ্জিকা ছাপা হয়ে থাকে। এবং পঞ্জিকাগুলির মধ্যে অনেক ব্যাপারে কম বেশী অনৈক্য দেখা যায় এবং সকল পঞ্জিকা-কারগণই জোর গলায় প্রচার ক'রে থাকেন, যে হিন্দুর কাজকর্ম্ম বিশুদ্ধ ভাবে করতে হলে, তাঁদের পত্রিকাই প্রশস্ত। প্রত্যেক পঞ্জিকার গোড়াতেই সব বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের নাম দেওয়া হয়ে থাকে, যাঁরা সেই পঞ্জিকার পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাদাতা। অনেক জায়গায় এমনও দেখা যায়, একই পণ্ডিত এমন দুটি পঞ্জিকাতে পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে নাম দিয়েছেন যাদের তিথি নক্ষত্রের স্থিতি এবং গ্রহ নক্ষত্রের স্ফুট ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

এ ধরণের অদ্ভুত মানসিকতা পোড়া বাংলা দেশেই সম্ভব। তিথি নক্ষত্র গ্রহের অবস্থান প্রভৃতি আকাশের কতকগুলি প্রত্যক্ষ ব্যাপার। এ'র সত্য মিথ্যা চোক দিয়ে দেখে যাচাই করা অনায়াসেই যেতে পারে। এ ব্যাপার নিয়ে কি ক'রে যে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কবিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা চলতে পারে তা' আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। পঞ্জিকা ত গ্রহ নক্ষত্রের একটা "টাইম্-টেবল্" মাত্র। এখন যদি অনেকগুলি "টাইম্-টেবল্" হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, তা' হলে যার টাইমিং-এর সঙ্গে আকাশের অবস্থাগুলি ঠিক মিলবে সেইটাই যে ঠিক, একথা ত নিতান্ত বালকেও বুঝতে পারে।

পণ্ডিতদের মধ্যে আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা স্বীকার করেন, যে পুরাতন শাস্ত্র বা সারণী থেকে গণিত তিথি নক্ষত্রের স্থিতি বা গ্রহের অবস্থান অনেক সময়ে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মেলে না বটে; কিন্তু হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্মে সংস্কৃত পুঁথির প্রাপ্ত তিথি নক্ষত্রই বিহিত, তা' প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার যতই গরমিল হোক্। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত একটি পঞ্জিকা আছে, যার ভূমিকায় জোর ক'রে লেখা হয়েছে, যে সেই পঞ্জিকাই হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য একমাত্র বিশুদ্ধ পঞ্জিকা এবং কেউ যদি তার ভুল বের করতে পারে তাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সে পঞ্জিকাতে এ-ও লেখা হয়েছে, যে মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচারে ঐ পঞ্জিকা নির্ভুল বলে' প্রমাণিত হয়েছে। সত্যের আবরণে মিথ্যা প্রচার করার এ রকম প্রচেষ্টা বোধ করি এ দেশেই সম্ভব। আসল কথা এই পঞ্জিকার প্রচারকেরা জোর গলায় যখন বলছিলেন যে কেউ যদি ভুল বের করতে পারে তাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কেন না তারা এটা স্পষ্টই জানতেন, যে প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিচার করলে তাদের পদে পদে গলদ বেরুবে। তাই যখন মহামান্য আদালতে তাদের জবাব দাখিল করবার দরকার হ'ল, তখন তারা এই ব'লে নিষ্কৃতি পেলেন যে—তাদের ঐ বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে, যে শাস্ত্র হিসাবে তারা গণনা করেছেন সেই শাস্ত্র হিসাবে যদি কেউ ভুল বের করতে পারে, তা' হলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই বলছিলুম—এ সম্ভব শুধু এই বাঙ্গালা দেশেই যেখানে বস্তু-পরিচয়ের চেয়ে বর্ণপরিচয়ের, জ্ঞানের চেয়ে উপাধির এবং প্রকৃত বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার বড়াইয়ের আদর বেশী। কিন্তু এই রকম সব পঞ্জিকার পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—স্বীকার করলুম আমাদের শাস্ত্রকারদের এই উদ্দেশ্য ছিল, যে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রত্যক্ষ বা দৃক্‌সিদ্ধ তিথি নক্ষত্রের কোনই প্রয়োজন নেই; তা' হলে তাঁরা

গ্রহণের সময়ে যে স্নানাদি কৃত্য নির্দ্দেশ করেছেন তাতে গ্রহণটা চোখে দর্শন করতে বলেছেন কেন? এবং কোন্ রাশির লোক গ্রহণ দেখ্‌বে, কোন রাশির লোক না দেখ্‌বে, তারই বা ব্যবস্থা কেন? এ-র আরও একটু মজা এই গ্রহণের ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যায়। যে সময়ে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা শেষ হয়েছে, যার পারিভাষিক নাম পূর্ণিমান্ত বা অমান্ত, তার সঙ্গে গ্রহণের সময়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রবি, চন্দ্র এবং রাহুর অবস্থান নিয়ে গ্রহণ গণনা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে এই তিনটি গ্রহের অবস্থান এবং পূর্ণিমান্ত ও অমান্তের ব্যাপারে পঞ্জিকায় পঞ্জিকায় যতই প্রভেদ থাক্, গ্রহণের সময়টি সব পঞ্জিকাতেই অবিকল এক। রবি, চন্দ্র এবং রাহু যখন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছায় তখন গ্রহণ আরম্ভ এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে গ্রহণ শেষ হয়। এইটিই যদি সত্য হয়, তা' হ'লে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকায় তাদের অবস্থান ও গতিবেগ ভিন্ন ভিন্ন হ'লে প্রত্যেকের মতে ঠিক একই সময়ে যে গ্রহণ আরম্ভ ও শেষ কী ক'রে হয় তা' একটা বোঝ্‌বার বিষয়। এই গ্রহণের ব্যাপার দেখে এই কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারা যায়, যে অধিকাংশ পঞ্জিকাকারেরাই গ্রহণের ব্যাপারের সময়টা নাবিক পঞ্জিকার মতে দৃক্‌সিদ্ধ কোন পঞ্জিকা থেকে গ্রহণ ক'রে থাকেন; কেননা তিথি নক্ষত্র বা গ্রহের অবস্থান সাধারণ লোকে অজ্ঞতার জন্য বুঝ্‌তে পারে না, গ্রহণের সময়টি কিন্তু সকলেই চোখে দেখে নিতে পারে এবং তা' যদি প্রত্যক্ষের সঙ্গে না মিলে—তা' হ'লে পঞ্জিকার উপর জনসাধারণের অভক্তি ও অবিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী।

এই গ্রহণের ব্যাপার বিনা শিক্ষায় ও বিনা চেষ্টায় প্রত্যেক লোকে দেখ্‌তে পায় ও মিলাতে পারে। সেইজন্য শাস্ত্র হিসাবে গণনায় যাই আসুক, পঞ্জিকাকারকে সেই সময়েরই নির্দ্দেশ কর্‌তে হয় যা' দৃক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সঙ্গে মেলে। শিক্ষার দ্বারা লোকে যখন তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধেও এই রকম জ্ঞান লাভ কর্‌বে, তখন আর তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হবে না—সকল পঞ্জিকাকে বাধ্য হয়ে দৃক্‌সিদ্ধ তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি দিতে হবে। কাজেই আমরা যদি পঞ্জিকার সংস্কার কর্‌তে চাই, তা' হ'লে সাধারণকে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত ক'রে তোলা দরকার এবং যাতে স্কুল কলেজে এই ব্যাপারগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় তার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

পঞ্জিকায় সম্বন্ধে বল্‌বারও অনেক জিনিষ আছে—কিন্তু একদিনে বা এক প্রবন্ধে তা' বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল।

এই প্রবন্ধে জায়গায় জায়গায় পঞ্জিকাকার বা ব্যবস্থাপক পণ্ডিত প্রভৃতিকে আক্রমণ করা দরকার হ'য়েছে। এগুলি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে না নিলে আমি খুসী হ'ব। কেন না, সত্যই ব্যক্তিগত ভাবে আমি কাউকে আক্রমণ করি নি। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় মিথ্যাকে আক্রমণ অপরিহার্য্য।



বৈদিক-যুগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি]

পুরাণে পুণ্য-তীর্থ নৈমিষারণ্যে এই শৌনকের সত্রে সৌতি কর্ত্তৃক পুরাণ সকল কথিত হয়। নৈমিষারণ্য বর্ত্তমান নিম্‌সার বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা গোমতীতীরে স্থিত। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে নৈমিষ প্রসিদ্ধ স্থান। শৌনকের প্রাচীনত্ব গোমতীতীরে নৈমিষক্ষেত্রকেও প্রাচীন করিয়া তুলে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নৈমিষের ইতিবৃত্ত মিলে। শৌনকের আশ্রম আফগানিস্থানের গোমাল নদীর তীরে স্থাপন করা পাশ্চাত্য মত বটে। তাঁহারা গোমানকে গোমতী ও হরুদকে সরযূ বলেন। ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা মধ্যে ভৃগু বংশের ও এতদ্ব্যতীত নেম, সোমাহুতি, আপ্লুবন, কৃৎণু, প্রয়োগ, চ্যবন, ইট, স্যুরশ্মি, ইঁহাদের নাম পাওয়া যায়। ভৃগু-বংশীয় কবি ঋঃ ৯ মণ্ডলের নয়টী সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহার পুত্র উশনা ঋঃ ৮।৮৪ ও ৮৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি শুক্রাচার্য্য নামে পুরাণে কথিত। তিনি পৌরাণিক যুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে তৈত্তিরীয় সংহিতায় "কাব্যং অসুরাণাং" মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। এখানে কবিপুত্র অসুরদিগের পক্ষপাতী সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ত্বষ্টাও ইন্দ্রবিরোধী হন। তৎপূর্ব্বে উশনা বৃত্রবধে ইন্দ্রের বীর্য্য তীক্ষ্ণীকৃত করেন ও বজ্র প্রদানে সাহায্য করিলেও (ঋঃ ১।১২১।৯ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য) পরবর্ত্তীকালে অসুর মজদার প্রিয় ত্বষ্টার পক্ষাবলম্বনে দেব-বিরোধী হন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ঋঃ ১০।১৫৭।৪ ও ঋঃ ১০।১৫১।৩ মন্ত্রদ্বয়ে অসুরগণের প্রবল হইবার ও পরাজিত হইবার উক্তি বিবেচ্য। উশনার প্রাচীনত্ব ঋঃ ৫।২৯।৯ ও ৯।৯৭।৭ বশিষ্ঠোক্ত এই মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত হয়। পুরাণে দক্ষযজ্ঞে ভৃগুকে দেব-বিরোধী দেখা যায়। উশানা সাময়িক ভাবে অসুরের পক্ষপাতী হইলেও, ভার্গবগণ দেব-বিরোধী হন নাই। পুরাণে ভার্গবগণ দীর্ঘসত্রে ও দীর্ঘযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা দৃষ্ট হয়।

সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠ ভারতেতিহাসে বিশিষ্টতম বিশিষ্ট লোক ছিলেন। ইনি মিত্রাবরুণতনয় ও ঔর্ব্বশ্য বলিয়া পরিচিত ঋষি অগস্ত্য ইঁহারই ভ্রাতা। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্রগণ—শক্তি, সংস্তব, কণ্ব, শ্রুত, ব্যাঘ্রপদ, মন্যু, উপমন্যু, ইন্দ্র প্রমতি, মৃড়িকা, বৃষগণ, চিত্রমহা প্রথ, দ্যুম্নিক, ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি পরাশর ও গৌরবীতী শক্তিপুত্রগণ ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা।

মহর্ষি অগস্ত্য ও তদীয় পুত্র দৃঢ়চ্যুত ও পৌত্র ইধ্মবাহ, ইঁহারাও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি অগস্ত্য পুরাণে সমুদ্র-শোষণ, বাতাপিইল্বল ধ্বংস, বিন্ধ্যের অবনতি ও নহুষের পতন ইত্যাদি ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। বর্ত্তমানযুগে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের তত্ত্বানুসন্ধান অবলম্বনে কেহ কেহ উক্ত কার্য্য-সম্পাদনকারী অগস্ত্যকে ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া যাইতেছেন। বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় ঐ সকল ঘটনা ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী কালে ঘটে এবং ঐ সমুদ্র রাজপুতনা সমুদ্রের শোষণ বলিয়া গণ্য করেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত দাক্ষিণাত্যে স্থিত। যখন আর্য্যাবর্ত্ত সৃষ্ট হয় নাই, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে ভূমিকম্পাদি অগ্ন্যুৎপত্তি, যাহা ভূমি ও পর্ব্বতাদি বিপর্য্যস্ত করে, তাহার ফলে বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতের অবনতি সম্ভবপর মনে হয় এবং ভূতত্ত্ববিদগণও তাহার সাক্ষ্য দেন। বা বাহুল্য তাপসংযুক্ত বাতাপি ইলা বা দেশ যাহা অত্যুষ্ণ মণ্ডলে ছিল তাহা ভূগর্ভগত হওয়ায় বিন্ধ্যের অবনতি ও হিমালয় পর্ব্বতের শেষ অভ্যুত্থানে Tythe টাইদ্ নামক বৃহৎ সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ পায়। উহাই অগস্ত্যকৃত বলিয়া গণ্য হইলে উহা Pleistocene যুগের কথা এবং ঐ সকল ঘটনা পরস্পর সমসাময়িক, ইহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও বলিতে-ছেন। আর্য্য-সভ্যতা দুই তুষারপাতের মধ্যবর্ত্তী যুগে ঘটিয়া থাকিলে প্রাচীন অগস্ত্যের নাম তৎসহ সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অগস্ত্য কুম্ভযোনি, কোন স্ত্রীগর্ভসম্ভূত নহেন। ইহাও তাঁহার প্রাচীনতার নিদর্শন। "নগস্ত্য" অগস্ত্য যিনি গমনশীল নহেন অর্থাৎ ধ্রুব। ইঁহার অপর নাম 'মান' শব্দের অর্থ যাহাদ্বারা পরিমিত হয়। রামায়ণে দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্যের আশ্রম দেখা যায়। কেহ কেহও অগস্ত্য নক্ষত্র দক্ষিণ ধ্রুব থাকা এবং তদ্দ্বারা আকাশ পরিমিত বা পরিবিচ্ছিন্ন হয়, এইরূপ উক্তি করেন এবং ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে অগস্ত্য নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্র ছিল, এইরূপ বলিয়া থাকেন। অগস্ত্য ঋষি স্বনামধন্য হইয়া ইহলোক ত্যাগের পর আকাশে নক্ষত্রলোকে বিভূষিত হইয়াছেন, এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে আমেরিকান মতে শেষ তুষারপাতের সময়ের সহিত তুলনায় অগস্ত্যের সময় তুষারপাতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়াই পড়ে, কুরু পর্য্যন্ত মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৯৫ অধ্যায়ের বংশ-তালিকায় এইরূপ যুক্তিমূলক অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন।

শক্তিপুত্র পরাশর ও গৌরবীতি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদ্বয়। গোপায়ন শক্তির শিষ্য। এই গোপায়নবংশীয় বহু ঋষি ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আছেন। দৌষ্মন্তি ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা সম্পাদন করেন। ভরতের পৌত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত; তাহা বিশ্বামিত্র দৃষ্ট তৃতীয় মণ্ডল হইতে প্রাপ্ত হই এবং ঐ মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভারতগণকে শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয় পার করিতেছেন। আরও দেবরাতের পৌত্র সুদাসের তিনি পুরোহিত। সুতরাং অনুমান করিতে হয়, যে দূরদেশ হইতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিতেছেন বলিয়াছেন তাহা বিপাশা ও শতদ্রু অধ্যুষিত দেশ নহে, তদ্বহির্ভূত স্থান। অর্থাৎ এই ঘটনা আর্য্যগণের প্রথম ভারত-প্রবেশের সমসামসয়িক। মহর্ষিবশিষ্ঠ-দৃষ্ট ঋঃ ৭।৩৩।৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—ভরতগণ অল্পসংখ্যক ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাদের পুরোহিত হবার পর সুদাসাধীন তৃৎসুগণের প্রজা বৃদ্ধি হইতে থাকে। অজ্ঞানতা বশতঃ তৃৎসুগণ সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় (ঋঃ ৭।১৮।১৫ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য) এবং ঐ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া

পলায়নে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রপ্রিয় সুদাসকে তৃৎসুগণ সর্ব্বভোজ্য বস্তু প্রদান করে। তৃৎসুগণ ভরতবংশীয় অসুর ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণ সুদাস সহ যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েন (ঋ: ৭।১৮।১৪ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে সুদাসের পুরোহিত অসু, দ্রুহ্য ও পুরু প্রভৃতির সমসাময়িক হইয়া পড়েন। মহর্ষি বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক। উভয়ে ঐক্ষাক হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়ে ঋত্বিক্ ছিলেন। পুরু হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তরে স্থাপিত। অতএব অসু, পুরু প্রভৃতির সমসাময়িক মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র কুরু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ শান্তনুর পুত্র ধৃতরাষ্ট্রাদির সমসাময়িক হইতে পারেন না। পুরাণে বেদবিভাগ বিষয়ে বাস্কল শাখীয় ঋগ্বেদের উল্লেখ আছে। উক্ত বাস্কলের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর দেখা যায়। উক্ত বাস্কল পরাশরতনয় ব্যাসের পরবর্ত্তী। সুতরাং ব্যাসপিতা পরাশর, বাস্কলশিষ্য পরাশর ও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা পরাশর স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

কশ্যপ মরীচিপুত্র। তিনি প্রথম ও নবম মণ্ডলের কতিপয় সূক্তের দ্রষ্টা কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ। রেভ, সুনু, ভূতাশ, বিব্রীহা, অবৎসার, অপ্সরস্ এবং অসিত ও দেবল—ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অপ্সরসের পুত্র অপ্সর ও তদীয় পুত্র মনু ও তদীয় পুত্র চক্ষু ও তদীয় পুত্র অগ্নি আকার বিবরণ ঋ: ৯।১০ ও সূক্তে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে নিধ্রুবী ও অবৎসার কাশ্যপ গোত্রের প্রবর। অসিত ও দেবল প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া ভগবদ্গীতায়ও দেখা যায়। ইঁহারা বেদে কশ্যপগোত্রীয় উল্লেখ থাকিলেও, বর্ত্তমানে 'শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রবর' বলিয়া প্রচলিত আছেন। ইহাতে অনুমান করিতে হয়—ইঁহারা কশ্যপ গোত্রাপত্য নহেন। কিন্তু মহর্ষি কশ্যপ ঋগ্বেদের সপ্তর্ষিগণের মধ্যে একজন। কশ্যপের পিতা মরীচি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা নহেন, পুরাণে মরীচিকেই সপ্তর্ষিগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পুরাণ-মতে, কশ্যপ ঔরসে দিতি ও অদিতির গর্ভে দানব ও দেবগণ সৃষ্ট হন। কদ্রুর গর্ভে সর্পগণ ও অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে গন্ধর্ব্বাদি সৃষ্ট হয়।

মহর্ষি অত্রি ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৩৭—৪৩, ৭৬—৭৭, ৮৩—৮৬ সূক্তের ও ৯।৩৭ সূক্তের দ্রষ্টা বৈদিক ও পৌরাণিক উভয় মতে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে একজন। আত্রেয়গণ ঋগ্বেদে পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা। ঋগ্বেদে অত্রিকে ভৌম বলা হইয়াছে। অত্রি-দৃষ্ট ঋ: ৫।৪১।৫ মন্ত্রে মহর্ষি অত্রি ঔশীজপুত্র প্রাচীন কক্ষিবানের হোতা ছিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। ঋ: ৫।৪০ সূক্তে সূর্য্য গ্রহণের বর্ণনা আছে এবং "তৃতীয় ব্রহ্ম" নামে মন্ত্রের সাহায্যে অত্রি ঐ গ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবৃতি আছে। ঐ মন্ত্রে রাহুকে 'স্বর্ভানু' বলা হইয়াছে। ইহাতে তৎকালে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা থাকা দৃষ্ট হয়। যাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে এতটা উন্নতি করেন, তাঁহাদের সময়ে অক্ষর-যোজনা ছিল না অর্থাৎ লেখাপড়া জানিতেন না, তাই "বেদ চাষার গান" বলিয়া আক্ষেপ দেখা যায়—এবং পুস্তকাভাবে মন্ত্র সকল মুখে মুখে শুনিয়া অভ্যস্ত করিতেন, তাই উহার নাম শ্রুতি। শ্রবণমননযোগ্য বিষয় মধ্যে বিশেষ শ্রবণাদি জন্য 'শ্রুতি' কথাটী তাঁহারা লইতে চাহেন না। প্রাচীনতম ঋষি দীর্ঘতমাদৃষ্ট ১।১৬৪।২৪ মন্ত্রে আছে—"গায়ত্রেন প্রতিমিমিতে অর্কমর্কেন সামত্রৈষ্টুভেন বাকম্। বাকেন বাক্যং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ।" অর্থ—"তিনি গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা অর্ক অর্থাৎ ঋক্-মন্ত্র রচনা করেন। ঋক্ হইতে সাম রচনা করেন। ত্রিষ্টুভ দ্বারা (গদ্য) বাক্য রচনা করেন অর্থাৎ যজুঃ।

দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্‌দ্বারা অনুবাক্ রচনা করেন এবং তাঁহারা অক্ষর দ্বারা সপ্ত ছন্দ রচনা করেন। অবশ্য "আমরা ক, খ অক্ষর লিখিতে শিখিয়াছি" —একথা বেদে লেখা নাই। ঋঃ ১০।১৩।৩ "পঞ্চ পাদানি রূপো অন্বরোহং চতুষ্পদী-মন্বেমি ব্রতেন। অক্ষরেণ প্রতিমিম এতামৃতস্য নাভাবধি সম্পুনামি।" অর্থ—"পঞ্চপদ যজ্ঞের যথা বিনিয়োগ করিতেছি, ব্রত অর্থাৎ নিয়মানুসারে চতুষ্পদ ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি—অক্ষর (ওঁঙ্কারাত্মক) তাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞের নাভি স্বরূপ বেদীতে যজ্ঞের শোধনকার্য্য সমাধা করিতেছি।" ঋঃ ১০।৭১।১—৩ মন্ত্রে "হে বৃহস্পতি বালকেরা প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। যেমন চালুনী দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিশোধিত (সংস্কৃত) ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন।" বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে। ঋঃ ১০।৭১।৯ মন্ত্রে দোষামিশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল-চালনা বা তাঁত বুনিয়া উপযুক্ত হয়। ঋঃ ৬।৫৩।৮ রেখাঙ্কন ও ১।১১০।৫ মানদণ্ড দ্বারা ক্ষেত্র মাপ করা বর্ণিত আছে। ঋঃ ১।৪১।১১ মন্ত্রে "বিদ্যাভ্যাসে কুশল পুত্র দেও," এরূপ প্রার্থনা আছে। ১।৮৬ মন্ত্রে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষানিযুক্ত বিপ্রগণের উল্লেখ আছে। ১।২১।৫ মন্ত্রে সদসপতি (সভাপতি) ঋঃ ১।১৬৬ সূক্তে সভাস্থানে উচ্চারিত বাণী সাধারণ কথিত ভাষা হইতে পৃথক ছিল, জানা যায়। বৈদিক-যুগে স্ত্রী-শিক্ষারও বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহা ঋগ্বেদে মামতেয়, বিশ্ববারা, অপালা, বাগাম্ভৃনী, রোমশা, ঘোষা, রাত্রি, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকাগণের দৃষ্ট মন্ত্র হইতে জানিতে পারি। ঋঃ ১০।৪০।১০ ও ৪।২৪।২৮ মন্ত্রে বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করার উল্লেখ আছে। ১০।১৪০।৬ মন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষে স্তব করার উল্লেখ আছে।

(ক্রমশঃ)

জীবনের পথে

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী]

জীবনের পথে, দেখা হল অনেকের সনে,
কেহ মনোরথে, দিনেক সারথি,
নর্ম্ম সখা কেহ একাসনে,
বিশ্রব্ধ আলাপে চির বাসন্তী মূরতি,
রেখে গেল মনে মূর্ত্তিমতী,
যার লাগি কুসুম আরতি,
জলি ওঠে বর্ষে বর্ষে, প্রতি মধুমাসে,
নিভে যায় বাদলের উতলা বাতাসে॥

তোমার কোথায় ঠাঁই,
খুঁজিয়া ঠিকানা নাহি পাই,
শুষ্ক হেমন্তের সাথী, শীতের দোসর,
দীর্ঘ হিমরাতি পুষ্পহারা আঁধার বাসর
ললাট লিখন, জীবনের সব অনটন
মনের ভেঙেছে যবে আশা;
তুমি নিয়ে এলে ভালবাসা;
কি আঁকিয়া দিলে আঁখি' পরে,
ক্ষণেকের তরে,
বসন্তের অকাল বোধন,
তারপরে বিরহের অসাধ্য সাধন!
তপস্যায় ক্ষীণ শীর্ণ তনু, বাতাসে মিশায় অণু অণু।

বিশ্বসম্রাট্ অজাতশত্রু ও পারস্য-রাজ্য

[শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ]

উত্তরভারতে কালগণনার বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন—ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই ও থাকিতে পারে না, যেহেতু ভারতবর্ষের সময়গণনার কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই। অথচ "Prinsep's Useful Tables" নামক গ্রন্থে পাই—Alexandria'র Greek Church-এর পাদরীগণ "Era of the Creation of the World" নাম দিয়া যে তারিখ হইতে কাল গণনা করিতেন (৫,৫০২—৫,৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দ) তাহা হইতে ২,৪০০ বৎসর বাদ দিলে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত কল্যব্দের আরম্ভের তারিখ ৩,১০১ খৃঃ পূঃ অব্দ পাওয়া যায়। ইহাতে Alexandria'র তথাকথিত Creation of the World-এর অব্দ ভারতবর্ষের দ্বাপরাব্দ বা জলপ্লাবনের অব্দ হইতেছে; কারণ দ্বাপর যুগের পরিমাণ যে ২৪০০ বৎসর, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এই দ্বাপরাব্দের নাম দিয়া একটি অব্দ অদ্যাপি কাম্বোডিয়াতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইউরোপে যে মহাপুরুষের জন্মের তারিখ হইতে সময়গণনার এত গৌরব করা হয়, সেই মহাপুরুষের জন্মের ৫,৫০১ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতে একটি Geological Event হইতে সময়গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। উহা বাস্তবিকই উত্তর ভারতের অধিবাসিগণের পক্ষে পূর্ব্ব বিশ্বের বিনাশ এবং নূতন বিশ্বের সৃষ্টির অর্থাৎ Creation of the Existing World-এর দিন। ঐ তারিখেই হিমালয়ের পাদদেশের বিশ Geological action'এ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল এবং জলপাইগুড়ি জেলায় সমুদ্রগর্ভ হইতে নূতন দ্বীপ উঠিয়াছিল। (১) এই দ্বীপ মৎস্য বা নৌকার আকারযুক্ত ছিল—আর ইহাতে উঠিয়াই প্রথম বৈবস্বত (Xisuthros) মনু ('নু—Noa) সপরিবারে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। "শ্রীমদ্ভাগবত" একবার এই ঘটনার কথা বলেন :—

'মৎস্যো যুগান্ত সময়ে মনুনোপলব্ধঃ।
ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ॥''

শ্রীমদ্ভা ২।৭।১২

ত্রেতাযুগের শেষে অর্থাৎ দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে মৎস্যাকার একটি দ্বীপ মহাসমুদ্র মধ্যে উঠিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে মনুর পশ্চাদ্বর্ত্তী মানুষ ও জীব সকল জলপ্লাবনে পীড়িত হইয়া ঐ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

এই ঘটনার কথাই অন্য একস্থানে এইরূপে বলা হইয়াছে :—

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্॥"

চাক্ষুস মন্বন্তরের শেষে বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল—সেই সময়ে মৎস্যরূপী ভগবান্ বৈবস্বত মনুকে মহীময়ী নৌকাতে, অর্থাৎ মহাসমুদ্রে মধ্যে উত্থিত নৌকার আকারযুক্ত দ্বীপে স্থাপন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

বাইবেলও বলেন—এই ঘটনা বাবিলনিয়ায়

(১) "বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" ১।২২

পূর্ব্বে আরারাত (আর্য্যাবর্ত্ত) পর্ব্বতের অর্থাৎ হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকটে হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যও তাহাই বলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে সময়গণনার জন্য নির্দ্দিষ্ট Epoch নাই, একথা যিনি বলেন তাঁহার কথা শ্রদ্ধেয় নহে; কারণ ভারতবর্ষ হইতেই দ্বাপরাব্দ বা Creation of the world-এর তারিখ অবলম্বন করিয়া সময়গণনার প্রথা পশ্চিমে Alexandria এবং পূর্ব্বে কাম্বোডিয়াতে গিয়াছিল

অজাতশত্রুর রাজ্যকাল

Prinsep's "Useful Tables"-এ আছে—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে যে শাক বা অব্দ অদ্যাপি Sacred Epoch নামে ব্যবহৃত হয়, উহা ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে অজাতশত্রু প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন :—

"B C 543—The sacred Epoch established by King Ajatasat."

ইহা যে বুদ্ধ নির্বাণাব্দ নহে, একথা Vincent Smith তাঁহার 'Early History' 3rd Edition'এ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। তিনি নিজে বুদ্ধের নির্বাণের তারিখ লিখিয়াছেন ৪৮৭ খৃঃ পূঃ অব্দ (See page 47—48 'Early History") এবং এই তারিখ সত্য হওয়া যে খুব সম্ভব, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি ৪৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বুদ্ধের নির্ব্বাণের তারিখ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"The variant dates for the death of Buddha given by Chinese and other authorities are too numerous and well-known to need citation. Dr. Fleet at one time held 482 BC. to be the most probable and satisfactory date that we are likely to obtain......Every body now seems to be agreed that the event occurred between 490 and 480 B C., while nobody upholds the Ceylonese traditional date of 544 or 544 BC. 483 is now preferred by Dr. Fleet and Prof. Geiger."

ইহা হইতে দুইটি কথা পাওয়া গেল—সিংহলেও 544-43 খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে একটি অব্দগণনার আরম্ভের তারিখ বলা হয় এবং উহাকে ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়ার ন্যায় সিংহলেও Sacred Epoch বলা হয়; কিন্তু Sacred Epoch কথার সাধারণ লোকে যে অর্থ ধরে—অর্থাৎ উহা বুদ্ধের নির্ব্বাণাব্দ, সেই অর্থ ঠিক নহে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে—৫৪৪-৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ যদি বুদ্ধের নির্বাণাব্দ না হয়, তবে অজাতশত্রু ঐ অব্দ বা Era ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কাম্বোডিয়াতে কেন প্রবর্ত্তিত করিলেন? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে বিম্বিসারের অঙ্গবিজয় (২), ব্রহ্ম, শ্যাম ও কাম্বোডিয়া বিজয় এবং ৫৪৪-৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু সম্রাট্পদবী প্রাপ্ত হইয়া ঐ সব দেশে এবং ভারতবর্ষে তাঁহার নিজের রাজ্যারম্ভের এই অব্দকে পৃথক্ "শাক" রূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আমি আমার "Examination of the History of Bengal", "The Eastern Aryan Empire" "ষোড়শ রাজকীয়ম্" "বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখাইয়াছি—'শাব্দ' কথার অর্থ "An Era established by the Emperor of India and Cambodia"—যিনি যুগপৎ ভারতবর্ষ ও

(২) "প্রবর্ত্তক" পৌষ ও মাঘ ১৩৩৭

কাম্বোডিয়ার সম্রাট্ স্বরূপে অব্দ প্রবর্ত্তন করিতেন তাঁহার অব্দকে "শাক" বলা হইত, অন্যান্য অব্দকে শাক বলা হইত না। "শব্দকল্পদ্রুমে" পাই :—

শাক :—যুধিষ্ঠিরবিক্রমাদিত্যশালিবাহনাদিশক-নরপতীনামতীতাব্দঃ।

ইহার অর্থ—যুধিষ্ঠিরাব্দ বা ভারত যুদ্ধাব্দের প্রবর্ত্তক বিশ্বসম্রাট্ যুধিষ্ঠির, উজ্জয়িনীপতি কাম্বোজ-(কাম্বোডিয়া)-বিজেতা বিক্রমাদিত্য, প্রচলিত-শকাব্দপ্রবর্ত্তক কাম্বোডিয়ার রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট্ শালিবাহন এবং যবদ্বীপে যাঁহার নাম অদ্যাপি ২,৩৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্রবর্ত্তিত অব্দের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বিশ্বসম্রাট্ আদিশকের প্রবর্ত্তিত অব্দই "শাক" নামে প্রসিদ্ধ।

ইহাতে হর্ষাব্দের প্রবর্ত্তক হর্ষবর্দ্ধন এবং গুপ্তাব্দের প্রবর্ত্তক সমুদ্রগুপ্ত "শাক"প্রবর্ত্তক নরপতির শ্রেণী হইতে বাহিরে যাইতেছেন। ইহার কারণও পাওয়া গিয়াছে—হর্ষবর্দ্ধন কাম্বোডিয়া জয় করা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশই জয় করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহের অপরাধে গৌড়ীয় বিশ্বসম্রাট্ শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধন এবং তাঁহার ভগিনীপতি মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মার সামন্ত রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গ্রহবর্ম্মাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এবং যুদ্ধে বন্দী রাজ্য বর্দ্ধনের প্রাণদণ্ড করিয়া তাঁহাদের দুই জনের সামন্ত রাজ্য নিজ অধিকারে লয়েন। হর্ষবর্দ্ধন ৬ বৎসরের যুদ্ধের ফলে পিতার থানেশ্বর রাজ্য এবং মৌখরি রাজ্যের কনৌজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াই উত্তর ভারতের সম্রাট্পদবীর দাবী করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্রাট্পদবীর দাবী করিয়া অব্দ প্রবর্ত্তনের ৭ বৎসর পরে অর্থাৎ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর ১৩ বৎসর পরেও যে শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্য বিশ্বসম্রাট্রূপে গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উড়িষ্যার দক্ষিণের কলিঙ্গের সামন্ত নরপতি সৈন্যভীত মাধব বর্ম্মার তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে।

সমুদ্রগুপ্ত যে ব্রহ্ম, শ্যাম ও কাম্বোডিয়া জয় করিতে পারেন নাই—ইহার প্রমাণ হইতেছে এই, যে তাঁহার এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতট (ত্রিপুরা), ডবাক (ডৌকা নদীর দেশ শ্রীহট্ট) এবং কামরূপের পূর্ব্বের কোন দেশের রাজাকে তাঁহার সামন্ত বলা হয় নাই। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই যে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কাম্বোডিয়া বিজয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীর "একাধিরাজ" হইয়াছিলেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (৩)।

কিন্তু অজাতশত্রু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দকে কাম্বোডিয়াতে Putta Sakarat—বুদ্ধ-"শাক" বলা হয়। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, অজাতশত্রুর সাম্রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য হইতেও পূর্ব্ব দিকে বৃহত্তর ছিল, এবং তিনি ভারতবর্ষ ও কাম্বোডিয়া এই উভয় দেশের সম্রাট ছিলেন। অজাতশত্রু বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু কোষকারগণ "শাক"-প্রবর্ত্তক রাজগণের তালিকায় তাঁহার নাম লেখেন নাই।

তারপর, সিংহলের কথা। সিংহলের ইতিহাসে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষীয় রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের তারিখ ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ (৪)। ইহাতেও বোঝা যাইতেছে—ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচলিত Sacred Epoch বা বুদ্ধ-"শাক" প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ নহে, উহা অজাতশত্রু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত তাঁহার রাজ্যারম্ভাব্দ। আর বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের বিবরণ যে

(৩) 'প্রবাসী' কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ১৩২১।

(৪) Prinsep's "Useful Tables" p. 135.

সম্রাট্‌ অজাতশত্রুরই দিগ্বিজয়ের বিবরণ, ইহাও এই কথা হইতে পাওয়া যাইতেছে। সিংহল যে অজাতশত্রুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত "শাক" অদ্যাপি সিংহলে ব্যবহৃত হইতেছে—ইহা দেখানই যথেষ্ট।

ইতিহাসের উপকরণ

Alberuni'র গ্রন্থে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষে হর্ষাব্দ, বিক্রমাব্দ, শকশালিবাহনাব্দ, এবং বলভী ও গুপ্তাব্দ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধাব্দ, কল্যব্দ এবং আরও কয়েকটি অব্দ কালগণনায় ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বৎসরের সংখ্যা অধিক দেখাইতে হয় বলিয়া সেই সব অব্দের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছিল :—

"The Eras of the Bharat War and of the Kaliyuga, and certain other methods of reckoning time"......which "had been abondoned because of the very large numbers involved in the use of them" (Dr. Fleet's "Gupta Inscriptions." Int. p. 24 Foot note).

যে সব অব্দ এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত অব্দসমূহের বিবরণ পাইয়াছি

অব্দ	আরম্ভ-কাল	অদ্যাপি ব্যবহারের স্থান
১। দ্বাপরাব্দ বা উত্তর ভারতে বরাহ কল্পে বিশ্বসৃষ্ট্যব্দ	৫,৫০১ (খৃঃ পূঃ)	ইজিপ্ট, কাম্বোডিয়া.
২। কল্যব্দ	৩,১০১(খৃঃ পূঃ)	ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র
৩। আদিশকাব্দ	২,৯৩৯ (খৃঃ পূঃ)	যবদ্বীপ
৪। যুধিষ্ঠিরাব্দ বা ভারত যুদ্ধাব্দ	২,৪৪৮ (খৃঃ পূঃ)	ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ।
৫। অজাতশত্রুর অব্দ	৫৪৪ (খৃঃ পূঃ)	সিংহল, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি।

ইহার পরেও কি কেহ পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকগণের নিম্নলিখিত উক্তির সমর্থন করিয়া বলিবেন—উত্তর ভারতের ইতিহাস থাকিতে পারে না, যেহেতু উত্তর ভারতে কালগণনার কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় ছিল না :—

'In Indian History no date of a public event can be fixed before the invasion of Alexander and no *comected* relation of the national tansactions can be attempted until after the Mahometan conquest" (Elphinstone, quoted by Vincent Smith—"Early History."

(ক্রমশঃ)



দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্য-কাহিনী

(৪)

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

২২৫ মাইল সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া ৩০শে ডার্ব্বাণ পৌছিলাম। ১৮২৪ খৃঃ এই সহরের তখনকার গভর্ণর Sir Benjamin D'urbon'এর নামে নামকরণ হয়। সহরটী যেন ছবির ন্যায় সুন্দর ও পরিষ্কার। প্রায় ৩৫ মাইলব্যাপী ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম আছে। "কৃষ্ণবর্ণের" সাধারণ ট্রাম গাড়ীতে উঠিবার অধিকার নাই, যথা তথা বাস করিবারও অধিকার নাই। ভারতবাসীর উপর অত্যাচার সকল রকমেই এই প্রদেশে অত্যধিক।

তাহাদের জন্ত নিম্নশ্রেণীর স্বতন্ত্র ট্রাম, মোটর গাড়ী ও রেল গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, আবার সেই সকল গাড়ীতে "শ্বেতবর্ণে"র প্রবেশ অধিকার নাই। "কাল-ধলা"র এই পার্থক্য ও প্রভেদ দক্ষিণ আফ্রিকার সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। রিক্‌শা গাড়ীতেও সেই প্রভেদ। স্থানীয় আফ্রিকার অধিবাসীরা এই সকল রিকস-গাড়ীর কুলীর কাজ করে। নানা জাতীয় বেশভূষায় পালক, লতাপাতা, ও বিচিত্রবর্ণের উল্‌কী দ্বারা পুরাতন প্রণালীতে সজ্জিত এই সকল রিক্‌স-কুলী হাবভাব নৃত্যভঙ্গী করিয়া রাজপথে দৃশ্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ কনেষ্টবলও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মোটরযাত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। তাহাদের ডান হাতের উপরে একটা সাদা আবরণ সমস্ত হাত ঢাকিয়া রাখে। দূর হইতে এই সাদা হাত দেখিতে পাইয়া মোটরচালক নিজ গতি পরিচালিত করে। সমতল ভূমিতে দাঁড়াইয়া ট্র্যাফিক পুলিশ নিত্যকর্ম্ম সমাধা করে না। পথিমধ্যে উচ্চ মঞ্চের উপর তাহাদের স্থিতি-স্থান। তাহাদেরও অঙ্গভঙ্গীবাহুল্যের অভাব নাই। ইহাতেও দৃশ্য-বৈচিত্র্যের আনুকূল্য হয়। রাস্তাঘাট অতি চমৎকার। ইউরোপ বা আমেরিকার কোন সভ্য সহরের ব্যবস্থা ইহা হইতে অপকৃষ্ট নহে।

বন্দরটী ক্ষুদ্র এবং বিশেষ শ্রীসম্পদযুক্ত নহে। সে বিষয়ে বর্ণনা বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। মনে হয়, এখানকার প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অপর স্থান অপেক্ষা অধিকতর অর্থশালী।

সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপতি ও উহার বহু সংখ্যক সভ্য আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন; আমাদের সমুদ্র-যাত্রাও উপস্থিত শেষ হইল। ইমিগ্রেসান

অফিসারের সাহায্যে Custom "পাশ" হইল। এ বিষয়ে ভারতবাসী সম্বন্ধে অতি কড়া নিয়ম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের মাল তদারক হয়। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের দূত বলিয়া আমরা সে তদারক হইতে অব্যাহতি পাইলাম

সহর হইতে দূরে নির্দ্ধারিত স্থানে মিঃ সিং'এর গৃহে যাওয়া হইল। বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার ও পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে সজ্জিত। বহু সংখ্যক বিখ্যাত ও ধনী ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব গাড়ী করিয়া আমাদের নানা স্থানে ঘুরাইলেন। মিঃ আজমলের দোকান কলিকাতার হোয়াইটওয়ের (White-away) দোকান অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুসজ্জিত। তাঁহার বাড়ীটী অতি চমৎকার এবং বাগান, ফোয়ারা ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। "বোম্বে বাজার কোং"-র দোকান বেশ বড়। ইহারা প্রধানতঃ সিল্ক ব্যবসায়ী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সিল্ক আদৌ নাই। যাহাতে ভারতীয় সিল্কের প্রচলন হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করিলাম এবং কয়েক জন ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা দিলাম। জানি না কাজ কতদূর হইবে। সিল্ক-সত্ত্বাধিকারী রাম চন্দর অনেক European shop-girl রাখিয়াছেন। ইহাতে নাকি ব্যবসায়ের সুবিধা খুবই হয়।

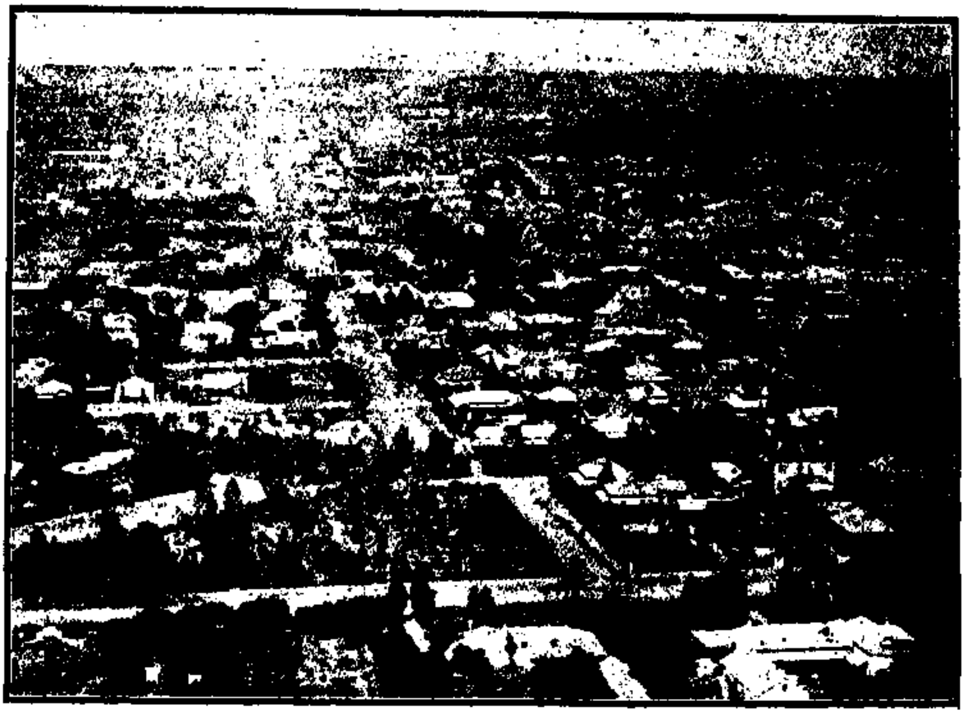
এই তিন ঘণ্টায় প্রায় ২০০ মাইল মোটরে ভ্রমণ করিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে কাফ্রি ফুল-বিক্রেতারা বিশেষ আগ্রহের সহিত অতি যত্নে আনীত ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া ভয়ে ভয়ে দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নাকি "গণ্ডীর" এদিকে আসিবার অধিকার নাই। ইহা জানিতে পারিয়া আমি আগ্রহে তাদের কাছে যাইয়া তাদের স্নেহের নিদর্শন শিরোধার্য্য করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিলাম। প্রথমটা তাহারা যেন আমার সম্বর্দ্ধনা ঠিক প্রণিধান করিতে পারিল না বলিয়া মনে হইল। তাহারা অত্যাচারের পেষণে নিজেদের হয়ত মানুষ বলিয়া ধারণা করিতেও ভুলিয়াছে

ষ্টেশন মাষ্টার, ইমিগ্রেশান অফিসার, অপরাপর রেলকর্ম্মচারী, ভারতবাসী ও কাফ্রি সম্প্রদায়—সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে সাউথ আফ্রিকান্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কাজী আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ডার্ব্বাণ ষ্টেশনে একজন মান্দ্রাজী Quick artist তখনি তখনি আমার একটী ছবি আঁকিয়া উপহার দিয়া চমৎকৃত করিলেন।

ইংরাজ অধিকারের পর নেটালের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। স্থানীয় অধিবাসি-দিগের দ্বারা সে কার্য্যের কিছুমাত্র সহায়তা সম্ভব হইত না এবং শ্বেতকায় ও ঔপনিবেশিকগণ শ্রমসাধ্য কুলীর কাজ করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক নয়। নিজের দেশে যে যা করুক, কৃষ্ণকায় অধিবাসীর চক্ষের সম্মুখে তাহারা এই সকল কাজ করা গ্লানি ও অপমানের বিষয় মনে পরে। যথেষ্ট উর্ব্বর ক্ষেত্র সত্ত্বেও কৃষিকার্য্যের কিছুমাত্র সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় পূর্ব্ব হইতে মাডাগাস্কা ও মরিশেয়স (Mauritius) দ্বীপে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষ ও কর্ম্মী শ্রমজীবীর দল আনিবার ব্যবস্থা করেন। আইন কানুনের বাঁধাধরা ও আরকাটির অত্যাচার যথেষ্ট ছিল; তাহার নিগড় হইতে ঔপনিবেশিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে ঘোরতর আন্দোলনের প্রয়োজন

হইয়াছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা অপেক্ষা মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশ হইতে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী "চালান" হইত।

তাহারা সকলেই কুলী শ্রেণীর নয়; কিন্তু তাহাদের সকলের সাধারণ নাম দক্ষিণ আফ্রিকায় "কুলী" মতান্তরে "কোলা" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শব্দটার উদ্ভব ও অর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতান্তর আছে, অধিবাসিগণকে চমৎকৃত করে। তিন চার পুরুষ ধরিয়া এই সকল কাজ করিয়া তাহাদের অদ্ভুত কৃতিত্ব জন্মে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সকল প্রকার শস্য, ফলমূল, ফুল ও শাকশব্জী ইহাদের যত্নে জন্মে; আখের চাষ যথেষ্ট হয়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা নিজ ব্যবহারার্থ এই কৃষিসম্পদ্ সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট নয়। "মনিবালি" কাজেও তাহারা যথেষ্ট দক্ষ। যাহারা



ডার্ব্বান সহরের দৃশ্য

তাহার সমস্যা এখনও হয় নাই। বাহক অথবা মুটিয়া অথবা সাধারণ শ্রমজীবী অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। নেটাল ঔপনিবেশিকদিগের ব্যবহারার্থ প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক জমিজমা দেন। তাহারা কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতার ফলে সেই সকল জমিতে "সোণা ফলাইয়া" কর্ত্তৃপক্ষ ও স্থানীয় চাষ ও চাকুরী করে না তাহারা দোকান খুলিয়া নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য করে, ছোট বড় সকল কাজই করে।

কোন কাজই তাহাদের নিকট হেয় বা অশ্রদ্ধেয় নহে। নম্রতা, বিনয়, কার্য্যপটুতা, ভদ্রতা এবং সাধুতার ফলে কৃষি ও ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই তাহারা

খুব কৃতিত্ব অর্জ্জন করে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিক লইয়া তাহারা গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে সন্তুষ্ট করে। অতএব যাহা তাহাদের বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং হওয়া উচিত, তাহাই তাহাদের দোষের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই দোষে দোষী বলিয়া তাহারা পদে পদে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা অল্প লাভে ব্যবসা করিয়া ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করে এবং যাহারা তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহাদের নিকট অল্প মজুরীতে কাজ করে। ইহা অসহিষ্ণু, বিলাসী ও শ্রমকাতর শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকের অসহ্য। ফলে তাহাদের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ-বহ্নি ভারতবাসীর প্রতি জ্বলিয়া উঠে। যাহাদের অকাতর পরিশ্রম ও দক্ষতার ফলে নেটাল ও অন্যান্য প্রদেশের শ্রী ফিরিল, সেই নেটালবাসী ভারতবাসিগণের প্রতি অসাধারণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরম্ভ করিল।

তাহারা ৫টা বাজিতে না বাজিতেই টেনিস্ খেলিতে যাইবে, ক্লাবে যাইবে, আমোদ উৎসবে ব্যস্ত থাকিবে; আর মিতব্যয়ী, সহিষ্ণু, শ্রমশীল ভারতবাসী মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে—ইহা তাহাদের সহিল না। ভারতবাসীর স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সামাজিক ও নাগরিক অধিকারপ্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক, যতদূর অসুবিধা সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহা চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের যথা তথা বাসের অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইল। উপকূলের ধারে ধারে ৫০ মাইল চওড়া গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের যাইবার হুকুম রহিল না। আইনের পর আইনের নিদারুণ পাশে পেষণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। যত ধনীই হউক, ভারতবাসী সহরের মধ্যে ইউরোপীয়-

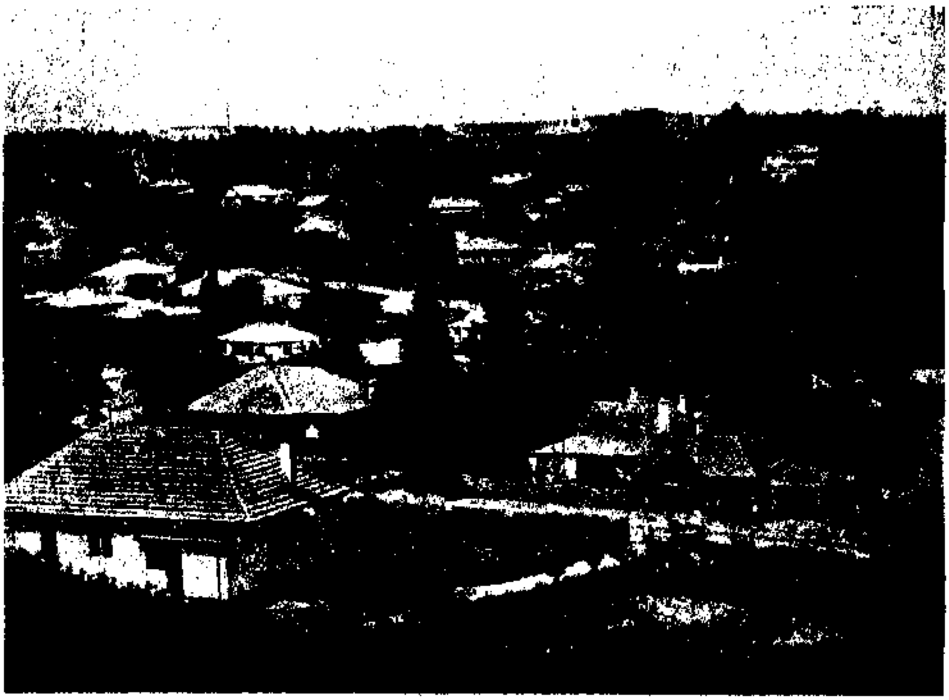


ডার্ব্বান সহরের রাস্তার একটী দৃশ্য

দিগের পাড়ার মধ্যে বাস করিতে বা ব্যবসা করিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই সকল নির্য্যাতনের ফলে মহাত্মা গান্ধী প্রতিকার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং সপরিবারে যে সকল অত্যাচার সহ্য করেন, তাহার প্রতিধ্বনি ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া ভারতবাসীকে আংশিকরূপে জাগরিত করে এবং ধীরে ধীরে সে আন্দোলনের ফল ফলিতে থাকে। কিন্তু হাতে না মারিয়া ভাতে মারার ব্যবস্থা কেহ বন্ধ

করিতে পারে না। বংশানুক্রমে তিন চার পুরুষ পরিশ্রম করিয়া যাহারা ধনোপার্জ্জন করিল—কেহ কেহ যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারাও সম্মানের সহিত সে অর্জ্জনের ফল ভোগ করিতে পারিল না। নানারূপ ভেদ-নীতির প্রচলনে গ্লানির পর গ্লানি তাহাদিগের অন্তর-দাহ জন্মাইতে লাগিল এবং তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িল। ভারতবাসীর উপযোগী আহার্য্য বস্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর আমদানীর মাশুল স্থল-বিশেষে ১০০৲ টাকা মূল্যের মালের উপর ১০০৲ টাকা চড়িল। শ্রমজীবী অভাবে জমিজমা চাষ হয় না; যতদূর নজর চলে, জমি পড়িয়া আছে, চষিবার লোক নাই, তথাপি ভারতবাসীকে তাহাতে হাত দিতে দেওয়া হইবে না—সাব্যস্ত হইল।

নূতন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ হইতে আসা একেবারে বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষে যাহার একাধিক স্ত্রী আছে, তাহার একের অধিক স্ত্রীকে আসিতে দেওয়া বন্ধ হইল; ষোল বৎসরের অধিক যাহার সন্তান আছে, সে সন্তানের আসা বন্ধ হইল। পুরোহিত কিম্বা শিক্ষক বলিয়া ভাণ না করিতে পারিলে, কিম্বা সাময়িক অবস্থিতির প্রতিশ্রুতি না দিলে, সাধারণ ভারতবাসীর দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন অসম্ভব হইল।



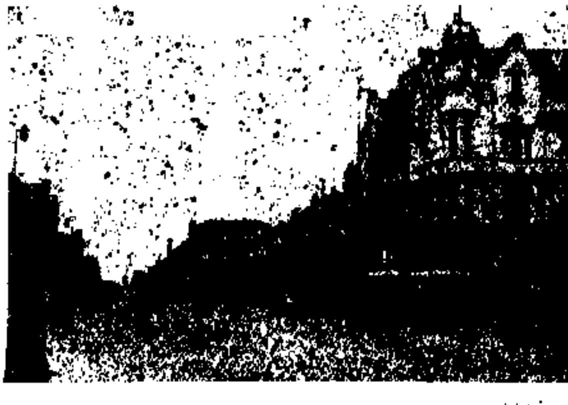
পচেস্‌রুম যাইবার পথে জোহেনাসবার্গের সুবার্ব্বের একটী দৃশ্য—উপরে ইউনিভারসিটি

যাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রুস্তমজী নামে

পার্শী সদাগর প্রসিদ্ধ সাধারণ হিতকর বহু কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। স্কুল, লাইব্রেরী, অগ্নি-মন্দির (Fire-temple), অতিথিশালা, হাট বাজার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জমির lease'এর মেয়াদ ফুরাইলে আর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে পূর্ব্বভাবে lease দেওয়া হইল না। এই অবস্থায় ভারতবাসীকে চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিবার ফলে স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ্-ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীন ভাবে কাটাইতে হইতেছে।

কেবল বসবাস, চাকুরী-বাকুরী, রিক্শা মোটর ও রেলওয়ে গাড়ীর পার্থক্য লইয়াই যে ভারতবাসীর যন্ত্রণা তাহা নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাই। দোকানপাট করিয়া দু'পয়সা লাভ করিয়া সংসার চালাইলে, তাহাতেও বিস্তর প্রতিবন্ধক। প্রথমে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র না পাইলে, কাহারও—অর্থাৎ ভারতবাসীর ফলমূলের দোকান পর্য্যন্ত খুলিবার অধিকার নাই। কোনখানে দোকান হইবে, কি ভাবে দোকান-ঘর এবং সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কোন কোন দিন, কোন কোন সময়ে দোকানের কাজ চালান যাইবে এবং কতক্ষণ কি ভাবে দোকান খোলা রাখা যাইবে—এই সকল বিষয়েই কঠিন আইন কানুন হইয়াছে। ঠেলা-গাড়ীতে সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করিতেও এই সকল বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। ফলমূল খাবার দাবার দোকানে পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম প্রচলিত। শ্রম স্বীকার করিয়া লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিবার অনুমতি নাই। শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না; কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই, যে আরামপ্রিয় বিলাসী শ্বেতকায় বণিক্ এত পরিশ্রম করিয়া এত অল্প লাভে কাজ করিতে পারিবে না এবং মিতব্যয়ী শ্রমকুশল ভারতীয় বণিক্ তাহাদের নিজ প্রচলিত পথে অধিক লাভ করিবার অবকাশ পাইবে, ইহা অসহ্য!

রেলগাড়ীতে কাজী সাহেবের সহিত এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইল। তাঁহার নিকট অনেক "আবেদন নিবেদনের" কাগজপত্র পাইলাম এবং অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ হইল। আমাদের সুবিধার জন্য রেলওয়েতে স্বতন্ত্র সেলুনের ব্যবস্থা ছিল, আহারাদির ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র ছিল। যাহাতে



জোহানেসবার্গের একটী রাস্তা

সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে যাইয়া গ্লানিদুষ্ট হইতে না হয়, এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি; কিন্তু তাহা হইলেও সকল সময়ে আমাদিগের রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমাদের পৌঁছিবার সংবাদের বহুল প্রচার বশতঃ প্রায় সকল ষ্টেশনেই ছোট বড় জনতা হইতে লাগিল। ভারতীয় অধিবাসিগণ আসিলেন অভিনন্দন করিবার জন্য,

শ্বেতকায় অধিবাসিগণ আসিলেন—সুবিধা পাইলেই উপহাসও বিদ্রূপ করিবার জন্য। সন্ধ্যার সময়ে একটা ষ্টেশন হইতে গাড়ী বাহির হইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে ডিষ্টেণ্ট (Distant) সিগ্‌নেলের নিকট একদল লোক আমাদিগকে দেখিয়া তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল—"কুলী" "কুলী"। আমরা দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছি; অতএব এই সকল বিষয়ে আমাদের জিহ্বা, কর্ণ ও দৃষ্টি বিশেষ সংযত রাখিতে হইবে, ইহা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যভার লইয়াছি। ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ পার হইয়া যাইতেছি, চাষবাসের চিহ্নমাত্রও নাই, বনানীশোভা ও পর্ব্বত-শোভায় প্রকৃতি কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করে নাই; কিন্তু দেশ নদীমাতৃক নহে, এজন্য কৃষিকার্য্য, উদ্যানরচনা প্রভৃতি দুরূহ ও বহুলশ্রমসাধ্য। শ্বেতকায় শ্রমিকের অভাব, অথচ কৃষ্ণকায় শ্রমিকের শক্তি ও ইচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হইল না—অদ্ভুত রহস্য! নাতি-উচ্চ পর্ব্বত বা "কোপে" (Kopje) কেন্দ্র করিয়া ইংরাজ অথবা বোয়ার (Boer) কৃষক শত শত মাইল জমি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের উপর বাড়ীর বারেন্দা ষ্টোয়েপ্ (Stoep) হইতে আলেকজান্দার সেলকার্কের মত তাহাদের গর্ব্ব এবং 'গরিমা' "I am the monarch of all I survey"—যে দিকে ফিরাই আঁখি আমারই সকলি দেখি—এই উন্মাদ ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসেন। "The story of a South African farm-house" নামে একখানি দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাস গ্রন্থে এই ভাবের বিশেষ বিকাশ আছে। গদ্যে পদ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভাবের অনেক গ্রন্থ আছে। তাহার অনেকগুলি পড়িয়া লইয়া ভিতরের রহস্যনির্ণয়ের সহায়তা পাইলাম। "ধূলোর মত শুক্‌নো" "নীল মলাটে"র সরকারী পুস্তিকা (Dry-as-dust—blue-books) হইতে যত তথ্য সংগ্রহ না হয়, "লোকসাহিত্যে"র সাহায্যে তাহা হয়। দূরে কখনও অতিদূরে এক একটী ক্ষেতবাড়ী (Farm-House) দেখা যাইতে লাগিল। অধুনা বিতাড়িত ভারতীয় কৃষক তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। সে শ্রীবৃদ্ধির অংশীদার হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয় নাই, দূরে অতিদূরে হীনভাবে কালযাপন করিতেছে। বিগত বোয়ার যুদ্ধের সময়ে বিজয়ী বোয়ার সেনা ইংরাজ সেনাকে সমুদ্র পর্য্যন্ত হটাইয়া আনিয়াছিল, Roni-neck লাল-কোর্ত্তা ইংরাজ সৈনিককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন লর্ড কার্জ্জন-প্রেরিত দশ হাজার ভারতীয় সৈনিক জেনারেল হোয়াইটের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ অধিবাসিগণের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল।

তখন স্থানীয় ভারতবাসিগণ জেনারেল হোয়াইটের সেনার সহিত যোগ দিয়া অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল, সামরিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিল, সময়ে সময়ে রণকৌশল এবং সতত সেবা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল—ইংরাজ-বোয়ারের মধ্যে স্থায়ী সখ্য এবং সন্ধি স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল। যে বহু পুরুষ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজ দেশ বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাকে "নিজবাসভূমি" মনে করিয়াছিল, সেখানে আজ সে "পরবাসী"!

ক্রোনিয়ে (Cronje), জেনারেল হার্টজহগ, জেনারেল স্মাটস্ প্রভৃতি বোয়ার অধিনায়কগণ ভারতবাসীর শৌর্য্যবীর্য্য এবং ইংরাজ-প্রীতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতসৈনিক ও ভারতবাসিগণ বিরোধী হইয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত

করিয়াছিল, একথা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে বহুবার বোয়ার নাগরিকদিগের মুখে একথা শুনিয়াছি এবং শুনিয়াছি, এই অবস্থায় ভারতবাসিগণ বোয়ারের কৃপাপাত্র বা সহানুভূতি হইবার আশা রাখিতে পারে না। কিন্তু বুঝি না, ইংরাজের কৃপাপাত্র কেন তাহারা হইবে না। কৃপার কথা নয়, ন্যায় বিচারের কথা—সেই বিচারও তাহারা কি পাইবে না?

এইরূপ কথা ভাবিতে ভাবিতে রজনীর অবসান হইল। নব কর্ম্মস্থানে নবীন সমস্যার সহিত সংগ্রামে শক্তি অর্জ্জনের জন্য, শক্তিময়ের নিকট শক্তির জন্য উদ্বোধন করিয়া সুপ্রভাত হইল। নবশক্তিচ্ছটায় নবীন রবি সমগ্র দেশ উদ্ভাসিত করিয়াছে, মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির নবীন লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

পথে ছোট বড় অনেক নগর গ্রাম রেলের ধারে পড়িল। যেখানে গাড়ী কিছুক্ষণ থামিল সেখানেই ভারতবাসিগণ নানা উপায়ন লইয়া উপস্থিত। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়াছেন তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবাকল্পে আমরা উপস্থিত, এই কারণে আদর আপ্যায়ন। পথে পিটার মারিজ-বার্গ প্রভৃতি বোয়ার যুদ্ধে প্রসিদ্ধ নগর সব পড়িল। আমাদের কমিশন এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া জোহানেসবর্গে ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি ভারতীয় অধিবাসিগণ নূতন করিয়া পুরাতন কাহিনী বলিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন—ডিসেম্বর মাসের খর উত্তাপ খর রৌদ্রে ইঁহারা অনেক দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, ষ্টেশনে সমস্ত রাত্র অপেক্ষা করিয়াছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাঁহারা ষ্টেশনের অতিথি-শালায় আহার পানীয় সংগ্রহ করিবার অধিকার পান নাই। আমাদের আয়োজন হইতে তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হইল।

যদি পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ডেলাগোয়াবে হইতে স্পেশাল ট্রেণে আসা হইত, তাহা হইলে অধিকতর আরামে ও অল্প সময়ে আসা যাইতে পারিত এবং প্রিটোরিয়া হইয়া আসিতে হইত; তথাপি ৩৯৫ মাইল অতি অল্প দৌড়ান হইত—কিন্তু ডার্ব্বাণ হইতে আসিতে হইল আমাদের ৪৮২ মাইল।

Electrification of Railway'এর কার্য্য খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং জায়গায় জায়গায় স্থানীয় ইলেকট্রিক্ ট্রেণের গতি অত্যন্ত দ্রুত, খরচ অপেক্ষাকৃত কম—দুর্ঘটনা সম্ভাবনাও অনেক কম।

বেলা ১১।৪৫ মিনিটে গ্রিমষ্টোনের (Grimstone) কাছাকাছি হওয়ার সময় হইতে প্রায় চারিদিকেই দূর হইতে সোনার খনি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বালি—স্বর্ণরেণু বিহীন বালি পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ করিয়া রাখা হইয়াছে, আবার তাহারই উপর ছোট রেল পাতিয়া আরও বালি জমা করা হইতেছে। চারিদিকে এই সকল প্রকাণ্ড স্তূপ দেখিয়া পঞ্চতন্ত্রে পঠিত "বক-কুলীরকয়োঃ" সংবাদের "মৎস্যাস্থীনি"র কথা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে এই বালি রাস্তা তৈয়ারী করার প্রধান মসলা ছিল; কিন্তু এখন পিচের রাস্তার প্রচলন হইয়া ইহার ব্যবহার প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যখন আমরা আমাদের ভোজ্য দ্রব্যের মূল্য ও ট্রেণ ষ্টুয়ার্টদের পুরস্কার ইত্যাদি দিতে যাইলাম, তখন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী চিফ ষ্টুয়ার্ট সম্মানের সহিত নত হইয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল,—আপনারা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের মাননীয় অতিথি।

গ্রিমষ্টোন জংশন ষ্টেশন। সেখানে অনেক

স্বর্ণের খনি আছে। ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যারও অভাব নাই। যেখানে স্বর্ণখনি সেখানে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা অধিক—এই আশায় লুব্ধ হইয়া তাহারা সেখানে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, নির্য্যাতনও সহিতেছে। তাহাদের বাসস্থান অপরিষ্কার, সহরের ভাল জায়গায় তাহারা স্থান পায় না; খনিতে কর্ম্ম পাইবার তাহাদের অধিকার নাই এবং পাছে তাহাদের সাহায্যে খনির শ্রমজীবিরা স্বর্ণ স্থানান্তরিত করে, এই সন্দেহে ক্রূর সতর্কতার সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষিত হয়। স্বর্ণখনির মূল কেন্দ্র জোহেনাস্‌বার্গেও ব্যবস্থা এইরূপ।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, দূর হইতে বাল-স্বভাব অথচ চির উৎসাহী সৌম্যমূর্ত্তি রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজকে দেখিলাম দৌড়াইতেছেন এবং সঙ্গে প্রায় ১৫০ প্রবাসী ভারতবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রধান ইমিগ্রেশন অফিসার হার্টসর্ণ (Hartshorn) প্রভৃতি কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদের নামাইয়া লইলেন। ফটো তোলা, ফুল, মালা এবং জনতায় ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে এবং রাস্তায় সাধারণ যাত্রীদের কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মিঃ হাজারী, বার, এট্‌-ল, মিঃ মল (Land & Property Agent) মিঃ পেটেল (সেক্রেটারী ট্রেনস্‌ভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস) মিঃ কাজি (সেক্রেটারী ডার্ব্বান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস), ধনী সওদাগর বৃদ্ধ কোভাডিয়া, ফলব্যবসায়ী সোলেমান ইসমাইল পেটেল, পার্সী ব্যবসায়ী পারাস্‌, ধনী হাজি হাবিব ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক করিয়া সকলে আমাদের লইয়া গেলেন ইণ্ডিয়া বায়স্কোপে। হলটি অত্যন্ত ছোট এবং আদৌ সুসজ্জিত নহে। ভারতবাসীদের সাধারণ মনোরম ও সুসজ্জিত থিয়েটার বা বায়স্কোপে প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারণে কয়েকজন ধনী উদ্যোগী ভারতবাসী যাহা হউক "একটা কিছু" খাড়া করিবার ইচ্ছায় এইরূপ নিজস্ব স্থান সংগ্রহ করিয়াছে। এখানে জলযোগ ও বক্তৃতার অভাব ছিল না। অল্প সময় কাটাইয়া বক্তৃতা ইত্যাদির ভার নিখিলের উপর দিয়া "Carlton Hotel'এ চলিয়া গেলাম। সেখানে আমাদের কমিশনের অধিবেশন চলিতেছিল। এ রকম বড় ও সৌখীন হোটেল কমই দেখা যায়। ইহার ত্রি-সীমায় কাল চামড়ার আসিবার অধিকার নাই আগাগোড়া হোটেল electric vacunm cleaner দ্বারা প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর শ্বেতচর্ম্মধারী মেথরের দ্বারা পরিষ্কৃত হইতেছে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট আমাদের অফিসের কার্য্যে এবং বসবাসের জন্য কয়েকটী ঘর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সে হোটেলে না থাকা স্থির করিয়া স্থানীয় ভারতবাসিগণের ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র স্থানে বাসা লইলাম। শ্বেতকায় স্বামিগণের কৃপা কার্পণ্য বশতঃ আমাদের বাসের জন্য ভাল বাড়ী পাওয়া সম্ভব হয় নাই। অবিবেকে শ্বেতকায় অধ্যুষিত হোটেলের নানারূপ নির্য্যাতন ও তাচ্ছল্য সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইজন্য বৃদ্ধ ধন-কুবের কুভাডিয়ার একটী বাড়ীতে বাসের জন্য ভারতপ্রবাসী বন্ধুরা ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ীটী ছোট হইলেও খুব সাজান। এইখানেই মিঃ রেজা আলী, মিঃ জি, এস, বাজপাই ও আমরা উঠিলাম মিঃ ও মিসেস্‌ পেডিসন্‌ হোটেলে রহিলেন।

নিখিলচন্দ্র ভারতবাসীর চিরবন্ধু মিঃ এণ্ড্রুজের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত অত্যন্ত গরীব ফল-বিক্রেতাগণের মধ্যে খানিকটা সময় কাটাইয়া

তাহাদের অভাব অভিযোগ দেখিয়া ও শুনিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের খবর আনিল। এণ্ড্রুজের ত্যাগের নাই, কার্য্যের শেষ নাই। অনেক পুণ্যফলে ব্যথিত, প্রপীড়িত, প্রবাসী ভারতবাসী এণ্ড্রুজকে মেরুদণ্ড-স্বরূপ পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর এক পুত্র মণিলালের সহিত আলাপ হইল। তিনি ডার্ব্বাণ প্রদেশে "Indian opinion" নামক কাগজ পরিচালনা করেন এবং সেখান হইতে এখানে খবরের কাগজওয়ালাদের নানা cuttings ও খবর পাঠান। লোকটী অতি শান্ত, অমায়িক ও কর্ম্মঠ।



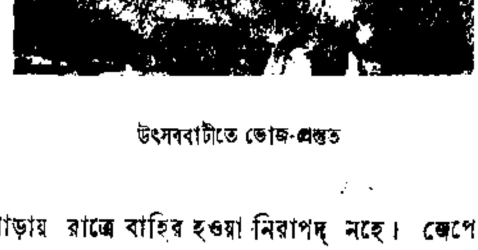
আফ্রিকায় দেশীয় বিবাহ

মিঃ হাজারী কথায় কথায় আমাদিগকে তাহার বাড়ী লইয়া গেলেন। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যারিষ্টার এবং তাঁহার স্ত্রীও একজন শিক্ষিতা মহিলা। মিঃ হাজারী "ভারতীয়" বলিয়া "location"-এ অর্থাৎ ভারতবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বাহিরের স্থানে থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সহরের ভিতরেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি ধনী ব্যারিষ্টার বলিয়া বিলাসীভাবে সহরের ভিতরে থাকিতে চান না; নির্য্যাতিত স্বদেশবাসী অন্যায় আইনের বলে যেখানে থাকিতে বাধ্য, সেইখানেই তিনি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নীচ অশিক্ষিত



বিবাহান্তে শোভাযাত্রা

শ্রমজীবিদের মধ্যে খানকতক ঘর লইয়া অতি নীচ প্রকৃতির ও নিম্নস্তরের মানুষের সহিত একই বাড়ীতে বসবাস করিতে হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা তাঁহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন; বিশেষতঃ সে



উৎসববাটীতে ভোজ-প্রস্তুত

পাড়ায় রাত্রে বাহির হওয়া নিরাপদ্ নহে। জেপে (Jeppe), বাটরাম (Buttram), বাগান, স্কুল ইত্যাদি দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ীটী লোকে ভরিয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্থান পান নাই, তাঁহারা রাস্তায় অপেক্ষা

করিতেছেন। সকলের সহিত দু' এক ঘণ্টা কথা কহিয়া আপ্যায়ন লইয়া এবং আপ্যায়িত করিয়া কোন রকমে স্নানের ঘরে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। রাত্রে খাওয়ার দ্রব্যসম্ভারের যত ছড়াছড়ি, বন্ধুবর্গের ততোধিক আমদানী। নৈশ ভোজের পর বেড়াইতে যাইবার জন্য অনেকে গাড়ী লইয়া আসিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর আর বয় না; তাঁহারা নিখিলকে লইয়া গেলেন। পরদিন ৪।৫ খানি গাড়ী করিয়া প্রায় ১৫০ মাইল দূরে পচেস্‌ক্রমে বেড়াইতে যাওয়া হইল। সেখানে আগে ভারতীয়কে এত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত না। এখন "Indian location" হইয়াছে এবং license মঞ্জুর হওয়া শক্ত। যাহা আছে, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইতে চলিয়াছে। ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা আদৌ নাই। ভারতীয় উপনিবেশে সহর হইতে দূরে থাকিতে হয়।

৪ঠা তারিখে সকাল ৮টার সময়ে আমাদের নির্দ্ধারিত সেলুনে আসিয়া উঠিলাম। কোন কোন বন্ধু ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; কেহ কেহ জোরে আগের ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পথে এক জায়গায় দেখিলাম—একটী কাফ্রি বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সহিত চলিয়াছেন। আর একদিকে পরিশ্রমী নিকট আত্মীয়গণ তাঁহাদের ভোজের ব্যবস্থার জন্য রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমরা সকলেই এই নূতন পদ্ধতি ও উদ্‌যোগ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিলাম।

(ক্রমশ:)

নীড়

[শ্রীউমানন্দ ভাদুড়ী]

মুকুলিত-মিলনে-অধীর,
ছোট ছোট পাখী দুটো,
ঠোঁটে বহি' খড় কুটো,
আম্রশাখে বিরচিল নীড়।
দিবাশেষে সাঁজের আঁধারে,
পাখী দুটি ফিরে আসে,
বিরচিত গৃহবাসে,
যাপে নিশি কৌতুক-বিহারে।
অকস্মাৎ একদিন ঝড়ে,
ক্ষুদ্র নীড় গেলো টুটি',
পাখী দুটি কেঁদে উঠি'—
উড়ে গেলো মহাশূন্যে পরে।

আমরাও রচিয়াছি নীড়,
নির্জ্জন পথের পাশে,
শান্তি ঘেরা ক্ষুদ্র বাসে,
কাটে কাল প্রণয়-অধীর।
হয়তো বা কোনো একদিন,
মোদের রচিত ঘর,
লুটিবে ধরণী 'পর,
গরজিবে প্রলয়ের বীণ্।
সীমাবদ্ধ ধরণীর ঘর,
ছাড়িয়া যাইতে হবে,
পশ্চাতে পড়িয়া রবে,
শুধু স্মৃতি, সমদুঃখী নর।

***

সম্ভবামি

(উপন্যাস)

(২)

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বুড়ী তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে যায়—অন্ধকার ঘর, মা যেখানটায় শুইয়া ছিল, শশীশেখর সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে; মনে হয় যেন মা তাহার এখনও সেইখানে শুইয়া আছে। ধীরে-ধীরে ডাকে,—'মা!'

চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসে।

চোখের জল মুছিয়া আবার ডাকে, 'মা!'

কিন্তু কোথায় মা! বুড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই প্রদীপের ছটায় দেখা যায়, কোথাও কিছুই নাই। দেওয়ালের কাছে আন্‌লায় তাহার মায়ের কাপড়-খানি তখনও তেম্‌নি ঝুলিতেছে।

ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি বাহিরে সে উঠানে আসিয়া দাঁড়ায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া অনেক কষ্টে পিসিমা তাহাকে ও-পাড়া হইতে এইমাত্র ধরিয়া আনিয়াছে, আবার হয়ত কোথাও পালাইবে ভাবিয়া পিসিমা ডাকিল, 'ওরে ও ছোঁড়া, তোকে নিয়ে আর পারলাম না দেখছি! খেয়ে নিবি আয়।'

শশীশেখর তখন উর্দ্ধে আকাশের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, মানুষ মরিয়া স্বর্গে গিয়া বোধকরি তারা হয়; কিন্তু ওই অতগুলা তারার মধ্যে কোন্‌টি তাহার মা কে জানে!

•

সঙ্গী-সাথীদের বাড়ী শশীশেখর খেলা করিতে যায়, মেয়েরা তাহাকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলে, 'ওরে ও শশী, শোন্!'

নিতান্ত অপরাধীর মত শশী কাছে গিয়া দাঁড়ায়।

মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেহ বলে, 'আহা বাছারে, মাথায় একটু তেল পড়ে নি। মা না থাকলে কে-ই বা করবে বল?'

আবার কেহ-বা হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'হ্যারে, মাকে তোর মনে পড়ে? মা'র জন্যে মন কেমন করে না?'

শশীশেখর সজলচক্ষে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাছে সে অশ্রু কেহ দেখিয়া ফেলে সেই লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারে না।

দয়াময়ী কোন নারী হয়ত তখন এই মাতৃহীন বালকের উপর করুণা করিয়া চোখ টিপিয়া বলে, 'না লো না, মা ওর মরবে কেন? গঙ্গাচান করতে গেছে, আবার আসবে দেখিস্।'

কিন্তু চাতুরী বৃথা। ছেলেভুলানো কথায় বিশ্বাস করিবার বয়স তাহার গিয়াছে। ইহাতে তাহার লজ্জা যেন আরও বাড়িয়া উঠে। এইবার সে তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া দুষ্ট ছেলের মত সেখান হইতে পলায়ন করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

হঠাৎ কোন্ সময় ফস্ করিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া সেই যে সে ছুটিয়া চলিয়া যায়, ভুলিয়াও আর সে-পথ কোনোদিন মাড়ায় না।

গ্রামের পাঠশালায় শশীশেখর পড়িতে যায়।

'দীনবন্ধুদাদা'র গল্পটি পড়িতে তাহার বড় ভাল লাগে। গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন। ছাত্রদের উপর জিনিষপত্র সংগ্রহের ভার। নিতান্ত দরিদ্র এক অসহায়া বিধবার একটি ছেলের উপর ভার পড়িয়াছে দই সংগ্রহ করিবার। নিজেরাই পেট ভরিয়া দু'বেলা খাইতে পায় না, বিধবা মা তাহার অতিকষ্টে সংসার চালায়,—অতগুলি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দই সে সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! মা বলিল, 'কি করি বাছা, আমাদের ত' একমাত্র দীনবন্ধু ছাড়া আর কেউ নেই।'

নিরুপায় বালক তখন গ্রামপ্রান্তে এক নির্জ্জন বাগানের ধারে গিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধু-দাদা! দীনবন্ধুদাদা!'

ঘন বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার ছোট একটি দই-এর ভাঁড়।

বালক সেই ছোট দই-এর ভাঁড়টি হাতে লইয়া গুরুমহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইতেই তিনি ত' রাগিয়া আগুন! ওইটুকু ত' দই, উহাতে অতগুলি ব্রাহ্মণ-ভোজন হওয়া অসম্ভব। রাগিয়া তিনি ভাঁড়টা আর স্পর্শ করিলেন না, দধিভাণ্ড সেইখানেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু হঠাৎ একটা কাক আসিয়া ভাঁড়টা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিতেই দেখা গেল, ভাঁড় হইতে প্রচুর দই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল, অথচ ভাঁড় তেমনি কানায় কানায় পরিপূর্ণ। অবশেষে সেই ছোট ভাঁড়টি তুলিয়া লইয়া কে একজন ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতে সুরু করিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, নিমন্ত্রিত সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দই খাইয়াও ভাঁড়ের দই আর কিছুতেই শেষ করিতে পারে না। অবাক্ কাণ্ড! বিস্মিত হইয়া ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ভাঁড় তুই কোথায় পেলি বল্ দেখি?' ছেলে বলিল, 'আমার দীনবন্ধুদাদার কাছে।'

'দেখাতে পারিস্ তোর দীনবন্ধুদাদাকে?'

'হ্যাঁ, পারি।' বলিয়া গুরুমহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন কৌতূহলী ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বালক পুনরায় সেই বাগানের কাছে গিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধুদাদা! দীনবন্ধুদাদা!'

কিন্তু কোথায় দীনবন্ধু!

অবিশ্বাসী ওই অতগুলি লোকের সুমুখে দীনবন্ধু আর আসিলেন না।

এই দীনবন্ধুদাদার গল্পটি শশীশেখর বারে-বারে পড়ে।

পড়ে আর মনে হয়, ওই বালক যেন সে নিজে। সেও যদি অম্‌নি নির্জ্জনে গিয়া তাহার মাকে ডাকে ত' তাহার মা নিশ্চয়ই একবার তাহাকে দেখা দিয়া যায়……

সন্ধ্যা হোক্,—গ্রামের উত্তরদিকের ওই পাকা সড়কের ধারে, নির্জ্জন ধানের মাঠের পাশে গিয়া সে তাহার মাকে আজ ডাকিবে। চোখ বুজিয়া শশীশেখর মনে-মনে কল্পনা করিতে লাগিল—মা যেন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শশীশেখর তাহার কোলে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া বলিতেছে, 'এমনি করে' রোজ তুমি আমায় দেখা দিয়ে যেয়ো মা, তোমায় না দেখে যে আমি……'

এমন সময় গ্রামের পথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিসের ঘণ্টা দেখিবার জন্য শশীশেখর ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে—হিন্দুস্থানী এক ফিরিওয়ালা মাথায় আমসত্ত্ব, খেজুর ও পাকা কলার ডালি লইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ছেলে ডাকিতেছে।

শশীশেখর ছুটিয়া তাহার পিসিমার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'পিসিমা!'

বুড়ী পিসিমা রান্না করিতেছিল। বৌ মরিবার পর হইতে যেমন করিয়াই হোক, তাহাকেই রান্না করিতে হয়। বিড়্‌বিড়্ করিয়া আপনমনেই বকে আর রান্না করে।

পিসি বলিল, 'রান্নার সময় জ্বালাস্‌নে শশী, কি বলছিস্ কী?'

শশীশেখর বলিল, 'একটি পয়সা দাও না পিসিমা, পাকা কলা কিনব।'

পয়সার নামে পিসিমা জ্বলিয়া উঠিল।—'আ-মর্, পয়সা কোথা পাব রে, পয়সা কোথায় পাব? তোর মা বুঝি পয়সা আমায় রাখতে দিয়ে গেছে! যা—পয়সা নেই, যা, বেরো এখান থেকে!'

ম্লানমুখে শশীশেখর বাহিরে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। ছেলেরা তখন ফিরিওয়ালাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।—এ-কথাও মাকে তাহার বলিতে হইবে।

সন্ধ্যায় সড়কের ধারটা প্রায় নির্জ্জন হইয়া আসে। মুদীর দোকানের জিনিষ বোঝাই করিয়া সহরের ফেরত দু'একটা গরুর গাড়ী কদাচিৎ যাওয়া-আসা করে। নূতন-পুকুরের পাড়ে ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়া লুকাইয়া শশীশেখর সড়ক পার হইয়া ধানের মাঠে গিয়া নামিল। গ্রীষ্মকাল। চারিদিকে শুকনো মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথাও জনপ্রাণী নাই। অনুচ্চকণ্ঠে শশীশেখর ডাকিল, 'মা!'

আবার ডাকিল, 'মা!'

নিস্তব্ধ পল্লীপ্রান্তরে এবার তাহার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তবু তাহার মা'র দেখা নাই। এখনও বোধহয় শুনিতে পায় নাই। তাই সে এবার বেশ জোরে জোরেই ডাকিল, 'মা!'

ডাকিবামাত্র চোখদুইটা তাহার ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল, এবং তাহার সেই সজল চক্ষের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সম্মুখে দেখিল, কোথা হইতে চিত্র-বিচিত্রিত নাম-না-জানা চমৎকার একটি পাখী উড়িতে উড়িতে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। শশীশেখর ভাবিল, মা কি তবে তাহার মরিয়া পাখী হইয়া জন্মিয়াছে? তা' যদি হয় ত' পাখীটি নিশ্চয়ই তাহার আরও কাছে আসিয়া বসিবে।

শশীশেখর ধীরে-ধীরে পাখীটির দিকে হাত বাড়াইল। ভাবিয়াছিল সে কাছে আসিবে, কিন্তু আসিল না। হাত বাড়াইবামাত্র পাখীটি উড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গেল কে জানে!

শশীশেখরের সেখান হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না, অথচ সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। ভাবিল, মা তাহার আজ না আসুক, এমনি করিয়া প্রতিদিন ডাকিতে ডাকিতে একদিন সে আসিবেই। মা কি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে কখনও?

অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শশীশেখর বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, পিসিমা বোধকরি তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইবার জন্ত তখন সদর দরজায় তালা বন্ধ করিতেছে।

পিছন হইতে শশীশেখর বলিল, 'আমি এসেছি পিসিমা।'

অনেকক্ষণ হইতেই পিসিমা তাহার উপর রাগিয়া আগুন হইয়াছিল। হাতের তালা দিয়াই তৎক্ষণাৎ সে তাহার মাথার উপর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, 'বেরো, তোকে আর ঘরে ঢুকতে হবে

না হতভাগা! বলি, না, আহা, মা-মরা ছেলে, মানুষ করি। ও মা, ছেলে ত' নয়—শয়তান। হবে না? মা কেমন ছিল? যেমন মা, তার তেমনি ছেলে হবে ত'!'

বলিতে বলিতে যে দরজা খুলিল। মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'আ, আবার কান্না দ্যাখো! কেন, আমি কি খুন করে' দিলাম নাকি? ওরে ও ছোঁড়া, লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে কেঁদে কেঁদে আর দুষ্‌মণ হাসাতে হবে না—আয়!'

বলিয়া পিসি তাহার হাতে ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া টানিতে টানিতে ঘরে লইয়া গেল। শশী-শেখরের মাথাটা বোধকরি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কান্না তাহার তখনও থামে নাই।

বুড়ী বলিল, 'দাঁড়া, তোকে কালই আমি দিয়ে আস্‌ছি। মামা ত' তখন নিয়ে যেতে চাইলে—গেলি নে কেন হতভাগা? গেলি নে কেন? চল্ আমি তোকে সেইখানেই দিয়ে আসি।'

দিয়া সে তাহাকে আসিত কিনা কে জানে।

কিন্তু তাহার পরের দিন—

পিসি স্নান করিতে গিয়াছে,

শশীশেখর বাড়ীতে একা।

মায়ের জিনিষপত্র এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে শশীশেখরের হঠাৎ নজর পড়িল—মা'র একটি ছোট কাঠের হাত-বাক্সের উপর। এই বাক্সটির মধ্যে মা'র একটি 'রামায়ণ' আছে। সময়ে-অসময়ে প্রায়ই সে ওই রামায়ণখানি পড়িত এবং রোজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া শশীশেখরকে কোলের কাছে টানিয়া রাম-সীতার গল্প বলিত।

রাবণ তখনও মরে নাই; লঙ্কায় যুদ্ধ চলিতেছে, —এমন সময়ে তাহার মা'র হইল জ্বর। শশী-শেখর ভাবিল, সে ত' পড়িতে জানে, বাক্স হইতে রামায়ণখানি বাহির করিয়া রাম-সীতার গল্পটি সে নিজেই পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।

অনেক খুঁজিয়া অনেক কষ্টে শশীশেখর চাবীর তোড়াটি বাহির করিল। তাহার পর বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, সেলাইর আসবাবপত্র রহিয়াছে। মা'র নিজের হাতের সেলাই। নিজের হাতে বাক্সটি সে সাজাইয়া রাখিয়াছে। শশীশেখর একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিক্ পানে তাকাইয়া থাকিয়া রামায়ণখানি বাহির করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে গিয়া দেখে, বাক্স বন্ধ কিছুতেই হয় না। জিনিষপত্র আবার আগাগোড়া নামাইয়া ভাল করিয়া সাজাইতে হইবে। তাহাই সে করিতেছে, এমন সময়ে পিসিমা হাঁকিল, 'শশী!'

চমকিয়া শশীশেখর পিছন ফিরিয়া দেখিল, স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বুড়ী তখন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, 'পায়ে একটু জল ঢেলে দিয়ে যা ত' বাবা, আসতে আসতে মনে হলো এঁটো পাতা না কি যেন একটা মাড়ালাম।'

শশীশেখর বলিল, 'যাই'।

কিন্তু 'যাই' বলিয়াই সে বড় বিপদে পড়িল। বাক্সের অর্দ্ধেক জিনিষপত্র তখন সে নামাইয়া রাখিয়াছে, পিসিমা যদি এ-কাণ্ড তাহার দেখিতে পায় ত' বাকি কিছু রাখিবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি খোলা বাক্সটা আড়াল করিয়া জিনিষগুলি কোনো-রকমে তুলিয়া রাখিতেছিল; দেরী হইতেছে দেখিয়া পিসিমা চৌকাঠের ওপার হইতে উঁকি মারিয়া চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, 'কোথায় তুই? কি করছিস্?'

ভয়ে শশীশেখর সাড়া দিল না।

কিন্তু স্পষ্ট দিবালোকে একেবারেই না দেখিতে

পাইবার মত কানা সে নয়, পিসিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে ও বাস্‌কোর কাছে কি করছিস্ শুনি ?'

শশীশেখর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এবার আর গোপন করিবার উপায় নাই ; বলিল, 'বাক্সটা বন্ধ হচ্ছে না, পিসিমা !'

বাক্সর নামে এঁটো পাতা মাড়ানোর কথা পিসিমা বোধকরি ভুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'কার বাস্‌কো খুলেছিস্ রে ছোঁড়া ? আমার ? না তোর মায়ের ? ও সব্বনাশ! ওরে হারামজাদা, ওরে লক্ষ্মীছাড়া—'

বলিয়া বুড়ী তাহাকে যেমনি হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইবে, শশীশেখর রামায়ণখানি তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

পিসি তাহার পিছু পিছু খানিকটা ছুটিয়া আসিয়া চেঁচাইতে লাগিল, 'কই দেখি রে দেখি—কি নিয়ে পালালি .....টাকাকড়ি না গয়না-গাঁটি ......গেল-গেল-গেল-গেল আমার সব গেল রে ......দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে আমার সব গেল !'

বলিয়াই সে আবার বাক্সর কাছে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কি গিয়াছে না গিয়াছে দেখিবার আগেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, যে আজ হোক্ কাল হোক—যে কোনোপ্রকারে সে ওই দস্যি ছেলেটাকে তাহার মামা-মামীর কাছে রাখিয়া আসিবে, তাহার পর অন্য কথা।

বেলা প্রায় চারটার সময়ে একহাতে শশীশেখরের কান ধরিয়া আর-এক হাতে মোটা রামায়ণখানি লইয়া ও-পাড়ার যোগীন আসিয়া দাঁড়াইল — 'ওগো ও দিদি, এই নাও তোমার শশীর কাণ্ড দ্যাখো ! ও-পাড়া থেকে আসছি, দেখি না আমাদের গোয়ালের পাশে—তেঁতুলগাছের তলায় একটা শেকড়ে মাথা দিয়ে শশী ঘুমোচ্ছে। আর এই রামায়ণখানা কোথা ও পেলে দ্যাখো ত' দিদি ! এইখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ;—এই এত বড় মোটা বই—মুখের ওপর চাপা দেওয়া'; আর-একটু হ'লে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো যে রে হারামজাদা !' বলিয়াই ঠাস্ করিয়া শশীর মাথায় এক চড় মারিয়া যোগীন বলিল, 'না দিদি, একে একটু শাসন কোরো, নইলে দিন-দিন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠ্ছে ছেলেটা। সেদিন অম্‌নি—'

বলিয়া যোগীন বোধকরি ছেলেটার আরও কিছু দুষ্কৃতির কথাই বলিতে যাইতেছিল, বুড়ী পিসি তাহার আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'তবে বোসো যোগীন, শোনো তবে, শুনেই যাও। শেষে তোমরা এই পিসির দোষ দিও না। ছেলে ত' নয়—ডাকাত !'

পিসি সেইখানেই বসিল। বসিয়া যোগীনের কাছে তাহার ও-বেলার ডাকাতির কথাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিল, 'বৌএর গয়না-গাঁটি ত' কম ছিল না, টাকাকড়িও কিছু না থাক্......নাই নাই করে'ও কিছু ছিল, কিন্তু এম্‌নি ও ছেলের গুণ,- কোন্ ফাঁকে কোন্ দিক দিয়ে যে নিয়ে পালালো —নিয়ে কাকে যে দিলে, কি যে করলে ও-ই জানে ! ওইটুকু ত' ছেলে......চোখে ভাল দেখতে পাই না কিনা.. ..ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে মানুষ করি, আহা মা-মরা ছেলে .....না, কাজ নেই ভাই আমার অমন ছেলে মানুষ করায়—ওর মামার বাড়ীতে দিয়ে আসি। কালই যাব।'

যোগীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই যাও দিদি, নইলে তুমি ও ছেলেকে পার্‌বে না।'

পরদিন মামার বাড়ী যাইবার সবই ঠিক। ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে মাত্র মিনিট-পাঁচেকের পথ। বুড়ী নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। শশীশেখরের জামা-কাপড় বই শ্লেট্—সবই একটা পুঁটলীতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বুড়ী রান্না করিতেছিল। ভাত চারটি মুখে দিয়াই তাহারা ষ্টেশনে গিয়া বারোটার ট্রেণ ধরিবে।

নিতান্ত বোকার মত হাঁ করিয়া শশীশেখর ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। এই ঘরে আর-কোনোদিন সে আসিবে কিনা কে জানে। বুড়ী না আসিতে আসিতে রামায়ণখানি সে তাহার পুঁটলীর মধ্যে ঢুকাইয়া লইল।

মা'র ওই আন্‌লায়-ঝুলানো কাপড়খানি......

শশীশেখর হাত বাড়াইয়া সেখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, তাহাতেই তাহার চোখের জল মুছিয়া ঘরের অন্ধকার কোণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া চোখ বুজিয়া ডাকিল, 'মা!'

ডাকিবামাত্র গলার আওয়াজ তাহার ভারী হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

চুপি-চুপি বলিল, 'মা, আমি মামার বাড়ী চললাম।' বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া আসিতেছিল। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'তুমিও যেয়ো।'

ঠিক এই সময়ে দেওয়ালে একটা টিক্‌টিকি কোথায় যেন টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল।

এদিক ওদিক তাকাইয়া শশীশেখর নিশ্চিন্তমনে গোপনে চোখ মুছিয়া ভাবিল, মা তাহার কথাগুলি নিশ্চয়ই শুনিয়াছে, তাহা না হইলে টিক্‌টিকি কখনও বিনা কারণে টিক্‌টিক্ করে না।

কাল রাত্রেও সে যখন বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনে-মনেই মাকে বলিতেছিল—'তোমার গয়না-টয়না পয়সা-টয়সা কিচ্ছু আমি নিইনি মা, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না, বুড়ী মিছে করে' বলছে।' তখনও ঠিক ওই টিক্‌টিকিটাই এম্‌নি করিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছিল—তাহার মনে আছে।

শশীশেখর উপরের দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ালের গায়ে টিক্‌টিকিটার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

মামার সন্তানাদি কিছু হয় নাই, কাজেই মামীমা তাহার দুইটি ভাইকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ভাই দুটি ছোট। একটি শশীশেখরের সমবয়েসী, আর-একটি তাহার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। মামা বলিল, 'ভালই হয়েছে, শশীকে আপনি নিয়ে এসেছেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। ওখানে ইস্কুল নেই, ছেলেটার লেখাপড়া কিছু হ'তো না, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।'

পিসি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, লেখাপড়া ওর......'

বলিয়াই বোধকরি শশীশেখর সম্বন্ধে খারাপ কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া একটা ঢোঁক্ গিলিয়া চুপ করিল।

শশীশেখরকে রাখিয়া বুড়ী সেইদিনই ফিরিয়া যাইতে চাহিল, শশীশেখরের মামা ভবেশ নিষেধ করিল। বলিল, 'না না, তাই কি হয় নাকি কখনও?'

কিন্তু মামী কনকবরণী বলিল, 'তা—তা আজই যাবেন? তা—হ্যাঁ, একলা মানুষ, খালি ঘর ফেলে এসেছেন, আজকালকার দিনে চোর-ডাকাতের ভয়......ওরে ও যুক্ত!'

বলিয়া চাকরটাকে কাছে ডাকিয়া বুড়ীর সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিয়া আসিবার জন্ত অনেক করিয়া বারে-বারে তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিল।

থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও বুড়ীর আর থাকা হইল না।

যাইবার সময়ে কনকবরণী বুড়ীকে একটুখানি জল খাওয়াইয়া একখিলি পান হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যা দিদি, ঠাকুরঝির গয়না-টয়নাগুলি ভাল করে'......'

বুড়ী বলিল, 'ওই দ্যাখো, ওই কথাটিই বলি-বলি করেও বলা হচ্ছিল না ভাই, শোনো তবে বলি। বোসো।' বলিয়া বুড়ী তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিতে লাগিল, 'সে-কথা আর বলো কেন, ছেলে ত' নয়—ডাকাত! চোখে ভাল দেখতে পাই না মা,—ওই দ্যাখো, মা বল্‌ছি,—চোখে ভাল দেখতে পাই না দিদি, মনেরও কি আর ঠিক আছে ছাই! চাবীর গোছাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম। তা, ও-ছেলের কাছে কি লুকিয়ে রাখবার জো আছে নাকি? চোখ থেকে চোখের কাজল চুরি করে। চাবী বের করে' 'বাস্‌কো' খুলে' গয়নাগুলি কখন্ যে বের করে' নিয়েছে দিদি, কিছুই বুঝলাম না। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়ে' গেল। দেখি না, ওমা, অত-অত গয়না, তা একটা নাকছবি ফেলে' রাখ্! তাও নেই। টাকাকড়ি-গয়না গাঁটি...... কোথাও কিচ্ছু নেই, পায়ের ক'টা রুপোর আংটি—তাই শুধু ফেলে' রেখেছে। ছেলেটাকে কত মারলাম, কত শাসন করলাম; বললাম, বল্ কাকে দিয়েছিস্ হারামজাদা, বল্, আমি তার কাছে যেমন করে' হোক্ বের করে' নিয়ে আসি। কিন্তুক্......উহুঁ!'

বলিয়া প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বুড়ী বলিল, 'কার বাবার সাধ্যি বলায়। বললে না—কিছুতেই। ......শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি ভাই, বলি, যাক্—থাকলে তোরই থাকতো, গেল ত' তোরই গেল।'

কথাগুলা শুনিয়া কনকবরণী গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'তাহ'লে ত' আমাকেও দেখছি ও-ছেলে... ..'

'হাঁ ভাই, কি আর করবে বল, তোমার লোকজন আছে, একটুখানি চোখে-চোখে......' বলিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

কনক বলিল, 'ও-কথা তুমি ওর মামাকে একবার বলে' যাও দিদি।'

'হাঁ হাঁ' করিয়া হাত নাড়িয়া বুড়ী বলিল, 'থাক্ ভাই, ও তুমিই বোলো। বুড়ো মানুষ......টেরেণ্ না পেলে আবার আঁধারে কোথায় প'ড়ে মরব দিদি......তার চেয়ে......কই বাবা হারু, না কি নাম বললে চাকরটার?'

হারু দাঁড়াইয়াই ছিল। বলিল, 'আসুন।'

স্ত্রীর কথা ভবেশ বিশ্বাস করিল না। হাসিয়া বলিল, 'পাগল! তাই কি হয় নাকি কখনও? ওই অতটুকু ছেলে......বুড়ীর মতলব খারাপ।'

কনকবরণী বলিল, 'হ'তে পারে। কলিকালের ছেলে—কিছু বিশেষ নেই।'

কথাটাকে ভবেশ উড়াইয়া দিল। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্‌গে! বোন্‌টাই যখন গেল! কী আর এমন গয়না ছিল।'

বলিয়া শশীশেখরকে কাছে ডাকিয়া ভবেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,

'মাথায় এত চুল কেন রে বোকা? এত চুল রাখে কখনও? ওগো শুন্‌ছো? মুকুকে ব'লে একটা নাপিত ডাকিয়ে চুলগুলো এর কাটিয়ে দিয়ো ত' ভাল করে'! আর গায়ে বেশ করে' সাবান মাখিয়ে দিয়ো! হ্যাঁগা, দর্জ্জিটা আবার আসবে বলে' গেল, না?'

কনক বলিল, 'কেন? দর্জ্জি কি হবে?'

ভবেশ বলিল, 'আচ্ছা থাক্, বিকেলে আজ ওকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।'

কনক বলিল, 'তাহ'লে অম্‌নি সেন্টু মেন্টুকেও নিয়ে যেয়ো।'

ভবেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যাব।'

শশীশেখর তখনও হেঁটমুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। মামা তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,

'ছি ছি, পা-দুটো অমন কেন হয়েছে রে, এঁ্যা? খুব দুষ্টুমী করে' বেড়াস্, না? জুতো পায়ে দিস্‌নে কেন?'

শশীশেখর কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

ভবেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

মৃদুকণ্ঠে শশীশেখর কহিল, 'জুতো যে নেই।'

ভবেশের কি যে অভ্যাস—ছোট ছেলেপুলে ঘরে থাকিলে একা বসিয়া কিছুতেই সে খাইতে পারে না। সেন্টু মেন্টু দুই শ্যালককে দুই পাশে বসাইয়া খাওয়ায়।

স্ত্রী বলে, 'আহা, ওদের আমি দিচ্ছি, তুমি খাও না বাপু! ওদেরই খাওয়াচ্ছ ত', নিজে খাবে কখন্?'

ভবেশ বলে, 'খাচ্ছি। খাচ্ছি। আমার সঙ্গে খেতে ওরা ভালবাসে।'

এবার আবার আর-একজন বাড়িয়াছে—শশীশেখর।

শশীশেখরের লজ্জা করে। সহজে সে কিছুতেই বসিতে চায় না। ভবেশ শেষে বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া একেবারে কোলের কাছে বসাইয়া বলে, 'খা।'

খাইতে বসিয়া শশীশেখরের বিপদের আর সীমা থাকে না। এত আদর-যত্ন তাহার কেমন যেন অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। মাকে তাহার মনে পড়িয়া যায়। হেঁটমুখে খাইতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার অকারণেই জলে ভরিয়া আসে। একটি বারের জন্যও সে মাথা তুলিতে পারে না। অথচ কাপড়ের বদলে হাফ্-প্যাণ্ট্ পরা। কোঁচার খুঁটে কোনও একটা ছুতা করিয়াও যে চোখ মুছিয়া মাথা তুলিবে তাহারও উপায় নাই।

এম্‌নি প্রায় প্রতিদিন।

কিন্তু ইহা আর এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার কিছু নয়, যাহার জন্য কনকবরণীর রাগ হইতে পারে।

অথচ রাগ তাহার হয়।

ভবেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতেই দিন তাহার ভালই চলে। তবু একটা কাজকর্ম্ম না করিলে ভাল দেখায় না বলিয়াই বোধকরি যা-হোক্ কিছু করে। হাতের কাছেই আদালত। মোক্তারীটাও পাশ করা আছে। কাজেই কালোরঙের সাম্‌লা পরিয়া ভবেশ রোজ আদালতে যায়, আবার যখন-খুশী ফিরিয়াও আসে।

ভবেশ সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়াই দেখে, বৌএর মুখ ভারী, ভাল করিয়া কথা কয় না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, কথা কও না যে?'

কনকবরণী মুখ ফিরাইয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল, আধ ঘণ্টা খানেক্ তাহার আর দেখা নাই।

শশীশেখরের নূতন পোষাক আসিয়াছে। পোষাকে তেমন বৈচিত্র্য কিছু নাই, রঙিন খদ্দরের হাফ্-প্যাণ্ট্ এবং তাহারই সার্ট। তবু তাহার সেই ধপ্‌ধপে রঙের উপর লাল-টক্‌টকে' কাপড় এমন সুন্দর মানাইতেছিল, যে ভবেশ সেদিক্ হইতে তাহার আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করছিস্ রে শশী ?'

শশী তখন একাকী জানালার ধারে বসিয়া মা'র সেই রামায়ণখানি পড়িতেছিল। বলিল, 'পড়ছি।'

বলিয়াই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা মামা, কপি মানে বাঁদর, না ?'

ঘাড় নাড়িয়া ভবেশ বলিল, 'হাঁ, ওটা কি বই রে ? তোর পড়বার বই ?'

'না ; রামায়ণ।'

'রামায়ণ ?'—ভবেশের ইচ্ছা করিল, স্ত্রীকে তাহার ডাকিয়া আনিয়া দেখায়—শশীশেখর ওইটুকু ছেলে, রামায়ণ পড়িতেছে এবং কপি মানে যে বাঁদর—তাহাও সে জানে।

হয়ত এই সূত্রে রাগটাও তাহার পড়িয়া যাইতে পারে, ভাবিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল্। সানন্দে খবরটা তাহার স্ত্রীকে দিবার জন্য ঘরের ভিতর গিয়া ডাকিল, 'কই গো ! কোথায় তুমি ?'

সবেমাত্র তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। কনকবরণী আর্শীর সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথার চুল আঁচ্‌ড়াইতেছিল—কথা বলা দূরে থাক্, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

ভবেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিগো, চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছ ?'

কনকবরণী বলিল, 'না। সাঁতার কাটছি। কেন ? কাণা ত' নও, দেখতে পাও না ?'

ভবেশ ত' অবাক্ ! বলিল, 'রাগের কারণটা কি শুনতে পাই না ?'

ঘাড় নাড়িয়া কনক বলিল, 'না।'

ভবেশ বলিল, 'এসো দেখবে এসো।—শশী আমাদের ওইটুকু ত' ছেলে, কি রকম গম্ভীর হয়ে জানালার কাছে বসে' বসে' রামায়ণ পড়ছে দেখে যাও !'

কনকবরণী দপ্ করিয়া যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, 'তুমি দ্যাখগে যাও।'

এমন সময়ে ঝি আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই কথা আর তাহাদের অগ্রসর হইল না—প্রেমালাপে বাধা পড়িল।

রাত্রে ভবেশ খাইতে বসিয়াছে। সেণ্টু মেণ্টুকে আজকাল আর ডাকিতে হয় না। আপনা হইতেই ঝুপ্ করিয়া দু'জন দু'পাশে আসিয়া বসিয়া পড়ে।

ভবেশ ডাকিল, 'শশী !'

বইখানি বন্ধ করিয়া শশী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া মামা যে-ঘরে খাইতে বসিয়াছে সেই ঘরে ঢুকিতে যাইবে,- অন্ধকার বারান্দার উপর পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন সজোরে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টান মারিল। যন্ত্রণায় সে ধীরে-ধীরে 'উঃ' বলিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিল, আব্‌ছা অন্ধকারে তাহার মামীমা দাঁড়াইয়া আছে। মামী যে তাহার চুল ধরিয়া এমন করিয়া টানিতে পারে সে বিশ্বাস তাহার ছিল না। অবাক্ হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সে তাহার মুখের পানে তাকাইতেই, অন্ধকারে ঠিক একটা হুলো বিড়ালের

মত্ত মামীমা তাহার যেন ফোঁস্ করিয়া উঠিল। আবার আর-একবার তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বেশ করিয়া প্রবলবেগে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া অস্ফুটকণ্ঠে কি যে কহিল, কিছুই ভাল বুঝা গেল না। মামীমা তাহাকে আর বুঝিবার অবসরও দিল না—ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রান্নাঘরের উনানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'বোস্ এইখানে। পিণ্ডি দিচ্ছি খেতে,—দাঁড়া! যেই ডেকেছে আর অমনি একেবারে......এঁঃ! ছেলের সোয়াগ্ রাখবার আর জায়গা নেই রে! খবরদার বল্ছি—খাবার সময় আর যাস্নে ওপানে—চোর, বদ্মাস্, পাজি কোথকার!' বলিতে বলিতে রান্নাঘরের ভিতর হইতে কলাই-করা একটা থালার উপর খানকতক শুকনো রুটি ও একটুখানি তরকারি আনিয়া তাহার সুমুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, 'এইখানে খা বসে' বসে'—আমি আস্ছি। এই কথা মামাকে গিয়ে লাগিয়েছিস্ যদি শুনতে পাই ত' খুন করে' ফেল্‌ব।'

বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয় বোধকরি ভবেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভবেশ আবার ডাকিল, 'শশী!'

কনকবরণী তখন হাঁপাইতেছে। বলিল, 'রোসো, শশী শশী করে' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লে যে? শশীর ক্ষিদে পেয়েছিল, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। তুমি খাও।'

ভবেশ একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'সে কি! এই ত' দেখে এলাম সে পড়্‌ছে!'

কনকবরণীর মুখ ভারী হইয়া উঠিল। বলিল, 'বিশ্বাস হ'লো না বুঝি? হ্যাঁ, তা' কেন হবে? আমি কে, যে—আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে!'

ভবেশের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া সে হাঁ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

ক্রমশ—



যুগব্রত

— ১ —

এম্-এ পরীক্ষা দিয়া ভবতোষ খান কয়েক রেলওয়ে টাইম-টেবিল হাঁটকাইয়া কিছুদিন ঘুরিয়া আসার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। বর্ষার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থাকিয়া থাকিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিতেছে। সার্সীর ভিতর দিয়া বর্ষণধারার দৃশ্য তাহার চক্ষে পড়িতেছিল। পড়ার ঝোঁকে সে কতদিন জগতের অন্য কিছু দেখে নাই। আজ এই বাদ্‌লার দিনটা একটা বন্ধুর মতই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। পুস্তক অধ্যয়নের ন্যায় সে একবার আকাশের দিকে, আর একবার শূন্যে জল-বর্ষণের ধুঁয়াটে রূপের দিকে চাহিয়া নূতন কিছু পাওয়া ও জানার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। টাইম্ টেবিলের পাতাগুলি অতর্কিতে উল্টাইয়া যাওয়াই সার হইল, মনের বাহিরে যে জিনিষটা এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল, সে যেন সুযোগ বুঝিয়া তাহার সব-খানিকে এই দিনেই ঘিরিয়া ধরিল।

ছেলেবেলায় পল্লী-প্রাঙ্গনে যাহাদের সহিত সে খেলা করিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি একে একে জাগিল, ডুবিল; তাহার মধ্যে ধরিয়া রাখার বস্তু কিছু ছিল না—তবে সে কত হাসি, কত খেলা, কত কৌতূহল! প্রতিদিন প্রভাতে যে প্রাণের সাড়ায় সে পাগল হইয়া অস্থিরচিত্তে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত, গায়ে জামা পরাইয়া জননী বোতামগুলি আঁটিয়া দিতে সময় পাইতেন না, দুধের বাটি নিঃশেষে পান করার অবসর থাকিত না, ছুটিয়া বাহির হইতে পারিলেই যেন সে কৃতার্থ হইত; শ্রীশ, ননী, মন্মথ, যামিনী—তারা বোধহয় এতক্ষণ জামগাছের মোটা গোলঞ্চ লতার দোলনায় কত না দুলিয়া লইল; পিটুলী ফলে নয়-চূড়া রথটা তৈরী করিয়া বুঝি এতক্ষণ হরিগোপাল তাহার উপর একটা ছোট রাঙা নিশান গুঁজিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে; সে উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু জননীর দুই একটা চড় চাপড় খাইয়া বাধ্য হইয়াই সংযত থাকিতে হয়। দুধের শেষ গ্রাথা চলে না, সন্দেশের সবখানি উদরস্থ না হইলে ছাড়ান নাই, চিবাইয়া খাইলেও দেরী হইয়া যায়, আস্তে গিলিয়া ছুট্ ছুট্, একেবারে ঘোষালদের বাগানে গিয়া তবে সোয়াস্তি—সে কি দিন না গিয়াছে!

মনে পড়িল—প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাহার দুঃখের কথা। নিঝুম পল্লীকুঞ্জে ভোরের পাখী কি মধুর স্বরে না গাহিত, আকাশে মাথা তুলিয়া যে নারিকেল গাছটা তাহাদের উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তার বুকে চড়িয়া অসংখ্য বিচিত্র বর্ণের পাখী ঠোকর মারিয়া গর্ত্ত খুঁড়িত, কাঠবিড়ালী দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিত না ভোজন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, তাহা বুঝা যাইত না। আর এখানে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে কলের জল পড়ার ছর্ ছর্ শব্দ, রাস্তায় ফেরীওয়ালার কণ্ঠে কর্কশ

হাক ; বেলা বাড়ে, তবুও রৌদ্র দর্শন হয় না ; কুণ্ডলী পাকাইয়া দূষিত বাষ্প দম বন্ধ করিয়া দেয়। শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাণে প্রাণে সজীবতার সাড়া পাওয়া যাইত, তাহার অভাব বেশ সে অনুভব করিত এবং এই কারণেই সহরে শয্যা-ত্যাগের সময়টা পাশ-মোড়া দিতে দিতে তাহার যে ঢের দেরী হইয়া যায়, ইহাও অনুভব করিত ; কিন্তু ক্রমে ইহাই স্বভাবে দাঁড়াইয়া গেল। আজ যেদিন আটটায় বিছানা ছাড়িয়া উঠে, সেদিন মনে হয় বুঝি আধ ঘণ্টা আগেই ঘুম ভাঙ্গিল—অভ্যাসে মানুষ এমনই বিচিত্র হইয়া উঠে!

কলিকাতায় ভবতোষের রাত্রি দিন হইয়াছে; কলেজ না থাকিলে দিবসের আলো তাহার চক্ষেই পড়িত না। রাত্রি-জাগরণে তাহার ক্লান্তি নাই; সুদীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলি অতিক্রম করিতে তার আদি গড়নটী পর্য্যন্ত বদ্লাইয়া গিয়াছে ; এ চেহারা বাল্যের পরিণত মূর্ত্তি নয়, শিক্ষার প্রভাব তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে। তাহার চুল তো এমন কোঁকড়ান ছিল না। মাথার কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বটে ; কিন্তু এমন বাহার করিয়া ছাঁটার গুণেই ইহা আজ এত সুন্দর—চোখে লাগার বস্তু হইয়াছে। পাথর-চাপা ঘাসের মত তাহার শরীরের রঙ্ সুন্দর ; কিন্তু তাহা রৌদ্র বাতাসের ভর সহে না। মাসের অর্দ্ধেকদিন রুমালে ইউকেলিপ্টাস্ লইয়া ঘ্রাণ লইতে হয় ; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বাড়াবাড়ি হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও তেমন নাই ; কিন্তু সোণার চশমাখানি রাত্রিদিন নাকের উপর লাগিয়া থাকায় সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সম্মান যেন বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ভবতোষ সেদিন ও আজিকার জীবনের কথা লইয়া আপন মনেই তুলনা করিল; কিন্তু জলের ঢেউয়ের মত মনেই উঠিল, মনেই লয় পাইল। শুধু এক প্রকারের চিন্তা নয়, জ্ঞান হওয়ার পর হইতে এই তেইশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত যত ঘটনা, আজ সব বর্ণে বর্ণে ছবির মত তাহার চিত্তে আঁকিয়া উঠে, আবার মুছিয়া যায় ; কিন্তু তার বিভোর দৃষ্টি ছিল বাহিরের দিকে। ঝাপ্সা আকাশের তলায় ঝাপ্সা শূন্যে রজতধারার মত বৃষ্টি ঝরিতেছিল।

পশ্চাতে জুতার শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ফিরিয়া দেখিল, গোকুলচন্দ্র—তাহার সহধ্যায়ী। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আরে এমন দুঃসময়ে পথে বাহির হ'লে কেমন ক'রে হে ? ধন্য তোমায় !"

গোকুল মাথা হইতে বৃষ্টির জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "ভবতোষ, আজ আমি তোমার শরণাপন্ন, আমার একটা বিশেষ উপকার করতে হবে।"

ভবতোষ হাঁ করিয়াই বলিল, "ব্যাপার কি ? একটা কাণ্ড না বাধিয়ে যে এসেছ তা' বোধ হয় না ; তবে এবার শর্ম্মারাম আর পিকেটিং'এ যাচ্ছে না ! বাপ্ প্রাণ যায়, পথে পথে ঘোরা, আর পুলিশের লাঠী খাওয়া—এ ভাই তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে, আমার ধাতে ওসব নেই।"

ভবতোষ একদিন সখ করিয়া গোকুলের সঙ্গে বড়বাজারে পিকেটিং'এ গিয়াছিল ; সেদিন সহরের অনেক গণ্যমান্য লোকের অন্তঃপুরমহিলারা এই কাজে যোগ দিয়াছিল। কাজটা তার মন্দ লাগে নাই, কিন্তু পথের ভিড় ঠেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, তাহার উপর পুলিশের তাড়া খাওয়া—এই কাজটা যে কেবল তাহার পক্ষেই অশোভন মনে হইয়াছিল তাহা নহে, হুজুগে ঘরের মেয়েদের এইরূপ বাহির হওয়া খুবই নিন্দনীয় বলিয়াই সে বোধ করিয়াছিল। গোকুলের সহিত তাহার এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কাতর্কি হয়, কিন্তু এইসব তর্কের মীমাংসা নাই—দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া

দু'জনেই নীরব হইত। আজ গোকুলের ভাব দেখিয়া, পাছে এইরূপ একটা প্রস্তাব সে করিয়া বসে, তাহার অন্ত পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ কথা উত্থাপন করিল।

গোকুল বলিল—"ভবতোষ, এসব কাজ তোমার নয়। কিন্তু বন্ধুর একটা অনুরোধ তোমায় পালন করতে হবে, এই উপকার আমি জীবনে ভুলবো না।"

ভবতোষ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"আরে কথাটা কি বল না, আমার সাধ্যে যদি কুলায় তোমার কাজে আমি আছি। কিন্তু ভাই ঐ কাজটায় আমায় রেহাই দিও, নেহাৎ বেয়াড়া কর্ম্ম!"

গোকুল বলিল—"দেখ, দেশে আজ যে আন্দোলন সুরু হয়েছে, তার ভিতর ভগবানের হাত আমি স্পষ্টই দেখ্‌ছি। ছোটখাটো কাজে আর অন্তর তৃপ্ত নয়, একটা বড় কাজে লেগে যেতে চাই, তাই তোমার সাহায্য চাইছি।"

ভবতোষ তাহার হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল, "গোকুল! এ-সব পাগ্‌লামী ছাড়। বিধবা মায়ের তুমি একমাত্র সন্তান, মায়ের মনঃক্ষুণ্ণ করো না, তাঁর কত আশা—বল দেখি!"

গোকুল—"মা আমার তেমন নয়, ছেলে তাঁর বীর হোক, দশ জনের এক জন হোক্, দেশের কাজে মাথা তুলে দাঁড়াক, এ ইচ্ছা খুবই পোষণ করেন। সে সব কথা থাক। আমি মেদিনীপুর যাব, সেখানে যে তুমুল আন্দোলন চলেছে, তাতে যোগ না দিলে যেন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করা হয়। মা রাজী হয়েছেন, বাসায় আর তো কেউ নেই; আমি যে ক'দিন না ফিরি, তাঁদের দেখো।"

ভবতোষ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার মা ঝাঁ ক'রে রাজী হলেন? এসব ভূতুড়ে কাজ নয়? নুন জ্বাল দিতে যাবে, লাঠীর ঘায়ে মাথাটা যাবে, নয় তো কয়েক মাস শ্রীঘর বাস অবধারিত। তোমার মা এসব না জেনেই তোমার কথায় সায় দিয়েছেন। বৃষ্টি থামুক, আমি তোমার মায়ের কাছে যাচ্ছি!"

গোকুল ভবতোষের কথা কানেই লইল না। বলিল—"গাড়ীর বেশী দেরী নেই, আমি বেরিয়েই পড়েছি। তুমি যত শীঘ্র পার মায়ের কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রো, নলিনীকে একটু বুঝিও।"

গোকুল আর বিলম্ব করিল না। ঘর হইতে বাহির হইয়া, নীচে একটা লেদার-ব্যাগ রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহা লইয়া লম্ফ দিয়া চলন্ত ট্রামে গিয়া আরোহণ করিল। ভবতোষ অবাক্ হইয়া গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল। গোকুল হাত জোড় করিয়া মিনতি জ্ঞাপন করিল।

— ২ —

"আপনি এত বেলায় উঠেন কেন?"

ভবতোষ লজ্জা পাইল। হাসিয়া বলিল, "দেখ নলিনী, একেবারে চেপে ধরলে মারা যাব—আগে চরকাটা দোরস্ত করি, তারপর এক প্রহর রাত থাকতে উঠার চেষ্টা করা যাবে।"

নলিনী বলিল—"কৈ চরকাই বা কাটেন কৈ!"

ভবতোষ—"সে কি, রোজ যে কি কসরৎ করি, সে দিকে তো নজর নেই—সূতা বেরুতে চায় না, করি কি! আচ্ছা, আর একবার আমায় দেখিয়ে দাও তো, দেখি যদি সুবিধা করতে পারি!"

নলিনী ভবতোষের সম্মুখে বসিয়া এক মনে চরকা কাটিতে বসিয়া গেল; ভবতোষের সূতার দিকে দৃষ্টি ছিল না; সে দেখিতেছিল, কাল কাল

চক্ষু ছুটী কেমন একাগ্র হইয়া টেকো-সংলগ্ন লম্বমান সূতার দিকে স্থির রহিয়াছে; তাহার ললাটে, ওষ্ঠে কে যেন গোলাপী পাউডার মাখাইয়া দিয়াছে; সদ্যস্নাত মাথার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—এই সৌন্দর্য্যের হাটে সে দিশেহারা, তাহার চরকা কাটার প্রচেষ্টা এই অপূর্ব্ব রূপ-সম্ভোগের মূল্যদান মাত্র। নলিনী হঠাৎ চাহিয়া দৃষ্টি আবার সূতার দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "কৈ, শিখ্‌ছেন না তো!"

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। তাহার হাত অবিরাম চলিতেছিল।

ভবতোষ হঠাৎতাহার অর্দ্ধোত্তোলিত বাম হাতখানি ধরিয়া বলিল—"কি যে বাজে কাজে সময় দিতে তোমার দাদা শিখিয়েছে, আমি যদি তার এক বিন্দু বুঝ্‌তে পারি! বেশ খেলা বটে, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাটা এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জিনিষটাকে এত বড় ক'রে দেখার আদৌ প্রয়োজন নেই। থামো, তার চেয়ে আলাপ করি এসো—সারাদিনই ব্যস্ত, আমার কথার জবাব দেবার সময় নেই!"

নলিনী ভবতোষের দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা তো আপনি! সূতার খেই কোথায় হারিয়ে গেল, আবার খুঁজে বার কর্‌তে দু'দণ্ড সময় যাক্—ছাড়ুন হাত!"

ভবতোষ নলিনীর কব্জী জোর করিয়া ধরিল এবং একটু টান দিতেই সে তাহার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। এত কাছে এমন করিয়া সে তাহাকে কোনদিন পায় নাই, আজ তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না; কথায়, ভাবে, ইঙ্গিতে সে যে ভরসা পাইয়াছিল, তাহাই আজিকার কাজে যথেষ্ট ছিল। নলিনীর ফুল্ল অধরে ভবতোষের অধর সংযুক্ত হইল; সেই সময়ে হঠাৎ গোকুলের মাতাঠাকুরাণী কি কাজে আসিয়া পড়িলেন; দু'জনের চক্ষুই সবিস্ময়ে দেখিল—এই প্রৌঢ়া রমণীর তীব্র দৃষ্টি, কুঞ্চিত ললাট তাহাদের কার্য্যে ধিক্কার দিতেছে!

— ৩ —

খবরের কাগজে গোকুলের ছবি বাহির হইল। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাহার



এই প্রৌঢ়া রমণীর তীব্র দৃষ্টি, কুঞ্চিত ললাট তাহাদের কার্য্যে ধিক্কার দিতেছে!

ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। ভবতোষ খবর পাইয়া মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু এ সংবাদ গোকুলের মাতাঠাকুরাণীকে দেওয়ার সুযোগ ছিল না। গোকুলের পরামর্শে তাহার মাতা ও অনূঢ়া ভগ্নী ভবতোষের বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিল। ভবতোষের যত্নের ত্রুটি ছিল না; সে গোকুলের ন্যায় তাহার মাতাকে শ্রদ্ধা করিত, সোদরার অধিক নলিনীকে স্নেহ করিত; দুই ভাই ভগ্নীতে মিলিয়া তর্কাতর্কি করিত, গোকুলের জননী হাসিয়া

বলিতেন, "তোদের ঝগড়ার দায়ে আমায় পালাতে হবে দেখছি!" ঝগড়া আর কিছুর জন্ত নয়—ভবতোষ বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোয়, তাহা যে কত দোষের নলিনী তাহা সপ্রমাণ করিতে চায়; ভবতোষ খাদির চেয়ে মিলের কাপড় ব্যবহার করার অধিক পক্ষপাতী, ইহার স্বপক্ষে তার যুক্তি অকাট্য, কিন্তু নলিনী তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই কহে। ভবতোষ ধর্ম্ম মানে না, ভগবান মানে না, নলিনী কপালে চক্ষু তুলিয়া ভবতোষকে জোর করিয়াই এই সব স্বীকার করাইতে চায়। ভবতোষ প্রতিপদেই হারিয়া বসে, নলিনীর মতই অনুসরণ করিবে বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই ঘটিয়া উঠে না। ইহা লইয়াও তর্ক বড় কম হয় না। গোকুলের মাতা ইহাদের এই প্রকার তর্ক-যুদ্ধ অতিশয় আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেন। কিন্তু এই তর্কাতর্কির অন্তরালে তরুণ তরুণীর ভিতর এমন স্বভাবের খেলা প্রশ্রয় পাইতে পারে, এ ধারণা তিনি করেন নাই। গোকুলের অসংযত চরিত্রের জন্য তাঁর অধিক দুঃখ হয় নাই, তিনি কন্যার তরল প্রকৃতি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ভবতোষ মুখ তুলিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। গোকুলের জননী কন্যাকে লইয়া সেইদিনই কলিকাতার বাসা ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার অপেক্ষা গ্রামে গিয়া বাস করাই তাঁহার শ্রেয়ঃ বোধ হইল। ভবতোষ এই অবধি ইহাদের কোন সংবাদ রাখে নাই—আজ গোকুলের কারাদণ্ডের খবর পাইয়া মনে হইল, এ সংবাদ তাঁহারা পাইলে বড়ই উদ্বিগ্ন হইবেন। এই সময়ে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, কিন্তু কোন্ মুখে সে গোকুলের মাতার নিকট গিয়া দাঁড়াইবে।

ভবতোষ লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিচার করিয়া সে নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। নলিনী একান্ত বালিকা নয়, সে যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে, ইহা বুঝিয়াই তাহাকে কাছে টানিয়া একান্ত অসহায়ের ন্যায় এক কাজ করিয়া বসিয়াছে; তাহার জন্য এমন কিছু কঠোর প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাহা না করিলে সে হেয় হইয়া রহিবে; নলিনীর দিক্ দিয়াও কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—ইহা তাহাদের ভাগ্য বলিতে হইবে।

ভবতোষ নিজের দিক্‌টা একান্ত বাড়াইয়া দেখিল না। তাহার সঠিক অবস্থার দিক্ চুল-চেরা বিচারে নলিনীর পক্ষে কোনমতে হেয় বলিয়া বোধ হইল না; বরং তাহার ভাগ্যে ইহাপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ সম্ভব হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। নলিনীকে সে ভালবাসিয়াছে। অল্পবুদ্ধি গোকুলের জননী ইহাতে বিমুখ হইলে, তিনি নলিনীর ক্ষতিই করিবেন; কিন্তু ইহা কোন মতেই সে সহ্য করিবে না। ছয়মাস কাল গোকুলের প্রতীক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু ইহারমধ্যে নলিনীর কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা তাহার কর্ত্তব্য। সে গোকুলের বন্দী-সংবাদ দিতে গোকুলের পল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিল।

— ৪ —

"চরকা নিশ্চয় বন্ধ আছে!"

ভবতোষ কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পায় না।

"বেলা নয়টার কম নিশ্চয় ঘুম ছেড়ে উঠেন না!"

ভবতোষ অপ্রস্তুতের ভাব প্রদর্শন করিল।

"বেশভূষা সবই মিলের, এক রত্তি খাদি নেই, —আপনার দিকে চাইতেও কষ্ট হয়!"

ভবতোষের এক আতঙ্ক অকারণ হইয়াছিল; কিন্তু যাহা সে ভাবে নাই, সেইখানেই ঠেকা খাইল।

নলিনী ঘৃণা না করুক, তাহার বিরক্তি প্রাণে আঘাত দিল। ভবতোষ চারি দিক্ চাহিয়া নলিনীর হাত ধরিতে গেল, নলিনী দু' হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, স্পষ্ট তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি আমার একটী কথাও রাখেন নি, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

কথা শেলের মত হৃদয়ে আঘাত দিল। ভবতোষ বলিল—"নলিনী, তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌বো না, ঐ সব কাজ তোমার দাদার, আমার নয়; তুমি আমায় আমার মত ক'রে দেখ, আমায় দুঃখ দিও না।"

নলিনী বলিল—"বা রে, বেশ মজা তো! দেশ অত্যাচারে নির্য্যাতনে ভেঙ্গে পড়ে, আপনি আপনার ভাবে সহরের অট্টালিকায় তোয়াজ ক'রে ব'সে থাক্‌বেন, গরীবের রক্ত চুষে দেশে যারা ধনী লোক তাদের বাক্স ভরাতে আপনি মিলের কাপড় ব্যবহার করবেন, দেশের সমাজ, ধর্ম্ম-বিশ্বাস অস্বীকার ক'রবেন—বেশ তো আপনি, এ সব খুব স্বার্থপরের কথা!"

কথা শুনিয়া ভবতোষের ব্রহ্মতালু জলিয়া গেল; কিন্তু নলিনীর দিকে চাহিয়া তাহা নীরবে সহিয়া বলিল—"ঐ সব দিয়ে আমায় বিচার ক'রো না নলিনী, আদৎ মানুষটাকে নিয়ে বিচার কর। পার্টির হুজুগ আজ আছে, কাল থাক্‌বে না; রাজাশাসন-নীতি আজ কঠোর অবিচার ব'লে মনে হয়, দু'দিন পরে এই সব চিন্তার প্রয়োজন হবে না; দেশের সহজ অবস্থা আবার ফির্‌বে—গোকুল ফিরে এলে দেখো, আমার কথাই সত্য হবে। আসলে নলিনী, আমাদের হৃদয় নিয়ে কথা। আমি তোমায় ভুল্‌তে পারি না; তোমার হৃদয়ের যে স্পর্শ, যে আস্বাদ পেয়েছি, তাতে তোমার পরিচয় আমার কাছে বিশেষ অস্পষ্ট নয়। এইখান থেকেই আমার প্রতি তোমার ব্যবহার আশা করি।"

নলিনী কথার উত্তর দিল না। ভবতোষের মনে হইল, সে ঠিক যায়গায় আঘাত দিয়াছে, উৎসাহের সহিত বলিল—"আমি মা বাপের কথা ঠেলে রেখেছি, তোমায় পাওয়ার আকুলতা আমায় পাগল করেছে, তোমায় এই হৃদয়ের রাণী ক'রে আমি ধন্য হবো, সার্থক হবো। আমার সকল ভার যে দিন তোমার হাতে তুলে দেব, সে দিন তুমিই হবে আমার কর্ত্রী, সেখানে তোমার সবখানিই যে আমার জীবন ছেয়ে দেবে; তাই এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি আর আমাদের ভাল দেখায় না, অনর্থক আমাদের মধুর সম্বন্ধ তিক্ত হ'য়ে উঠে, দু'জনে দু'জনকে আঘাত দিয়ে বসি—আমার কথা বুঝ্‌ছ তো!"

নলিনী হাসিয়া বলিল—"এক বর্ণ না!"

ভবতোষ আকাশ হইতে পড়িল।

সে তীব্র দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে চাহিয়া অনুভব করিল, কি যেন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কলিকাতার বাসায় নলিনীর মুখশ্রীতে যে মাধুর্য্য কমনীয়তা ছিল, তাহা যেন লোপ পাইয়াছে। নলিনী সুন্দরী। তাহার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি মর্ম্মভেদ করে, তাহার চিবুকে ওষ্ঠে লালিমা প্রকাশ হয়, কিন্তু কোথা হইতে কঠোরতার প্রলেপ পড়িয়া সব যেন কঠিন প্রস্তরের মত অচঞ্চল প্রাণহীন করিয়াছে। নলিনীকে লইয়া আর যেন আমোদ কৌতুক করা চলে না, সে আর খেলার বস্তু নয়, আত্ম-বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বে সে আজ গৌরবময়ী। ভবতোষ এতক্ষণ ইহা লক্ষ্য করে নাই। সে গোকুলের পল্লীগৃহে আসিয়া ভাবিয়াছিল, নলিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পথে তাহার জননী খুবই বাধা হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অন্যথা হওয়ায়,

সে এই সুযোগে নলিনীর সহিত সম্পর্কটা যাহাতে পাকা হইয়া উঠে, সেই দিকেই কথার স্রোতঃ ফিরাইয়া ধরিয়াছিল। নলিনীর হাসির সহিত যে কয়েকটা কথা তাহার কানে গিয়া পৌছিল, তাহা তীক্ষ্ণ কর্কশ না হইলেও কেমন যেন বুকে ছুঁচ বিঁধাইয়া দেয়। দৃষ্টির বিনিময়ে কিশোর কিশোরীর অন্তরে যে পরিচয়ের মধুবর্ষণ হয়, বাক্যালাপে তাহা ঘনীভূত হইয়া উভয়কে বিভোর করে; নয়ন দেয় সঙ্কেত, আলাপে বন্ধন দৃঢ় হয়। নলিনী এখন যেন সবই বিপরীত দেখিল। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া একটু কড়া করিয়াই বলিল, "না বুঝ্‌বার কি আছে, নলিনী!"

নলিনী বুঝিল—ভবতোষ বিরক্ত হইয়াছে। তাহার মুখে হাসির ঘটা দেখা দিল—নয়নের কোণে এক ঝলক বিদ্যুৎবৃষ্টি হইয়া গেল, কণ্ঠে সুধা-স্রোতঃ উগারিয়া বলিল, "আমার কথায় যে আপনি আঘাত অনুভব করেন আগে তা বুঝি নাই—কত কথা ব'লেছি, আমার অপরাধ নেবেন না।"

ভবতোষের ধারণা উল্টাইয়া গেল। বিনা ঝড়ে, আকাশে সঞ্চিত জমাট মেঘ এক মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া চন্দ্রমার উদয় হইল। ভবতোষ দেখিল, নলিনীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই; ধৈর্য্যহীন হৃদয় পদে পদে ভুল বুঝিয়া নাকাল হয়। সে হাসিয়া বলিল, "আঘাত দিলে তো বাঁচি, তুমি যে এড়িয়ে এড়িয়ে আমায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোল আজ আর ছাড়্‌ছি না, কথার উত্তর দিবে বল!"

নলিনী নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ভবতোষের দিকে চাহিল, হাসিয়াই বলিল—"কি কথা?"

ভবতোষ দুই পা আগাইয়া নলিনীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিবার জন্য খুবই ব্যস্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে বিশেষ সতর্ক হইয়া আরও একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ভবতোষের একবার মনে হইল, তাহার পূর্ব্ব ধারণা মিথ্যা নহে; কিন্তু নলিনীর দিকে চাহিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। এ প্রেমের চাতুরী ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সে তাই হাসিয়া বলিল—"নলিনী, আমি তোমায় এই হৃদয়খানা দিয়ে পেতে চাই, বোধহয় অযোগ্য বোধে বাতিল হবো না!"

নলিনী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই কথা! কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি—আপনার কাণ্ড দেখে।"

ভবতোষের মুখে অর্দ্ধেকটা কালি লেপিয়া



ভবতোষ পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিতেছিল, নলিনী বলিল, "ভুল বুঝ্‌বেন না, আমার মুখের কথা আমারই, অন্যের নয়।"

গেল, আশায় নৈরাশ্যে বলিল—"কাণ্ড আবার কি দেখ্‌লে!"

নলিনী বলিল—"মনে রাখ্‌বেন দাদা জেলে—কেবল আমার অগ্রজের কথা নয়, দেশের কত ভাই, কত ভগ্নী আজ মৃত্যুপণে মুক্তির সন্ধানে ছুটেছে; দেশের নেতা যাঁরা তাঁরা বন্দী, মরণ আলিঙ্গনে অমৃতপথের যাত্রী—আর আপনি আজ একটা তুচ্ছ নারীর মোহে আত্মহারা! পুরুষের পক্ষে হয়তো

কিছু নয়, কিন্তু নারী আজ এই ঘটনা খুবই আশ্চর্য্য ব'লে মনে করে।"

ভবতোষ মাথা নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইল, তারপর বলিল, "নলিনী, এ কথা তোমার কণ্ঠ দিয়ে বাহির হ'লো বটে; কিন্তু আমি গ্রহণ ক'রতে পারলুম না—এ তোমার অন্তরের কথা নয়। তোমার মাকে সান্ত্বনা দিও, গোকুল ফিরলে শেষ কথা হবে।"

ভবতোষ পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিতেছিল, নলিনী বলিল—"ভুল বুঝবেন না, আমার মুখের কথা আমারই, অন্যের নয়।" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভবতোষের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে মুখ বিকৃত করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

— ৫ —

দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল।

"গোকুল! আমায় একা অপরাধী ক'রো না। নলিনী আজ অন্য কথা বলছে; আমি নিশ্চয় বলছি, এ কথা তার নিজের নয়, তোমার মায়ের মনই নলিনীর মুখ দিয়ে বাহির হচ্ছে। আমার দুঃখ কি—নলিনীর মত সুন্দরী সংসারে দুষ্প্রাপ্য নয়, তবে তোমাদের সঙ্গে সৌহৃদ্য-সূত্র দৃঢ় করার আকুলতায় আমি ধৈর্য্যহীন হয়েছি, তার জন্য ক্ষমা ক'রো।"

গোকুল জেল হইতে বাহির হইয়া জগৎটাকে একটু নূতন করিয়া দেখিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু এই ছয় মাসে কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্যে পড়িল না। তার অকৃত্রিম বন্ধু ভবতোষ পর্য্যন্ত সেই আছে; বরং তাহার যে নির্ম্মল, স্বচ্ছ, হাস্য-কৌতুকোজ্জ্বল হৃদয়খানি ছিল, তাহা ছায়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নলিনীকে সহোদরার মত রক্ষা না করিয়া সে যে অপরাধী হইয়াছে, তাহার জন্য সে কোন ক্ষোভই প্রকাশ করিল না; বরং গোকুলের জননী ও ভগ্নীকে সে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য দুই কথা বলে। এই ছয় মাসের ভিতর দেশের আবহাওয়ার বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন হয় নাই। আন্দোলন চলিয়াছে; কিন্তু এক মহাত্মা যদি বন্দী না হইতেন, এই আন্দোলনে তাঁর আত্মদান যদি না হইত, তবে ত্রিশকোটী নরনারীপূর্ণ ভারতে পঞ্চাশ ষাট হাজার লোকের কারাবন্ধন কোন সাড়াই তুলিত না। সে ভাল করিয়াই বুঝিল—এ সংগ্রাম দেশের নয়, জাতির নয়, মুক্তির নয়; এ সংগ্রাম মহাত্মার আদর্শবাদ ও ধর্ম্মমতের সহিত পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড সংঘাত। ভারতের স্বাধীনতা এখনও সুদূরপরাহত। আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে আজ যে বিরোধ, অশান্তি, ইহা সিদ্ধ হইলে জাতি দাঁড়াইবার ঠাঁই পাইবে, পা রাখিবার ভিত্তি পাইবে। কিন্তু এই আদর্শ কেবলই পাশ্চাত্যজাতির বিরোধিতার সম্মুখে দাঁড়াইবার মত শক্ত হইলেই চলিবে না, দেশের লোকও ইহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের সঙ্গে, স্বজাতির সঙ্গে অচিরে গুরুতর সংঘাতসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া সে বিচলিত হইয়াছিল।

বাহিরে তেমনি কেরাণীকুল ফুটপথে হাঁটিয়া প্রতিদিন অফিস যায়, স্কুলে কলেজে ছাত্রের ভীড় ক্রমেই বাড়ে, তেমনই ট্রাম, ট্যাক্সী, বাস্, ছ্যাকড়া গাড়ী ছুটাছুটি করে, বড়বাজারে পিকেটিং হয়, খবরের কাগজে অহিংস-সংগ্রামের বিবরণ বাহির হয়—কিছু বাদ যায় না, কিন্তু প্রাণ কোথা!

বিশেষ জেলে বসিয়া সে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা নৈরাশ্যের কথা। দলাদলি করার উৎসাহ থাকিলে সে আসল অবস্থা উপেক্ষা করিতে

পারিত, কিন্তু সে কোন দলের নয় ; তাই বন্দীগণের মধ্যে যে আন্দোলন আলোচনা সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বিরোধটা প্রতিপক্ষের সহিত অধিক কি নিজ দেশবাসীদের মধ্যে অধিক, এই লইয়া তাহার সংশয় বাড়িয়াছে। খবরের কাগজে নেতৃবিশেষের গৌরব দিতে বড় বড় অক্ষরে যে সব কথা বাহির হয়, তাহার সবখানি মিথ্যা না হইলেও খুবই বাড়াবাড়ি। ইহা ব্যতীত দেশে অনেক বড় বড় কাজ হয়, সে সকল কাজের সন্ধান দেশ পাইলে আশা পায়, কিন্তু তাহা প্রকাশ করা হয় না। দেশের সংবাদপত্র আজ আর দেশের নয়, জাতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল নয়—নেতৃবিশেষের সুনাম বজায় রাখার মুখপত্র। দেশের কাজ, দেশের মুক্তি এই অবস্থায় আসন্ন কেমন করিয়া বলা যায়! তা' ছাড়া বাহিরে যাহা চক্ষুলজ্জার খাতিরে, লোকমতের ভয়ে ঢাকা দিয়া চলিতে হয়, জেলে তাহার বালাই নাই। দলাদলির কদর্য্য আন্দোলন অবাধেই চলে। কেহ মহাত্মার মুণ্ডপাত করে। কেহ বা তাঁহাকে সমর্থন করিতে গিয়া যাহা নয় তাহা গালি দিয়া বসে। অন্য দেশের অবস্থা কিরূপ সে জানে না, তবে বাংলায় খাঁটি সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যে অঙ্গুলীসঙ্কেতে গণিয়া শেষ করা যায়, ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল।

দেশের স্বাধীনতাস্পৃহার অপেক্ষা নেতৃত্ব করার আকাঙ্ক্ষা যেন অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে। দলাদলির বিসদৃশ আচরণের মধ্যে নেতৃত্বের মর্য্যাদারক্ষার দায়ই অধিক দেখা যায়। গোকুল যে আশায় দেশ-যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া সে উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বাড়ী আসিয়া তার ভগ্ন বুক জুড়িয়া গেল। যে উৎসাহের আগুন নিভিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা দ্বিগুণ জলিয়া উঠিল। তাহার জননীই এ ইন্ধন যোগাইলেন ; গোকুলের মনে যে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল।

যে জাতির মধ্যে এমন মা জন্মিয়াছেন, সে জাতির বন্ধন-গ্রন্থী আর দীর্ঘদিন দৃঢ় থাকিতে পারে না। জাতির মুক্তি আসন্ন—বাহিরের দিক্ দিয়া নহে, জাতির অন্তঃপুরে আগুন ধরিয়াছে। দেশে যে আজ নারী জাতি এই আন্দোলন রক্ষা করিতে উদ্যত, তাহার নিগূঢ় কারণ, মাকে দেখিয়া মায়ের কথা শুনিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছিল।

মায়ের মুখেই সে তাঁহার কলিকাতা পরিত্যাগের কারণ জানিয়াছিল। ভবতোষের অসংযত আচরণ তাহার প্রাণে আঘাত দিয়াছিল; সে ইহার প্রতীকারের উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। ভবতোষের হাতে ভগ্নীকে সম্প্রদান করিয়া আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মনস্থ করিয়াছিল ; কিন্তু জননী যখন বলিলেন—"ভবতোষ! নলিনী মানুষ, জড় বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উন্নত ; এক মুহূর্ত্তের স্পর্শে সে উচ্ছিষ্ট ভোজ্যের মত পরিত্যক্ত হবে না ; তোদের লক্ষ্যসিদ্ধির পথে দেশের মা বোনকে যদি ঘর ছেড়ে বেরুতে হয়, এর চেয়ে বড় আঘাত পেতে হবে, সে আঘাত বড় ক'রে ধর্‌লে চলবে না, উপেক্ষা ক'রেই এগুতে হবে। নলিনী কি জানে—মাতৃ-স্তন্যের ক্ষীরে কি বীর্য্য, কি স্পর্দ্ধা আছে! তা' মা'ই ছেলে মেয়ে দুজনকে জানিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে। নলিনী অবোধ শিশু; চিত্ত তার কলুষিত নয়। সংসারে দশজনের মত ঘর সংসারের ভিতর দিয়ে তাকে যদি দাঁড়াবার পথ দেখান যায়, তবে সে ব্যর্থ হবে, এ যুগের ধর্ম্মে তাকে পাবে না—তাই সেও থাক্‌বে তোর মত অনাঘ্রাত কুসুম। এমন অসংখ্য নারীপুরুষ দলে দলে কাতারে

কান্তারে মুক্তির পথে যে দিন ছুটবে, সেদিন তোদের পায়ের বাঁধন খ'সে পড়বে।"

গোকুল মাকে দলাদলি আত্ম-বিরোধের বীভৎস ঘটনার কথা বলিয়াছিল; কিন্তু মা তাহা বিশেষ করিয়া লওয়ার বস্তু মনে করিলেন না, বলিলেন—"ঐ বিরোধ বড় কাজে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে, জাতি-বিরোধের আগুন কি ভীষণ, তোরা তা জানিস্ না! আজ বিধবার পেছনে তোরা দুই ভাই বোন ছাড়া আর কেউ নেই, কিম্বা তোদের পেছনে এই অনাথা আছে, আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, তার কারণ ঘরাঘরি বিরোধ; এই বিরোধের শাস্তি ঘটলে বৃহৎ কার্য্য সিদ্ধ হবে তা' নয়, গোকুল—বৃহতের ক্ষেত্রে গিয়ে সবাই যদি দাঁড়ায়, তবেই সঙ্কীর্ণতা থেকে জাতি মুক্তি পাবে। আজিকার এই বিবাদ মৃত্যুর পূর্ব্বে দীপ-শিখার ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় ক্ষণিক শেষ হওয়ার তাগিদেই ফুটে উঠেছে, উহার জন্য দুঃখ করার কিছু নাই।"

কাজের মানুষের অভাবের কথা শুনিয়া মা কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—"গোকুল, দলে প'ড়ে যে মানুষ ছুটে চলে, তার মত পশু আর দুটী নেই; নিজের বুকের জোরে এগিয়ে যাবে, যে পথে পা দিয়েছ আর ফিরো না; মায়ের গৌরব যদি রাখ, আঘাতে অবসাদে মুখ ফেরাবে না। তোমার পেছনে নলিনী দাঁড়াবে—দুজনে যদি ভেঙ্গে পড়, আমি আছি—আমাদের আত্ম-তর্পণ সিদ্ধ হ'লে, তর্পণের ধূম প'ড়ে যাবে। আজ দল ভারী ক'রে কাজের কথা নয়, আজ আত্মদানের যুগ। যেখানে সাহস, যেখানে সততা, যেখানে মনুষ্যত্ব, সেইখানেই আজ আত্মদানের মহাযজ্ঞ আরম্ভ ক'রে দাও। সকল উৎসাহ, সকল আশা—আপনাকে দেওয়ার স্পর্দ্ধায় জাগাতে হবে, তবেই তোমরা সিদ্ধ হবে, সার্থক হবে। অন্যের দিকে চেয়ে বুকে বল সঞ্চয় করার বালাই থাকবে না।"

জেল হইতে ফিরিয়া মায়ের মুখে বিদ্যুদ্বাণী শ্রবণ করিয়া, তার আর এক মুহূর্ত্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু ভবতোষের পত্র পাইয়া সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। কথায় কথায় ভবতোষ গোকুলের সৌভাগ্যের দিক্‌টা দেখাইয়া, সে তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে চাহিল। গোকুল নীরবেই উঠিয়া আসিতেছিল, কিন্তু একটা জবাব না দিয়া সে থাকিতে পারিল না, বলিল—'ভবতোষ! আমরা যে জননীর স্তন্যধারায় মানুষ, তাহাতে গৌরব আমাদের দারিদ্র্যে, সৌভাগ্য দুঃখবরণে। আমার তোমার কাছে সহোদরার ন্যায় স্নেহ পাবে, আশ্রয় পাবেই ভেবেছিলাম; তুমি তার অন্যথা করায় বিশ্বাসের মূলেই ঘা দিয়েছ। মা তোমায় সে অপরাধের দণ্ড-স্বরূপ আশীর্ব্বাদই জানিয়েছেন—তুমি সুখী হও, তাঁর সন্তান আজ দেশ ও জাতির দায়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী।"

গোকুল উঠিয়া পড়িল। ভবতোষ আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল—"ছোঃ!"

— ৬ —

আজ বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাপ্রতিপদ। কাল পূর্ণিমায় মায়ের উপদেশে গ্রামের কয়েকজন তরুণ ও তরুণী উপবাস করিয়া সংযম রক্ষা করিয়াছে; ভোর হইতেই তাহারা নদীতে স্নান সারিয়া মায়ের জন্য তাহারা শ্রদ্ধাসন বিছাইয়া দিয়াছেন। মা শুচি-স্নাত একখানি শুভ্র বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া সন্তানের মাঝে বসিয়া আছেন। প্রাতর্বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে; নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছে।

গোকুল বলিল—"মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের এই সংহতি যেন অটুট হয়, আমাদের হৃদয় যেন এক হয়, অব্যাভিচারী হয়।"

মা হাসিয়া বলিল—"তুই এক রঙ্গ কর্‌লি, গোকুল; আমার আশীর্ব্বাদে তোদের জয় হবে, তোদের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। জগতের যত রস, যত আনন্দ, সব যেন এই জাতিকে জাগিয়ে তোলার কাজেই লাভ হয়,তাঁজা প্রাণ যেন অন্য দিকে ঝুঁকে না পড়ে।"

একে একে সকলেই মায়ের চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। নলিনী মায়ের মুখের দিকে চহিয়া বলিল—"মা, আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

মা মেয়েকে বুকে লইয়া বলিলেন—"পুরুষের পাশে পাশে থেকো, কটাক্ষের আগুনে তাদের পুড়িয়ে ছাই ক'রো না, অমৃতবর্ষণে তাদের সান্ত্বনা দিও, বরদাত্রী রূপে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রো। এই মহা-তপস্যা জাতি যদি পালন করে, তবে মুক্তি এ জাতির আসন্ন—নলিনী।"

প্রাঙ্গনে ভবতোষের গলা পাওয়া গেল। তাহার পশ্চাতে রেশমীসাড়ীপরিহিতা নববধূ। সৌন্দর্য্যে বাড়ী পূর্ণ হইল। ভবতোষ নলিনীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল—"বউ দেখাতে এনেছি—অমিয়, মাকে প্রণাম কর।"

নলিনী ভবতোষের চরণে প্রণাম করিয়া বউয়ের হাত ধরিয়া বলিল—"দাদা, বৌকে আজ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেবো, তুমিও আজ থেকে আমাদের সঙ্গী।"



ভবতোষ নলিনীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,
"বউ দেখাতে এনেছি"

অমিয়া নলিনীর পাশে দাঁড়াইল। ভবতোষ দেখিল, নলিনীর চক্ষে যে আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, তাহা সে সহ্য করিতে পারে না। সে চক্ষু মুদিত করিল।



প্রবাহ

স্পেনে যুগান্তর—

পৃথিবীর আর এক রাজার মাথা হইতে মুকুট খসিয়া পড়িল। ১৮৮৪ খৃঃ বুরবন-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় আলফন্সো যখন স্পেনের সিংহাসন শূন্য করিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার বিধবা রাণী মেরিয়া ক্রিষ্টিনা একমাত্র শিশু কন্যার অভিভাবিকা রূপে রাজদণ্ড চালনা করিতে থাকেন; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাস পরেই তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাত শিশুকে তৎক্ষণাৎ স্পেনের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অষ্টম বর্ষ বয়স হইতেই ইনি সৈনিকজীবনের শিক্ষারম্ভ করেন। তিনি স্পেনের ভাষা ছাড়া ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন ও ১৬ বৎসর বয়সেই মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে রাজকার্য্যে দীক্ষিত হন। পর বৎসর তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর কাল তিনি স্পেনের সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া রাজ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া সংগ্রহ করেন ও তাঁহার সদয় বিনম্র ব্যবহারে সকলেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। এই সময়েই প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে "Rey Simpatics" অর্থাৎ "সাদাসিধা রাজা" এই উপাধি প্রদান করেন। স্পেনের ন্যায় ষড়যন্ত্রবহুল দেশেও তিনি ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার জন্য কোনও যত্ন লইতেন না। তিনি বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন ও স্পেনে বহু নূতন ভাব ও আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ক্রীড়া-কৌতুকও তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন এবং শীকার, অশ্বারোহণ, পোলো, অসিবিদ্যা, টেনিস এবং সর্ব্বোপরি মটরচালনায় তিনি বেশ সুপটু। সারা ইউরোপে তাঁহার তুল্য উৎকৃষ্ট লক্ষ্যভেদকারীও খুব অল্পই আছেন। ১৯০৬ খৃঃ রাজা আলফন্সো



গণতন্ত্র স্পেনের প্রথম রাষ্ট্রপতি সীনর আলকোলা জামোরা

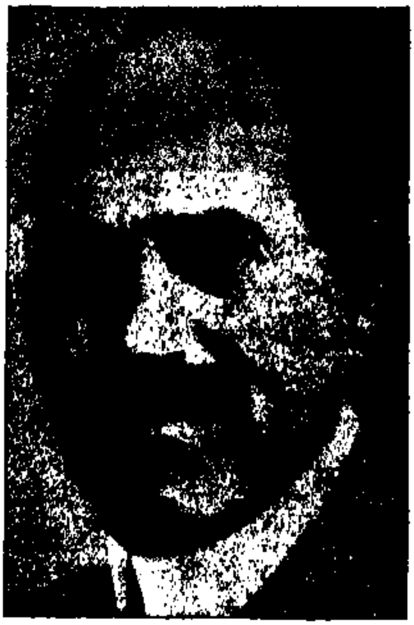
ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্রী ইউজিনীকে (বা এনাকে) বিবাহ করেন। অশান্তি-সৃষ্টিকারীরা বিবাহের শোভাযাত্রাকালে বোমা নিক্ষেপ করিয়া উৎসবের আনন্দভঙ্গ করিলেও, রাজদম্পতি অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

ইউরোপের মহাযুদ্ধ হইতে স্পেনকে দূরে রাখিলেও, মরোক্কোনীতি লইয়া যে ঘোরতর অশান্তিসৃষ্টি হয়, তাহার ফলে বার্সিলোনায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিশেষ মরক্কোর রীফজাতি দুর্দ্ধর্ষ স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি। এই রীফ-নেতা আব্‌দুল করিমের অসমসাহসিক স্বাধীনতা-সমর আজ মুক্তি-সংগ্রামেতিহাসের অমর-কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। মরক্কোর সমরচালনায় স্পেনের অজস্র অর্থ ও রক্তব্যয় হয়। শুনা যায়, প্রায় ২০,০০০ স্পেনীয়কে আফ্রিকার মরুভূমিতে এইজন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতে হইয়াছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন নবীন-যুগের প্রতিনিধি সীনার ফেরারকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়, তখন হইতে রাজা আলফন্সোর বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের তুফান উঠিতে আরম্ভ করে। আলফন্সো নিজে সুশিক্ষিত হইলেও, রাজকীয় আভিজাত্য-রক্ষায় দেশের মুক্ত চিন্তাস্রোতঃ ও শিক্ষাস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে দেন নাই। তারপর প্রিমো ডি রিভেরার অভ্যুত্থান। ইনি রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া ক্রমে ক্রমে সামন্ত শাসন-নীতি করায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন ও স্পেনের অবিসম্বাদিত ডিক্টেটর পদ অধিকার করিলেন। রিভেরা সামরিক নেতা—তাঁহার ছয় বৎসরব্যাপী শাসনকালে অবশ্য স্পেন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও, সে শাসনের কঠিন নাগপাশে দেশের মন দিন দিন প্রপীড়িত হইতেছিল। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে, এই অশান্তি তলে তলে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে এমন নিদারুণ হইয়া উঠিল, যে ডিক্টেটর রিভেরা অবশেষে পদ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। রিভেরার পতনে জেনারেল বেরেঙ্গোয়ার নূতন ডিক্টেটর হইলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইঁহারও পতন হইল। বিপ্লব আন্দোলন এইবার খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া রাজা আলফন্সোর সিংহাসন ভাসাইল—স্পেনে নূতন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। এই গণ-তন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কারামুক্ত নেতা সীনর আলকোলা জামোরা।

আজ স্পেন রাজতন্ত্র হইতে মুক্তি পাইয়াছে; মুক্তির জয়যাত্রায় স্পেনের নরনারী এইবার অনাহত পদক্ষেপে অগ্রসর হউক—ইহাই প্রার্থনা।

ভারতের জয়—

মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব্ব রণনীতি সত্যই বিশ্বের পরাধীন মানবজাতির প্রাণে নূতন আশা ও আন্দোলন সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা এক নূতন আলো দেখিয়াছে। তাই আরবের



নাহাস-পাশা

মরুক্ষেত্রেও মহাত্মার অনুসরণে অহিংসা-মন্ত্রের জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। আরবের প্রপীড়িত প্রজা অত্যাচারের প্রতিকার এই পথেই অন্বেষণ করিতে উদ্যত।

ইজিপ্টেও সুপবন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বিদেশীয় পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন প্রখর বেগে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াফ্‌ড রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ মিশরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ইংরাজের হস্তক্ষেপ নিবারণ ও শাসন-তন্ত্রে জাতীয় প্রতিনিধিগণের কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতীয় আন্দোলনের আদর্শে এই আন্দোলন পরিচালন করিতেছেন। স্বয়ং ওয়াফ্‌ডনেতা নাহাস পাশা মহাত্মাজীর ত্যাগমন্ত্র হৃদয়ে ধরিয়া পাশ্চাত্য-সভ্যতার জয়চিহ্ন স্বরূপ "কলার" ও "নেক্‌টাই" অঙ্গ হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন ও সম্পূর্ণ জাতীয় বেশ পরিধান করিতেই মনঃস্থ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার ইচ্ছা—তিনি একদল উলঙ্গ দরবেশ সেনার সৃষ্টি করিবেন, যাহারা প্রাচ্য ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সমগ্র দেশে নব উন্মাদনা সৃষ্টি করিবে ও বৈদেশিক পণ্যের বিরুদ্ধে অপুর্ব্ব জেহাদ ঘোষণা করিবে। ইজিপ্তের সাআদ পাশা উন্নতির সূর্য্য পশ্চিমমুখী হইয়াই দেখিতে চাহিয়াছিলেন—আজ জাতীয় নেতা নাহাসের শুভ প্রেরণায় ভারতেরই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ইজিপ্তের নূতন জাতি আবার পূর্ব্বমুখে প্রাচ্যসূর্য্যোদয় প্রত্যক্ষ করিবে—ইহা কত বড় আশা ও গৌরবের কথা, তাহা ভারতের তরুণ কি অবধারণ করিবে না?

নারীর মুক্তি ও তুর্কের প্রগতি—

মাদাম হানুম—ভূতপূর্ব্ব তুর্ক-সুলতান আবদুল হামিদের অন্তঃপুরবাসিনী অসংখ্য রাণীর অন্যতমা ছিলেন। তুর্কের রাষ্ট্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে আমূল জীবনবিপ্লব সম্ভব হইয়াছে, তাহারই অবধারিত পরিণতি—বন্দিনী নারী-আত্মার মুক্তি। মাদাম হানুম একণে নব্য তুর্কের সাধারণ ব্যবস্থাপক সভায় তুর্ক-নারীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রূপে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা জাতির জীবনপরিবর্ত্তনের সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

রাষ্ট্রপতি কামাল পাশা এই পরিবর্ত্তনের মূল। রাজশক্তি হাতে পাইলে সমাজজীবনে কত বড় মহাবিপ্লব কত অল্প আয়াসে সম্ভব হয়, তাহা কামাল করিয়া দেখাইয়াছেন। যেদিন তুর্ক-পুরুষের মাথার তাজ—সনাতন ফেজ অপসৃত হইয়া,



মাদাম নৈমী সানি হানুম

ইউরোপীয় হ্যাট্ তাহার স্থান গ্রহণ করিল, তুর্কের নারীশক্তিও পর মুহূর্ত্তে অবগুণ্ঠন খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, সসম্ভ্রমে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জাতির সকল কর্ত্তব্যভার মাথায় লইলেন। আজ সাহিত্যে, চিকিৎসায়, আদালতে, সমাজসেবায় ও রাষ্ট্রকার্য্যে সর্ব্বত্র নারী যোগ্যবেশে স্বীয় অধিকার অর্জ্জন করিয়া যুগসাধনার জয় দিয়াছেন। তুর্কের ধর্ম্ম আজ কারামুক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তুর্ক-জাতি

ধর্ম্মহীন হয় নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর ধর্ম্মের যে যাদুকরী মায়াপ্রভাব জাতির চিত্ত মোহ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই দূর হইয়াছে; তাই মুক্ত হৃদয়ে জাতি যাহা বরণ করিয়া লইবে, তাহা প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের নিদান হইবে।

এই কল্যাণের মূলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বরূপ-পরিচয় চাই। শিক্ষা সাধনার আলোকেই মানব-হৃদয়ে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ হয়। নারী ও পুরুষ এই স্বরূপের সাধনায় বিভোর হইলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিগড় চরণ হইতে অবহেলে খসিয়া পড়ে। মুক্তির ইহাই অবধারিত লক্ষণ। কামালের রাষ্ট্র-সাধনায় এই স্বরূপ-দৃষ্টি কতখানি তাহা আজিও সুনির্ণীত হইবার দিন আসে নাই—প্রাচ্য জাতি তাহার স্ব-ভাব ও স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাব, ভাষা, কর্ম্ম ও জীবনে যুগের দান বরণ করিয়া লইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আত্মহারা হইলেই প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কামাল ৯ বৎসর তুর্কের নব রাষ্ট্রীয় তন্ত্রে একাধিপত্যের পর, আজ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহার কিছু কিছু আভাষ সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। ইহা প্রতিক্রিয়া কিম্বা নূতন জয়ের লক্ষণ স্বরূপ শেষ অন্তরায় অপসারণ করিয়া তুর্কের জীবন-প্রগতি চিরদিনের জন্ম বাধামুক্ত করিবে, তাহা দেখিবার জন্ম আমরা প্রতীক্ষানেত্রে চাহিয়া রহিয়াছি। নবীন তুর্ক যেমন স্বাধীন, তেমনি স্বরূপনিষ্ঠ হউক—ইহাই প্রার্থনা।

ঊষার স্বপন

[শেখ ইস্‌মাইল হোসেন]

মুঞ্জরিছে কুসুম কলি গুঞ্জরিছে অলি,
রক্ত রাঙা নবীন ঊষায় খেল্‌ছে রবি হোলি;
যুঁই, চামেলী, ঘোমটা তুলি মিটিমিটি চায়,
মলয় বায় চামর বুলায় পারুল রাণীর গায়।
কোকিল বধুর কুহু স্বরে,
আমের মুকুল পড়্‌ছে ঝরে;
ভোরের শিশির তৃণদলে ঝলক দিয়ে যায়।

প্রেম বিধুর নও কিশোরীর অলস অবশ কায়,
এলিয়ে দিছে রাতের শেষে ফুলের বিছানায়;
স্বপন সখি লুকচুরি খেল্‌ছে সইয়ের সনে,
ফুটিয়ে তুল্‌ছে মধুর হাসি বধূয়ার অধর কোণে।
শিথিল বেণী পড়্‌ছে হেলি,
খসিয়ে পড়্‌লো টগর বেলী;
"বউ কথা কও" কুটুমপাখী ডাক্‌ছে আপন মনে।

* * *



[আশ্রমী লিখিত]

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া-উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী

উৎসবের বোধন ও প্রভাতফেরী

গত ৮ই বৈশাখ পুণ্য তিথিতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবের যথারীতি উদ্বোধন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ ৪ ঘটিকায় সঙ্ঘের সমস্ত নারী পুরুষ "যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে" সম্মিলিত হইয়া মহিমাময়ী মহাশক্তির ধ্যান ও আবাহন করেন। অতঃপর, সঙ্ঘ-দেবতা যুগ-বাণী হৃদয়ে প্রকাশ করিলে, প্রাতরুপাসনার পর সঙ্ঘসেবক ও প্রবর্ত্তক-বিদ্যার্থি-ভবনের ছাত্রবৃন্দ প্রভাতফেরীর মিছিল বাহির ও নামসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পুরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন। তাঁহাদের কণ্ঠে ভৈরব চৌতালে এই সুগম্ভীর যুগপ্রভাতী সারা পল্লীময় যে পবিত্র আব্‌হাওয়ার সঞ্চার করে তাহা সত্যই অভাবনীয়। এই প্রভাতফেরীর ব্যবস্থা উৎসবের প্রত্যেক দিবসেই নির্দ্ধারিত থাকে।

এই দিন বেলার ১১টায় বাংলার অন্যতম মনীষি শিরোমণি ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সঙ্ঘে শুভাগমন করেন। মধ্যাহ্নে আশ্রমে যাপন করিয়া, বেলা ৫টায় তিনি উৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়া সমস্ত উৎসবমণ্ডপটী মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করেন।

মেলা ও প্রদর্শনী

বিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই সারি সারি শিল্পকক্ষ ও পণ্যবিপণির শ্রেণী দুই দিকে নজরে পড়ে। ভারতের খাদি-শিল্প ও অন্যান্য স্বদেশী শিল্পের এই বিচিত্র সমাবেশ দেখিলে সত্যই হৃদয় আনন্দপ্লুত হয়।

মেলার একদিকে প্রদর্শিত হইয়াছে—"ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য।" মূর্ত্তি ও লিপি যোগে একে একে তেরটী দৃশ্যে দেখান হইয়াছে (১) কেমন করিয়া ক্ষত্রিয় গৃৎসমদ হইতে গুণভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল (২) ব্রাহ্মণের বাক্যে ক্ষত্রিয় বীতহব্য কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (৩) বৈশ্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজা নাভাগের দুই পুত্র কি ভাবে ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষা লইয়াছিলেন (৪) শূদ্র কবষ কিরূপে চরিত্রোৎকর্ষে ব্রাহ্মণের পদ-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন (৫) অনার্য্য-বংশীয় শুনঃসেফের কিরূপে ঋষিত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছিল (৬) তার পর, এই উদার হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইলে, লোকরঞ্জনার্থে পরম কারুণিক রামচন্দ্রকেও তপস্বী শূদ্রককে হত্যা করিয়া মহুর নিষ্ঠুর বিধান পালন করিতে হয় (৭) তত্রাপি ভীষ্মের অপার্থিব চরিত্রবল অস্বীকারে অসমর্থ হইয়া কেমন করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র হিন্দুজাতি তাঁহার প্রতি গৌরবপ্রদর্শনার্থে আজও শ্রদ্ধাঞ্জলী তর্পণ করে (৮) শুদ্ধিযজ্ঞে রাজপুত

জাতির অভ্যুদয় (৯) যবন সেনাপতি ডিয়া-পুত্র হেলিওডোরার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা ও ভারতে গরুড়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা (১০) বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ্যের লোপ (১১) পুনঃ হিন্দু-সমুত্থানে সমাজে অস্পৃশ্য জাতির উৎপত্তি (১২) পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের আচণ্ডাল পতিতোদ্ধার ও শুদ্ধির বিধান এবং (১৩) আধুনিক যুগে আবার যে সুবাতাস বহিতেছে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানের হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ ও মৌলভী আক্রাম খাঁর ভ্রাতার সহিত হিন্দু ব্রাহ্মণ-কন্যার শুভ পরিণয়সম্বন্ধ—এইগুলি চমৎকার শিক্ষাপূর্ণ করিয়া সমাজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

অন্যদিকে, "যন্ত্রযুগের পরিণাম" বা সরল পল্লীজীবনে আধুনিক সভ্যতার অনুপ্রবেশে যে জীবনধ্বংসকারী সর্ব্বনাশের সূচনা হইয়াছে, তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিচিত্র "মোনা বাগ্দী" নামে একটী পল্লী-কাহিনী মূর্ত্তি ও লিপির সাহায্যে বিবৃত করিয়া বিষয়টীকে সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে স্বদেশীযুগের রোমাঞ্চকর ইতিহাস ও গত ১৯৩০ সালের ধর্ম্মযুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে যে নব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই আনুপূর্ব্বিক ভাব ও কাহিনী চিত্র ও বিবরণীর সাহায্যে এমন চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, যাহার পরিচয় স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহার উপর প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু ও যুগনেতা মানবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধীর প্রমাণ তৈলচিত্র মনোরম দৃশ্যপটে মন্দিরে জীবন্ত বিগ্রহের ন্যায় বিরাজমান থাকিয়া অসংখ্য নরনারীর প্রাণে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতেছিল তাহাও অনুভবনীয়।

উদ্বোধন-সভা

অতঃপর সুসজ্জিত সভামণ্ডপে উদ্বোধন-সভার অধিবেশন হয়। সভাক্ষেত্রে চন্দননগরবাসী সুহৃন্মণ্ডলী ও গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা ও উপকণ্ঠ হইতেও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হয়। "প্রবর্ত্তক-নারী-মন্দির" কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয়:—

অভিনন্দন-সঙ্গীত

কর্ম্মজ্ঞানের ভক্তি-স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গম ধরিয়া শিরে,
কে আসিলে আজ, ওহে গুণীরাজ!
অবগাহিতে (এই) তীর্থনীরে॥
প্রেমের পূজারী মিলি ভক্তদলে
নূতন ভুবন গড়ি তিলে তিলে,
মুক্তি-তিলক পরাইয়া ভালে
সাজাইব জননীরে।
তুমি যে ভাবুক, ভারত-প্রেমিক,
সুধী, মানী, জ্ঞানী, পরম রসিক,
বাণীর ভবনে কলকণ্ঠ পিক
আশীষ পূজার্থীরে॥

উৎসব-সমিতির পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় সভাপতিবরণ প্রসঙ্গে বলেন:—

"বাংলার ঠাকুর-বংশের ন্যায় সর্ব্বাধিকারী-বংশও প্রতিভার উজ্জ্বল তীর্থক্ষেত্র।.....৺সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এমনই প্রতিভাশালী সুযোগ্য অস্ত্র-চিকিৎসক ও এই কুলের রত্নস্বরূপ ছিলেন। এই বংশেরই অন্যতম কুলপ্রদীপ দেবপ্রসাদকে এই সভার সভাপতিরূপে বরণ করিতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর উচ্চ উপাধি, রাজগৌরব প্রভৃতি বাহ্য পরিচয়ই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়। পরন্তু অন্তরে তিনি একজন খাঁটি বাঙ্গালী ও পরম বৈষ্ণব।"

অনন্তর মেলার পরিচয়দানচ্ছলে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় উৎসবের অন্তর্নিহিত গভীর ভাব ও সঙ্ঘের মর্ম্মকথা প্রেরণাপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বক্তৃতা

মেলার একটা পরিচয় দিতে হবে।"…আমাদের ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইহা নবম বর্ষ। একটা স্বপ্ন, আদর্শ নিয়ে, একটা ভাব প্রবর্ত্তন হয়, জাতির আত্মার উন্নতি ও জাতির মুক্তি দাবী করে। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' বাংলাদেশের ও চন্দননগরের সহানুভূতিতে বর্দ্ধিত; তাঁরা যদি সৌজন্য ও আন্তরিকতা পোষণ না কর্‌তেন, এই প্রতিষ্ঠান দেশে স্থান পেত কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সকলকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আজ যিনি সভানেতৃত্ব কর্‌তে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত, তাঁর পরিচয়—শুধু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor ছিলেন, অথবা ইংরাজের দৌত্যের ভার নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, সে দিক্ দিয়ে তাঁর পরিচয় পাই নি, আমরা তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি—তাঁর হৃদয় খাঁটী বাঙ্গালীর হৃদয়; সে হৃদয়ের পরিচয় আমরা তাঁর ভাষার মধ্য দিয়া, তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করেছি। আপনারা জানেন, সভাপতি মহাশয়ের ন্যায় মনীষী সাধক এটা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন, যে ভাষা যখন প্রকাশ পায়, তার পূর্ব্বে ভাব জমাট রূপ নেয়, সে জমাট ভাবই প্রকাশিত হয়। ভাষার পশ্চাতে ভাব না থাক্‌লে, কর্ম্মের পশ্চাতে সাধনা না থাক্‌লে তার প্রকাশ কখনও পূর্ণাঙ্গ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

বামাচারী ও দক্ষিণাচারী—এই দুই শ্রেণীতে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতি আজ বিভক্ত রয়েছে। বামাচারী উপাসকেরাই মহাত্মাকে কৃষ্ণমাল্যে অভিনন্দিত করেছেন, শ্রীযুক্ত সেন-গুপ্তকে চট্টগ্রামে কৃষ্ণমাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করেছেন। আর দক্ষিণাচারী মহাত্মাজী—তিনি ভারতের দৈবসম্পদ্ সংগ্রহ কর্‌তে চলেছেন। এখানে অস্ত্রবলের কোন কথা নাই, হিংসা বিদ্বেষ লেশমাত্র নাই—দৈবগুণকে আশ্রয় করে' তিনি ভারতকে মুক্তিপথে নিয়ে চলেছেন। তিনি আজ দিগ্বিজয়ী বীর। ভারতের মর্ম্মবাণী তিনি বহন কর্‌ছেন। ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার কথা যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে আস্‌ছে। আজ মহাত্মাও সেই ধর্ম্মরাজ্যই ভারতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন। ইহাই তাঁর জীবনের মিশন। ইহাই ভারতের পরিপূর্ণ আদর্শ। সাধকশ্রেষ্ঠ ভাবুকপ্রবর সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার অন্তরের কথা বুঝ্‌বেন ব'লেই এত কথা বল্‌ছি।

মানুষ যখন অন্তর বাহির সকল সংস্কার ও বাধাকে বিদীর্ণ ক'রে, একটী অজস্র ধারা তার মধ্যে অবতরণ করে, সেই শক্তিই তাকে পরিচালিত করে, সেটা সুষুম্নার পথ, মধ্যপথ—ইহাই ভারতের সাধনার নিদর্শন। উহা ত্যাগও নয়, অহঙ্কারবাসনাসংযুক্ত ভোগ-জীবনও নয়। …আমাদের পশ্চাতে অফুরন্ত সচ্চিদানন্দের প্রবাহ রয়েছে—তাহা খুলে দেওয়ার সঙ্কেত পেলে, সে অফুরন্ত শক্তির সন্ধান আমরা লাভ কর্‌বো। সে শক্তির দ্বার খুলে গিয়ে আমরা সেই শক্তিমানের সঙ্গে যুক্তি পাবো।

বিজ্ঞানের সহিত ভারতের সাধনার খুব মিল আছে। ৫+৫=১০—ইহা যেমন অস্বীকার করা যায় না; সেইরূপ সাধনার সঙ্গে বিজ্ঞান জগতের অকাট্য সম্বন্ধ রয়েছে। সাধনা জিনিষটা অলীক

বা কল্পনা কিছু নয়, খুব সত্য বস্তু। সাধনার মধ্য দিয়াই এই মর্ত্ত্যশরীরকেই দেবশরীরে পরিণত করা যায়—ইহাই ছিল বাংলার মধ্যপথ বা সুষুম্নার পথ। বাঙ্গালী অন্তর থেকে সকল দ্বেষ বিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে, প্রেমধর্ম লাভ করবে, সত্যাগ্রহী হবে। 'সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' —'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—ইহা বাঙ্গালীর সাধনা; বাঙ্গালী মানুষের মধ্যেই ভক্তি প্রেম আরোপ ক'রে জীবনে ঈশ্বরোপলব্ধি করেছিলেন। যে মানুষ ভগবানের সঙ্গে affinity পেয়েছেন, সে মানুষই মানুষ, সেখানে হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, জাতিভেদ নাই।

আমরা চাই—ভাগবত জীবন—I worship life, not hallucination। জীবনকে ভাগবত করাই ছিল বাংলার সাধনা।

আজ ২ লক্ষ সোভিয়েট রাশিয়ানকে শাসন করছে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ একটা আদর্শে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সেটা স্বার্থের ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী যদি অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই ঐক্যবদ্ধ জীবন লাভ করতে পারে, তা' হলে একটী নূতন জাতি গড়ে' তুলতে পারবে; সে জাতির পরস্পরের মধ্যে কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধের সৃষ্টি হবে, তাহা ভাবলে সত্যই আনন্দে হৃদয় ভরে' উঠে। আমাদের বিশ্বাস, এই মধ্যপন্থাকে আশ্রয় ক'রেই জাতি সার্থক হবে; ইহার মধ্য দিয়াই দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আসবে।...

আমরা একটী স্বাবলম্বী জাতি গ'ড়ে তুলতে চাইছি, এবং তার জন্ম বিভিন্ন রকমের cottage industryকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছি।

ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত হিন্দু-জাতি ২৫০৫ রকম জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। দেশেতে আজ 'মেজরিটী', 'মাইনরিটী' সমস্যা উঠেছে; প্রকৃত পক্ষে, হিন্দুজাতিই 'মাইনরিটী'; কারণ অখণ্ড হিন্দুজাতি বলে' তারা একজাতি দাঁড়াতে পারে না, তাদের মধ্যে অস্পৃশ্য নিম্ন-শ্রেণীর বহুজাতি আছে, হিন্দুজাতি বিভক্ত হয়ে শক্তিহীন হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য কর্ম্ম-সৌকর্য্যের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল; ব্রহ্মের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ থেকে শূদ্র ইত্যাদি সৃষ্ট হয়েছিল, ইহা ঠিক নয়—এ ব্যাখ্যা আর দেওয়া চলে না। গীতায় বলেছে—চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং'। গৃৎসমদের পুত্র তাঁহার পরিবারে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তন করেছিলেন, অর্থাৎ ছেলেদের গুণ বিচার ক'রে তদুপযোগী কাহাকেও ব্রাহ্মণের বৃত্তি, কাহাকেও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, কাহাকেও বৈশ্য-বৃত্তি ও কাহাকেও সেবাধর্ম্ম পালন করার ভার অর্পণ করেছিলেন। নাভাগের পুত্রগণের মধ্যেও এরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচলন করেছিলেন। ইহার ভিতর দিয়াই তাঁহারা পরিবারকে উত্তমরূপে গ'ড়ে তুলেছিলেন। যার যা' গুণ তাহা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যকে আর সঙ্কীর্ণ করে' রাখলে চলবে না। মানুষ যে গুণের অধিকারী, তার সে গুণ প্রকাশ যাহাতে হয়, সমাজ সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিবে। মহাত্মা গান্ধী বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের গুণ প্রকাশ পেয়েছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও গুণে ব্রাহ্মণের আসন অধিকারের যোগ্য; সুতরাং কুলগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা না ক'রে গুণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হিন্দু-জাতিকে একটা অখণ্ড জাতিরূপে দাঁড়াতে হবে, সেখানে বংশগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের সঙ্কীর্ণতা ধ'রে রাখলে সেই অখণ্ড জাতি গড়া আমাদের নিকট স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

আর একটা কথা—হয়ত এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গে মতানৈক্য হবে; কিন্তু আমরা পরাধীন জাতি, অলস জাতি—জীবনে সময়ের অপব্যবহার যে কত করি, তাহার হিসাব রাখি না। এই অবসর সময়ে যদি আমরা চরকা ধরি, তাহা হ'লে ভারতের ৬০ কোটী টাকা আমরা নিজের দেশেই রাখ্‌তে পারি। এইটা শক্ত কাজ কিছু নয়, খুব সহজ, এবং আমরা নিজে হাতে সূতা কেটে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির সংস্থান করি। আমার নিজের জীবনেও দেখি, এত বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যেও আমি প্রতিদিন অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় সূতা কাট্‌তে পারি। অনেকের আমার চেয়ে অধিক সময় নিশ্চয়ই আছে, কত সময় হয়ত অপব্যবহার করছি, সেই সময়টুকুর যদি চরকাতে সদ্ব্যবহার করি, তা'হলে নিজেদের পরিবারের বস্ত্র-সমস্যা দূর করতে পারি—ইহা আমাদের ন্যায় দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে কম লাভের কথা নয়। ইহা বিশ্বাসের কথা নয়, আমরা practically করে' দেখেছি, ইহা খুবই সম্ভব।...

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন দেখা করেছিলুম, তিনি বল্লেন, "মতিবাবু, একটা প্রাণের আকুলতা নিয়ে বেঁচে আছি। ১০০০ হাজার মানুষ চাই, যারা পল্লীতে থাকবে, পল্লীতে বসে কাজ করবে।" রবীন্দ্রনাথও কাজ করার জন্য আকুল হয়েছেন—৭০ বৎসরের বৃদ্ধের বুকেও আগুন জ্বলছে। আমাদের অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করে' যেতে হবে, সে কর্ম্ম ভগবানের যজ্ঞ-স্বরূপ হবে। আমরা নিদ্রা যাবো, আহার করবো, তার মধ্যে ভগবানের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকবো। সকল কর্ম্ম, কর্ম্মফল তাঁহাতেই অর্পণ করব।

আপনারা এই প্রদর্শনীর পল্লী-চিত্রে দেখ্‌তে পাবেন—"মোনা বাগ্‌দী"র জীবনের পরিণাম। দারিদ্র্যের কষাঘাতে সে পল্লী-জীবন ছেড়ে কলের মজুরী গ্রহণ করেছিল; সেখানে সে তাহার অর্থ, চরিত্র, জীবন পর্য্যন্ত হারালো। তাই বলছি—তাঁত চরকার দ্বারা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করলে, পরিবারে শান্তি থাকে, ঘরে বসে' অন্নবস্ত্রের সমাধান হয়, বাহিরের কিছু আশ্রয় নিতে হয় না।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিক্‌টা ফুটিয়ে তোলার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু করতে পেরেছি, তা আপনারা সকলে ভাল করে' দেখে বুঝ্‌তে চেষ্টা করবেন। আর এই তের দিন বাংলার অনেক মনীষীই এখানে আসবেন, তাঁদের কাছ থেকেও অনেক শিখ্‌বার, জান্‌বার জিনিষ পাবেন। আমরা যতটা পেরেছি, আমাদের সাধ্যমত দেখাতে চেষ্টা করেছি। চন্দননগরের সুধীবর্গের সাহায্যে এই মেলা ও প্রদর্শনী সার্থক করে' তুলতে পেরেছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্ব্বশেষে, যিনি আজ বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট স্বীকার করে' এই সভার সভাপতিত্ব করতে এসেছেন, তাঁকে চন্দননগরবাসী ও প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।"

সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের বক্তৃতা

মহীয়সী মহিলাবৃন্দ ও মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ!

এই সুদীর্ঘ জীবনের স্মরণীয় দিন অনেক হয়েছে, সম্মান শ্লাঘাও অনেক পেয়েছি; কিন্তু আজ এই প্রবর্ত্তকপ্রতিষ্ঠানে সভানেতৃত্বের পদে আহূত হয়ে যে শ্লাঘা ও গৌরব অনুভব করছি, জীবনের বহু শ্লাঘার সহিত ইহার তুলনা হয় না।

নূতন সেন্সাস রিপোর্টে আমরা দেখ্‌ছি—দেশে লোক অনেক বেড়েছে; লোকের অভাব নাই,

অভাব মানুষের। লোক এত বেড়েছে, যে আমাদের মন্ত্র-দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গীতির কথা-গাথার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—সপ্ত কোটী কণ্ঠে বল্‌লে চলে না, ত্রি-ত্রিংশৎ কোটী কণ্ঠের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

দেশ ও সমাজের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য মানুষ অনেক প্রয়োজন। স্যার জগদীশচন্দ্র আপনাদের মাননীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের নিকট গড়ে' তোলা হাজার মানুষের তলব দিয়েছেন; হয়ত আমাদের জীবনে তাহা দেখা ঘটে উঠ্‌বে না। বাংলায় করিবার কাজ অনেক আছে, শক্তিও অনেক আছে—অভাব কেবল মানুষের মত মানুষের। সে মানুষ পেলে গোখ্‌লের স্মরণীয় কথা আবার সত্য হবে—বাংলা আজ যা ভাবে, করে ও বলে, কাল সমগ্র ভারত তাই ভাব্‌বে, কর্‌বে ও বল্‌বে। এখনও গোখলের চিরস্মরণীয় বাণী মনে পড়ে—"What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow।" মানুষ পেলে একথা আবার সত্য হবে। তাই মানুষ গড়ে' তোলার সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি মাথা হেঁট করি এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠান হতে নিজের শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করি। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' শুধু প্রচারক-সঙ্ঘ নয়, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ—নব ভাব ও কর্ম্ম ধারার প্রবর্ত্তন তার কাজ, তাই তার স্থান এত উচ্চ।

আজ আমি এমন প্রতিষ্ঠানে আহূত হয়েছি, যাঁহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—মানুষ গড়ে তোলা বাংলা দেশে এ শ্রেণীর অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছে; কোথাও কোথাও অল্প বিস্তর সাধু কাজের চেষ্টা চলেছে, কোথাও বা সাধু কাজের নামে অসাধু কাজ হচ্ছে। তবে উপায় নাই, অসাধু বাদ দিয়ে সাধু বেছে নিতে হবে। আবার বাংলায় মানুষ গড়ে' তুল্‌তে হবে। উপাদান উপস্থিত, আর মতিবাবুর মত কারিগর সেই মালমসলায় যারা মানুষ গড়ে' তুলতে পারবেন। নরোত্তম দাসের কথায় বলি—'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনা জনা গো।'

আজ আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করে' বল্‌তে হয়—বাংলার সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার অপ্রাচুর্য্য ছিল না; বহু যুগব্যাপী জাতীয় পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাদের বর্ত্তমানে শাস্তি ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। কবি যোগেন্দ্রনাথ বসুর কথায় বল্‌তে হয়—"হিন্দুর দুর্গতি মূলে, দুর্ম্মতি হিন্দুর"। সে দুর্ম্মতির এখনও শেষ হয় নাই, তাই প্রায়শ্চিত্ত হবে বহুদিনব্যাপী।

প্রদর্শনী উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতির কার্য্যভার লঘু। প্রদর্শনী সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাষ মতিবাবুর সুদীর্ঘ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় আপনারা পেয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে সাধারণ প্রদর্শনীর ন্যায় ইহাতে কোন তামসিক হাস্য-কৌতুক কিছু ব্যাপার নাই। 'যার যেথা ব্যথা, তার সেথা হাত'—একটা মৃতপ্রায় জড় জাতিকে জাগাতে হ'লে যে প্রণালীর প্রয়োজন, প্রদর্শনীর এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বাস্তব চক্ষে তাহা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। দেশের শিল্পের উন্নতি যাতে হয়, যাতে জাতীয় জীবনে তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয়, সে চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য

মতিবাবু ভূমিকায় যে সকল কথা বলেছেন, তাঁহার সকল কথার সঙ্গে একমত হ'তে পারি না। সমাজে যে সকল নিয়ম চলে' আস্‌ছে, তাহার ক্রমোন্নতির প্রয়োজন। দেশবাসীর কুসংস্কার অপনোদন করতে হবে—ক্রমোন্নতি ও আত্ম-বিকাশের মূলসূত্র অনুসারে। সমাজকে সঙ্গে

পিছে এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গে এগুতে হবে। সমাজকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার যো নাই। "গ্রামশুদ্ধ লোক একঘরে একলা একদল"—সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এ নীতির অনুমোদন করা যায় না। দুর্নীতি, কুসংস্কার অনেক এসে পড়েছে, সে সব ক্রমে ক্রমে সরাতে হবে। বাস্তব জগৎ বর্ত্তমানে আমাদের কোথায় নিয়ে ফেলছে, তাহার আলোচনার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ সমাজ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও আদর্শকে রক্ষা করতে হবে, তাকে উন্নত করতে হবে, তার তিরোধানে হিন্দুসমাজের মঙ্গল হবে না এবং হিন্দুসমাজ তাতে সমৃদ্ধও হবে না।

রাশিয়ার বলশেভিকবাদ ভারতের আদর্শ হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়—বহু অভিজ্ঞতার ফলে বহুদিন এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।



অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধনসভার সভাপতি—স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

একটা কথা সারাদিন মনে উদিত হচ্ছে—মন্তিবাবুর এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ও শক্তি স্বরূপা সঙ্ঘমাতা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী অন্তর্হিতা হয়েছেন। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের শক্তিও তদনুপাতে অন্তর্হিত। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাঁহাদের ইহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে, যাতে এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গহীন না হয়, তজ্জন্য প্রাণ মন দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করতে হবে। যে সকল তরুণ তরুণী এই প্রতিষ্ঠানে লিপ্ত রয়েছেন, তাঁহাদিগকে সতত ভগবানের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করে' এই প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার শক্তি লাভ করতে হবে। এই আগুনের ভেল্কী খেলায় প্রতিষ্ঠান সম্যক্ বিজয় লাভ করতে পারে, তার জন্য সম্যক্ সতর্ক দৃষ্টি ও অসাধারণ সংযম সর্ব্বদা প্রয়োজন। ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদ এই দুরূহ কার্য্যের উপর অজস্র বর্ষিত হউক।

একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে—মতিবাবু "ভিক্ষাপাত্রে"র বিরুদ্ধে ; সেইজন্ম এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। স্বাধীন উপজীবিকাই অবলম্বীয়—কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য নানা উপায়ে দীনহীনভাবে' পরিশ্রম করে' অর্থোপার্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতর দিয়াই মানুষ গড়ে তোলারও চেষ্টা চলেছে। এই কথা মনে হবার বিশেষ কারণ—আমি যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Vice-Chancellor ছিলুম, তখন আমাদের এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্র ধ্বংস করার কথা উঠেছিল, তখন বলেছিলুম, এ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। তারপর Naitional Council of Education স্থাপিত হল', উহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও হয়েছিল। সে দিন এই শিক্ষার প্রাণস্বরূপ ছিলেন অক্লান্ত কর্ম্মী পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ। নানা কারণে তিনি সে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের ভাগীরথী-আবাসে শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এই মতিলাল—তজ্জন্য তিনি ফরাসী ও ইংরাজের বিশেষ 'স্নেহের' চক্ষে পড়েছিলেন। এখন হাওয়া ফিরেছে—বিদ্রোহী বলে' যাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হত, তাঁর পন্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। তাহার নিদর্শন এই সকল প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে এমন হয়—শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ পরিবর্ত্তন দেখা গেছে। মধ্যপন্থাই জাতিকে গ্রহণ করতে হবে, সেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে'ই জাতির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মতিবাবু সঙ্ঘের সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "ভিক্ষাপাত্র" হস্তেও পরের দ্বারস্থ হন নাই, নটরাজ বেশ পরিগ্রহ করে'ও সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন নাই। মন্দিরনির্ম্মাণাদি সাময়িক বহুব্যয়সাধ্য ও প্রদর্শনী উপলক্ষে সাধারণ সাহায্য আহ্বান করেন। সাময়িক এই সাহায্য দান বিষয়ে সাধারণের কার্পণ্য অসঙ্গত ও অশোভন হবে। যতদূর বুঝেছি, এ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সমস্ত সম্পত্তি মতিবাবু প্রতিষ্ঠানকে দান করছেন ও চিরদিনের জন্য তাহা প্রতিষ্ঠানের সেবায় অর্পিত হয়েছে। অতএব প্রয়োজনমত সাধারণের নিকট সাহায্যে তাঁহার যথেষ্ট দাবী আছে এবং প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক ব্যাপার সাধারণ চক্ষুর অন্তরাল হওয়া উচিত নহে এবং মতিবাবু নিশ্চয়ই তাহা ইচ্ছা করেন না।

আপনাদের সুযোগ্য মেয়র, প্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় আমাকে নানা বিশেষণে অভিনন্দিতও করেছেন ; চল্‌তি ফরাসী কথায় "hospital-hearted" বল্‌লে অন্যায় হবে না। তাঁহার প্রশংসাবাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ ক'রে আমি মনে করতে বাধ্য, এ সব তাঁর স্নেহগত অত্যুক্তি মাত্র। কিন্তু সুকুমার কুমারীকণ্ঠে আমাকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ত্রিবেণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সম্মান আমাকে করা হয় নাই এবং আমার প্রাপ্যও নহে ; এ সম্মান এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শকে করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সার্থকতার জন্য পুণ্য ত্রিবেণীর জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ধারা যুগপৎ আবার বহাতে হবে। আমার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত উল্লেখ উপলক্ষ মাত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—এই প্রতিষ্ঠান ত্রিধারায় ফুটে দেশকে প্লাবিত, ধন্য করুক। "Work is worship"—'মুখে কর হরি নাম, হাতে কর কাজ,' ইহা বাংলার কথা। বাংলা সে কথা ভুলে গেছে, বাঙ্গালী জাতি পক্ষাঘাতদুষ্ট, ভাগবত পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে।

সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হয়েছে। আর অধিক সময় নাই। আমার অকিঞ্চিৎকর দীর্ঘ-ছন্দ

বক্তৃতায় উপাসনার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করা শোভন হবে না। এই ঘনান্ধকার সন্ধ্যাচ্ছায়ার মধ্য দিয়ে আমি অনতিদূরে দেখ্‌তে পাই—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের তরুণ তপস্বী, ত্যাগী, সংযমী সেবকমণ্ডলীর কার্য্যে ক্রম-সাফল্য ও সার্থকতা সম্পূর্ণ সম্ভব, সঙ্ঘের কয়েকজন তরুণ কর্ম্মীর উচ্চ আদর্শের সংস্পর্শে ও ত্যাগ-শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাদের এক একজন জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—কাহাকে কাহাকেও জ্যোতিষ্কস্বরূপ বলে' বর্ণনা কর্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। এই সকল কর্ম্মীর পূর্ণ শক্তির ব্যবহার সরল ও সাধুপথে হয়ে দেশকে গৌরবের উচ্চশিখরে নিয়ে যেতে বাধ্য। সে আদর্শ তারা যদি অক্ষুণ্ণ রেখে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর্‌তে অবকাশ পান, তা হ'লে বিশ্বমাতার অপার করুণায় দেশ-মাতৃকার সেবায় তাঁরা ধন্য হবেন; তাঁদের কর্ম্মশক্তি এই প্রতিষ্ঠানে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ থাকবে না।

আপনাদের পূর্ব্ব এক প্রদর্শনীতে কবি "দাশুরায়ে"র কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন যে —"জেলার সেরা হুগলী"। রামমোহন রায়, পরমহংস রামকৃষ্ণ, রমাপ্রসাদ রায়, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, রাজকুমার, সুরেশপ্রসাদ, ভূপেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, সারদাচরণ, আশুতোষের সাধের হুগলী জেলা আপনাদের কর্ম্মের কেন্দ্রস্থান। জেলার সেরা হয়েও হুগলীর অনেক অভাব। সে অভাব দূর করা আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য। মতিবাবুর পূর্ব্ব পুরুষ সুদূর রাজপুতনা হতে—হয়ত মানসিংহ, জগৎসিংহের সঙ্গে গড়মান্দারণ অঞ্চলে এসে এই হুগলী জেলাকে তাঁদের বৈষয়িক কর্ম্মের কেন্দ্র করেছিলেন। আজ বিধি-নিয়ন্ত্রণে আপনাদের পেয়ে সেই হুগলী জেলা মতিবাবুর সাধনার চরম কেন্দ্র। কিন্তু শুধু আশ্রমে বসে' সে সাধনার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে না—যান আপনাদের কর্ম্মীদল গ্রামে গ্রামে। রোগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হউন, তবেই সে সাধনার সমগ্র সার্থকতা হবে। কর্ম্মীপ্রবর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এই সভায় উপস্থিত। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষায় তিনি পথপ্রদর্শক হবেন। অক্লান্তকর্ম্মী বাঁশবেড়িয়া রাজবাটীর বংশধর শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রনাথ দেবরায় মহাশয় এই সভায় উপস্থিত। পুস্তকাগার সাহায্যে তিনি সুবিস্তৃত জ্ঞান-বিস্তারের সহায়ক হবেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে ও আপনাদিগকে বল্‌তে চাই—এক নগরে বা এক গ্রামে পুস্তকাগারের কার্য্যক্ষেত্র আবদ্ধ রাখ্‌লে চল্‌বে না, সুদূর পশ্চিম দেশের ন্যায় ছোট ছোট গ্রামে এবং গণ্ডগ্রামে 'চলন্ত" পুস্তকাগার নিয়ে যেতে হবে। গ্রামবাসীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৎসাহিত্যের আদর ও পূজা কর্‌তে শিখাতে হবে। কুমিল্লা জেলায় অভয় আশ্রমে আমি এ শ্রেণীর কার্য্যের আদর্শ দেখেছি; তাঁদের গন্তব্য স্থান ও পথ রাজনীতি ক্ষেত্রে—আপনাদের তা' নয়; আপনারা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও কর্ম্মনীতির আদর্শসংক্রান্ত বাছা বাছা পুস্তক সংগ্রহ ক'রে হুগলী জেলায় সাধু ও অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের প্রবর্ত্তন কর্‌তে পারেন। শুধু হুগলী জেলা নয়, শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ আপনাদের সাধনায় সংক্রামিত হবে।

সভাপতির পদে আহূত হয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নানা দিক্ থেকে দেখে আমার মনে বহু উচ্চ আশার সঞ্চার হয়েছে। এই

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ যে কার্য্যে প্রবর্ত্তক—উদ্যোগী হয়েছেন, তাহা সার্থক হউক। কবির ভাষায় বলি—

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি হিতায় পার্থিবঃ,
সরস্বতী শ্রুতি মহতী ন হীয়তাং।"

***

চট্টল প্রবর্ত্তক আশ্রমে যতীন্দ্রমোহন

গত ১২শে এপ্রিল, রবিবার সকাল ৮টার সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন চট্টল প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আশ্রমে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বিরাট্ আয়োজন করা হইয়াছিল। তোরণদ্বারে গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্রই সঙ্ঘের সভ্য শ্রীযুত পঙ্কজকুমার চৌধুরী তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন এবং ঘন ঘন শঙ্খরব ও বিপুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ও সমবেত ভদ্রমহিলাদের উলু-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রমপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করেন। আশ্রমপরিদর্শনান্তে সভাস্থলে তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে বিদ্যার্থিগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয় ও আবৃত্তি হয়। সঙ্ঘের সভ্য শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী তখন সঙ্ঘের আত্মকথা পাঠ করেন। সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য শ্রীযুত হেমচন্দ্র রক্ষিত খদ্দরে লিখিত অভিনন্দন এবং ধুতি ও চাদর তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপর সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন, "আজ বেশী কথা বলিব না, সঙ্ঘের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্ঘের সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম দেখিয়া এবং তাহাদের আত্ম-কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা পরাধীন হইতে পারি, রাষ্ট্রশাসনে হয়ত আমাদের হাত না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িবার শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের পরাজয় কোথায়? প্রথম পরিচয়েই নিবিড় আত্মীয়তার কথা আজ আমি এখানে ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। তবে এখানকার অধ্যক্ষদিগকে বলিতেছি, যে এই পরিচয়ের নিবিড় আত্মীয়তার নিদর্শন হিসাবে আমি নিজেকে নিমন্ত্রিত করিয়া যাইতেছি। আগামীবার চট্টগ্রাম আসিলে নিজ হইতে আপনাদের কুতুবদিয়া কেন্দ্রে যাইব। এই সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র হইল চন্দননগরে। ২২শে এপ্রিল আমি সেখানে যাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সেখান হইতে আমি সঙ্ঘের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আরও বিশেষ ভাবে জানিবার সুযোগ পাইব।" অতঃপর বিপুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন।



বাংলার স্বাস্থ্য—

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ সংবাদে বাঙ্গালী জাতি শিহরিয়া উঠিয়াছিল; ঐ বৎসর জন্মের তুলনায় বাংলায় হাজার করা ৮'৭ জনের মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছিল; ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হাজার করা ৫'৮ জন বৃদ্ধি হইয়াছে—উহা আশার কথা বৈ কি?

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় জন্মসংখ্যার হার কম—২৯'৩ জন মাত্র। পঞ্জাবের জন্মসংখ্যা সর্ব্বাধিক। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই জন্মসংখ্যার আধিক্য দেখিয়া বাঙ্গালী ও ব্রহ্মবাসীর শরীর ও মনের অবস্থার দিকটা বিচার করিয়া দেখা উচিত। জাতির প্রজনন শক্তির হ্রাস হওয়া অধঃপতনের লক্ষণ; নৈতিক পতনে অনেক সময়ে জাতি নির্ব্বীর্য্য হয়; অবিবাহিত অথবা বিধবার সংখ্যা অধিক হইলেও এইরূপ ঘটিতে পারে। ব্রহ্মদেশের কথা ছাড়িয়া, আমরা বাংলার জন্মসংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ বিচক্ষণদের অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি। বাঙ্গালী জাতিকে সকল দিক দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিতে হইলে মেধা প্রতিভার অনুশীলনের সঙ্গে জাতির মধ্যে প্রজননশক্তিও বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বাংলাদেশে এই বৎসরে ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩১৩ জন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। পুরুষের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৩৪ জন, নারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪২৯ জন; নারী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বাংলায় মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস হইলেও সকল বিভাগের জীবনের লক্ষণ সমান নহে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগে মৃত্যুসংখ্যার হার ছিল হাজার করা ২৫'৪ জন, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ২২' জন, রাজসাহী বিভাগে ২৮'৬ জনের স্থানে ২৬'৪ জন, এবং ঢাকা বিভাগে ২৩'৬ জনের স্থানে ২০'৬ জন হইয়াছে; চট্টগ্রাম ২২'৫ জনের স্থানে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কেবল প্রেসিডেন্সি বিভাগে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২৬'৯ স্থলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭'৫ জন হইয়াছে।

সহরগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা ৭২৩৮১ জন, এবং পল্লীসমূহে ১০২০৯০২ জন। পল্লীর অপেক্ষা সহরের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল বলিয়া মনে হয় না; কেন না, সংখ্যানুপাতে সহরে হাজার করা ২৩'৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে; পল্লী অঞ্চলে হাজার করা ২৩'৫ জন কলিকাতা সহরে হাজার করা ৩০'৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পল্লীতে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসকের অভাব সত্ত্বেও পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল বলিয়াই মনে হয়।

প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা অতিশয় ভয়াবহ হইয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সন্তানপ্রসবের ছয় মাসের মধ্যে ১১৮৫ জন মারা গিয়াছিল; উহা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৯৭৭০ জনে পৌছিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিকে এই দিকে সতর্ক হইতে হইবে।

মরণের গতিরোধ করার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি পালন, রোগের প্রতিকার প্রভৃতির ন্যায় প্রসূতি রক্ষার বিধান ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সুশিক্ষিত ধাত্রীর অভাব খুবই দেখা যায়। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া নারী অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করে; কিন্তু সন্তানপ্রসবকালে যে সেবা ও পরিচর্য্যার অভাব, তাহা পূরণ না হইলে মাতৃজাতির মৃত্যুসংখ্যা যে বাড়িবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়। দেশের সর্ব্বত্র প্রসূতিরক্ষার আয়োজন হউক; এই কার্য্যে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যাহাতে অধিক সচেতন হন, সেই দিকে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেশ-সেবকদেরও এই দিকে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে।

নিখিল বঙ্গ মহিলা-কংগ্রেস—

বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ভারতের নারীজাতি যে ত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নারীজাতিকে আর অবলা বলিয়া ঠেলিয়া রাখা সম্ভব নয়—কলিকাতার মহিলা-কংগ্রেস তাহার নিদর্শন। এই সভায় বাংলার সকল স্থান হইতে তিনশত সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ইহার সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক রাজশক্তি স্বার্থ-পরতন্ত্র হইয়া যেমন বিজিত জাতিকে কোন দিক্ দিয়া মাথা তুলিতে দেয় না, দমন-নীতির নিষ্পেষণে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করে, সেইরূপ অখ্যাতি পুরুষজাতির উপর চাপাইয়া, নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী এই সভায় নারীর চিত্তক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন। তাঁর বাণীর মর্ম্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এক দিক্ দিয়া যেমন বঙ্গনারীর প্রগতির পরিচয় পাই, অন্য দিকে তেমনি আঘাতের প্রতিশোধ দেওয়ার প্রবৃত্তিও যেন তাঁর বাণীর মধ্যে অন্তর্নিহিত দেখিয়া আতঙ্কিত হই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সাধনায় নারীর যে অধিকার তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু ভারতের সমাজবিধানে নারীর যে স্থান, যে দাবী, তাহা যদি



নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রভাবে বিকৃত ও বিপরীত আকার ধারণ করে, তাহা হইলে পুরুষজাতিই ইহার পরিপন্থী হইবে না, দেশে বিদুষী মহিলা অনেকেই আছেন, যাঁহারা একবাক্যে ইহার প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইবেন।

সভানেত্রী মহাশয়া ভারতের পবিত্র সমাজবিধানের উৎকর্ষসাধনের জন্য অর্থ-ও শাসন-তন্ত্রের আশ্রয় অন্বেষণ করিয়াছেন। অর্থাভাব বশতঃ নারী দুশ্চরিত্রা হয়; দায়ভাগের ব্যবস্থায় নারীর তুল্য অধিকার প্রদত্ত হইলে, এই মহাপাপ হইতে নারী রক্ষা পায়—এইরূপ উক্তি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁর মর্ম্মবাণী গভীর অনুভূতিপূর্ণ, কিন্তু সে বাণী আঘাত দিতে গিয়া তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। নারীদের জন্য একটী পৃথক্ কংগ্রেসের প্রয়োজন দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ; বাঙ্গালার পুরুষের আত্ম-চেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। বাঙ্গলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব।"



নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী— শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী

কথাগুলি প্রতিক্রিয়ামূলক। নারীর স্বতন্ত্র কংগ্রেস নারী-চেতনার মূর্ত্ত প্রকাশে আপত্তি নাই, কিন্তু পুরুষের আত্মচেতনার সহিত ইহার সম্পর্ক-রাহিত্য প্রমাণে সভানেত্রীর এই আগ্রহ সত্য নহে; কেন না, জাতির জীবনে যে চেতনার স্ফুরণ দেখা দিয়াছে, তাহা নারী অথবা পুরুষ ভেদে ভিন্ন নহে; এক অখণ্ড চেতনাই আজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং নারী জীবনের বিভিন্ন বিভাগের বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়াই আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই, পুরুষের উদাত্ত প্রাণে নারী আত্মশক্তি সংযুক্ত করিয়া, নারীধর্ম্মের মহিমাই রক্ষা করিয়াছে। আজ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীজাতির উদ্বুদ্ধতা—স্বামী, সন্তান, সহোদরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও নিবিড় সম্বন্ধেরই পরিচয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর এই যে আত্মদান, ইহা বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া নহে। পল্লীক্ষেত্রে নারীপুরুষের মিলিত সংগ্রামের পরিচয় যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা ইহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

সভানেত্রী মহোদয়ার অভিভাষণের মধ্যে পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ সৃজনের ভাবটাই প্রকাশ



নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেসের সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা শান্তি দাস

পাইয়াছে। ইহা সমগ্র বাঙ্গালার মনোভাব নহে বলিয়াই রক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যমূলক, পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ হারাইয়া আমাদের দেশে এইরূপ নারীচরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পরস্পর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া নির্ব্বিবাদেই বলিয়াছেন—"পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশ্যেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে; নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই।"

কথাটা কি সত্য? পুরুষ নারীকে নিজ

স্বার্থোদ্দেশ্যেই কি ব্যবহার করিয়া থাকে? এই স্বার্থ তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আন্দাজে ধরিয়া লওয়া ঠিক নয়; তবে পারিবারিক জীবনের মূলে নারীর জীবন যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা পুরুষের স্বার্থবশতঃ বলিলে খুবই ভুল বলা হইবে। এই ক্ষেত্রে অন্য দিক্ দিয়া পুরুষের জীবনও কি নারীর প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় না? আজ দায়ভাগের উপর অংশ বসাইতে নারীর প্রাণে যে স্বার্থবোধের উন্মেষ হইয়াছে সেই সম্পৎরাশি সঞ্চয়ে পুরুষের প্রাণ কি বলি পড়ে না? রক্ত-মোক্ষণ করিয়া পুরুষ যে সৌভাগ্য সঞ্চয় করে, তাহা কি পুরুষের আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার হেতু? দায়ভাগের অংশে নারীর দাবী তাহার মৌলিক স্বভাবের ব্যভিচার; কেন না, নারী পুরুষের সংযুক্ত শ্রমেই পরিবার সমৃদ্ধিশালী হয়। পুরুষ ধনসঞ্চয় করে, নারীই তো তাহা রক্ষা করে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নারী পুরুষের অভেদ দরদ দিয়াই গড়িয়া উঠে; এখানে একের উপর অন্যের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবহারবাদ খুব লঘু কথা। কন্যা পিতৃধনে বঞ্চিত হয়, কিন্তু স্বামীর সে যে গৃহকর্ত্রী! স্বামী নির্ধন হইলে স্ত্রী ভাগ্যহীনা —দরিদ্র পিতার কন্যারও তো এই একই দুর্দ্দশা! পতিপত্নীর সম্বন্ধভেদ রাখিয়া চলার ফন্দী থাকিলে, দুই কূল রাখার কথাটা চলিতে পারে; কিন্তু সমাজ যদি নারীপুরুষের অভেদাত্মক সম্বন্ধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এইরূপ প্রসঙ্গ ভারতীয় নারীর পক্ষে শোভন নহে। অর্থাভাবেই নারী পতিতা হয়, ইহা নূতন যুক্তি—সম্পদ, যৌবন, প্রভুত্ব, অবিবেকিতা, এইগুলিই অধঃপতনের হেতু। নারী শিক্ষাহীনা বলিয়াই দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে, সে দিকে পুরুষের প্রয়াস উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রাচীন যুগে নারীকে তুল্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। অধঃপতনের যুগে সমগ্র জাতিই আত্মবিহ্বল হইয়া পড়ে। জাতির প্রাণে চেতনার আগুন ধরিবামাত্র নারীকে সঙ্গে উঠাইয়া লওয়ায়, পুরুষের অকৃত্রিম প্রচেষ্টাই তো আজ নারীজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ আগাইয়া লইতেছে! সভানেত্রী মহাশয়া সভাভঙ্গে তাঁর এই মনোভাব রক্ষা করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন "শ্রীমতী শান্তি দাস কেবল মাত্র একার চেষ্টায় এত বড় একটী মহাসম্মেলন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।" কিন্তু শ্রীমতী শান্তি দাস সত্য গোপন না করিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন—'এত বড় কাজ আমি একা করিতে পারি নাই, মেয়েরা ছাড়াও বহু ছেলে আমার এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।" নারীর ভাগ্যোন্নতির জন্য পুরুষের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সংশয় অকারণ বলিয়াই মনে হয়

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মত দেশের নারী পুরুষের মধ্যেও ভেদ সৃষ্টি করিতে হইবে—এইরূপ মনোবৃত্তি ভাল নহে! পুরুষের সহিত নারীর সংযুক্ত জীবনই স্বাভাবিক; পুরুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নারীকে উদ্বুদ্ধ করিবে; কেন না, সম্বন্ধের দরদ বস্তুটি যদি হারাইয়া যায়, তবে আর থাকিবে কি? জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি যদি শুধু পুরুষদের দ্বারাই কার্য্যসমিতি চালাইয়া থাকে, তাহা নারীর সাহায্য পাওয়ার সুযোগ আসে নাই—বলিয়া ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আজ নারীর সহায়তা মিলিয়াছে বলিয়া, নারী ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত তাহাদের বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতার যথাযথ আদর আদায়ের জন্য যদি প্যাঁচ দিতে শিখে, তবে জাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মহিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রীর সম্ভাষণ তলাইয়া পড়িলে, পুরুষের প্রতি একটা আক্রোশের

[illegible] বাহির হইয়া পড়ে। এই ভাব জাতির ভবিষ্যৎগঠনের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়াই আমরা এইরূপ অপ্রিয় কথার উল্লেখ করিলাম।

নারীর মূল অধিকার-বস্তুটী দেশের শিক্ষিতা যাঁরা, তাঁরা যেন হারাইয়া বসিয়াছেন; তাই দেখি, মহিলা-কংগ্রেসে সম্প্রদায় বিশেষের ন্যায় পুরুষের অনুকরণে নারীর স্বার্থসংরক্ষণের প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার, ভারতের সভ্যতার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত রাখা কর্ত্তব্য —এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা করিয়াছেন; কিন্তু এই ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শের অনুগত জীবন যদি গড়িয়া না উঠে, তবে মহিলা-কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টাই নারীপ্রগতির লক্ষণ বলিয়া আমাদের বাহবা দিতে হইবে। সুখের কথা— বিবাহ-বিচ্ছেদসম্পর্কিত প্রস্তাবটী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সংশোধনপ্রস্তাবে বাতিল হইয়া যায়। আমরা ভারতীয় ভাব হারাইয়াছি—গড়িব কি? শিক্ষার প্রভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে যে একটা ব্যাভিচার ঘটাইয়া তুলিব, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে।

ইউরোপ ও আমেরিকার আদর্শে এ দেশের নারীজাতির চরিত্র ও কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এখনও ভারতের বাহিরে সকল সুসভ্য দেশের মনীষিমণ্ডলী ভারতীয় নারীর চরিত্র অনুকরণ করিয়া নারীজাতিকে গড়িতে অভিলাষ করে। পতিত জাতির সর্ব্বত্রই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এক হিসাবে নারীজাতির দিকে দৃষ্টি দিলে যে বীভৎস দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা তো আমাদের অক্ষমতার লক্ষণ! ভারত নারীকে যে স্থান দিতে চাহিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, নারী ও পুরুষের সংযুক্ত তপস্যায় তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে—ভারতের নারীজাতিকে আমরা এইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি।

মহাত্মা গান্ধী ও বিপ্লবী—

মহাত্মা বিপ্লবীদের কর্ম্মধারা সংযত করার অনুযোগ করায়, ল্যাহোরের অগ্নিহোত্রী শুকদেব ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একখানি 'খোলা' চিঠি দিয়াছিলেন। মহাত্মা উহা তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মার অনুরোধ পালন করিতে হইলে তাঁহাদের আত্ম-দ্রোহী হইতে হয়। শুকদেবের পত্রে জানা যায়— বিপ্লবের মূলে সৃজনের প্রেরণাই আছে; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ধ্বংস ব্যতীত ইহা সিদ্ধ করার অন্য উপায় নাই; কাজেই ধ্বংস-নীতিকেই তাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতি জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করায় তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে; ইহার ফলে বিপ্লবীকে বাহির করা সহজ হয় ও তাহাদের কঠিন দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, তাহারা জনসাধারণের ভিতর বিপ্লবের প্রভাব এমন করিয়া বিস্তার করিবে, যাহাতে এই বিপ্লব স্থায়ী হইয়া দেশের চরম আদর্শ সফল করিবে। শুকদেবের বিশ্বাস— দেশের জনসাধারণ বিপ্লবের লক্ষ্য ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে এবং রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্য অদূর ভবিষ্যতে ইহার অনিবার্য্য প্রয়োজন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অহিংস-ব্রতীদের ন্যায়, হিংসা-ব্রতীদেরও আত্মপন্থায় অটুট প্রত্যয় আছে; এইজন্য ইহাদের কর্ম্মের প্রতিবাদে অথবা ইহাদিগকে কর্ম্মবিরত করার যুক্তি ও অনুযোগ কোনই কাজের হইবে না। আমরা বাংলায় বিপ্লব-পন্থীদের দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। চট্টলের গ্রামে গ্রামে তরুণ বিপ্লব-পন্থী প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ প্রচার

করিতেছে ; অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে বিপ্লবের বীজবপনের প্রাণপাত প্রয়াস চলিতেছে। গভর্ণমেণ্টের স্পর্দ্ধা পুলিশ আতঙ্ক সৃজন করিতে পারে ; কিন্তু সাহস যখন শাসনের সীমা অতিক্রম করে, তখন ইহা বাধা মানে না—বিপ্লবীদের এই ভরসা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

মহাত্মা বিপ্লবীদের বুঝাইবার জন্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যথা বিপ্লবপন্থায় আমরা লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হই নাই, ইহা দেশের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের মনে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছে। যেখানে বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই কিছুদিনের জন্য অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে ; ইহা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে নাই, বরং দুই দিক্ দিয়া ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—সামরিক ব্যয়ভার বহন এবং গবর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। বৈপ্লবিক হত্যা ভারতের ধাতুগত নহে, ভারতের আদর্শের বিপরীত ; বিপ্লবীগণ যদি তাহাদের পদ্ধতি জনসাধারণকে গ্রাহ্য করাইতে চায়, তবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই আমাদের ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে ; আর যদিও এই বিপ্লব-নীতি সাফল্য লাভ করে, তবে ইহার প্রতিক্রিয়া আমাদের মাথার উপরই দিয়াই বহিয়া যাইবে—ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা অহিংস-নীতির জয়াংশ দেখাইয়া বিপ্লবীদের তিনি প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস—যুক্তি দ্বারা দেশের মাটীতে এই যে কঠিন কণ্টকলতা জন্মিয়াছে, তাহার মূল উপড়াইয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। মহাত্মা স্বীকার করিয়াছেন—বিপ্লব-পন্থীদের হত্যাকাণ্ড নিন্দনীয় বটে, কিন্তু ইহাদের স্বদেশ-প্রীতির আগুন উপেক্ষার নহে, তাহাদের ত্যাগ ও সাহস অসাধারণ—এই হেতু বিপ্লববাদীদের নিরস্ত করিতে হইলে তাহাদের দাবী পূরণ করিতে হইবে। অহিংস-নীতি যদি তাহা সিদ্ধ করিতে পারে, হিংসা-নীতি অস্ত্রস্বরূপ যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, স্বভাবতঃই সে অস্ত্র নিষ্প্রয়োজনেই পরিত্যক্ত হইবে, এবং তখন এই সকল আত্মত্যাগী বীরের দল দেশ-গঠন-যজ্ঞে আত্মদান করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। দেশ এখনও সংশয়দোলায় দোল খাইতেছে ; মহাত্মার প্রচেষ্টা সার্থক হইলেই আমরা শান্তি লাভ করিব। যতক্ষণ সংগ্রাম, ততক্ষণ সংশয়—এই অবস্থায় ঘটনা দেখিয়া মনে হয়, বিপ্লবপন্থীও যুগপৎ ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে আত্ম-প্রকাশে বিরত হইবে না। আমরা তাই এই দিকে নিরাশ হইয়াছি। ভারতে পরস্পরবিরোধী দুইটি পথে জাতি যদি চলিতে থাকে, কেবল দেশবাসীই বিপন্ন হইবে না, রাজশক্তিকেও বিব্রত হইতে হইবে ; এই হেতু দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে প্রশমিত করার জন্য, পশুবল প্রয়োগ সকল সময়ে যে হিতকর তাহা নহে, জাতির দাবী পূরণ করিয়া শান্তির প্রতিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। এই দিকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়াই আমরা ভারতের শুভ সন্দর্শনে উদ্গ্রীব হইয়াছি।

দিল্লীর চুক্তি—

গান্ধী-আরউইন-সন্ধি বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ী-দের মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। ইংরাজ এ দেশে রাজ্যবিস্তারের আশা লইয়া আসে নাই, ব্যবসার সুবিধা করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য—ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের শিরে রাজমুকুট তুলিয়া দেওয়ায়, তাহাদের সৌভাগ্যের অবধি ছিল না। কিন্তু চিরদিন এই অবস্থা রক্ষা হওয়া সম্ভব নহে—ইহা ইংরাজ জাতিও আজ বুঝিয়াছে। চার্চ্চহিল প্রমুখ কয়েকজন চরমপন্থী ইংরাজের আস্ফালন—আসন্ন রাজ্যহীন হওয়ার খেদোক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইংরাজ জাতি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে। আজ পূর্ণ-স্বাধীনতার বাণী সমগ্র ভারতে বিনাবাধায় উচ্চারিত হইতেছে। ভাব ও আদর্শের ব্যাপক

প্রচার উদ্দেশ্যসাফল্যের বড় উপায়; সে পথ আজ অবারিত; রাজশক্তির বাধা সেখানে ব্যর্থ হইয়া মাথা নত করিয়াছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, ইংরাজের স্বার্থসংরক্ষণের একটা বিধিব্যবস্থা হইলে, ভারতের রাজ্যশাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর আধিপত্য ইংরাজ জাতি স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি করিবে না। এই স্বার্থ-সংরক্ষণের অজুহাতে হয় তো আর একটা সংঘর্ষ বাধিতে পারে, কিন্তু ভারতের বন্ধন-দশা দীর্ঘদিন থাকিবে না—ভারতের প্রাণ ইহার জন্ম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে

ইংরাজের অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বস্ত্র-ব্যবসায়ের মত তত গুরুতর নয়। ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায় ধ্বংস করিয়া ইংরাজের ম্যান্‌চেষ্টার, ল্যাঙ্কেসায়ার গড়িয়া উঠিয়াছে।

দিল্লীর সন্ধি-ফল এই পথ বিঘ্নহীন করিবে বলিয়া বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীদের আশা হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মার স্বদেশী আন্দোলন আরও বিরাট্ আকার লইয়া দেখা দেওয়ায়, বিলাতের বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ ধৈর্য্যহীন হইয়াছেন; ল্যাঙ্কেসায়ারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা একবাক্যে ভারতের রাষ্ট্রশাসন ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচনা করিয়াছেন।

লর্ড আরউইন যে অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সর্ত্তবদ্ধ হইয়া ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, সে অবস্থা বিলাতের ব্যবসায়ীগণ উপলব্ধি করিবেন না। ভারতের রাষ্ট্র যে ভাবেই গঠিত হউক, ভারতের শাসনযন্ত্র যাঁহাদের হাতেই পরিচালিত হউক, বিলাতের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ না হইলেই তাঁহাদের আর কথা নাই; কিন্তু ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি যতই জাগ্রত ও জীবন্ত হইবে, শাসন-নীতির উপর অধিকারবিস্তারের সঙ্গে, স্বজাতির ধনসম্পদ্ সংরক্ষণে তাহারা যে অধিকতর সচেষ্ট হইবে, ইহা অবধারিত। এই দিক্ দিয়া মহাত্মা বিলাতীবস্ত্র-বর্জ্জনের নীতি রাষ্ট্র-সংগ্রামের অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ না করিয়া, জাতির শিল্প ও বাণিজ্যরক্ষার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন—ইহা আরও মারাত্মক হইয়াছে।

ইহার ফলে সন্ধিসর্ত্তস্থাপন হওয়া সত্ত্বেও, বিলাতী বস্ত্রের চাহিদা বাড়িতেছে না; বরং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি দিবারাত্র কল চালাইয়াও দেশের অভাব পূরণে অসমর্থ হইতেছে। ভারতবাসী স্বদেশজাত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশের উৎপন্ন বস্ত্র গ্রহণ করিবে, ইহা আর সম্ভব নয়।

বাণিজ্যের সৌভাগ্য রাজ্যহারা হইলে পূর্ব্বের স্থায় থাকিবে, ইহা দুরাশা। এই দিক্ দিয়া ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বুঝাপড়ায় ঘোরতর সমস্যা আছে; আর এই সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নহে মনে করিয়াই অনেকে লর্ড আরউইন ও মহাত্মার সর্ত্তটার পরিণাম সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় করেন, কিন্তু আমরা বলি, ভারতের সহিত ইংরাজের সৌহার্দ্দ যদি আন্তরিক হয়, ভারতের অর্থ-সঙ্গতির যদি উন্নতি হয়, অন্নবস্ত্র ও ধর্ম্মের দায়ে ভারত বিলাতের স্বার্থরক্ষায় উপযোগী না হইলেও, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। যাহা আছে তাহার পরিবর্ত্তন হইবেই; শাসনশৃঙ্খলায় ইংরাজ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা থাকিবে, বস্ত্রব্যবসায়ে ইংরাজ ভারতের রক্ত শোষণ করিবে, শিক্ষায় সাধনায় ইংরাজের আদর্শ সভ্যতা প্রচারিত হইবে, অথচ ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে, ইহা সম্ভব নহে। রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হইলে, এবার কথা অধিক নাই—ইংরাজের স্বার্থসংরক্ষণনীতি লইয়া গণ্ডগোল বাধিতে পারে, কিন্তু ভারতের পন্থা সুনির্দ্দিষ্ট। যদি হিন্দু ও মুসলমান সংযুক্ত হইয়া ভারতের স্বার্থ দাবী করিয়া বসে, তবে ইহা উপেক্ষা করা ইংরাজ শক্তির পক্ষে সম্ভব হইবে না। ভারতের ভাগ্যোদয়ে ইংলণ্ডের ভাগ্য মলিনমূর্ত্তি না ধারণ করিলেও, একটা সাম্য অবস্থা যে আসিবেই, ইহাতে আর সংশয় নাই। ইংরাজ জাতির ইহার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই, নতুবা দিল্লীর চুক্তি ব্যর্থ হইবে।

লর্ড আরউইন ও রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স—

বিলাতে উপস্থিত হইয়া লর্ড আরউইন ভারতের চিন্তার কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভারত শাসন করিতে যে সকল কঠোর বিধান প্রবর্ত্তন

করিয়াছেন; কোন শাসনকর্ত্তাকে এরূপ করিতে হয় নাই; তথাচ বিদায়কালে ভারতের দাবী উপেক্ষা করা ইংরাজ রাজ্যের পক্ষে শুভ নহে বলিয়াই তিনি মহাত্মার সাহত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, এবং এই চুক্তির শুভ ফল ব্যর্থ করার বহুবিধ কারণ ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কা তিনি করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ রাষ্ট্র-বিদ্‌গণ ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক যদি স্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে দিল্লীর সর্ত্ত যাহাতে কার্য্যকরী হয়, সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে বিলাতের প্রতিনিধি রূপে তিনি যোগ দিতেও পারেন, এরূপ সম্ভাবনার কথা উঠিয়াছে। মহাত্মার সহিত তাঁহার চুক্তির সর্ত্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এই ভারত-যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার পক্ষে তাহাই সবখানি নয়; উভয়ের মধ্যে যে অন্তরের সম্পর্ক লাভ হইয়াছে, যে পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহাই ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবে। এ ক্ষেত্রে, মহাত্মা বা লর্ড আরউইন দুই জন বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষ নহেন, হিন্দু ভারতের প্রতিনিধির সহিত ইংলণ্ডের রাজ-প্রতিনিধির আদান প্রদানে, ভারত ও ইংলণ্ডের বিপুল শক্তিসমন্বয় সিদ্ধ হওয়ার সঙ্কেত দেয়। এত বড় কর্ম্ম সিদ্ধ করার পথে অন্তরায় অল্প নহে; কিন্তু এই দুই মহাপ্রাণের আন্তরিক সহযোগিতায় বিলাতের আবহাওয়ায় যে সংশয় ও অস্পষ্টতা আছে, তাহা দূর হওয়া বিচিত্র নহে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণ যদি ইষ্ট সাধন না করিয়া দৈব অথবা আসুরিক বুদ্ধিবশতঃ ব্যর্থ হয়, তবে ভারতের দুর্ভাগ্য নহে, ইংলণ্ডের দুর্দ্দিনও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

হিন্দু মুসলমান—

বহুদিনে ভারতে হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই—ইহা আজ নূতন কথা, আশার কথা। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে একেবারেই না হইত তাহা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাষ্ট্র-বুদ্ধি প্রণোদিত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের স্থান থাকিত না, ভারতব্যাপী বিরোধে হিন্দু মুসলমান ছন্নছাড়া হইত না।

মহাত্মা রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার সার্থকতা হিন্দু মুসলমান মিলন ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া মনে করেন; এইজন্য তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের শরণাগত হইতে কুণ্ঠাহীন—এমন কি হিন্দু জাতিকে নিঃস্বার্থচিত্তে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শওকৎ আলি প্রমুখ ভারতের একদল মুসলমান মহাত্মার এই আন্তরিক আহ্বানের মধ্যে চালবাজী দেখিয়া উল্টা কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সুখের কথা, দিল্লীর মোস্‌লেম সম্মিলন ইস্‌লামীর চরম বস্তু নহে। লক্ষ্ণৌ এ যে জাতীয় মুসলমানের সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হইয়াছে; যদিও জিন্নার চৌদ্দ দফা ইঁহারা নাকচ করিতে ভরসা করেন নাই, তত্রাচ যুক্ত-নির্ব্বাচননীতির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

দিল্লীর সভায় চারি হাজার মুসলমান সভ্য যোগ দিয়াছিলেন; লক্ষ্ণৌ'এ বার হাজার মুসলমান সভ্য যোগ দিয়া ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে লক্ষ্ণৌসভার প্রস্তাব যাহাতে সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থা যেমন হওয়া উচিত, অন্য দিকে বিশাল হিন্দু সমাজের ভিতরও মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত একযোগে কার্য্য করার সদ্বুদ্ধি জাগাইয়া তোলার দরকার। বিরোধ এক পক্ষের দোষেই ঘটে না, অনেক সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমান রাষ্ট্র-ঘটিত স্বার্থের দায়ে আমরা মিলনের পক্ষপাতী নহি, ভারতে ধর্ম্মবিশ্বাস স্বতন্ত্র বলিয়া আমরা এক জাতিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া অসম্ভব মনে করি না। ভারতের জাতি-বৈচিত্র্য ভেদের কারণ হয় নাই; হিন্দু মুসলমানও ভারত-বাসীরূপে একত্র ঐক্যবদ্ধ হইয়া অপরাজেয় হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



সঙ্কলন

মুক্ত দুয়ার—

"পাঠান-বৈষ্ণব রাজপুত্র বিজুলী খাঁ"র ঐতিহাসিকত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সুধীবর শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বৈশাখের "প্রবাসী"তে লিখিয়াছেন :—

"হিন্দু যে স্বধর্ম ত্যাগ করে' স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, এ ঘটনা আজও ঘটে ; কিন্তু মুসলমান যে স্বধর্ম ত্যাগ করে' হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, আজ তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, যে হিন্দু ধর্ম অর্থাৎ হিন্দু সমাজের দরজা আজ বন্ধ হ'লেও, অতীতে খোলা ছিল। আজ আমরা এ সমাজ থেকে অনেক হিন্দুকে বহিষ্কৃত করতে পারি, কিন্তু কোন অহিন্দুকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নে, কারণ আজকের দিনে হিন্দু সমাজের অর্থ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের অর্থ হিন্দু সমাজ। আর হিন্দু সমাজ হচ্ছে অপর সকল মানব সমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে। কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, যে হিন্দু যুগে অসংখ্য শক ও যবন বৌদ্ধ ধর্মের শরণ গ্রহন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটী শাখা মাত্র। আর এ ধর্মমন্দিরের দ্বার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত ছিল।"

প্রমথবাবুর অভিমত আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু হিন্দু তার মানসকন্যা বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়াই মুক্তির দুয়ার বিশ্বমানবের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা সত্য নহে। হিন্দুর উদারতর ধর্ম ও সমাজনীতির পরিচয় মৌলিক হিন্দু যুগেও পাওয়া যায়। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, খশ, হুণ প্রভৃতি কত বৈদেশিক জাতি দিগ্বিজয় বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রতিকূল ভাব বর্জ্জন করিয়া হিন্দুর উদার ও মহৎ ভাব অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে ও হিন্দুর রক্তস্রোতে আপন রক্তস্রোতঃ মিশাইয়া আপনাদিগকে আজ পর্য্যন্ত সগৌরবে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে—তাহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য স্পষ্টাক্ষরেই পাওয়া যায়। যবন রাজপুত্র জয়দাম ও রুদ্রদামের কথা অনৈতিহাসিক নহে। বেশনগরের শিলালিপিতেও জানা যায়, যে যবনদূত ডিয়ার পুত্র হেলিওডোরা নামে এক ব্যক্তি বাসুদেব মন্দিরের অগ্রভাগে একটী গরুড়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করেন ও নিজেকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভাগবতেও আছে—কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতি ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়াছিল—

> কিরাত-হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশাঃ
> আভীর সুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
> যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
> শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

আমাদের মনে হয়, অগ্নিযজ্ঞে চৌহান প্রভৃতি রাজপুত অগ্নি-কুল ক্ষত্রিয় জাতির অভ্যুদয়—এই একই শুদ্ধি-যজ্ঞের নিদর্শন। হিন্দু সমাজের দ্বার উদার ও মুক্ত ছিল, ইহা অবধারিত। কোনও জীবন্ত সমাজই জড় ও অচলায়তন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। গতি ও ব্যাপ্তি জীবনেরই লক্ষণ।

শুভঙ্কর—

শুভঙ্কর বাঙ্গালীর—বাংলার গৌরব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী তাহার সঠিক পরিচয় জানে না। ১২৯৯ সালে মিঃ পি-ঘোষ তাঁহার প্রচারিত শুভঙ্করীর ভূমিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, যে বঙ্গ-বিশ্রুত শুভঙ্করীর লেখক ও আবিষ্কর্তার আসল নাম শুভঙ্কর নহে, ভৃগুরাম দাস নামে জনৈক কায়স্থ লোকের শুভকামনায় নানা আর্য্যা রচনা করিয়া শুভঙ্করী নামক এই গণিতগ্রন্থ রচনা করেন। ইহা মিঃ ঘোষের নিছক অনুমান হইতে পারে—কেন না, এ সম্বন্ধে তিনি কোনও প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। সম্প্রতি চৈত্রের "মাসিক বসুমতী"তে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এ সম্বন্ধে যে তথ্যোদ্ধার পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রের প্রণিধানযোগ্য। তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, শুভঙ্কর বাঁকুড়ার লোক। তাঁহার দৌহিত্র-বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শুভঙ্করের বংশধর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বরাট মহাশয়ের নিকট হইতেই তিনি যে বিবরণাংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন আমরা তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বিষ্ণুপুর পরগণা সামিল সোণামুখী চৌকীর অন্তঃপাতী রামপুর গ্রামে পীতাম্বর দাসগুপ্ত (চৌধুরী) একজন থাকেন। ১০০৯ সনের ফাল্গুন মাহায় তাঁহার পুত্র শুভঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। সেই সদ্যজাত শিশুর অতি সুন্দর রূপ দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পিতা মহাশয় অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। উক্ত পীতাম্বর চৌধুরী অতি নিঃস্ব ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মহারাজ চৈতন্য সিংহের অধীনে স্বল্পবেতনে কার্য্য করিয়া গৃহস্থ প্রতি পালন করিতেন। এই হেতু পুত্রোৎসবে দানাদি করণে অসমর্থ হইয়া মহাখেদিত হইলেন। কিছুদিন গতে নামকরণ কালীন গঠন ও উত্তম রূপ দেখিয়া কুলপুরোহিত মহাশয় জগন্নাথ নাম রাখেন। পঞ্চম বৎসর গতে বিদ্যারম্ভ করাইলেন; ১০ বৎসর বয়সে বাংলা বিদ্যাভ্যাস করিয়া বাংলায় জ্ঞানবান্ হইলেন।

শুভঙ্কর তৎকালে সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়াকালীন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সকলকে পরাভব করিতেন। দশজনে যে বস্তু উত্তোলনে অসমর্থ হইতেন, উক্ত জগন্নাথ চৌধুরী অবলীলাক্রমে তাহা উত্তোলন করিয়া দূর দেশে লইয়া যাইতেন এবং মুগুর চালনা প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ কীর্ত্তি দেখাইতেন। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বল ও অসামান্য বুদ্ধি দেখিয়া গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা তাঁহার নাম সুরেন্দ্র নারায়ণ রূপে খ্যাত করেন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পীতাম্বর চৌধুরী পরলোক গমন করায় জগন্নাথ অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতার ও নিজের ভরণ পোষণ হওয়া কঠিন। বিদ্যাধ্যয়নে বাধা ঘটিল, জগন্নাথ নানা দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবৎ কৃপায় তাঁহার মনে হইল যে—মল্লভূমিনাথ অতি দয়ালু ও অতি কৃপাবান্। তাঁহার নিকট যাইয়া পিতার পরিচয় দিলে আশ্রয় পাইবেন। এই ভাবিয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া, কুলদেবতা লক্ষ্মী জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া রাজবাটীতে চলিলেন। গড় পার হইয়া প্রস্তর দ্বারে উপনীত হইলেন, দ্বারী তাঁহাকে ভিতরে যাইতে দিল না। কিয়ৎপরে একজন কর্ম্মচারী যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া শুভঙ্কর রাজসভায় রাজদর্শনে চলিলেন। রাজা জগন্নাথের দেহলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পরিচয় চাহিলে, রাজকর্ম্মচারী শুভঙ্করের পরিচয় দিলেন ও তাঁহার দুরবস্থার কথা বলিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার যে বেতন ছিল, তাহা তাঁহার মাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাসে মাসে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। ৪।৫ বৎসর মধ্যে ফরাসী, বাংলা প্রভৃতি তৎকালোচিত বিদ্যা সকল অভ্যাস করিয়া শুভঙ্কর সকল বিদ্যায় নিপুণ হইলেন। গণিতে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। তিনি অঙ্ক শিখিবার সরল ও সুমধুর কৌশল বাহির করিতেছেন দেখিয়া সভাসদ্‌গণ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, জগন্নাথ লোকের শুভঙ্কর রীতি বাহির করিতেছেন—অতএব ইঁহার নাম শুভঙ্কর রাখা হউক।" তদবধি শুভঙ্কর প্রচারিত হইল।

তৎপরে রাজভ্রাতা দামোদর সিংহ শুভঙ্করকে কোন হীন কার্য্য করিতে বলিল। শুভঙ্কর অস্বীকৃত হওয়ায় দামোদর সিংহের আদেশে রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজাকে কিছু না বলিয়া শুভঙ্কর প্রাণভয়ে পলাইয়া ফলমূল আহরণ করিয়া দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, মহারাজ সভাসদ্‌সহ সহর পর্য্যটন করিতে গমন করেন। পথিমধ্যে এক উচ্চ তালবৃক্ষ দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে কহিলেন,

"এই তালবৃক্ষ-মাপে কত হস্ত হইবে, বল।" সভাসদেরা

—অনুমানে যাহা বলিলেন, মাপে তাহার মিল হইল না। তখন রাজা কহিলেন, "শুভঙ্কর কোথায়? সে থাকিলে নিশ্চয়ই ঠিকঠাকে উচ্চতা বলিত, তাহার সন্দেহ নাই।"

তখন দামোদর সিংহের সহিত শুভঙ্করের কলহ ও তাহার প[...]কাহিনী শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাই অর্জ্জিত বস্তুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অবিধি। যাও, শুভঙ্করকে খুঁজিয়া বাহির কর, তাহা হইতে রাজ্যের উন্নতি ও দীপ্তি হইবে।' বহু অনুসন্ধানে শুভঙ্করের দেখা মিলিল। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা শুভঙ্করকে সান্ত্বনা দিয়া সেই তালবৃক্ষের বিবরণ কহিলেন; শুভঙ্কর তালবৃক্ষ দৃষ্টি করিয়া, সেই বৃক্ষেতে ছায়া মাপ করিয়া * * *"

এইখানেই বিবরণী শেষ হইয়াছে। শেষের অংশ হারাইয়া গিয়াছে, তথাপি অনুমানে গল্প পূর্ণ করিতে পারা যায়। শুভঙ্কর ছায়া মাপিয়া তাল বৃক্ষের উচ্চতা নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন।"

মতিলালবাবু অনুসন্ধানে ইহাও জানিয়াছেন, শুভঙ্কর একজন বিখ্যাত পূর্ত্তবিদ্ (Engineer) ছিলেন। তাঁহার এই পূর্ত্তবিদ্যানৈপুণ্য দেখিয়া বিষ্ণুপুররাজ তাঁহাকে 'রায়' উপাধি দেন এবং নানা কার্য্যের [...] দেবোত্তর ভূমি দান করেন। রাজাদেশে শুভঙ্কর কঙ্করময় বাঁকুড়া প্রদেশে খাল কাটিয়া প্রায় ২ হাজার বিঘা জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করেন। এই সময়ে তিনি রাজার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত ছিলেন। "শুভঙ্করের দাঁড়া" নামে তাঁহার বিখ্যাত কীর্ত্তির ভগ্নাংশ বর্ত্তমান আছে। বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে সম্প্রতি তাহার সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলার এই ঐতিহাসিক পুরুষের জীবনানুসন্ধান আরও ভাল করিয়া যাহাতে হয়, তজ্জন্য "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" ও বাঙ্গালী মাত্রেরই সজাগ ও উদ্বুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা—গান্ধী-ভাষ্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সঙ্কলিত। দাম—বার আনা।

গান্ধীজীর 'অনাসক্তি-যোগ' গ্রন্থখানি—গীতার শ্লোকের গুজরাটী অনুবাদ। ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের সম্পর্কে টীকা ও ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ টীকা কেবলমাত্র সেই সব শ্লোকের সম্পর্কেই দেওয়া হইয়াছে যেগুলির বিশ্লেষণ করা গান্ধীজী আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশবাবু প্রথম এই 'অনাসক্তি-যোগের'ই বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকারের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনাসক্তি-যোগ ত পুরাপুরি রাখা হইয়াছেই—উপরন্তু তাহার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে গীতাপ্রবেশিকা, প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, কঠিন সংস্কৃত শব্দের অর্থ এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের ভাবার্থ। অর্থাৎ সাধারণ রকমের লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে গীতা যাহাতে সহজে বোধগম্য হইতে পারে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে। গীতাকে এই ভাবে সাজানোর পন্থায় একটা অভিনবত্ব আছে। লোকশিক্ষার পক্ষেও ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার প্রথম ভাগ 'গীতা-প্রবেশিকা'। গীতাকে কি ভাবে পাঠ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া গীতা প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছে, সাধারণের উপযোগী করিয়া এই অংশে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক কথায় ইহা গীতার দার্শনিক তত্ত্বের সহজ সরল আলোচনা। এ অংশের ভাষাও যেমন সহজ, বক্তব্যও তেমনি সুস্পষ্ট। এই অধ্যায় কয়টির দ্বারা গীতা-পাঠকদের পক্ষে গীতাপাঠের পথ সতীশবাবু যে ঢের সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

অধ্যায়গুলির ভাবার্থও জনসাধারণকে এই দিক্ দিয়া প্রভূত সাহায্য করিবে। শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া আগাগোড়া তাহার সামঞ্জস্য মনে রাখা

কঠিন। তাহাতে মূল তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভাবার্থ অধ্যায়ের শেষে এই ভাবে সাজাইয়া দেওয়ায় সে সম্বন্ধে ভুল হইবার আশঙ্কা কমিয়া গিয়াছে।

এইবার "অনাসক্তি-যোগের" [illegible] গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন—"আচরণে যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় গীতার নিকট হইতে সে গোলমাল আমি সাফ্ করিয়া লইয়া থাকি।" সুতরাং গীতা অন্যের কাছে যেখানে কেবলমাত্র ধর্ম্মসম্পর্কে দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের জিনিষ, মহাত্মার কাছে সেইখানে তাহা ব্যবহারিক কাজের ভিতর দিয়া লব্ধ সত্য; তাঁহার কাছে তাহা সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। জনহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একজন মনীষী তাঁহার কর্ম্ম-প্রেরণার নির্দ্দেশ যেখান হইতে পাইয়াছেন, সেই নির্দ্দেশের উৎসের সহিত পরিচিত হইবার প্রয়োজন জন-সাধারণের অল্প নহে। বস্তুতঃ কর্মীদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ভিতর দিয়া কর্ম্মপথের ইঙ্গিত ত তাঁহারা পাইবেনই, ভুলের বিরুদ্ধে, মোহের বিরুদ্ধে, দ্বিধার বিরুদ্ধে লড়িবার একটা আশ্রয়ও পাইবেন। যে পথের নির্দ্দেশ গীতার ভিতর হইতে নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত, গান্ধীজীর মত অদ্ভুত-কর্ম্মা লোক তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিয়া জন-সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। জন-সাধারণের পক্ষে এ লাভ সহজ লাভ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

অনাসক্তিযোগেই কোনো কোনো বিষয় লইয়া পণ্ডিতদের ভিতর যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মহাত্মাজীর মত অহিংসব্রত সন্ন্যাসী জাতির ভিতর অহিংসারই অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। কিন্তু সাধারণের এবং অনেক পণ্ডিতেরও বিশ্বাস—গীতা অহিংসার বাণী প্রচার করে না, অন্ততঃ ন্যায়যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাহার কোন অনুশাসন নাই। কিন্তু এ বিষয় লইয়া বিরোধের কোন কারণ আছে বলিয়াও মনে করি না। কেননা, মানুষের সাধনা, শক্তি, জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতির উপরেই এই ধরণের গ্রন্থের, এই ধরণের মহাকাব্যের ভাব ও অর্থ নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। কথাটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"গীতা সূত্রগ্রন্থ নহে। গীতা এক মহান্ ধর্ম্মকাব্য। ইহাতে যতই ডুবিয়া যাওয়া যাইবে, ততই নূতন ও সুন্দর অর্থ পাওয়া যাইবে। গীতা জনসমাজের জন্য। উহাতে একই বস্তু অনেক প্রকারে বলা হইয়াছে। এইজন্য গীতার শব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে ও বিস্তার লাভ করিতেছে।"

In Search of Jesus Christ—মনস্বী ধীরেন্দ্র বাবুর মনোজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান—এই "ঈশানুসন্ধানে"। তিনি তাঁহার আবাল্য অনুসন্ধিৎসাগুণে সুদীর্ঘ চিন্তা, পাঠ ও আলোচনার ফলে, খৃষ্টের অস্তিত্ব ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা যে অভিনব গতানুগতিক ধারণাকে নির্ম্মমভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে—সত্যের অনুসন্ধানে এ নির্ম্মমতা নিষ্করুণ হইলেও বরণীয়। সত্যের এই নির্ভীক পূজারীকে আমরা প্রশংসাপূর্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থখানি যথার্থ চিন্তাকর্ষক, সুযুক্তিপূর্ণ ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ। ইহার বহুল প্রচার আমরা কামনা করিতেছি।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ — উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা তিনজন মহাপুরুষ—রাজা রাম-মোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পবিত্র জীবন-প্রসঙ্গ ও ভাবালোচনা চিন্তাশীল ভাবুকের দৃষ্টিতে সংগ্রথিত হইয়াছে। ভাবুক জনের উপভোগ্য।

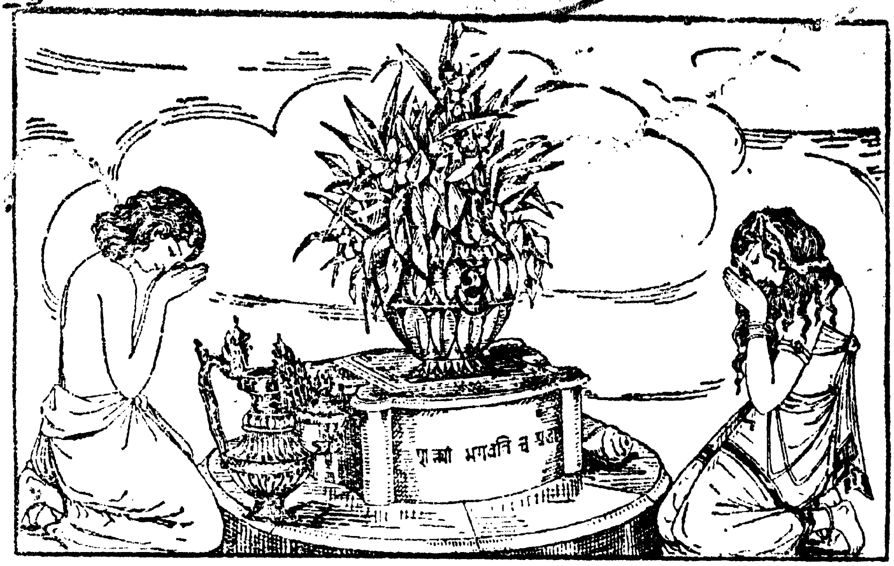
প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন

শিল্পী—স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী



১৬শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

আষাঢ়,
১৩৩৮।

দলাদলি

—:০:—

দলাদলির সমস্যা আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই ইহার সমাধান না হইলে আর রক্ষা নাই। ঐক্যের কথা, মিলনের কথা প্রচারিত হইতেছে।—যেন অভিনয়। মিলনে বিচ্ছেদে জোর হাততালি পড়ে, অবশ্য রুচিভেদে পক্ষাপক্ষ আছে। বিষয়টা আমরা তলাইয়া বুঝিতে চাই।

দেশের আশা ও ভরসা—কংগ্রেস। কংগ্রেস আজ কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্র নহে; ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাধনা, সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেস দেশের সমগ্র প্রাণটাকে একই কেন্দ্রে শৃঙ্খলিত করিতে চায়—কিন্তু এখনও ভারতের বিচিত্র কর্ম্মজীবন এক কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতে চাহিতেছে না। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সর্ব্বক্ষেত্রের কথা নয়। আত্ম-রক্ষার একটা দৃঢ় সংস্কার আছে; স্বধর্ম্মপালনের মমতা অনেককে ইহা হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছে।

কংগ্রেসের মেরুদণ্ড রাজনীতি। এই বস্তুটাকে প্রধান করিয়া ভারতের জাতীয় মহাসভা ভারতের সব কিছু সিদ্ধ করিতে চাহে। বিশেষ, মহাত্মার আত্মদানে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতি একপ্রকার ধর্ম্ম-

নীতিস্বরূপ হইয়াছে; কিন্তু তবুও রাষ্ট্রকে পুরোভাগে রাখিয়া জাতিকে সিদ্ধ করা এক শ্রেণীর মানুষের হয়ত ধর্ম্ম নয়, অনুভূতি নয়; তাই বলিয়া কংগ্রেস দিয়া তাঁহাদের সর্ব্বকর্ম্ম যদি সিদ্ধ হয়, ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি বা অবিশ্বাসও নাই। আত্মধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু যেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে বিসর্জ্জনের নয়; এই হেতু জাতির সবখানি প্রাণ একত্র হইয়া বিরাট্ মূর্ত্তি লইতেছে না—অবশ্য ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে কুণ্ঠিত জীবনের নিরপেক্ষতা নিন্দনীয়। এই শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা নাই। আমরা বলিতেছি—আত্মদানের বীর্য্য, সাহস যেখানে, সেখানে ঐক্যবদ্ধ জীবনের মহাপ্রবাহ সৃজনেরর অন্তরায় কেন? এই কথাটা আমরা যেভাবে বুঝিয়াছি, দেশের কাছে তাহা নিবেদন করিব।

প্রথম, রাষ্ট্রক্ষেত্রের দলাদলির কথা। ভারতের অন্যত্র ইহা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। পঞ্জাবে, মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে মতানৈক্য ও দলভেদ খুবই আছে। আমরা এক্ষণে বাংলার কথাই আলোচনা করিব।

বাংলায় রাষ্ট্র এক্ষণে দ্বিধা-বিভক্ত। উভয় দলের নেতৃপুরুষদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে হীনতার পরিচয় মিলে না, দেশপ্রীতির নির্ঝর অনেক ক্ষেত্রেই অনাবিলরূপে ঝরিতে দেখা যায়; ত্যাগ ও সাহসের কোথাও কুণ্ঠা নাই, ঔদার্য্যের অভাব নাই। ভগবান সকলের মধ্যেই জীবন-সংগ্রামের ব্রহ্মাস্ত্র সংগোপিত রাখিয়াছেন—এইজন্যই তো ব্যক্তি-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া জগতে কেহ বড় হইতে পারে না; কিন্তু এই অস্ত্রের আবিষ্কার ও ইহার যোগ্য ব্যবহার অল্পজনের ভাগ্যেই ঘটে। নেতারা অস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, ব্যবহারে[illegible] গোল বাধাইয়াছেন।

ইহার কারণ, একই গুণ, একই ঐশ্বর্য্য সৃজনের মূল উপাদান হইলেও বৈচিত্র্যরহস্যে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়—ইহাই আমাদের অজ্ঞানতা। আর এইজন্যই সংঘাতটাই বড় হয়, আত্মধর্ম্ম লইয়া অবিরোধে চলা যায় না। বাংলার দলাদলির ভিতর এই নিগূঢ় রহস্যই রহিয়া গিয়াছে।

একজনের মাথায় লাঠী মারিয়া অন্যজন যে অখণ্ড দলের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইবে, এমন ধৃষ্টতা বা অপরিণত বুদ্ধি দেশ-প্রেমিকের পক্ষে ধারণা করিয়া লওয়া নিজেকেই ছোট করা, নেতৃ-পক্ষকেও লোকচক্ষে হেয় করিয়া দেওয়া—ইহা ভাল নহে। ঘটনা তাহাই প্রমাণ করিতে চায় বটে; এমন কি নেতৃগণও ইহাই ব্যক্ত করেন; কিন্তু আজ ঘটনা বা প্রত্যক্ষ মনের অনুভূতিটাই বড় কথা নহে, ভিতরেও বস্তুটাকে ছাঁকিয়া বাহির করিতে হইবে। বাহিরের কদর্য্য গণ্ডগোলের মধ্যে তবেই আমরা শক্তি পাইব, সান্ত্বনা পাইব, দেশের ভাগ্যচক্র কোন কারণেই স্থগিত থাকিবে না।

আমরা কেবল অনুভূতির দ্বারাই বিষয়টা বুঝিতে চাহি নাই, প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে বাংলায় দলাদলির মধ্যে উৎকট হলাহলের অস্তিত্ব দেখিয়া সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় 'হায়, হায়' করিবার কিছু নাই। বাংলায় বিভিন্ন ধারায় যেমন জাতিকে বহুভাবে প্রবুদ্ধ করার প্রবাহ বহিতেছে, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য উভয় দিক্ হইতে দুইটী বিভিন্ন স্রোতঃ উৎসরিত হইয়াছে। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুর্ঘট নহে। একটু উপরের আবর্ত্ত ভেদ করিলে, দেখা যায়—

দেশবাসীর বুকে স্বাধীনতার বাণী আঁকিয়া দেওয়া ও জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলার তাগিদের সঙ্গে জাতির স্বপ্ন ও ভাবকে জাগাইয়া, জাতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আভিজাত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দেশের প্রাণ, অধিকন্তু বাঙ্গালীকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থা পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্ম নহে। একের মধ্যে আছে—প্রধান সুরটীকে ধরিয়া থাকা, এবং তাহা উদাত্তস্বরে প্রতি মানুষের কানে ঝঙ্কার তুলিয়া দেশের প্রাণ মন প্রবুদ্ধ করার আকুলতা, আর অন্য কণ্ঠে বাজিতে চায়—বাঙ্গালীর মজ্জাগত রস ও মাধুর্য্যের অমৃত-গাথা গমকে গমকে প্রতি মূর্চ্ছনায় এক তারে ঝঙ্কার দিয়া সপ্ত-স্বরকে বিনাইয়া বিনাইয়া বাহির করা। জাতির প্রাণের আগুন নিরবচ্ছিন্ন ফুৎকারে যেমন জ্বালাইয়া তুলিতে হয়; আবার তাহার স্থিতিকে সুরে ছন্দে লীলায়ত করার চাতুর্য্য না থাকিলে, স্থিতির মধ্যে যে ভোগ ও ঐশ্বর্য্য, তাহা হইতে জাতি বঞ্চিত হয়। এই জন্যই নবজাগ্রত জাতির মহা কলরবের অন্তরালে তটিনীধারার মত এই যুগল ফল্গু-প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন-ধারায় বহিয়াছে। ইহা নূতন নহে; বাংলার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস গভীরভাবে অন্বেষণ কর, আমার কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে—নাম করিয়া সমালোচকের চক্ষুঃশূল হইব না।

বিরোধ আমাদের মনের ময়লা। এই আবর্জ্জনা কর্ম্মক্ষেত্রের অনিবার্য্য অঙ্গ। এমন যে পবিত্র হোমশিখা তাহাতেও ধূমের মিশ্রণ থাকে। তাই বলিয়া তাহা যে কার্য্য-সাধিকা নহে, এমন কথা কে বলিবে? সহস্র গলদের ভিতর দিয়া আমরা জগন্নাথের মন্দিরে ছুটিয়াছি। যে দিন শ্রীধামে গিয়া দাঁড়াইব, সে দিন ভেদ দূর হইবে, বিরোধের কারণ থাকিবে না।

অতএব ঐক্যের অন্তরায় একের বিরুদ্ধে অন্যের কণ্ঠে বিষোদ্গার নহে, অথবা কোন শক্তিশালী পুরুষের অভাব নহে। বাহ্য ঘটনার আঘাতে এইরূপ কারণ মনের কল্পনা। আসল কথা, আত্ম-লয়ের শেষ না করিয়া কর্ম্মের ভিতর নিজেকে ফুরাইয়া পুনঃ-প্রাপ্তির সাধনক্ষেত্রে এইরূপ বিপ্লব ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। যেখানে জ্ঞানের ঘৃত-প্রদীপ জ্বলে, সেখানে সংঘাতের বজ্রপাতেও হৃদয়ভেদ ঘটে না; ইহা আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়।

রাষ্ট্র-সংহতির বাহিরে কোন শক্তিশালী পুরুষ অথবা সঙ্ঘ যদি মাথা তুলিতে চায়, তাহা হইলেও বিরোধসৃষ্টি হইবে এবং বর্ত্তমান দলাদলির ভিতর এইরূপ শক্তি বা দল বিশেষের অপ্রত্যক্ষ ইন্ধন থাকিবে। এইজন্য আমরা এই দিক্‌টাও ভাল করিয়া দেখিয়া লইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভীরুর কথা, স্বার্থপর মানুষ বা দলের কথা আমরা কোনদিন উল্লেখযোগ্য মনে করি নাই, করিবও না। আমরা দেখিতে চাই—রাষ্ট্র যার লক্ষ্যস্থান নহে, এমন মানুষ বা সঙ্ঘ দেশে আছে কি না? ইহ-বিমুখ সন্ন্যাসীর কথা ছাড়িয়া দিলে, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ধার্ম্মিক—কাহাকেও এই বিষয়ে উদাসীন দেখা যায় না। আজ নটকেও দেশের মুক্তি-যজ্ঞের কথা ভাবিতে হয়। জাতি-হিসাবে যদি ভারতকে দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাহার রাষ্ট্র-সাধনা উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। জাতির ভিত্তি দৃঢ় না হইলে কোন তপস্যাই সফল-মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে না। "নাল্পে সুখমস্তি" যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা স্ব স্ব পথে কিছু দূর গিয়া বুঝিয়াছেন—এইবার চাই মুক্তি। আত্মার মুক্তি কাল্পনিক, যদি মানুষের সার্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা না মিলে। চাই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু তাহার জন্য কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণরূপে তাঁহারা

যুক্তও হইতে পারেন না। তাহার কারণ—আত্ম-ধর্ম্মের সংস্কার, অথবা ভিন্ন পথে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির স্বপ্ন। ইঁহারা কংগ্রেসপন্থীদের প্রত্যক্ষ বাধাস্বরূপ না হইলেও, একই উদ্দেশ্য অথচ পথ-ভেদ বলিয়া ইঁহাদের দ্বারা স্থূলতঃ না হউক, তান্মাত্রিক বিঘ্ন-সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির কারণ উপাদেয় হইলেও, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা করে, এই তান্মাত্রিক অন্তরায়ে বাহ্যতঃ দলাদলির বীভৎস মূর্ত্তি প্রকটিত করিতে তেমনি খুবই সাহায্য মিলে। বাহিরের দিক্ হইতে দলাদলির সমাধান করিতে হইলে, যেমন কংগ্রেসের মতভেদ দৃঢ় করার একটা বাহ্যিক প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ কংগ্রেস ব্যতীত মানুষের স্বতন্ত্র কর্ম্মস্পৃহার অঙ্কুর উপড়াইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময়ে কংগ্রেস-নেতৃদের মুখ দিয়া এইরূপ কথা এইজন্যই মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু দলাদলির মূল কারণ অবগত হইলে, বাহির হইতে এই সকল প্রচেষ্টায় দলাদলির আগুন খোঁচাইয়া অধিক করাই হয়—ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তখন মিলনের জন্য আর ব্যস্ত হইবার ইচ্ছা হয় না, আত্মধর্ম্ম-পালনে অধিকতর উদ্যত হইয়া জাতির ভবিষ্যৎকে অতি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করার অগ্নিপ্রেরণা জাগিয়া উঠে।

কংগ্রেসের মধ্যে দলভেদ যেমন অকারণ নয়, কংগ্রেসের বাহিরে যদি নিরাসক্ত নিঃস্বার্থ কোন দল দাঁড়াইয়া উঠে, তাহাও কোনমতে অকারণ হইতে পারে না। জাতির মুক্তিপথে এইরূপ দলের খুবই প্রয়োজন আছে। যেখানে মমতা দিয়া প্রাণের অভিষেক, শ্রদ্ধায় আত্মার উদ্বোধন, সেখানে এই তৃতীয়পক্ষই উদ্যোগী এবং উদ্যত। ইহারাই নিয়ত নিঃশেষপ্রায় প্রাণের গোড়ায় অমৃত সিঞ্চন করিয়া জাতির গতি অব্যাহত রাখে। কর্ম্ম-চঞ্চল জীবনের খেই যখন হারাইয়া যায়, তখন ইহারাই আবার নীরবে, স্থির হইয়া, জটিল কর্ম্মসূত্র হাঁটকাইয়া জীবনের সূত্র বাহির করিয়া দেয়। ইহাদের কেহ চিনে না, কেহ পরিচয় রাখে না, ইহাদের কথা কেহ প্রচার করে না; কিন্তু যে জীবনের হারান পথ ফিরিয়া পায়, সে কি অকৃতজ্ঞ হয়? মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকৃতি শ্রদ্ধার উৎস গড়িয়া তুলে। একদিন শতাব্দীর চাপা আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। হিসাবনিকাশের দিনে বাছিয়া বাছিয়া হিসাবের কড়ি বাহির করার সময়ে, পাকা-খাতায় ইহাদের গৌরব-অক্ষর বাদ পড়ে না। ইহা সমাপ্তির দিনের কথা। এক্ষণে দলাদলির আবর্ত্তে কলঙ্কের দাগ ইহাদের ললাটও লাঞ্ছিত করে।

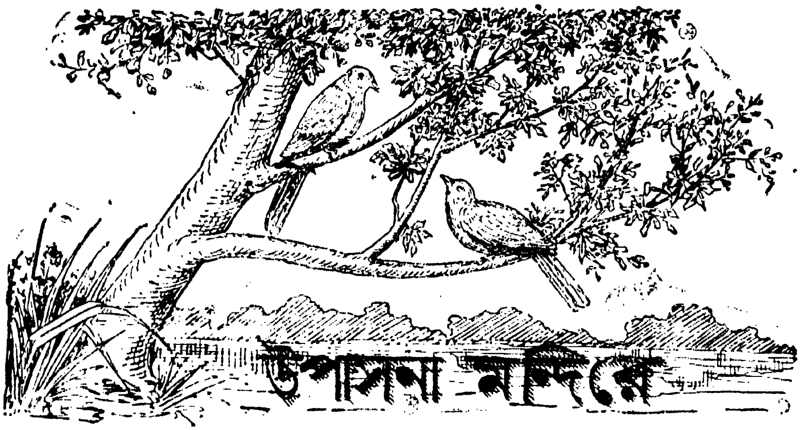
এইহেতু এক হিসাবে দলাদলিই তো জাতির প্রাণ। দলাদলি না হইলে সৃজনের বিচিত্র সম্পদ্ রক্ষা পাইবে কেন, জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিবে কি করিয়া? ভারকেন্দ্র রক্ষার জন্য যে দিকে যে অংশ চাপান দেওয়ার দরকার, তাহা নির্ম্মম হইয়াই দিতে হয়। আদর্শের পশ্চাতে দৌড় দিবার তো প্রয়োজন নাই! দলাদলির নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি চক্ষুঃপীড়াজনক; কিন্তু সবই যে প্রিয়বস্তুরূপে আমাদের সার্থক করিবে, তাহার তো কোন কথা নাই! আমরা আজও হিন্দুমুসলমানবিরোধের অন্ত চাই; কিন্তু কি নিদারুণ আঘাত সহিতে হয় বল দেখি? দলের প্রয়োজন মানুষের অহঙ্কার-প্রসূত নয়, মানুষের স্বার্থই ইহার জন্য দায়ী নহে, এইগুলি গৌণবস্তু। আসলে একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, বিশেষ বিশেষ উপাদান বহিয়া সকলে ছুটিয়াছে লক্ষ্যের পথে। খণ্ডদৃষ্টি সম উপাদান না দেখিয়া যদি কলহ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা

করে, এ গতি, এ বহন কি লোকবিশেষের জন্য স্থগিত থাকিবে? এ বিধান অকাট্য। তোমার যাহা অভাব নাই, তাহা অন্যের হস্তে দেখিয়া অনাবশ্যকবোধে কটু কথায় গালি দাও; একদিন ইহাই অমৃত-বোধে তোমায় হাত পাতিয়া চাহিতে হইবে। দেওয়ার জন্য যে গালি খাইয়া এতদিন সঙ্গ লইয়াছিল, তাহার কাজ তখন হয় তো পূর্ণ হইবে, তোমার মাঝে জীবন পাইয়া সে শেষ হইবে। এইখানেই মিলন, এইখানেই চরম ঐক্য।

দান প্রতিদানের হিসাবনিকাশ ছাড়া দলাদলির আরও একটী বৃহত্তর কারণ আছে। দান-বৈচিত্র্যে দলাদলির শোভাযাত্রা বোধহয় এইখানেই শেষ হয়। সে কত দীর্ঘদিন পথ অতিবাহনের পর সম্ভব হয়, তাহা আমরা জানি না; তবে জাতির চরম পথ পূরণ করার জন্য ইহাই প্রয়োজন।

জাতি-চৈতন্য এককালে দেশব্যাপী হয় না; বৃত্তাকারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ইহা বিশাল দেশকে জাগাইয়া তুলে। দেশের স্বাধীনতা একটা বিশাল জাতির অভিব্যক্তি নয়। তাই দেশের মধ্যে কয়েক সহস্র ব্যক্তির জীবন আশ্রয় করিয়া এই অগ্নি-চেতনা যদি স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে জাতি মুক্তি পায়, স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর এই স্বাধীন সমষ্টিপ্রাণটাকে আশ্রয় করিয়া কল্প-প্রেরণা একটা দেশের সমস্তখানি প্রাণকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলে। এই বিধান অন্যত্র দেখা গিয়াছে, ভারতেও তাহা না হইবে কেন?

আজ নিজের অপূর্ত্তি, অভাব—তাই কণ্ঠে হাহাকার। যেখানে সহযোগিতা করিয়া নিজেকে ভরাইয়া তুলি, সেখানে কোনই কলরব উঠে না; কিন্তু এমন ক্ষেত্র আছে, যাহা গোপনেই হরণ করিতে হয়, রাহাজানি করিয়া আদায় করিতে হয়। সেখানে এই দান প্রতিদানের ভঙ্গীই মানুষের ঘুমন্ত প্রাণকে চঞ্চল করিয়া তুলে। স্বপ্নের সংখ্যা অধিক; তাই তুমুল কোলাহলে কর্ম্মী বিচলিত হয়। মিলনের গান গাহিয়া আবার সকলকে ঘুম পাড়াইতে হয়। কিন্তু হৃদয় অপূর্ণ থাকিতে, মিলনের আদর্শে চিরদিন কি স্থির থাকা যায়! ছন্দের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মাথা তুলিয়া যে দাঁড়াইতেই হইবে। আপনকে ভর করিয়াই যে মহাশক্তি জাতির জীবনে জাগরণ ঘটাইতে চাহে! একটা মানব-সমষ্টি হইলেই তো জাতির স্বাধীনতা অনায়াসসিদ্ধ হয়। তাই নবযুগে লেনিন, মুসোলিনি, কামাল দল গড়িয়া জাতির ভগীরথ। ভারতে-মহাত্মার প্রতিষ্ঠা, তাঁহার পশ্চাতে দলের স্থিতি অটুট বলিয়া। সে দলটা যে পরিমাণে সিদ্ধ হইলে দেশের স্বাধীনতা মূর্ত্তি লইতে পারে, তাহার অভাব বশতঃই তো তাঁহাকে আজও ইহার তাহার সহিত যুক্তির জন্য হাত বাড়াইতে হইতেছে। এমন দিন আসিবে—ভারতের মুক্তি-পতাকা উড়াইবার যোগ্যতা তাঁর দলের শক্তির উপরই নির্ভর করিবে। সে দিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে, তাহাতে আর argument ও negotiation-এর মার-প্যাঁচ থাকিবে না, বিজিত ও বিজেতার মধ্যে মিটমাটের কথাবার্ত্তা সাঙ্গ করিয়া ভারতে সেই দলটাই অন্য সকল সমস্যার সমাধান করিবে। বাংলায় এইরূপ একটা মহাপ্রেরণা সকলের অগোচরে খেলিয়া চলিয়াছে। এই হেতু দলাদলির জন্য মানুষকে অপরাধী করায় লাভ নাই। কামালের পর পারস্যে নূতন দল গড়িয়া তুলিল সম্রাট্ রেজার্খা, আফগানে আমানুল্লা সর্ব্বস্বান্ত হইল। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই তুল্য সুযোগ দেন। তাই যেখানে উদ্বুদ্ধতা, সেইখানেই তো প্রাণ। জয়পরাজয় শক্তির ব্যবহারগুণে হয়; আমরা বাংলার অসংখ্য দলের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে এই নীতিই লক্ষ্য করিতেছি। যেখানে ত্যাগ, তপস্যা, ঔদার্য্য, সেইখানেই ভগবান মুক্তির মূর্ত্তি লইয়া প্রকট হইতে চান। সে মুক্তিব্রতী আজ ছন্নছাড়া নয়—কোন সমষ্টিপ্রাণ আজ তাহা সিদ্ধ করিবে, তাহারই বিচার চলিতেছে। এই হেতু দলাদলিতেও যেমন আমরা বিচলিত হইব না, বিরুদ্ধ লোকমত বলিয়া দলের উপশান্তিতেও আমাদের উল্লাস নাই। আমরা গাহিতেছি—"হরে মুরারে! হরে মুরারে!" এ প্রলয়-তরঙ্গ রুদ্ধ করিবার শক্তি মানুষের নাই।



উপাসনা মন্দিরে

আপনার মাঝে নারায়ণ জেগে উঠুক। সকলের মাঝে তবেই নারায়ণের প্রতিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হবে, তবেই সর্ব্বজনহিতকর মহাযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ প্রাণ নেচে উঠ্‌বে। "ওঁ হরি নারায়ণ" মন্ত্র স্মরণ করে' অভিযান কর।

এই দেবতার জাতিকে জাগাও। আত্মার জাগরণ যদি একটী মানুষের মধ্যে সত্য হয়, সর্ব্বজগতে জাগণের সাড়া উঠ্‌বে। ভারতের কাণে মন্ত্র দাও—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

কে আজ আবর্ত্তগত থাক্‌বে? ভগবানের পাঞ্চজন্যে তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হচ্ছে। সম্মুখে মহাকুরুক্ষেত্র। হে বীর, হে যোদ্ধা, অগ্রসর হও। মানুষের চেতনা জাগাও। সব নারায়ণ, সব ব্রাহ্মণ—ভারতের ব্রহ্মণ্যদেব হুঙ্কার দিয়ে উঠুক। কণ্ঠে কণ্ঠে বেদ-ধ্বনি ঝঙ্কৃত হোক।

জাগ নারী, জাগ পুরুষ, জাগাও জাতির সবখানি। বাহির হও, গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে জাগরণের গান গাও। তুমি অম্লান অগ্নিশিখা, তোমার রস, আনন্দ—সতত ঈশ্বরস্থিতি। অভীঃ, উন্মাদ বেশে উল্কার মত ছুটে চল। অন্তরের অনির্ব্বাণ আগুন উর্দ্ধশিখায় অধিকতর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক।

*　　*　　*　　*

ভাবের সঙ্গে জীবন যদি যুক্ত হয়, তবেই তো ভাবদেহ গড়ে উঠে। সে দেহ তো রক্তমাংসের ধর্ম্ম নিয়ে বাঁচে না; ভাগবত ধর্ম্ম হয় তার স্বভাব, প্রকৃতি। এই সিদ্ধ দেহ পূর্ণ উৎসর্গে গড়ে' উঠে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধ দৃঢ় করার জন্য যেমন প্রেম প্রয়োজন। তেমনই এই দেহ-ধারণ ঈশ্বরের প্রয়োজন-সাধনের কারণ। এ তনু—ভগবানের ভোগনিকেতন। রস ও আনন্দে তাই এ দেহের পোষণ ; ভোজনাদি গৌণ কারণ।

প্রতি অঙ্গের শিহরণ—সে যে মহানুভূতির স্পর্শন ও আলিঙ্গন। নিরলস তনু—কেলির উৎসব ও আনন্দের হেতু। এ চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি স্বার্থপরতন্ত্র নয়—মহাসম্ভোগ-জনিত রসোল্লাস।

বিচ্ছেদ বিরহ—বিষণ্ণ তনুমনের কারণ। যুক্তির আনন্দে প্রাণের নৃত্য—সে মহাগতি যার জীবন-ধর্ম্ম, সে যে উন্মাদ উদ্বুদ্ধ, চির-যৌবন সেখানে লীলায়ত। বসন্তের কুঞ্জবনে নিত্য উৎসব। আনন্দের তরঙ্গ-হিল্লোল যমুনাপ্রবাহ সেখানে উজানেই ছুটে। সে মধু-বৃন্দাবন যদি এ জীবন না হয়, তবে ইহার নির্ব্বাণ, মোক্ষ, লয়ই ভাল।

তাই তো প্রেমের সাথী কালিয়-দহে ডুব দিয়েই মিলে ; বিরহের হলাহল ছেনে অমৃতের উদ্ধার হয়। ওরে মরণব্যাধিজড়ান প্রাণ, মুক্তির সংবাদ শুনে আজ অভিযান কর। মিলনের মধু উৎসবে চির যৌবন, অমর দেহ লাভ হবে।

* * * *

ভারতের দেবতাকে জাগিয়ে তোল। ভারতীয় আচার, ভারতীয় শিক্ষা সাধনার প্রবর্ত্তন কর। যাও ঘরে ঘরে, মানুষের অলস প্রকৃতির মধ্যে যে আগুন সুপ্ত তা' ফুৎকার দিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে তুল্‌তে হবে। প্রতীক্ষার হেতু নাই, তোমাদের সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার নাই—যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। যে আবরণশক্তি তোমাদের অক্লান্ত তেজো-বীর্য্য ঢেকে রাখে, সেই বৃত্রাসুরকে বজ্রাহত কর। নির্ম্মল হও, সুন্দর হও। বৃহৎ যজ্ঞ সমাগম কর্‌তে হবে—হে নব ঋত্বিকের দল, কণ্ঠে তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হোক।

স্পষ্ট বিশুদ্ধ হও। বাণী তোমাদের স্পষ্ট হোক্‌। কণ্ঠে উদাত্ত ঋক্‌ ঝঙ্কার দিয়ে উঠুক। মন্ত্রশব্দ যত বিশুদ্ধ হবে, তত তাহা কার্য্যকরী হবে, তত লোকের হৃদয় উদ্বুদ্ধ কর্‌বে, মানুষের মর্ম্মে নূতন শক্তি সঞ্চার কর্‌বে।

* *

*

ব্যথার তপস্যা

—:o:—

ব্যথাও শক্তি। এই মহাশক্তি দিয়া নূতন জগৎরচনা হয়। হৃদয়ের তপস্যা ব্যথা-রূপে প্রকাশ পায়। এই বিপুলা হৃৎশক্তিকে চিৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার যে কৌশল তাহা এক অধ্যাত্ম জীবনশিল্প। সে শিল্প অধ্যাত্মযোগীর বিজ্ঞেয়।

*　　*　　*

ব্যথা জাগায় আঘাত। কত রূপে সে আঘাত বুকে বাজে—জীবনকে মরুভূমি করিয়া দেয়। কাল বুঝি সে আঘাত কতক মুছায়; কিন্তু হয়ত আবার সবখানি পারে না। যত গভীর আঘাত, তত দীর্ঘস্থায়ী হয় অনুভূতি-বেদনা। কখনও একই বেদনার মূলে বারম্বার আঘাতের প্রবাহ সমস্ত জীবনের মর্ম্ম নিঙড়াইয়া রক্তস্রোতঃ যেন চুঁচিয়া বাহির করিয়া লয়। জীবনের এই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা যাহার সেই কেবল ইহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে। কল্পনায় নাট্যাভিনয় মাত্র সম্ভাবনা। তাহাও উপভোগ্য।

*　　*　　*

ব্যথার আঘাত কখনও হৃদয়ে পায় নাই, এমন লোক সংসারে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু আঘাতের তারতম্যে উপলব্ধির বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। স্প্রীঙের গদীর মত কেহ আঘাত পাইলেই লুফিয়া ফেরত দেয়, গায়ে ব্যথা বড় একটা মাখে না। অন্যে স্পঞ্জের মত সবখানি আঘাতের নির্ম্মমতা অন্তরে শুষিয়া লইয়া, অন্তরেই ভীয়ান চড়াইয়া দেয়। হৃদয়-কটাহে জ্বাল দেওয়া চলিতে থাকে। গরল ছানিয়া অমৃতের সন্ধান যদি কোন দিন সম্ভব হয়, তবেই মঙ্গল—নতুবা মর্ম্মদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়াই খাক হইতে হয়। এই খাক্ হওয়াই বুঝি তার পরিণাম। এরূপ দরকচা জীবন বিধাতার অভিশাপ রূপে যতদিন মাটীর বুকে বাঁচিয়া থাকে, ততদিনই অশান্তি। মরিলেই বুঝি জুড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সারা সংসার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে। এমন অভিশাপের কেন্দ্র জীবন—মরণের চেয়ে অসহনীয়। মৃত্যু ইহার চেয়ে ঢের ভাল।

*　　*　　*

"ওরে মৃত্যু, তুই মোরে কি দেখাস্ ভয়—ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়—"এমন উক্তি ব্যর্থ প্রেমিকের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। মরণ তুচ্ছ, হৃদয়ে যে শ্মশানচুল্লী নিয়ত জ্বলিতেছে—মুহূর্ত্তের মৃত্যুযন্ত্রণা তার চেয়ে ঢের বেশী সুখকর। তিলে তিলে তুষের আগুনে দহিয়া মরার চেয়ে, একটী আঘাতে অপমৃত্যুও বরণীয়। মরণপণ সঙ্কল্প জাগাইয়া কোনও একটা মহালক্ষ্যে জীবন বলি দেওয়ার প্রেরণা ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়। আসলে মরণই বাঞ্ছনীয়, উপলক্ষের মহনীয়তা এই প্রাণের অন্তিম নাভিশ্বাসকে একটুও মহনীয়তর করিয়া তুলে না।

*　　*　　*

কিন্তু ব্যথার আঘাত আদৌ পাই কেন? এ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকের, জীবনশিল্পীর নয়। আঘাত দেয়—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া ভগবান্। ভক্তির দৃষ্টিতে এইটুকু মানিয়া লইলেই উপস্থিত পক্ষে

যথেষ্ট। ভগবান সচ্চিদানন্দময়। তাঁর স্পর্শ বেদনার আঘাত জাগায় কেন? এইটুকুই আমাদের অনুসন্ধেয়। এই বেদনার কারণ যদি খুঁজিয়া পাই, তবে ব্যাধির নিদান জানিয়া যেমন সুচিকিৎসক রোগের প্রতিকারে যত্নবান্ হন, তেমনি আমরাও বেদনার প্রতিবিধানে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি। এই প্রতিকারই—হৃদয়ের রূপান্তর।

*   *   *

বুকে বেদনা পাই—ইহা হৃদয়েরই স্বভাব। এই স্বভাবধর্ম্ম বর্ত্তমানে বেদনার প্রতিকার সম্ভব নয়। কারণ ইহা নয় তাহা একটা ঘটিবেই। প্রত্যেক উপলক্ষকে হেতুস্বরূপ ধরিয়া ব্যথার মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ব্যর্থকাম হইব। প্রত্যেক পাতাটী ছিঁড়িয়া তরুরাজকে নিষ্পত্র করার ন্যায় এই উদ্যম বাতুলতা। বৃক্ষকে যদি ধ্বংস করিতে চাও, নির্ম্মূল কর। তেমনি ব্যথার প্রতীকার—স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন। হৃদয়ের বিকৃতি যদি দূর হয়, বেদনার স্পর্শও আনন্দের স্পর্শে রূপান্তরিত হইতে পারে। এ হৃদয়-বিকার দূর করাই যোগীর সাধনা।

*   *   *

বিকার—অহঙ্কার। অভিমান ও মমতা—এই অহমিকার রূপভেদ মাত্র। হৃদয় অভিমানে ফুলিয়া উঠে। আপন জনকেও পর মনে হয়। এতটা নিষ্করুণতা আর কিসে সম্ভব হয়? ব্যথার অনুভূতি আর কিছুতেই এত নিবিড় ও গভীর হয় না, যতটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে হয়। বিশেষ, এই সময়ে দরদীর একটুও সহানুভূতি না পাইলে, সত্যই তাহা দুঃসহ হয়। এইখানেই অহঙ্কার ধরা পড়ে। তুমি যদি আপন হও, তবে কেমন করিয়া এতখানি পরের মত আমায় দূরে ঠেলিয়া দিতে পার! ইহাই অভিমান। ইহাই আমার ব্যথা। প্রেমিকের হৃদয়ে এই ব্যথার কণ্টক উৎপাটন করার একমাত্র উপায়—আমিত্বের উৎসর্গ। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"—এই সাধুবাণী অন্তর-শোধনেরই সিদ্ধ সঙ্কেত। হৃদয় যদি শুদ্ধ হয়, এই মনই বৃন্দাবনে পরিণত হয়।

"অন্যের স্বভাব মন   আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি ॥"

—হৃদয় যখন নির্ব্বিকার হইয়াছে, ব্যথাহীন বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে, তখনই সে বৈকুণ্ঠে নরনারায়ণ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। জনে জনে এই নারায়ণের জাগরণ বুকে করিয়াই ধরাকে স্বর্গে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

*   *   *

হে প্রেমিক, জাগ্রত হও। হৃদ্‌গ্রন্থী মোচন করিয়া, প্রকৃতিস্থ হও। ব্যথার আঘাত যদি বড় দুঃসহ হয়, অন্তরের সমুদ্রে আর একবার ডুব দাও—একেবারে অতলে গভীরে তলাইয়া যাও। প্রতিকার—নিজ অন্তরেই। ঐ লবণসমুদ্র মরণ-পণে মথিত করিয়াই অমৃত উঠিবে। তুমি নিরাশ হইও না। জাগ, জাগ—বুকভরা তপ্তশ্বাস স্পন্দনে স্পন্দনে উদ্‌গার করিয়া বাহিরে নিষ্কাশিত করিয়া দাও। স্বরূপই প্রকৃতি। অন্তর শূন্য হইলেই এই দিব্য প্রকৃতির বুকেই দেবতা নামিবেন। যেদিন বলিতে পারিবে—

"ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য এ মন্দির মোর",

যেদিন আকুল স্বরে করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া ডাকিবে—

"শূন্য এ হৃদয়পুরে আও আও মুরারি"

—সেদিন আর তোমার করুণ আকৃতি জীবন-দেবতা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না—অন্তর্যামী

চিদ্‌ঘন সুন্দর বেশে তোমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া চির সান্ত্বনার স্পর্শে তোমায় অভিষিক্ত করিবেন—সে আস্বাদের প্রত্যেকটী তরঙ্গ অমৃতময়। মৃত্যু স্বয়ং তখন অমরত্বের দূত-রূপে তোমায় আলিঙ্গন দিবে—এ জীবনেই নবজীবন লাভ করিবে। ইহাই নবজন্ম। ব্যথার সমুদ্রক্ষোভ তখন এই নবজন্মেরই গর্ভবেদনা-রূপে তোমার চক্ষে নূতন অর্থ মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইবে। এই হৃদ্‌গ্রন্থী মোচন হইলেই চিরযৌবনের পরম রহস্য তোমার মর্ম্মগোচর ও করায়ত্ত হইয়া উঠিবে। পাইবে অমরত্ব—কেন না, বিকারহীন প্রেমকেই তখন শাশ্বত মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে নিত্য পূর্ণ করিয়া বুকের শতদলে ফুটাইয়া তুলিয়াছ। নবযুগের মানুষ, প্রেমের জাতি-সৃষ্টি হইয়া উঠিবে—তোমারই বুকখানি কেন্দ্র করিয়া। একটা জাতির মর্ম্মবেদনা রূপান্তরিত করিয়া নবজাতি রচনার যে বিরাট্ তপস্যা তাহার কথা বারান্তরে আলোচনা করিব।

আঁধারের ডাক

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

আলোক এ নয়, আজকে আমায় আঁধার দিল ডাক,
শ্যামের বাঁশী নয় গো, এ যে মহাকালের শাঁখ।
অন্ধকারের নীলসাগরে ঢেউয়ের জাগরণ,
পাঠায় তারা আজ্‌কে মোরে এ কোন্ আমন্ত্রণ।
দুর্দ্দিনেরই ঝড়ের মাঝে নিব্‌ল বাতি মোর,
রাত্রি এসে পরায় হাতে কালো রাখীর ডোর।
আজকে আমায় কইবে সে কোন গোপন কথা তার,
বুকের 'পরে দেয় তুলে তাই কোন্ সে উপহার।

কেমন কালো বুকের মাঝে মুখখানি মোর টানি',
আলোর কথা ভুলিয়ে দিল কেমন করে' জানি।
কানের কাছে গেয়েছে আজ সব ভোলাবার গান,
অন্ধকারের কাজল মেঘে ঢাক্‌ল আমার প্রাণ।
মুখের পরে নীলাম্বরীর ঘোম্‌টা করি' ফাঁক,
আঁধার আজি মোহন রূপে দিল আমায় ডাক্।
আলোর কথা আজ ভুলেছি, ভুলেছি আজ সব,
কালোর আঁচল ঢেকেছে মোর সকল অবয়ব।

* *
*

বিশ্বসম্রাট্ অজাতশত্রু ও পারস্য-রাজ্য

[শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ]

(২)

অজাতশত্রুর রাজত্বকাল

অজাতশত্রুর রাজ্যারম্ভের তারিখ পাওয়া গিয়াছে—৫৪৪-৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। ইঁহারই রাজত্ব-কালের মধ্যে যে গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছিল, এ-কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। Vincent Smith তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের (Early History 3rd Edition) শেষে যে সময়ের নির্ঘণ্ট দিয়াছেন তাহাতে তিনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের কথা লিখিয়াছেন—৪৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ এবং এই ঘটনাকে অজাতশত্রুর রাজত্বকাল মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য আমি আমার সময়ের নির্ঘণ্টে অজাতশত্রুর রাজ্যশাসনের তারিখ ধরিয়াছি—৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে অজাতশত্রুর রাজ্যকাল ৫৮ বৎসর হইতেছে। ইহা অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিবার একটা দৃষ্টান্তের কথা আপনারা সকলেই জানেন। ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি—বিশ্ব-সম্রাট্ মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল ৪২২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। অজাতশত্রুর পরে দর্ভক, উদয়াশ্ব, নন্দিবর্দ্ধন এবং মহানন্দী এই চারিজন রাজা রাজত্ব করিবার পর মহাপদ্ম নন্দ রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতে শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালের গড় হয় ১৬ বৎসরের কিছু কম। সুতরাং আমরা Chronology সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অধিকার হইতে নিশ্চয়তার সীমাতে পঁহুছিলাম।

পারস্যের রাজগণ

এই সময়ের পারস্যের রাজগণের সময়ের নির্ঘণ্ট এইরূপ :—

রাজার নাম—Cyrus the Great, রাজত্বের পরিমাণ—২৯ বৎসর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ—৫৫৮ খৃঃ পূঃ। (কাম্বোডিয়া-বিজয়ী বিশ্বসম্রাট্ বিম্বিসার তখন ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত)।

রাজার নাম—Cambyses, রাজত্বের পরিমাণ ৭ বৎসর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ—৫২৯ খৃঃ পূঃ।

রাজার নাম—Darius I, রাজত্বের পরিমাণ—৩৭ বৎসর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ—৫২২ খৃঃ পূঃ।

রাজার নাম—Xerxes I, রাজত্বের পরিমাণ—২০ বৎসর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ—৪৮৫ খৃঃ পূঃ। (৫৪৪-৪৩ খৃঃ পূঃ সম্রাট্ অজাতশত্রুর রাজ্যারম্ভ। ৪৮৫ খৃঃ পূঃ সম্রাট্ অজাতশত্রুর রাজ্যাবসান)।

ইহাতে পাওয়া গেল—Cyrus যে সময়ে Astyagesকে রাজ্যচ্যুত করিয়া Media-র সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে কাম্বোডিয়া-বিজয়ী প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট্ বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। Cyrus-এর জীবনকালেই বিম্বিসারের মৃত্যু হয় এবং অজাতশত্রু তাঁহার স্থানে সম্রাট্ হয়েন, আর তাঁহার রাজ্যাবসান এবং Darius I-এর রাজ্যাবসান একই সময়ে হইয়াছিল। সুতরাং Cyrus,

Cambyses ও Darius I—এই তিনজনই অজাতশত্রুর সমসাময়িক রাজা ছিলেন।

ইতিহাস

হিরদতসের ইতিহাসে পাওয়া যায়—Cyrus-এর পিতা পারস্যের লোক ছিলেন—তিনি Mediaনিবাসী ছিলেন না। তাঁহার মাতা Media'র রাজকন্যা ছিলেন। মিডিয়ার রাজা Astyages জন্ম মাত্রেই তাঁহার দৌহিত্র Cyrusকে নিধন করিতে চেষ্টা করেন; কারণ Cyrus যখন মাতৃগর্ভে তখন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার পুত্র তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিবে। Cyrus'এর পিতা যে পারস্যের ক্ষুদ্র নৃপতি ছিলেন, সে "পারস্য" বর্ত্তমান কালের পারস্য নহে, উহা বাহ্লিক বা Bactria প্রদেশ (১)। এ Bactria যে ভারতবর্ষীয় বিশ্বসম্রাট্ বৈবস্বত মনুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, একথা পারস্যদেশের "Legendary History"তেই পাওয়া যায়। ঐ ইতিহাসে বৈবস্বত নাম (ঐবস্বত-যৈমস্বিত) "Jamsheed" এই আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ ইতিহাসে পাই—Jamsheed-এর সময়েই বাহ্লীকদেশে সভ্যতার আমদানী হয়—"Djemsheed, during a reign of many years, accomplished much for the advancement of his people. He introduced the use of iron and the weaving and embroidering of woollen silk and cotton stuffs. (Benjamins "Persia" p 2). ঠিক ইহার পরেই পাই—Djemsheed (e. Jamsheed) divided his subjects into four castes or classes: priests, warriors and traders, the fourth class was composed of husbandmen."

ইহাতে Jamsheed যে ভারতবর্ষের নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুতরাং বাহ্লিক দেশের বাহিরে জমসিদের "Deev" বা "দেব" উপাধিধারী প্রজাগণ ভারতবর্ষীয় 'দেব" উপাধিধারী দ্বিজাতীয় প্রজা হইতেছেন (২)। তাঁহাদেরই কথা পারস্যের "Legendary History"তে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

"Shah Djemsheed also enlisted the subjeet Deeves into the service of making bricks of which the invention is attributed to him. He is likewise credited with the employment of hewn marble in the construction of buildings, with the discovery of perfumes, the arts of healing, the invention of ships and many other useful means for benefiting the race. (Benjamin's "Persia" p 3)

ইহা "পারস্য" অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের অপর "পারের" দেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস নহে, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তমমনুর অর্থাৎ "Founder of the VIIth Imperial Dynasty'র" সময়ে দিগ্বিজয়-সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে বাহ্লিক প্রভৃতি Turanian বা Tartar Country'তে আর্য্য অভিযান ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস।

(১) "The founder of the Persian nation was Kaiomurs·········He established his capital at Balkh." Benjamins "Persia" p. 1.

(২) দ্রবিড় দেশের নামান্তর ছিল দিব্ দেশ। ঐ দেশ হইতে আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে মানভূমে এবং মানভূম হইতে উত্তর ভারতে migrate করেন—তাই দ্বিজাতীয় বা আর্য্যগণের সকলের উপাধিই "দেব"। "বাঙ্গালী নামের অর্থ কি?" ২৮১ পৃঃ

এই বিশ্বসম্রাট্ জমসিদ বা বৈবস্বত মনুর সাম্রাজ্যই বিশ্বসম্রাট্ যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মগধের বার্হদ্রথ বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে এই সাম্রাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্যই তাহার অমাত্য পুলীক তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। পুলীকের পুত্র প্রদ্যোত দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ায় মগধেশ্বরের সকল সামন্ত তাহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে পশ্চিমে মধ্য ইউরোপ এবং পূর্ব্বে কাম্বোডিয়া মগধের প্রদ্যোত-বংশীয় সম্রাট্গণের হস্তচ্যুত হয়, এই কথা আমরা পাইয়াছি (৩)। এখন প্রশ্ন হইতেছে—বাহ্লিক বা পারস্যদেশ; মিদিয়া (মেদ—মদ্র) দেশ বা ইরাণ এবং বৎস বা পশ্চিম কোশল (Mesopotomia) এই সময়ে মগধসম্রাটের হস্তচ্যুত হইয়াছিল কিনা? পূর্ব্বে পাইয়াছি—মগধের রাজপুত্র বিশ্ববজ্রী জার্ম্মানীর অন্তর্গত Maghdeburgএ মগধসম্রাটের সামন্ত স্বরূপ রাজত্ব করিতেন এবং তিনি দুর্নীতিপরায়ণ প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মধ্য ইউরোপে স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ৯২২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের ঘটনা (৩)। ইহার ৫০০ বৎসর পরে যে পুনরায় মধ্য ইউরোপ মগধসম্রাট্ মহাপদ্ম নন্দের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহাও আমরা পাইয়াছি (৪)। ইউরোপ মগধ-সম্রাটের অধিকারচ্যুত হওয়ার অর্থ এই, যে ঐ সময়ে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত ইরাণ ও তুরাণ এই উভয় দেশই মগধসম্রাটের অধীনে ছিল। আবার যখন ইউরোপ পুনরায় মগধ-সম্রাটের অধীনে আসিল, তখনও ইরাণ ও তুরাণ এই দুই দেশই মগধসম্রাটের অধীনে ছিল—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই দুই সময়ের মধ্যে ইরাণ ও তুরাণ মগধসাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়াছিল, এই কথা যিনি বলেন, ঐ কথার প্রমাণের ভারও তাঁহারই উপরে। প্রকৃত পক্ষে, এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব presumption হইতেছে এই, যে মগধের বার্হদ্রথ-বংশের সম্রাট্-গণের স্থলাভিষিক্ত সম্রাট্ অজাতশত্রু বিশ্বসম্রাট্-পদবীর সহিত ইরাণ তুরাণের অধিরাজের পদও পাইয়াছিলেন।

Cyrus-এর পূর্ব্বপুরুষগণ

পারস্যের কথা শাস্ত্রমূলক ইতিহাস (Legendary History)তে পাই—Cyrus-এর পূর্ব্বে যাঁহারা পারস্য দেশে বৈবস্বত মনু (Djemsheed)-এর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে

Zohak, Feridoon, Kaikobad ও Kaikaoos। হিরদতসের ইতিহাসে Zohak-এর নাম পাওয়া যায় Deiokes, Feridoon-এর নাম পাওয়া যায় Phraortes এবং Kaikaoos-এর নাম পাওয়া যায় Cyarares। হিরদতসের কথায় বোঝা যায়—ইঁহারা সকলেই Media'র রাজা ছিলেন এবং Pnraortes বাহুবলে Persia অর্থাৎ Bactria জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং কথাশাস্ত্র-মূলক ইতিহাস ও গ্রীক সাহিত্যমূলক ইতিহাসে কতকটা সমন্বয় হইতেছে।

কথাশাস্ত্র ইরাণ ও তুরাণকে এক করিয়া Cyrus বা Kaikhasroo'র পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন। Darius I-এর Inscription-এ পাওয়া যায়—তাঁহার পূর্ব্বে Hakhamanish বা Achoemenes-এর বংশের ৮ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম এইরূপ:—

1. [Achoemenes] 2. [Teispes]
3. [Cyrus 1] 4. [Cambyses 1]

(৩) "প্রবর্ত্তক" আষাঢ় ১৩৩১, পৌষ ও মাঘ ১৩৩১।
(৪) "প্রবর্ত্তক" চৈত্র ১৩৩১।

5. [Aryarmena] 6. [Arsames]
7. Cyrus II the Great 8. Cambyses

এই তালিকার প্রথম ছয় জন রাজার নামের সহিত Media'র রাজগণের নামের সাদৃশ্য নাই। ইহাতে পাওয়া যাইতেছে—এই ছয় জন Media বা ইরাণ দেশের রাজগণের অধীনে Bactria বা তুরাণ দেশের অন্যত্র সামন্ত রাজা ছিলেন, পরে Cyrus the Great নিজকে তুরাণের সামন্তের পদবী হইতে যুক্তরাজ্য ইরাণ ও তুরাণের অধিরাজের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং তাহার পর দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া মাইনর ও মেসপাটেমিয়া প্রভৃতি দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ

হিরদতস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত Deiokes প্রমুখ Media'র রাজগণ এবং Medo-Persia'র Cyrus the Great ও তৎপুত্র Cambyses এর ইতিহাসে India অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঐ ইতিহাসের Darius'এর রাজত্বের বিবরণে নিম্নলিখিত কথা পাওয়া যায়—Darius সিন্ধুনদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, Skylax-এর জিম্মায়, সিন্ধুনদ বাহিয়া যাইয়া সমুদ্রপথে তাঁহার দেশে ফিরিবার জন্য কয়েকখানি অর্ণবপোত পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা ৩০ মাসের পরে তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল—(Herodotus IV. 44 :—)

"Of Asia the greater part was explored by Darius who desiring to know of the river Indus......where it runs into the sea with ships, besides others whom he trusted to speak the truth, Skylak also, a man of Caryanda. These, starting from the city of Carspatyros and the land of Pactyike, sailed down the river towards the east and the sunrising to the sea, then sailing over the sea westwards, they came in the thirtieth month to that place whence the king of the Egyptians had sent the Phoenicians, of whom I spoke before, to sail round Lybia."

ইহা সমুদ্র-যাত্রার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পরেই পাই :—

"After these had made their voyage round the coast, Darius both subdued the Indians and made use of this sea" (Herod Bk. IV, 44)

ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহের কথা বা কোনরূপ ভৌগোলিক বিবরণ নাই—সুতরাং ইহা সরল ভাবের কথা হইলে বুঝিতে হইত, সিন্ধুনদের পারের লোক ঐ নদদ্বারা Darius-এর নৌবাহিনী চালাইতে বাধা দেয় নাই। তথাপি ঐতিহাসিকগণ এই কথার উপরে নির্ভর করিয়া Daruis-এর সাম্রাজ্যের মানচিত্রে, সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারের কতক স্থানকে একটি লাইন টানিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহা Darius-এর সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া দেখাইয়াছেন। বাদীও তাঁহার আর্জ্জীতে যে ভূমির দাবী করেন না এবং প্রতিবাদীও যাহা বাদীর বলিয়া স্বীকার করেন না, বিচারক সেই ভূমির জন্য বাদীকে ডিক্রী দেন—এ কেমন বিচার? আমরা জানি, Daruis-এর রাজ্যাভিষেকের ২২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশ্ব-সম্রাট্‌গণের স্থলাভিষিক্ত, বিশ্বসম্রাট্‌পদবী-স্পর্দ্ধী, শাক-প্রবর্ত্তক দিগ্বিজয়ী, সমগ্র ভারতবর্ষ, Farther India ও সিংহলের অধীশ্বর সম্রাট্ অজাতশত্রু সিন্ধুর পূর্ব্ব পারের সমস্ত দেশে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তথাপি আমরা বিনা প্রমাণে, ইতিহাসের উক্তির বিরুদ্ধে বলিব—Darius সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার

করিয়াছিলেন—এ কেমন ব্যবস্থা? "Subdued the Indians" কথার 'Indians" যদি সিন্ধুর পূর্ব্ব পারের লোক হয়, তবে এই কথাতে সম্রাট্ অজাতশত্রুর গোটা ভারত সাম্রাজ্যই Darius কে দিয়া দিতে হয়—তবে অজাতশত্রু থাকিবেন কোথায়?

সত্য কথা মিথ্যা হইতেও অধিকতর বিস্ময়জনক

হিরদতসের ইতিহাসের উপরে নির্ভর করিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না—Darius অজাতশত্রুর সমস্ত সাম্রাজ্য নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন; কিন্তু সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে আমরা হিরদতসের ইতিহাসেই পাইব—Cyrus the Great মগধের নৃপতি অজাতশত্রুর পশ্চিম আসিয়াতে ও ইজিপ্টে উপরিস্থ সম্রাটের পদবী স্বীকার করিতেন। তৎপুত্র Cambyses ইজিপ্ট বিজয় উপলক্ষে ঐ দেশের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেইজন্য সম্রাট্ অজাতশত্রু Cambysesকে রাজ্যচ্যুত করিয়া Cambyses-এর ভ্রাতা Bardiya-কে ইরাণ ও তুরাণে এবং Cyrus কর্ত্তৃক বিজিত অন্যান্য দেশে সামন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৭ মাস শান্তিতে রাজত্ব করিবার পর Darius ষড়যন্ত্র করিয়া এই Bardiya-কে গুপ্তঘাতকের ন্যায় হত্যা করেন এবং প্রথমে যুদ্ধ এবং পরে সাম-নীতি অবলম্বন করিয়া মদ্র-পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন এবং বিশ্বসম্রাট্ অজাতশত্রুর সামন্তরূপে তাহা ভোগ করেন।

Cambyses-এর রাজ্যচ্যুতি

প্রচলিত ইতিহাসে পাই—Cambyses ইজিপ্ট জয় করিতে যাইবার পূর্ব্বেই নাকি তাঁহার ভ্রাতা Bardiyaকে হত্যা করিয়াছিলেন; তারপর তিনি ইজিপ্ট গিয়া এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, যে লোকে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। ইহার পরে গৌমত নামে এক "মগ" নিজেকে Cyrus-এর পুত্র Bardiya বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজ রাজ্য অধিকার করে এবং তাঁহার সামন্তদিগকেও বশ্যতা স্বীকার করায়। এই কথা হিরদতসের ইতিহাসেও আছে, Darius-এর Behistun Inscription'এও এই কথা পাওয়া যায়। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসের অযোগ্য। রাজার ভ্রাতাকে রাজা হত্যা করিলে সে কথা গোপন থাকিতে পারে না, আর অপরিচিত লোকের রাজার ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথাও একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। সুতরাং ধরিতে হয়—Cambyses ইজিপ্টে অত্যাচারপরায়ণ হইলে প্রজাশক্তি অথবা উপরিস্থ রাজশক্তি বিচার করিয়া Cambyses-কে রাজ্যশাসনের অযোগ্য সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার পরিবর্ত্তে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। Cambyses এই সংবাদ ইজিপ্টে থাকিতেই প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আত্মহত্যা করেন। ইহার পরে প্রজাদিগের মধ্যে Darius প্রমুখ ৭ জন পারসীক ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে নূতন রাজাকে হত্যা করে এবং এই হত্যার পর Darius যুক্ত মদ্র-পারস্য রাজ্যের নূতন রাজধানী Pasargadae অধিকার করেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য অধিকার করিতে তাঁহার বহু বৎসর লাগিয়াছিল এবং সমস্ত রাজগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইতেও তাঁহার বহু প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। Darius তাঁহার Inscription-সমূহে এই সব ব্যাপারকে বিদ্রোহদমন বলেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই যে বিদ্রোহী ছিলেন, ইহা এই সময়ের ইতিহাস পাঠে বোঝা

যায়। তথাকথিত গৌমত প্রকাশ্য রাজসভায় Cyrus-এর পুত্র Bardiya বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন এবং সমস্ত প্রজা এবং সমস্ত সামন্তগণ তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিনি ৭ মাস পর্য্যন্ত প্রশংসার সহিত সাম্রাজ্য-শক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন :—

"Thus when Cambyses had brought his life to an end, the Magian became King without disturbance, usurping the place of his namesake Smerdis (Bardiya B) the son of Cyrus, and he reigned during the seven months which were wanting yet to Cambyses for the completion of the 8 years; and during them, he performed acts of great benefit to all his subjects, so that after his death all those in Asia except the Persian themselves mourned for his loss, for the Magian sent messages abroad to every nation over which he ruled and proclaimed freedom from military service and from tribute for 3 years." (Herod Bk. III, 67).

পারস্যদেশের প্রজাসম্বন্ধেও হিরদতস বলেন—Cambyses যে Bardiya-কে হত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিত না; তাহারা বিশ্বাস করিত—Cyrus-এর পুত্র Bardiya'ই পারস্যের সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন (Herod III, 66).

সুতরাং Darius যে বলেন—গৌমত নামক এক "মগ" নিজকে Cyrus-এর পুত্র Bardiya বলিয়া পরিচয় দিয়া মদ্র-পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, এই কথা মিথ্যা হইতেছে। Cambyses-এর মৃত্যুর পর Cyrus এর Bardiya ভিন্ন অন্য কোন উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিল না; সুতরাং Bardiya ৭ মাস পর্য্যন্ত যুক্ত মদ্র-পারস্য-সাম্রাজ্যের defacto এবং dejure এই উভয় প্রকারের Emperor ছিলেন। এমতাবস্থায় Darius তাঁহাকে হত্যা করাতে বিদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী এবং গুপ্ত-ঘাতক (assasin) সাব্যস্ত হইতেছেন।

তারপর যে ব্যক্তি Cambyses-এর ভ্রাতা বা তথাকথিত গৌমতকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহাকে গ্রীক-সাহিত্যে Petizeithes বলা হইয়াছে। হিরদতস বলেন—Petizeithes কথার অর্থ Care-taker। Cambyses ইজিপ্টে যুদ্ধাভিযান লইয়া যাইবার পূর্ব্বে নাকি এক "মগ" বা মঘকে Petizeithes অর্থাৎ Care taker নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এই মঘ তাহার নিজ ভ্রাতা গৌমতকে Cambyses'এর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া যুক্ত-রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। হিরদতস এই রাজপদবী-স্পর্দ্ধীর কথা বলেন :—

"The Magian Petizeithes brought him and seated him on the royal throne and having so done he sent heralds about to the various provinces and among others to the army in Egypt to proclaim to them that they must obey Smerdis (Bardiya), son of Cyrus, for the future instead of Cambyses. 62. So then, the other heralds made this proclamation and also the one who was appointed to go to Egypt, finding Cambyses and his army at Agbatana in Syria, stood in the midst and began to proclaim that which had been commanded to him by the Magian." (Herod Bk. III, 61 62).

ইহাতে বোঝা যায়—এই Magian Petizeithes Cambyses'এর অধীন ছিলেন না, Cambysesই তাঁহার অধীন ছিলেন—তাই তিনি Cambyses-এর বিপুল বাহিনীর সম্মুখে Cambysesকে রাজ্যচ্যুতির আজ্ঞা জানাইতে পারিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)



তন্ত্রশাস্ত্রে ভাব-ভেদ

(২)

[শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ]

আবার কোন কোন তন্ত্রে আম্নায়ভেদ অনুগত ভাব-ভেদের কথা আছে। "নিরুত্তর তন্ত্রে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

দিব্যে বীরে চ যো ভেদঃ স ভেদঃ পরিভাষ্যতে।
দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।
পূর্ব্বাম্নায়োদিতং কর্ম্ম পাশবং পরিকীর্ত্তিতং।
যদুক্তং দক্ষিণাম্নায়ে তদেব পাশবং স্মৃতং।
পশ্চিমাম্নায়জং কর্ম্ম বীরপশুসমন্বিতং।
উদঙ্মুখোদিতং কর্ম্ম দিব্যভাবান্বিতং প্রিয়ে।
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ পিতৃকাননে।
উর্দ্ধাম্নায়োদিতং কর্ম্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে।
শ্মশানগামিনো বীরাঃ কলাং পূজন্তি সর্ব্বদা।
শ্মশানগামিনো বীরা গুপ্তা যোনীব পার্ব্বতী।
গোপনাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ব্যক্তাচ্চ কুলনাশনং।
দিব্যবীরান্বিতং কর্ম্ম ফলদং গোপনান্বিতং।
দিবৈঃ সুরাণাং বীরাণাং যদ্ যদ্ কর্ম্ম চ যোগিনাং।
তৎ সর্ব্বং গোপনং কার্য্যং প্রকাশান্নিষ্ফলং ভবেৎ।

যাঁহারা আম্নায় তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট উদ্ধৃত বচনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইবে না। তবে আম্নায় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখা এখানে সম্ভবপর নহে। যদি আম্নায় সম্বন্ধে কিছু লিখিবার অবকাশ হয়, তবে পরে লিখিব। এখানে যে গোপনের কথা লেখা হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে তন্ত্রশাস্ত্রই যে কেবল গোপনের কথা বলেন তাহা নহে, শ্রুতিও ব্রহ্মবিদ্যার গোপন করিবার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ—যে সাধারণ লোক তত্ত্বকথার মর্ম্ম না বুঝিয়া নানাবিধ ভ্রমে পতিত হইতে পারে ও উহা দ্বারা সত্যের অপলাপও হইতে পারে।

এই ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত সপ্ত আচারের কথা "বিশ্বসার তন্ত্রে" যে উল্লিখিত হইয়াছে, উহার নামোল্লেখ পূর্ব্ব প্রবন্ধেই করা হইয়াছে। "কুলার্ণব তন্ত্রে" শিব বলিতেছেন :—

সর্ব্বেভ্যশ্চে-ত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

এই বচন "মহাচীনাচার" প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রেও পাওয়া যায়; আবার অন্ততঃ এক স্থলে নয়টী আচারের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু নয়টী আচার "বিশ্বসার" প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্রেরই সম্মত নহে। এখন

এই যে সপ্তবিধ আচার ইহাদের সার্থকতা কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বেদাচারের উদ্দেশ্য এই, যে উহা দ্বারা সাধকের বহিঃশুদ্ধি নিষ্পন্ন হয়। বেদাচারস্থিত সাধক সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারে আপনাকে শুদ্ধ ও নির্ম্মল রাখিবার চেষ্টা করেন ও ক্রমশঃ উহা তাঁহার স্বভাবে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তাঁহার কর্ত্তব্য সংক্ষেপে "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।

ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥

বেদাচারপরায়ণ সাধকের আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু "মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র" বচন দেখিলে উহা সাধারণভাবে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বেদাচার অবলম্বন করিয়া বহিঃশুদ্ধি স্বভাবগত হইলে, সাধক বৈষ্ণবাচারে প্রবৃত্ত হইবেন। বৈষ্ণবাচার ভক্তির অবস্থা; এই আচারাবলম্বী সাধক ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রাখিয়া যাহাতে ইষ্ট-দেবতার সহিত তদ্‌গতপ্রাণ হওয়া যায়, ইহারই চেষ্টা ও ক্রমশঃ উহারই সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাই করেন। এইটী চিত্ত-শুদ্ধির অবস্থা। এই বৈষ্ণবাচারে কেহ কেহ বলেন— সাতটী ভূমিকা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন, সাতটী নয়, অনেক ভূমিকা আছে অর্থাৎ ভক্তির অবস্থা বিবিধ। বৈষ্ণবাচার বা ভক্তির অবস্থায় সাধক গুরূপদিষ্ট মার্গে গমন করিবেন; কেন যে তাঁহাকে গুরু এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, সে বিষয়ে বিচার করিবার তাঁহার অধিকার নাই; অকুণ্ঠচিত্তে তিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করিবেন এবং বহিঃশুদ্ধি সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্দ্দেশ তাহাও পালন করিবেন। আমাদের দেশে অনেকে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণবাচার পালন সম্বন্ধে নিতান্তই অমনোযোগী। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ দেখা যায়, যে বাড়ীতে সময়ে সময়ে হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন বা করান, কিন্তু পানাহার সম্বন্ধে কোনই নিয়ম পালন করেন না। ঐ সব নিয়ম পালন করা কুসংস্কার বলিয়াই বোধহয় তাঁহাদের ধারণা। আমাদের শাস্ত্রকার যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, উহা অনেক চিন্তা ও অনেক দর্শনের ফল। এখনকার দিনে আমরা দেখিতে পাই, যে দিন দিন আইনের পরিবর্ত্তন হইতেছে; আর কেবল আইনের কথাই বলি কেন, যে "বিজ্ঞান" পাশ্চাত্য জগতের অহংকারের জিনিষ, সে সম্বন্ধেও দিন দিন নূতন মত হইতেছে, আর ভারতের ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ক্রমশঃ স্বীকার করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এখন মদমত্ত অবস্থায় রহিয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহাদের দৃষ্টি ও বিবেক অভ্রান্ত হইতে পারে না। তাঁহাদের স্বভাব এই, নিজের দোষ বা ভ্রম দেখিতে পান না বা স্বীকার করেন না; আর চোখ রাঙাইয়া ভ্রান্তমতও আমাদের নিকট চালাইয়া দেন। আবার তাঁহারা সকল সময়েই এবং সর্ব্বপ্রকারেই অভাবগ্রস্ত। আমরা অনেকে মনে করি, যে তাঁহাদের অবস্থা খুবই ভাল; কেন না, সংসর্গদোষে আমরা তাঁহাদেরই মত সকল বিষয় বিচার করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের অপেক্ষা হীন বলিয়া আমার মনে হয়। যিনি সর্ব্বদাই অভাবগ্রস্ত, যিনি পরস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র, তাহা অপেক্ষা আর দরিদ্র কে হইতে পারে? আমাদের ঋষিদের কোন্ অভাব ছিল না; তাঁহারা কোন বিষয়ে ব্যগ্রতার বশবর্ত্তী হইতেন না, সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে থাকিতেন, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদের সমদৃষ্টি ছিল; সুতরাং তাঁহারা যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, উহার ভালমন্দ

বিচার আমাদের করিবার সামর্থ্য নাই। পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া অনেকে সমাজসংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিবার জন্য নিতান্তই উৎসুক। এই শ্রেণীর লোকই বৈষ্ণবাচার প্রতিপালন করিবার সময়ে কেবল মাত্র নাম সংকীর্ত্তন করিয়াই সমস্ত কাজ করা হইল বলিয়া মনে করেন। পান, আহার, বিহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম আছে, উহা কুসংস্কারপ্রণোদিত বলিয়াই ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই, যে যাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক-দিগের পালিত-পুত্র (Foster-child)। এ কথা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহার এক রচিত পুস্তকে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নব্যভারত (New India) তাঁহাদের পালিত-পুত্র (Foster-child)—সুতরাং তাঁহার পোষা-পাখী। এ কথা নিতান্তই সত্য—যদি তাহা না হইত, তবে খ্রীষ্টীয় বাইবেল হইতে সঙ্কলিত পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইত না, আর সংস্কৃতচর্চ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষদৃষ্টিতে পড়িত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক প্রধান পুরুষকে আমি একবার বলিয়াছিলাম, যে "মহিম্নস্তোত্র" পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থাকা উচিত। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, যে এ কাজ করিলে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পাইবে। এই উত্তর শুনিয়া আমি নির্ব্বাক্। উক্ত মহোদয় ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রধানতম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মহিম্নস্তোত্র সম্বন্ধে এই জ্ঞান! এই সব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে নিতান্ত মনঃকষ্ট পাইতে হয়; তবে ইহা দ্বারা এই জ্ঞান হয়, যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্যাজ ভক্তের নিতান্ত অভাব। আর শাস্ত্র-জ্ঞান ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে কেন, আজকাল উপাধিধারী পণ্ডিত যাঁহারা প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণবাচারের পর শৈবাচার। এই অবস্থায় সাধক বিচারের অধিকার পান—এই অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের অবস্থা। এই সময়ে তিনি কেন যে কি করিলাম, সেই বিষয়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং গুরুও তাঁহার অধিকার বুঝিয়া সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

ইহার পর দক্ষিণাচার। দক্ষিণ শব্দের অর্থ অনুকূল—এই অবস্থায় সাধক পূর্ব্বার্জ্জিত বহিঃশুদ্ধি, অন্তঃশুদ্ধি ও যাহা শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা শাব্দবোধরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, উহাকেই বদ্ধমূল করিবার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি বামাচারে প্রবৃত্ত হন। অনেকের ধারণা এই, যে বামাচার শব্দের অর্থ বামা—অর্থাৎ স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করা। এইটী নিতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। বামাচার শব্দের অর্থ প্রতিকূলাচার, ব্যাভিচার নহে। দক্ষিণাচার পর্য্যন্ত সাধক যে ভাবে আসিয়াছেন, উহারই প্রতিকূল ভাব বামাচার। দক্ষিণাচারের চরম অবস্থায় মানুষের মনে নির্ব্বেদের বীজ অঙ্কুরিত হয় ও তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবেগ ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধক এ পর্য্যন্ত সংসারে থাকিয়াই সকল কাজ করিতেছিলেন; এখন তাহার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা হয় এবং সেই জন্যই তিনি বামাচার বা প্রতিকূলাচার অবলম্বন করেন। ইহার পর সিদ্ধান্তাচার। সিদ্ধান্তাচারের অবস্থায় তিনি দুইদিকই দেখিলেন—দক্ষিণও দেখিলেন, বামও দেখিলেন। তখন তিনি কুলজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সন্নিহিত হইলেন, কেন না, মন নিশ্চলভাব ধারণ করিল; সুতরাং মনের মনোভাব লয় হইবার অবস্থা হইল এবং এই আচারেতে পূর্ণকাম হইলে সাধক কুলাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। কেহ কেহ সিদ্ধান্তাচার বামাচারের পূর্ব্বে নিবেশ করেন। এইরূপ নানাস্থানে নানাপ্রকার মতভেদ সম্প্রদায়ানুগত।

এই যে সপ্ত আচারের কথা বলিলাম, এইরূপ সপ্ত জ্ঞানভূমিকা "যোগবশিষ্ঠে" আছে ও "কুলার্ণব-তন্ত্রে" আবার সপ্ত মত্ততার অবস্থার সহিত তুলনা করা আছে—উহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

লক্ষ্য স্থির করিয়া পথ স্থির করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। লক্ষ্য স্থির না হইলে, পথ লইয়া বিবাদ করা ব্যর্থ। আর যদি লক্ষ্য স্থির না করিয়া কোন একটা পথ ধরিয়া চলা যায়, তাহা হইলে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা স্থির থাকে না। ইহাতে কখন অভীষ্ট লাভও হয়, আর কখনও বা অনভীষ্ট লাভও হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ জীবনই এইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণ জীবনে লক্ষ্য বিষয়ে চিন্তা আলোচনা না করিয়াই একটা না একটা পথে চলিতে দেখা যায়। আর তাহার ফলে তাহাদের জীবনও সাধারণ লোকের মতই হয়। এজন্য লক্ষ্য স্থির করিয়া পথ স্থির করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলা হয়। ইহাতে লাভ অধিক হয়। অধিকাংশ মহৎ লোকের জীবনে দেখা যায়, তাঁহারা জানিয়াই হউক, বা না-জানিয়াই হউক, বাল্যাবধি একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিয়াছিলেন। এজন্য লক্ষ্য স্থির করিয়াই আমাদের জীবনপথের পথিক হওয়া উচিত।

এখন এই লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে, আমাদের দেখিতে হইবে—আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? দেখিতে হইবে—ইহা এক কি বহু। এক হইলে তাহার স্বরূপ কি, এবং বহু হইলে তাহার স্বরূপ ও জাতি—উভয়ই কিরূপ, তাহাও আলোচনা করা উচিত। এই বিষয়টী চিন্তা করিলে দেখা যায়, আমাদের জীবনের লক্ষ্য বহু হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী ঐক্য আছে। ধন, মান, যশঃ, আয়ুঃ, বিদ্যা এবং স্ত্রীপুত্রাদিলাভ জীবনের লক্ষ্য হইলেও, দুঃখহানিপূর্ব্বক সুখলাভ সকল জীবনেরই সর্ব্ব-প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। আরও একটু চিন্তা করিলে দেখা যায়—এই দুঃখহানি পূর্ব্বক সুখলাভের জন্যই লোকে ধন, মান, যশঃ, বিদ্যা প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। আর তাহা হইলে, এই ধনমানাদি উক্ত লক্ষ্যলাভের উপায়বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

কিন্তু মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য—উক্ত দুঃখ-হানিপূর্ব্বক সুখলাভ, এবং তাহার উপায়—উক্ত ধনমান প্রভৃতি হইলেও, এই উভয় লাভের উপায় আবার দুইটী বলিয়া বহু কাল হইতে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ, সেই সত্যযুগের দেবাসুরগণ হইতে এই বিভাগ চলিয়া আসিতেছে। অসুর প্রকৃতির মানব বলেন—উহা যোগ বা বিজ্ঞানের সাহায্যে লভ্য, আর দেব-প্রকৃতির মানব বলেন—তাহা বেদ বা বেদোক্ত যোগযাগাদি ধর্ম্মাচরণদ্বারা লভ্য। দেবগুরু বৃহস্পতি আর অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য এই উভয় মার্গের উপদেষ্টা ছিলেন। বস্তুতঃ, আজ যে অধিকাংশ লোকে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য এত ব্যস্ত, এত ব্যাকুল, ইহার কারণ—যে প্রকৃতির মানব বিজ্ঞানই সুখলাভের উপায় ভাবেন, তাঁহাদের প্রকৃতির প্রভাবাধিক্য—ইহা সেই পূর্ব্ব-কালের আসুর প্রকৃতির প্রাবল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, উভয়েরই লক্ষ্য সেই দুঃখশূন্য সুখলাভ। এখন ইহা যখন মানবেরই প্রকৃতি, ইহা যখন স্বভাবেরই সৃষ্টি, তখন ইহার কোনটীকে চেষ্টার দ্বারা একেবারে নির্ব্বাসিত

করিবার উপায় নাই। ভাল ও মন্দ যেমন চিরকালই জগতে থাকিবে, এই দুই মানবপ্রকৃতিও তদ্রূপ চিরকালই জগতে থাকিবে। ভগবানের অবতার হইতে মুনি, ঋষি, বুদ্ধ, যিশু পর্য্যন্ত কেহই জগৎ হইতে মন্দকে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। পানাপুকুরে ঢিল ফেলিয়া পানা সরাইয়া দিবার মতই তাঁহাদের চেষ্টা বা যত্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি, আত্মহিতেচ্ছু মানব চিন্তা করিয়া, বিবেচনা করিয়া—অন্য কথায়, ইহাদের ভাল মন্দ আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে একটী অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ অভীষ্ট সাধন করিবেন মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোনটীকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়া শক্তিক্ষয় করিবেন না—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এখন তাহা হইলে, দেখা যাউক—যোগ বা বিজ্ঞান আমাদের সেই চরমাভীষ্ট প্রদান করিবে, অথবা বেদোক্ত যোগযাগাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের সেই পরম কল্যাণ প্রদান করিবে?

কিন্তু এই বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মাচরণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুইটীর মধ্যে কোনটী সেই দুঃখশূন্য সুখলাভের কতটা অনুকূল বা কতটা প্রতিকূল?

বেদমার্গের বিশেষত্ব এই, যে ইহা কোন মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত পথ নহে। পরামাণু, দেশকাল ও ঈশ্বর প্রভৃতি যেমন নিত্য, ইহা তদ্রূপ নিত্য। এই বেদবিদ্যার প্রকাশক যে শব্দরাশি, তাহাও তদ্রূপই নিত্য। মনুষ্য-বুদ্ধির যাহা অতীত বস্তু, মনুষ্যবুদ্ধি যাহা কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না, ইহা সেই সকল তত্ত্বের উপদেশক। শব্দ বলিয়া, মনুষ্যের ভাষা বলিয়া, যে ইহা মনুষ্যরচিত তাহা নহে। মনুষ্য সৃষ্টির আদিতে কোন সর্ব্বজ্ঞ অবতারপুরুষের নিকট ইহা শিক্ষা করিয়া বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আজও দেখা যাইবে, যদি কোন শিশুকে ভাষা শিক্ষা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ হয় না; হাসি কান্না প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক ভাষারই কেবল বিকাশ হইয়া থাকে। বেদ যে যাগযজ্ঞাদির কথা উপদেশ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া বা চেষ্টা করিয়া কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। এই মন্ত্রের দ্বারা এই যাগ করিলে স্বর্গ হয় বা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়—ইহা বিজ্ঞান কখনও আবিষ্কার করিতে পারিবে না। অথবা সর্ব্ববিধ সম্বন্ধরহিত এক অদ্বৈত ব্রহ্মই আছেন—এ কথাও কোন ম কোন উপায়েই নিজে নিজে উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। কারণ, জগতের মূল বলিয়া তাঁহাকে অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, জগতের সহিত বা জগতের মূলীভূত কোন অন্য এক বিকারশীল তত্ত্বের সহিত, অথবা দেশ-কাল প্রভৃতি পদার্থের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই সম্বন্ধ স্বীকার করায় সেই জগতের মূল অবিকারী ব্রহ্ম-বস্তুটী আর এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইতে পারিবে না। জগতের মূল বিকারশীল বস্তু ও অবিকারী ব্রহ্ম বস্তু—এই দুইটী বস্তুই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। এজন্য বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি এবং বেদোক্ত অদ্বৈত অসঙ্গ ব্রহ্মের জ্ঞান বেদ ভিন্ন আর জানিবার উপায় নাই। তাহার পর বেদ বলিয়াছেন—এই অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপতালাভই জীবের চরমাভীষ্ট। এই ব্রহ্মস্বরূপতালাভ হইলে জীবের আর অবস্থান্তর ঘটিবে না, ব্রহ্ম যেরূপ *নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ*, জীবও তাহাই হইয়া যাইবে। অবস্থান্তরেই দুঃখ। দুঃখশূন্য সুখলাভ—এজন্য এই ব্রহ্ম-স্বরূপতালাভ ভিন্ন সম্ভবপরই হয় না। বেদ হইতে এই যাগযজ্ঞাদিরূপ ইহপারলৌকিক অভ্যুদয়ের অলৌকিক উ

জানিতে পারা যায়, আর বেদ হইতেই এই অসঙ্গ অদ্বিতীয় অবিকারী ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়; আর বেদ হইতেই এই নিঃশ্রেয়স-রূপ মুক্তির সন্ধান ও সাধনোপায় অবগত হওয়া যায়। বেদ ভিন্ন এই কয়টী বিষয় আর জানিবার উপায় নাই। বেদোক্ত বিষয়ে: বেদই প্রমাণ, এক কথায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদ যাহা বলে, তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা স্বাধীনভাবে জানা যায় না, এবং অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহার অন্যথাও হয় না।

অবশ্য বেদ যে নিত্য, অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত এবং স্বতঃপ্রমাণ—ইহা আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুগে বলিলে অনেকেই আপত্তি করিবেন, অনেকেই উপেক্ষা করিবেন, অথবা হাস্য করিবেন—সন্দেহ নাই। প্রাচীনে আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আজকাল অনেকেই এতাদৃশ নিজ মত, নিজ ধারণা বা নিজ বিশ্বাস গোপনই রাখেন, অনেকেই এ সব কথা বলিতে সাহসই করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের এই নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বাদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরই সম্মত, বিজ্ঞান ইহার বিরোধী হয় না —ইহা তাঁহারা অনুধাবনই করেন না। এ বিষয়ে এতই অকাট্য যুক্তি আছে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই এত অনুকূল আছে, যে এ বিষয়ে সংশয়ের অবসরই থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। এখন প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক, এখন দেখা যাউক—বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি?

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জগতের তত্ত্ব নির্ণয় করা, জগতের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা, জগতের নানাবস্তুর মধ্যে তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বা অন্য যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহার আবিষ্কার করা, আর এইরূপে জগতের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। এক কথায়, জগতের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে করিতে জগতের সৃষ্টিস্থিতি-লয় পর্য্যন্ত আয়ত্ত করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আর তাহা যদি হয়, তবে মানবের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি যে দুঃখশূন্য সুখলাভ তাহাও সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং জন্মমৃত্যু, শোকতাপ, বিবাদ-বিসম্বাদ সবই বিদূরিত করিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞান যতই কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন প্রভৃতি আবিষ্কার করুক না কেন—ইহার মুখ্য লক্ষ্য ও বেদের লক্ষ্যের মধ্যে যে তত বেশী প্রভেদ থাকিতেছে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদের লক্ষ্য যদি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হয়, তবে বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য, সেই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সই হইতেছে—ইহাই ত আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হইতেছে।

আর তাহা যদি হয়, তবে বেদ ও বিজ্ঞানকে মানবের চরমাভীষ্টলাভের পক্ষে, মানবের চরম লক্ষ্যের অভিমুখে দুইটী পথ বলিবার আবশ্যকতা কি? বরং বেদের কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক যুক্তিবহির্ভূত ভাবকে স্বীকার করিয়া অন্ধভাবে আর যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া এবং দর্শনশাস্ত্রের কচ্‌কচির মধ্যে হাবুডুবু না খাইয়া বিজ্ঞানের সেবাতেই জীবন-ক্ষয় করাই ভাল। বলা বাহুল্য, এইরূপই আজ কাল শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশেরই মনোভাব। আর এইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সংস্কৃতকে আর বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান দেওয়া হইতেছে না।

কিন্তু বিজ্ঞানকে এ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, বিজ্ঞান বেদের মত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দানে সমর্থ কি না? বিজ্ঞানের বেদোক্ত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দানে সামর্থ্য আছে কি না?

আমরা দেখিতে পাই—বিজ্ঞান যাহার আলোচনা

করে, বিজ্ঞান যে রাজ্যের কথা কহে, তাহা দ্বৈত-রাজ্যের কথা, তাহা প্রকৃতির রাজ্যের কথা, তাহা দৃশ্য বা জ্ঞেয় বিষয়ের তত্ত্ব, তাহা বিকারী পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর কথা, তাহা সক্রিয় ক্রিয়াশীল পদার্থের তত্ত্ব। যাহা অজ্ঞেয়, যাহা আছে মাত্র, যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, যাহা অদ্বৈত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহার তত্ত্ব আলোচনা বিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে, তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে; অধিক কি, তাহা বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত বিষয়। বিজ্ঞান সে রাজ্যে প্রবেশে চির অসমর্থ —বিজ্ঞান সে কার্য্যে স্বভাবতঃ অযোগ্য। এ রাজ্য একমাত্র বেদমার্গের লক্ষ্য।

এখন অবস্থান্তর যদি দুঃখ হয়, সক্রিয় ও পরিবর্ত্তনশীল ভাব যদি অসুখ পদবাচ্য হয়, পক্ষান্তরে নিত্যাবস্থালাভ ভিন্ন যদি দুঃখশূন্য সুখলাভ না ঘটে, আর ইহাই যদি নিঃশ্রেয়স হয়, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ভাল আর নাই, তাহাই যদি নিত্যাবস্থা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান হইতে যে নিঃশ্রেয়সলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই বেদোক্ত নিঃশ্রেয়সের সমকক্ষ হইতে পারে না। বিজ্ঞান যে নিঃশ্রেয়স দিবে, তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া নিত্য নহে, আর নিত্য না হওয়ায় তাহা দুঃখশূন্য অবস্থা হয় না। বিজ্ঞান যদি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার সামর্থ্যও দান করে, বিজ্ঞান যদি জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিও দান করে, তাহা হইলেও তাহা নিত্য না হওয়ায় তাহা বেদোক্ত নিত্য নিঃশ্রেয়সের সমান হইতে পারে না। ইহার কারণ, বিজ্ঞান নিত্য বস্তুর সন্ধানই দিতে পারে না। যেহেতু বিজ্ঞান যে জগন্মূলের সন্ধান দিবে, তাহা সেই প্রকৃতির তত্ত্ব ভিন্ন কিছুই নহে। প্রকৃতি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় প্রকৃতি নিত্য নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী হইতে পারে না। তাহা নিত্য অবিকারী হইলে তাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় কি করিয়া? পক্ষান্তরে, বেদের লক্ষ্য—অবিকারী নিত্য ব্রহ্মরূপে নিঃশ্রেয়স হওয়ায়, বিজ্ঞানের দান বেদের দানের সমান কখনই হয় না। বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও বেদের লক্ষ্য কখনই অভিন্ন নহে।

কিন্তু তাহা হইলেও, অভ্যুদয় অংশে বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্যমধ্যে ত কোন প্রভেদ থাকিতেছে না। কারণ, অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি, ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, তাহা ত আর অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান নহে। আর বিজ্ঞান ইহলোকের উন্নতি দান করে, এবং বেদ ইহ-পরলোক উভয় লোকের উন্নতি দান করে —এরূপও বলা যায় না। কারণ, ইহলোকের উন্নতির জন্য চেষ্টা পরলোকেও থাকিবে না। কারণ, ইহলোকের সংস্কার পরলোকেও থাকে—ইহা ত স্বীকারই করা হয়। বিজ্ঞান যেমন দ্বৈতরাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেও যে স্বর্গাদি সুখ হয়, তাহাও ত দ্বৈত-রাজ্যেরই মধ্যে আবদ্ধ। আর তাহা যদি হয়, তবে এতাদৃশ অভ্যুদয়ের জন্য অযৌক্তিক যাগ-যজ্ঞাদির অন্ধ ভাবে অনুষ্ঠান করা কেন? যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞানের সেবাই ত করা উচিত। এই যে পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে —ইহা তো বিজ্ঞানবলেই করিতেছে। বেদসেবা করিয়া আমরা ত তাহাদের অধীনই হইয়া রহিয়াছি। আর বৈদিক নিঃশ্রেয়স বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও নহে। কারণ, নিত্যাবস্থায় সুখভোগ অসম্ভব। ভোগ থাকিলেই অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অবস্থায় পরিবর্ত্তন না থাকিলে, ভোগ সম্ভবপর হয় না। অতএব বিজ্ঞানের

দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স হয়, তাহা নিত্য না হইলেও তাহাই আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাই অভিলষণীয়।

বস্তুতঃ এরূপ শঙ্কা আপাত-দৃষ্টিতে খুবই সমীচীন। আর এই চিন্তা আমাদের মধ্যে অনেক মনীষীরই মনীষাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এস্থলেও বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের আবশ্যকতা বা অনুপযোগিতা প্রমাণিত হয় না এবং বেদোক্ত নিঃশ্রেয়সও অনভিলষনীয় হইতে পারে না।

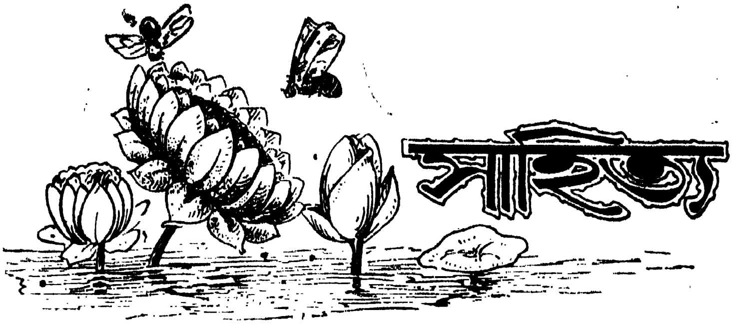
প্রথমতঃ দেখা যায়, উন্নতির জন্য যে চেষ্টা তাহা সুকৃতির ফল। সুকৃতি না থাকিলে, লোকের আত্মহিতেচ্ছাও থাকে না। এই সুকৃতি কেবল সাধুজীবনযাপন ও সাধুচেষ্টা করিলেই আকাঙ্ক্ষানুরূপ হয় না; কিন্তু বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে এই সুকৃতি প্রচুর পরিমাণে, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষানুরূপই হইয়া থাকে। যেহেতু সাধুজীবন যাপন ও সাধুচেষ্টা —ইহারা দৃষ্ট উপায়। এই উপায় লোকমধ্যে এক ব্যক্তি অপরকে দেখিয়া শিখিতে পারে; কিন্তু বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানস্বরূপ যে উপায়, তাহা আলৌকিক উপায়; ইহা দেখিয়া শিক্ষা করা যায় না। আর সকল কার্য্যেরই এইরূপ দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, এই দ্বিবিধ উপায় বা দ্বিবিধ সাধন থাকায়, যদি কেহ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দ্বিবিধ উপায় বা দ্বিবিধ সাধনই অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহা দৃষ্ট উপায় অবলম্বন হইতে অধিকতর ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ, এইজন্য আত্মীয়স্বজনের কঠিন পীড়ার সময়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেদ ও ঈশ্বরনাস্তিক ব্যক্তিও সন্দিহান হইয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হন; দেখা যায়। কেহ হয় ত উপহাস করিয়া বলিবেন—তবে কি পাশ্চাত্যগণের এই যে অভ্যুদয়, তাহার জন্য তাঁহারা কোন্ বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন? তাহা হইলে এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে আমরা যখন দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, এই উভয় উপায়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম, তখন পাশ্চাত্য-গণ দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা ও পরহিতকর কতিপয় সাধু আচরণ-রূপ দৃষ্ট উপায়ের ফলে আমাদিগকে পদানত করিয়াছে মাত্র। আমাদের বেদোক্ত ক্রিয়া নিষ্ফল বলিয়া আমরা এরূপ অবস্থায় পতিত হই নাই। অতএব বিজ্ঞানসম্মত অভ্যুদয়োপায় এবং বেদোপদিষ্ট অভ্যুদয়োপায়, উভয়ের অনুষ্ঠানই যে ক্ষেত্রে আবশ্যক, সে ক্ষেত্রে একটী উপায় অপরটী হইতে ভাল বলিয়া আশঙ্কা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুরোধে বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপেক্ষা করা উচিত হয় না।

অবশ্য আজকাল অনেকে আছেন, তাঁহারা কার্য্যমাত্রেরই প্রতি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, এই দ্বিবিধ উপায় স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মধ্যে সকল কার্য্যেরই উপায়—দৃষ্ট। চক্ষুদ্বারা না দেখিলে, অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রসাহায্যে তাহাকে ধরা যায়, এবং নিয়ন্ত্রিতও করা যায়, বলেন। কিন্তু এই মতটী সঙ্গত নহে; কারণ, সকল কার্য্যেই দৈব বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। দৈব অনুকূল থাকিলে দৃষ্ট উপায় কার্য্যকরী হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিতে যদি সকলই দৃষ্ট উপায়ই হয়, তবে ঝটিকা প্রভৃতির দ্বারা তাহার কখনই বিঘ্ন হইতে পারিত না। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারেও সকল ক্ষেত্রেই দুর্দ্দৈব ঘটিয়া পরীক্ষা পণ্ড হয়, তাহা কোন বৈজ্ঞানিকেরই অবিদিত নহে। পরীক্ষকের বুদ্ধিরও যখন নিয়ন্তা রহিয়াছেন, তখন এই অদৃষ্টকারণ অস্বীকার করা নিতান্ত ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। নৈয়ায়িক-

গণ এজন্য সকল কার্য্যেরই প্রতি ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতিকে অলৌকিক কারণ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব কার্য্য মাত্রেরই প্রতি অদৃষ্ট কারণ অস্বীকার করা সঙ্গত নহে।

তাহার পর, বৈজ্ঞানিক নিঃশ্রেয়স বৈদিক নিঃশ্রেয়সের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে আপত্তি করা হয়, তাহাও সমীচীন আপত্তি নহে। কারণ, ভোগের অনুরোধে অনিত্য অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিলে দুঃখশূন্য সুখলাভ অসম্ভব হয়। তবে যাঁহারা দুঃখমিশ্রিত সুখলাভ কামনা করেন, তাঁহারা যে বৈদিক নিঃশ্রেয়স আকাঙ্ক্ষা করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু মানবপ্রকৃতি দুঃখমিশ্রিত সুখের পক্ষপাতী নহে। মানব নিত্য অবস্থারই—সুতরাং অমিশ্র সুখেরই পক্ষপাতী। কে না দেখিতেছেন—সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞাত সুখভোগ দিনান্তে একবার না হইলে মানব নিজেকে কতই অসুখী বোধ করে! সুনিদ্রার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা এই ভোগজ্ঞানশূন্য সুখস্বরূপতালাভেরই আকাঙ্ক্ষা। অতএব দুঃখমিশ্রিত সুখলাভাকাঙ্ক্ষা মানবপ্রকৃতির অনুকূল কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর নিঃশ্রেয়স মধ্যে ভোগাকাঙ্ক্ষা যে দার্শনিক বিচারেও অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য যাবতীয় দ্বৈতবাদী যে এ কথার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাহাও নিশ্চিত; কিন্তু তাঁহারা সে ভোগেরও নিত্যতাই স্বীকার করেন। এজন্য অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্ত ইহা উত্তমরূপেই খণ্ডন করিয়া থাকেন। কারণ, ভোগ কখন নিত্য হইতেই পারে না। আমরাও তদনুসারে নিত্যাবস্থায় ভোগ সম্ভব নহে—স্বীকার করিয়া, ভোগাতীত বৈদিক নিঃশ্রেয়সকেই মানবের চরমাভীষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। দ্বৈত-বাদিগণ ভোগসহকৃত নিঃশ্রেয়সকেই বৈদিক নিঃশ্রেয়স বলিতেও চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা যুক্তিসহ নহে।

যাহা হউক, বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি—ইহা স্থির করিয়া যদি আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করি, তাহা হইলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির যে গতি হয়, তাহা আর আমাদের হইবে না। আর সেই লক্ষ্যহীন গতি যদি নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বেদের রক্ষার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই বেদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সাংসারিক ক্ষণিক অভ্যুদয় এবং কলকব্জার সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন আমাদের অতুলনীয় পৈত্রিক সম্পত্তি না হারাইয়া ফেলি। আমরা আমাদের অভ্যুদয়ের জন্য দৃষ্ট উপায়—বিজ্ঞানানুশীলন, এবং অদৃষ্ট উপায়—বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সমানভাবে বদ্ধপরিকর যেন হই। বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিচার করিয়া চলিলে আমরা আর আমাদের পরম গন্তব্য স্থান হইতে বিচ্যুত হইব না। পাশ্চাত্যের ক্ষণিক চাকচিক্যে আমাদের অনেকেই অভিভূতদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু কেবল ইহলোকের সুখভোগই, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। ইহা যেন আমাদের চিত্তে সতত জাগরূক থাকে।



দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী

(৫)

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

[আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসিগণকে আমরা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ভুলিতে বসিয়াছি ; তাহা ভুলিলে চলিবে না। লর্ড আরউইনের ভারতবর্ষ হইতে বিদায়কালে তাঁহার সহিত আমার পত্রব্যবহারের সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহাকে এ-কথা আমি বিশিষ্ট ও বিশদভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি ; তিনিও যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রাজকুটুম্ব লর্ড এ্যাথলোন (Atholone) বহুদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজপ্রতিনিধি হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আমাদের দৌত্যকালে তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ; আমাদের কার্য্যে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা হইত। ভারতবাসীর সমস্ত অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজন তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, আর তাহা জানেন, আমায় যিনি যত্ন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন—লর্ড রেডিং। এই তিনজন মহানুভব ইংরাজ রাজপুরুষ ইচ্ছা করিলে আমাদের অনেক হিতসাধন করিতে পারেন এবং ইংরাজ জনসাধারণকে যথার্থ অবস্থা জানাইতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে যে রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে প্রবাসী ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর সর্ব্ব স্বত্ব ও অধিকার যেন সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে ; অন্যথা পূর্ণশান্তির সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী সিমলায় নূতন বড়লাটের সহিত দেখা করিতে গিয়া উপনিবেশ সচিব স্যার ফজ্‌লি হোসেনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন ; এ-সকল কথার বিশদভাবে আলোচনা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মহামতি রেঃ এণ্ড্রুজ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রতি নব নির্য্যাতনের যে ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা আপাততঃ, অন্ততঃ নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থগিত আছে—এ সুসংবাদ তিনি আনিয়াছেন। এ বিষয়ে পুনরালোচনার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পুনরায় প্রতিনিধি যাইবে ও কন্‌ফারেন্স হইবে, স্থির হইয়াছে। রীতিমত ভাবে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কন্‌ফারেন্সে এ বিষয়ে আলোচনা হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কেনিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ বিলাতে গিয়া ঘোরতর আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন। অতি সম্মানিত অতিথির ন্যায় হাউস অফ লর্ডস্ সভার রাজকক্ষে এই বিশিষ্ট অধিবাসিগণকে সমাদৃত ও অভিনন্দিত করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন মনে আশা হইতেছে, বুঝি পূর্ব্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায়ের ও সত্যের জয়পতাকা পুনরায় উড়িবে। এ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা অতি প্রয়োজনীয় এবং এই সকল প্রবন্ধে তাহারই চেষ্টা হইতেছে।]

জোহানেসবার্গে কমিশনের নিকট ইংরাজ এবং বোয়ের পক্ষ হইতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, যে ভারতবাসীর প্রতি বিদ্বেষ ডার্ব্বান প্রভৃতি নেটাল প্রদেশের নগর অপেক্ষা সেখানে অনেক অধিক। নেটাল প্রদেশে শুধু শ্রমজীবী, শিল্পী, কৃষিজীবী ও দোকান পসারীর

লাভ লোকসান, দেনা পাওয়া ও ব্যবসায়ের মুনাফা লইয়াই অধিকাংশ বিবাদ ও বিদ্বেষ। স্বর্ণ-খনির কেন্দ্র জোহানেস্‌বার্গে এই সকল প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহার উপর বিষম প্রশ্ন ও সমস্যা—পাছে, ভারতবাসী অসদুপায়ে খনি-প্রসূত স্বর্ণ অপহরণ করে। যেখানে যেখানে হীরকের খনি আছে, সেখানেও এই সমস্যা। যেখানে হীরক বা স্বর্ণের সমস্যা নাই, সেখানে ভারত-বিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত অল্প। পরে কেপ-কলোনী প্রদেশের অন্তর্গত কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, ইষ্ট লণ্ডন প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিয়া এই স্থান-কাল-পাত্রগত বিদ্বেষতারতম্য লক্ষিত হয়। কেপ্‌কলোনী প্রদেশে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। বোয়রদিগের আদি দুর্গ অরেঞ্জ-রিভার ফ্রি-ষ্টেট্ (Orange River Free State) প্রদেশে সে দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেখানে ভারতবাসী প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত পায় নাই; অতএব কোন সূত্রে কোনই অধিকারের কথাই উঠে নাই। সে জন্য আমাদের সেই প্রদেশে পরিদর্শন অথবা ভারত-সমস্যা সমাধানের কোন আয়োজন বা প্রয়োজন হয় নাই।

ভাল (Val) নদীর পারে অবস্থিত বলিয়া যে প্রদেশের নাম ট্রান্সভাল, তাহার প্রধান নগর জোহানেস্‌বার্গ ও প্রিটোরিয়া। এ প্রদেশের রাষ্ট্রপতি ও গণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন, প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার (Cruger) এবং অরেঞ্জ-রিভার-ফ্রি-ষ্টেটের গণনায়ক ছিলেন, প্রেসিডেণ্ট ষ্টীন (Stein)। ইঁহারা প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষী। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত সৈন্য-সামন্ত ইংরাজকে সহায়তা করিয়া ও স্থানীয় ভারতবাসিগণ নিজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়া বোয়রপরাজয়ের অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, ভারতবাসীর প্রতি বিরাগ এই সকল গণাধিনায়ক ও বোয়র-সাধারণের মজ্জাগত। ভারতীয় সমস্যা সকল স্থানেই প্রায় এক শ্রেণীর—তাহাদিগকে নাগরিক সাধারণের সহিত বাসযোগ্য উত্তম স্থানে বাস করিতে কিছুতেই দেওয়া হইবে না; "অন্তেবাসী"র ন্যায় ঘৃণ্যভাবে, অস্পৃশ্যভাবে নগরপ্রান্তে পরিখাতুল্য নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থানীয় ক্যাফির অধিবাসিগণের ন্যায় নীচ ভাবে বাস করিতে হয়। তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিক্ষেত্রে এবং শ্রমজীবী রূপে সাধারণ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রম, মিতব্যয়িতা ও বিনয় এবং নম্রতার ফল ব্যবসায়ক্ষেত্রে পাইতে দেওয়া হইবে না। সহরের সম্পত্তিক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে সাধারণ অধিকারেও তাহারা বঞ্চিত; শিক্ষা ও ধর্ম্মক্ষেত্রেও কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় তাহার 'অস্পৃশ্য" এবং রাজনৈতিক সকল অধিকারেরই তাহারা বহির্ভূত। এইভাবে তাহাদিগকে সর্ব্বত্রই জীবন-যাপন করিতে হইতেছে। অবাধভাবে ভারতবর্ষ হইতে যাতায়াতের অধিকার নাই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্বন্ধেও এ বিষয়ে সেইরূপ কঠোর শাসন।

এই অমানুষ ও অনৈসর্গিক নাগরিক বাধাবিঘ্ন একই সাম্রাজ্যের মধ্যে এক সম্রাট্‌চক্রবর্ত্তীর ছত্রচ্ছায়াতলে বিসদৃশ, আমরা সর্ব্বত্র এইভাবেই প্রতিবাদ করিয়া চলিতেছি। বোয়র ইংরাজ পক্ষের সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিবার সময়ে এইরূপ ব্যবহার অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া ধর্ম্মতঃ স্বীকারও করিতে বাধ্য এবং স্বীকারও করিতেছে; কিন্তু স্বার্থান্ধ হইয়া তাহারা প্রতিকার সাহায্যে পরাঙ্মুখ। মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর শ্রম-কৌশলকে তাহার এত ভয় করে, যে লজ্জাহীনভাবে বলে—শ্বেত অধিবাসি-গণ ঐ শ্রম স্বীকার করিতে অক্ষম ও অপ্রস্তুত; অতএব ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে শ্বেতাঙ্গের লাভের অঙ্কে কুঠারাঘাত হইবে। অতএব সে পথ

পরিত্যজ্য। দ্বিতীয় লজ্জাহীন কথা এই, যে অল্প-সংখ্যক ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্রয় দিতে হয় বহু সংখ্যক, অতি বহু সংখ্যক স্থানীয় কৃষ্ণকায় ক্যাফির ও অন্যান্য অধিবাসিগণকে। ইহা তাহাদের বিবেচনায় অসহনীয়। তাহারা ভয় করে, যে এরূপ করিতে গেলে শ্বেতাঙ্গের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। এই সকল অন্যায় অযুক্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা বৃথা। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া সামঞ্জস্যের চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইল।

যে সব কাজকর্ম্ম বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। সরকারী রিপোর্টে বাছা বাছা কথা স্থান পাইবে। কখনও তাহা লোক নয়নগোচর হইবে কিনা সন্দেহ। খবরের কাগজওয়ালারা মতামত প্রকাশের জন্য জেদ করিতেছে। Interview করিতে আসিয়া মনোমত উত্তর না পাইয়া নিজেদের যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে সময়ে সময়ে বিস্তর ক্ষতি হয়।

ভারতবাসিগণ দলে দলেদেখা করিতে আসিতে-ছেন: তাঁহাদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের কথা পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া তাঁহারাও বিরক্ত হইতে-ছেন। এরূপ কঠিন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে আর কখনও হস্তক্ষেপ হয় নাই।

কমিশনের মেম্বারদের মধ্যেও বিশেষ সাবধান হইয়া কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার প্রয়োজন।

ভারতবাসিগণের প্রতিনিধি হইয়া এখান হইতে যাঁহারা ভারতবর্ষে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসংযত বক্তৃতা ভারতবর্ষে করিয়া আমা-দিগকে বিপন্ন করিতেছেন। যতদূর সম্ভব বিরোধী ভাবের মধ্যে যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কঠিনতা ভারতবাসিদিগের দ্বারা বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। যাঁহাদের যথাসাধ্য হিত-চেষ্টার জন্য এই আয়োজন, তাঁহারা কিম্বা তাঁহা-দিগের প্রতিনিধিরা সংযত কার্য্য ও কথা দ্বারা সহায়তা না করিলে, শত্রুপুরীতে বিপদের সম্ভাবনা অধিক।

কলিকাতা হইতে সিমলা, সিমলা হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে জোরহাট, জোরহাট হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে পুনরায় দিল্লী, দিল্লী হইতে বম্বে, বম্বে হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা—সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এত দীর্ঘ পথ যাতায়াত—প্রবাসক্লেশ ও প্রিয়জনের সেবারাম-লাভে অনধিকার সত্ত্বেও ভগবৎ কৃপায় শরীর সুস্থ আছে, ইহা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। বিজয়া দশমী রেলপথে কাটিয়াছে, বড়দিন জাহাজে কাটিয়াছে, ১লা জানুয়ারীও দেশ হইতে ছয় হাজার মাইল দূরে কাটিল।

এ প্রচেষ্টার ফল দেশবাসীর সামান্য সেবাতেও যদি যথাসম্ভব উপকার হয়, তাহা হইলে সকল প্রচেষ্টাই সফল হইবে।

"কারাপারা" জাহাজে ভারতবর্ষের ডাক যাইবে। জোহানেসবর্গ হইতে পত্র দিলে সে জাহাজ ধরিতে পারিবে বলিয়া চিঠিপত্র ও ভ্রমণ-কথার কিয়দংশ ডাকে দিলাম।

দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে, তাহার স্থির নাই। নিয়মিত ভাবে ভ্রমণকথা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। সময় নাই, শরীরে শ্রান্তিভাব দূর হইতে না হইতে কর্ম্মান্তরে যাইতে হয়, চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে যাইতে হয়, শুধু এই কারণে যে লেখা দুঃসাধ্য তাহা নহে। মন ও নয়ন—এ দুইয়ের উপর এত কর্ম্মভার আসিয়া পড়িয়াছে, যে তাহারা

কোন মতে আর ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

অতি সামান্য কথা বা ঘটনা লইয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে সময়ে সময়ে গভীর ভাব ও চিন্তার উদয় সম্ভব। আপাততুচ্ছ বিষয়ে লক্ষ্য সম্বন্ধে "প্রবাসপত্র" ও "ইউরোপে তিনমাসে'র কোন কোন পাঠক প্রসংশাবাদ করিয়াছে বুঝি নয়ন মন নবীনতর ছিল বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল। এখন হইতেছে না।



ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট হোটেলের ভোজনাগার

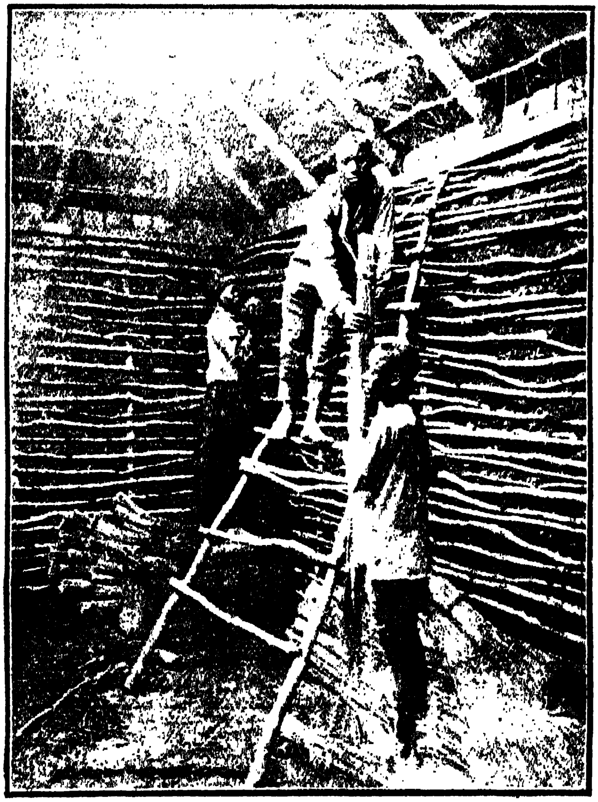
ডার্ব্বানে পৌছিবার দিন সকালে যে সকল বিষয় নয়ন ও চিন্তাগোচর হইয়াছিল তাহার শতাংশের একাংশও লিপিবদ্ধ হয় নাই। মার্সেলস, পোর্টসায়েদ অথবা ডোভারের বন্দরের অপেক্ষা কোন অংশে ডার্ব্বান বন্দর ছোট বা হীনতর নয়। বিদেশীকে বাহিরে রাখিবার এমন ব্যবস্থা আর কোথাও দেখি নাই। বন্দরের সুবিধা জন্য, বাণিজ্য-প্রসার জন্য যত কিছু নবীন ব্যবহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমবায় ডার্ব্বান বন্দরে হইয়াছে।

ডার্ব্বান হইতে জোহানেসবার্গ পথে স্বাভাবিক দৃশ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু ক্রোশের পর ক্রোশ, এইরূপ শত শত ক্রোশ জমি অনাবাদে পতিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া মনে যে ক্ষোভ ও অশান্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্বেত-কৃষক চাষার সাধ্য নাই, যে সে সব জমির চাষের ব্যবস্থা করে। জলকষ্ট-নিবারণ জন্য নূতন পন্থার যে সব ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। অর্থাভাব, লোকাভাব—উভয় কারণেই তাহা হয় নাই। শ্বেত-কৃষক কেবল জমি আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঘিরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। এক ইঞ্চি জমি ভারতবাসী কিম্বা স্থানীয় লোকে পাইবে, তাহার উপায় নাই। নানারূপ শস্য, ফলমূল, তুলা ইত্যাদির চাষ যত্ন করিলেই প্রচুর হইতে পারে—ভারত-বাসীকে তাড়াইবার ও কষ্ট দিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তদপেক্ষা সহস্রাংশের একাংশ চেষ্টাতে ভারতবাসীর সাহায্যে দেশে সোণা ফলাইতে পারিত। নেটালে আখের চাষে ধনকুবের যাহারা হইয়াছে, যাহারা

কুলী করিয়া ভারতবাসীকে এখানে আনিয়াছে, "কুলীকাল" অতীত হইবার পর যাহাদের ফিরিয়া যাইতে দেয় নাই, পুনরায় কুলীগিরিতেই বাহাল করিয়াছে, তাহারাও এখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে।

বড় বড় বিলাতী নাম দিয়া সহর-পত্তন হইয়াছে, বিলাতী ধরণের বাড়ী, ঘর, দ্বার রাস্তা-ঘাট হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রাণতার অভাব। "Un-English" বলিয়া গালাগালি দিয়া ইহাদিগকে লজ্জিত করা অসম্ভব। কারণ, ইহারা ইংরাজের বিরুদ্ধ, সাম্রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধ, সাধারণতন্ত্রবাদী লোক। দায়ে পড়িয়া, ঘা খাইয়া সাম্রাজ্যের ভিতর রহিয়াছে। অবকাশ পাইলেই ছুটিয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে পালাইবে, এই ভয় কথায় কথায় দেখায়।

৩১শে ডিসেম্বর সকালে রেলগাড়ীর স্নানাগারের ভিতর গিয়া একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ইহাদের মনের ও সমাজের অবস্থার কথঞ্চিৎ বর্ণনা হইতে পারে। কালা ভারতবাসীর স্বাস্থ্য-বিধানে ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনেক কথা বিদ্রূপ করিয়া ইহারা কয় এবং সেই কথা উল্লেখ করিয়াই তাহাদের বিরোধী-আইন পত্তনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমাদের ব্যবহারের জন্য যে কয়েকখানা গাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসী কিম্বা দেশী লোককে কখন উঠিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা সর্ব্বোচ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, পায়খানার ভিতরে ইংরাজী ও ডচ্ ভাষায় নোটিশ লিখিয়া দিতে হইয়াছে, যে পায়খানা ও মুখ ধুইবার স্থান যেন অপরিস্কার না থাকে ও ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়ে যেন পায়খানা ব্যবহার না হয়। আমি পায়খানা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী একটা বড় ষ্টেশনে পৌছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, যে অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসি; নরকযন্ত্রণাভোগ যাহাকে বলে, তাহাই মনে হইতে লাগিল। ইংরাজী নরক (Hell) শব্দের যোগরূঢ়ী অর্থ "ঘেরা", নিজের সৃষ্টি-করা বেড়া কিংবা ঘেরার মত আর নরক নাই। সাদা দল দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের সৃষ্টি-



ক্যাফির কোয়ার্টার

করা ঘেরা বা বেড়া হইতে অব্যাহতি পাইবে না। জনসন্ রাজকুমার রাসেলাসকে আবিসিনিয়ার গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া কোন সুফল উদয় করিতে পারেন নাই। রাজা শুদ্ধোধন সুরম্য উদ্যান মধ্যে



ক্যাফির কৃত্রিম-যুদ্ধ

রম্যতর প্রাসাদে নানা ঐশ্বর্য্য-বিলাসিতার ঘেরার মধ্যে শাক্য-সিংহকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় বিফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। যে শ্বেত সম্প্রদায় এইরূপ ঘেরার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। ইতিহাসের এ অধ্যায় বিস্মরণ হইলে চলিবে না।

জোহেনাসবার্গ হইতে প্রিটোরিয়া যাইবার পথে পুনরায় গ্রিমষ্টোনে আসিতে হই । গ্রিমষ্টোন প্রকাণ্ড জাংশন ষ্টেশন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেখান হইতেই জোহেনাস্‌বার্গের সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং জোহানেস্‌বার্গের "ঘেরা" নরকেরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল।

নেটালে এখন এই "ঘেরার" সৃষ্টি হয় নাই; কাজেই ডার্ব্বানে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ট্রান্সভালে বহুদিন হইতে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে সাদা "ঘেরা" সৃষ্টি হইয়াছে। এখন নূতন আইনে সে প্রণালী কঠোরতর হইবে।

গ্রিমষ্টোন ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে দূর হইতে এশিয়াটিক লোকেসন-রূপ "ঘেরা" দেখা গেল। সহর হইতে বহুদূরে মাঠের মাঝে খানিক জায়গা আছে, সেইখানে ভারত-বাসীকে থাকিতে হয়। সময়ে সময়ে সাধারন কাফ্রিদিগের সহিত সামান্য-ভাবে কাদা ও রোলার সাহায্যে অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত টিনের বা খড়ের চালা-ঘরে বাস করিয়া



ক্যাফির ব্যাণ্ড

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে হয়। ধারণাতীত পীড়নে পীড়িত হইয়াও ক্যাফ্রিগণের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার কিছুই অভাব দেখিলাম না। অসাধারণ প্রকাণ্ড

বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তালে তালে যুদ্ধের অনুকরণে তাণ্ডব নৃত্যে আত্মহারা হইতে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে পানভোজনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে। সাদা অধিবাসিদিগের সেবায় তাহাদিগকে শক্তি নিয়োজিত করিতে হয়, অথচ শ্বেত-অধিবাসীর ত্রি-সীমানায় যাইবার যো নাই। ট্রান্সভালে এ ব্যবস্থা বহুদিন প্রচলিত, এখন তাহা কঠোরতর হইবে। অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত হইবে।

দিন-তারিখ-তিথির গণনা আর সম্ভব নহে। বারদিন মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া পৌছিয়াছি। দিন রাত কোথায় দিয়া কাটিয়া গিয়াছে—কি করিয়াছি, কি বলিয়াছি, কি শুনিয়াছি, কাহার সহিত দেখা হইয়াছে, কোথায় গিয়াছি, কি দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা দূরে যাউক, তালিকা করা দূরে যাউক, মনে করাও দুরূহ। দিবারাত্র কার্য্যে ও কার্য্য করিবার চেষ্টা ও চিন্তায় আহার ও বিশ্রামের সময় করা সুকঠিন হইতেছে, এত পরিশ্রম করিয়া শেষ ফল কি? কোথায় গিয়া এই কার্য্যস্রোতঃ পৌছিবে? সাধারণে প্রকাশযোগ্য ভ্রমণ-কথার মধ্যে সে সকল কথা স্থান পাইবে না।

(ক্রমশঃ)

নারী-জাগৃতি

—:০:—

* * * আজ দেশ জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, পুরুষের অপেক্ষা নারীজাতি আজ অধিক অবনত নয়; শিক্ষায়, সাধনায় নারী পুরুষের চেয়ে অতিশয় নিম্নে থাকা সত্ত্বেও দেশের মুক্তিযজ্ঞে নারীজাতি যে স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে দেশের সকল কাজেই নারীর স্থান যে কত উর্দ্ধে তাহা সকলেই বুঝিয়াছে; এবং এ-কথা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবে, যে নারী-জাতি দেশের ও জাতির লক্ষ্যসাধনে পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়—বরং নারীর সাহায্য না পাইলে একা পুরুষজাতির দ্বারা কোন বড় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

এই অধিকার অস্বীকার করিবার নয়; কেন না, ইহা বিধাতার দেওয়া বস্তু—আমরা ইহার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে, দেশ ও সমাজের যথার্থ কল্যাণ হইবে। আমরা আর স্বার্থপর সমাজের শাসন-বাক্যে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে পারি না; কেবল নারী-মর্য্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় নহে, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনাই আজ নারীর হিয়াকে চঞ্চল করিয়াছে।

দেশের শিক্ষিতা নারীই যে আজ দেশ-সেবার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে ছুটিয়াছে তাহা নহে, নিরক্ষরা কৃষক-বধূরা দলে দলে দেশের সম্মান-রক্ষায় পুরুষের সহিত সমানভাবেই দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, কারাবন্ধনে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায়—শিক্ষার প্রভাবেই যে একদল নারী দেশের পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়, নারীর সত্তায় আজ আগুন ধরিয়াছে; সে অনল আর

নিভিবার নয়, যাহা বন্ধন আবরণ তাহা পুড়াইয়া ছাই করিবে। আমাদের মুক্তি—জাতির মুক্তি; নারীর মাথা যদি উঁচু হইয়া উঠে, দেশের তাহাতে শ্রেয়ঃ ও উন্নতি—এ-কথা কেহ কি আর অস্বীকার করিতে পারে?

দেশে যে ভাঙ্গনের যুগ আসিয়াছে, সেখানে নারী করালমূর্ত্তি ধরিয়া যেমন দাঁড়াইবে, আবার উহার সঙ্গে গঠনের হৃদয় লইয়াও নারীকে মহা-তপস্বিনীবেশে দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের এই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে সেই গঠনের দিক্‌টাই ভাল করিয়া দেখিয়া চলা হয়, এবং আজ আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—গঠনের বস্তু কি এবং এই আদর্শ আমরা কতখানি সিদ্ধ করিয়া চলার অধিকার পাইয়াছি।

গঠন বলিতে একটা নিরুপদ্রব মৃত্যুশীতল শান্তির অবস্থা নহে; আমাদের নারী-সমাজ সে শান্তি-কুটীরে বহুদিন বন্দী হইয়া আছে, সেখানে আমরা তিলে তিলে প্রাণ হারাইয়াছি, হৃদয় হারাইয়াছি, সংসারের মাঝে কি ক্ষুদ্র জীবনের মোহে যে আচ্ছন্ন আছি, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! দেশের মুক্তি কেবল পুরুষের স্বাধীন জীবন ভিত্তি করিয়া সম্ভব হইবে না, নারীরও স্বাধীনতা চাই। দেশের উপর বিদেশীর কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব যেমন দেশকে অবনত ও শ্রীহীন করে, নারীজাতির উপর সেইরূপ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নারী-সমাজকে অবনত করে—তাহার প্রমাণ আমাদের জীবন। জানি না, কোন অপরাধে কেবল নারীজাতিই আজ প্রায়শ্চিত্তের পর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলে—যত দুঃখ, যত ব্যথা আমাদের বহিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার প্রতিকারের জন্য পা বাড়াইবার উপায় নাই, ইহা কি কম লজ্জার কথা, ইহা কি সমাজ-পুরুষদের কম অন্ধতা! এই মোহ যে আমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে!

! আজ বিচার করিয়া দেখুন, দেশের অর্দ্ধেক প্রাণ আমাদের অধিকারে, কিন্তু সেখানে আমরা অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছি। নারী যদি মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, সমাজের মধ্যে অসংখ্য কারাগারে এই বন্দিনী-জীবন নির্য্যাতনের ভারে মুমূর্ষু হয়—কেহ তার সন্ধান রাখে না, মুখ ফুটিয়া যে কথা বাহির হয় পৃথিবীর কানে তাহা পৌছায় না। অন্তঃপুরবাসিনী আমরা, দুরবস্থা আরও অধিক; বুঝি শৃগাল কুকুর অত্যাচারিত হইলে চীৎকার করিয়া দুঃখ জ্ঞাপনের ভাষা পায়। নারী মূক, অন্তরের কথা ব্যক্ত করার শিক্ষা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কয়জন—বুকের মধ্যে যে ভাব গুমরিয়া মরে, তাহা প্রকাশ করার ভাষা জানে? এ ব্যথা ব্যক্ত করিবার নহে।

কি তুচ্ছ মোহ দিয়া সমাজ আমাদের ভুলাইয়াছে দেখুন—কেবল বার-ব্রত, গঙ্গাস্নান, কাপড়, পাউডার, সাবান, গৃহস্থালীর শোভা, তৈজসপত্র, অলঙ্কার, এই সবের ভার বহিয়া আমরা মনে করি—কি সৌভাগ্য আমাদের! কৌতুক, পরিহাস, রঙ্গ যদি পাই, সেদিন ভাবি—আজ কি আমোদের দিন! কি মহোৎসব জীবনকে ধন্য করিল! কত লঘু, কত তুচ্ছ অবস্থায় আমরা আত্মহারা, নারীর যথার্থ মর্য্যাদা ভুলিয়া দিন গুণিয়া যাই! এই একটা বিশাল নারীজাতির আত্মদান যদি দেশের ও সমাজের কল্যাণের কারণ হইত, পৃথিবীর মত সহিষ্ণু নারীজাতি নীরবেই সব সহিত। কিন্তু কতযুগ এমন করিয়া কাটিল, দেশের অধঃ-পতন কোথায় গিয়া দাঁড়ায় একবার দেখুন! পরশ্রী-কাতরতায় আমরা ম্লান, দারিদ্র্য-রাক্ষসীর অত্যাচারে আমরা গতপ্রায়, সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ প্রবেশ

করিয়াছে ; গর্ত্তের ভেক খোঁচা খাইয়া যেমন নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করে, আমাদের যে সেই অবস্থা। ইহা হইতে পুরুষের সাহায্য প্রতীক্ষায় উদ্ধার পাওয়ার আশা ছাড়িয়া আমাদের নিজেদের ভিতর সংহতি-গঠন করিয়া মাথা তুলিতে হইবে। ভগ্নীগণ, সেই কথাই আজ বলিতে দাঁড়াইয়াছি।

কেবল বর্ণমালা শিক্ষার সঙ্গে বহু গ্রন্থ অধ্যয়নেই আমরা চরিত্রলাভ করিব না, নারী-মর্য্যাদা রক্ষায় সমর্থ হইব না। পুস্তক সাহায্য করে ; কিন্তু আসল কথা, আমাদের অন্তরকে জাগাইবার জন্য আমাদের মধ্যে মিলন ও ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের এমন ক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে, যেখানে দাঁড়াইয়া আমরা স্বাধীনভাবে সুখ-দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা আন্দোলন করিতে পারি। নারী বলিয়া এই সকল ক্ষেত্র স্বতন্ত্র করিয়া গড়ার চেষ্টায় আমাদের বহু আয়াস করিতে হইবে না। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিকার স্থাপন করিতে হইবে। দেশের গ্রন্থাগারে আমাদের হানা দিতে হইবে। দেশের শিক্ষা-নিকেতনে নারী আসন বিছাইয়া বসিবে। পুরুষের সম্পর্কে নারী কি ম্লান হওয়ার আশঙ্কা রাখে ? সত্যই কি নারী পুরুষের চেয়ে অধিক অসংযমী ? আমরাও নারী—অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে আমাদের জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিব—না, নারী আত্মসম্মান-রক্ষায় যতটা উদ্যোগী, আত্মস্বার্থরক্ষার দায়ে যতটা সতর্ক, পুরুষ তাহার শতাংশের একাংশও নহে। তবে কথা হইতেছে, নারীর সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষের চিত্ত কলুষিত হওয়া খুবই সম্ভব। ভগ্নী যেখানে আদ্যাশক্তির অংশ নারীজাতির কণ্ঠে সেই কল্যাণবাণীই কি বাহির হইবে না ? শুম্ভ-নিশুম্ভের মত এই কাপুরুষ পুরুষজাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই সমাজের অধিক শ্রেয়ঃ হইবে। এই ভীরু, অপদার্থ পুরুষজাতিকে ভয়ে ভয়ে রক্ষা করার দায়ে স্বতন্ত্র নারী-প্রতিষ্ঠানের জন্য এই কাঙ্গাল দেশকে আর পীড়িত করা বাঞ্ছনীয় নহে। প্রাচীন ভারতে নারী এত ভয়ের বস্তু ছিল না ; কেন না, তখন বিশ্বজয়ী পুরুষের সংখ্যাই অধিক ছিল—তখন ভারত স্বাধীন ছিল, পৃথিবীজয়ে ভারত অভিযান করিত। আজ এই জাগরণ-যুগে আমাদের স্বাধীন ভারতের মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, আমাদের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে দাঁড়াইতে হইবে। পুরুষ-জাতিকে বল দিবার জন্য, পুরুষজাতির মেরুদণ্ড শক্ত করার জন্য ইহার খুবই প্রয়োজন হইয়াছে। এদিকে ভগ্নীগণ আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হওয়া মারাত্মক হইবে।

আমাদের এই নয় বৎসর অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবের ফলে দেখিতেছি—অতর্কিতে এই সহরে নারী-মহলে সত্যই একটা ভরসার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ অনেকের মাথা হইতে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে, মহিলা-দিবসের প্রতীক্ষায় কেহ আর ঘরে বসিয়া থাকেন না, পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া মহিলাবৃন্দ নিত্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে বিচরণ করেন—ইহা স্বাস্থ্যের পরিচয়, ইহা নারীর গৌরবের বস্তু। পুরুষকে ভূতের মত ভয় করিয়া চলা মনুষ্যত্বের অপমান—পুরুষকেও হেয় করা, নিজেদের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া—এ দায় যেন ঘুচিয়াছে। সহরে আমরা নারী-প্রগতির একটা স্বচ্ছ অভিব্যক্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

নারীর একটা বিধাতৃদত্ত ধর্ম্ম আছে ; সে ধর্ম্ম —সংসার-রক্ষা, জননী হওয়া, সন্তানপালন করা। পুরুষেরও কি সে ধর্ম্ম নাই ! গার্হস্থ্যজীবনরক্ষার নীতি পালন করিতে দেশে যে ধর্ম্মের প্লাবন

উপস্থিত হয়, সে গঙ্গোত্রীধারা বহিয়া যুগে যুগে যে ভগীরথের আবির্ভাব দেখি, নারী কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে? নারীজাতির মধ্যে এই উদাত্তপ্রাণ আনার জন্য, এই অধঃপতন-যুগে আমাদেব জীবন ছানিয়া কি কয়েকজন তপস্বিনী বাহির হওয়া সম্ভব নয়—যাহারা পুরুষের মতই দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া আশার গান, ভরসার সঙ্গীত গাহিবে? দেশ-সত্তার ডাকে সে অভাব পূরণ হইবেই। আজ তাই বলি, তোমাদের মধ্যে কে আছ ভাই, আজ নারীর ঐ সহজ অধিকার পদাঘাত করিয়া অনাঘ্রাত জীবনের সৌরভ বুকে বহিয়া এই পতিত জাতির জীবনে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিবে? পুরুষ যেমন দলে দলে বাহির হইয়া অধঃপতনের যুগ ঘুরাইয়া দিয়াছে, আজ নারীকেও এই মহাব্রতসাধনে নিঃসঙ্গ মুক্তজীবন লইয়া দলে দলে বাহির হইতে হইবে। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র "নারী-মন্দিরে" এই কঠোর ব্রতপালনের ঘোর তপস্যা চলিয়াছে; কে জানে—ভগবানের এই মর্ম্মন্তুদ বাণী আমরা কয়জন পালন করিয়া ধন্য হইব, কয়জন সে মহাব্রত পূরণ করিয়া সার্থক হইব! তবে একজনও যদি সে স্বপ্ন সার্থক করে, নারীজাতির মধ্যে আশার সঞ্চার হইবে, মহাসম্ভাবনার সৃষ্টি হইবে। ভগ্নীগণ, আপনাদের মধ্যেও সে শক্তির বীজ আছে, এই চরিত্রলাভের জন্য আপনারাও আজ সকল ভোগ-প্রবৃত্তিকে পদতলে দলিয়া আমাদের বুকে বল দিতে পারেন—সে আশা আমাদের দুরাশা নহে!

শঙ্কর, বুদ্ধ, নবদ্বীপচন্দ্র সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন মানুষের কল্যাণে; তাই তাঁরা প্রণম্য। তাঁরা জাতির অধঃপতনের বেগ নিবারণ করিয়াছেন। আজ এই পতিত নারীজাতির উন্নতিকামনায় এমনই একদল নারী চাই—সহস্রের জীবন ছানিয়া দশজনও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া বাহির হইবে কি না কে জানে? তাই আপনাদের দলে দলেই যোগ দিতে হইবে—অন্ততঃ একশত নারীর জীবন-যজ্ঞ আরম্ভ করিতে পারিলে, আমরা যে ভগবানের বাণী সফল করিয়া সার্থক হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের আজ লজ্জানিবারণের বস্ত্রটুকু রাখিয়া আর সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে; আমাদের উদরান্নের মুষ্টিটী হইবে জীবনধারণের সম্বল, আর আমাদের কিছু থাকিলে চলিবে না। মাথার উপর জগৎ-স্বামীকে তুলিয়া ধরিতে হইবে, জননীর স্নেহ হৃদয়ে ধরিয়া কোটী কোটী সন্তানের বুকে উৎসাহের আগুন জ্বালিতে হইবে। কে আছ ভাই, এই বৃহতের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবে?

ইহার জন্য আমাদের ভোগবিলাস ভাবনা করিয়া স্কুল কলেজে ছুটিতে হইবে না, পল্লী-কুঞ্জে পাঠশালা, টোল, বিদ্যালয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। নারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আড়ম্বরে দেশের অর্থ অপচয় করার প্রয়োজন নাই। এই মুক্তির প্লাবনে যদি কয়েকটা মাতঙ্গ ভাসিয়া যায়, ভয় করিলে চলিবে না; যদি একটা পুরুষসিংহ জন্মে, তবে তার গর্জ্জনে ভারত-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইবে, একজন জগদ্ধাত্রী মহাদেবীর অভ্যুত্থানে ভারতের নারী-মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে। আজ আমাদের এই গঠন-ব্রতকেই জীবন দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে।

আমরা আশা করি, এই ক্ষুদ্র মহিলা-সভাই যেন আমাদের শেষ না হয়, এইখানেই আমাদের কর্ম্ম যেন রুদ্ধ হইয়া না থাকে। সভানেত্রী মহাশয়া, সমবেত ভগ্নীগণ, এ ধারায় আমাদের জীবনকে অভিষিক্ত করিয়া যাহাতে আমরা ধন্য হই, সে ভার আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইলাম। ভগবান আমাদের সহায় হউন। *

* 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' অষ্টম তৃতীয়া উৎসবে মহিলা-দিবসে শ্রীমতী অমিয় বালা বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

সন্তবামি

(উপন্যাস)

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

(৩)

কনকবরণী তার স্বামীকে বলে, 'ছল চাতুরী আমি জানি নে বাপু, যা করি আমার সব সোজাসুজি।'

সে কথা সত্য। কারণ, শশীশেখরের মত ছেলেমানুষ,—মামীমার মনের ভাব টের পাইতে তাহারও দেরি হইল না। বেশ বুঝিতে পারিল যে, মামীমা তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু কি আর করিবে, পৃথিবীতে আর কেই-বা তাহাকে পছন্দ করে! ওদিকে পিসিমাও যেমন, এদিকে মামীমাও তেম্‌নি। অকারণেই যখন-তখন মামীমার কিল-চড়-লাথি খাইয়া তাই আজকাল তাহার মাকে বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। কিন্তু মা'র সঙ্গে একটি দিনের জন্যও তাহার আর দেখা হয় না যে!

পল্লীগ্রামে সে বরং ছিল ভাল। চারিদিক ফাঁকা। শড়কের কাছে ধানের মাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইলে জনমানবের সাড়াশব্দটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। একেবারে নিস্তব্ধ নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তর। একদিন না একদিন মা'র সঙ্গে দেখা তাহার সেখানে নিশ্চয়ই হইত। আর—এখানে? চারিদিকে লোকজন গাড়ী ঘোড়া শহরের গোলমাল, রাত্রি গভীর না হইলে কোলাহল থামে না,—মা তাহার এখানে আসিবেই বা কেমন করিয়া! মা'র দোষ নাই। সে হয়ত তাহাকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, শুধু এই মানুষের গোলমাল হট্টগোলে তাহার আসিবার উপায় নাই।

শশীশেখর তাই এই শহরের মধ্যেও নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়।

স্কুলে সে ভর্ত্তি হইয়াছে। সেন্টু মেন্টুর সঙ্গে সকাল-সকাল ভাত খাইয়া নূতন বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে নূতন স্কুলে পড়িতে যায়। টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে একাকী সে বাহির হইয়া পড়ে। স্কুলের পাশেই রেলের লাইন সোজা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গেছে। খানিক্ দূর হাঁটিয়া গিয়া সে এই লাইনের ধারে একটা গাছের তলায় চুপ করিয়া বসে। জায়গাটা মন্দ নয়। অন্ততঃ লোক-জনের যাওয়া আসা খুব কম। ভাবে, আজ স্কুলের ছুটির পর সে এইদিক পানে একাকী বেড়াইতে আসিবে। মা হয়ত বা এখানে দেখা দিতেও পারেন।

কিন্তু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী গিয়া শশীশেখর দেখে, তাহার রামায়ণখানি নাই। কোথায় গেল— এদিক্-ওদিক্ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে ভবেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে, খুজ্‌ছিস্ কি?'

শশীশেখর বলিল, 'আমার রামায়ণ।'

'কোথায় রেখেছিলি?'

'এইখানে।' বলিয়া দেওয়ালের গায়ে কাঠের যে তাকটায় তাহাদের বই-দপ্তর শেলেট পেন্সিল

থাকে, সেইখানটা দেখাইয়া দিল। মুখখানি তখন তাহার শুকাইয়া গেছে।

ভবেশ বলিল, 'দেখে আয় না ঘরের ভেতর যদি নিয়ে গেছে তোর মামীমা ?'

কিন্তু মামীমার কাছে যাইতে তাহার ভয় করে। কাছে গিয়া দাঁড়াইলেই একটা-না-একটা ছুতা ধরিয়া সে তাহাকে প্রহার করিবে।

করুক্ প্রহার! মা'র ওই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন! তাহার নিজের হাতের মলাট্ দেওয়া। রামায়ণ-খানির জন্য সে সব কিছু করিতে পারে। শশীশেখর ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখে, সেণ্টু একটা বড় বাটিতে দুধের সঙ্গে কতকগুলা মুড়ি ভিজাইয়া একহাত দিয়া খাইতেছে, আর একহাতে মেঝের উপর রামায়ণখানি খুলিয়া ধরিয়া থামিয়া থামিয়া বেশ জোরে-জোরেই পড়িতে সুরু করিয়াছে; আর মেণ্টু তাহার হাতে একটি বড় রসগোল্লা লইয়া জিব দিয়া চাটিতে চাটিতে একটা পা তুলিয়া আর এক পায়ে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ঘরময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং মামীমা তাহার পিছন ফিরিয়া বসিয়া, লোহার বঁটিটা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বোধকরি শশা কাটিতেছিল।

শশীশেখর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়াই কোনদিকে না তাকাইয়া রামায়ণখানা সেণ্টুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। কাড়িয়া লইয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল; সেণ্টু চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, মেণ্টুও চেঁচাইল, এবং এই দুইটি বালকের তীব্র কণ্ঠস্বরে সহসা চমকিত হইয়া কনকবরণী পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে, কি হ'লো কি? গাধার মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?'

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সেণ্টু বলিল, 'কেন, দেখতে পাও না? বইখানা কেড়ে' নিয়ে গেল যে!'

শশীশেখরকে কনকবরণী দেখিতে পায় নাই, দরজার দিকে তাকাইয়া আন্দাজি ডাকিল,—'ওরে ও-ছোঁড়া, ও হতভাগা, শোন্!'

শশীশেখর ফিরিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই কনকবরণী ডাকিল, 'আয়, ভেতরে আয়। কেন, রামায়ণটা তো তোর খেয়ে ফ্যালে নি, অমন করে' হাত মুচ্‌ড়ে' কেড়ে নিয়ে যাওয়া কেন? বোস্ ওইখানে! মামাকে গিয়ে লাগাবি হয়ত—ওরা খাচ্ছে, আমায় খেতে দিলে না—নে বোস্ ওইখানে।'

বলিয়া একটা বাটির উপর চারটি মুড়ি ও গোটাদুই শশার ফালি লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ঠক্ করিয়া বাটিটা নামাইয়া দিয়া হাত হইতে রামায়ণখানা টানিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মামীমা বলিল, 'বোস্, খা এইখানে বসে' বসে'; তারপর রামায়ণ নিয়ে যেতে হয়—নিয়ে যাস্।'

মেণ্টু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পা দিয়া ঠিক ফুটবলের মত রামায়ণখানা 'সুট্' করিয়া সেণ্টুর হাতের কাছে পাঠাইয়া দিয়া বলিল, 'নে দাদা, পড়বি ত' পড়্!'

কনকবরণী চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল, 'খবরদার বলছি ছুঁস্‌নে সেণ্টু, ও-রামায়ণ তোরা ছুঁস্‌নে, আজই তোদের ভাল রামায়ণ আনিয়ে দিচ্ছি।'

'কি রে পেলি রামায়ণ? পেয়েছিস, শশী?' বলিতে বলিতে ভবেশ বারান্দা পার হইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

শশীশেখর তখন মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হঠাৎ এক-কামড় শশা খাইয়া এমন বিপদে পড়িয়াছে, যে মুড়িগুলা মুখ হইতে না ফেলিয়া তাহার আর কথা বলিবার উপায় নাই।

কোনরকমে ঘাড় নাড়িয়া রামায়ণখানি সে যে পাইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতে বইখানা কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেন গেল, কেহ কিছুই বুঝিল না।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'না খেয়েই পালালি যে, হাঁ রে ও-শশী?'

কনকবরণী বলিল, 'বুঝতে পারছ না? তোমায় জানানো হলো, যে ওকে আমি দুধ দিইনি। এই ত' দুধের বাটি দিতে যাচ্ছি, আর ও উঠে' গেল। দ্যাখো দ্যাখো—তোমার বড় বড় চোখদুটো নিয়ে দ্যাখো ভাল করে'।'

এমন সময়ে নীচের উঠান হইতে শশীশেখরের বমির শব্দ পাওয়া গেল।

ভবেশ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে বমি করছিস্! শশী!'

অনুচ্চকণ্ঠে শশী বলিল, 'হুঁ।'

'কেন?'

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া শশী কহিল, 'শশাটা বড্ডো তেঁতো।'

কথাটা আস্তে বলিলেও, কনকবরণী ঘরের ভিতর হইতে তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। বলিয়া উঠিল, 'ওমা, দ্যাখো দেখি অপবাদ দেওয়া কেমন! তোকে কি আমি বেছে বেছে তেঁতো শশা খেতে দিয়েছি নাকি রে ছোঁড়া? কেন, এরাও ত' খাচ্ছে।'

সেণ্টু বলিল, 'কই আমার শশা ত' তেঁতো নয় দিদি।'

মেণ্টু বলিল, 'আচ্ছা দেখি না খেয়ে।'

বলিয়া শশীশেখরের পরিত্যক্ত বাটি হইতে একফালি শশা তুলিয়া লইয়া কচ্ করিয়া খানিকটা কামড়াইয়া কচ্‌কচ্ করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া গিলিয়া ফেলিয়া দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'না। তেঁতো ত' নয়।'

ভবেশ ফিরিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কনকবরণী বলিল, 'ওই বল্ তোদের জামাই-বাবুকে।'

ভবেশ বলিল, 'তাহ'লে হয়ত মুড়িতে কিছু ছিল।'

বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কনকবরণী বলিল, 'ওগো শুনছো?—একটা রামায়ণ এনে' দিতে পারবে? হাতে পয়সা-কড়ি নেই, থাকলে আর তোমায় আমি বলতাম না।'

ভবেশ বলিল, 'কেন, রামায়ণ কি হবে? ওই ত' রয়েছে একটা, ওইটেই পড়।'

কনকবরণী গালে হাত দিয়া চোখদুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'ও মা গো! দেখলে না? ভাগ্‌নের মূর্ত্তিটা একবার দেখলে বুঝতে পারতে। সেণ্টুর হাতে ছিল, পড়ছিল বেচারা, আমি পিছন ফিরে' বসে আছি, কিছু জানি নে, ছাঁাক্ করে' কোন্ সময় এসে' এম্‌নি হাতটাকে দিলে ওর মুচ্‌ড়ে'—আর-একটু হ'লে……হাঁরে সেণ্টু, বড্ডো ব্যথা করছে; না?'

সেণ্টুর গালে তখন একগাল মুড়ি। স্পষ্ট কথা বলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

কিছু না বলিয়াই ভবেশ চলিয়া গেল। কনক-বরণী বলিল, 'তাহ'লে পারবে না আনতে নাকী বলে' যাও পষ্ট করে'।'

বারান্দা হইতে জবাব আসিল, 'আনছি।'

কনকবরণী আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, মেণ্টু বলিল, 'আঃ, যাক্ না, যাক্ না। দাও ত'

দিদি, একটা রসগোল্লা দাও ত' চট্ করে'—চট্ করে'—'

দিদি বলিল, 'কেন রে? আবার রসগোল্লা কি হবে?'

মেণ্টু মুখখানা তাহার কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'বারে, তেঁতো শশাটা···তখন জামাইবাবুর কাছে বললাম না ·····মাইরি তেঁতো—ভারি তেঁতো!'

হাসিতে হাসিতে কনকবরণী মেণ্টর হাতে একটি রসগোল্লা দিয়া সেণ্টুর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'দেখেচিস্, মেণ্টু কেমন চালাক দেখেচিস্?'

বলিয়া সে একেবারে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রামায়ণ কিনিয়া দেওয়া হয় নাই; তাহার প্রয়োজনও কনকবরণীর ছিল না, কাজেই সে সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য না হইলেও গণ্ডগোল বাধিল আর-একটা ব্যাপার লইয়া।

রাত্রে সাধারণতঃ তাহারা তিনজনে একসঙ্গে বসিয়াই পড়িত। মাঝখানে একটি লণ্ঠন,—একদিকে বসিত সেণ্টু ও মেণ্টু দু' ভাই, আর-একদিকে শশীশেখর একা। কিন্তু সেণ্টু-ছেলেটা এম্‌নি দুষ্ট, যে, লণ্ঠনের ডাঁটের ছায়াটা যাহাতে শশীশেখরের বই-এর উপর পড়িয়া তাহার পড়ার অসুবিধা ঘটায়, তাই সে বারে-বারে লণ্ঠনের পল্‌-তোলা ডাণ্ডার দিক্‌টা শশীশেখরের দিকে ঘুরাইয়া দেয়। প্রথম শশীশেখর আপত্তি করিতে ছাড়ে না; কিন্তু পরে যখন দেখে উহাদের সঙ্গে পারিবার জো নাই, আপত্তি করিতে হইলে ক্রমাগত ঝগড়াই করিতে হয়, পড়া আর হয় না, তখন সে মাথাটা একটুখানি নীচু করিয়া আধ-আলো আধ-ছায়াতেই পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। সেণ্টুর ঘন-ঘন পিপাসা পায়, বারে-বারে তাহাকে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া যাইতে হয়, কখনও বা নাক ঝাড়িবার প্রয়োজনে পড়া ছাড়িয়া দাঁড়ায়, কখনও-বা মিছামিছি বই খুঁজিবার জন্য দেওয়ালের কাছে তাক্‌টার কাছে উঠিয়া যায়, কখনও বা অন্য কোনও কারণে দিদির কাছ হইতে একবার ফিরিয়া আসে,—অথচ যতবার তাহার উঠিবার প্রয়োজন হয় ততবারই সে ফস্ করিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

সেদিন অমনি লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া সেণ্ট ঘরের ভিতর চলিয়া গেছে, অন্ধকারের মাঝে মেণ্ট ও শশীশেখর বসিয়া।

শশীশেখর হঠাৎ 'উঃ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মেণ্ট কোনো প্রকারেই তাহার হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতেছিল, পাশের ঘর হইতে শশীশেখরের চীৎকার শুনিতে পাইয়া ঠিক সেই সময়েই লণ্ঠন হাতে লইয়া দরজার কাছে ভবেশ আসিয়া উপস্থিত!

—'কি হলো কি রে! এই বুঝি তোদের .. কোথায় যাচ্ছিস্?'

বলিয়া পলায়ন-তৎপর মেণ্টুর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ভবেশ শশীশেখরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চেঁচিয়ে উঠলি কেন শশী?'

শশী বলিল, 'অন্ধকারে বসে' ছিলাম, আমার এই হাতে কি যেন একটা ফুটিয়ে দিয়ে ও ছুটে পালাচ্ছে।'

ভবেশ মেণ্টুর হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কি ফুটিয়েছিস্ বল্!'

মেণ্ট ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া দিয়া বলিল, 'কিছু না। ওকে বিছেয় কাম্‌ড়েছে।'

'কই দেখি।' বলিয়া ভবেশ তাহার আর-একখানা হাত পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, হাত হইতে কি যেন সে তৎক্ষণাৎ মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া হাতখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ছাখো না!'

কিন্তু ভবেশের কাছে চালাকি তখন তাহার ধরা পড়িয়া গেছে। লণ্ঠন লইয়া একটুখানি এদিক-ওদিক খুঁজিতেই বড় একটা আলপিন্ তাহার হাতে ঠেকিল। রাগের ঝোঁকে মেণ্টর মাথায় ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া দিয়া ভবেশ বলিল, 'শশী, তুই বই নিয়ে আমার ঘরে পড়বি আয়। এখানে আর বসিস্ নে।'

সেইদিন হইতে শশীশেখর তাহার পাশের ঘরে মামার কাছে পড়িতে বসে।

এবং এই লইয়া ভবেশকে অনেক কথাই শুনিতে হয়।

কনকবরণী তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিরীহ ভাই দুটিকে তাহার উদ্দেশ করিয়া বলে, 'গরীবের ছেলে, ভগ্নীপতির বাড়ী জায়গা যদি একটুখানি পেয়েছিস্ ত' ভাল করে' পড়াশোনা করে' নে ভাই, ভবিষ্যতে দু'মুঠো খেতে পাবি।'

আবার হয়ত' বলে, 'ভালই হয়েছে, আলাদা পড়বার ব্যবস্থা করে' দিয়েছে—খুব ভাল হয়েছে তোদের। তোরা ইস্কুলের পড়া পড়তে এসেছিস্, তোদের ত' আর রামায়ণ মহাভারত নাটক নভেল পড়লে চলবে না ভাই, তোদের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।'

অথচ, এম্নি মজা যে, সে বছর পরীক্ষায় তাহার দু'টি ভাই-এর মধ্যে একটি ভাইও পাশ করিতে পারিল না, আর শশীশেখর পাশ ত' হইয়াছেই, এমন-কি শোনা গেল, সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান বলিয়া ইস্কুল হইতে সে নাকি দু' দুইটা পুরস্কার পাইবে।

এ খবর সে শুনিতে চায় না, তবু কেমন করিয়া যে সংবাদটা কনকবরণীর কানে আসিয়া পৌঁছিল কে জানে।

বলিল, 'মরণ আর-কি! পোড়ারমুখো মাষ্টারদের অম্নি আক্কেলই বটে! বলেছে হয়ত গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে'—মা-বাপ-মরা গরীব ছেলে আমি .....। মায়ের গয়না চুরি করে' যে বেচ্তে পারে তার অসাধ্যি ত' কিছু নেই।'

মেণ্টু কেমন করিয়া না জানি দিদির কথাটা শুনিয়া সেইদিনই ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টায় শশী-শেখরের সঙ্গে ভাব করিয়া লইল। বলিল, 'হাঁ শশী, তুই নাকি গয়না চুরি করিস্?'

শশী অবাক্ হইয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'কিসের গয়না? কার? চুরি? কে—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মেণ্ট বলিল, 'বারে, দিদির গয়না চুরি করিস্ নি? দিদি যে বল্লে!'

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, 'না।'

বলিল বটে, কিন্তু তাহার ভয় হইতে লাগিল—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাহাদের কোনও কথা হইয়া থাকিবে এবং হয়ত'-বা ইহারই ছুতা ধরিয়া মামীমা তাহাকে প্রহার করিতেও পারেন। সেখানে পিসিমা একবার তাহাকে তাহার মা'র গহনা চুরির অপবাদ দিয়াছে, এখানে হয়ত মামীমা তাহাকে আবার সেই অপবাদ দিয়াই লাঞ্ছনার আর বাকি কিছু রাখিবে না।

এই ভাবিয়া চোখদুইটা তাহার ছল্ছল্ করিয়া আসিতেই মেণ্টুর কাছ হইতে সে ছুটিয়া পলাইল।

মেণ্ট অত্যন্ত চালাক ছেলে। ভাবিয়াছিল, এম্নি করিয়া ভয় দেখাইয়া শশীর সহিত ভাব

করিয়া লইয়া কালকার অঙ্কগুলা তাহাকে দিয়াই করাইয়া লইবে, কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন সে সেইখান হইতেই শশীশেখরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'চল্ একবার বাড়ী চল্, তারপর দিদি আজ দেখ্‌বি তোকে কি করবে!'

ছুটির পর শশীশেখর সেদিন আর বাসায় না ফিরিয়া রেল-লাইনের ধারে-ধারে সোজা চলিতে লাগিল। খানিকদূর গিয়া সেদিন যে জায়গাটা সে দেখিয়া গিয়াছিল, সেই নির্জ্জন স্থানটায় চুপ করিয়া বসিল। আজ যদি মা তাহার এত দুঃখের পরেও তাহার কাছে আসিয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে জানিবে যে, সব মিথ্যা, হয়—মা তাহাকে আর ভালবাসে না, নয়ত' তাহাকে সে একেবারেই ভুলিয়া গেছে।

এই লইয়া মাকে তাহার ডাকা হইল চারবার, তবু মা তাহার আসে না কেন?

এতদিন পরে সে মনে-মনে জানিল যে, মা তাহার আসিবে না, মরা মানুষ হয়ত' আর ফিরিয়া আসে না। কিন্তু সে নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করিতে তাহার কষ্ট হইল, ভাবিল, হয়ত' তাহার ভুল হইয়াছে, এরকম করিয়া ডাকিলে হয়ত' আসে না, হয়ত' অন্য কোনও রকমে ডাকিতে হয়।

যাই হোক্, আর সে কোনোদিন মাকে তাহার বিরক্ত করিবে না ভাবিয়া বিষণ্ণমুখে বাসায় যখন ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

ভবেশবাবুর উদ্বেগ আশঙ্কার আর সীমা নাই। শশীশেখর বাড়ী ফিরিতেই তাহাকে কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

ওদিকে পর্দ্দার আড়ালে যে মামীমা দাঁড়াইয়া আছে, শশীশেখর তাহা লক্ষ্য করে নাই। ভিতর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কোথায় ছিল আবার! ওই যে বললাম! ছেলেটিকে তুমি তেমন সাধু মনে কোরো না,—বুঝলে? শয়তানের একশেষ!'

কোনও জবাব না দিয়া শশীশেখর হাঁ করিয়া রহিল।

মামীমা আবার বলিল, 'জিজ্ঞেস্ কর না—নিয়েছে কি না। দ্যাগো এখুনি 'না' বলবে।'

ভবেশ তাহার হাতে ধরিয়া টেবিলের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'হাঁরে শশী, তোর মামীর হাত-বাক্স থেকে তুই একটা গিনি চুরি করেছিস?'

শশীশেখর একটা ঢোক্ গিলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বাঁহাত দিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া মামীমা এইবার মুখ বাহির করিল। বলিল, 'কথা বলবার ছিরি দেখ্‌লে? ও যে নিয়েছে, সে ওর মুখ দেখলেই ত' বুঝতে পারা যায়। তা'ছাড়া মেণ্টুর কাছে ও'ত একরকম বলেইছে।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ রে, নিয়েছিস্?'

এবারেও শশীশেখর ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'না।'

'মেণ্টুর কাছে বলেছিস্ কিছু?'

'না।'

ভবেশ মেণ্টুর মুখের পানে তাকাইল।

মেণ্ট বলিল, 'জিজ্ঞেস্ করলুম ত', ঘাড় নেড়ে ছুটে পালালো।'

'হাঁরে, পালিয়েছিলি?'

মা'র দেখা না পাইয়া একে তাহার মন ভাল ছিল না, তাহা উপর এই সব কথার প্যাঁচে পড়িয়া বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া কি যে বলিবে না বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, চোখদুটা আবার জলে ভরিয়া আসিল।

কনকবরণী বলিল, 'থাক্ বাপু, কাজ নেই আর জেরা করে।' আমার জিনিস যখন ওর পকেট থেকেই পাওয়া গেছে আর যে-রকম উল্‌টোপাল্‌টা কথা বলছে, তাতে আর······যাক্, তুমি জেনে রাখো। আমি একদিন বলেছিলাম ত' হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

আজ আর ব্যাপারটাকে ভবেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। তাহারও মনে কেমন কেমন যেন একটুখানি সন্দেহের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। হাতখানা তাহার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'যা।'

শশীশেখর চলিয়াও গেল; কিন্তু মন তাহার এম্‌নি ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল, যে সে রাত্রে সে না পারিল ভাল করিয়া খাইতে, না পারিল পড়িতে, না পারিল ঘুমাইতে।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া ক্রমাগত তাহার মাকে মনে পড়িতে লাগিল। অন্ধকারে চোখ বুজিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া কাহার উদ্দেশে এই নির্ব্বোধ বালক যে তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিল না।

পরদিন হইতে দিন যেমন চলিতে থাকে আবার তেম্‌নি চলিতে লাগিল। খাইবার সময়ে আবার তেম্‌নি বিভ্রাট ঘটে। কনকবরণী সেন্টু মেন্টুকে আলাদা করিয়া খাইতে দেয়, শশীশেখরের উপর আবার তেমনি অত্যাচার চলে।

এসব অত্যাচার তাহার গা-সওয়া হইয়া গেছে। তবে সে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিদারুণ।

আলাদা বই-দপ্তর রাখিবার জন্য ভবেশ একদিন বাজার হইতে শশীশেখরের জন্য টিনের ছোট বাক্স আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতেই তাহার যাহা কিছু সবই থাকিত।

সকালে সেদিন কনকবরণী ভবেশকে কাছে পাইয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'ওগো, তোমার সাধের ভাগ্‌নেটি যে বিড়ি টানতে শিখেছে! সাবধান কর—নইলে আমার ভাইদুটির মাথা খেয়ে দেবে যে!'

কথাটা ভবেশ প্রথমে বিশ্বাস করিল না। ওইটুকু ছেলে—বিড়ি-সিগারেট সে খাইবে কেমন করিয়া! বলিল, 'না, খায় না। খেলে একদিন না একদিন আমার চোখের সুমুকে ধরা পড়ে যেতো।'

কনকবরণী ডাকিল, 'সেন্টু!'

সেন্টু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'কি?'

'নীচে থেকে শশীর বাক্সটা নিয়ে আয় ত' ভাই! ওগো, তুমি যেয়ো না—দাঁড়াও, আমি কাল স্বচোখে দেখেছি, অন্ধকারে ওই সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ও বিড়ি টানছে। তোমায় ওঠালাম না, তুমি ঘুমোচ্ছিলে।'

ছোট বাক্স। সেন্টু দুহাত দিয়া তুলিয়া আনিয়া দিদির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'শশী জানতে পারেনি, জানলার কাছে পিছন ফিরে' বসে বসে' রামায়ণ পড়ছে আর কাঁদছে।'

কনকবরণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছে কেন?'

সেন্টু জবাব দিবার আগেই মেন্টু বলিয়া উঠিল, 'বা, তুমি জানো না বুঝি? রামায়ণটা পড়লেই ত' ও অমনি করে' কাঁদে। ছিঁচ্-কাঁদুনে' ছেলে কিনা!'

কনকবরণী নিজের চাবি দিয়া বাক্সটা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল; দুইটা চাবি লাগিল না,

তিনবারের বেলা একটা চাবি দিয়া ফস্ করিয়া খুলিয়া ফেলিল।

খুলিয়াই দেখে, তাহার কয়েকটি কাপড় জামার নীচেই এক বাণ্ডিল বিড়ি, দুইটা সিগারেট'—একটা পোড়া, আর একটা আস্ত, আর একটি নূতন দিয়াশালাই।

'দ্যাখো, যা বলেছিলাম সত্যি কিনা দ্যাখো!' বলিয়াই সেগুলা সে বাহির করিয়া ভবেশের পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'সব্বনাশ! সব্বনাশ! এ কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব, না কী! এই ছেলেকে তুমি বল—ভাল ছেলে!'

ভবেশ এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেণ্টকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'ডাক্ ত' ওকে।'

সেই অপেক্ষাই সে করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তড়্‌বড়্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিয়া গিয়া শশীকে উপরে ডাকিয়া আনিল।

মাথার কোঁক্‌ড়ানো কালো চুল কপালে আসিয়া পড়িয়াছে, রামায়ণ পড়িয়া সীতার দুঃখে কাঁদিয়া চোখের জল মুছিয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া ফেলিয়াছে, পরণের কাপড়খানি এককেরৃতা গায়ে দিয়া শশীশেখর ধীরে ধীরে আসিয়া দাড়াইল।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কী এ-সব?'

মামার মুখে এমন কথা সে কোনদিনই শোনে নাই। চোখে তাঁহার একটি স্নিগ্ধ করুণ মমতার দৃষ্টি সে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছে, আজ সে-দৃষ্টি সহসা এমন রুক্ষভাবে রূপান্তরিত যে কেন হইল তাহা সে প্রথমে ভাল ঠাহর করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এতগুলা বিড়িই বা আসিল কোথা হইতে, এবং তাহার বাক্সটাই বা হঠাৎ এমন কিসের প্রয়োজনে এখানে আনা হইল তাহাও সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই।

মামীমা বুঝাইয়া দিল, 'বিড়ি খেতে শিখেছ বাবা, সেই কথাই বলা হচ্ছে!'

ঘাড় নাড়িয়া শশীশেখর বলিল, 'না, বিড়ি ত' খাই না।'

কনকবরণী বলিল, 'তবে কি এই বিড়িগুলো আমি তোমার বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছি বলতে চাও?'

শশীশেখর অবাক্ হইয়া গিয়া একবার তাহার খোলা বাক্সের দিকে আর একবার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিড়িগুলার দিকে তাকাইতে লাগিল।

ভবেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঠাস্ করিয়া তাহার মাথায় একটা চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেখ্‌ছিস্ কি ষ্টুপিড্, খবরদার বলছি, এ-সব যদি শিখবি ত' খুন করে' ফেলব। জানিস্?'

বলিয়া আবার আর-এক চড় মারিয়া বলিল, 'ভেবেছিলাম—ভাল ছেলে। দিনে দিনে দেখছি গুণ বেরোচ্ছে।'

কনকবরণী বলিল, 'বেশ হয়েছে, ওগো আর মেরো না। যাও বাবা, যাও, আর কাঁদতে হবে না – যাও, নাটক নভেল কি-সব পড়ছ পড়গে।'

ভবেশ আবার রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে মারিবার জন্য হাত তুলিতেই, দয়াময়ী কনকবরণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'থাক্, তোমার রাগ ত' জানি। শেষে আবার—'

ভবেশ বলিল, 'ওরে সেণ্ট্, নিয়ে আয় ত' ওর রামায়ণখানা! ঠিক বলেছ, রামায়ণও যা, নাটকনভেলও তাই; তাই-বা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছে কিনা তাই বা কে জানে!'

সেণ্টু বিদ্যুৎগতিতে রামায়ণখানা আনিয়া ভবেশের হাতে দিল। ভবেশ আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাগের মাথায় দুহাত দিয়া বইখানা ধরিয়া পাতাগুলা তাহার পড়্ পড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগ তখন তাহার এত চড়িয়া গেছে যে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, শতচ্ছিন্ন রামায়ণখানি মেঝেতে নামাইয়া নূতন যে দিয়াশালাইটা শশীশেখরের বাক্স হইতে বাহির হইয়াছিল তাহারই একটা কাঠি জালিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিয়া বলিল, 'নে পড়্ এইবার! ভেবেছিলাম, ভাল ছেলে……নাঃ!'

বলিয়া সে দাড়াইয়া থর্ থর্ করিরা কাঁপিতে লাগিল।

রামায়ণখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। শশীশেখর একবার তাহার অশ্রুসজল চক্ষু দুইটী তুলিয়া সেইদিক পানে তাকাইল। মনে হইল—পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের নীচে টল্‌মল্ করিয়া টলিতেছে। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আগুন ধরিয়াছে। (ক্রমশঃ)

হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ

অধিকারি-ভেদে হিন্দুজাতির মধ্যে যত বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি, দেবদেবীর ব্যবস্থাই থাকুক, আসলে ভারতের সত্তা চাহিয়াছিল—নিঃশ্রেয়স্। এই নিঃশ্রেয়স্ অর্থে মোক্ষ, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ। হিন্দুর দর্শন, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই পথেরই নির্দ্দেশ দেয়। অতএব ধর্ম্ম বলিতে ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণ-কামনা হিন্দুজাতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; তবুও যে এই সকলের ব্যাপক ব্যবস্থা তাহা অনধিকারীর জন্যই। আজ অধিকারী অনধিকারী লইয়া দ্বন্দ্ব উঠিয়াছে; অতএব মানুষের বোধের উন্মেষে ধর্ম্মের সত্য লইয়া মতভেদ কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে।

অনধিকারী বলিয়া শীতলা মনসার পূজা দিতে হইবে, গঙ্গাস্নানে, বিশ্বনাথ দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে, দেবদ্বিজে ভক্তি দেখাইতে হইবে, বার-ব্রত পালন করিতে হইবে—হিন্দুর আদর্শপালনের এই যুক্তি আর লোকে শুনিবে কেন? আজ অস্পৃশ্য বলিয়া যাহাদের এতদিন কর্ম্মফল ভোগের জন্য ঠেলিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাদের সমুন্নত হওয়ার জন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন হইল না; তুল্য শিক্ষা-লাভের সুযোগে বিচারকের আসনে ভারতের অস্পৃশ্য যখন উঠিয়া বসে, তখন ভারতের ব্রাহ্মণই যে হাত তুলিয়া এই জন্মেই তাহাকে অভিবাদন করে! যুগধর্ম্মে অধিকারবাদ লইয়া যে শাস্ত্রনীতি তাহা নাকচ হইয়া যায়। কাজেই আজ আমাদের ধর্ম্ম, আচার, সামাজিক অবস্থার কথা ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

ইহাতে হিন্দুত্বের নাশ হইবে না। দুষ্টক্ষত চাপা দিয়া রাখা শ্রেয়ঃ নহে, ক্ষতের চিকিৎসা

করিতে হইবে; জাতিকে তবেই আমরা নিরাময় মূর্ত্তিতে দেখিব

অধিকারী ও অনধিকারী ভেদেই জ্ঞান ও কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি ঘটিয়াছে। কার্য্য-ও-কারণজ্ঞান সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। মৃৎকলস মৃত্তিকাপিণ্ড হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা যে কখন দেখে নাই, জানে নাই তাহাকে ইহা বুঝান যায় না। এক শ্রেণীর লোক ইহার জন্য অধিকারী, অন্য শ্রেণীর পক্ষে ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই—ভারতে এইরূপ একটী নীতি জোর করিয়াই হউক, আর প্রয়োজনবশতঃই হউক, চালান হইয়াছিল। তাহাতে তত্ত্বের দিক্ হইতে অনেকেই অন্ধকারে আছে। ভারতে যে বিশাল শূদ্রজাতির সৃষ্টি, ইহাই তাহার একটী প্রধান কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কোন ধর্ম্মেই এমন বিসদৃশ বিধান নাই। এইহেতু দেখা যায়, ধর্ম্ম বলিতে অন্যান্য জাতির যে ঐক্যবদ্ধ প্রাণ, হিন্দুর মধ্যে তাহা আদৌ নাই। আমরা বিশ কোটী হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু এই সংখ্যা নামে হিন্দু, বস্তুতঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখের মধ্যে যত পার্থক্য, হিন্দুদের মধ্যে তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। জগতের সকল ধর্ম্মীই একটা মৌলিক তত্ত্বে জাতির সমগ্রতাটাকে উঠাইয়া ধরিতে চাহিয়াছে। হিন্দু অধিকারবাদের অছিলায় তাহার জাতির অধিকাংশ ভাগই বর্জ্জন করিয়াছে। আজ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে আমরা একখানি শাস্ত্রপুস্তকের নাম করিতে পারি না, হিন্দুর ধর্ম্ম-মন্দির বলিতে একটী ক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে পারি না। সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মভেদের চূড়ান্ত হইয়াছে, তবুও বলি—আমরা হিন্দু। ইহা উপরের ভাষা। নিজ নিজ সম্প্রদায়গত ধর্ম্মবুদ্ধি পাকা হইলে, অতঃপর আমাদের মধ্যে কেহ বলিবে —আমি বৈষ্ণব, আমি তান্ত্রিক, আমি শৈব, আমি ব্রাহ্ম, আমি বৈদান্তিক ইত্যাদি; আর হিন্দুর মধ্যে আজ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, অস্পৃশ্য ভেদে কেবল সামাজিক অধিকারভেদ রক্ষা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত নই, রাজনীতির অধিকারও পৃথক্ ভাবে দাবী করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ইহা অন্যায় কিছু হয় নাই; ধর্ম্মে, সমাজে, সর্ব্বত্র ভেদ থাকিবে—রাজনীতিক অধিকার পাওয়ার সময়ে একটা ভেদস্থান কেন রক্ষিত হইবে না? মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানের মত ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এমন কি তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, সকল শ্রেণীর সংখ্যানুপাতে অধিকারের অংশ বিভক্ত করিয়া লওয়ার আন্দোলন আমরা প্রায় সমতুল্য বলিয়াই মনে করি। তারপর নারী পুরুষের মধ্যেও তো অধিকারভেদ আছে। এই নারী-জাগৃতির দিনে, তাহাদেরও স্বতন্ত্র দাবীটার উপর পরিহাস করার কি আছে? এই সকল অবস্থার কথা এইরূপ ভাবে হয়তো কেহ আলোচনা করেন না; কিন্তু কথাগুলি বুঝিবার বিষয় বলিয়া উপস্থিত অনেকের কাছে ইহা অনাবশ্যক ও দুর্ব্বোধ্য হইলেও, আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ইহা উপস্থিত করিতেছি।

ঔদার্য্য-বস্তুটা এক দিকে মহৎ গুণ, কিন্তু নিষ্ঠা-রক্ষার পক্ষে ইহা অন্য দিক্ হইতে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। ইস্‌লামের অভ্যুত্থানযুগে খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলিকে ঔদার্য্যগুণে হজরৎ মহম্মদ যদি উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আজ তিনি একধর্ম্মরাজ্যপাশে ইস্‌লাম জগতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাত্মার মুখ দিয়া সামান্য সতর্ক-বাণী বাহির হওয়ায়, খ্রীষ্টান জগতে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। ভারতরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় যদি খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে উপড়াইয়া ফেলার আয়োজন হয়, তবে জগতের খ্রীষ্টান জাতি সেখানে যত রক্ত ঢালিতে

হয়, কুণ্ঠা করিবে না। তাহারা জানে—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পতাকা মানুষের নহে, ইহা তাহাদের প্রভুর দান; তাহার অপমান একজন খ্রীষ্টান জীবিত থাকিতেও সম্ভব হইতে দিবে না। কথাগুলি এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে। এমন অভিব্যক্তি খ্রীষ্টান জাতির মুখ হইতেই বাহির হইয়াছে।

হিন্দুজাতি কিন্তু খুব উদার—নিজেদের মধ্যে যত মত তত পথের সন্ধান দিতে সিদ্ধহস্ত, ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে মুক্তকণ্ঠ। এক অদ্বয় ভাগবত তত্ত্বে আবার সমন্বয় সম্ভব কেমন করিয়া হয় বুঝি না! কিন্তু আমরা যে উদার জাতি, গভীর সত্যদর্শী, সবের মধ্যে সত্য আছে, ইহা কি অস্বীকারের বস্তু! কাজেই সব এক করিয়া হিন্দু দুই বাহু বাড়াইয়া সব কিছুকেই বুকে তুলিয়া লয়। ভারতের গর্ব্ব—আজ নিজ বাসভূমে সে পরবাসী হইয়াছে। অতিথি-সৎকারের দায়ে হিন্দু-ভারতে অহিন্দুর জন্মগত অধিকারদান তার উদার ধর্ম্মেরই পরিচয়। আমরা বলি—সাবাস্ হিন্দু জাতি, এমন আত্মদান জগতে নাই, তাই তারা স্বার্থপর—নিঃস্বার্থ ভারত, বড় আনন্দের অধিকারী তোমরা!

বস্তুতত্ত্বের দিক্ দিয়া হিন্দুর এই ঔদার্য্য কিন্তু একেবারেই শূন্য। ধর্ম্ম লইয়া যথেচ্ছাচার করায় যেমন আপত্তি নাই, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, সমাজ-নীতিতে, জাতিবোধের চেতনায় হাত মুঠা না থাকিলে সত্যই জাতিটা অন্যের কুক্ষিগত হইয়া একটা নূতন সৃষ্টি সম্ভব করিত, সন্দেহ নাই। আজ ধর্ম্মবস্তুটা নাই, তাই সেখানে তার ঔদার্য্যে বাধে না। যাহা বস্তুতন্ত্র, অস্তিত্বশূন্য নহে, তাহা কিন্তু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার পুত্র পরিবার, আমার ব্যবসা, আমার সবই থাকিবে; কিন্তু আমার ধর্ম্ম বলিয়া কোন কিছুকে ধরিয়া থাকা কার্পণ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিচিত্র কথা! সকল বস্তুর ন্যায় ধর্ম্ম যদি আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইত, তাহা হইলে আমরা স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ করিতাম। আমাদের যদি একটা নিজস্ব ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহার সহিত সামঞ্জস্য করার উপাদান অন্য ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম তো একটা নিছক সত্য বস্তু। সত্যের কতকটা আমাদের ধর্ম্মে, কতকটা অন্য ধর্ম্মে, দুইয়ে মিলিয়া পূর্ণ ধর্ম্ম লাভের কল্পনা বাতুলতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

যখন খ্রীষ্টান বলে—ত্রাণ-কর্ত্তা যীশু, অন্য কেহ নয়; ঔদার্য্য বশতঃ এইরূপ গোঁড়া খ্রীষ্টানের অন্ধতা দেখিয়া আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিই। ইস্লামধর্ম্মী জেহাদ ঘোষণা করিয়া যখন এক অখণ্ড পরমেশ্বরের উপাসনা-ভেদকারীদের কণ্ঠনালী কাটিয়া রুধিরের নদী সৃজন করে, তখনও আমরা ইহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া চমৎকৃত হই। কিন্তু আচরণগত বীভৎস মূর্ত্তিটার পশ্চাতে যে অকপট বিশ্বাস তাহা তো আমরা দৃষ্টিগোচর করি না! হিন্দুর তত্ত্ববস্তু এই এক অদ্বয় ব্যতীত যে দ্বিতীয় নাই, এবং দ্বিতীয় নাই বলিয়া অনলে অনিলে তত্ত্বদর্শনে হিন্দুর বাধে নাই—তাই অন্য কি এই এক তত্ত্বে মানুষের অনুভূতি জাগাইবার উপায় অশ্বত্থে, বটে, তুলসী-বৃক্ষে তত্ত্ববস্তুর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করা—এ বিধান কিন্তু সনাতন ভারতের নয়। যদিও কামধেনু স্বরূপ শাস্ত্র দোহন করিয়া ইহা কেহ সপ্রমাণ করিতে চাহে, তরুণ ভারত তাহা যেন বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করিয়া বলে—এ পথ ঋজু নয়, জটিল দুর্গম, ইহাপেক্ষা মানুষকে সহজভাবে এই অনুভূতিদানের ব্যবস্থা হইতে পারে।

অনেকে বলেন—প্রতিমাদির ভিতর দিয়া অনধিকারী ঈশ্বরভক্তি অর্জ্জন করে, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি প্রতীকোপাসনার মূল্য কম নহে;

অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু এই সকল প্রতীকপূজা অসংখ্য কোটী মানুষের অন্তরে ভক্তির বীজ বপন করে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি—ভারতের দেব দেবী কি অনধিকারীর বোধগম্য বিষয়? একজন অশিক্ষিত লোকও বুঝিতে পারে—সত্য বাণীর মূল্য কতখানি, সদ্ব্যবহারের সুফল কি। আকাশের দিকে চাহিয়া অনন্ত নীলিমার মহিমা তবুও তার অনুভূতিগম্য, কিন্তু বিশ্ব ছানিয়া যে মহাশিল্প, যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত ভারতের দেবদেবীর অনুভূতি, তাহা তাহাদের মর্ম্মগত সহজে হইতে পারে না। মানুষ যেমন অশ্ব, গো, মহিষ অতি সহজ চক্ষে দেখে, এই সকল প্রতিমাও তাহারা সেই ভাবেই সন্দর্শন করে। অশ্বের নাম যেমন অশ্ব, দুর্গা ঠাকুরের প্রতিমা তেমনি দুর্গা। ধাবমান অশ্বের অন্তরের দিক্‌টা শিল্পী যদি রেখায় রঙে আঁকিয়া দেখায়, মূর্খ দেশবাসী তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়, কিছুতেই তাহা মর্ম্মগত করিতে পারে না; কেন না; তাহা বুঝিবার বুঝাইবার একটা শিক্ষা আছে, সাধনা আছে। হিন্দুজাতির অন্তরের দিক্‌টাই তো শিল্পীর হাতে বিচিত্র রেখায় রঙে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি লইয়াছে! এইগুলি যে উচ্চ মনের সৃষ্টি, বিনা অনুশীলনে ইহা তো বুঝিবার বস্তু নহে! সাধকের হৃদয়-মন্দিরে শ্যামার দোল; সে যে কত আনন্দের, তাহা দরদী ভিন্ন অন্যে আর কে বুঝিবে! কিন্তু এই শ্যামাকে খড়ে মৃত্তিকায় গড়িয়া শ্যামা ঠাকুরাণীকে অনধিকারীর কাছে উপস্থিত করায়, আমরা দেশের অধ্যাত্ম আদর্শের অবমাননা করিয়াছি। সাধক যাহা মানস নয়নে দেখিয়াছিল তাহাকে মূর্ত্তি দেওয়ার প্রয়াস ভাল; কিন্তু তাহা লইয়া খেলা কোনদিন শ্রেয়ের কারণ হয় না। মূর্ত্তিপূজার জয়ঢক্কা বাজাইয়া আমরা যতই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করি, জাতিনির্ব্বিশেষে যদি হিন্দু ধর্ম্মের গোড়ার কথাটা সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা হইত, এক অখণ্ড চিদ্‌ঘন অন্তর্য্যামীর দিকে মানুষকে মাথা তুলিবার শিক্ষা যদি দিতে পারিত, আজ হিন্দুজাতি এমন ছন্নছাড়া হইত না। প্রশ্ন হইতে পারে—হিন্দুর তত্ত্ব যদি এক অখণ্ড, তবে ইহা হিন্দুর বলিয়া সঙ্কীর্ণতা কেন? ইহা সঙ্কীর্ণতা নহে। আমার পিতাকে আমি পিতা বলিয়া ডাকিব, তেমনই আমার অন্তর্য্যামীকে আমার বলিয়াই ঘোষণা করিব। জগতের সংগ্রামে এই "আমি"কে কেহ যদি জয় করিতে পারে, তবেই আমার পরাজয়; নতুবা "আমার জীবনে লভিয়া জনম" জগৎকে সফল হইতে হইবে। এই আমিত্বের অনুভূতি ইস্‌লামের আছে, খ্রীষ্টানের আছে, হিন্দুরও থাকিবে। তুমি অন্ধ, তুমি ভূয়ো উদার, তাই বলিয়া আশ্রিত বস্তু অক্ষয় অমর অদ্বয়, তাহার বিকৃতি নাই। এইজন্যই জাতিটা এমন হতভাগ্য হইয়াও তাহাদের ধর্ম্ম শাশ্বত সনাতন রূপে এখনও টিকিয়া আছে এবং থাকিবেও।

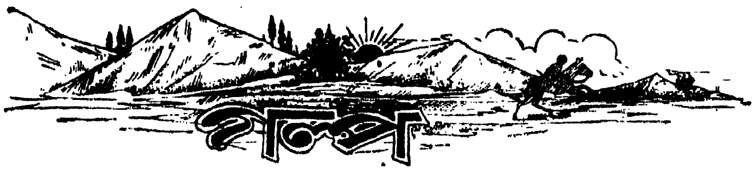
জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়গত বন্ধন রাখিয়া বুঝিতে চাহিলে, আমরা কেন প্রচলিত অনেক আচার আচরণের মূলোৎপাটনে ব্যগ্র, তাহা অনুভূত হইবে না। এই জাতিটা নিশ্চিহ্ন হয়, হিন্দু জাতির প্রতি দরদ লইয়া আজ আমাদের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। হয়তো অনেক শোধন বর্জ্জন প্রয়োজন হইতে পারে। আমাদের একটা আমূল সংস্কার কিন্তু চাইই। সে দিকে উদাসীন থাকিয়া হিন্দুতত্ত্বের উন্নতিশীল গতিবেগ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে চাহিলে আমরা নিজেরাই রক্তাক্ত হইব, অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। এইজন্য, কয়েকটা উদাহরণস্বরূপ হিন্দু-সমাজের আচার লইয়া খোঁচা দিলাম বলিয়া কেহ

যেন বিচলিত না হন। আসলে, আমাদের সচেতন হইয়া উঠিতে হইবে। জগৎ ছুটিয়াছে তীব্রবেগে, আমরা যদি মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচল মূঢ় হইয়া পড়িয়া থাকি, ধূলির ন্যায় নিঃশেষ হইব। জাগ্রত জীবন চাই। এই বিশাল জাতিটাকে একই সুরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

সুরবৈচিত্র্য পাকা ওস্তাদের জন্য; কিন্তু এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যে বৈচিত্র্য দিয়াই শিক্ষানবীশকে বিগ্‌ড়াইয়া দিতেছে। এক তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে, এক সুরে কণ্ঠ মিলাইতে মিলাইতে তবে তো সপ্ত-স্বর স্বতঃই বাহির হয়। গলার সুরেই তো যন্ত্রের সৃষ্টি, আজ যন্ত্রের সুরে গলা ভিড়াইতে গিয়া আমরা বিকৃত সুরেই কোলাহল সৃষ্টি করিলাম। ভারতের হিন্দুধর্ম্মটা তাই একটা জগাখিচুড়ি।

আমরা ইহা বিশ্বাস করি- রাষ্ট্রাধিকার না পাইলে জাতির অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মও আজ জগতে স্থান পাইত না, যদি রাষ্ট্রশক্তি ইহার অনুকূল না হইত। যুগে যুগে ভারতে ধর্ম্ম-বিরোধ ঠেলিয়া ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের যতবার জয়চ্ছত্র উড়িয়াছে, ততবারই তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে– রাষ্ট্রশক্তি। আরবের ধর্ম্মও দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, রাষ্ট্রশক্তিকে আশ্রয় করিয়া। জেরুজেলামের ধর্ম্ম আজ জগৎ ছাইয়াছে—এই রাষ্ট্রশক্তির মাথায় ভর করিয়া। ভারতের হিন্দু যদি হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড়াইতে চায়, রাষ্ট্র-স্বাধীনতার পথে দাঁড়াইতে পশ্চাৎপদ্ হইবে না। ইহা যদি হস্তগত না হয়, আমাদের আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে।

কিন্তু রাষ্ট্র-স্বাধীনতার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের আশ্রয় চাই। আজ আমাদের আদর্শ ও সকল দিকের উদ্দেশ্য যত স্পষ্ট, যত ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ হইবে, ততই আমরা যথাসময়ে নিঃসংশয়ে স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব। স্বাধীনতার পর ধর্ম্মের বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ তাহার প্রবর্ত্তন হয় না; যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এইহেতু রাষ্ট্রসাধনার সঙ্গে, ভাবপ্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যে ধর্ম্মভাব বহুশক্তিশালী ব্যক্তি আশ্রয় দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলে, সেই ধর্ম্মই যথাকালে কার্য্যকরী হয়। ইস্তাম্বুলের প্রাচীন ধর্ম্মাচার কামালের একটী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে যে তিরোহিত হইল, তাহার মূলে ছিল ভাবপ্রচারের শক্তি। পুরাতন রুশের পতনের সঙ্গেই নব্য রুশ যে সোভিয়েট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিল, তাহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ভারতের মুক্তিযুগ যত আসন্ন হইবে, ততই যেভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ সত্য ও সুন্দর হয়, সেই ভাবই প্রবল হইয়া ধীরে ধীরে যোগ্যজনকে আশ্রয় করিবে। এখানে সংখ্যার গরিমা নাই, অল্পসংখ্যক কৌশলী দ্বারাই স্ব-কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইহেতু আজ একদল লোককে পূর্ব্ব হইতেই একটা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মভাব আশ্রয় করিয়া জাতির জীবনে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে—যে জাতির ঘটে ঘটে নারায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে, যে জাতির মিলনক্ষেত্র ভারতের দেব মন্দির হইবে, যে জাতির শাস্ত্র হইবে এক, মত ও পথের পার্থক্যে যে জাতি বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভেদ সৃষ্টি করিতে দিবে না। ভারতের রাজসিংহাসনে বিধাতা যে পুরুষকে উঠাইয়া বসাইবেন, তিনিই গড়িবেন ভবিষ্য ভারতকে—বর্ত্তমানের আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া শাশ্বত ও সনাতন মূর্ত্তিতে। তাই আজ রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্ম আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। দেশের তরুণ, আজ এই নূতন চিন্তার উন্মেষ মাত্র আমাদের প্রয়াস। এমন দিন আসিতেছে, রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লব বাধাইয়া, যাহা হিন্দুত্ব, যাহা ভারত, তাহাই প্রকট করিতে হইবে তাহার জন্য আমরা যেন সতত প্রস্তুত থাকি।



নারী-প্রগতি

— ১ —

"বেন্দা, ও বেন্দা"।

ছোট ভগ্নী বিন্দুবাসিনীকে হরিপদ আদর করিয়া "বেন্দা" বলিয়া ডাকিত। বিন্দুবাসিনী ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, সে কোনই সাড়া দিল না।

পাশের ঘর হইতে ক্ষান্তমণির গলা পাওয়া গেল, "বেন্দা, বেন্দা ক'রে নিজের শরীর যে গোল্লায় যাবে, লুচি ক'খানা মুখে দিয়ে যা খুসী কর, জুড়িয়ে ফ্যান হ'য়ে গেল!"

কথাগুলি হরিপদের কাণেও গেল, বিন্দু-বাসিনীরও কর্ণগোচর হইল। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না, এই কথাটা হরিপদের মনে হইল, সে কথার ভয়েই বিন্দুবাসিনীকে আর কিছু বলিল না, ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

বিন্দুবাসিনী শুইয়া শুইয়া শুনিল—"ভাতার পুত চিরকেলের নয়, ও সব বরাৎ। ভায়ের সোহাগ পাচ্ছে, ঠাটও বাড়ছে—অতো কি!"

হরিপদের অস্পষ্ট গলা, কথা বুঝা গেল না। ক্ষান্তমণির স্বর সপ্তমে চড়িয়া উঠিল—"নাইলে খেলে শোক থাকে নাকি? তুমি চুপ ক'রে থাকো—যা করবার আমি করবো। হোক্ না বোন, বলে—বয়সে বাপ বেটী হুঁসিয়ার হয়। রাতদিন, দুজনে গুজ্ গুজ্ হচ্ছে; কিসের কথা রে বাপু, ও সব আমার ভাল লাগে না ব'লে দিচ্ছি!"

বিন্দুবাসিনী মরমে মরিয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল।

* * *

"দাদা, আমায় শ্বশুরবাড়ী রেখে এসো।"

"জ্বালা সেখানেও কম নয়, শেষে আত্মহত্যা কর্‌বি!"

বিন্দুবাসিনী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর উত্তর দিল—"তা' হোক্, সে আমি সইতে পার্‌বো।"

ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া হরিপদ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও সে তত আশ্চর্য্য হইত না, অকস্মাৎ ক্ষান্তমণির চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিল—"ওলো জটী, ও শৈল! দেখে যা, দেখে যা, মান ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা দেখে যা!"

জটী হরিপদের কন্যা, শৈল পুত্র।

তাহারা আসিয়া অবাক্ হইয়া একবার মায়ের দিকে, একবার পিতার দিকে চাহিতে লাগিল। বিন্দুবাসিনীর মনে হইল, মাটী দু'ফাঁক হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। সে বিনাবাক্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

"যত দোষ, নন্দ ঘোষ—আমার উপর ঝাল করা দেখ! না খাও, ভাতের থালা ঐখানেই প'ড়ে থাক্—মাথা রাখার ঠাঁই আমারও আছে!"

জটীর বয়স তের বছরের কম নয়, সে ভয়ে কোন কথা বলিতে পারে না; কিন্তু অত্যাচার কোন্ পক্ষে তাহা বুঝিয়া মায়ের উপর রাগের সীমা আজ খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—"পিসীমাকে তুমিই তাড়ালে। আহা, বোধহয় জলে ডুবেই ম'লো।"

হরিপদ শিহরিয়া উঠিল।

শৈল বলিল—"বাবা! পিসীমাকে আর একবার খুঁজে আসি চল।"

ক্ষান্তমণি উভয়ের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "মরে পোকা প'ড়ে গেল! ওলো হতভাগী, পিণ্ডি বেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে সব ঘুমোগে—কোন্ চুলোয় যাবে, নিজেই এসে হাজির হবে।"

হরিপদ রাগিয়া অস্থির হইয়াছিল; কিন্তু কোন দিন তাহার মুখে কেহ কটু কথা শুনে নাই, স্ত্রীর অত্যাচার সে চিরদিন নীরবেই সহ্য করিয়াছে। সদ্য-বিধবা ভগ্নীর উপর তাহার এই উপদ্রব অসহ্য মনে হইতেছিল; কিন্তু মুখে তাহার কথা বাহির হইল না। ক্রোধদমনের উপায় ছিল, ক্ষেত্রত্যাগ; আজও সে ইহাই করিল। ক্ষান্তমণি বিরক্ত হইয়া বলিল—"ছাইয়ের সংসার—এসে অবধি জলে পুড়ে মর্‌ছি, পোড়া যমের চোখ নেই!"

—২—

"কালামুখী আবার কোত্থেকে! ওমা কি বুকের পাটা, এক কাপড়ে কার সঙ্গে এলি—ওগো শুন্‌ছ!"

সোনার চশমা চক্ষে এক প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ় হুঁকা হাতে বাহির হইয়া সম্মুখে বিন্দুবাসিনীকে দেখিয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—"মেজ বৌ, চুপ কর, চুপ কর। এসো মা, এস, আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

।তে কলরব পড়িয়া গেল। গোপাল চীৎকার করিয়া বলিল—"ছোটদা, বৌদি এসেছে।" রেবা বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিল। ঝি চাকর অবাক্ হইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। কর্ত্তা বিন্দু-বাসিনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "দাঁড়িয়ে কেন মা, তুমি যদি এখানে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে থাক, তোমার কোন অব্যবস্থা হবে না। রেবা. যা, ঘরে নিয়ে যা। মেজ বৌ, যা ব'লবার আমায় ব'লো, এখন কোন কথা শুন্‌বো না।"



শাশুড়ী বলিল—"কালামুখী আবার কোত্থেকে! ও-মা কি বুকের পাটা, এক কাপড়ে কার সঙ্গে এলি—ওগো শুন্‌ছ!"

কর্ত্তার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভরসা হইল না; সে নীরব হইয়া রহিল। বিন্দু শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণাম করিয়া রেবার সহিত প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

* * *

"গোপালের জ্বর ছাড়্‌ছে না, রেবা সর্দ্দিতে হোঁস-ফোঁস করছে, আমার শরীরও ভাল নয়—

অলপ্পেয়ে বউকে বিদায় কর, আমার ছেলে গেছে সম্বন্ধ ফুরিয়েছে, আর কেন !"

কর্ত্তা হুঁকায় জোর জোর টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন, গৃহিণী উত্তর না পাইয়া বলিল—"দাসীর কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হবে, আমি তোমার সংসারের হিত দেখেই কথা বল্‌ছি—বউ বিদায় কর।"

"বিদায় করি কোথা, মেজ বৌ!"

"কেন অমন ভাই, সেখানে মাথা গুঁজে থাক্‌তে নেই!"

"পারে নি ব'লেই তো ছুটে এসেছে আমাদের আশ্রয়ে। আহা, এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। শরতের কথা মনে কর, সে থাক্‌লে বউমাকে বিদায় করার কথা মুখ দিয়ে বার কর্‌তে পার্‌তে কি!"

"ওগো তোমার পায়ে পড়ি—দেখ্‌ছ না, বউয়ের রঙ যেন অগ্নিমূর্ত্তি, সব পুড়িয়ে ছাই কর্‌বে। আমার কথা শোন—ওর ভাইকে খবর দাও, অমনি না রাখে খোরাকী দিও!"

কর্ত্তা ভারী হইয়া বলিলেন—"কাজ থাকে অন্যত্র যাও, ও সব কথা আমার কাণে শুনিও না!"

গৃহিণী ক্রোধে যাহা তাহা বলিয়া গালি দিল। কর্ত্তা উদাসীন হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে উঠানময় পায়চারি করিতে লাগিলেন; হাতে তাঁর হুঁকা ছিল, মধ্যে মধ্যে তামাকু সেবন করিতেছিলেন।

* * *

বিন্দুবাসিনীকে কর্ত্তা উইল পড়িয়া শুনাইলেন—যদি সে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে, তাহা হইলে আইনতঃ কেহ তাহাকে বাহির করিতে পারিবে না; চারি বৎসর একাধিকক্রমে থাকিতে পারিলে, চোরবাগানের ভাড়াটিয়া বাড়ীর যে আয় তাহা তাহার নামে জমা হইবে, দশ বৎসর পর ইচ্ছামত সেই টাকা সে ব্যয় করিতে পারিবে। এখন তাহার সুবুদ্ধি হইলে বিধবা বলিয়া তাহার ভাবনা নাই।

বিন্দুবাসিনী কৃতজ্ঞ হইয়া শ্বশুরের দিকে চাহিল। কর্ত্তা পুত্রবধূর কাতর দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিল—"শরৎ আমার তোমাতেই আছে মা, ম'লে দেহ যায়, বস্তুর নাশ হয় না—তোমাকে কি অযত্ন কর্‌তে পারি! শাশুড়ী পাগ্‌লী, মেয়ে-মানুষ অত বোধশোধ নেই, যদি দু-কথা বলে মেনে নিও, চঞ্চল হয়ো না।"

বিন্দুবাসিনীর মনে হইল—হৃদয় পুড়িয়া ছাই হোক্, যদি আত্মহত্যা না করি, সসম্মানে বাঁচিয়া থাকার মত আশ্রয় মিলিয়াছে; ভায়ের কাছেও তো জ্বালা, এ-জীবনে জ্বালা জুড়াইবার স্থান আর কোথায় মিলিবে—এইখানেই পড়িয়া থাকিব। শাশুড়ীর উৎপীড়নের কথা মনে হওয়ায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু কপাল পুড়িয়াছে, কাদায় গুণ ফেলিয়া থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

* * *

"তোমার সাধের বৌকে নিয়ে তুমি থাক, আমরা বিদেয় হই।"

"হ'লো কি?"

"ঝি আসে নি, বাসন ক'খানা মাজ্‌তে হয়েছে, মুখ যেন তোলো হাঁড়ী! আমার মরণ, বামুন ঠাকুর ক'দিন থেকে দু'দিন ছুটী চাইছে, ভাব্‌লুম মরুক গে, গরীব মানুষ গতর খাটিয়ে খায়, না হয় আমরা একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নিলুম। ও-মা, বৌয়ের ধনুক-ভাঙ্গা পণ, বলে—হাঁড়ী ধর্‌বে না। তোমার আস্কারায় এত তেজ—তা' থাকো তোমার গুণের বউ নিয়ে, আমরাই বিদেয় হই।"

কর্ত্তা জোরে জোরে হুঁকায় টান দিয়া বলিলেন, "কাজটা সবাই মিলে কর্‌লে বোধহয় গোলমাল

বাধে না। সকাল থেকে কলতলায় সেজ বৌমাকেই তো এক গাড়ী বাসন নিয়ে বস্‌তে দেখ্‌লুম, রান্নাটা না হয় আর কাউকে দিয়ে চালিয়ে নিলে!"

গৃহিণী ফোঁস করিয়া জবাব দিল—"আর কেউ মানে? আমি হেঁসেলে ঢুকি, এই তোমার ইচ্ছা—তা' বেশ, এই বুড়ো বয়সে খুব সুখ হ'লো আমার!"

কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ, কথা বাঁকিয়ে ধর কেন? বড় বৌমা বাপের বাড়ী, মেজ বৌমা তো আছে, রেবাও তো একটু সাহায্য কর্‌তে পারে—সবাই মিলে সংসারের কাজটা সার্‌লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়!"

গৃহিণীর চক্ষের কোণে জল আসিল এরই মধ্যে কখন লাগিয়ে যাওয়া হয়েছে! এত কথা তোমার মুখ দিয়ে বাহির করায় কে, তা' সবই জানি। মেজ বৌয়ের শরীর খারাপ, রেবা এখন পরের বৌ—ইচ্ছাটা আমায় বাঁদী ক'রে রাখা—যেমন আমার কপাল!"

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের তালু সজোরে কপালে আঘাত করিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিল। কর্ত্তা ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। তিনি পুরুষ-মানুষ, সংসারের গৃহিণী যদি অনাথার বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার স্থান এখানে সম্ভব নয়; চিন্তায় তাঁর ললাট কুঞ্চিত হইতেছিল।

* * *

"ওরে বাবা জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল, উঃ—"

বিকট আর্ত্তনাদ শুনিয়া কর্ত্তা রন্ধনশালার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। কি সর্ব্বনাশ! ভাতের ফেন গালিতে গিয়া অসাবধানে হাঁড়ীর কানা ভাঙ্গিয়া জ্বলন্ত ফেনটা বৌমার হাতের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে, নিদারুণ জ্বালায় তাহার কণ্ঠে চীৎকার, চক্ষে অশ্রু, মেঝের উপর কাৎরাইতেছে

"মেজবৌ! মেজবৌ!"

কর্ত্তার গলা পাইয়া ঘুমন্ত চক্ষে গৃহিণী আসিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইল। রেবা কার্পেটের উপর ফুল তুলিতেছিল, সে সুতা পশম হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। মেজ বৌ উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা! বাড়ীতে যেন চোর ডাকাত পড়েছে, বলি হ'লো কি?"

কর্ত্তা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন; কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হস্তখানিতে যে তীব্র জ্বালা ধরিয়াছিল, তাহা কথায় উপশম হওয়ার নয়—সে মেঝেয় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিল, "কি নাড়া-কাতুরে তুমি গা, হাতে একটু ফেন গড়িয়ে পড়েছে, বাড়ী যে মাথায় ক'রে তুল্‌লে!" কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি পুরুষমানুষ, বাড়ীর ভিতর কি হয় না হয়, ছুটাছুটী কর কেন! যাও, ও কিছু নয়, একটু নারিকেল তেল ঢেলে দিলেই জ্বালা জুড়িয়ে যাবে!"

কর্ত্তা কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—"হারামজাদা মেয়েমানুষ! বোকা গাধা—দেখ্‌ছ না, হাতময় ফোস্কা উঠ্‌লো, জ্বালা কি কম হচ্ছে!"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। এত বড় কথা! ছেলে মেয়ের সম্মুখে এতখানি অপমান কোন্ গৃহিণী সহিতে পারে? সেদিন সেজ বৌয়ের হাতে ফেন পড়িয়া যাওয়ার চেয়ে, গৃহিণীকে সান্ত্বনা দেওয়া অধিক প্রমাদ হইল। কর্ত্তা অস্থির হইয়া বলিলেন—"দাও, বৌকে বিদেয় ক'রে। আমার সাধ্য নেই তোমাদের অমতে কিছু করি। কর্ত্তা আমি নামে. যা' খুসী হোক গে!"

তিনি এক মুহূর্ত্তে উদাসীন হইলেন বাহিরের বৈঠকখানায় হুঁকা লইয়া পথের উপর কত প্রকারের লোক চলাচল হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পোড়া হাত লইয়া, বিন্দুবাসিনী সন্ধ্যার পর কর্ত্তার কাছে দাঁড়াইল। কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ব'স মা, ব'স। আমরা পুরুষমানুষ, ইচ্ছা হ'লেও তোমাদের কিছু কর্‌তে পারি না; নারীর শত্রু নারী। সারাদিনই ভাব্‌ছি—বনিয়ে না থাক্‌তে পার্‌লে, বিষয়-আশয় কাগজ কলমেই থেকে যাবে।"



কর্ত্তা কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—"হারামজাদা মেয়েমানুষ! বোকা গাধা, দেখ্‌ছ না হাতময় ফোস্কা উঠ্‌লো, জ্বালা কি কম হচ্ছে!"

করে না; আমি অনেক চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু অসহ্য, বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু—"

বিন্দুবাসিনী সজল নয়নে কর্ত্তার দিকে চাহিয়া আর কথা কহিতে পারিল না, কর্ত্তাও ভ্যাবাচাকা খাইলেন, ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—'অতো অধৈর্য্য হ'লে চলে কি, স'য়ে সাম্‌লে থাক্‌তে হবে বৈ কি! যাবে কোথা? মেয়ে মানুষ—শরৎ বিহনে সবই অন্ধকার!" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বিন্দুবাসিনী বলিল, "চেষ্টা কর্‌লেই যে টিকে থাকা যাবে তা' নয়, আমার স্থান এখানে নেই।" একটু চুপ করিয়া আবার বলিল—"স্বামীহীনার প্রতি আর কারু কি দৃষ্টি দিতে নাই! সত্যই আমি আজ যাই কোথা—মরণ ছাড়া যে আর পথ নাই!"

"সর্ব্বনাশ! ও-কথা

বিন্দুবাসিনী যে কারণে ভায়ের সংসার ছাড়িয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে, সেই একই কারণে শ্বশুরবাটী ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় ভায়ের সংসারে গিয়া প্রবেশ করিতে তাহার মন হইতেছিল না। কোথায় যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া, কর্ত্তার কাছে মনের ভাব জানাইয়া যদি কোন প্রতিকার হয় এই আশা করিয়াছিল। কর্ত্তার কথা শুনিয়া সে বলিল—"বনিয়ে থাকা না থাকা তো আমার উপর নির্ভর

মুখে এনো না মা, আত্ম-হত্যা মহাপাপ—আজকাল ঐ এক হুজুগ হয়েছে!"

"হুজুগ নয়, আশ্রয়হীনার চরম সান্ত্বনা মৃত্যু। অবশেষ হয় তো এই পথই নিতে হবে।"

"মাথা খারাপ ক'রো না—যাও, শাশুড়ী মায়ের তুল্য; যদি এক কথা হয়, মেনে নিয়ে আবার দাঁড়াও। আমি একটা প্রতিকারের কথা ভাব্‌ছি।"

"রক্ষা করুন, উনি আমায় বাড়ীতে স্থান দেবেন না; এ অবস্থায় মানা-মানির কথা নেই।

আমি টাকাকড়ি চাই না, একটু আশ্রয় দিন; আপনার পায়ে পড়ি—যতদিন বাঁচ্‌বো, গতর খাটিয়ে খাবো, কিন্তু নিরাপদ্‌ আশ্রয় চাই।”

বৃদ্ধের চ’খে জল গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মনে পড়িল শরৎকে। সে এই বছরেই বেলগেছিয়া কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইত। পৃথিবীতে স্বামী ভিন্ন নারীর আশ্রয় আর দ্বিতীয় কেহ নাই! পুরুষের তো এমন অবস্থা নয়, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান তার পক্ষে অসম্ভব নহে বলিয়াই কি এই ব্যবস্থা! এমন যদি হয়, নারীজাতি যে আজ স্বাবলম্বনের পথ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, ইহা তো তাহাদের হঠকারিতা নয়, প্রাণের দায়—মরণের অপেক্ষা ইহা যে শ্রেয়ঃ!

কর্ত্তার মনে হইল—কেন, ছেলে মরিয়াছে শ্বশুরশাশুড়ী আছে তো! আচ্ছা, ইহারা না হয় পর, নিজের ভাই কি বিধবার ভার বহিতে পারে না! হতভাগিনীর যদি পিতামাতা থাকিত, তবে এমন করিয়া তাহার চক্ষের জল তাহারা কি দেখিত? বুক দিয়া রক্ষা করিত, উপায় কি? ভাবিতে ভাবিতে তিনি হুঁকায় জোর জোর টান দিতে লাগিলেন। বিন্দুবাসিনী শ্বশুরের পায়ের তলে গিয়া বসিল, অতর্কিতে তাঁহার চরণ দু’খানি সুকোমল কোলে লইয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। বৃদ্ধের অন্তরে তৃপ্তির সহিত দুঃখ মিশ্রিত ছিল; কেন না, তাঁর উজ্জ্বল মুখশ্রীর এক কোণে কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল।

ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় গৃহিণী সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল—“বাঃ, বাঃ, খুব চালাকী—মিন্‌সেকে ভুলিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা! এক পয়সা দিতে পার্‌বে না, বাঁদী হয়ে থাকে তো খেতে পর্‌তে পাবে। চোরবাগানের বাড়ী বাবার কড়িতে হয়েছে, নয়! তাই আল্‌টপ্‌কা বিষয়ের অধিকারী হওয়ার সাধ—আ-মর্‌ মর্‌, হারামজাদী।”

এ-কি অত্যাচার! বিন্দুবাসিনীর অসহ্য হইয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল—“আমি তোমাদের এক পয়সা চাই না। আমায় বিদায় ক’রে দাও, তোমাদের আশ্রয়ে একদণ্ড থাক্‌তে চাই না।”

“বেরো বেরো, আ-ম’লো যত বড় মুখ তত বড় কথা—বেরো বল্‌ছি! কর্ত্তার পায়ে তেল দেওয়া হচ্ছে, আমি ভাবি সর্‌ সর্‌ ক’রে মাগী যায় কোথা—ও-মা, এদিকে বুদ্ধি তো বেশ পেকেছে!”

বিন্দুবাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। প্রাণ বাহির করার সুযোগ হইলে, এই অবস্থায় তাহা ছাড়ে কে? কিন্তু ইচ্ছা মাত্র মানুষ আত্মহত্যার সুবিধা পায় না। সে চারিদিকেই হতাশ হইয়া চাহিল।

কর্ত্তা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহিণীকে বলিলেন—“সবুর কর, গলার হাঁকে পাড়া মাথায় ক’রো না। শরৎ নেই, তাই এমন কথা বল্‌তে ভরসা হ’লো। আমি আজই যদি একটা ব্যবস্থা না করি, চ’খের সাম্‌নে নারীহত্যা দেখ্‌তে হবে। মানুষ যে গলায় দড়ি দেয়, আফিম খায়, কেরোসিন জেলে মরে, অনেক দুঃখে। ঝুম্মন!”

কর্ত্তাও রাগে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। গৃহিণী একটু নরম হইল, কিন্তু কর্ত্তার রাগ গেল না; তিনি রাগের মাথায় ভিতরে ভিতরে একটা মতলব আঁটিয়া লইয়াছেন, তাহা আজই সফল করা চাই। ঝুম্মন আসিলে, তাহাকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন। বিন্দুবাসিনী বুঝিল, শ্বশুর মহাশয় কিছু একটা করিবেনই। গৃহিণী অবাক্‌ হইয়া দেখিল, কর্ত্তা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। এই ঘটনা এমন হঠাৎ ঘটিয়া গেল, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। গৃহিণী শুনিল, কর্ত্তা

গম্ভীর আওয়াজে কোচ্‌ম্যানকে বলিলেন—".. নং 'আমহার্ষ্ট ।" গাড়ী ছুটিল।

৩—

"আরে রাজেনবাবু যে!"

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী সুপরিষ্কৃত দ্বিতল কক্ষে সুসজ্জিত টেবিলের এক পাশে একখানি ঘুর্ণি-চেয়ারে বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সম্মুখে উপবিষ্ট এক তরুণকে লইয়া অধ্যয়ন করিতে-ছিলেন। চশমার ফাঁক দিয়া রাজেনবাবুর সহিত যে যুবতী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার দিকে ঘনঘন তাকাইয়া কথাগুলি বলিলেন। রাজেন ওরফে আমাদের পূর্ব্বকথিত কর্ত্তা মহাশয় একখানি খালি চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"আর ভাই, বড় বিপদে পড়েই এসেছি। তোমার কত নিন্দাই না করি, কিন্তু আজ উদ্ধারের ব্যবস্থা তোমার হাতেই।"

যুবকটী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজেনবাবু বলিলেন—"বস বাবা বস। যদুবাবু, ইনি আমার পুত্রবধূ, শরতের স্ত্রী।"

যদুবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

বিন্দুবাসিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদুবাবু বলিলেন—"বস মা, বস! সুধীর, তুমি পাশের ঘরে চেয়ার আছে —ব'স।"

বিন্দুবাসিনী নিশ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর বিনয়নম্রবদনে বলিল—"বসুন! বসুন!!" সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারখানি আগাইয়া দিল। বিন্দুবাসিনী সলজ্জে উপবেশন করিল। যদুবাবু বলিলেন—"ব্যাপার কি রাজেনবাবু?"

রাজেনবাবু এক নিঃশ্বাসে সব ঘটনা ব্যক্ত করিয়া শেষে বলিলেন—"বেশ আছ ভাই, নিজের নেই' ব'লেই পাঁচজনের সঙ্গে বনিয়ে ভাল কাজ করছ। তোমার আশ্রমে বৌমা রইলো—যে যাই বলুক, তোমায় ছেলেবেলা থেকে জানি, তোমার হাতে ছেলে মেয়ে ভাল ভাবেই গ'ড়ে উঠ্‌বে, খরচপত্র সবই দেবো।" তারপর বিন্দুবাসিনীর



আশ্রমের পরিচালক যদুবাবু সবিস্ময়ে বিন্দুবাসিনীর দিকে ঘন ঘন তাকাইয়া রাজেনবাবুর সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যদুবাবু আমার পর নয়, ছেলেবেলায় এক স্কুলে, এক ক্লাশে পড়েছি। যদুবাবু ক্ষণজন্মা পুরুষ, আপনার ব'লতে কেউ নেই, আকুমার ব্রহ্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, তোমার মত অনেক মেয়েকে মানুষ ক'রে তুলছেন। তোমার

কোন ভাবনা নেই, আমি রোজ অপরাহ্নে এসে দেখে যাবো।"

যদুবাবু কথার উত্তর দিতে সুযোগ পাইলেন না। রাজেনবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন— "দেখ্‌বেন যদুবাবু, বাকী কথাগুলি এসে কইবো, বাড়ীতে কি হচ্ছে দেখি গে!"

কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন। বিন্দুবাসিনী যে কি করিবে, কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না।

"কি করবে বলুন—আপনি কতটুকু করতে পারেন! এই যে ভদ্রলোকের মেয়েটা এলো, তার ভবিষ্যৎ কি? দু' ছ'মাস কিছুর প্রতীক্ষায় কাট্‌লো; তারপর তো ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠ্‌বেই—অতঃপর কি হবে! বিধবা ব'লে তার ভবিষ্যৎ নেই, তাতো নয়।"

সুধীরের সহিত যদুবাবুর কথা হইতেছিল।

যদুবাবু বলিলেন—"তোমরা সংযম হারিয়েছ। নারীর ধর্ম্ম, সেবা, তা' ছাড়া অন্য কিছুতে দাও, তোমরা যা' ভাব, তাই তাদের পথ বটে; কিন্তু পুরুষের সেবায় যদি সবখানি ঢেলে দেয়, কোন সমস্যাই নেই—নারীজীবনের সার্থকতা এই সেবা-ধর্ম্মে।"

সুধীর বসিয়া দক্ষিণ দিকে মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকি মারিয়া বলিল—"মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, মানুষের মন বুদ্ধি নিয়ে তার জন্ম, জিনিষটা এত সোজা নয়। সেবার সবখানি অধিকার নিতে যেদিন সে অস্বীকার করবে, সে দিন বিপ্লব; আর সে বিপ্লবে মেয়েরা যদি তাদের সুপথ আবিষ্কার করে, তবে এই যে তাদের ঘাড়ে একটা ধর্ম্মতত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠা করবে না—এ আমি ব'লে দিচ্ছি!"

"তোমার কথা কি!"

"আমি বলি, পুরুষের মত ওদের সমান অধিকার দেওয়া হোক্। যদি কেউ স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, আপত্তি নেই, কিন্তু মেয়েদের উপর এই সমস্ত সংসারের ভারটা ঘাড়ে চাপিয়ে ঐ যে সান্ত্বনার কথা, পুরুষের সেবাই তাদের ধর্ম্ম ব'লে আমাদের স্বার্থরক্ষা—ইহা একদিন বিপ্লব সৃষ্টি করবে, সে বিষয়ে একবিন্দু সন্দেহ নেই!"

যদুবাবু সুধীরের কথায় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন ব্যয় করিয়াছেন কয়েকজন মানুষের জন্য; তাঁর জ্ঞান, শ্রম, সময় সবখানি দিয়া চাহিয়াছেন একটা নূতন সমাজ সৃজন করিতে; জীবনের অর্দ্ধেকের উপর শেষ হইয়াছে। সুধীর তাঁহার যোগ্য শিষ্য, তাহারই তত্ত্বাবধানে তাঁর কার্য্য পরিচালিত হয়। খরচ দিয়া বড় কেহ আসে না। রাজেনবাবু বিন্দুবাসিনীকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার খবর লইতে তিনি আর আসেন নাই। এমন অনেকগুলি মেয়ে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। প্রায় কুড়ি জন যুবকও যদুবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া স্কুলে কলেজে পড়ে। সুবিধা হইলে তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু যদুবাবুর বাড়ী খালি থাকে না।

তিনি যাহা উপায় করেন, তাহাতে খরচ কুলায় না। মেয়েরা খাটিয়া মরে; ছেলেরা আরাম করিয়া খায়, যদুবাবুর নিকট জ্ঞানার্জ্জন করে, কলেজে যায়, বড় বড় কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করে।

বিন্দুবাসিনী এই নূতন সংসারে খুব আমোদ পাইয়াছে। বয়ঃকনিষ্ঠ যারা, তারা বিন্দুদিদি বলিতে অজ্ঞান; তাদের দাবী এক প্রকারের নয়—কাপড়ে সাবান দেওয়া, খেলিতে খেলিতে পা মচ্‌কাইয়া গেলে চুনে-হলুদ গরম করিয়া দেওয়া, শরীর অসুস্থ হইলে পায়ের তেলোয় গরম তেল মালিস করা

কাজের সংখ্যা নাই; ইহার উপর চা, ভাত, রুটী তৈরী করা, পরিবেশন করা, বাসন মাজা সারা দিন রাত শ্রমের অন্ত নাই। বিন্দুবাসিনীর তাহাতে দুঃখ নাই, এই জীবনগুলিকে লইয়া তার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে সে অতিশয় অসন্তোষের আগুন দেখিয়াছে। তাহারা কি জন্য এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবে, এই লইয়া তুমুল কলহ সৃষ্টি করে; খাটিয়া খাটিয়া তাহাদের মেজাজ এমন রুক্ষ হইয়া গিয়াছে, ভাল কথা বলিলে মন্দ মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে—যুক্তি নাই, বিচার নাই, কে কাহাকে আঘাত করিবে, এই ছুঁৎ ধরিতেই ব্যস্ত।

যদুবাবু ইহাদের লেখাপড়ার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে; কেন না, ছেলেরা নিজেদের পড়া লইয়াই ব্যস্ত, তাহার উপর ছেলেদের উপর পড়াইবার ভার দেওয়ায়, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় লেখা-পড়ার সময় অতিবাহিত হয়; ফলে জীবনের সহিত জীবনের সংঘাতে যে অভিজ্ঞতা, তাহা ব্যতীত জ্ঞান বলিয়া বস্তু বিশেষ কিছুই জন্মে না। যদুবাবু ইহা বুঝেন, কিন্তু অর্থের অভাববশতঃ ব্যবস্থা করা আর সাধ্যে কুলায় না। সুধীর যদুবাবুর আপনার ভ্রাতুস্পুত্র; বাল্যকাল হইতে তাহাকে পালন করিয়াছেন, সে লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, পিতৃব্যের খেয়াল প্রাণপণে পালন করিতে গিয়া প্রায় হার মানিয়াছে। বিশেষ, এইরূপ খিচুড়ি পাকাইয়া যদুবাবুর জীবন শেষ হইল; সে ইহাতে রাজী নহে। তাই তার ইচ্ছা, জিনিষটা ভাঙ্গিয়া একটা সহজ জীবন গ্রহণ করে। কিন্তু পিতৃব্যের সঙ্কল্পভঙ্গ হইবার নয়। তিনি বাস্তব অবস্থা দেখিয়া মনোভঙ্গ হইলেও, চক্ষু বুজিয়া নূতন সৃষ্টির যে স্বপ্ন দেখেন তাহা কোন মতেই ছাড়িতে চাহেন না, বলেন—সুধীর তোর মত আর একটা ছেলে যদি হয়, আমার সব শ্রম সার্থক হবে; বিন্দুর মত মেয়ে আর কি দু' একটা জুটবে না, তা' হ'লেই তো মিটে গেল! পাথর ঠুকে একটা স্ফুলিঙ্গ যদি শোলায় পড়ে, ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালি—সারা জন্ম গেল শেষ না দেখে ছাড়্ছি না।

সুধীরের কথা শেষ হইল না। খাওয়ার ঘণ্টা বাজিল। যদুবাবু সুধীরের গলা ধরিয়া রন্ধনশালার সম্মুখে ছাদের উপর গিয়া নিজের আসনে বসিলেন। উমানাথ, হরিপদ, বিশ্বেশ্বর, রামজীবন—প্রায় কুড়ি জন বালক ও যুবক মহাকোলাহলে ভোজনে বসিয়াছে। যদুবাবু ইহাদের সহিত একত্র ভোজন করেন; সুধীরের পাশে তিনি বসিলেন। পাতে দুইখানা রুটী পড়িল, এক হাতা দাল আনিতে দশ মিনিট কাটিয়া গেল। সুধীর চীৎকার করিয়া বলিল, "বলি, হয়েছে কি! ঘোড়া দেখ্লে সব খোঁড়া হয়ে থাকে, ভদ্রলোকের মেয়ে যে ম'রে যাবে।"

বিন্দু একা পরিবেশন করিতেছিল।

সুধীরের কথা কেহ যে কর্ণগোচর করিল, তাহা মনে হইল না; বরং অলক্ষ্যে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল।

বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি এক হাতা দাল যদুবাবুর পাতে ঢালিয়া দিল। পাশে হরিপদ একেবারে হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ছাই পাঁশ খেয়ে ক'দিন টিক্‌বো! দালে নুন নেই, রুটী কাঁচা—গেলাস দেখুন, এখনও ছাই লেগে রয়েছে। খাওয়ায় না আছে কিছু সাব্‌স্ট্যানস্যাল, না আছে পিউরিটি—এর চেয়ে হোটেল ভাল।"

হরিপদ এবার ম্যাট্রিক দিবে। সে কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র হক করিত, যদুবাবুর প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছে। যদুবাবুর সবই

আপনার লোক। তাঁহার শিক্ষায় এই সব পুরুষ নারী একটা আদর্শ পরিবার গড়িয়া তুলিবে, এই তাঁর খেয়াল।

সুধীর বলিল—"হোটেলে খেলেই হয় তো, এতগুলো মেয়েকে নাকের জলে চ'খের জলে করার দরকার কি আছে!"

হরিপদ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল—"সুধীর দাদা, আপনার কথা শুনে আসি নি, যাবো না। যে ভাব গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, তার জন্য প্রাণ দেব, তবুও নড়্‌ছি না!"

সুধীর—"খুব বীর, মনে রেখো কাল থেকে নিজেদের রেঁধে খেতে হবে। এরা তো তোমাদের মা, বোন নয়; আমাদের মতই একটা জীবন গড়্‌তে এসেছে, সুযোগটা সমানভাবেই দিতে হবে—প্রাণ দেওয়া এখন থাক্‌, আমি কাল এই ব্যবস্থা করছি।"

তিন চার জন ছেলে পাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত বড় কথা! সেবার অধিকার যে দেয়, তার মহত্বের কথা যদুবাবুর মুখে কতবার তাহারা শুনিয়াছে, আর মেয়েরা তাই শুনিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছে; আজ এ-কি বিপরীত কথা, সুধীরের মনে স্বার্থ জন্মিয়াছে। একজন বলিয়া বসিল, "সুধীরবাবু যদি এখানকার ভাব্‌টা ধর্‌তে না পারেন, অনায়াসে স'রে পড়ুন না, আমরা পূজনীয় যদুবাবুর স্বপ্ন তো ব্যর্থ করতে পারি না।"

সুধীরের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, সে "গাধা, রাস্কেল" বলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, পাঁচ সাত জন উঠিয়া কীল, ঘুঁষি উঠাইয়া সুধীরের উপর পড়িল। যদুবাবুর চক্ষু স্থির। একটা মেয়ে কাঁসি বাজাইয়া যুদ্ধ জমাইয়া তুলিবার উপক্রম করিল। অনেক মেয়েই বাহির হইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল; বিন্দুবাসিনী সকলকে সরাইয়া সুধীরের হাত ধরিয়া বলিল—"ছিঃ ভাই, ভায়ে ভায়ে এ-কি কাণ্ড!"

সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কে আমি!"

বিন্দুর চক্ষের টীপ্পনি দেখিয়া সুধীর স্থির হইল। সে পুনঃ ভোজনে প্রবৃত্ত হইল; অন্যান্য ছেলেরা পরস্পরের দিকে বাঁকা চোখে চাহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। অস্ফুটস্বরে এক যুবতীর কণ্ঠে এই কথা কয়েকটা সকলেই শুনিল—

"গলায় দড়ি!"

(আগামীবারে সমাপ্য)



[আশ্রমী লিখিত]

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া-উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লিখিত হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণের পর, সান্ধ্য উপাসনান্তে যথাবিধি মেলার উদ্বোধন-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

রাত্রে চির-হিতৈষী হৃদয়বান্ সুহৃদ্ ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্রেয় তাঁহার ইউরোপভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শতাধিক চিত্র সহযোগে দীপালোকে বক্তৃতা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা এত কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল, যে সমুদয় শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহা অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিল।

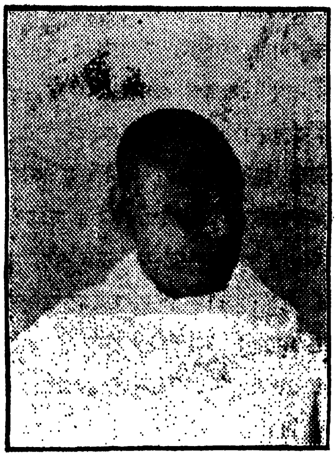
ব্যায়ামপ্রতিযোগিতা

২৩শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার চন্দননগরের "সন্তান-সঙ্ঘ" শারীরিক ব্যায়াম কৌশল, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। "প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের" ছাত্র শ্রীমান পরিমলবিকাশ চৌধুরী এই উপলক্ষে মটর গাড়ী টানিয়া এক মণ আটত্রিশ সের ভার উত্তোলনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে।

রাত্রে সন্তানসঙ্ঘ কর্ত্তৃক "ধ্রুব" সম্বন্ধে আলোক-চিত্রে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

চরকা-দিবস

শুক্রবার মেলায় চরকাপ্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়। সঙ্ঘের প্রায় ৬০ জন আশ্রমবাসী নরনারী এই ঘণ্টাকালব্যাপী প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। খাদিপ্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দেশযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে এই উপলক্ষে খাদি ও চরকার প্রয়োজনীয়তা সুন্দর ও সহজ করিয়া বুঝাইয়া



শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

বলেন—"ভারতের শতকরা ৭৯ জন অধিবাসীর প্রাণ নিজের প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াই মহাত্মার কণ্ঠে এই চরকার বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। খাঁটি স্বরাজ—ইহাদের জন্যই। তাই চরকা ও খদ্দরের দ্বারাই স্বরাজ পাইবার উপায় গান্ধীজী দেখাইয়াছেন। বিলাতী যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে পড়িয়া এই চরকার কল্যাণকারী শক্তি আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।

দেশের যত বস্ত্র দরকার, এককালে চরকা তাহার সমস্ত সূতাই কাটিয়া দিয়াছে। আজও চরকা তাহাই করিতে পারে। চরকার প্রসারের সীমা নাই।"

সতীশবাবুর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বাণীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ভাব ও সাধনা যেন স্পষ্ট মূর্ত্তি লইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

হিন্দু সম্মিলন ও সঙ্গীতসঙ্গত

পরদিন নকীপুরের জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়ের সভানেতৃত্বে বিরাট্ হিন্দুসভার অধিবেশন হয়। সভায় কলিকাতা হইতে হিন্দু-সভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন, পণ্ডিত বটুক নাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত সারদেশ্বর বেদশাস্ত্রী ও শ্রীনলিনীনাথ মৈত্রেয় প্রভৃতি মনীষী ও সুবক্তা আগমন করেন। রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণে হিন্দুসমাজের মর্ম্মান্তিক আত্মবিশ্লেষণ করিয়া, ভারতের ইতিহাস ও পুরাণ হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার পূর্ব্বক দেখান—চাতুর্ব্বণ্য গুণমূলক, বংশগত নহে; তাই হিন্দু মাত্রের ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকার আছে। জাপানের সামুরাই জাতির মত ভারতের ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় অভিজাত্যের অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু-সন্তানকে ব্রাহ্মণ্যাধিকার দান করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ আবার ঐক্যের বীর্য্যে শক্তিমান্ ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে—"এ দেশ ব্রাহ্মণের, ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের, জাতি ব্রাহ্মণের বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। আজিও আবার ব্রাহ্মণের জাতি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের দেশে পরিণতি লাভ করাইতে হইবে—সামাজিক সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়।"

অনন্তর, পণ্ডিতবর বটুকনাথ, বৈদ্যশাস্ত্রী ও মৈত্রেয় মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় হিন্দুর উন্নতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত মতিবাবু হিন্দুধর্ম্মের সুগভীর মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিয়া বলেন—"একটী একটী পাতা ছিঁড়িয়া বৃক্ষকে নিষ্পত্র করার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারচেষ্টায় শক্তির অপচয় মাত্র। তাই রাষ্ট্রপন্থী যাঁহারা, তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যই সর্ব্বাগ্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কামালের ন্যায় শক্তিধর পুরুষ যদি রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, এক নিমিষে সমাজে নূতন প্রবাহ বহিয়া আনা অসম্ভব নয়। কংগ্রেসের রাষ্ট্র-সাধনা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে মুক্তির পথে ছুটিয়াছে। হিন্দু যদি রাষ্ট্রশক্তি পায়, সমাজের পরিবর্ত্তন রাষ্ট্র-যন্ত্রের মধ্য দিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস শুধু হিন্দুর কংগ্রেস নহে; তাই হিন্দু আজ ইহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ....হিন্দুর জীবনে আজ অনুভূতিই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। পণ্ডিত সমাজ অনুভূতিহীন। ধর্ম্মের নামে এমন জুয়াচুরী হিন্দুর ন্যায় আর কুত্রাপি দেখা যায় না। হিন্দু যদি জীবনে খাঁটি ভাগবত অনুভূতি আবার জাগাইয়া তুলিতে পারে, সমাজ আপনা হইতে নূতন হইয়া উঠিবে। হিন্দুর জীবন—ভগবানের জন্য। এ বাণী ভগবানের। তাই ইহা ক্ষুরধার সদৃশ, জ্বলন্ত, অগ্নিময় হইবে। এ বুদ্ধি দিয়া ভগবান চিন্তা করিবেন, হৃদয় দিয়া ভগবানই ভালবাসিবেন। ভগবানই এ জাতির মধ্যে জাগিতে চাহিয়াছেন—ভারতের হিন্দুকে তাই এই পথেই মুক্তি ও অভ্যুদয়ের সন্ধান লইতে আহ্বান করিতেছি।"

এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী সকলেরই হৃদয়ে একটা নূতন আশার রাগিণী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু যদি ভাগবত অনুভূতির পরশ পায়, শক্তি ও প্রেমের দ্যোতনায় সমাজ, ধর্ম্ম, সমস্তই নূতন জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠিবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাত্রে যে বিপুল সঙ্গীত-সঙ্গত হয়, তাহাতে গোয়ালিয়র হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর হাফেজ আলি খাঁ, বঙ্গবিশ্রুত সঙ্গীতাচার্য্য ৺লালচাঁদ বড়ালের যোগ্যপুত্র রায়চাঁদ বড়াল প্রমুখ কয়েকজন কলিকাতার খ্যাতনামা সুগায়ক ও চন্দননগরের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ গায়কমণ্ডলী যোগদান করিয়া মজলিসটীকে অভাবনীয় আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলেন। বিশেষতঃ, হাফেজ আলি সাহেবের সুমধুর স্বরদ বাদন ও রায়চাঁদ বাবুর সুতালে তবলা-বাদ্য সত্যই সর্ব্বজন মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

মহিলা-সভা

সোমবার "মহিলাদিবস"। অপরাহ্নে "প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের" উদ্যোগে একটী বিপুল নারী-সভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা-বাসিনী শ্রীমতী সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

সভায় "নারীমন্দিরের" পক্ষ হইতে শ্রীমতী অমিয়বালা বসু "নারী-জাগৃতি"র কথা পাঠ করেন। তাহাতে ভারতের নারী-জাগরণের ধারা কোন্ পথে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মুষ্টিমেয় নারীর জীবনসাধনার কথা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়। প্রবন্ধটী আমরা স্বতন্ত্র স্থানে প্রকাশ করিলাম।

অতঃপর শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত "মেলা ও প্রদর্শনীর" বিশদভাবে পরিচয় দেন ও পরিশেষে তাঁহাদের জীবন-গঠনের মূলে যে উৎসরূপিণী পুণ্যময়ী মহাশক্তির অবদান সেইটুকু স্মরণ করিয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে কহেন "......এই প্রদর্শনীর পরিচয়টুকুই আমাদের সবখানি নয়। আজ হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে যে করুণ চাপা রাগিণী বক্ষপঞ্জর কাঁপাইয়া গাহিয়া যায়, সেই মর্ম্মকথা ব্যক্ত না হইলে তো মেলার পরিচয় মূর্ত্ত হয় না। তাহা আমাদের মূর্ত্তিমতী জননীর পবিত্র স্মৃতি। তাঁরই অকলাশ্রয়ে সঙ্ঘের এই নারীজীবনই কেবল গড়ে নাই, 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' তাঁর অপার্থিব স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আজ অমর জীবন লইয়া পৃথিবীজয়ে বাহির হইয়াছে। তাঁর পুণ্যময় জীবনের আলোয় আমরা পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি। সেই উৎসব, সেই শিক্ষাসাধনার চিত্র সেই দেশের অসংখ্য নারী-পুরুষের সমাবেশ—কিন্তু তার মাঝে যে পুণ্য মূর্ত্তি জাগ্রত জীবন লইয়া চলা ফিরা করিতেন, তাহা তো আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। এই আনন্দের মাঝে নয়নে তখন প্রাবৃটের বর্ষণ ঝাঁপিয়া আসে। আজ তাঁর উদ্দেশ্যে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলি—মা, আজ তুমি অশরীরিণী, কিন্তু তবুও আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই আছ। তোমার আশীর্ব্বাদই আজ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের পূর্ণ করিতেছে। তোমার পবিত্র স্মৃতি আমাদের জীবন রক্ষা করুক। হে জননি, জগদ্ধাত্রি! তোমার হৃদয় লইয়াই আমরা যেন দেশের ও ভগবানের কাজে জয়ী হইয়া তোমার চরণতলে ফিরিতে পারি। ওঁ স্বস্তি !!!"

সভানেত্রীর অভিভাষণ

সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা সরকার বলেন :—

"......যখন আমাদের সমবেত মনের ঐকান্তিক আগ্রহ কোন মহৎ চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত, তখন যোগ্য অযোগ্যের প্রশ্নই যেন চলে যায়। তখন সমস্ত ব্যক্তির যত ইচ্ছাশক্তি এবং যোগ্যতা, সব এক হয়ে এক অখণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। আর সেই সংঘাতে অশক্তও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেটা যেন ভগবানের একটা বিশেষ প্রকাশ। এই বিশেষ মুহূর্ত্তে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, মূকও বক্তা হয়।"

পরে বলেন—"পশুজীবনে যে স্বার্থ-সংঘাত তা' পৃথিবীর ভাব অর্থাৎ জড়ভাব। কিন্তু ইহারই

মধ্যে আর এক নূতন জগতের ভাব দেখা যায়, যা স্বার্থের জন্য কাড়াকাড়ি নয়, অপরের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ। সেই নূতন জগতের পথ দেখাবার জন্য যাঁহারা প্রেমের আলো হাতে নিয়ে জগতে এসেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—'মা'। এই মায়ের ভালবাসাতেই স্বার্থের পৃথিবীতে ত্যাগের বিকাশ। ইহা থেকেই ভ্রাতৃত্বের ভাব (Comrade-ship) বিকশিত হয়েছে।"

তাই তাঁর মতে—"এই গোড়ার কথা 'মা'। অর্থাৎ নারীজাতির মধ্যে মাতৃত্বের উপলব্ধি ও প্রকাশ। পরিবার বল, ধর্ম্ম বল, সমাজ বল, জাতি বল, সবই এর মধ্যে রয়েছে। নারীজাতি নিজেদের যতটা গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌ছেন—ব্যক্তিগত ভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে—এই সমস্তের বিকাশ তারই উপর নির্ভর কর্‌ছে।"

নারীর দায়িত্বপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"পাশ্চাত্যে একটা কথা আছে, যে হাত দোলনায় দোল দেয়, সেই হাতই পৃথিবী শাসন কর্‌ছে.....আমরা যে মা, আমাদের নিজেদের একটা বৃহত্তর রূপ আছে, এটা আমাদের অনুভব কর্‌তে হবে। মায়ের মাতৃত্ব, মায়ের দেবীত্ব এইখানে। কেবল নিজের সন্তানের স্বার্থের দিক্ দেখ্‌লে যথার্থ মা হতে পারে না মেয়েরা যদি কল্যাণী হতে চান, তবে তাঁদের শক্তিময়ী হতে হবে—যেন তাঁদের সন্তানের কল্যাণ-বিধান কর্‌বার, সন্তানকে কল্যাণপথে চালিত কর্‌বার শক্তি থাকে।"

আরও বলেন—"আমরা ভীরু। ভয় করে' চলাটাকেই মেয়েরা পরম ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছি। মেয়েদের সমস্ত গুণের মধ্যে ভয়টাই যেন সব চেয়ে বড় গুণ।.... স্বেচ্ছায় অথবা সংস্কারবশে এই ভয়ের উপাসনায়, আমরা একদিকে পুরুষের বোঝা-স্বরূপ হয়েছি; অন্যদিকে ভীরু মায়ের গর্ভে ভীরু সন্তানই জন্মায়, ভীরু বংশের উৎপত্তি হয়, এবং দেশটাই ভীরুর দেশ হয়ে পড়ে।"

তিনি বিশ্লেষণ করিয়া জানাইয়াছেন—"এই ভয়টা—বেশীর ভাগ অজ্ঞানতা অর্থাৎ না জানার দরুণ হয়। এমন কি, জ্ঞানের পথে চল্‌তেও আমাদের ভয়।...এই না জানার পথ আশ্রয় করার জন্য আমরা যে জগতের মধ্যে আছি, তার কোন কিছুই জানি না, সে জগতের সঙ্গে আমাদের যেন পরিচয় নাই। যে দেশে জন্মেছি, যে জাতির মধ্যে বাস কর্‌ছি, সে দেশ, সে জাতির সঙ্গে পরিচয় নাই—দেশে থেকেও যেন আমরা দেশবাসী নই। এমন কি, যে পরিবারে মধ্যে বাস করি, সেখানে পিতার, ভ্রাতার বা স্বামীর চিন্তার অংশ গ্রহণ কর্‌তে পারি না।......স্বামীদের স্ত্রীরা সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী অথবা চিন্তার অংশভাগিনী অনেক ক্ষেত্রেই নন। ছেলেদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু জানি না......আর এই সব না জানার জন্য আমাদের মনের প্রসারতাও কমে যাচ্ছে। মনের দিক্ দিয়েও আমরা দরিদ্র হচ্ছি। ঘটিবাটি আঁক্‌ড়ে থেকে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেওয়াকেই জীবনের পরম সার্থকতা মনে কর্‌ছি।"

তাঁহার মতে, "এই অবস্থার কারণ—অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা। সেইজন্য আত্মীয়দের কেবল ভালবাসি তা নয়, সর্ব্বদা ভয় করি। তাঁরা বিমুখ হলে, বিরক্ত হলে কি গতি হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? সাহস বিসর্জ্জন দিয়েছি, সেই সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমও বিসর্জ্জন দিয়েছি।

"চৌদ্দ বৎসরের বেশী মেয়ে ঘরে রাখ্‌লে সে মেয়ে ভাল থাকৃতে পার্‌বে না—অবরোধে বদ্ধ আছি বলেই ভাল আছি, বাহিরে পা বাড়ালেই আর পবিত্রা থাকৃতে পার্‌ব না—আমাদের সে শক্তি নাই, যে আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা

করি, পবিত্রতার সে শক্তিও নাই যে সকল রকম অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলি।

"যিনি মা, তিনি এ কথা কি করে' ভাব্‌তে পারেন, জানি না। ছেলে তবে কিসের গর্ব্ব কর্‌বে? কোন্ অহঙ্কারে নিজেকে মানুষ বলে' মনে কর্‌বে?" পরিশেষে সভানেত্রী দিক্-নির্দ্দেশ-চ্ছলে বলেন—"নারীর আদর্শ যদি সুসন্তান গড়ে তোলা হয়, তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, স্বাবলম্বন-বৃত্তি—সকল দিক্ দিয়াই নারীকে তাহার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠ্‌তে হবে।"

রাত্রিকালে, "প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের" বালিকাগণ শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "স্বপ্নভঙ্গ" নাট্যখানি অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়া সমাগত নারীমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

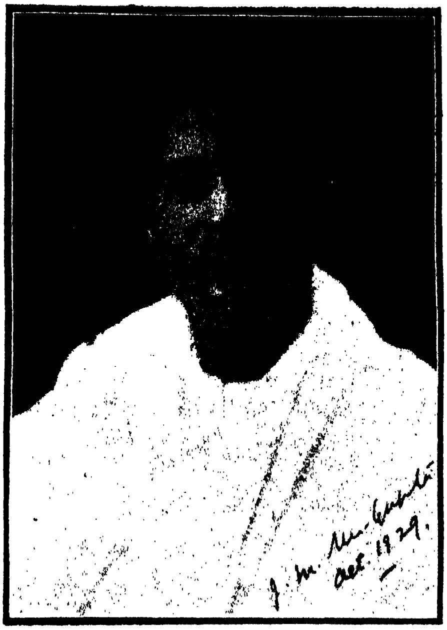
প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী

মঙ্গলবার দিন চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্রের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে শ্রীনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষবিহারী বসু কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করেন। অতঃপর বাঁশবেড়িয়ার কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় "জগতে গ্রন্থাগার" সম্বন্ধে একটী অতি পাণ্ডিত্যগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের এই যজ্ঞপীঠে মানুষ-গঠনের সার্থকতা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উল্লেখ করিয়া মাননীয় বক্তাগণের সুপ্রকাশিত বিষয় লইয়া অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আলোচনা করেন।

পরিশেষে, "রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের" স্বনামধন্য সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ মহাশয় "গ্রন্থাগার" সম্বন্ধে আলোকচিত্র সহযোগে একটী অতি উপাদেয় বক্তৃতার সূচনা করেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সময়াল্পতা প্রযুক্ত তাহা ঐদিন সম্পূর্ণ না হওয়ায়, মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় আর একদিন সঙ্ঘ ও চন্দননগরবাসীর ক্ষুধা মিটাইবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন

২৯শে এপ্রিল বুধবার, দেশপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে' শুভাগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের যোগ্য সমারোহে অভ্যর্থনা



শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

করা হইলে, তাঁহারা সারাদিন আশ্রমে যাপন করেন এবং সঙ্ঘ এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিবাবুর সহিত কথালাপ করেন। তথায় মেয়র শ্রীযুক্ত চারুবাবুর সঙ্গেও তাঁহার রাষ্ট্র-বিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। মধ্যাহ্নে 'প্রবর্ত্তক নারী-মন্দিরে'র মহিলাবৃন্দ অতি সমাদরে তাঁহাদের ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে মেলা-ক্ষেত্রে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। চন্দননগরে এত বড় জনসভা খুব কমই হইয়াছে। একটী সুললিত সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত মতিবাবু যোগ্য ভাষায় দেশ-নেতৃবরকে সভাপতি পদে বরণ করেন। অতঃপর সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণবাবু সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নিম্নলিখিত মানপত্রে অভিনন্দিত করেন :-

অভিনন্দন পত্র

হে সর্ব্বজনমান্য বাংলার রাষ্ট্রবীর,

যুগপ্রভাতে যাঁহার আহ্বানে বাংলার দেশবন্ধু জাগিয়াছিলেন, তুমিও তাঁহারই ডাকে জাগিয়াছ —প্রবুদ্ধ দেশাত্মার জাগ্রত প্রতীক, তোমাকে এই পবিত্র তীর্থে সাদরে আহ্বান করিতেছি তোমায় নমস্কার।

তুমি বিপ্লবী—সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবের জয়ধ্বনি তুলিয়া চিরদিন ছুটিয়াছ—প্রবাহের ন্যায় গতিশীল, বিশ্বাসের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কোথাও কোনদিন কুণ্ঠিত হও নাই—নির্ভীক আত্মদানে যুগের পথ চিনিয়া লইয়াছ ও সেই পথেই দেশকে আহ্বান করিয়াছ—নব ভারতের কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী তোমায় ধর্ম্ম-যুদ্ধের যোগ্য নায়ক ও সেনানীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

আমরাও বিপ্লবী—জাতির মস্তিষ্কে মহাবিপ্লব ঘটাইয়া যুগান্তর আনিতে চাহি। পরাধীন জাতির যে স্বভাবের আমূল রূপান্তর চাই। যে জাতি সৃষ্টি করিতে পারে, সে আপনার স্বাধীন ভাগ্য আপনি গড়িয়া লইবে। তাই আমরা নির্ম্মাণের কঠিন পথই বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা এই নির্ম্মাণযজ্ঞের পুণ্যবেদীতে যে উৎসর্গের হোমানল জ্বালিয়া বোধন বসাইয়াছি, তাহা তলে তলে প্রধূমিত হইয়া একদিন সমগ্র জাতিরই নবজীবন আনয়ন করিবে—এই বিশ্বাস আমাদিগকে পরি-চালিত করিতেছে। দেশসাধনার পূজারী! তুমি আমাদের এই জীবন-সিদ্ধ বিশ্বাসের মর্ম্ম হৃদয় দিয়াই উপলব্ধি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

হে উদার দেশযোগী। তোমার কর্ম্মক্ষেত্র আজ সমগ্র ভারত। বাংলার এই নব গঠন তোমার হৃদয়ে সোণার স্বপ্ন রাঙিয়া তুলিবে। তুমি যে বাঙ্গালী, বাংলার রাষ্ট্রপুরোহিত, বাংলার প্রাণ। বাঙ্গালীর এই সিদ্ধ-যজ্ঞে অদ্য তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

এই নির্ম্মাণ—সঙ্ঘতন্ত্র। জাতির ইহা মহাবীর্য্য। স্বাধীন ভারতের ইহা ভ্রূণমূর্ত্তি। স্বাধীনতা ভিক্ষার দান নহে। উহা জাতির মুক্ত প্রাণেরই আত্ম-পরিচয়। প্রাণে প্রাণে যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তবেই সেই মহাবীর্য্য জাগে, যাহা জাতির মুক্তি-সংগ্রাম অবধারিত জয়মণ্ডিত করিয়া তুলে। অখণ্ড ভারতের গুরু ও নেতা মহাত্মাজী আজ দেশের রাষ্ট্রজীবনে যে ঐক্যের বীজ বপন করিলেন, তাহাই জাতির সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত ও সঞ্চারিত হইলে, ভারতে মহাজাতিগঠনের স্বপ্ন সুসিদ্ধ হইবে। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' এই ঐক্য-স্বপ্নই দেখিয়াছে। বহু ব্যষ্টি যখন আপনা ভুলিয়া একতন্ত্রে মিলিত হয়, তখনই উদ্ভূত হয় অভেদ সমষ্টি—তাহাই সঙ্ঘ। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এই সঙ্ঘ-সাধনার অগ্রদূত। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যে —সন্ন্যাস ও গার্হস্থ জীবনে সর্ব্বব্যাপী মহান্দোলন সৃষ্টি করিয়া সঙ্ঘ এক নব-জাতিকেই রূপ দিয়া গড়িতে উদ্বুদ্ধ। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই গঠন-শক্তির সহায়তা কর। বাংলার বুকেই সর্ব্বপ্রথম নূতন নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠিত হউক। হে দেশপ্রিয়, দেশমূর্ত্তি! তুমি নবজাতির প্রণতি গ্রহণ কর।

তোমার শুভ-বাণী দেশমাতারই আশীর্ব্বাণীরূপে আমাদের সকল আশা সার্থক করুক—এই প্রার্থনা।"

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

অনন্তর মাননীয় যতীন্দ্রবাবু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"যে প্রতিষ্ঠানে আহুত হয়ে এসেছি, এরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে খুব কম আছে। সেদিন এঁদের শাখা-কেন্দ্র চট্টল আশ্রমও পরিদর্শন করে' এসেছি। পরাধীন দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান দেখে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে—জাতির ভিতর একটা শক্তি নেমেছে, একটা সত্যের আবির্ভাব হয়েছে।"

তিনি বলেন—"ইংরাজের শিক্ষার কুহকে আমরা নিজেরা কিছু কর্‌তে পারি তা' আর বিশ্বাস কর্‌তুম না। যেন ইংরাজ ছাড়া চল্‌তে পারি না, তাদের সহযোগিতা না পেলে কোন প্রতিষ্ঠান চালাতে পারি না। এ বদ্ধমূল ধারণা ক্রমশঃ দূর হচ্ছে। আজ কংগ্রেসের দিকে চাইলেও, জাতির প্রকাণ্ড শক্তি ভিতর থেকে অনুভব কর্‌তে পারি। আমার অভিনন্দনে এই ভারত-শক্তিকেই আপনারা সম্মানিত করেছেন।',

কংগ্রেস এই বার মাসে যে অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করেছে, তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ যে উচ্চস্থান লাভ করেছে, তাহা জগতে অতুলনীয়।" সকলকে তিনি অন্তর দিয়ে এই শক্তি অনুভব করিতে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অনুরোধ করেন ও বলেন, "কেহ যেন আজ এই এই জাতীয় শক্তির হ্রাস না করেন।" দুইটী বড় বাধার বিরুদ্ধে তিনি জাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন—"একদিকে হিংসা-পন্থা, অন্যদিকে হিন্দু মুসলমান বিরোধ—এই দুই ভয় আছে। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছি—হিংসাপন্থায় অধিকাংশ লোকের আস্থা নাই। তেমনি কানপুরের ঘটনাও সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রমাণ হতে পারে না।"

এইজন্য তিনি করুণকণ্ঠে নিবেদন করেন—'কংগ্রেসে যেন ভেদনীতি কোন ছলে প্রশ্রয় না পায়।" কংগ্রেসের উপর এই অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তিনি সমগ্র জাতিকে কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে বলেন, "মহাত্মা সারা ভারতের প্রতিনিধি, তাঁর দাবী দেশের দাবী—আর জাতির এই সত্য স্বাধীনতার দাবী যে মুহূর্ত্তে প্রতিপক্ষ অগ্রাহ্য করবে, সেই মুহূর্ত্তে শাসনতন্ত্র অচল হবে।—এরূপ হলেই ইংরাজ বল্‌তে বাধ্য হবে—তোমরা এবার স্বাধীনতা নাও, শুধু আমাদের কারবারের সুবিধা ভারতবর্ষে কর্‌তে দিও।……কংগ্রেস চায় পূর্ণ-স্বাধীনতা—অন্য কোন terms এ স্বীকার পাবে না। মহাত্মা গান্ধী বেণের ছেলে, অল্পেতে তাঁকে সন্তুষ্ট করা কখনও সম্ভব নয়।" সম্প্রতি চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক-আশ্রমে পুলিশের খানাতল্লাসের কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন—"দেশের কোন কাজই আজ রাষ্ট্রনীতির বাহিরে নয়। মতিবাবুর গঠন-নীতিও বড় দিক্ দিয়া রাষ্ট্রসাধনারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব সকলকে আজ একযোগেই দেশের কাজ সিদ্ধ কর্‌তে হবে।"

ইস্‌লাম দিবস

মেলার মধ্যে একদিন—"ইস্‌লাম দিবস" ছিল। কলিকাতা হইতে হৃদয়বান্ মৌলভী "মহম্মদী"-সম্পাদক আক্রাম খাঁ ও "মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মজিহর রহমান আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষ প্রীতির সহিত হিন্দুর এই পুণ্য মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজনীয় মতিবাবু শ্রদ্ধাস্পদ মৌলভী আক্রাম খাঁকে "ইস্‌লাম-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে সভাক্ষেত্রে উপদেশ দিতে

অনুরোধ করিয়া সভাপতি-পদে বরণ করেন। মৌলভী সাহেব "ইস্‌লাম' বলিতেই যে ধর্ম্ম বুঝায় আর সে ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র যে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ তাহা অতি চমৎকার করিয়া বুঝাইয়া দেন। আর সকল ধর্ম্মের মূলকথা যখন এই ঈশ্বরতত্ত্বে আত্মসমর্পণ, তখন হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিরোধের কোনই যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই, ইহা তিনি বিশেষ জোর দিয়াই ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাঁহার মুখে "ইস্‌লাম"-প্রবর্ত্তক ধর্ম্মগুরু মহম্মদের পবিত্র



মৌলভী মহম্মদ আক্রাম খাঁ

মহাজীবনী ও বিশ্বাসগঠনের ইতিহাস অতি মধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন।

'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র এই উদার ধর্ম্মতীর্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যথাকালে স্ব স্ব ভাবে সমবেত সান্ধ্য-উপাসনা এবারকার উৎসবের বিচিত্র ও অপূর্ব্ব ঘটনা। সে সময়ে সত্যই এক অপার্থিব ভাবসঞ্চারে হিন্দু-মুসলমান উভয় জনমণ্ডলীর প্রাণ স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পূর্ণ ও পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষে বর্ষে এমনই মহোৎসবে একই তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুব্যক্তির সম্মিলন ঘটাইতে পারিলে, দেশের যে বিরাট্ কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য শ্রদ্ধেয় মতিবাবু ও সঙ্ঘমণ্ডলীকে আন্তরিক অনুরোধ ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইয়া মৌলভী সাহেবদ্বয় প্রস্থান করেন।

আয়ুর্ব্বেদ-কথা

পরদিন কলিকাতার সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "ভারতের আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে



ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একটী অতি জ্ঞানগর্ভ অথচ সর্ব্বজনসুখবোধ্য বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি করেন ও সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

সাহিত্য-সম্মিলন

শনিবার পণ্ডিত-চূড়ামণি শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সভানেতৃত্বে একটী সুন্দর সাহিত্যসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীহরিহর শেঠ প্রমুখ স্থানীয় সাহিত্যিকবৃন্দ ও কলিকাতা হইতে স্বনামধন্য শ্রীজলধর সেন মহাশয়ও যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বক্তৃতা

সভারম্ভে সভাপতির আহ্বানে শ্রীজলধর সেন মহাশয় তাঁহার ভাবগুরু ও সাহিত্যগুরু সিদ্ধসাধক শ্রীশ্রী৺কাঙ্গাল হরিনাথের পুণ্যবাণী স্মরণ করাইয়া বলেন—তিনি খাঁটি সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্য-কাননের একজন বেতনভোগী মালাকর মাত্র। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার অধিক কিছুই নাই, জীবনে অনেক ভাল কথা তিনি বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, কিন্তু যখন কোন বাণীই সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, তখন আর নূতন বাণী কহিয়া লাভ কি! সুকৃতি থাকিলে, জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত আসিলে, একটী মহাক্ষণেই ভক্তসাধক লালাবাবুর মত জেলেনীর কথায় "বেলা হল, পারে যাবে না?" শুনিয়া আমূল জীবনপরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতে পারে। এই পবিত্রতীর্থে ভাগবতভাবে জীবন-গঠনের যে আয়োজন চলিয়াছে তাহার আকর্ষণে তিনি আসিয়াছেন ও ইঁহাদের সাফল্য প্রার্থনা করিতেছেন।"

অন্যান্য বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বলেন—তিনি সাহিত্য-রাজ্যের চোরমাত্র—চুরি করাই তাঁহার ব্যবসায় ইত্যাদি।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত মতিবাবু বলেন—তিনি সাহিত্যিক না হইলেও, দীর্ঘদিন ধরিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে দেবী-ভারতীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। এই একনিষ্ঠ পরিচর্য্যার ফলে তিনি যে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন তাহাই ভবিষ্য-জাতির জন্য প্রবর্ত্তকের মধ্য দিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন।

তিনি সাহিত্যের অমৃত-ধারা যে গঙ্গোত্রীমূল হইতে উৎসৃত তাহার নির্দ্দেশচ্ছলে বঙ্গসাহিত্যের ভাব-মন্দাকিনী তরঙ্গে তরঙ্গে যত রূপে প্রবাহিত, যেমন করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া অনন্তের সাগরসঙ্গমে চলিয়াছে তাহা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। চণ্ডীদাসের ভাব, শ্রীচৈতন্যের জীবন, তারপর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-সেবিত নবযুগের উচ্ছ্বসিত সাহিত্যধারা কেমন একে একে বাংলার হৃদয়-মনকে পবিত্র ও প্লাবিত করিয়া বাঙ্গালীকে রসে মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছে তাহা বড় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করিয়া পরিস্ফুট করেন এবং তরুণজাতিকে সেই অমৃত-সম্পদের উত্তরাধি-কারী রূপে দেবীভারতীর চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। এই উৎসর্গই যে সৃজন-প্রতিভার উৎস তাহা তিনি নিজের জীবনেই উপলব্ধি করিয়াছেন ও সেই বিদ্যুৎধারা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া এক দল তরুণ আজ জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে। রুষিয়ায় যেমন লেনিনের ভাবধারা আজ একটা মহাজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পৃথিবী-জয়ে উদ্যত করিয়াছে, তেমনি ভারতভারতীর এই সেবকমণ্ডলী চারণের বেশে দেশে দেশে নব-জীবনের অমর প্রবাহ বহিয়া আনিবেন, ইহাই তাঁহার আশা। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে এই ঋত্বিকবৃন্দকে ভারতীর চারণব্রত গ্রহণ করিয়া মুক্তির বিজয়-বাহিনী গঠন করিতে অনুরোধ করেন।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অভিভাষণ

বিদ্বদ্বর সভাপতি মহাশয় অতঃপর সুরসিক সাহিত্য-তত্ত্ববিশারদের যোগ্য ভঙ্গীতে শাস্ত্রের নজীর দেখাইয়া বক্তৃতারম্ভে বলেন—"সাহিত্যে জলধরদাদা নিজেকে মালাকর বলিলেও তিনি শাস্ত্রানুসারে সুসাহিত্যিক ; হরিহরবাবু নিজেকে সাহিত্যক্ষেত্রে চোর লম্পট বলিয়া মনে করিলেও তিনিও সাহিত্যিক—আর মতিবাবুও নিজে খাঁটি



পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সাহিত্যিক নহেন বলিয়া যতই বিনয় পূর্ব্বক বলুন, তাঁহার অদ্যকার এই হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ হইতে তিনি যে সাহিত্যের মর্ম্মদর্শী একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাহা বলিতে একটুও বাধে না। অতএব, এই সাহিত্যের বাণীকুঞ্জে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।"

অমূল্যবাবু অতঃপর সাহিত্যের সাধনা ও প্রকৃতি, বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের অভাব ও প্রয়োজন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা তাঁহারই নিজস্ব ভাষায় "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

সুভাষচন্দ্রের আগমন

সভাভঙ্গে সেই রাত্রেই তরুণ দেশনেতা সুভাষচন্দ্র আগমন করেন। সমস্ত সঙ্ঘ তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলে, তাঁহার সভানেতৃত্বে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। সভার সূচনায় দেশ-প্রতীক সুভাষচন্দ্রের প্রতি যোগ্য সম্ভাষণ জানাইয়া ভারতে জাতিগঠনের যে মূল আদর্শ ও দিব্যধারা 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' জীবনে অনুসরণ ও অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিবাবু একটী সুগভীর, প্রাণস্পর্শী, আবেগময় বক্তৃতায় উহা পরিস্ফুট করিয়া তুলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি জাতীয়তার মধ্যে ধর্ম্মের স্থান কোথায় তাহার নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন —ভারতে নব্যশিক্ষিত যাহারা "ধ" (অর্থাৎ ধর্ম্ম) এবং "ভ" (অর্থাৎ ভগবান) বাদ দিয়া ভারতের মুক্তিপ্রয়াসী, তাঁহারা ভারতের মর্ম্মের চাওয়া কি তাহা জানেন না। অভাব জাগাইয়া চেতনাকে জাগাইবার প্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহ কিসের তাড়নায় রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শঙ্কর, চৈতন্য কেন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন? অভাব জাগাইয়া এ জাতির চেতনা জাগাইবার চেষ্টা বালুর উপর ভিত্তি গড়িবার মত অস্থায়ী ও নিষ্ফল। দেখিতে হইবে—চেতনা পড়িয়া আছে কোথায়? আহার না হইলে চলে না—শরীরের চেতনায়। কিন্তু শাশ্বত সত্যকে

এই দেহ-চেতনা থাকিতে লাভ করা যায় না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন—এই তিন বৃত্তি লইয়া মানুষের পশুত্ব। এই পশুত্বের স্তর হইতে চেতনার মুক্তি না হইলে, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না।...... দেশের আশা—এমন খাঁটি মানুষের দেখা এ যুগেও পাওয়া গিয়াছে। আজ পূর্ব্ব দিকে উষা-রাগের সূচনা হইয়াছে। তাই দেশবন্ধু, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলালের মত খাঁটি মানুষের আবির্ভাব ভারতের প্রাণে সত্য সত্যই মুক্তি-চেতনার সাড়া তুলিয়াছে।"

তিনি বলেন—চেতনার সেই মুক্তি-কেন্দ্র আবিষ্কার করাই ভারতের সাধনা। তাই তিনি স্বাধীনতার পূজারী সুভাষচন্দ্রের কাছে এই অন্তরের নিবেদন জানান—তরুণজাতির মধ্যে এই খাঁটি ভারতীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠা করুন। মানুষের রসহীন আত্মা আজ ঈশ্বরের উপাসনায় যাহাতে পুনরায় রসে ও আনন্দে সঞ্জীবিত ও ঐশ্বরিক বীর্য্য ও প্রতিভার আধার হইয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করুন। দেশের নারীচরিত্রকেও এই ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংকে—ভগবানকে পাইয়া ধন্য হইতে ও পুরুষকে যথার্থ শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে তিনি অনুরোধ করেন।

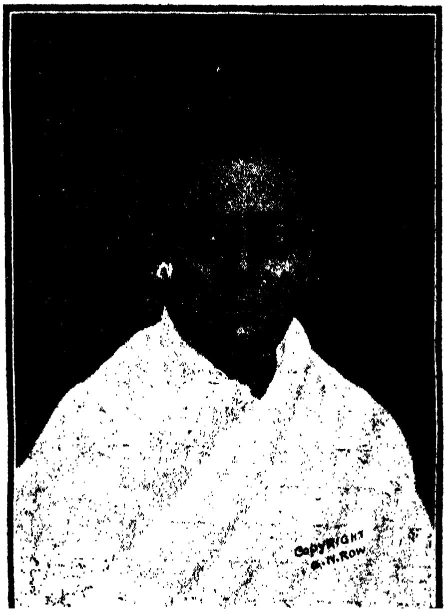
এদেশে যদি এমন দশ সহস্র খাঁটি মুক্তির মানুষ—নারী-পুরুষ গড়িয়া উঠে—যাহাদের "এক দেশ এক ভগবান"—"এক জাতি, এক মনোপ্রাণ"—তাহা হইলে শুধু ভারতের মুক্তি তাহাদের তপস্যায় অদূর ভবিষ্যতে সিদ্ধ হইবে না, ভারতের মুক্তি জগতের আদর্শ হইবে—মানবজাতি এই মুক্ত ভারতের কাছে নূতন করিয়া মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লইবে।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বলেন—

"এই সভায় আমার কিছু বলবার কথা নয়, শুনবারই কথা।

.. ...সভাপতির কর্ত্তব্য বক্তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও প্রয়োজন নেই। আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মতিবাবুর মুখ থেকে যে অমূল্য কথা শুনলেন, তাহা বুঝিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। আপনারা যা শুনলেন, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন—এই আমার নিবেদন। অনেক সার কথা তিনি বলেছেন, সে সকল বিষয় লইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত গবেষণা চলতে পারে। যাঁরা দিনের পর দিন একটা ভাব, আদর্শ নিয়ে



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

আছেন, ও তাহা বাস্তব জগতে সার্থক করার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কথা জগতের নিকট সত্যই খুব প্রয়োজনীয়। আমি সে সকল ব্যাখ্যা করবো না, আপনারাই বুঝে নেবেন।

আমরা যারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে কাজ করতে চাইছি, আমাদের ভাবধারা, চিন্তাধারা কি সে সম্বন্ধে আভাষ দিব।

......ভারতবর্ষ যে এত অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, তার আয়ুঃ এখনও নিঃশেষ হয় নি, তার কারণ বোধ হয়, তাহার বাঁচার সার্থকতা

আছে, জগৎ আমাদের দান চায়। ভারত যে বেঁচে আছে, তার নিদর্শনও পাচ্ছি—পরাধীনতার পীড়ন, নির্য্যাতনের ভিতরও যে ভারত জগতে কিছু দান দিতে সমর্থ হচ্ছে, তাহাই আমাদের বাঁচার লক্ষণ। আমরা যে 'স্বরাজ' চাই, তার কারণ কি! স্বরাজ পেলে আমাদের অন্নসংস্থানের সুষ্ঠু উপায় হবে, দেশের স্বাস্থ্য, শ্রী ফিরে আস্‌বে, স্বাধীন হ'লে অনেক বিষয়ে উন্নতি করার পথ খুলে যাবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নহে। সব চেয়ে বড় কথা—যে পর্য্যন্ত আমরা স্বাধীন না হই, আমরা খাঁটি মানুষ হতে পার্‌বো না। পরাধীন দেশের আব্‌হাওয়ায় আস্ত নিখুঁত মানুষ জন্মাতে বা গড়ে উঠ্‌তে পারে না। তাই সব চেয়ে বড় কথা—গোড়ার কথা আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ হতে চাই। বাহিরের ধাক্কায় স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রকাশ হয় না, ভিতরের উন্মেষ চাই; বাহিরের আঘাতে প্রতিক্রিয়ায় যে জীবনপ্রকাশ হয়, তাহা বেশীদিন টিক্‌বে না। ভারতের জীবন রয়েছে, ভারতজাতির সত্তা বা আত্মা রয়েছে, তাহা প্রকাশ হতে চায়। যার মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ হতে পারে তার উপায় চাই। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় সত্তার বিকাশ হচ্ছে।

জাতির ন্যায় বিশ্বেরও আত্মা রয়েছে। বিশ্বের আত্মার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ রয়েছে—একেরই বিকাশ হয়েছে বহুর মধ্যে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই এই একই তত্ত্ব—একের সঙ্গে বহুর সম্বন্ধ। জোর করে বল্‌তে পারি, ভারতে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌বে, তাহার বৈশিষ্ট্য থাকবেই; কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও একত্বের খেলা থাকবে। নিজেদের মৌলিকত্ব উপলব্ধি কর্‌তে না পার্‌লে, জীবনের উন্মেষ কখনও হবে না। Universalism খুব বড় জিনিষ বটে; কিন্তু বিশ্বের একত্বকে ভিত্তি করে' বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তুলতে হবে; জাতির মৌলিকত্ব উপলব্ধি না কর্‌লে, জাতি কখনও সার্থক হতে পারে না।

আমাদের জীবনেও একটা স্বপ্ন আছে, তা' সার্থক করার জন্যই আমাদের কাজ কর্ম্ম। সার্থক কর্‌তে পার্‌বো কিনা জানি না; তবে একদিন যে হবেই, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই স্বপ্ন মানুষের নয়, আমরা বাহন-স্বরূপ; আমাদের মত ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রেই সাফল্য লাভ কর্‌বে। তা' আমাদের দেওয়ার বস্তু, প্রাণের বস্তু! আমাদের এই স্বপ্নকে উত্তরাধিকারী সফল করে' তুলবে।

বাস্তব-জীবনের সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য না থাক্‌লে, কিছু সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌বো না; নিজের অন্তরে স্বরাজ না পেলে বাস্তবজীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

"নবজীবন সভায়"ও আমি বলেছিলুম—ভারতের বৈশিষ্ট্যে, বাংলার বৈশিষ্টকে বাদ দিলে চলবে না।

...দেশের একজন নেতার পতাকাতলে সবাই দাঁড়ায়, তার কারণ কি! মহাত্মার পতাকাতলে আজ সমস্ত দেশ দাঁড়িয়েছে, তার কারণ—আমাদের অন্তরের চাওয়া, অন্তরের বাণী তাঁর মধ্যে পাচ্ছি। দেশবন্ধুর মধ্যে বাংলার লোক সে বাণী শুনেছিল।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ"—কখন বল্‌তে পারি—যখন জাতির সঙ্গে, সত্যের সঙ্গে এক হয়ে যাই, তখনই ইহা সম্ভব। জাতির সঙ্গে মিশে গেলেই জাতিকে জাগাতে পার্‌বো।

...আমি মর্ম্মকথা শুন্‌তেই এখানে এসেছি। এতদিন ধরে' যে প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠ্‌ছে, তার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে।

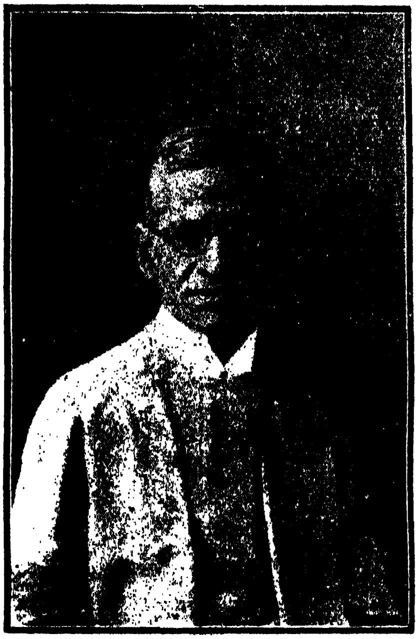
যাঁরা political field'এ রয়েছেন, আমি যা' বল্‌লুম, তা' তাঁদেরই ভাবের কথা। আদর্শের দিকে বড় হতে হলে, ভাবের ভাবুক হতে-হবে।

.. মনে রাখ্‌তে হবে—ভারতের নিজস্ব মিশন আছে—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়ের মধ্য দিয়াই দিবার আছে; ভারতের যে রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌বে, তা'ও জগতে নূতন জিনিষ দিবে। ভারতের দান না পেলে বিশ্ব পূর্ণ হতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের চেষ্টা হচ্ছে—এই সাম্রাজ্য-বাদের ভিত্তি ভারতে। ভারতে আমরা বেঁচে আছি আমাদের জন্য, বিশ্বের জন্য। এই আদর্শ

নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌লেই বিপুল শক্তি পাবো।... শক্তির মূল প্রস্রবণে পৌঁছতে হবে, আমরা শক্তির সন্ধান হারিয়েছি, তাই এই অবস্থা। আমাদের মায়েদেরও একই অবস্থা, তাঁরাও শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। নারীকে "অবলা" নামে অভিহিত করা হয়, সাহিত্য থেকে এই অপবাদ দূর কর্‌তে হবে, মাতৃশক্তিকে জাগাতে হবে।

বাংলাদেশে দলাদলির কারণ—অখণ্ড শক্তির অভাব। যেদিন অখণ্ড শক্তি উপলব্ধি কর্‌বো, সেইদিন সব ভুলে যাবো।"



শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

শেষ দিন

শেষ দিনে "রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে"র বাংলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু আগমন করেন। তাঁহার মুখে সুদূর ইংলণ্ডে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য যে জগদ্বিখ্যাত মহাসভার অধিবেশন ও অতি গুরুতর বিষয়সমূহের আলোচনা হইয়া গেল, তাহার প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট ও পরিশ্রুত আনুপূর্ব্বিক সুদীর্ঘ বিবৃতি শুনিয়া সকলে যারপর নাই পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

অনন্তর, সমাপ্তিসভায়, উৎসব-কমিটীর সভাপতি ও মেয়র শ্রীচারুচন্দ্র রায় এই দীর্ঘ ত্রয়োদশ-দিনব্যাপী মহোৎসব যে একটী অখণ্ড প্রাণের অনাবিল চেতনা ও রসধারা তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলেন এবং দেশ ও সমাজকে এই আনন্দবিতরণের



শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়

জন্য অনুষ্ঠাতৃবৃন্দকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর, উৎসব-কমিটীর সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দত্ত মিষ্টমধুর ভাষায় এই মহাযজ্ঞে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগী ও দেশবাসীকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এই বিরাট্ উৎসব সুসমাপ্ত করেন।



প্রবাহ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

বাংলার মধ্যাহ্ন-সূর্য্য মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব আজ সারা বাংলার প্রাণে সাড়া তুলিয়াছে। ইহা রবীন্দ্রের মহাব্যক্তিত্বের পূজা ও জাতির জয়োৎসব। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গায়ক, স্রষ্টা, শিক্ষক, লোকগুরু ও দেশপ্রেমিক, দিগ্বিজয়ী মনীষী ও ভবিষ্য যুগমানবের পরিপূর্ণতার আশা-বিগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ যে কত দিক্ দিয়া কত বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার আধার হইতে পারে, মানবাত্মার পরিপূর্ণতর সম্ভাবনীয়তা এই একটী মহাজীবনে শতদল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়া তাহাই যেন প্রমাণিত করিয়া তুলিয়াছে। কবি মাত্রেই ভবিষ্যতের দূত— এই দিক্ দিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দাবী সব চেয়ে বেশী; কেন না, তাঁহার শতদল প্রতিভা ও সর্ব্বসৌভাগ্য মানুষের রাজগৌরবেরই সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ যেন স্বর্ণযুগেরই মানুষ—এযুগে তিনি কেবল কয়েকটা জয়চিহ্ন প্রমাণ স্বরূপ প্রোথিত করিয়া গেলেন—যে মানুষ আসিতেছে, সেই অনাগত মহামানবেরই আগমনী সঙ্গীতস্তুতি পাই তাঁর জীবনে—শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং যেন তাঁহাদেরই একজন অগ্রদূত, পরিপূর্ণতারই নমুনা লইয়া আসিয়াছেন। তাই শুধু বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বমানবের জীবনক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ও কবিপ্রভাব উজ্জ্বল গ্রহরাজের ন্যায় সত্যই সকলের বন্দনীয় ও বরণীয়। দিবাকরকে কে অস্বীকার করিতে পারে? তেমনি কেহই রবীন্দ্র-নাথের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা অস্বীকার করিতে পারে না।

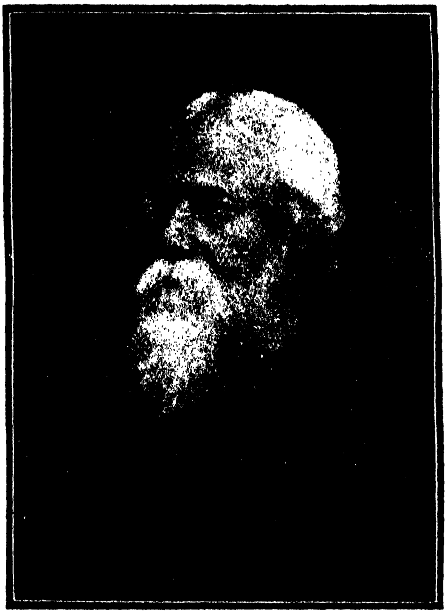
জগতের মুকুটধারী রাজন্যবৃন্দের স্বর্ণকিরীট এই দিগ্বিজয়ী কবি-সম্রাটের উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে সম্মান দানে ইতস্তত: করে না, বাণীর বরপুত্রগণ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি অর্ঘ্য দিতে ছুটিয়া আসে, জনমণ্ডলী তাহাদের "কবি" বলিয়া প্রীতিভরে তাঁহার গীতি ও কথা শ্রবণ করে—টুপি খুলিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মুসোলিনী ইউরোপের প্রাচীন জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলীস্বরূপ রোমের গ্রন্থ-ভাণ্ডার তাঁহার চরণে লুটাইয়া দেয়—ইহা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পূজা কি মানবাত্মার পরিপূর্ণ আশা ও সম্ভাবনীয়তার বন্দনা তাহা বিচার্য্য নহে। রবীন্দ্রনাথ মহা-মানবত্বেরব কবি—তাঁর মধ্য দিয়া বিশ্বমানবেরই বিজয়রাগিণী সুর-সপ্তকে ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

মহাকবির জন্মোৎসব তাই মানবাত্মারই মহোৎসব মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালী মহাজাতিরূপে দাঁড়াইতে চায়, তাই মহাজীবনের সকল সম্ভাবনীয়তা তাহার মধ্যে যুগে যুগে বিচিত্র-রূপে ফুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম—এমনই এক বিশ্বতোমুখী প্রতিভার অবিসম্বাদিত নব উৎস। তাই এ জন্মোৎসবে বাঙ্গালীর জাতিহিসাবে যোগদান করা উচিত।

যে যজ্ঞের উদ্বোধক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হোতা স্বয়ং বিজ্ঞানরাজ জগদীশচন্দ্র, তাহার সাফল্যে সন্দিহান হওয়ার লেশমাত্র কারণ থাকিতে

পারে না। শুধু আমাদের কথা, এই মহোৎসবে কবির প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ কালে তাঁর সেই আজন্মপোষিত বিরাট্ সঙ্কল্প—সেই চির-কল্লোলিত প্রাণের মহাবাণী—

"এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।
এই সব শ্রান্ত ক্লান্ত বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা।"



মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

—ইহা না ভুলি। কবি-প্রাণের ইহা যে বড় গভীর একান্ত আকূতি—এ আকূতির মর্ম্ম যদি সিদ্ধ হয়, তবেই না কবিপরিচয়ের সাথে সাথে, একটা জাতির আত্মপরিচয়ের দীক্ষা সর্ব্বব্যাপী ও সার্থক হয়। বঙ্গ-ভারতীর দুয়ারে আমরা জাতির এই করুণ মর্ম্মরাগিণীই নিবেদন করিয়া রাখিলাম। "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"—বিরাট্ জাতীয় জাগরণোৎসবে পরিণত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

বর্ম্মায় অভ্যুত্থান—

বর্ম্মা ভারতেরই সংযুক্ত দেশ, একই রাষ্ট্র ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। বর্ম্মানজাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; তাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ম্মা ভারতেরই অধ্যাত্ম-কন্যা। রাষ্ট্রীয় সাধনায় আজ বর্ম্মা ভারতের সহিত একই ভাগ্যসূত্রে সন্নিবদ্ধ থাকিবে অথবা বিযুক্ত ও স্বতন্ত্র ভাবে আত্মভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অর্থেই যদি এক্ষেত্রে স্বাধীনতা হইত, তাহা হইলে বলিবার কোনই কথা ছিল না; কিন্তু ভারতের ন্যায় বর্ম্মাও আজ তৃতীয় শক্তির অধীন রাজ্য—কাজেই বন্ধুহীন মুক্তি-সংগ্রামে একক সাহায্য লাভের আশা যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী সাফল্যের সম্ভাবনা ভারতের ব্যাপক মুক্তি-সংগ্রামে সহযোগী ও সাধকরূপে যদি বর্ম্মা আগুয়ান হয়। বর্ম্মার দূরদর্শী জাতীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই এই শেষোক্ত পথই শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছেন ও সাধ্যপক্ষে বরণ করিয়াছেন। আমরা ত্যাগীশ্রেষ্ঠ রেঃ উত্তমকে জানি—তিনি ভারতেরই মর্ম্মবেদনার আগুন নিজের বুকে জ্বালিয়া একনিষ্ঠচিত্তে মুক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও স্বজাতির অন্তরে এই একই ভাবপ্রতিষ্ঠা চাহেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহামণ্ডলীও বর্ম্মাকে সসম্মানে স্বাধিকার নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিয়াছেন—ইচ্ছা করিলে সে স্বাধীন ভারত মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে, ইচ্ছা করিলে সে স্বতন্ত্র হইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, বর্ম্মার খাঁটী দেশ-প্রেমিক দরদী নেতৃবৃন্দ এ স্বাধিকারনির্ব্বাচন ক্ষমতার যোগ্য ব্যবহার করিবেন—বর্ম্মার প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ কোথায় নিহিত তাহা তাঁহারা বুঝেন বলিয়াই ভারতের সহিত যোগসূত্র রক্ষায় তাঁহারা কোনদিন উদাসীন হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না।

এদিকে, বর্ম্মার পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আন্দোলনের তলে তলে, আবার এক অগ্নিপ্রবাহের সূচনা হইয়াছে, যাহা আর কোনমতে ধামাচাপা দিয়া রাখা চলিতেছে না। বর্ম্মার সরকারী ইস্তাহারে যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, বর্ম্মার বর্ত্তমান বিদ্রোহ সাময়িক অর্থনৈতিক কারণপ্রসূত বা সামান্য নহে। সমগ্র থারওয়োডী প্রদেশকে কে যেন সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং এমন অদম্য স্বাধীনতা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও সংহতিবদ্ধ

করিয়া তুলিয়াছে যে শত শত প্রাণ বলি পড়িয়াও তাহার দমন এখন পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ হয় নাই। এই আরামপ্রিয়, সুখী অথচ দুর্দ্ধর্ষজাতির প্রাণে কে এই মৃত্যুপণ অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া তুলিল? বুঝি, যুগের হাওয়াই বর্ম্মার গিরিকান্তারে সুপ্তবীর্য্য ও স্বাধীনতাপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহার সঠিক বিবরণ এখন পর্য্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই।

১৮২৬ খৃঃ প্রথম বর্ম্মাযুদ্ধের অবসান হয়। তারপর ১৮৫২ খৃঃ লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়া কয়েকটী ক্ষিপ্র যুদ্ধযাত্রায় প্রোম অধিকার করেন ও পেগু প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ইহাতেই দ্বিতীয় বর্ম্মাযুদ্ধের অন্ত হয়। অন্ততঃ ১৮৮৫ খৃঃ বর্ম্মারাজ থীবো যখন প্রবল স্পর্দ্ধায় ইংরাজের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন পুনরায় যুদ্ধঘোষণা করিয়া থীবোকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মার স্বাধীনতা-যুগেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। বন্দী বর্ম্মারাজ কিছুদিন চন্দননগরে পলাতক ছিলেন, শুনা যায়।

সে যাহা হউক, বর্ম্মা স্বাধীনতা হারাইয়াছে খুব দীর্ঘদিন নহে—মাত্র প্রায় ৪০ বৎসর। তাই বর্ম্মার প্রাণের আগুন বুঝি এখনও নিভে নাই। কিন্তু মুক্তির নূতন পথ যে হিংসাহীন নব সংগ্রামের মধ্য দিয়া মহাত্মাজী আবিষ্কার করিয়াছেন, ভারতের ন্যায় বর্ম্মা সেই পথেই জাতির মুক্তিপ্রেরণা পরিচালনা না করিলে, অনর্থই ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বর্ম্মায় কি এমন কেহ নাই, যিনি এই রক্তাক্ত পথ হইতে সংগ্রামশীল জাতিকে মোড় ফিরাইয়া শান্তিময় পথে ফিরাইয়া আনিতে পারেন?

মাটী-কাটুনীর ছেলে রাষ্ট্রপতি—

মঃ ডুম্যার ফ্রান্সের নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার পিতা একজন খাঁটি শ্রমজীবী —'নাব্বি' (Earth-cutter) অর্থাৎ মাটি কাটাই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। তাঁহার পুত্র সারা ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী—ইহা শ্রম-সাধনার উচ্চ মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের বিরাট্ পরীক্ষাক্ষেত্র আমেরিকাতেও "পর্ণকুটীর হইতে শ্বেতাবাস" (From Log-cabin to White-house),—এইরূপ অতি সামান্য অবস্থা হইতে অসামান্য জীবনের অভ্যুদয়দৃষ্টান্ত পরিলক্ষ্য করিয়াছি।

আভিজাত্য ধনের অথবা রক্তের নহে—আভিজাত্য গুণের। ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। পাশ্চাত্যে যেখানে এই সত্য গুণমহিমা প্রকাশ পায়, সেইখানেই সম্ভ্রমে মস্তক অবনত হয়।

মঃ ডুম্যারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—মঃ ব্রিয়াঁ। ব্রিয়াঁকে ইউরোপে না জানে, এমন কে আছে? ফ্রান্সের স্বনামধন্য পররাষ্ট্রপতি "অখণ্ড ইউরোপীয় মহারাষ্ট্র" (United States of Europe) প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর—এই স্বপ্নকে কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি দীর্ঘজীবন যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার নাম আজ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, এই ব্রিয়াঁকে ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া মঃ ডুম্যারের রাষ্ট্রপতিত্ব লাভ বিস্ময়কর ঘটনা। ফ্রান্স আজ তাহার রাষ্ট্রপরিষদে বিরাট্ ব্যক্তিত্বের চেয়ে এই লোকপ্রিয় 'গণের' মানুষকেই শ্রেষ্ঠ পূজার আসন ছাড়িয়া দিল কেন—তাহার মূলে অন্য রাষ্ট্রনৈতিক কারণ থাকিলেও, গণতন্ত্রের মহিমাই ইহাতে বাহিরের চক্ষে অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।



নব-ফরাসী-রাষ্ট্রপতি—মঃ পলে ডুমার



রুশ ও আমরা—

আমরা পরাধীন—এইজন্যই দুঃখ ; কিন্তু স্বাধীন হইতে হইলে যে প্রাণ উদ্যত করিতে হয়, তাহা কৈ ? রুশের অবস্থা ভারতের চেয়ে অধিক উন্নত ছিল না, বিপ্লবের পর অর্থসঙ্কটের পাষাণ চাপে তাহারা মাথা তুলিবার পথ পায় নাই, ইউরোপের সকল সভ্যজাতিই নবজাগ্রত রুশকে টিপিয়া মারিবার উদ্যোগ করিয়াছিল ; কিন্তু রুশ নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহাদের নূতন ভিত্তির উপর জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে দাঁড়াইয়া উঠিতে হইবে। রুশ বাঁচিতে চায়, তাই তাহাদের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবার নহে। ১৯২৮-২৯ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ভিতর অসাধারণ ব্রত-পালনের ভার লইয়া তাহারা শনৈঃ শনৈঃ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। যে জাতি বাঁচিতে চায়, তাহার পশ্চাতে ভগবানেরই নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ; কাল্পনিক আদর্শ, মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন সেখানে ঠাঁই পায় না। অপরাজেয় জীবনের উপর ভর করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্বতঃই সেখানে মূর্ত্ত হয়। রুশের অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, তারা বুঝি অতি শীঘ্র দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে, তাহাদের দেয় কেহ বারণ করিতেসমর্থ হইবে না, জগৎকে উহা মাথা পাতিয়া বহন করিতে হইবে।

লেনিন বলিয়াছিলেন—"Electrification plus Soviets equals Socialism."

সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত করার জন্য বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা অব্যর্থ হইয়াছে। বিয়াল্লিশটী নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাগার নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে বছরে ৫ মিলিয়ার্ড কিলোর স্থানে ২২ মিলিয়ার্ড কিলো পাওয়ার খরচ হইবে। রুশের বস্তু-উৎপাদিকা শক্তি ইহা দ্বারা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে, মূলধনের উপর দ্বিগুণ লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হইবে। রুশে তাই বিদেশ হইতে ধনাগম আরম্ভ হইয়াছে। রুশ পাঁচ বৎসরে যতখানি হইতে চাহে, ততখানি হইতে না পারিলে তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই ; কাজেই রুশ জাতি তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে - ইহাই তো জীবনের পরিচয় !

রুশজাতির উপস্থিত আয়ের উপর তিন গুণ আয়বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি ব্যতীত রাজ্যপরিচালন ব্যবস্থা হইতে এই অর্থ-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজস্বের শতকরা ৬৩ অংশ ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, ২১ অংশ শিক্ষাদি কার্য্যে ব্যয় হইবে, রাজ্যশাসনব্যবস্থায় ১০ অংশ, বাকী ৬ অংশ অন্যান্য প্রয়োজন বাবদ ব্যয় হইবে! ইহা দ্বারা রুশের

রাজস্বের অনেক অর্থই মূলধন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। একটা জাতিকে বাঁচিতে হইলে, এমন হিসাব করিয়া, এমন জাগ্রত হইয়া রক্তমুখী হইতে হয়। রুশের ভাগ্যলক্ষ্মী আজ প্রসন্ন, এইজন্য রুশের ললাটে সিদ্ধির জয়টীকা জগতের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ভারতও বাঁচিতে চায়, তাহারও দেওয়ার কিছু আছে; কিন্তু এই দেওয়ার তাগিদ দেখাইয়া আমরা ভূয়া হইয়া যাই। আজ বাঁচার মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে হইবে। ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামতি পেটেল বলিতেছেন, ইংরাজের রাষ্ট্রপতিগণ যে ভাবে সুর বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন কথায় ও যুক্তিতে সম্ভব হইবে না। আমরাও তাহাই মনে করি। রুশের মত করিয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের হয় তো চালাইবেন না; কিন্তু তবুও এই অবস্থায় তো আমাদের রক্ষা পাইতে হইবে।

রাজ্যশাসনব্যবস্থায় রুশ শতকরা দশমাংশ ব্যয় করেন—ভারতে ব্রিটীশশাসন প্রবর্ত্তিত থাকিতে ইহা কি সম্ভব হইবে? ব্রিটীশ-ভারতে ১ কোটী ৫৮ লক্ষের উপর টাকা কেবল পুলিশ ও জেল বিভাগে খরচ হয়; ইহার উপর সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজস্ব আদায় বিভাগ, কত বিভাগ আছে! ভারতশাসন বাবদ টাকা এমন মিলে না, যাহা দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হয়; তাহার উপর ভারতের রাজস্ব হইতে দেশে কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে টাকা পাওয়া একেবারেই দুঃস্বপ্ন। তবে ভারতের বাঁচিবার উপায় কি?

আমাদেরও আজ সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে; কয়েকটী পরিবার মণ্ডলীবদ্ধ করিয়া আমাদের সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মিলনই আজ যথেষ্ট ঐক্যবল বৃদ্ধির উপায় নহে, সমস্ত পরিবার মিলিয়া ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনমত ব্যবস্থা মাত্র করিয়া এই যুক্ত সঞ্চয় অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিবে। আমরা যাহা করিতে চাই, অর্থাভাব বশতঃ তাহাতে সফলকাম হই না। দেশের নিকট হইতে আমরা বহুবার অর্থসংগ্রহ করিয়া দেশের কাজে নামিয়াছি; কিন্তু সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হই নাই। যেখানে সাফল্যের স্বর্ণরশ্মি দেখা যায়, পরীক্ষা করিলে জানিতে পারি—সেখানে কর্ম্মীদের দরদেই বিষয়টা সিদ্ধ হইয়াছে। এই দরদের কারণ আর অন্য কিছু নহে, যে অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া হিসাব দিতে হয় না, এবং হিসাব দিলেও ক্ষতির মাত্রা কর্ম্মীকে বহন করিতে হয় না, এই সকল ক্ষেত্র তদ্রূপ নহে; এখানে নিজেদের রক্ত ঢালিয়াই বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহতি নিজেদের কড়ি দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাঁচ সাতটী পরিবার একত্র করিয়া, আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক কষিয়া এমন অর্থ বাহির করিতে হইবে, যাহা দিয়া আমরা জীবনের সমস্ত প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাট বাজার হইতে খরিদ না করিয়া, নিজ নিজ পল্লীক্ষেত্রে তাহা উৎপন্ন করিয়া সমাজে কমলার আসন বিছাইয়া দিতে পারি। ইহার জন্য 'স্কিম' করিবার প্রয়োজন নাই। 'স্কিম' অনেকেই করেন, এবং তাঁহারা উহাতে সিদ্ধহস্ত, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে উহার কিছুই থাকে না; কর্ম্ম-প্রবাহে সত্যাশ্রয়ী ভাসিতে ভাসিতে অভিনব ধারায় কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করেন। স্বাধীনতার দাবী লইয়া একদল মানুষ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অগ্রসর

হইয়াছেন। বাংলার প্রায় পাঁচ কোটী নরনারীর মধ্যে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কিঞ্চিদধিক বার হাজার মানুষ যোগ দিয়াছিল, ইহাতে আমরা গর্ব্ব করি—বাকী লোকেরও তো কাজ আছে, তাহারা করিল কি ?

আমরা এইজন্যই বলিতেছি—জাতির প্রাণে বাঁচার তাগিদ এখনও আসে নাই, তাহা হইলে সর্ব্বত্র আমরা একটা হিসাবের অঙ্ক কষাকষির সাড়া পাইতাম। যাঁহারা আজ আশ্রমজীবনের উপর কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাঁহাদের আজ বলিয়া রাখি—বাংলায় অনেক আশ্রমে জাতি গড়ার যে মন্ত্রধ্বনি উঠিয়াছে, তাহা ঐ বার হাজার কারাবন্দী জীবনের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য না হইলেও, জাতি কোন্ পথে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, তাহার নিঃস্বার্থ প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে। বাহিরের সমাজ-জীবনে যেমন আপনাকে প্রবুদ্ধ করার দিক্‌টা দেখিয়া তবে পা বাড়ান হয়, এই ক্ষেত্রে তাহা নহে। আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়া, সমাজ-জীবনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাহাতে দেশে মুক্তিধারা প্রবাহিত হয়, তাহারই তপস্যা চলিয়াছে। মুক্তি মোক্ষের উদ্দেশ্যে যে সকল আশ্রম সমাজের বুকে স্থান করিতে চায়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া আমরা বাংলায় অন্ততঃ এক হাজার এইরূপ সঙ্ঘ গড়িতে বলি—বিশ পঁচিশটী পরিবার একত্র হইয়া এইগুলি এক একটী অখণ্ড পরিবারস্বরূপ হইবে ; এই ভিন্ন ভিন্ন পরিবারমণ্ডলীর আয়ের দিক্‌টায় শুধু সতর্ক হওয়া নহে, প্রত্যেক নারী পুরুষ পুত্রকন্যাদের সংযত জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া সমাজকে এমন শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে জাতিবোধের অনুভূতি জ্বলন্ত আগুনের মত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইবে—এই সমাজই ভবিষ্যতে জাতিমূর্ত্তি লইয়া অসাধারণ কর্ম্ম সিদ্ধ করিবে। রাজনীতিক ক্ষেত্র শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে, তখন দেশকে বাঁচাইবার জন্য ইহা ব্যতীত অন্য উপায় থাকিবে না। এই সকল সঙ্ঘ অথবা আশ্রম এইজন্যই নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। আমরা দেশের ও জাতির জন্যই তরুণদের বিষয়টা তলাইয়া বুঝিতে বলি।

সংস্কৃত শিক্ষার শীর্ষছেদন—

কালাপাহাড় দেশে অনেক জন্মিয়াছেন—ইহা ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিতে হইবে। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ একদিন বলিয়াছিলেন—ভারতে ইংরাজ-রাজ্য ধ্বংস হইবে ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের লোপ হইবে না, ইহাই “হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড”। কিন্তু দুর্ভাগ্য—আজ হিন্দুসন্তান প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রতি মমতা দেখাইতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা নাকচ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এমনই অসার, যাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করার সুযোগ পাইলে যাঁহারা তৎপর হয়েন, তাঁহাদের আজ এই দিকে দৃষ্টি গিয়াছে—অতঃপর নীরব থাকা শ্রেয়ঃ নহে।

জষ্টিস্ গ্রীভ্ সাহেবের নিকট প্রাথমিক বিজ্ঞানের মত সংস্কৃতশিক্ষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক যাহাতে না থাকে, তাহার এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। কয়েকখানা অতিরিক্ত ভোটের জোরে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু মতানৈক্য প্রবল থাকায় এতদিন ইহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই ; অধিকন্তু মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়া যে ঝড় বহিতেছিল, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবকাশ পান নাই। সম্প্রতি সেনেটে ইহার পূর্ণ সমর্থন করার তাগিদ আসিয়াছে। দেশবাসীর পক্ষ হইতে এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হওয়া

উচিত। এল্‌বার্ট হলে কলিকাতার সেরিফ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে সংস্কৃতের সহিত প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিয়া যাহাতে ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, এইরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। আমরা সভার উদ্যোক্তৃবর্গকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলেজ হইতে সংস্কৃত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই তাহা নহে; পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় যদি ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই আঘাত দেওয়া হইবে।

সংস্কৃতচর্চ্চা কেবল আমাদের অতীতকে স্মরণ করাইয়া দেয় না, জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে; এইজন্যই মহাত্মা বলিয়াছেন—"আমি ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখি নাই, তার জন্য গভীর ভাবেই দুঃখ পাই। আমি আমাদের দেশের প্রত্যেক হিন্দু বালক বালিকাদের ভাল করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হইতে বলি।"

ল্যাটিন সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যকে মৃত-স্তূপে ঠেলিয়া যে সান্ত্বনা, তাহা আত্মহারার পক্ষেই সম্ভব এবং যাঁরা বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যাহা ভাল আছে, তাহার অনুবাদ পড়িলেই যথেষ্ট হইবে, আমরা এই শ্রেণীর অধ্যাপক ও শিক্ষকদের কি বলিয়া তিরস্কার করিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

যে ভাষায় জাতির মর্ম্ম নিঙাড়িয়া উপাসনার বাণী বাহির হইয়াছে, যে শাশ্বত শাস্ত্র ও বেদ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রস ও আনন্দ, যাহার অভাবে আজ কেবল দাসজাতি হইয়া রক্ষা পাই না, আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহার অনুবাদ কেমন করিয়া হয় এবং সে অনু-বাদে মানুষ কেমন করিয়া তৃপ্তি পায়, বুঝি না। সন্দেশের আস্বাদ যাহার নাই, তাহার চিটাগুড়ই যথেষ্ট; কিন্তু যে সকল অভিভাবক এবং দেশনেতৃবৃন্দ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভারতের প্রাণ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাঁহারা আজ নীরব থাকিবেন কেমন করিয়া! আমরা জানি, অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষিত যাঁহারা, তাঁহারা জাতীয় জীবনরক্ষার পথে কি গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত, তাহা বুঝিবেন না; বরং অনাবশ্যক বোধে, মৃত বোধে সংস্কৃত ভাষাকে বিসর্জ্জন দিতেই ব্যস্ত হইবেন। কিন্তু ভারতীয় চরিত্রের মূলস্বরূপ এই সংস্কৃত বিদ্যা—যাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমরা একেবারে আত্মবিস্মৃতির অতলে ডুবিব, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের আজ তো নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। স্বরাজ, স্বাধীনতা পাওয়ায় বিলম্ব হউক, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার এই পুণ্যবেদী আজ যে ভাঙ্গিয়া পড়ে—অচিরে ইহার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

অনেকেই মনে করিতে পারেন—সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ম্যাট্রিক হইতে উঠাইয়া দেওয়ায় ভারতের ধর্ম্ম যদি অধঃপাতে যায়, তবে এই অসার ধর্ম্ম না আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। কথাটা শুনায় বেশ; কিন্তু সংস্কৃতভাষার প্রতি এই অনাদর করার মূলে যে উদ্দেশ্য, যে মনোবৃত্তি, তাহার সহিতই আমাদের সংগ্রাম। প্রবল রাজশক্তি যে বস্তু উপেক্ষা করে, তাহা যদি জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আশ্রয় হয়, তবে তাহার প্রতি ঔদাসীন্য মহাপাপ এবং এই কার্য্যে যাহারা প্রশ্রয়দাতা, তাহাদের আমরা দেশদ্রোহী বলিতেও ক্ষান্ত হইব না।

দেশে শতকরা ৫২ জন মুসলমান; অতএব সংস্কৃতশিক্ষা প্রবর্ত্তিত থাকিলে, সাম্প্রদায়িক

বিরোধ জাগাইয়া রাখারই সুবিধা দেওয়া হয়—এ যুক্তি হিন্দু ভারতের নয়, নষ্টবুদ্ধি মানুষের। আমাদের কাণে আজও শিবের বিষাণ বাজিতেছে, স্বামীজির বাণী—"A nation in India must be a union of those whose heart beat to the same spiritual tune." এই একই সুরের ঝঙ্কার আমরা আমাদের শাস্ত্র সংহিতার ভিতর দিয়াই পাই। সেই সকলের অনুবাদ যতই নিখুঁত হউক, অকৃত্রিম অনুভূতি শুধু মৌলিক বাণীর মর্ম্মবোধ করিয়াই পাইয়া থাকি—শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিবিদ্ মনিষীবর্গ আমাদের কথা বুঝিবেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা মারাত্মক হইবে।

অর্থসঙ্কট—

গোলাজাত ধান, কিন্তু কৃষকের খাজনা দিবার অবস্থা নয়। জমিদার কপালে করাঘাত করিতেছে, মানসম্ভ্রম রক্ষা পায় না। টাকা চাই, মাথা খুঁড়িলে এক পয়সা আজ আদায় হওয়া সম্ভব নয়। ঋণী যে সে মহাজনের সম্মুখে নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া বলে, ঋণশোধের উপায় নাই; টুঁটীতে ছুরি বসাইলেও, এক ফোঁটা রক্ত বাহির হইবে না। চতুর্দ্দিকে হাহাকার!

দেশের সর্ব্বত্র টাকার ভেল্‌কী লাগিয়াছিল—আজ সহসা সে ইন্দ্রজাল শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সহজ অবস্থায় আমাদের দাঁড়াইতে হইলে, যে ধৈর্য্য ও কৌশলের প্রয়োজন তাহা না থাকায়, চতুর্দ্দিকে অশান্তির আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। কৃষক ভিটা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে, জানে না; জমিদার কেমন করিয়া খাজনা আদায় করিবে, খুঁজিয়া পায় না; চিকিৎসকের রোগী জুটে না; আদালতে উকিল, মোক্তার, ব্যবহারজীবী হাই তুলে আর তুড়ি দেয়; কল কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোকে যে হারে পারিশ্রমিক পাইত, তাহা ক্রমেই হ্রাস পায়, তাহারা ধর্ম্মঘট করে। ফলে, ৩১শে মার্চ্চ হইতে এই তিন মাসে চার লক্ষ, আটাশ হাজার, ছয়শত চৌষট্টি দিন বেকার অবস্থায় কাটিয়াছে। দুরবস্থার সীমা দেখা যায় না। চাঞ্চল্যের মাত্রা বাড়িতেছে। অনেকে বলেন, দেশে এখনও যে বিপ্লব দেখা দেয় নাই, ইহা ভারতবাসীর রক্ত দধির ন্যায় শীতল বলিয়া—অন্যদেশ হইলে, সর্ব্বনাশ হইত।

উপায় কি? কয়লার মালিক আশায় বসিয়া আছেন, আবার একটা যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে হয়; ক্ষতির মাত্রা সুদে আসলে পোষাইয়া লইব। ভূমি মালের আড়ৎদার কাঁটা হওয়ার প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে, সস্তায় রাশীকৃত চাউল, দাইল, সরিষা গুদামে জমা করিয়াছে—আবার টাকার আণ্ডিল হইবে। ব্যাঙ্কের আমানত জমার অঙ্ক ক্রমেই কমিয়া আসে; চাকর মুনিবের মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠে, কখন জবাব দেয়! বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে, পেটে দুটী অন্ন জুটিলে তাহারা কৃতার্থ হয়। ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সকলের মুখেই ঐ এক কথা—উপায় কি? আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

অবস্থা আর পূর্ব্বের ন্যায় ফিরিয়া আসিবে না, ধান চাউল দুনো দরে আর বিকাইবে না, লোহার বাজার আর উঠিবে না, চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না, জমিদারের খাজনা ষোলআনা আদায় হইবে না, নালিশ মকদ্দমায় প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করা আর সম্ভব হইবে না—আমাদের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে হইবে; আর মোহে, সম্মোহনের কুহকে মজিলে চলিবে না।

কৃষকের নিকট হইতে কাঁচা মাল আদায় লইয়া তাহাকে রেহাই দিতে হইবে—বিনিময় প্রথাই

পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আমাদের অভাব কিসের! অর্থের চলাচল করিতে গিয়া আমরাই লক্ষ্মীছাড়া হইলাম, কাঞ্চন মূল্যে কাচ খরিদ করিলাম—আজ হইতে আমাদের চিরদিনের মত সাবধান হইতে হইবে।

আশায় আর কেহ বসিয়া থাকিও না। প্রতি গৃহস্থের খোরাক সঞ্চয়ের জন্য জমি সংগ্রহ কর। পারিশ্রমিক দিয়া শস্য গোলাজাত করার দুরাশা রাখিও না, নিজেদের শ্রমে মাটী খুঁড়িয়া সম্পদ্ বৃদ্ধি কর। ফাঁকি দিয়া কেহ চিরদিন বড় হইয়া থাকে না। আজ শ্রমিক ও মহাজনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহা কোন মানুষ বা দল বিশেষের কলকাটি নয়; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে সত্য তাহাই রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছে। ভগবানের তুল্য অধিকার—শিক্ষার অভাবে, ব্যবহারদোষে একজন নত, অন্যজন উন্নত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল; ক্রমে সকলেই চক্ষুষ্মান্ হইতেছে। অধিকারবাদ যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যরক্ষায় আর টিকে না, সেইরূপ ধনী গরীব অদৃষ্টবশতঃ বলিয়া মানুষ আর সান্ত্বনা চাহে না। সে চক্ষের সম্মুখে প্রমাণ করাইয়া দেয়—ইহা নিছক জুয়াচুরি; এ পৃথিবীর উপর মানুষের যে তুল্য অধিকার তাহা আর নাকচ করা যায় না। এই অন্তর্বিপ্লব ঘটনা ওলট-পালট করিয়া আর নিবারণ করা সম্ভব হইবে না; মানুষের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। সহজে না হইলে ক্রমে জোর প্রকাশ পাইবে, মানুষের প্রতিকূল চেষ্টা রক্তবিপ্লব সৃজন করিবে। এইজন্যই বিলাতের স্বার্থপর রাষ্ট্রনেতৃদের মতবাদের বিরুদ্ধে সে দিন ভারতসচিব মিঃ বেন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন —ভারতের আরউইন-গান্ধীর মধ্যে যে সর্ত্ত, তাহা বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাকল্পে নয়...... to restore good-will in India—ইংলণ্ডের সেফ্‌গার্ড রক্ষা করার জন্য নয়.... the safe-guards would be formulated in Indian interests। শাণিত তরবারির সাহায্যে রাজ্যশাসন-নীতি তাই উল্টাইয়া যায়। লর্ড আরউইন এইজন্যই বিলাতে গিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, কঠোর শাসনে কোন জাতিকে অধীন করিয়া রাখা সম্ভব নহে; "willing and contented India"কে ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত রাখার উপায়—উভয়কে সমান ভাবে চুক্তিবদ্ধ করা। এইরূপ মনোভাবের কারণ আর অন্য কিছু নয়, মহাকাল আজ যে বার্ত্তা আনিয়াছে, তাহা দম্ভবশে অস্বীকার করিলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সে সম্রাট্ হইতে রাজা, জমিদার, মহাজন, আড়ৎদার, অফিসের বড় সাহেব পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিয়া মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে বাধ্য। এই মর্য্যাদার উপরই বিশ্বমানবজাতি নূতন ভঙ্গীতে জীবন যাত্রা সুরু করিতে চায়। এইজন্য আজিকার অর্থবিপ্লবকে আমরা সাময়িক বলিয়া উপেক্ষা করিলে ভুল করিব। শ্রমের মূল্য দিতে গিয়া দেখিব—শ্রমিক হওয়াই শ্রেয়ঃ। আজ অতীত ভারতের আদর্শই আরও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হয়। রাজর্ষি জনকের হল চালনা আজ মনে হয় সখের বিষয় ছিল না; শ্রম ছিল আমাদের সম্পদ্। শ্রমের বোঝা একদল মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া অন্যদল যে স্বপ্ন-জগতে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটিবে, এ ফাঁকির দিন শেষ হইয়াছে। আমাদের এই দিক্ দিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

শ্রমকাতর জাতি—

আমাদের দেশে পেটের খোরাক ভিক্ষায় সংগ্রহ করার একটা রীতি আছে। দাতার পরলোকে বিশ্বাস যতদিন, ততদিন ইহা ধর্ম্মনীতিরূপে প্রবর্ত্তিত

থাকিবে, কেন না দানের কড়ি গুণান্বিত হইয়া পরজন্মে দাতাকে অধিক সমৃদ্ধশালী করিবে। করুণার দায়েও আমরা বেকার জীবনের প্রশ্রয় দিই; কিন্তু একটা সবল সুস্থ মানুষ তার নিজের পেটের জ্বালা দূর করার শক্তি যদি না রাখে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার মুছিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এইজন্য অনেক স্থানে অন্নদানের ব্যবস্থার উপর মহাত্মা কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তিনি বলেন—"Every one can work, for meal......it is a sin to give a free meal to one who is fit to do any remunerative work at all".—দেশে মানুষ গড়িতে হইলে, এই দিকে আমাদের কার্পণ্য শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

ধর্ম্মান্ধতা—

মহম্মদ হজরতের ছবি সহ 'প্রাচীন কাহিনী' মুদ্রিত করায়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা সেন ব্রাদার্সের সত্বাধিকারী ভোলানাথ সেন তাঁহার দুইজন সহকারীর সহিত বীভৎসরূপে ইসলাম ধর্ম্মীর নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াছেন। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ বলেন—ইস্‌লামবিশ্বাসীর প্রাণে আঘাত দিলে তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, ফলে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়; অতএব এইদিকে সতর্ক হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমরা জানি, ব্রিটিশ মিউজিয়মে মহম্মদের ছবি রক্ষিত হইয়াছে, এমন কি ওয়েল্‌স সাহেব কেবল এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন—ইহাতে বিশ্বাসীর প্রাণে আঘাত দেওয়ার কি আছে! হিন্দুর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনযাত্রার আলোচনা অন্যান্য ধর্ম্মী ব্যতীত হিন্দুজাতি নিজেরাই বহু প্রকারে করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর প্রতি হিন্দু-ধর্ম্মীর শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই।

আর একটা ভাবিবার কথা—বাংলায় একখানা স্কুলপাঠ্যের সংবাদ পাইয়া পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে দুইজন মুসলমান বিশ্বাসী আসিয়া পুস্তক প্রকাশককে হত্যা করিল—ইহার মূলে কি কোন রহস্য নাই! রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের মূল অন্বেষণে পুলিশ যেরূপ প্রযত্ন করেন, এই ক্ষেত্রে তাহার ত্রুটি হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। হত্যাকারীরা বিচারাধীন—এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অধিক কথা সমীচিন নহে। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। ধর্ম্মের নামে নরহত্যা যদি বিংশ শতাব্দীর রীতি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রাণতায় আমাদের আত্মার উন্নতি হইল কোথায়? হিন্দু জাতি ইহা চক্ষের জলে সহিয়া লইবে, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠুক। মহম্মদ হজরতের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা তাঁহার ছবি প্রকাশ করায় হ্রাস পাইবার নহে। পীরের দরগায় যে জাতি সিন্নী দিতে ছুটে, সে জাতি মহম্মদের চরণে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণতি জ্ঞাপন করিবে; কিন্তু এই হিংসাবৃত্তির রুদ্র কদাকার প্রকৃতিকে তাহারা চিরদিনই অন্ধতা বলিয়া উপেক্ষা করিবে।

বড়লাটপত্নীর খাদি-প্রীতি—

সিমলা শৈলে মহাত্মা বড়লাট বাহাদুরের সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইয়াছেন। বড়লাটপত্নীর নিমন্ত্রণে শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী লাটভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন; আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নাই। মহাত্মার প্রতি লেডি উইলিংডনের শ্রদ্ধা ও সম্মান কতখানি, তাহা তাঁর কথাপ্রসঙ্গেই প্রকাশ পাইয়াছে। মহাত্মার উপর কত বড় কার্য্যভার, অতএব তাঁহার জীবনরক্ষার দিকে খুব নজর রাখিয়া, মহাত্মা

যাহাতে অধিক ভোজন করেন তাহার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি কস্তুরীবাঈ গান্ধীর



শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী

নিকট হইতে ভাল খাদি চাহিয়াছেন; বড়লাট-পত্নীর খাদি-প্রীতির পরিচয় এই প্রথম।



লেডি উইলিংডন

সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া শৈলাবাসের ব্যবস্থা ভাল নহে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবাসীর সহিত অবাধ মিলনের সুবিধা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। আমরা বড়লাটপত্নীর গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, রাজপুরুষগণ ক্রমে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে জনসাধারণের সহিত মিলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহা যুগের ডাক ছাড়া আর কিছু নয়। যুগপুরুষ মহাত্মা যে শৃঙ্গে ফুৎকার দিয়াছেন, তাহা ভাবজগতে মহাকুরুক্ষেত্র সৃজন করিয়াছে; তাঁর বিলাতগমনের ভিতর বিধাতার কি সঙ্কেত আছে, তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

মহাত্মার বিলাত গমন—

ীর চুক্তি বর্ণে বর্ণে সার্থক করা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দূর হওয়া, এই দুইটী সঙ্কল্প সিদ্ধ না হইলে মহাত্মা গোল টেবিলের বৈঠকে যোগ দিবেন না, এইরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শিমলা শৈলে বড়লাট বাহাদুরের সহিত বাক্যালাপের পর তিনি প্রথমটীর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন, কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট দিল্লীর চুক্তি পালনে উদাসীন দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের সহিত আলাপ করিয়া মহাত্মা একপ্রকার বিরক্ত হইয়াই বারদৌলীতে প্রস্থান করেন; কিন্তু তবুও তিনি বলেন—দিল্লীর চুক্তি যখন করাচি কংগ্রেসে পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য তিনি মৃত্যুপণ করিবেন এবং এইজন্যই জুন মাসে ফেডারল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

দিল্লীর চুক্তিপালনে মহাত্মার ন্যায় প্রয়াস যদি রাজকর্ত্তৃপক্ষ করিতেন, তাহা হইলে আজও যে বিরুদ্ধ ভাবের আগুন ধিকি ধিকি

জলিতেছে তাহা হয় তো নিভিত। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধসূত্র দৃঢ় হইত। কিন্তু সকলেই লর্ড আরউইন নহেন; এইজন্য এইদিক্ দিয়াও মহাত্মার ধৈর্য্য অসাধারণ। তিনি বলেন —জেনোয়ায় শান্তি-পত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ পক্ষ স্বাক্ষর করিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া কালসাপেক্ষ; চুক্তিকে সার্থক করার ভার দেশের উপর যতখানি, ততখানি তিনি অন্য পক্ষের আচরণ উপেক্ষা করিয়াও শেষ করিবেন।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্যের সূত্র তিনি এখনও খুঁজিয়া পান নাই। ভূপালের নবাব বাহাদুরের সাধু প্রচেষ্টায় তিনি আস্থাবান্। যদিও ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ না হয়, কংগ্রেসের হইয়া তিনি যে গুরুকার্য্যভার মাথায় লইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বহিতেই হইবে; এইহেতু তিনি লণ্ডনে অভিযান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জগতে এই ঘটনা যুগান্তর সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মহাত্মার দিকে সমগ্র জগৎ বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া আছে—ইহা কি ভারতের অধ্যাত্মশক্তির জয় নহে?

কংগ্রেসে দলাদলি—

বিষয়টী নূতন নহে। সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে দলাদলি থাকিতে পারে, আর রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহা থাকিবে না—এমন অসম্ভব কথা আমরা ভাবিতে পারি না। যদি ঐক্য আমাদের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে উহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার কারণ ছিল; কিন্তু ঐক্য আমাদের লক্ষ্য নয়, মত ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য লইয়াই আমাদের গতি। এই মত ও অনুভূতির অন্তর্গত যতগুলি মানুষ তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, অথবা কোন শক্তিশালী পুরুষের গুণে বা প্রভাবে পড়িয়া বহুলোকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে। ঐক্যের জন্য স্ব-মত পরিত্যাগ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার উপর আছে—ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ। এই অবস্থায় ঐক্যের কথা কার্য্যসিদ্ধির জন্যই বলিতে হয়; পরন্তু ইহা আমাদের অন্তরের কথা নহে।

কোন মানুষ যদি স্বীয় মতের অনুগত করিয়া এমন একটা প্রবল সমষ্টি গড়িতে পারে, যাহা দ্বারা সমস্ত প্রতিকূল শক্তি পর্য্যুদস্ত হয়, সেখানে মিলন বা ঐক্যের কোন কথা নাই; কিন্তু তাহা যদি কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী না হয়, তাহা হইলেই আর দশজনের সহিত মিলিয়া কার্য্য করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বাংলার কংগ্রেসে এমনই একদল মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাত্মার আদর্শের বাহিরে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসে স্থান হওয়া এখন অসম্ভব; কেন না, দেশের অধিকংশ কংগ্রেস-পন্থী এক্ষণে মহাত্মার অনুসরণে উদ্যত, অতএব কংগ্রেসের আদর্শ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে অল্পশক্তিশালী দল বা দলপতি বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে আর একদল লোক আছেন, যাঁহারা কতকটা মহাত্মার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায়, আর কতকটা মহাত্মার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া রাষ্ট্র-সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন; মহাত্মার প্রভাব যদি অকস্মাৎ লোপ পায়, তবে এই দলের মধ্যেও ভেদ দেখা দিবে। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' বলিয়া এক শ্রেণীর মানুষ পুনঃ যে লক্ষ্য ও আদর্শ লোকগ্রাহ্য হইবে, তাহারই অনুসরণ করিবে, অন্য পক্ষ মহাত্মার আদর্শ পরিত্যাগ করিবে না; রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্থান না হইলেও, ইহারা School of thought লইয়া বাঁচিয়া থাকার প্রয়াস করিবে। এই সকল ভবিষ্যতের কথা। উপস্থিত দলাদলির অন্যান্য কারণ যাহাই থাকুক, ফলে উহাই দাঁড়াইয়াছে।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের মাথায় যেদিন তিন দফা রাজমুকুট পরাইয়া তাঁহাকে দেশবন্ধুর পর বাংলার এক এবং অদ্বিতীয় নেতা বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাঁহার উপর আজিকার মত সেদিনও কেহ কথা না কহিলেও, ভিতরে ভিতরে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রতি এইদিন হইতেই বিদ্বেষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠে। কর্পোরেশন ব্যাপার লইয়া এই রহস্য ক্রমে পরিস্ফুট আকারে বাহির হওয়ায়, এই বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ করিয়াছে। তারপর আধুনিক সংবাদপত্রের স্বভাবই হইতেছে, স্বদলের ঢাক পিটা; এই দুঃখে দেশবন্ধুও যেমন "ফরওয়ার্ড" বাহির করিতে বাধ্য হন, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তও তদ্রূপ "এড্ভান্স" বাহির করেন— বিবাদের সুরে দেশ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় করাচীর কংগ্রেসে সুভাষবাবু নাকি বাংলায় কংগ্রেস-নির্ব্বাচন নিরপেক্ষভাবে করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু চারি আনা চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সদস্য হইলেই তাহার ভোটাধিকার হয়, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ধুম পড়িয়া যায়। সুভাষবাবুর নেতৃত্বে বর্ত্তমান কংগ্রেসের পরিচালকবৃন্দ তিন লক্ষ ৮০ হাজার সদস্যসংগ্রহের জন্য রসিদ ছাপাইয়াছেন; এই রসিদ বিলি লইয়া প্রথমেই গণ্ডগোল বাধে, কিন্তু নিখিল কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার পেটেল সে বিবাদ অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফলে দেখা যায়, বর্ত্তমান কংগ্রেসের পরিচালকগণের বিরুদ্ধপক্ষ যাহাতে সদস্য হইতে না পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই সাধারণতঃ নির্ব্বাচনাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন, বর্ত্তমানে তাহার অন্যথা হইয়াছে। শুনা যায়, সুভাষবাবু নিজের দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীতে নির্ব্বাচনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন; ইহার উপর নির্ব্বাচন সম্পর্কে গোলমাল ঘটিলে, তাহা মিটাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতেই নির্ব্বাচনসমিতি গঠিত হয়; কিন্তু এবার যাঁহারা এই সমিতির সদস্য, তাঁরা নাকি সকলেই শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধ পক্ষ। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা নহে, পরন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যে পাপ ও অন্যায় আশ্রয় করিয়াছে, তাহা নিরসন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং নিজ পক্ষকে দেশের পুরোভাগে স্থাপন করার লক্ষ্যও ইহার মধ্যে আছে। দেশের কাজে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁদের পক্ষে ইহা অশোভন নহে; বরং ইহাতে ঔদাসীন্য দেশপ্রীতির পরিচয় নহে। আমরা এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অন্যায় কিছু দেখি নাই।

৩২টী জিলা কংগ্রেসের ২৬টী নাকি সুভাষবাবুর পক্ষে, ইহার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত দেখাইতেছেন—না ইহা নির্জ্জলা মিথ্যা; নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলার সর্ব্বত্রই শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের জয় হইবে। বস্তুটার আপোষে আর নিষ্পত্তি হওয়ার নহে; মহাত্মার নিকট বাংলার উভয় নেতাই তার করিয়া অবস্থা জানাইয়াছেন। তিনি সালিসীতে ইহা মিটাইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সুভাষবাবু নির্ব্বাচন বন্ধ রাখিবেন না। তাঁহার ইচ্ছা—নির্ব্বাচনে জয় হইলে সকলেই বুঝিবে, দেশ কোন্ পক্ষে। কিন্তু কথা হইতেছে—নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন না করিয়া পরাধীন জাতির এই যে জয়, ইহা তো কংগ্রেসের মধ্যেই ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি করিবে। গভর্ণমেণ্ট লোকমত উপেক্ষা করিয়া কিছু করিলে চতুর্দ্দিকে

যে কোলাহল উঠে, তাহাই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; শাসনশক্তিহীন দেশীয় দল যে ইহাতে অভাবনীয় রূপে বিপন্ন হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই চাই আপোষ ও ভিতরে যত বিরুদ্ধ ভাবই থাক, তাহা চাপিয়া মিলন নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন-যুদ্ধে উভয় পক্ষের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ করা। সুভাষবাবু ইহাতে অসম্মত হইবেন কেন, বুঝি না। সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত পি. সি, রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সালিসীতে এই বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করা। আমরা বাংলার ঘটনা অন্য প্রদেশে টানিয়া নিজেদের নত মস্তকে দাঁড়ান অপেক্ষা, ইহা খুব সমীচিন বলিয়া মনে করি।

নির্ব্বাচন একটু পিছাইয়া দেওয়ায় আপত্তি নাই। কংগ্রেস-সভ্য হওয়ায় পথ অবাধ করিয়া দেওয়া হোক, ৩২টী জিলা কমিটিতে দেশে ৩২ জন নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনাধ্যক্ষ নিয়োজিত করা অসম্ভব হইবে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটী হইতে যে নির্ব্বাচনসমিতি গড়া হয়, তাহা নিরপেক্ষ কয়েকজন মানুষ লইয়া গঠিত করা হউক। নির্ব্বাচনসংগ্রামে উভয় পক্ষ সমান ভাবেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করুন, দেশ কোন্ পক্ষে—এই জয়ই শ্রেয়ঃ। ফরাসী-ভারতে নির্ব্বাচন-যুদ্ধে যে কদর্য্য নীতি আশ্রয় করা হয়, জাতীয় দলের মধ্যে সেই কূট-নীতির আশ্রয় দেশভক্ত যদি নেতৃত্বের দায়ে দিতে প্রস্তুত হন, তবে আমাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ আসিবে না। আমরা সুভাষবাবুর অন্তরের পরিচয় জানি; তিনি ভূয়ো নেতৃত্বের দাবী লইয়া দেশের পায়ে যে কুড়ুল মারিবেন না—ইহা বিশ্বাস করি। সরল, স্বচ্ছস্বভাব শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তও রণক্ষান্ত হইয়া সালিসী দ্বারা এইভাবে যদি নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বাংলার দলাদলির কলঙ্ক মাখিয়া বিমল চন্দ্রোদয় হইবে। বাঙ্গালী জাতিকে ছানিয়া যে দল গড়িয়া উঠিবে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে অভিনব এবং বাংলায় জাতিগঠন-যজ্ঞে এই উদীয়মান রাষ্ট্র-সঙ্ঘই ভবিষ্য ভারতের নিয়ামক হইবে।

আমরা এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, নিখিল কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি হইতে বাংলার দলাদলির নিষ্পত্তির জন্য মিঃ আনে একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনও বন্ধ থাকিবে না।

'তুমি নাই আমি আছি'

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী]

তুমি নাই, আমি আছি কেমন করিয়া বাঁচি,
পরম বিস্ময়,
আমার মরম তলে, যে দীপ জ্বলে নি বলে,
ছিল বড় ভয়;

আজ দেখি তারি শিখা অমর আরত লিখা
জীবনবারতা
পলে অনুপলে মোরে নিয়ে চলে সাথী ক'রে
চির অনুরতা ॥

তোমার চরণ ভিন্ন নাই আর কোন চিহ্ন
আঁখির সম্মুখে,
মনে নাই আন কথা মিলনের ব্যাকুলতা
চোখে আর বুকে!

* *



ভারতের রাষ্ট্রভাষা

(২)

[শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার]

প্রথম প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও কয়েকটী কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। সর্ব্বপ্রথমেই আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, রাষ্ট্রভাষা বলিলে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝিয়া থাকি। এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নাই, যে ভবিষ্যতে ভারতের প্রত্যেক আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রদেশই নিজ প্রদেশের মাতৃভাষাকে স্বকীয় অধিকার মধ্যে রাষ্ট্রভাষার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও ইতিপূর্ব্বে এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে কাহারও বলিবার কিছুই থাকিবে না। অতএব ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিলে সর্ব্বভারতীয় বা আন্তঃপ্রাদেশিক কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী একটী সাধারণ ভাষাকেই বুঝাইবে। এরূপ ভাষার প্রয়োজন সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষৎ, ভারত সরকারের দপ্তরখানা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক কার্য্যে মাত্র হইবে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, যে জনসাধারণের পক্ষে এরূপ ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন খুব কমই হইবে। যাঁহারা সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ বা ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় কার্য্য করিবেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দেশের উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিই হইবেন; অন্ততঃ ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ যে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণই হইবেন, এ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে। নেতৃত্বের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া যাঁহারা এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ভারতের হৃদয়মণি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা কি তাঁহারা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন না? সংস্কৃতভাষার সঙ্গে আমাদের জাতীয়জীবনের সম্বন্ধ যে কতখানি, তাহাও কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? একজন অহিন্দুর কথাই এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মির্জ্জা মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত অভিভাষণে বলিয়াছেন:—

"And I cannot but think that it is something of the genius of the Sanskrit language that has entered into and carried on the Hindu nation as a living entity, while great empires have risen and fallen." * * *

"We should in view of its living value to the whole Indian nation, make the teaching of it nationwide. Its scientific aspects will naturally remain an interest of the intellectual minority and these must be encouraged and helped. *But as a spoken language in a simplified and popular form, it should pass beyond any particular caste or group, and become popular in the widest sense of the term.* Speaking though not as a Hindu, at least as a well-wisher of the Hindus, I would appeal to all my Hindu brethren to encourage Sanskrit learning. They would thereby be discharging a sacred duty to their civilization and culture. The more people speak it, the greater will be its power and influence. It is a priceless heritage. Let all share in it."

যে ভাষার সঙ্গে আমাদের জাতীয়জীবনের উত্থানপতন এমন অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, যাহা শিক্ষা করা ভারতবাসী মাত্রেরই পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত—তাহা শিক্ষা করিতে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ পরাঙ্মুখ হইবেন কেন? আর যদি তাঁহারা উহা শিক্ষা করিলেন, তবে উহাকেই সর্ব্বভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে? মির্জ্জা ইস্মাইল সাহেব বলেন, যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটী সরল সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে সমাধান করা হইতেছে না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে তাঁহার এই দূরদর্শিতার ভূয়ো ভূয়োঃ প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। যে ভাষার মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া ভারতীয় জাতি ধরাপৃষ্ঠে অমর হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে উত্তমরূপে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তবে রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে জনসাধারণের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যেক প্রদেশে সেই প্রদেশের মাতৃভাষাই সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। আর ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের জনসাধারণের সঙ্গে ভাববিনিময় করিবার আবশ্যকতা এক নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া অন্য অতি অল্প লোকেরই হইবে। যাঁহারা নেতৃত্বের এই গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষাগুলি যে তাঁহাদের শিক্ষা করা একান্তই কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নেতৃগণ অজ্ঞ জনসাধারণকে তাঁহাদের ভাষা শিক্ষা করিতে না বলিয়া যদি নিজেরাই জনসাধারণের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে তাহাই অধিক শোভন হয় না কি? একথা অবশ্য বলা বাহুল্য, যে জনসাধারণকে তাহাদের মাতৃভাষা এবং সমর্থ হইলে নৈতিক ও ধার্ম্মিক শিক্ষার জন্য দেবভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। এই দুইটী ভাষা শিক্ষার পর তৃতীয় কোন ভাষা শিক্ষা করা যে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? সুতরাং অহিন্দী ভাষাভাষীদের পক্ষে সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করায় অসুবিধা এতই বেশী যে, তাহাতে জাতীয় জীবনের বিকাশলাভ আদৌ সম্ভবপর নহে; সর্ব্বভারতের

কল্যাণের দিক্ দিয়া দেখিলেও উক্ত ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার দাবীই রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে স্বীকৃত হইতে পারে না। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিলে উক্তভাষাভাষী প্রায় দশ কোটী লোকের সুবিধা হয় বটে; কিন্তু এই দশকোটী লোকের সুবিধার জন্য অবশিষ্ট বিশ কোটীর স্বার্থ কেন পদদলিত করা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব যে স্বার্থপ্রণোদিত, ইহা নিশ্চয়ই কেহ বলিতে পারিবেন না; কেন না সংস্কৃতই ভারতের জাতীয় ভাষা, এবং ভারতবাসী মাত্রেই ইহাকে আপনার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন—আর ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের ভাষাতেই সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং একমাত্র সংস্কৃতভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষাই যে সর্ব্বভারতের নিজস্বতার দাবী করিতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহ।

নেপাল ও ভূটান ব্রিটিশশাসিত না হইলেও ভারতের অঙ্গ—ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই নেপাল ও ভূটানের সঙ্গে যদি আমরা এক হইতে চাহি, তবে তাহা কি সংস্কৃতের দ্বারাই সহজ হইবে না? আজিকার শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা বিরাট্ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবার আশা রাখে, তবে সর্ব্বস্বহারা আমাদের মিলনের শেষ সূত্র সংস্কৃতকে হারাইলে আর কি অবশিষ্ট থাকিবে? আমাদের সবই তো গিয়াছে; একমাত্র অতীত গৌরবের জলন্ত কাহিনী বক্ষে ধরিয়া সংস্কৃতভাষা হেয় ও অবজ্ঞাতভাবে কোনরূপে তাহার প্রাণের ধুক্ধুকিটুকু অতিকষ্টে রক্ষা করিতেছে। আমাদের অবিবেচনার ফলে যদি এই ধুক্ধুকিটুকুও থামিয়া যায়, তবে ভারতের কালজয়ী সভ্যতাও যে সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, তাহা আমরা অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের বিদেশী প্রভুদের অঙ্গুলীহেলনে সংস্কৃতের যথেষ্ট অনাদর করিয়াছি, কিন্তু এখনও উহার যেটুকু আছে, তাহারই জন্য আমরা জগতের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেছি। বীর বিবেকানন্দকে প্রতীচী জয়ের জন্য বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, ইহা যেন কেহ ভুলিয়া না যান। ভবিষ্যতেও আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে হইলে সংস্কৃতের সাহায্যই লইতে হইবে। সুতরাং জাতিহিসাবে বাঁচিতে ও আমাদের সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। এই বাঁচাইয়া রাখিবারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, উহাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠা।

ভারতে প্রলিটেরিয়েট বা শূদ্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা বলি—সংস্কৃতের প্রসারে শূদ্রতন্ত্রের ক্ষতি হইবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা যেন তাঁহারা মনে স্থান না দেন। ভারতের ঋষি ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সকলেরই তৃপ্তি চাহিয়াছিলেন; তাঁহাদেরই সৃষ্ট সংস্কৃতভাষা শূদ্রতন্ত্রকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণতন্ত্রে পরিণত করিবে—এই আশা যদি সফল নাও হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ক্ষতি যে করিবে না, ইহা নিঃসন্দেহরূপেই বলা যায়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে যাঁহারা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষার আসন প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা কি ভ্রান্ত? এ কথার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতানিবন্ধন উহার বিরাট্ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অবশ্য এজন্য ইঁহাদের খুব দোষ দেওয়া চলে না, তাহা আমরা অস্বীকার করি

না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। কূট রাজনীতিজ্ঞ মেকলে সাহেব আমাদের সভ্যতা ও সাধনার ধ্বংস করিবার জন্যই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা শেক্সপীয়র, বাইরণ, টেনিসন, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, স্কট্ পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছি—আমাদের সেকালের পচা সংস্কৃতভাষা আর কে পড়ে? কিন্তু চিত্রের অন্যদিকে চাহিয়া দেখুন—অধ্যাপক মোক্ষমুলার ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতেছেন; সংস্কৃতভাষার বিরাট্ মহিমায় তিনি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে 'among the most astonishing productions in any age and country' বলিতেছেন; আর্থার এভেলিয়ন তন্ত্রের মন্ত্রশক্তির গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইতেছেন। যাহা হউক, গত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া আর লাভ নাই। শুধু আমরা ইহাই বলিতে চাহি, যে মির্জ্জা ইস্মাইল সাহেবের কথিত "Evolution of a simplified Sanskrit for the man in the street."—অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের জন্য বিবর্ত্তনের সাহায্যে একটী সরল সংস্কৃতভাষা গড়িয়া উঠা আদৌ অসম্ভব নহে। ইহার জন্য চাই—শুধু কুসংস্কার বর্জ্জন করিবার মত যথেষ্ট মনের বল। আমি ইংরেজী-শিক্ষিত মার্জ্জিত-রুচি নবালোকপ্রাপ্ত বিংশ শতাব্দীর বাবু, আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃত শিখিবার ও বলিবার হীনতা কেমন করিয়া স্বীকার করিব—এই প্রকার মনোবৃত্তি দূর করিতে পারিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, সর্ব্বসাধারণের কথোপকথনোপযোগী সরল সংস্কৃত অতি সহজে গড়িয়া উঠা আদৌ অসম্ভব নহে। সত্য বটে, এরূপ ব্যাপার রাতারাতি ঘটিয়া উঠিবে না (রাতারাতি ঘটিয়া উঠিলে তাহা জলবুদ্বুদে মতই অস্থায়ী হয়, ইহাও যেন আমাদের মনে থাকে); তবে হিন্দুস্থানীও যে রাতারাতি ইংরেজীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহাও নিঃসন্দেহ। আর হিন্দুস্থানী নাম দিলেও হিন্দী ও উর্দ্দুর একতা সম্পাদন সহজ ব্যাপার নহে। এই উভয় ভাষার প্রভেদ দূর করিয়া উহার সামঞ্জস্যসাধন কিরূপ কঠিন কাজ, তাহা যাঁহারা উর্দ্দু সংবাদপত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। আর যদিও বা এরূপ একটা সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও নাগরী ও আরবী লিপির সামঞ্জস্য কে করিবে? আর সামঞ্জস্য সাধন না করিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন নহে। একই অফিসের কেরাণী কেহ নাগরী ও কেহ আরবী অক্ষরে লিখিতেছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ব্যাপার যে অতি বীভৎস হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং রাতারাতি একটা কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়া ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে ভবিষ্য-কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়টার মীমাংসা করাই শোভন ও সঙ্গত।

পরিশেষে, একটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের শেষ করিব। যে দশকোটী লোককে হিন্দী-ভাষাভাষী বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি, পাঞ্জাব-বাসিগণকেও তাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মাতৃভাষা—অন্ততঃ পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখের মাতৃভাষা যে পাঞ্জাবী হিন্দী বা উর্দ্দু নহে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ইহাদিগকে উর্দ্দু শিখিতে বাধ্য না করিয়া যদি পাঞ্জাবীতেই ইহাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে প্রতিভাবিকাশের সুবিধার দরুণ জীবন-সংগ্রামে যেমন ইহারা অধিকতর অগ্রসর হইতে পারেন, সংস্কৃত শিখিয়া জাতির শিক্ষাদীক্ষাও ভাবধারার সহিত পরিচয়লাভ করাও তেমনি ইহাদের পক্ষে সহজ হয়। মোটের উপর আমরা ইহাই বলিতে পারি, যে অহিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা হিন্দী ভাষাভাষী অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং তাঁহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া গায়ের জোরে সকলের উপর হিন্দুস্থানী ভাষা চালান কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।



সঙ্কলন ও সমালোচনা

সঙ্কলন

—:০:—

চীনের সুতা—

"রাষ্ট্র-বাণী" সংবাদ দিতেছেন :—

"চীন দেশ হইতে সুতা কলিকাতার বাজারে খুব বেশী রকম আসিতেছে। গত কয়েক বৎসরের সুতার আমদানী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে ১৯১৪ সালে ভারতে যত সুতা আমদানী হইত, তাহার চৌদ্দ আনা বিলাত হইতে আসিত। তার পর, জাপানী সুতা আসিতে আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সালে বিলাতী সুতা আসে ছয় আনা, জাপানী আসে নয় আনা ও সেই বৎসরেই চীনের সুতা ভারতবর্ষের বাজারে দেখা দেয়। গত ৩ বৎসরের মধ্যে চীন আসিয়া জাপানের সুতায় বাজার অর্দ্ধেক করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে বিলাতী সুতা আসে সাত আনা, জাপানী চারি আনা, চীনা চারি আনা।

সুতা আমদানীর শতকরা হার

দেশের	১৯১৩	১৯২২	১৯২৭	১৯৩০
বৃটিশ	৮৩	৭০	৩১	৪৬
জাপানী	২	২৬	৫৪	২৫
চীনা	০	০	২	২৪

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে চীনই ছিল ভারতের কোটী কোটী টাকার বস্ত্র ও সুতার খরিদ্দার। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চীনে ভারতীয় সুতা ও বস্ত্র যাওয়া তো বন্ধ হইয়াছেই, পক্ষান্তরে চীনই ভারতবর্ষে সুতা পাঠাইতেছে। তাই বিচক্ষণ সুধীবর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় উপরোক্ত তথ্যগুলির উপর বিচারদৃষ্টি দিয়া সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"চীন ভারতবর্ষে সুতার বাজার করিয়া লইল —জাপান, বিলাতী ও দেশী মিলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও চীন এই কার্য্য করিয়া লইল। ইহাতে চীনের জয় নাই, কলের ও মানুষের হৃদয়হীনতার জয় রহিয়াছে।"

বিষয়টী অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। সুদূরদর্শী মহাত্মা গান্ধী বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের স্থলে এইজন্যই বৈদেশিক বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব আর্ত্তকণ্ঠে চিরদিন সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশী আমাদের শত্রু বলিয়া নহে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য ইহাই প্রয়োজন। খাদি ও চরকার সাহায্যে বস্ত্রে যদি আমরা স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারি, যন্ত্রযুগের নিষ্ঠুর কবল হইতে শুধু ভারতবর্ষকে মুক্ত করিব না, অন্যান্য জাতিকেও লোভ ও বিশ্বগ্রাসী দুষ্ট ক্ষুধা হইতে নিবৃত্ত করিয়া আমরা জগদ্ব্যাপী শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইব।

বিশ্বাসীর আশা—

মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুত্থান ভারতের মরা প্রাণে নবীন আশার জোয়ার বহাইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব ইহার মধ্যে এক প্রেমের মহাযুগাগমনেরই শুভ সূচনা দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছেন। "জ্যৈষ্ঠ ও

আষাঢ়" সংখ্যা "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় কোনও ভাবুক লেখক এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"পৃথিবী অবধি যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যৎ উক্তির সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আজ সর্ব্ববিষয়ে জগতের দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হচ্চে; বিশ্ব-ব্যাপী এক বিরাট্ প্রেমযুগের আবির্ভাবই যে পরিবর্ত্তনের মুখ্য ও চরম লক্ষ্য।"

তাঁহার এই কথাগুলি অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় ও প্রাণে অনুপ্রেরণা জাগায়ঃ—

"জগতের এই আগতপ্রায় মহাসৌভাগ্যের দিন—এক ঘোরতর দুর্দ্দিনের অন্তরালে অবস্থান করছে। যদিও কলির প্রভাব অবিলম্বেই অস্তমিত হবে, কিন্তু অস্তমিত হবার আগে, তার শেষ আক্রমণ জগতের উপর এতই ভীষণাকার ধারণ করবে, তা' কল্পনা করাও অসম্ভব। পতঙ্গ যেমন প্রজ্জ্বলিত আলোকের উপর তার অন্তিম লম্ফ প্রদান করে, সেইরূপ বিনষ্টপ্রায় কলির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও শেষ আক্রমণ পড়বে গিয়ে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপর; সুতরাং এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধু-দিগকেও অগ্নি যেমন মরণোন্মুখ পতঙ্গের আস্ফালন অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ মরণোন্মুখ কলির পদাঘাত স্থির ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। অপর পক্ষে সাধুদিগকেও এই সময়ে এক ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কলির কালাগ্নির হল্কা তাঁদের বুকের উপরই বেশী এসে লাগবে। এই সময়ে অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন ও অবমান ঈশ্বরবিশ্বাসী-দের শেষ পরিশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকবে। যিনি যত ধীর, স্থির ও প্রশান্তভাবে সে শুদ্ধি মাথা পেতে নিতে পারবেন, তিনিই হবেন যথার্থ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। বিশ্বব্যাপী সেই নবযুগের অভ্যুদয়ে ইঁহারাই হবেন প্রেম-প্রচারে অগ্রদূত। ভগবানের গৌরবপতাকা বহন করবার এই মহাভাগ্য পেতে হলে এখন থেকে চাই তার আয়োজন। দুর্দ্দিনের অন্ধকার যতই ঘনতর হয়ে উঠবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ ততই উজ্জ্বল করে' নিতে হবে। ধর্ম্ম ও ভগবানের জয়গান নির্ভয়ে ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হবে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বেই আবার যে সংগ্রাম সমস্ত জগতের উপর ঘোষিত হবে, শেষ পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ভগবানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করে', ভগবদ্ভক্ত-দিগকে এখন থেকেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। যদি কারও সহযোগ নাই পাওয়া যায়, বিশ্বাসী সৈনিকের মত, একাই এই বিশ্বাসের যুদ্ধে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে, প্রয়োজন হলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন জন্য এখন থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। একজনও যথার্থ ভগবদ্বিশ্বাসীর পবিত্র শোণিত যখন নির্য্যাতকের হাত গড়িয়ে বসুন্ধরার উপর পড়বে, তখনই সেই শোণিতা-হুতি থেকে কোটী কোটী বিশ্বাসী ভক্তের বিকাশ ও কলি-প্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ একই সঙ্গে সঙ্ঘটিত হবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাঁরা, তাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী; শ্রীগৌর-লীলায়, ঠাকুর ব্রহ্ম-হরিদাসের বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতের মধ্যে যার বীজ বা কারণ সঞ্চারিত রয়েছে, ব্যাপক রূপে তারই কার্য্য আরম্ভ হবার দিন আগতপ্রায় জানতে হবে।

কালপ্রভাববিমুগ্ধ উদ্ধত ও অসংযত জনতার অত্যাচার যেদিন সাক্ষাৎভাবে ভক্তশরীর স্পর্শ করবে, কলিপ্রভাব আরও বিনষ্ট হবার তখনই ঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে।"

কবি-প্রশস্তি—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁহার স্বরচিত এই কবিপ্রশস্তি বাঙ্গালীর

"অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশীখানি

যাত্রা-পথে। সে প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলন-ক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণী বন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিয়া হিল্লোল-দল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্ল্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রি দিন,
শুধু মোর আনমনে পথ চলা হ'ল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, কত বার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভাবিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপন বীণার তন্তুজালে। ফুল ফুটাবার আগে
ফাল্গুনে তরু মর্ম্মের বেদনার যে স্পন্দন জাগে,
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্চ্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবি-রশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে; যে বিরাট্ গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলীতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা মন্ত্র জপে আমার বাঁশীরে রাখি
আপন বক্ষের পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয় কম্পনে মম; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্নে স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংসরিত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশীর কলস্বনা।

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখের অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কল কল রোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লাসে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্র তালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দ-বেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত-সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথ প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম-বাঁশী—এই মোর রহিল প্রণাম।"

গুরু-শিষ্য—

বাংলায় খাঁটি গুরুভাব জাগিয়াছে। তাই এজাতি অবধারিত ভারতীয় ভাবে গড়িয়া উঠার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। গুরু—ভাবেরই মূর্ত্তি, সিদ্ধ শক্তির বিগ্রহ। গুরুর আনুগত্য—আত্ম-সমর্পণ যোগেরই মৌলিক কেন্দ্র। এই আনুগত্য-ভাবকে যাঁহারা দাসমনোবৃত্তিজাত বলেন, তাঁহারা প্রেমের, উৎসর্গময় জীবনের মর্ম্মরহস্য কিছুই জানেন না। তাড়িতাধার হইতে তাড়িৎ বিকীরণের ধারাই আত্মসমর্পণযোগ—আনুগত্যে শক্তিসঞ্চার বিঘ্নহীন ও নিরঙ্কুশ হয়। ইহা প্রেমেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণা। বাংলার এক নমস্য গুরুহৃদয়ের এই প্রেমময় আশীর্ব্বাণী বড় প্রাণস্পর্শী—তাই একটু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:— (আর্য্যদর্পণ, বৈশাখ)

"আমার শুভ ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার একমাত্র সহায় তোমরা। একদিন মুষ্টিমেয় কয়টাকে লইয়াই আমার কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আমি কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। আমার বিভূতি দেখিয়া কেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমার শরণাপন্ন হয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের আর কোনও হেতু নাই—আমাকে ভালবাসিয়াছিল তাহারা। আমি এক জায়গায় বসিয়া বিশুদ্ধ সঙ্কল্পই করিয়াছিলাম। সেই সঙ্কল্পের অদৃশ্য আকর্ষণের ফলেই তোমাদের মিলন।

তোমাদের জীবনের ভাবে কর্ম্মে ভাগবত-প্রেরণা নামিয়া আসুক। তোমরা সঙ্কল্পসিদ্ধির অক্ষয় বীর্য্য লাভ কর।

আমার সিদ্ধি তোমাদের চারিত্রিক বল এবং নির্ম্মলতার নির্ভর করে। তোমরা যেন আমার ভাবের পথে বিঘ্ন না হও।

এই দেহ দিয়াই কাজ হবে, তবে ইহার রূপান্তর নাই। তোমরা নির্ভীক সাধক—এই জন্যই আত্মদানে তোমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। আজ অক্ষয় তৃতীয়ায় তোমাদের কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমরা মানুষ হইয়া উঠ—এই আমার আশীর্ব্বাদ।

আমার মায়া নাই, কিন্তু আমি তোমাদের ভালবাসি। এই ভালবাসা দিয়াই তোমাদের জীবন গড়িয়া উঠিবে। ভালবাসা সব চেয়ে সেরা—আমার কাছে যাহারা অন্য কিছু দাবী কর, তাহারা বঞ্চিত হইবে। .....

আমার বলিয়া যদি আমি একটীকেও পাই, তাহাই আমার পরম লাভ। পরীক্ষার ভিতর দিয়াই সেই বাছাই হইয়া যাইতেছে।......

তোমরা মানুষ হইতে আসিয়াছিলে, আর কোনও কামনা বাসনা নাই তোমাদের। ... অধিকারী হওয়া সব চেয়ে বড় কথা। তোমাদের সাধনা সেই অধিকার অর্জ্জনের জন্যই। অহঙ্কার আসিয়া মাঝখানেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়; সেইজন্যই সমর্পণের পথ ধরিয়া চলিলে আর কোনও ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।

মানুষ দুই দিনেই প্রতিষ্ঠা চায়, প্রভুত্ব চায়। এই জন্যই সমর্পণের ধারা বহিয়া চলিতে তাহাদের এত আপত্তি! এই অপূর্ণতা লইয়াই কত মানুষ পূর্ণতার অভিনয় করিয়া যায়—কিন্তু হইলে কি হইবে, সেই জীবনের কোন সাত্ত্বিক প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষমতা নেই। অভিনয়ে একদিন না একদিন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়ই হয়। তোমরা অভিনয় ছাড়, নিখুঁতভাবে মানুষ হইয়া উঠ, অক্ষয় বীর্য্য লাভ করিয়া মর্ত্ত্য জগতেই অমৃতানন্দ অনুভব কর ইহাই আমার অভিলাষ এবং আশীর্ব্বাদ।"

এরূপ ভাবসিদ্ধ জীবনের স্পর্শে অনুগত বিশ্বাসীর হৃদয়ে যে যুগভাবের বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে ও ভবিষ্যতের আভাস প্রত্যক্ষ হয়, তাহারও নমুনা উক্ত সংখ্যা পত্রিকা হইতেই একটু দেই:—"আর্য্যদর্পণ"—"যুগান্তের আভাস")

"ভারতের আকাশে বাতাসে আজ বিপ্লবের সূচনা, কিন্তু অন্তরে তার প্রেমের প্রবাহ। আত্মজ্ঞানের গৌরবধারা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে তাহার প্রাণে—সকলের অগোচরে, অজ্ঞাতে। এই দারুণ উত্তেজনার দিনে শান্তি-প্রবাহের সন্ধান কেহ রাখিতেছেন না। এই কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ী ধারা আপন মনে বহিয়া চলিয়াছে দেবতার অঙ্গুলীসঙ্কেতে। রৌদ্রলীলার অবসানে ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়া এই ধারা বহিয়া যাইবে যে দিন, সেই দিনই নূতন জগৎ গড়িয়া উঠিবে। সেদিন জগতের তৃষিত হৃদয়ে অমৃতধারা পরিবেশন করিবে এই ভারত—ভারতের শান্ত সমাহিত ঋষি। দীর্ঘ বিংশ বর্ষ ধরিয়া তাহারই আয়োজন চলিতেছে—অতি ধীরে। কৃচ্ছ্র কোন সাধনা নাই, উৎকট কোন তপস্যা নাই—আছে শুধু অনাড়ম্বর ঋষি-জীবনের সরল অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রয়াস। আর এই জীবনই হইবে ভবিষ্য জগৎরচনার আদর্শ।

আজ সমাজে বিপ্লব, রাষ্ট্রে বিপ্লব, ধর্ম্মে বিপ্লব—এই ঘোর বিপ্লবের দিনে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা সুকঠিন। দেশের আকাশে বাতাসে আজ স্বাধীনতার বাত্যা বহিতে সুরু করিয়াছে, দেশবাসীর শিরায় তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া, অপরের কটাক্ষে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এই সঙ্কট অবস্থায় যাঁহারা স্থিতধী থাকিতে পারেন তাঁহারাই শক্তিধর, তাঁহারাই শান্তিপ্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ঋষিযুগের ভাবধারা বহন করিতেছে যে কয়টী তপস্যানিরত সঙ্ঘ তাহারা এই পথেরই পথিক; স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই তাহাদের এই উদাসীনতা অবলম্বন, এই অবিক্ষোভ কর্ম্মপ্রচেষ্টা। যেদিন সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, সেদিন সগৌরবে এই ঋষিসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিবে—জ্ঞানের প্রদীপ্ত চক্ষু লইয়া, হৃদয়ে প্রেমের অফুরন্ত উৎস লইয়া।"

বাংলার কীর্ত্তন—

কীর্ত্তন—বাংলার ও বাঙ্গালীরই প্রাণের বস্তু। রায়-রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিত যে সুচিন্তিত প্রবন্ধটী বৈশাখের "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যেমনই উপাদেয় তেমনি হৃদয়পূর্ণ। বাংলার সঙ্কীর্ত্তনের পরিচয় দিতে গিয়া মর্ম্মদর্শী ভক্ত সাধক বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাধনারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্মপরিচয় অতি সরল ও মধুর করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

লেখক সঙ্কীর্ত্তনের স্বরূপপরিচয় দিতেছেন :—

> "সঙ্কীর্ত্তনের গানের তাল, সুর, ভাষা, উহার বহিরঙ্গ মাত্র; উহার ভাব ও রস উহার অন্তরঙ্গ, উহার মজ্জা ও নির্য্যাস। ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার বস্তু নয়, উহা অনুভবের বিষয়; গায়কের অনুভূতি হইতে উহা শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে। গায়কের সরল অনুভূতিজনিত আবেগ-পূর্ণ একবিন্দু অশ্রু, মুহূর্ত্তকালীন কম্প, পুলক বা স্বরবিকৃতি সঙ্কীর্ত্তনকে অতি উন্নীত করে। সঙ্কীর্ত্তন গানে গায়ক অকপটভাবে আপনি মজিতে পরিলে, অপরেও মজিয়া যায়; গায়ক ব্রজজনৈকাশ্রয় নিষ্কাম ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া অশ্রুপাত করিলে তাহা দেখিয়া কোন পাষাণ হৃদয় অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে? ভাব—সংকীর্ত্তনগানের প্রাণ। ভাবের অভাবে অনেক তালসিদ্ধ গায়কের গান শ্রুতিমধুর হইয়াও মর্ম্মস্পর্শী হয় না। আবার অনেক গায়ক মধুরকণ্ঠ না হইয়াও, ভাবগদ্গদকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করেন। সঙ্কীর্ত্তন আবার দুই প্রকারের আছে—(১) নামসঙ্কীর্ত্তন; (২) লীলাসঙ্কীর্ত্তন। প্রথমোক্ত কীর্ত্তন ভক্তিমূলক, অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণে স্বার্থমূলকও বটে। দ্বিতীয়োক্ত কীর্ত্তন প্রেমমূলক—রসাত্মক।.....
>
> বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
> অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন॥"

প্রবন্ধের মাধুর্য্যরস উপলব্ধি করাইতে যতটুকু উদ্ধৃত করার প্রয়োজন তার স্থান আমাদের নাই—আমরা শুধু বলিতে চাই—আমাদের জাতীয়-জীবনে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়বিধ রসসাধনার অমৃতপ্রবাহ ক্রমশঃ শুষ্ক ও অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহা মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালীর জীবনের নিবিড়তর আনন্দের প্রকরণগুলি আজ ধীরে ধীরে কালের আড়ালে মুখ ঢাকা দিতেছে। রুচি আছে, কিন্তু সময় নাই—দারুণ অন্নচিন্তায়, রোগে, শোকে মুহ্যমান জাতি আজ মুক্ত প্রাণের সহজ আনন্দবিলাস করিবে কেমন করিয়া? বাঙ্গালী আজ গৌরচন্দ্রিকাও ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রাণের দুকূল উপছান যে রসোচ্ছ্বাস কীর্ত্তনে, গানে, উৎসবে, আনন্দে, নৃত্যকলায় প্রকাশ পায়, তাহাই যখন নাই, তখন এইগুলিকে শুধু বাহিরের দিক্ হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা শুষ্ক ও কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়। কাজেই জাতিকেই আজ বাঁচাইতে হইবে—আর সব মূল্যবান্ জীবনাঙ্গগুলি তখন আপনা হইতেই রক্ষা পাইবে—নূতন নূতন উপায়ে প্রাণের আনন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিবে। বাংলার কীর্ত্তন যদি জাতি-সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া নূতন প্রাণ খুঁজিয়া পায়, আবার তাহার অনাবিল রসাস্বাদে বাঙ্গালী উন্মাদ হইবে, ধন্য হইবে। নতুবা যাহা গিয়াছে, যাইতেছে, রায় রসময় মিত্র কিম্বা নবদ্বীপের রামদাস বাবাজীর ন্যায় আর দুই একটী শেষ মহাপ্রাণধারা শুকাইলে, ইহার রসাস্বাদে বাঙ্গালীকে মাতান দূরে থাক, এই অমৃত সম্পদের মহিমা বুঝিতে ও বুঝাইতেও বুঝি বাংলায় আর কেহ থাকিবে না।

সমালোচনা

—ঃ০ঃ—

লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা-বিস্তার—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি-এল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। "বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ" গ্রন্থমালা (১)। মূল্য ১৷৷০ মাত্র; লাইব্রেরী পক্ষে ১৲।

বইখানি আমরা আগাগোড়া সবটুকু আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিলাম। এই দেশব্রতী জ্ঞানসাধক জাতির মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের জন্য যে পবিত্র সংবেগ হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রের মধ্য দিয়া তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে সুশীল বাবু যথেষ্ট পড়িয়াছেন, ভাবিয়াছেন; তিনি নীরব কর্ম্মী, দেবী ভারতীর পূজার হোমশিখা দেশব্যাপী ছড়াইয়া দিতে আকুল আগ্রহে নিজেও কাজে নামিয়াছেন—তাই তাঁহার কথাগুলি তাঁহার ন্যায় চারণব্রতী কর্ম্মিবৃন্দের উপযোগী করিয়াই এমন সহজ ও প্রাঞ্জল করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় অন্য বই পড়ি নাই, ক্ষুদ্রায়তনে প্রয়োজনীয় সকল কথাই অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আজ এই দেশগঠনের যুগে, বইখানি উৎকৃষ্ট Suggestive manual রূপে প্রত্যেক তরুণ দেশকর্ম্মীর খুব কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, মনীষী লেখক এ সম্বন্ধে আরও অধিক জ্ঞানগর্ভ চিন্তা ও আলোচনা প্রকাশ করিয়া উদীয়মান্ জাতির ক্ষুধা মিটাইবেন।

কোষ্ঠি-দেখা—শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। বাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং কৃতবিদ্য জ্যোতিষী; কিন্তু তাঁহার সমধিক গুণপণা—এই দুরবগাহ জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বয়ং আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া যে সুধা আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাই জাতির জন্য উপাদেয় ও মধুর করিয়া বিতরণ করিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এমন সহজ জলের মত করিয়া এই কঠিন শাস্ত্র বুঝাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। "কোষ্ঠী-দেখা" গ্রন্থখানি তাঁহার অপর দুইখানি পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলার আগ্রহ দমন করিতে পারি নাই—একে অদৃষ্টপাঠ স্বতঃই কৌতুকাবহ, তার উপর বাচস্পতির যাদুকরী ভাষা ও বিষয়বর্ণনা উপন্যাসের ন্যায় ইহাকে আকর্ষণময় করিয়া তুলিয়াছে। "কোষ্ঠীদেখা"—সকলেরই উপভোগ্য। পণ্ডিতবর যুগোপযোগী করিয়া শাস্ত্র প্রচারে দীর্ঘদিন যে পরিশ্রম করিতেছেন তাহা সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

প্রতিকৃতি—শ্রীউল্লাসকর দত্ত প্রণীত। মূল্য ৸৹ মাত্র। লেখক স্থূল সূক্ষ্ম দুইটী লোকের মধ্য হইতে সত্য আহরণ করিয়া, যে চিন্তার মালা গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, তাহারই প্রতিকৃতি এই নিবন্ধগুলিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পড়িবার ধৈর্য্য থাকিলে, চিন্তা ও কৌতূহলের খোরাক ইহাতে যথেষ্ট মিলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সত্যদর্শন—১ম ভাগ, সনাতন ধর্ম্ম। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি লিখিত। বেশ গম্ভীর চিন্তাগুলি। ভাষাও প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য।

অমিয় ভক্তিরস—শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি প্রণীত। বৈষ্ণব দর্শনের সুধাসমুদ্র ছানিয়া লেখক "অমিয় ভক্তিরস" উপহার দিয়াছেন। রসিক ভক্তের পড়িতে ভালই লাগিবে। উদ্যম শুভ ও প্রশংসনীয়।

অনাসক্তিযোগ—(গান্ধীর গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য) শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য বাঁধা ।৵৹ আনা, আবাঁধা ।৹ আনা মাত্র। বিনয়বাবু মহাত্মাজীর অনেকগুলি বই সরল বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিয়াছেন। তাঁর অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও সরল হয়—পড়িতে অনুবাদ বলিয়া আদৌ কষ্ট হয় না। এ বইখানিতেও তাঁহার সে পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে। যাঁহারা গান্ধীজির মূল গীতাভাষ্যের ভাষাটুকু নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিতে চাহেন—গ্রন্থকারের কোনও মন্তব্য ইত্যাদি চাহেন না—তাঁহাদের পক্ষে এই ক্ষুদ্র সুদৃশ্য বইখানি বেশ পছন্দসই ও আদরণীয় হইবে।

দুর্নীতির পথে—মহাত্মা লিখিত ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন অনূদিত—মূল্য ।৵৹ মাত্র। "জন্মনিয়ন্ত্রণ বা সংযম"—এই যুগ-প্রশ্নের সদুত্তর মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য লেখকের মন্তব্যসহ ভারতের মর্ম্মদৃষ্টি লইয়াই "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" যাহা দিয়াছিলেন, এগুলি তাহারই বঙ্গানুবাদ। বেশ সুন্দর ও সুখপাঠ্য। ইহাতে যথেষ্ট চিন্তার উপাদান মিলিবে। বিনয়বাবুর উদ্যম সার্থক হউক।

প্রাপ্তিস্বীকার

১। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—সাঁতরাগাছি। কার্য্যবিবরণী।

২। নাগরপুর সেবাসমিতি—কার্য্যবিবরণী।

৩। A Report of Emigrants Repatriated to India & c By B. D. Sannyasi.

৪। প্রবাসী ভাইযোকে নাম পত্র & c।

৫। স্বতন্ত্র উপাসনা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট।

৬। স্বরাজ্যবিদ্যালয় (পাঠ্যক্রমকী যোজনা)।

৭। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সার মর্ম্ম—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৮। মুক্তিপথে—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

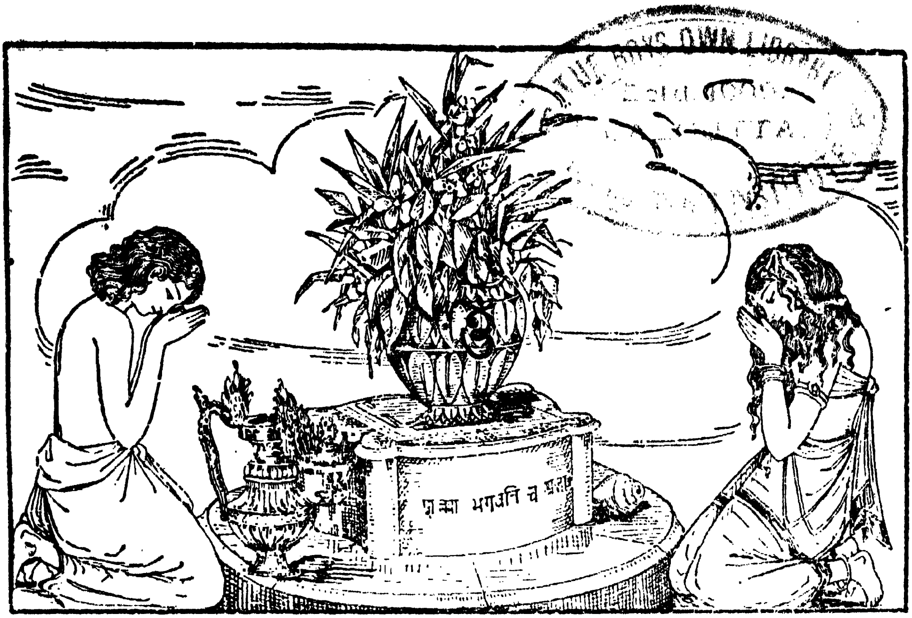
৯। মেবার মহিমা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন



১৬শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা | **প্রবর্ত্তক** | শ্রাবণ,
১৩৩৮।

মুক্তিপথের সমস্যা

—:০:—

অন্যান্য দেশে দেখা যায়, তরুণেরাই জাতির অধঃপতনের বেগ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না; কিন্তু ইহার সঙ্গে ভারতের প্রবীণ পুরুষেরাও একযোগে উদ্যত হইয়াছেন, এবং কোন অংশে তরুণের অপেক্ষা এই সকল প্রাচীন দেশ-প্রেমিকের সাহস ও ত্যাগের পরিমাণ অল্প নহে। এই হেতু আজ আর শক্তির ডাকে কেবল তরুণকে আহ্বান করিয়াই বিধাতার বিষাণ বাজে নাই, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রাণের তারে আঘাত দিয়া ভগবানের পাঞ্চজন্য সাড়া তুলিয়াছে। এ জাতিকে তাই কোন শক্তিই আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, এই বিশ্বাস সকলের মনেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে।

জাতি জাগিয়াছে, জাতির আত্মা আর সম্মোহন-মুগ্ধ নহে। এই অবস্থায় আমাদের সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের কাজ বলিতে যাহা কিছু, তার সবখানির প্রতিই আমরা যদি শ্রদ্ধান্বিত না হই, তাহা হইলে কেবল অন্ধতা হেতু আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া নিজের পায়ে কুঠার

মারিয়াই অচল হইব। এই বহুদিনের প্রাচীন জীর্ণ পরাধীন জাতিটার অস্থিকঙ্কালসার দেহ-পঞ্জরে যেটুকু প্রাণের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সেটুকু হইতে আমাদের অকারণ বঞ্চিত হওয়া শ্রেয়ঃ নহে।

যাহা কিছু গড়িয়া উঠে, তাহার প্রয়োজনের দিক্‌টা দেখিয়া আমাদের স্বভাব-বিদ্বেষী মনকে দমন করা উচিত। কেন না, প্রায় দেখা যায়—আমি যাহা ভাবি, যাহা করিতে উদ্যত হই, তদ্ভিন্ন কোন কর্ম্মে সহানুভূতি দেখাইতে পারি না। তাহার প্রতি ঔদাসীন্যও ভাল নহে; কেন না, ইহা ক্রমে বিরুদ্ধ-ভাব আশ্রয় করিয়া আমাদের বিদ্বেষী করিয়া তুলে। একটা পরাধীন জাতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে যতদিন এইরূপ মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, ততদিন স্বচ্ছন্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ মিলে না। এইজন্য সকল দিক্ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আমাদের স্ব স্ব লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে।

দেশের উপর দিয়া যে কর্ম্মস্রোতঃ ও ভাবস্রোতঃ বহিয়া যায়, তাহার তরঙ্গসংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে; তবুও স্থূলতঃ যে সকল বিচিত্র উদ্দেশ্য আজ পুঞ্জীভূত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কয়েকটী বিষয় লইয়া আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব, এবং আমাদের শিক্ষা ও সাধনার অনুকূল যে দুটী বিশিষ্ট কর্ম্মজীবনের দিক্, তাহাই প্রকাশ করিয়া তুলিব। তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য যে হইবে না, হওয়া সম্ভব নয়, তাহা আমরা জানি; কিন্তু আজ পরিচয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবন কোথাও অস্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন কি অন্ধকার মাটীর গর্ত্তে ষড়যন্ত্রের যে ফল্গুধারা বহিয়া চলে, তাহাকেও মাঝে মাঝে আত্মপরিচয়ের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হয়—ইহা আত্মকীর্ত্তি প্রকাশের প্রোপেগেণ্ডা নহে, পরন্তু অপরিচয়ে আত্মঘাতী না হওয়ার অনিবার্য্য প্রচেষ্টা। আমাদের কথাও আজ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করার এই প্রাণের তাগিদই আসিয়াছে।

দেশে যে অসংখ্য প্রকার কর্ম্মপ্রবাহ বহিয়াছে তাহার মূল ধারা রাষ্ট্রসাধনা। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, মহাত্মার জীবন-সাধনার আদর্শ আজ যে কেবল ভারতব্যাপী নহে, পরন্তু জগৎ ছাইয়াছে, তাহার কারণ, তিনি আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ রাষ্ট্রকেই আশ্রয় করিয়াছেন; ইহার অন্যথা হইলে তাঁর বাণী এমন করিয়া বিশ্বময় প্রচারিত হইত না। অতএব আজ রাষ্ট্রের বাহিরে যত বড় কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা যে নগণ্য বোধেই উপেক্ষিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু রাষ্ট্র-সাধনার ভিতর দিয়াই কি দেশের সবখানি কাম্য আমরা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিব? এই প্রশ্ন রাষ্ট্রের বাহিরে আছেন যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে রাষ্ট্র নেতৃগণ বলিবেন—দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ যদি ভারতের রাষ্ট্র-সঙ্ঘে কায়মনোবাক্যে যোগ দেয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অতি সহজেই সম্ভব হইবে; এবং এইজন্য দেশের কাজ বলিতে যতখানি সবই রাষ্ট্র-সংহতির অন্তর্গত করার একটা প্রয়াসও আছে। আমরা ইহা সমীচিন ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি; কিন্তু তবুও ইহা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের বাহিরে দেশোন্নতিমূলক কাজ অনেক হইতেছে। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, গ্রন্থাগার প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বতন্ত্র গঠনমূলক আন্দোলন অবাধেই চলিয়াছে। এই সমস্ত প্রাণশক্তিকে দেশের রাষ্ট্র-সংহতি যদি কুক্ষিগত করিয়া বিপুল মূর্ত্তি ধরিতে পারে, তাহা হইলে

একটা পরিপূর্ণ জাতি-বিগ্রহ গড়িয়া উঠে, এবং এইরূপ হইলেই দেশের যে প্রধান জীবনী-স্রোতঃ তাহা দুকূল প্লাবিত করিয়া অতি দ্রুত লক্ষ্য-সিদ্ধির অনুকূল হয়।

যাহা শ্রেয়ঃ তাহা সিদ্ধ করা সব সময়ে সম্ভব হয় না; তাহার কারণ, সম্মুখে থাকে অসংখ্য অন্তরায়। একটা পরাধীন জাতির সবখানি অংশ জাতীয় সাধনায় যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এক নিমেষেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহা সহজ নয়। এই হেতু জাতীয় সংহতি বলিতে যাহা গড়িয়া উঠে, তাহাতে লোক বাছাই হইয়া থাকে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া ভারতের জাতীয় মহাসভা এই কাজই করিয়াছে। আজ কংগ্রেসের মেরুদণ্ড বলিতে যেটুকু এইজন্যই তাহা বজ্রের ন্যায় কঠিন, জাতির মুক্তি-যজ্ঞে এইজন্যই কংগ্রেসনেতৃদের কণ্ঠে সিদ্ধমন্ত্রই উচ্চারিত হয়; কিন্তু স্বাধীন জাতির একটা বড় দিক্ আজ চক্ষের বাহিরে রাখিয়া ছুটিতে হইয়াছে, তাহা অধিক দিন অবহেলা করিলে চলিবে না। জাতির অপরিত্যজ্য অঙ্গ যাহা তাহা বর্ত্তমানে সমস্যার হেতু বলিয়া দূরে সরাইয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না; একদিন ইহা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হইবে, হয় তো সাফল্যের দিনেই এমন বিপ্লব সৃজন করিবে—শতাব্দীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

বোধহয় এইজন্যই একদল দরদী মানুষ অনাগত সমস্যার গ্রন্থীগুলি এখন হইতেই খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহা একেবারেই জটিল মনে হইতেছে, তাহা বাতিল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু যদি এই জাতি-প্রকৃতির তাহা অভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়, তবে তাহা বাদ দিলে আমরা বিকলাঙ্গ হইব এবং জাতি-সত্তা ব্যষ্টি অথবা সমষ্টির যুক্তি নাকচ করিয়া উহা আত্ম-স্বভাবেরই প্রতিষ্ঠা চাহিবে। তখন আত্মবিদ্রোহে ভবিষ্যতে আমরা অধিকতর বিপন্ন হইব, নাকালের শেষ থাকিবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায়, ভারতের স্বাধীন জাতির কি ধর্ম্ম হইবে? ইহার সহজ উত্তর উঠিয়াছে—ধর্ম্ম আমরা বিসর্জ্জন দিব। কিন্তু এই সহজ উত্তর মীমাংসা নহে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এমন সমষ্টিশক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা এই কর্ম্মসিদ্ধির অনুকূল হয়। কংগ্রেস যদি এই সমষ্টি হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধবাদী যাহারা তাহাদের বিদায় দিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইবার নহে; সমষ্টির সাধ্য ভাবভেদ দূর করা—অতএব দেখা যায়, এইখানেই প্রথম দফা অন্তরায়।

অনেকে মনে করেন, অনর্থক ধূলা উড়াইয়া কাজ নাই, তয়ে তয়ে কাজ শেষ করিতে পারিলেই হইল; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। বরং গোড়ায় অস্পষ্টতা রাখিয়া যেখানেই আগাইয়া যাওয়া হয়, ভবিষ্যতে সেইখানেই অধিক গোল বাধে। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অতিশয় নগণ্য ও ক্ষুদ্র হইলেও, তত্ত্বতঃ সংহতিগঠনের অনুকূল ও প্রতিকূল কারণগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছি। তাই যে দিক্‌টা অনেকেই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করেন না, সেই দিক্‌টা খুলিয়া দেখিবার প্রয়াস করিতেছি।

ভারতে বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠার ধূঁয়াও উপেক্ষার নহে। ব্রাহ্মণের প্রতিভা রাষ্ট্র-সাধনার তলে তলে বিস্তৃত হইয়া যে বস্তু ছাঁকিয়া বাহির করিতে চায়, তাহা বোধহয়, কর্ম্মোদ্যত নিঃস্বার্থপ্রাণ দেশ-প্রেমিক খোঁজ রাখেন না। তাঁহারা শ্রমিক-আন্দোলনে শূদ্রধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখেন, গঠননীতিক সংহতির মূলে বৈশ্য-শক্তি, রাষ্ট্র-

নীতিক আন্দোলনে ক্ষাত্র-বর্ণের পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখিতেছেন, ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই বিরাট্-মূর্ত্তির পুনপ্রতিষ্ঠা যে আসন্ন, এই প্রত্যয়ে তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা নাই। হিন্দুসমাজের এই আদর্শবাদের সহিত ভবিষ্যতে অমিল হইলে, সে যে কি সংঘর্ষ বাধিবে, তাহা আজ বুঝাইবার ভাষা পাই না। ইহাও নিরাময় সংহতিগঠনের একটী প্রকাণ্ড অন্তরায়।

এমন কি, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার লইয়া আদর্শ-ভেদও উপেক্ষার বিষয় নহে। যন্ত্রযুগ ও কুটীরশিল্প—এই লইয়া আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকারের আদর্শবাদ আছে, ইহাতেই যে কোন মুহূর্ত্তে সংহতিশক্তি বিভক্ত হইতে পারে। এমন অসংখ্য প্রকার মত ও যুক্তি আমাদের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছে, আসন্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন সব দাবিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সর্ব্বপ্রধান বিপদ্—সাম্প্রদায়িক স্বার্থে। এই অবস্থায় দেশে এক অখণ্ড সংহতির ভিতর দিয়া জাতির সবখানি প্রাণ সার্থক হইবে, এমন সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তাই আজ আমরা দলাদলির যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ঐক্যের আদর্শ ব্যর্থ হইতেছে বলিয়া ক্ষুব্ধ হই, ভবিষ্যতে আরও কি বিকট ও বিপুল বেশে দলাদলি প্রকাশ পাইবে—তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ জাতীয় মহাসভা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিখিল ভারতীয় মুসলমান সভা গড়িয়া ভাবিয়াছিলেন, সমধর্ম্মীদের একত্র করিলেন; আজ জাতীয় মুসলমান সভা বলিয়া নূতন দলের অভ্যুত্থানে তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু যে জাতি স্বাধীনতা চায়, সে জাতি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক পথের সন্ধানে কত খণ্ডে যে বিভক্ত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দল বৃহৎ হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুযোগ যে অধিক মিলে, তাহা নহে। দলের প্রকৃতি দেখিয়া সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ণীত হইয়া থাকে।

যত মত, তত ভেদ। এক ভাষা লইয়া এমন গণ্ডগোল বাধিতে পারে, যে তাহাতেই আমরা দলভঙ্গ হইয়া পড়িব। হিন্দীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দু অথবা সংস্কৃত জাতির ভাষা হউক, এই সামান্য বিপত্তিই কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আমাদের হয় তো ছন্নছাড়া করিবে; হিন্দু অথবা মুসলমানের প্রাধান্য লইয়া আমরা হয়তো এমন কলহ বাধাইব যে করামলকবৎ ফল হইতে অকস্মাৎ বঞ্চিত হইব। সমস্যার কথা চিন্তা করিতে বসিলে, নিরাশ হইতে হয়। তাই কর্ম্মপ্রাণ দেশধর্ম্মী এই সকল আজ ভাবিতে চাহেন না। যাঁহারা চিন্তাশীল, মৃতপ্রায় জাতিটার প্রতি অন্তরে যাঁদের অকৃত্রিম দরদ, তাঁরা তাই বলেন—কাজ নাই আদর্শবাদের ঝঞ্ঝাটে —হিন্দু মুসলমান, বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম, ভগবান, এই সব বালাই ভুলিয়া আমরা মানুষের মত বাঁচিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। কথাটা চরম হইতে পারে; কিন্তু মধ্যভেদ না করিয়া অন্ত দর্শন কে কোথায় সম্ভব করিয়াছে? নাই বলিলেই সব যদি ঘুচিত, তাহা হইলে এ জগৎটার অস্তিত্ব অন্ততঃ ভারতের চক্ষে শূন্য ছাড়া আর কিছু প্রতীয়মান হইত না; কিন্তু এই কপট চিন্তায় আমাদের আর মিথ্যাচারী হইয়া লাভ নাই। চাক্ষুষ বাস্তবটাকে এড়াইয়া চলা যে সম্ভব নহে, তাহা কি আজও আমরা বুঝি নাই?

সব 'নেতি'র কোঠায়' ঠেলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টাও যেমন অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক, প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলির প্রতিবিধান না করিয়া মনে মনে তাহার মুণ্ডপাতে যে পরম সান্ত্বনা এবং পথের আবিষ্কারপ্রয়াস তাহা ঐ একই প্রকার অক্ষমতা-জনিত মনোবৃত্তির পরিচয়।

আমাদের বাঁচার প্রেরণা সত্য; অতএব সমস্যা যতই জটিল হউক, তাহা বিদীর্ণ করিয়া মানুষের মতই মাথা তুলিব।

এইজন্য আমরা আজই এক অখণ্ড সংহতি এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল বলিয়াই মনে করি। আমাদের দেশে যে বিপুল লোকসংখ্যা তাহা ভাগাভাগি করিয়া যদি সহস্র শ্রেণী গড়িয়া উঠে, প্রত্যেকটাই যে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্য্য সিদ্ধ করিবে, এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয়। আজ এই যে কংগ্রেসের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা ও মমতা, শাসক জাতির সম্ভ্রমদৃষ্টি, তাহাতে তেত্রিশ কোটী নরনারীর কয়জন যোগ দিয়াছে! ষাট হাজার মিশ্রিত আদর্শের মানুষ আজ রাষ্ট্র-সাধনাকে যে পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছে—বিনা অস্ত্রে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, তাহা বিশ্বের দরবারে বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে প্রয়োজন হইয়াছে, যে আদর্শ এবং যে লক্ষ্য লইয়াই সংহতি-সৃষ্টি হউক না, সব মানুষগুলি একান্তভাবে তদনুযায়ী হইয়া নিজেদের গড়িয়া তুলিবে; তাহা না হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরিণামে আত্ম-বিদ্রোহে আসন্ন ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। এক দল যদি ছন্নছাড়া হইয়া পড়ে, অন্য দল মাথা তুলিয়া উঠিবে; এইরূপ একের পর এক অসংখ্য সংহতিশক্তি ভারতে যদি পর্য্যায়ক্রমে প্রাণশক্তির পরিচয় দিতে প্রস্তুত থাকে, সে জাতি নিশ্চিহ্ন করে কে?

যে দল পুরোভাগে সে দলই যদি জয়ের উৎসাহে সকল সমস্যার শেষ করিয়া মাথা তুলে, সেই দলের মত ও আদর্শ জাতি গ্রহণ করিবে; অন্যথা হইলে বিরোধ বাধিবে। চরম সাফল্য সেই দলের পক্ষেই সম্ভব, যে দল বর্ত্তমান অন্তরায়ের মূল উৎপাটনের শক্তির সহিত ভবিষ্যতের অন্তর্বিদ্রোহের আগুন নিভাইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিবে। যদি দলের মধ্যে বিচিত্র আদর্শ, বিচিত্র মতবাদের মিশ্রণ থাকে, তবে সে দলের জয়সম্ভাবনা নাই। আমরা ভারতের রাষ্ট্রসংহতির মধ্যে এই নীতিই ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই। সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্র হউক, পুরুষ হউক, নারী হউক, সংহতিরক্ষার পক্ষে যে নীতির প্রয়োজন বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগত সংস্কার ও অভ্যাসের বাঁধন টুটাইয়া তদনুগত করিয়া নিজেদের গড়িয়া লওয়ার নমনীয়তা যদি প্রত্যেকের থাকে, তবে জয়ের পথে যে আদর্শ ও চরিত্র এই সংহতির মধ্যে শিকড় গাড়িবে তাহাই হইবে ভবিষ্য ভারতের আদর্শ ও জাতীয়তা। পুরাতনের জের ধরিয়া সে দিন কেহ যদি বিরুদ্ধ হয়, তবে নিয়ত বর্দ্ধনশীল এই সংহতির বিদ্যুদ্বেগ এই জড় অচলায়তনের দুর্গপ্রাচীর সহিতে সমর্থ হইবে না, হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সংহতি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ তাহা লইয়া আজ কথা নহে, সংহতির বীর্য্য সকল ক্ষেত্রেই তুল্য শক্তিবিশিষ্ট। আজ যাহা ক্ষুদ্র, একদিন অনুকূল বাতাসে তাহা বিরাট্ মূর্ত্তি ধরিবে। আসল কথা, দেশময় সংহতি-গঠনের প্রয়াস চাই, এবং সংহতি নিজের শক্তি-বলেই দেশের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া প্রবৃদ্ধ হইবে। এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গেই তাহার মধ্যে একটা নীতি ও শৃঙ্খলা, ভাষা ও ভাবের প্রতিষ্ঠা হইবে। কল্পনার স্থান এখানে নাই। তাই জয়ের সঙ্গে এই ভাব ও আদর্শ সংক্রামিত হইয়া বিজিতকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবে। কোন পক্ষের জয় কেবল বিরুদ্ধ পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সিদ্ধ হয় না। যে উদাসীন সমষ্টি পাষাণভারের মত জাতির অগ্রগতিকে সতত পিছাইয়া দিতে চায়, তাহাও যেমন পরাজয় স্বীকার করিবে; আবার বিভিন্ন আদর্শগত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বজাতি-দ্রোহ নিবারণ করিয়া সে শক্তি সর্ব্বজয়ী হইবে।

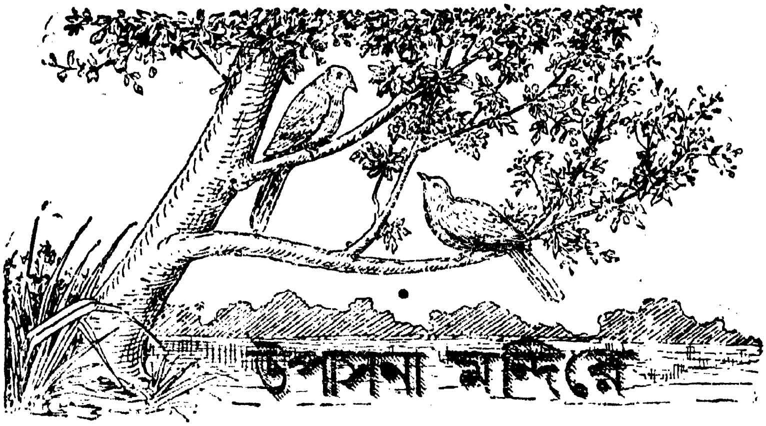
এই হেতু আজ সমস্যার মীমাংসায় আমাদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না, জাতিকেও অকারণ দুশ্চিন্তায় কাতর করিলে চলিবে না। দেশের মধ্যে সংহতিগঠনের সঙ্গে সজীব নব নব নীতি উদ্ভূত হইবে, তাহা এই জাতির বীর্য্যকেই প্রকাশ করিবে। সে দিন বেদের আবার নূতন অর্থ ব্যাখ্যাত হইবে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের নূতন রূপ প্রকাশ পাইবে, ধর্ম্ম ও সমাজের রূপান্তর ঘটিবে। ভারতের বুকে ভারতবাসী প্রাণ ঢালিয়া যাহা সিদ্ধ করিবে, তাহা ভারতের সামগ্রী, তাহা ভারতজাতিরই জয়। মানুষের জয় সাধারণ; সাধারণের মধ্যে যে বিশেষের ভঙ্গী,

তাহার ব্যতিক্রম এই ক্ষেত্রে হইবে না, ইহা অবধারিত।

এইজন্যই আজ মুক্তিকামী কেবল মুক্তি লক্ষ্যে রাখিয়া অতীতের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া যদি চলিতে চাহেন, তবে তাঁহার মিশ্র জীবনের দায়ে সংহতির শ্রেয়ঃ-লাভে বিলম্ব হইবে। মুক্তির মুকুট যে জাতি মাথায় পরিবে, সে জাতিটাকে আজ সব কিছু ত্যাগ করিয়া একটা নূতন ক্ষেত্রে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে হইবে। যখন সকল বিষয়েই সংশয় জাগিয়াছে, তখন সকল হইতে মুক্তিই শ্রেয়ঃ। সত্যকে অস্বীকার করিলেও, তাহা আমায় কখন অস্বীকার করিবে না—সত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা যাহার আছে, সেই বীর্য্যবান্ মানুষ; আর সেই সাহসী নারীপুরুষই আজ জাতিগঠন-যজ্ঞে আত্মদান করিতে পারে।

কংগ্রেসকে সেই ভাবে গড়িতে পারিলে, কংগ্রেসই একদিন—পঞ্চনদে শিখ পুরাতন জাতির বনিয়াদ হইতে নিজেদের মুছিয়া যেমন দুর্জ্জয় জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভারত-জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবে। যদি কংগ্রেসের দৌড় ততখানি না হয়, তবে মধ্য পথে তাহার শেষ হইবে; আবার অন্য আশ্রয় লইয়া জাতির সত্তা আত্মপ্রকাশ করিবে।

কিন্তু রাষ্ট্রস্বাধীনতার দাবী লইয়া কংগ্রেসের সৃষ্টি, রাষ্ট্র-সাধনাই ইহার কর্ম্ম; এইজন্য কংগ্রেসের ভিতর দিয়া আমরা জাতিগঠনের সূত্র নাও পাইতে পারি। রাষ্ট্র-সাধনা ও জাতিসাধনার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র-সাধক স্বাধীনতা চায়, এবং এই স্বাধীনতা ভর দিয়া কোথায় প্রতিষ্ঠা পাইবে, তাহার দিকে তত লক্ষ্য রাখিতে পারে না; তাই একটা মিশ্র-শক্তি লইয়া তাঁহাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হয়। জাতির সাধনা যেখানে, সেখানে অমিশ্র জাতিচৈতন্য লইয়া একটা সমষ্টিকে গড়িয়া তুলিতে হয়। এই সমষ্টির মধ্যে ভেদ ও বৈষম্য গোড়া হইতেই দূর করিতে হয়। এখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, সমাজ প্রয়োজনভেদে যদিও স্বতন্ত্র হয়; কিন্তু স্বাধীনতার অধিকার অংশে অংশে ভাগ করিয়া ভোগ অথবা ধারণ করার হিসাবের প্রয়োজন হয় না। এই অখণ্ডচৈতন্যযুক্ত সমষ্টির সবখানি দিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রত্যেকে তুল্য রূপেই বরণ করিয়া লয়। এই সমষ্টির সংখ্যা গরিষ্ঠ নাও হইতে পারে, কিন্তু অপরিসীম শক্তির আশ্রয় হওয়া চাই; সে শক্তি বাহিরের সম্পদ্ নহে, জাতিচেতনার বিদ্যুদ্বেগ অন্তরে অন্তরে ধারণ করা। এইজন্য কংগ্রেসের গঠননীতি এবং এই জাতিসাধনার তীর্থে যে গঠনের আয়োজন তাহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। আজ আমরা কেবল এই কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—দেশে রাষ্ট্র-সাধনার পাশে পাশেই জাতি-সাধনার স্রোতঃ তুল্য বেগেই প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র-সাধনার অন্তর্গত স্বাধীনতা, কিন্তু তাহার মধ্যে অখণ্ড জাতির বীর্য্য নাও স্থান পাইতে পারে; পক্ষান্তরে জাতিসাধনার লক্ষ্যও স্বাধীনতা, অধিকন্তু ইহা জাতির অখণ্ড বীর্য্যের অভিব্যক্তি—এইজন্য গঙ্গোত্রীধারার মত ইহার বেগ কোথাও রুদ্ধ হয় না, শনৈঃ শনৈঃ ইহা বিপুল কলেবরে মুক্তির পারাবার স্পর্শ করে। জাতি-সৃষ্টির মণ্ডলী আজ কংগ্রেসের মত বিরাট্ মূর্ত্তি নহে বলিয়া ইহা উপেক্ষার বস্তু নহে; আর ইহা অভিনব বলিয়া না বুঝিবারও কোন কারণ নাই। দেশে এই যুগল ধারার আসন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসের রাষ্ট্র-সিদ্ধির সহিত এই জাতি-গঠননীতি সংযুক্ত হওয়া বিচিত্র নহে; আবার জাতি-সাধনার প্রবাহেও রাষ্ট্র-সাধনা সম্মিলিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা আজই সম্ভব হইবে না। গঠনশক্তিকে স্বতন্ত্র গতিতে প্রবল হইয়া উঠিতে হইবে, জাতির সাধনার এই অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিতে রাষ্ট্র-সাধনার চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই দিকে স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়া আমরা সকলকেই চিন্তা করিতে বলি। রাষ্ট্রের সহিত জাতীয় সাধনার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার একটা আকারভেদ আছে। এইজন্য গোড়ার কথা না জানিলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। আমরা আজ ইহার আভাস মাত্র দিলাম, এই বিষয় লইয়া ভবিষ্যতে আরও অধিক আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।



উপাসনা মন্দিরে

সময় যায়, সাধনার জন্য জীবন উদ্যত কর। অমর প্রাণের সন্ধান কর। উদ্যত হও। মৃত্যুর দিক্ থেকে মুখ ফিরাও। তোমার আমার কাজের ভার নয়—ভগবানের ভারবহনের জন্য জীবন, সে জীবন স্বচ্ছ উন্নত করে' তোল। নীরোগ হও। সুশ্রী ও কান্তিপূর্ণ দেহ নিয়ে দাঁড়াও। সম্মুখে জয় পরাজয়ের দ্বন্দ্ব নাই—যে ভগবানকে আশ্রয় করেছে সে জয়ী হবে। চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দিনের কাল ছায়া ঘিরে ধর্‌ছে—হে বন্ধুগণ, সব বিদীর্ণ কর। আকাশের ঘনঘটা বিদীর্ণ করে' নূতন আলোর আবিষ্কার চাই।

* * *

ধর্ম্ম যদি গোড়ার কথা হয়—সব যাক্, ধর্ম্ম আশ্রয় কর। ধর্ম্ম বুদ্ধিগত হয়ে থাকা না থাকা তুল্য কথা। উহা দেহগত কর। ধর্ম্মভাব দিয়ে তনু মন গড়ে তোল। ধর্ম্ম কেবল মুখের কথা হয়ে না থাকে—যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য উদ্বুদ্ধ হও, উন্মাদ হও।

* * *

বাহিরের আচার—ভিতরের দাবী। আচারহীন সাধনা ধর্ম্মকে জীবনগত করার পরিপন্থী। এই আচার তোমরা পূর্ণাঙ্গ রূপে পালন কর। তোমাদের মধ্যে যারা সত্যাশ্রয়ী, তারা অবধারিত সকলেই স্বরূপ-ধর্ম্ম পাবে। সেখানে আর কোন সংশয়, কোন অস্পষ্টতা থাক্‌বে না—আত্মপ্রকাশের পথে কোন বাধা প্রবল হয়ে' দাঁড়াবে না।

* * *

একই ভাগবত বীর্য্য আধার ও প্রকৃতিবৈচিত্র্যে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী ধারণ করে; একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলে কত ভেদ, কত পরস্পর প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনা সৃষ্টি করে—এ বিপুল জগতে কত দ্বন্দ্ব, কত সঙ্ঘাত কে তার ইয়ত্তা করে!

তবুও মানুষ সাম্য চায়, ঐক্য চায়; সঙ্ঘ চায়। ইহা সেই মৌলিক বীজের সনাতন ধর্ম্ম এবং তা' যতটুকু সম্ভব হয় তা' কেবল বাহিরের দাবীতে। প্রত্যেকের টিকে থাকার যে বিধান তার মধ্যে আছে একটা সামঞ্জস্য—তারই প্রতিষ্ঠা হয়; সত্য মিলনের যে অমৃত তা' সৃষ্টির মধ্যে বুঝি দেখা যায় না। স্বপ্ন মানুষকে নাচায়, হাসায়; স্বপ্নে মানুষ সঙ্গীত রচনা করে, শাস্ত্র প্রণয়ন করে—আসলে সে আপনার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

মানুষ যেদিন প্রত্যেকে সমান অধিকার পাবে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধনায়—সেদিন কেউ কাউকে পরাভূত কর্‌তে পার্‌বে না, শক্তিতে নয়, সম্মোহনে নয়, রূপে নয়; কেন না, প্রত্যেক স্বয়ং পূর্ণ, অন্যের আনুগত্য তো কারও ধর্ম্ম নয়।

তবুও রাসচক্র, কৃষ্ণমণ্ডলের যে স্বপ্ন—সে শুধু ঐ বীজের দাবী। তা' যখন কেউ অতিক্রম কর্‌তে পারে না, তখনই সে এক অভিনব অবস্থা ও ভাবের প্রতিষ্ঠায় অনেকে চক্রবদ্ধ হয়। সে মিলনের ব্যূহ কোথায়, কতদূরে, তা' আজ কল্পনা করা যায় না। তাই এখানে যে প্রচেষ্টা চলেছে তা' অভিনব, অনির্ব্বচনীয়। যেখানে অধিকার তুল্য নয়, সেখানেই অবিচার। এই সমান অধিকার নিয়ে নারী পুরুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে। তবুও যদি ঐক্যবদ্ধ সমষ্টি গড়ে উঠে, তবে তা' কোন কৌশল, কোন প্রভাব নয়—ঈশ্বরের মহিমা, যা সত্যই নিগূঢ় অচিন্তনীয়। হে ভগবান! তোমার অসাধারণ লীলাপ্রকাশ হোক। তুমিই জেগে ওঠ ঘটে ঘটে। তোমারই আত্মপরিচয় বৈচিত্র্যের মাঝে—তাই এ অসম্ভব সম্ভব হবে।

* *
*

ব্যথার তপস্যা

(২০)

পতিত জাতি উঠিবে। পতন যেমন অহেতুক নয়, তেমনি উত্থানেরও কারণ আছে। সে কারণ—তপস্যা। জাতি যখন তপঃশক্তি-হারা হয়, তখনই তার ভাগ্য-গগন ম্লান তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; আবার আত্মগ্লানি ও প্রায়শ্চিত্তের পরে নূতন সৌভাগ্যোদয় সম্ভব হয়। তপস্যায় অভ্যুদয় ও মুক্তি, ইহার অন্যথায় করুণার দান মাথায় লইয়া কোন জাতি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না।

*　　*　　*

ব্যক্তির ন্যায় জাতিও জীবন্ত শক্তি। প্রতিকূল শক্তিসমষ্টির সম্মুখে তাহার জীবনগতি কখনও স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। ইহা অবসাদ যুগ। এই সময়ে বাঁচিবার প্রয়াস খুব স্বাভাবিক হইলেও, সব সময়ে সফল হয় না। তাহার কারণ—প্রাণের অর্থাৎ তপঃশক্তির অপ্রাচুর্য্য। দিগ্বিজয়ী প্রাণশক্তি তপঃসিদ্ধ জীবনেই সম্ভব হয়। যে জাতি যত পরিমাণে এই তপঃশক্তি জীবনে স্থান দেয়, সে ততখানি বিশ্বজয়ের জয়টীকা ললাটে ধারণ করার যোগ্য অধিকারী হয়। প্রাপ্তির মূল্য যোগ্যতা—ইহার অন্য ব্যতিক্রম নাই।

*　　*　　*

যোগ্য হওয়া—তাহারই জন্য তপস্যা। কৃপা ও অনুকৃতি—যোগ্যতার লক্ষণ নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠাই মূল। ব্যক্তির ন্যায় জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিমান্ হইলেই স্বাধীনতা-লাভের যোগ্য হয়। জাতি-গঠনের তপস্যাও প্রতিক্রিয়ামূলক নয়; কিন্তু তিল তিল করিয়া প্রতিকূল অবস্থা জয় করিয়াই খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জ একটা নূতন ভাবকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে। এই দানা-বাঁধা তত্ত্বই—জাতি। ব্যথার পীড়নে ইহা অন্তরে দুর্জ্জয় শক্তি সঞ্চয় করে ও দিনে দিনে সেই সহিষ্ণুতার সঞ্চয় লইয়াই নূতন ভাবকে মূর্ত্তি দিতে অগ্রগামী হয়। এরূপ নিপীড়িতের মধ্য হইতে নবশক্তির অভ্যুত্থান অসাধারণ হইলেও, অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ইতিহাসে তাহার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

*　　*　　*

এইজন্য সৃজনের যুগই তপস্যার যুগ—ইহা ইতিহাসের বাণী। ধ্বংসেই নূতন সৃষ্টি—ইহা উত্তেজনার কথা, নিছক সত্য নয়। ধ্বংসের বীজ ধ্বংসই করে, তবে সৃজনের তপস্যা ইহার সুযোগ লইয়া নূতন ক্ষেত্র রচনায় কতকটা সহায়তা কখনও কখনও পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। এমন অনেক সময়েই দেখা যায়, সাহায্য করা দূরে থাক, প্রতিকূল কালস্রোতঃ ও আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করায়, দানা বাঁধার তপস্যা ইহাতে বিলম্বিত, প্রতিহত ও পরিশেষে ব্যর্থ হইয়াই নিঃশেষ হয়। এইজন্য জাতিগড়ার সাধনায়, ধ্বংস-বীর্য্যের স্থান নির্ভয়ে দেওয়া চলে না। উহাতে পরিণামে আত্ম-নাশেরই সম্ভাবনা সমধিক বলিয়া, সৃষ্টিপন্থী দূরে দূরে অতি সতর্ক হইয়া ইষ্টসাধনায় রত হয়। উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নয়—সৃজনের তপস্যাকেই অনুকূল আবেষ্টনী ও আব্‌হাওয়ার মধ্যে নিরাপদ্‌ ও পরিপুষ্ট

করিয়া তোলা। ধ্বংসের প্লাবন হইতে নূতন শক্তির এই আত্মবৈশিষ্ট্যের ব্যবধান ও গণ্ডী-রচনা নানা অপব্যাখ্যার ভাগী হইলেও, পরিণামে ইহাই জাতিকে রক্ষা করে ও জয়যুক্ত করে। তাই জাতিযজ্ঞের পুরোহিত ও সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের অসাধারণ তপোবল লইয়াই এই ধ্বংস ও সমালোচনার সংযুক্ত প্লাবনমুখে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হয়। সমস্ত যুগস্রোতঃ যেন ইঁহাদের বিরুদ্ধগামী হয়—উজান ঠেলিয়া কার্য্যসিদ্ধি কত বড় দুর্জ্জয় প্রেরণা ও সাধনার বলে সম্ভব হয়, তাহা ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়।

* * *

পরাধীন জাতির জীবনে, এই সত্যদৃষ্টি দুর্ল্লভ; কেন না প্রতিকূল আবহাওয়ায় আদর্শের সংঘর্ষে যে একটা স্বাভাবিক হৃদয়ক্ষোভ ও অন্তর-পরিচয়ের অভাব পরস্পরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে সত্যদৃষ্টি ঘুলাইয়া যাওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। বিপ্লব, বিদ্রোহ, আত্মকলহ—একই মনোবৃত্তির বিচিত্র লীলাভঙ্গী—গঠনের বীজ এরূপ মানসক্ষেত্রে অনুকূল মাটি জলের অভাবে অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হয় না। নির্ম্মাণের ঋত্বিক্ একটা নূতন মন ও চরিত্র লইয়া জাতি-সাধনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। তাই তাহার দৃষ্টির সহিত যুগের দৃষ্টি মিলে না। যুগ যে প্রলয়মুখী—তাহাকে সবলে মোড় ফিরাইয়া একটা নূতন ও সম্পূর্ণ বিপরীত পথে টানিয়া আনা অসাধ্য সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহাই নির্ম্মাণব্রতীর সাধ্য। তাই অসাধারণ ভাব, চরিত্র, প্রকৃতি দিয়া আপনাকে গড়িয়াই তাহাকে যুগ-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা অসাধারণ অনুভূতি, অসাধারণ তপস্যা। জাতির জীবনে এই অসাধারণ অনুভূতির স্ফুরণ ও তদনুসরণে অলৌকিক তপস্যা যদি দেখা দেয়, তবেই তাহা নবযুগের স্পষ্ট আবির্ভাব-লক্ষণ বলিয়া আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি। ভারতের জাতীয় জীবনে আজ এই শুভ লক্ষণরাজি দেখিয়া আমরা সত্যই উৎফুল্ল ও আশান্বিত হইয়াছি।

* * *

জাতি চায়—নির্ম্মাণ। কিন্তু এ চাওয়া এখনও তার খুব অন্তরের অন্তরেই খেলিতেছে; বাহিরের জীবনক্ষেত্রে সে ফল্গুপ্রবাহের সন্ধান খুঁজিলে অল্পই মিলে। ইহার কারণ, জাতি এখনও আত্ম-হারা। কস্তুরীলুব্ধ মৃগযূথের মত আমরা বাহিরের দিকে তাকাইয়া এখনও যে ছুটাছুটি করিতেছি, তাহা এই আত্মপরিচয়হীনতারই লক্ষণ। গভীরে, জাতির মর্ম্মকোটায় নূতন সুরের আহ্বান বাজিয়াছে। সে সুর যাহারা শুনিয়াছে, তাহারা পাগল হইয়াই ঘরের বাহির হইয়াছে। সুরের নেশায় পাগল, কিন্তু মরমের সুর এখনও বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট মনের গোচর হইয়া উঠে নাই। তাই শুনিয়াও মর্ম্মহারা আমরা যাহা তাহা ভাবিতেছি; কিন্তু পাগল যে সে সে শ্রুতির সহিত দৃষ্টিও পাইবে—সুরকে ভাষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের সম্মুখে নূতন রূপের আশা-চিত্রও অবধারিত ফুটিয়া উঠিবে। ইহাও তপঃসাপেক্ষ; কিন্তু এ তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে বলিয়া, সত্তার সহজ ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিয়াই প্রকৃতিকেও অনায়াসে রূপান্তরিত করিয়া লইবে। যে অসাধারণচরিত্র নূতন জাতি বিধাতার কল্পনেত্রে বীজাকারে নিহিত আছে, তাহা এই সহজ তপস্যামূলক জীবনসাধনায় সকল বাধা বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। মানুষের দেহ, প্রাণ, হৃদয়ের রূপান্তরের সহিত তাই সমষ্টি জাতীয় জীবনেরও রূপান্তর ও নবজন্ম অবশ্যম্ভাবী।

* * *

নির্ম্মাণ নূতন নীতি। ইহা বিদ্রোহ বিপ্লব নয় —পরন্তু প্রকৃতির একটা আমূল রূপান্তর। তাই ইহাকে নবজন্ম বলিলেই বরং অধিকতর মর্ম্ম পরিস্ফুট হয়। জন্ম কি একটা বিদ্রোহ বা বিপ্লব? না, উহা সত্তারই অভিব্যক্তি। জন্ম একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয় (accident); প্রসূতির বহুদিনের তপস্যার অভীপ্সিত ও অভিনন্দিত কামনার ধন। প্রকৃতির এই নিগূঢ় বেদনা-আনন্দভরা তপস্যার নীতির সহিতই জাতিগঠননীতি একমাত্র তুলনীয়। এ ব্যথা যেমনই গভীর, তেমনি নব সৃষ্টির অভিনব দ্যোতনা ও অভিব্যঞ্জনায় পূর্ণ। জাতিসৃষ্টির মূলে এই ব্যথার তপস্যা বরণীয়।

সাধারণতঃ, মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা লাভের জন্য আমরা পৃথিবীর বিপ্লবযুগের ইতিহাস সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকি। ফ্রান্স, আমেরিকা, এ যুগের রুষ—মুক্তিসংগ্রামের জলন্ত আলেখ্য। কিন্তু এখানে জাতি-গঠনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাই না। বরং এদিক্ দিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস অধিকতর আলোকপ্রদ। শক্তিশালী বৃটীশ জাতি একদিনের সৃষ্টি নয়—প্রকৃতির দীর্ঘ তপস্যার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। রোম-কবলিত পরাধীন ইংলণ্ডের ব্যথাময় কাহিনী ইংরাজ ঐতিহাসিক ইচ্ছা করিয়াই প্রায় চক্ষু মুদিয়া পার হইয়া যায়, কেন না সে দিনের পরাধীনতার লাঞ্ছনা আজিকার জয়গর্ব্বিত ললাটে নিশ্চিহ্ন রূপে মুছিয়া না দিলে মানায় না। কিন্তু ইংলণ্ডের এই পরাধীনতাই বৃটনকে জাতি-রূপে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠার প্রথম সুযোগ দিয়াছিল। রোমের ভক্ত শিক্ষানবীশ সেই শিশু ইংরাজ জাতি বিদ্রোহীর বেশে রোমের শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা পরবর্ত্তী যুগে অস্বীকার ও বাহ্যতঃ বর্জ্জন করিলেও, সেই রোমশাসনের জগদ্দল পাষাণভার বুকে বহিয়াই ইংলণ্ডের জাতি-সত্তা একদিন আপনার কেন্দ্র সত্য খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাই দ্বাদশ শতাব্দী পরে দেখি, রোমশিষ্য সভ্যতার উচ্চশিখরারূঢ় ইংরাজ জাতি পুনঃ বর্ব্বরতার মহাসমুদ্রে ডুবিয়াও একটা অভিনব শক্তিশালী জাতিরূপে পরিশেষে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বৃটীশ জাতির বিবর্ত্তনের ইতিহাস বিপ্লবী ফ্রান্স বা রুষের চেয়ে নব ভারতজাতিগঠনের সহিত সমধিক তুলনার যোগ্য।

ইংরাজাধিকৃত ভারতের ন্যায়, রোমও চাহিয়াছিল ইংলণ্ডকে নিজের আদর্শে গড়িয়া পিটিয়া লইতে—Romanised করিয়া তুলিতে। রোম দিয়াছিল তাহাকে সভ্যযুগোচিত নগরনগরী, শিক্ষাবিধান, বিলাসনীতি। রোমের বীর-চমূ (Legions) ইংলণ্ডের সাগরবেষ্টিত তটভূমি অন্য বহিঃশত্রুর কবল হইতে সুরক্ষিত করার জন্য ইংলণ্ডেই মোতায়েন করা হইয়াছিল—ইংরাজ তাহারই দৃঢ় বাহুর আড়ালে নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমাইত, শান্তি শৃঙ্খলার অপূর্ব্ব রসাস্বাদে সুখভোগে প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু বিধাতার বিধান—এ সুখভোগে দুই শতাব্দীও কাটিল না। রোমের কেন্দ্ররাষ্ট্র বর্ব্বর জাতির অভিযানে সমাক্রান্ত ও টলটলায়মান হইলে, রোম তাহার বীরবাহিনী ইংলণ্ড হইতে সরাইয়া লইতে বাধ্য হইল; অসহায় শিশুর মত সেদিনের বৃটন আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও জলদস্যুর উৎপাতে নির্য্যাতিত মরণবাণবিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে মরণব্যথার মধ্য দিয়াই দ্বাদশ শতাব্দী পরে ইংলণ্ডের জাতি-সত্তা নব জন্ম লাভ করিল।

বিভিন্ন বিচিত্র উপাদানরাজি মিলাইয়া অখণ্ড জাতি-তত্ত্বের উদ্ভব—ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত। এখানে বিপ্লব বিদ্রোহ তত নয়, যতখানি সংমিশ্রণ ও অভিব্যক্তির (Assimilation and Evolution) মধ্য দিয়া কেমন করিয়া প্রকৃতির অব্যর্থ নির্দ্দেশক্রমে একটী জাতি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহারই পরিস্ফুট নিদর্শন পর্ব্বে পর্ব্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার কালে এই দিগ্বিজয়ী জাতির গঠনেতিহাস অনেক দিক্ দিয়াই সকৌতূহলে স্মরণীয় ও আলোচনীয়।

* * *

ইংলণ্ড ব্যথার মধ্য দিয়াই নবজন্ম লাভ করিয়াছে। এ একটা দুর্দ্দান্ত অসুর-প্রকৃতি জাতির জন্ম-বৃত্তান্ত। প্রাচ্যের ইংলণ্ড—জাপানের ইতিহাসও অভিব্যক্তির ইতিহাস—তথাকথিত বিপ্লবের নয়। যেখানে কিছু গড়িয়াছে, সেখানেই এই গঠনের তপস্যা তলে তলে অনুস্যূত। জাপানের সামুরাই স্বেচ্ছায় আভিজাত্য বলি দিয়া যে অখণ্ড জাতি-গঠনের বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিল, তাহাই জাপ-অভ্যুদয়ের কারণ। ইহাই দরদের তপস্যা! আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াই দরদী হৃদয় ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে আত্মলয়ে রূপান্তর পায়। জাপানে সেই জাতীয়তাই সুদৃঢ় ও অটুট ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে ; চীনে তাহার অভাব, তাই চীন জাগিয়াও একটা নূতন অখণ্ড জন্ম লইতে পারে নাই। বিপ্লবে ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়া চীন যদি এমনই ক্রমাগত ছন্নছাড়া হয়, তবে এই ধ্বংসনীতির ব্যর্থতাই তাহাতে অবধারিত সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে। রুষের যে নব জন্মের কথা শুনিতেছি, তাহার শেষ পরিণাম না দেখা পর্য্যন্ত কেহই এ সম্বন্ধে শেষ বাণী উচ্চারণ করিতে অধিকারী নহে।

* * *

আমরা ভারতে তপস্যার মধ্য দিয়া নব জন্ম গ্রহণের ইঙ্গিতটুকুই শ্রেয়ঃ বলিয়া এখানে বলার প্রয়াস করিতেছি। ব্যথার দুর্দ্দম শক্তিকে রুষের মত বিস্ফোরণের পথে উদ্গীর্ণ না করিয়া, উহাকে সংহত ও তটস্থ করিয়া সৃষ্টির পথেই প্রধাবিত করিতে বলি। সে পথ সংযমের পথ—আত্ম-সমর্পণের পথ। জাতিসৃষ্টির এই অভিনব ধারা সম্বন্ধে মাত্র মৌলিক কথাটাই অদ্য অবতারণা করিলাম। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও নির্ম্মাণনীতির প্রয়োগধারা পরিস্ফুট করার ইচ্ছা রহিল।

বিশ্বসম্রাট্ অজাতশত্রু ও পারস্য-রাজ্য

[শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ]

(৩)

Magian Petizeithes

পাটনা ও তাহার নিকটবর্ত্তী জেলাগুলিকে অদ্যাপি মগধ বলা হয়। এই মগধ যে একটী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইয়াছিল, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। Cambyses-এর পিতা Cyrus-এর সময় হইতেই সম্রাট্ অজাতশত্রু এই মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি যে বিশ্বসম্রাটের পদবীর দাবী করিতেন এবং ইরাণ ও তুরাণকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীন বলিয়া ধরিতেন, ইহা পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। মগধ কথার অর্থ "মগ"দিগের বাসস্থান। সুতরাং পাটনা প্রভৃতি জেলার অধিবাসিগণ এবং ঐ দেশের সম্রাট্ "মগ" পদ-বাচ্য হইতেছেন। "মগ" কথা পূজার্থক মহ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'মঘ' কথার অপভ্রংশ। সুতরাং 'মগ' বা 'মঘ' কথার অর্থ পূজনীয় ব্যক্তি। চারুবাবুর "অশোক" নামক গ্রন্থে পাই—"প্রাচীন তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ সমগ্র ভারতের নাম মগধ অর্থাৎ পুণ্যবান্ ও পূজ্যগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" সুতরাং Magus, Magush Magian প্রভৃতি কথা "ভারতবর্ষীয়", "মাগধ", "গৌড়ীয়" প্রভৃতি কথার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতেছে এবং উহাদের অর্থ হইতেছে পূজনীয় ভারতবাসী। অভিধানেও পাই—Magi অর্থ—the priests of the Persians—The wise men of the East. এই Eastও ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশ হইতে পারে না।

আর Petizeithes কথা যে "পতি ক্ষত্রিয়" কথার অপভ্রংশ, একথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। Dr. Hall-এর 'Ancieant History'তে পাই—Petizithes কথাই পরবর্ত্তী কালে সম্রাট্-বাচক Padishah কথায় পরিণত হইয়াছে:—

"Patizeithes is not a name but a title—Pati Kshayatriya—the mo'ern Persian and Turkish Padisha which from meaning 'Regent' has in Turkish become the ordinary appellation of the Sultan." ("Ancient History" p. 569 foot-note.)

পারস্যদেশে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় কথা ক্ষায়খিয় কথায় পরিণত হইয়া রাজবাচক হইয়াছিল। Daruis-এর Inscription'এ তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেন—আদম্ দারয়বুঃ ক্ষায়খিয়ঃ ক্ষায়াখিয়ানাম্—"I am Darius, King of the Kings;" তবেই পতি-ক্ষত্রিয় কথার অর্থ হইতেছে—"Suzerain cver many Kings" বা সম্রাট্। সুতরাং Magian Petizeithes অর্থ "মগ" ধর্ম্মাবলম্বী রাজভৃত্য না করিয়া "মগধের সম্রাট্" করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ রাজভৃত্যের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার অধিকার গ্রহণ করা এবং অধিকারবলে রাজাকে তাঁহার রাজ্যচ্যুতির দণ্ডাজ্ঞা: তাঁহার রণোদ্যত বিপুল বাহিনীর সমক্ষে অবগত করান একেবারেই

অসম্ভব। পক্ষান্তরে সম্রাট্ অধীনস্থ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা তাঁহাকে শুনাইতে হইলে, তাহা রণোদ্যত বাহিনীর সমক্ষে শোনানই খুব স্বাভাবিক; কারণ সামন্তরাজা সম্রাটের প্রতিনিধি মাত্র, সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার দাঁড়াইবার কোনই অধিকার নাই এবং তাঁহার সৈনিকগণও তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার উপরিস্থ সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিতে অধিকতর বাধ্য।

উপসংহার

পারস্তের Achoemenian রাজগণের ইতিহাস পৃথক্ ইংরাজী গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতেছে। Darius যে তাঁহার সমসাময়িক মাগধ সম্রাট্ অজাতশক্রর বিদ্রোহাচরণ করিয়া পরে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহার দুই একটি প্রমাণ দিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

Smithএর "Ancient History"তে পাই—

"In the only example of an epitaph inscribed by a Persian King upon his own tomb, he (Darius) calls himself "Darius the great king, the King of the Kings, the King of all inhabited countries, the King of this great earth far and near, the son of Hystaspes." (p. 577)

Hystaspes যে কখনও রাজা হয়েন নাই, একথা সর্ব্বাদিসম্মত; আর Darius যে অন্য দু'জন পারসীকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের রাজা গৌমত বা Bardiyaকে গুপ্তঘাতকের ন্যায় হত্যা করিয়াছিলেন, ইহাও সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে তিনি কোন সূত্রে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন? দিগ্বিজয়-সূত্রে কি? তিনি যে গ্রীস ও তাহার পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করিতে পারেন নাই, তাহা সকলেই জানেন। আর তিনি যে Scythia জয় করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, সেই Scythia যে Black Sea'র পশ্চিমে অবস্থিত Lower Danube Valley'র ক্ষুদ্র দক্ষিণাংশ মাত্র, তাহাও সকলেই জানেন। তিনি সিন্ধুনদ পার হইয়া অজাতশক্রর রাজত্ব আক্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কথা তাঁহার ইতিহাসে নাই—আর অজাতশত্রু যে সমস্ত India, Farther India এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে অজাতশক্রর সমসাময়িক Darius সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেন কোন সূত্রে? তিনি ১। উত্তরাধিকার এবং ২। দিগ্বিজয় ছাড়া আর একটি মাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইতে পারিতেন, সে সূত্র হইতেছে —প্রাচীন বিশ্বসম্রাট্‌কে প্রকাশ্যে Suzerain বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মানসিক বিদ্রোহ।

এইরূপ মানসিক বিদ্রোহের দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। মাগধ সম্রাট্ ভানুগুপ্ত বালাদিত্য অত্যাচারী মিহিরকুলকে মালবদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত সম্রাটের অধীনস্থ মালবের শাসনকর্ত্তা যশোধর্ম্মা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া পরিচয় দিয়া মন্দাসারে এক প্রশস্তি খাড়া করিয়াছিলেন এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন, তিনিই মিহিরকুলের শাস্তি-বিধাতা। মানসিক বিদ্রোহমূলক এই মিথ্যা কথা হইতে আমরা পাইয়াছিলাম—ভানুগুপ্ত বালাদিত্য প্রকৃত বিশ্বসম্রাট্ ছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য যশোধর্ম্মা অন্যায় করিয়া তাঁহার পদবীর দাবী করিয়াছিল (১)।

(১) "প্রবর্ত্তক" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে—রাজপুতনার মরু প্রদেশের নগণ্য ভূম্যধিকারী নাগভটের গোয়ালিয়রের নিকটের সাগরতাল শিলালিপিতে। এই শিলালিপিতে তিনি বলেন—তিনি "বঙ্গপতিকে" পরাজিত করিয়াছিলেন এবং আনর্ত্ত (Asia Minor), মালব (Roman Empire), কিরাত (Khazar Country), তুরুষ্ক (Turkesthan) বৎস (Mesopotomia) ও মৎস্য (Merv) প্রভৃতি দেশের বহু পার্ব্বত্য দুর্গ নিজ অধিকারে আনিয়া বিশ্বজনীন বৃত্তি" অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিশ্বসম্রাট্‌রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই শিলালিপি হইতে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা গিয়াছে—আমরা পাইয়াছি, এই সময়ের "বঙ্গপতি" অর্থাৎ গৌড়েশ্বর দেবপাল প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বসম্রাট্ ছিলেন এবং তিনি তাঁহার সামন্ত খলিফা Al Mamun-কে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্য নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন, এবং উপরোক্ত দেশসমূহে Al Mamun-এর ৪০টি দুর্গ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে পুনরায় নিজ সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নাগভট দেবপালের সামন্ত ছিলেন এবং প্রভুর বিজয়কে নিজের বিজয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন (২)।

নাগভটের এই মানসিক বিদ্রোহের সহিত Darius এর মানসিক বিদ্রোহের একটু সাদৃশ্য আছে। Darius-এর Behistun Inscriptionএ তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশসমূহের তালিকায় India-র নাম নাই, তাঁহার অন্তিম Inscription, Nakshi Rustam-এ তাঁহার কবরের উপরের খোদা হইয়াছে এবং উহাতে India বা ভারতবর্ষকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীন বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ধরা হইয়াছে—তিনি Behistun Inscription খোদিত হইবার পরে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষবিজয় সম্বন্ধে হিরদতসের ইতিহাসে যাহা আছে তাহা হইতে তিনি বিনা বাধায় সিন্ধুনদ দিয়া নৌবাহিনী চালন করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহাতে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের অধীশ্বরের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল না।

কেহ যেন মনে না করেন—Darius-এর তথাকথিত India-বিজয় ক্ষুদ্র এক ভূমিভাগ-বিজয়; তাই উহার বিস্তারিত বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। Vincent Smith এই তথাকথিত ভারতবর্ষ-বিজয় সম্বন্ধে বলেন:—

"Darius was enabled to annex the Indus valley and to send his fleets into the Indian ocean......The conquered provinces were formed into a separate satrapy, the twentieth, which was considered the richest and the most populous province of the Empire. It paid the enormous tribute of 360 cuboic talents of gold dust, or 185 huudred weights worth wholly a million sterling and constituting about one third of the total bullion revenue of the Asiatic provinces." ("Early History" p. 37).

এই কথা হইতে পাওয়া যাইবে—Darius-এর India-বিজয় একেবারে কাল্পনিক। তিনি বলিতে চাহেন—তিনি মগধের সম্রাট্ অজাতশত্রুকে নিজ সামন্তশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন, তাই অজাতশত্রু তাঁহাকে প্রতি বৎসর "One million pounds"

(২) "প্রবর্ত্তক" জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

কর দিতেন এবং এই ভূতপূর্ব্ব বিশ্বসম্রাটের বিশ্বসম্রাট্-পদবী তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে বিজয়ের বর্ণনা হিরদতস সিন্ধুনদে নৌচালনের পরিশিষ্টরূপে তিনটি মাত্র শব্দে শেষ করিয়াছিলেন ("Subdued the Indians" Herod. (V, 44) তাহা যে Darius-কে তাঁহার প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্যের লভ্যের এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ্বসম্রাট্পদবীস্পর্দ্ধী একটি সামন্ত দান করে নাই, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আর 'Subdued the Indians" কথা দ্বারা যে হিরদতস সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজয়ের কথাই বলিতে চাহেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে পাওয়া যায়:—

"Of the Indians the number is far greater than that of any other race of men of whom we know, and they brought in a tribute larger than all the rest, that is to say three hundred and sixty three talents of gold dust, this the twentieth division."

ইহা "প্রমাণ" হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষ-জয়ের! এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া Darius-কে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারের সামান্য এক টুক্‌রা ভূমির জন্য তরমিম ডিক্রী দিলে চলিবে না; হয় এই প্রমাণকে অবিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে, নতুবা ইহাকে সত্য ধরিয়া লইয়া দিগ্বিজয়ী, প্রবলপরাক্রমশালী, শাক-প্রবর্ত্তক, সমগ্র India ও Farther India'র অধীশ্বর অজাতশত্রুকে Daruis-এর প্রণত সামন্ত সাব্যস্ত করিতে হইবে।

এই প্রমাণ বিশ্বাস না করিলে, Darius-এর ভারতবর্ষজয়ের মিথ্যা Suggestion হইতে বুঝিতে হয়—Darius-এর সময়ে একজন নৃপতি ছিলেন যাঁহাকে বিশ্বসম্রাট্ বলা যাইত, আর তিনি Darius হইতে ভিন্ন ব্যক্তি আমরা পাইয়াছি। অজাতশত্রুর পূর্ব্বপুরুষগণ বহু শতাব্দী হইতে বিশ্বসম্রাটের পদবী ন্যায়ানুসারে দাবী করিতে-ছিলেন এবং তিনি নিজেও সেই পদবী শুধু দাবী করিতেন এমত নহে, সেই দাবী বলবৎ রাখিবার জন্য এক রাজকুমারকে সিংহলে পাঠাইয়া ঐ দ্বীপ নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন, এবং সিংহল, Farther India ও Indiaতে শাকপ্রবর্ত্তন করিয়া এই সকল দেশে প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্যশক্তি পরিচালনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, Darius সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এ কথা যে মিথ্যা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং

"The Great King, the King of Kings, the King of all inhabited countries, the King of the Great Earth far and near"

এই বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে Daruis-এর বর্ণনা নহে, ইহা বিশ্বসম্রাট্ অজাতশত্রুর বর্ণনা।

অজাতশত্রু নির্বিবাদে Daruis-কে সিন্ধুনদ দিয়া নৌবাহিনী চালাইতে দিয়াছিলেন; ইহাতে বোঝা যায়, প্রথম জীবনে Daruis তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি অজাতশত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। তারপর মানসিক বিদ্রোহের বলে Daruis অজাতশত্রুর প্রভু হইয়াছিলেন. এবং তাঁহার স্থলে সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর সাজিয়াছিলেন। তাঁহার যে ইতিহাস আমরা পাঠ করি, তাহা হইতেই পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার ভারতবর্ষ-জয়ের কথা এবং বিশ্বসম্রাট্পদবী পাইবার কথা মিথ্যা। সে মোকদ্দমায় পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকগণের বিচারে ভারতবর্ষীয় সম্রাটের বিরুদ্ধ পক্ষের

জয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য হিরদতস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ইউরোপীয় ঐতিহাসিকই Darius-এর মিথ্যা উক্তিসমূহকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

Cyrus-এর পুত্র Cambysesকে ইজিপ্টে অমানুষিক অত্যাচার করণের অপরাধে রাজ্যচ্যুত করিয়া মাগধ সম্রাট্ (Magian Padshah) Cyrus-এর অপর পুত্র Bardiayকে Cyrus-এর সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং এতৎসম্বন্ধে তাঁহার দূত দ্বারা প্রেরিত আদেশ ইজিপ্ট ও পশ্চিম আসিয়ার সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত পালিত হইয়াছিল। ইহাতে কি পাওয়া যায় না—Cyrus the Greatও অজাতশত্রুর সামন্ত ছিলেন, এবং Cyrus কর্ত্তৃক অবিজিত ইজিপ্টেও এই মাগধসম্রাটের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল?

কিন্তু বিচারক যেখানে গোড়া হইতে একপক্ষকে ডিক্রী দিতে কৃতসঙ্কল্প সেখানে যুক্তিতর্ক বিফল হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং মিথ্যা প্রমাণ মিথ্যার ছাপ কপালে লাগাইয়াও মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। যে mentality'র বশবর্ত্তী হইয়া Naksh-i-Rustam'এ Darius নিজেকে বিশ্বসম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—সেই mentality'র বলেই মন্দসোরে যশোধর্ম্মা এবং সাগরতালে নাগভট বিশ্বসম্রাট্ পদবীর দাবী করিয়াছিলেন। পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকগণকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করুন—তাঁহারা বলিবেন, এই তিন দাবীর কোন দাবীই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ভারতসম্রাট্রূপ নিকৃষ্টজীবকে আক্রমণ করিতে যে কোন অস্ত্র হাতের নিকট পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট; তাই পশ্চিমদেশীয় ঐতিহাসিকগণের কৃপায় Naksh i-Rustam-এর মিথ্যা কথা, মন্দসোরের মিথ্যা কথা ও সাগরতালের মিথ্যা কথা অদ্যাপি মাথা তুলিয়া মানুষের মতিভ্রম ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুধীবর্গ গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করুন, স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করুন; মিথ্যার ভিতর হইতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, বিশ্বব্যাপী প্রাচীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইবে, সত্যের জয় হইবে।

নারায়ণ

[বারিদবাসিনী দেবী]

সদা মোর কাছে কাছে থাক তুমি শুভঙ্করায়,
চলে গেছে প্রিয়তম স'পে দিয়ে রাঙা পায়।
আগে যে কমল-মালা দিয়াছিনু প্রিয়গলে,
আজ সেই শুষ্কমালা তব ওই গলে দোলে।

এলে কি দয়িতরূপে তুমি হে অখিল স্বামী!
কি দিয়ে পূজিব নাথ বড় যে দরিদ্র আমি।
দারুণ ব্যথায় ভরা বিষাক্ত এ মন প্রাণ,
স'পিলাম ও চরণে, ক'র না গো প্রত্যাখ্যান।
নিরাশার নিপীড়নে যদি ভুলে যাই পথ,
দেখা দিয়ে সেইকালে, পুরাইও মনোরথ।

* * *

সন্তবামি

(উপন্যাস)

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

৪

ধরিত্রী আজ এতদিন পরে শশীশেখরের কাছে নিষ্ঠুর নিরানন্দময় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। যে-মা তাহার মরিয়া গেছে, সে আর আসিবে না। এতদিন সে বৃথাই তাহাকে ডাকিয়াছে। মরে যাহারা, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াই মরে।

ওই একটিমাত্র আশা এবং বিশ্বাসই এতদিন শশীশেখরকে তাহার দুঃখের কথা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল; আজ আর তাহার সে-বিশ্বাস নাই,—মা'র সঙ্গে তাহার আর দেখা হইবে না—সে-কথা সত্য। মামীমার দেওয়া লাঞ্ছনার কথাটাই তাই আজ শশীশেখরের বড় বেশি করিয়া মনে পড়ে। যে-মামা তাহাকে একদিন ভালবাসিত, সেও আজ আর তাহাকে ভালবাসে না, রামায়ণখানি সে তাহার নিজের হাতে পুড়াইয়া দিয়াছে। সে-দৃশ্য সে তাহার জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না। মা'র স্মৃতির মধ্যে ওই রামায়ণখানিই ছিল তাহার সম্বল। সে-সম্বল আজ আর নাই। রামায়ণখানির পাতায় পাতায় মা'র আঙুলের ঘামের দাগ লাগিয়া ছিল, মা'র নিজের হাতের লেখা নাম ছিল,—সেগুলির উপর কতবার সে চোখ বুজিয়া হাত বুলাইয়া বুলাইয়া মা'র কথা ভাবিয়াছে, আজ আর তাহার ধরিবার ছুঁইবার কোথাও কিছুই নাই।

শশীশেখরের দিন যেন আর কাটে না। মামীমার অত্যাচার এখনও সমানে চলিতেছে, সেণ্টু মেণ্টু দেখা হইলেই তাহাকে ভেংচি কাটে, তাহাকে দেখিবামাত্র দু'ভাইএ তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, তাহার দিকে না তাকাইয়া আপনমনেই বলাবলি করে,—'আচ্ছা বল্ ত' দেখি মেণ্টু,—রামায়ণখানা কেমন দাউ দাউ করে' পুড়লো!' মেণ্টু হাসিয়া হাসিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়ে, বলে,—'আর সেই কান-মলাটা দাদা, আর সেই ঠাস্ করে' মাথার ওপর……'

বলে আর দু'জনেই হাসে।

মামা আর তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। দেখা হইলে আগে যে-মামা তাহার আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া কথা বলিত, সেই মামাই আজ তাহার মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

শশীশেখরের এখানে আর একদণ্ডের জন্য মন টেঁকে না; মনে হয়, এখান হইতে সে চলিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে। কিন্তু কোথায় যাইবে? পিসিমার কাছে গেলে সেও হয়ত আবার তাহাকে এইখানেই ধরিয়া আনিবে।

এই সব চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া শশীশেখর মুখ ভারি করিয়া দিবারাত্রি নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায়। রামায়ণখানিও নাই যে, মন খারাপ হইলে তাহাই লইয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া পড়িতে বসিবে।

ঘরে যে শশীশেখর বলিয়া আর-একটি ছেলে আছে তাহা আর বুঝিতেই পারা যায় না। খাইবার সময় চোরের মত নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর গিয়া যাহা পায় তাহাই চারটি খাইয়া আসে। সেণ্টু মেণ্টু টিট্‌কারি দেয়,—সে-সব আজকাল সে আর শুনিয়াও শোনে না, মামীমা তিরস্কার করে, শশী-শেখর অপরাধীর মত মাথা হেঁট্ করিয়া শোনে, ইস্কুলে যায়, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া বইগুলি গুছাইয়া রাখিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া উদাস-দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে। সেণ্টু মেণ্টু সরাসর তাহাদের দিদির কাছে গিয়া খাবার খায়, শশীশেখরের সে অধিকার কোনোদিনই নাই। আগে যদিই বা ভবেশের ভয়ে কনকবরণী তাহাকে যাহাহোক্ কিছু খাইতে দিত, আজকাল আবার তাহাও দেয় না, বেচারা শশীশেখর সেই যে বেলা দশটার আগে চারটি ভাত মুখে দিয়া ইস্কুলে যায়, ফিরিয়া যখন আসে ক্ষুধায় তখন তাহার আর জ্ঞান থাকে না, চোখের সুমুখে সব-কিছু যেন ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা মনে হয়, উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ওঠে, তাই কোনো-কোনোদিন সে আর জানালার ধারে বসিয়া থাকিতেও পারে না, মেঝেয়-পাতা তক্তাপোষটার উপর শুইয়া মার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

এম্‌নি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে, এমন দিনে তাহার পিসিমার কাছ হইতে একজন বাগ্‌দীর মেয়ে শশীশেখরকে একদিন লইতে আসিল। বলিল, তাহার পিসির নাকি ভারি অসুখ, বাঁচে কিনা সন্দেহ, সুতরাং তাহাকে একবার যাইতে হইবে।

ভবেশ বলিল, 'বেশত', যাক্ না!'

কনকবরণী ঠোঁট্ উল্টাইয়া বলিল, 'বলিহারি! বেশত', যাক্ না! এম্‌নি না হ'লে তোমার এমন হবে কেন বল? এমন হাঁদা-গঙ্গারাম লোক আমি কখনও দেখিনি।'

ভবেশ ত' অবাক্!

—'কেন গো, কি হলো কি?'

কনকবরণী বলিল,—'তুমি নিজেও যাও। ঠাকুরঝির গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি নাহয় গুণধর ভাগ্‌নে খেয়েছে, কিন্তু ও-বুড়ীরও ত' কিছু আছে! বুড়ী যদি মরেই যায়!'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল, 'ও!'

বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'অসুখ হয়েছে, ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছে, ও-ই যাক্, আমি আবার কেন?'

কনকবরণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়। সেই এককথাই সে বারে-বারে বলিতে লাগিল,—'যদি মরে' যায় ত' তখন পস্তাতে হবে দেখো।'

ভবেশ অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বলিল, 'মানুষের অসুখ হ'লেই সে মরে না। একান্তই যদি মরে ত' পরে আবার গেলেই চলবে।'

কিন্তু কনকবরণী কিছুতেই বুঝিল না। বলিল,—'হ্যাঁ, যে-ছেলেকে পাঠাচ্ছ, পরে গেলে আবার পাবে নাকি কিছু? তখন কিছু রাখলেই ত! তার চেয়ে এই সঙ্গেই যাও, যদি ছাখো, ভাল আছে তখন নাহয় ফিরে' এসো।'

অগত্যা শশীশেখরকে সঙ্গে লইয়া ভবেশকেই যাইতে হইল।

গিয়া দেখে, কনকবরণীর কথাই ঠিক্। পিসিমার তখন অন্তিম অবস্থা। মুখ দিয়া কথা বাহির হয়

না, শশীশেখর ও ভবেশকে দেখিয়া বুড়ী প্রথমে চিনিতেই পারিল না, পরে চিনিল যখন, চোখ দিয়া তখন তাহার দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে।

ডাক্তার-কবিরাজ দেখানো হয় নাই, প্রতিবেশী কয়েকজন দয়া করিয়া দেখাশোনা করিতেছিল।

শশীশেখর দেখিল, আবাল্য-পরিচিত তাহার সেই বাড়ী! যেখানে তাহার মা মরিয়াছে, ঠিক সেইখানেই আবার তাহার পিসিমা মরিতেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। ভাবিল, বুড়া কবিরাজকে একবার ডাকিলে হয়। কিন্তু কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবে, আর কেই বা তাহার টাকা দিবে? ভাবিল, তাহার মা'র মৃত্যুর সময় কবিরাজকে সে ডাকিতে চাহিয়াছিল, এই পিসিমাই তাহাকে ডাকিতে দেয় নাই, আজ তাহার অসুখের সময় সেই-বা কবিরাজকে ডাকিতে যাইবে কেন? কবিরাজের ঔষধ খাইয়া পিসি যদি তাহার সারিয়া ওঠে, তাহা হইলে তাহার আর আফ্‌শোষের বাকি কিছু থাকিবে না। মনে হইবে, কবিরাজকে ডাকিলে মাও হয়ত' তাহার বাঁচিতে পারিত।

কিন্তু তবু কেন না জানি ক্রমাগতই তাহার মনে হইতে লাগিল, বুড়ী পিসিমা তাহার কষ্ট পাইতেছে, আহা, কবিরাজকে একবারটি ডাকিলে হয়, ডাকিলে হয়!

ভবেশ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, শশীশেখর ঘন-ঘন তাহার মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। ভয়ে কিছু বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। শেষে অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে মামার আর-একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া মরীয়া হইয়া শশীশেখর বলিল, —'কোব্‌রেজ্‌কে ডাক্‌ব?'

বলিয়াই সে মাথাহেঁট করিল।

ভবেশ একবার এদিক-ওদিক তাকাইল। দেখিল, তাহার পশ্চাতে প্রতিবেশী জন-দুই ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। এবং কয়েকটি মেয়ে ঘোম্‌টা টানিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে।

প্রতিবেশী দুইজন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—'কোব্‌রেজ আর এ-সময়……' বলিয়াই একজন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তার চেয়ে একটুখানি গঙ্গাজল—'

সমবেত মেয়েদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আনি।'

বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে বোধকরি গঙ্গাজল আনিবার জন্যই নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু গঙ্গার জল যখন আসিল, বুড়ীর তখন সব শেষ হইয়া গেছে। মেয়েটা বাহির হইয়া যাইবার পর হইতেই বুড়ী খাবি খাইতেছিল, তাহার পর অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে মুখখানা বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুস্থির করিয়া দিল, মরণের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবার চেষ্টা করিয়াও জয়লাভ করিতে পারিল না। বুড়ী মরিল।

শশীশেখর অনেকক্ষণ হইতেই কাঁদিতেছিল। অনেকদিন পরে ভবেশ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'চুপ কর্, কাঁদিস্ নে।'

শশীশেখর যদি বা আপনা হইতেই চুপ করিত, বুড়ী পিসিমার জন্য এত বেশি দুঃখ তাহার হয় নাই, কিন্তু বহুদিন পরে মামার স্নেহের স্পর্শে তাহাকে আরও কাঁদাইয়া দিল। মামার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া শশীশেখর যেন অভিমান করিয়াই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ীর মুখাগ্নি করিল শশীশেখর। শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য আবার তাহারা আসিবে বলিয়া পরদিন সকালে শশীশেখরকে লইয়া ভবেশ তাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

কনকবরণী উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ভবেশ বলিল, 'মরে গেছে।'

কনকবরণী হাসিয়া বলিল, 'বলেছিলাম না!'

ষ্টেশন হইতে একজন মুটে তাহার মাথার উপর একটা বাক্স লইয়া আসিয়াছিল। কনকবরণী জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কার?'

ভবেশ বলিল,—'বলছি, চল।'

বলিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ভবেশ কহিল, 'ডাকো শশীকে।'

কনকবরণীর মুখের চেহারা হঠাৎ একটুখানি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। বলিল, 'শশীকে কেন?'

ভবেশ বলিল, 'ছিছি, মিছেমিছি ছেলেটাকে তখন তোমরা সবাই মিলে দোষ দিলে। আমি বলেছিলাম না, বুড়ী-মাগী শয়তানের একশেষ। বুড়ীকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরে' এসে ভাবলাম, দেখি, কি আছে না-আছে। বাক্স খুলে দেখি, সবই রয়েছে, শশীর মা'র গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি, যা-কিছু ছিল সবই রয়েছে,—অথচ বুড়ী বললে কিনা—ছিছি, তুমিও তাইতে সায় দিয়েছিলে। তুমিও বিশ্বাস করেছিলে।'

অন্য সময় হইলে কনকবরণী কি যে বলিত কে জানে, আজ আর সে অতগুলি গহনা টাকাকড়ির নামে মুখে কিছুই বলিল না। বাক্সটার কাছে গিয়া একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া বারে বারে শুধু জিনিসপত্রগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভবেশ বলিল, 'থামো, অত তাড়াতাড়ি কেন, তোমার কাছেই ত সব থাকবে।'

এই কথাটাই সে শুনিতে চাহিতেছিল। শুনিয়া প্রাণপণে তাহার দেখিবার আগ্রহ দমন করিয়া কনকবরণী চলিয়া গেল।

গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'হ্যাগা, ঠাকুরঝির মাথায় চারটে সোনার ফুল ছিল না?'

ভবেশ বলিল, 'কি জানি বাপু, ফুল-টুল জানিনে,—যা ছিল তাই নিয়ে এসেছি। দেখে মনে হলো—আর বিশেষ-কিছু ছিল না।'

কনকবরণী বলিল, 'তাই-বা তুমি জানলে কেমন করে'? তুমি ত' আর দাওনি, দিয়েছিলেন আমার শ্বশুর।'

ভবেশ ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

—'তবে?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কনকবরণী আবার চলিয়া গেল।

সেদিন খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভবেশের আর নিস্তার রহিল না। বারে বারে শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন—'ঠাকুরঝির ফুল চারটে ছিল। বুঝলে? আমার যেন মনে হচ্ছে। আর গলায় একগাছা সুঁৎ-হারও যেন দেখেছিলাম।'

ভবেশ বলে, 'তা' হবে।'

কনকবরণী বলে, 'বা! হবে কি রকম! হবে ত সে-সব গেল কোথায়?'

গত রাত্রে ভবেশের ভাল ঘুম হয় নাই, স্নান করিয়া আহারাদির পর তাহার ঘুম পাইতেছিল, তেমনি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষেই জবাব দিল, 'যাবে কোথায়? আছে—সবই আছে ওই বাক্সের মধ্যে। রাত্রে দেখাব। এখন যাও, একটুখানি—'

বলিয়া সে ঘুমাইবার জন্য চোখ বন্ধ করিল।

কনকবরণী তবু থামিল না। বলিল, 'তবে আর ছেলেটাকে সাধু বললে কি হবে? সে-সব তা'হলে গেল কোথায়? ওগো—শুনছো?'

বলিয়া নিদ্রাকাতর স্বামীকে তাহার খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া কনকবরণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'খালি ঘুম আর ঘুম! নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি তবে আর কাকে বলেছে! শুনছো?'

সদ্যঘুমন্ত মানুষকে এমন করিয়া বিরক্ত করিলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ভবেশ রাগিয়া বলিল,—'আঃ! আছে বলছি বাক্সর মধ্যে...'

কনকবরণীও তেমনি জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল, 'না—নেই। নেই বাক্সের মধ্যে।'

ভবেশের ঘুম ছুটিয়া গেল। চোখ খুলিয়া বলিল—'নেই তা' তুমি জানলে কেমন ক'রে?'

কনকবরণী এবার ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, 'দেখলাম। এই যে, এই চাবিটা দিয়ে খোলা গেল।'

বলিয়া সে তাহার আঁচলের খুঁটে-বাঁধা চাবির গোছাটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ভবেশ বলিল, 'ভারি অন্যায় হয়েছে তোমার। ও-জিনিষ শশীশেখরের, তা জানো?'

স্বামীর ভাব-গতিক তাহার ভাল বলিয়া মনে হইল না। গম্ভীরমুখে বলিল,—'জানি।'

ভবেশ বলিল, 'জানো ত খুললে কেন শুনি?'

'কেন, খুলেছি ব'লে কি ফাঁসি শূলি হবে নাকি?'

ভবেশ এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঘুম তখনও তাহার ভাল করিয়া কাটে নাই। হঠাৎ সে ঘুমের ঘোরেই বলিয়া বসিল, 'শশী যদি তোমায় চোর বলে? তুমি যেমন একদিন বলেছিলে সে গিনি চুরি করেছে!'

কনকবরণী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, কী! আমি তা'হলে মিছে কথা বলেছিলাম? গিনি সে চুরি করে নি?'

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল।

কনকবরণী তাহাকে আবার নাড়া দিয়া বলিল, 'বল! চুপ করে' রইলে যে? চুরি করে নি?'

ঘাড় নাড়িয়া ভবেশ বলিল, 'না।'

কনকবরণীর আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, সে তাহার চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

শিয়রের কাছে কোনও নারী যদি বসিয়া বঁসিয়া কাঁদে ত' অতি বড় পাষণ্ডেরও চোখের ঘুম ছুটিয়া যায়।

ভবেশেরও তাহাই হইল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিয়া হাত বাড়াইয়া কনকবরণীর কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদছ?'

ঝাঁকানি দিয়া স্বামীর হাতখানা সে তাহার কাঁধ হইতে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, 'যাঃ-ও!'

ভবেশ ভালমানুষ, কিন্তু বোকা নয়। স্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা তাহার বাড়িল না। কিছুদিন হইতে ভিতরে ভিতরে সবই সে বুঝিতেছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে নাই। এইখানেই তাহার দুর্ব্বলতা। এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কনকবরণীর স্বেচ্ছাচারিতার আর সীমা ছিল না। তাহাও সে জানে।

কিন্তু মানুষের মন। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেই বা কতক্ষণ! একান্ত স্বার্থপর এই নারীটির বিরুদ্ধে ভবেশের মন সহসা তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাও তুমি? 'কি করলে তুমি সুখী হও বল ত?'

কনকবরণী জবাব দিল না।

ভবেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল। এবার বেশ জোরে-জোরে। বলিল, 'শশীকে তাড়িয়ে দেবো বাড়ী থেকে?'

কনকবরণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তাই যেন আমি বলছি?'

বলিয়াই আবার কান্না। 'তা' না ত' কী! কী বলছ? কি বলতে চাও?'

কনকবরণী বলিল, 'কিছু না। তার চেয়ে আমি চলে যাই।'

ভবেশ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, 'যাও।'

কনকবরণী বলিল, 'যাবই ত! তোমার মত শয়তানের ভাত আমি আর খাব না।'

স্ত্রীর মুখে ভবেশ অনেক কথাই শুনিয়াছে, কিন্তু এমন কথা এই প্রথম। বলিল, 'কি বললে? শয়তান?'

ঘাড় নাড়িয়া কনকবরণী বলিল, 'হ্যাঁ।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া গুম্ হইয়া ভবেশ হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

কনকবরণীর কান্নার বেগ বোধকরি এতক্ষণ একটুখানি প্রশমিত হইয়াছিল, বলিল, 'ঢং করে গুণের ভাগ্‌নেকে সেদিন তাহ'লে মারলেই বা কেন, আর রামায়ণখানা পুড়িয়েই বা দেওয়া হলো কেন, বিশ্বেস্ যদি কর নি?'

কোনও জবাব না দিয়া ভবেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়েই দৈবক্রমে সুমুখের বারান্দা দিয়া পার হইতেছিল—শশীশেখর।

ভবেশ ডাকিল, 'এই শশী, শোন্!'

শশীশেখর বিষণ্ণমুখে কোঁচার খুঁটখানি গায়ে দিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাতের ইসারায় ভবেশ বলিল, 'এগিয়ে আয়!'

শশীশেখর আগাইয়া একেবারে তাহার হাতের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ভবেশ সজোরে তাহার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে না তাকাইয়াই থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি যে বলিবে কিছুই সে প্রথমে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পরে বলিল, 'বল্ তুই তোর মামীর গিনি চুরি করেছিলি কি না!'

ভয়ে-ভয়ে শশীশেখর একবার তাহার মামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'না।'

ভবেশ বলিল, 'এখনও—না'?'

শশীশেখরের চোখ দুইটা তখন ছল্ ছল্ করিতেছিল। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, 'নিই নি যে।'

ভবেশের রাগ যেন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। বলিল, 'নিস্‌নি হারামজাদা? নিশ্চয় নিয়েছিস্।'

শশীশেখর আবার বলিল, 'না।'

ভবেশ কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, 'বল্—বল্, পাজি ষ্টুপিড্, বল্ যে, হাঁ নিয়েছি। না নিলেও বল্‌তে হবে তোকে —বল্।'

বলিতে বলিতে ভবেশের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া মুখখানা সহসা লাল হইয়া উঠিল, চোখের কোণে জল দেখা দিল।

কনকবরণী বলিল, 'পাগল হ'লে নাকি? ছি!'

ভবেশ আবার চেঁচাইয়া উঠিল, 'তুমি চুপ কর।'

বলিয়াই সে আর একবার শশীশেখরের হাতে খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, 'এখনও বল্‌লি'নে হতভাগা! বল্!'

শশীশেখরের মাথার ভিতরটা এবার ঘুরিতেছিল। ব্যাপার কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সজলচক্ষে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল।

ভবেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিমিষের মধ্যে হাত বাড়াইয়া নিজের একপাটি চটি জুতা তুলিয়া লইয়া কম্পিত শশীশেখরের মাথার উপর পট্ পট্ করিয়া সজোরে বসাইয়া দিয়াই সে তাহাকে

ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—'যা বেরো আমার সুমুখ থেকে। বলবিনে ত' বেরো!'

বলিয়াই সে জুতাটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল, তাহার কাপড়ে গেঞ্জিতে কাঁচা রক্তের দাগ!

রক্ত দেখিবামাত্র ভবেশের পাগ্‌লামি ছুটিয়া গেল। শশীশেখরকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গিয়াও ধরিতে পারিল না। টাল্ খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে সাম্‌লাইয়া লইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেটা তখন ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভবেশ তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত চটি-জুতাটা আবার তুলিয়া লইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার তলাটা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, সেখানে একটা ধারালো পেরেক্ উঠিয়াছে।

ছি ছি, রাগের মাথায় এমন করিয়া মারা হয় ত তাহাকে উচিত হয় নাই।

কনকবরণী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ভবেশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিট্‌মিট্ করিয়া বলিল, 'হলো ত'? মনস্কামনা পূর্ণ হলো ত' এবার?'

বলিয়াই সে ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া ডাকিল, 'শশী! শশী!'

কোনও সাড়া না পাইয়া সে রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচে তাকাইয়া দেখিল—শশী নাই।

হয় ত' সে নীচের কোনও ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। ভবেশ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু কোথায় শশী! নীচের কোনও ঘরেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

সদর দরজায় গিয়া ভবেশ আবার ডাকিল—'শশী!'

শশী সেখানেও নাই।

উন্মাদের মত ভবেশ এবার খালি পায়েই রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। এ-দিক-ওদিক তাকাইয়া ডাকিল, 'শশী! শশী!'

নরু চাকরটা নীচের একটা ঘরে মেঝের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। বাবুর ডাক শুনিয়া সেও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ভবেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেণ্ট মেণ্টু ইস্কুলে গিয়াছে। বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ।

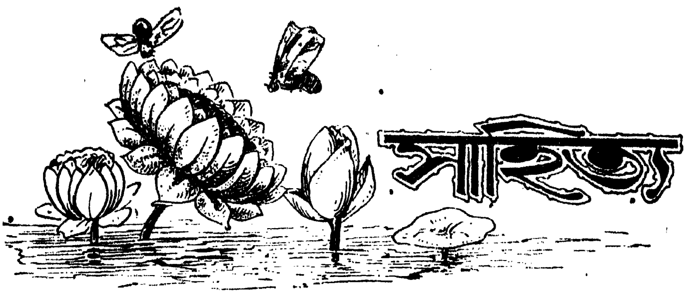
নরুর মুখের পানে তাকাইয়া ভবেশ বলিল, 'দ্যাখ্ ত' বাবা—শশী কোথায় গেল দ্যাখ্ ত!'

নরু সোজা রাস্তা ধরিয়া ঘুমের ঘোরেই ছুটিয়া চলিল।

ভবেশ রাস্তার মাঝখানে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় রাস্তার দিকের বারান্দার চিক্ ফাঁক করিয়া কনকবরণী ডাকিল, 'এসো।'

কথাটা ভবেশ শুনিতে পাইল কি না, কে জানে। দেখা গেল, সে তখন নিবিষ্টমনে তাহার কাপড়ের উপর কাঁচা রক্তের দাগগুলা পরীক্ষা করিতেছে আর চোখ বহিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

(ক্রমশ)



দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

(৬)

[ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ সম্বন্ধে দেশে সাধারণতঃ যে জাড্য ও আলস্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবার আশা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, কিন্তু সে আশা বুঝি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। ভারতবর্ষের একাঙ্গীভূত প্রায় সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ভারতবিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে স্থানীয় ভারতবাসিগণ বলিতেছেন, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষগণের শুধু নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত নয়, প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাও আছে। ধী শক্তি, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি ফলে ভারতবাসী যেখানে গিয়াছে, সেখানে সোণা ফলাইয়াছে; সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় এই সাফল্যই ভারতবাসীর বিপদের কারণ হইয়াছে এবং ঈর্ষা-কষায়িত প্রবল দল তাহার শত্রুতা সাধন করিতেছে। "Go back to India" (ফিরে যাও ভারতবর্ষে) কথা ব্রহ্মদেশীয় রাজবিদ্রোহের মুখেও শুনিতেছি। একথা বিদ্রোহীর মুখের কথা কিম্বা অপর মুখের কথা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ফলতঃ, এ কথার মূলে অসঙ্গত ভারত-বিদ্বেষ। মালয় প্রদেশে (Malaya) ভারতবাসী ধীরে ধীরে নিজ প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতেছিল, সেখানেও একথা উঠিতেছে। পীনাং'এ একথা উঠিতেছে, পূর্ব্বাঞ্চলে যেখানে যেখানে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও ধর্ম্মপ্রচার সম্পর্কে ভারতবাসী গিয়া নিজ-অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেইখানেই বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে কিম্বা কেহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে। মালয় কনফারেন্সের সভাপতি ডাঃ মেলান সম্প্রতি এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকারের দাবী করিয়াছেন। এই মালয় প্রদেশে ধৃত ক্রীতদাস—তাহার মধ্যে ছিল অনেক ভারত-প্রবাসী, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম শ্রী-সৌষ্ঠব সম্পাদনের সহায়ক হইয়াছিলেন। পরযুগে ১৮৬০ সালের পর ভারতবাসীর স্রোতঃ নেটেলে যাইয়া সেই শ্রী-সৌষ্ঠব অধিকতর সম্পাদন করেন। এখন তাহাদের বংশধরগণও ঈর্ষানলের আহুতি-যোগ্য হইয়াছেন। যাহাতে তাহারা সে অনলে ভস্মসাৎ না হয়, সে চেষ্টা ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে চিরদিন করিতে হইবে। আশা ও সৌভাগ্যের কথা এই, যে 'প্রবর্ত্তক' পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনীর কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়াতে এ বিষয়ে ভারতীয় ভারতবাসীর ও গণ-নায়কগণের মনোযোগ অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতেছে। 'হিতবাদী', 'বসুমতী' প্রভৃতি সাধারণ মতের নায়কগণ 'প্রবর্ত্তকে'র এই চেষ্টার যথেষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে "মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদনে শিক্ষা ও রুচির প্রসারও দেখা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত রচনা হইতে চয়ন করিয়া রমণীয় চিত্র সাহায্যে বিস্মৃতপ্রায় আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর দুর্দ্দশার কথা অল্পবিস্তর আলোচনা হইতেছে।

পূর্ব্ব সংখ্যায় পরিচয় দিয়াছি, যে ভারতবাসীর অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে আলোচনার সম্ভাবনা আছে। কোথায় সে বৈঠক

বসিবে, ও ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন্ কোন্ প্রতিনিধি যাইবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এক দলের মত, ভারতবর্ষেই সে অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্য। যেখানেই সে বৈঠক বসুক, সাধারণ-মত-শক্তি প্রভূত পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া অধিবেশনের সাফল্যচেষ্টা প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ নাইডু সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The news of the shelving of the Transvaal Asiatic Land Tenure Bill will bring relief, although temporary, to the Indians here and especially in the Transvaal. It was generally agreed that the Bill was as deadly in its effects as the Class Areas of 1925, which was withdrawn, and ran counter to the spirit of the Capetown Agreement. It aroused a storm of protest, which found its re-echo in India. Same and intelligent opinion condemned it as a measure which would eventually make the lives of Indians in the Transvaal unbearable, and relegate them to locations."

Proceeding, Mr. Naidoo stated that, in view of the grave principles involved in the Bill, the South African Indian Congress was the first to ask for the holding of a further Round Table Conference between the Union and India.

'Happily' to the satisfaction of all," continued Mr. Naidoo, "a Conference is to be held in September next. Every Indian will earnestly hope that the meeting of the two Governments will afford avenues of solving the problem, and bring closer together the two countries in friendship aud goodwill."

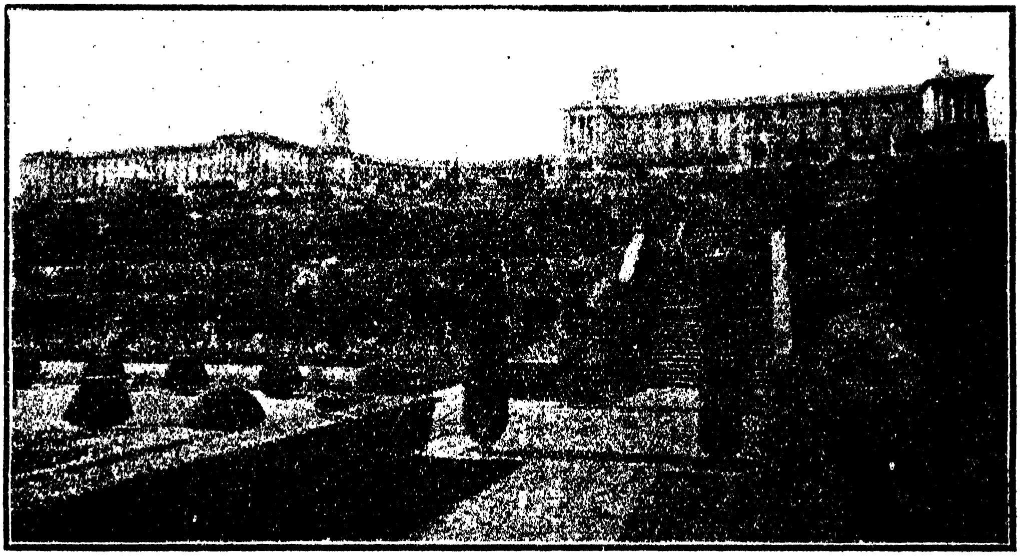
Mr. Naidoo said that with the ideal set before them in the "Uplift" clause of the Agreement made at Capetown, the Indians here would not be found wanting to fit themselves as useful people in South Africa, provided that the ideal was generously interpreted and made more and more practical by the ruling race.

"It is my sincere hope," said Mr. Naidoo, "which will, I believe, be shared by all that when the Conference meets, if the Agreement is to be scrapped, it will be replaced by a better and more enduring one. I cannot conceive why these two countries should not live in amity, and fulfil purposes which would more closely knit the ties of friendship that exist at present, due to the presence of the Agreement."

Indians are much concerned about certain clauses in the Asiatic Immigration Bill now before the House of Assembly and a comprehensive statement has been submitted to Dr. Malan regarding them by Mr. S. B. Medh honorary secretary of the Transvaal Indian Congress generally to the effect that they render entirely nugatory the protective value to Indians that Registration Certificates have hitherto possessed]

প্রিটোরিয়া সহরটি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ট্রেন্সভালের রিপাবলিকের প্রথম সভাপতি এন্, ডব্লিউ প্রিটোরিয়ানস্ (M. N. Pretorions)'এর নামেই অভিহিত হয়। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত প্রিটোরিয়া সহর ট্রান্সভালের রাজধানী ছিল। ১৯০০ সালে বোয়র যুদ্ধের অবসানে সহরটি লর্ড রবার্টস্ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। পরে ১৯১০ সালে সাউথ এফ্রিকান ইউনিয়নের Seat of Executive হয়, গভর্ণর জেনারেলের রেসিডেন্স হয়। মিঃ হারবার্ট বেকারের পরামর্শে Meintjes Kop পাহাড়ের উপর গ্রিসিয়ান স্থাপত্যপ্রথা অনুসারে অপূর্ব্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। গ্রেনাইট পাথরের ভিত্তির উপর ক্রিম এবং লাল রক্তবর্ণের অপূর্ব্ব সৌধে বিভিন্ন বিভাগে ম ও উচ্চ কর্ম্মচারিদিগের আবাসস্থান ও অফিস আছে। মেঞ্জিস কেপ্ পর্ব্বতের গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত নানা রকমের ফলফুলের বৃক্ষলতাশোভিত উদ্যানের মধ্যে স্থানে স্থানে কৃত্রিম ফোয়ারা ইত্যাদি দ্বারা কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে অতিশত আরামের স্থান হইয়াছে। অতি মনোরম টেরাস্ গার্ডেনের ভিতর দিয়া সম্মুখে এম্ফি-থিয়েটারের পথ।

ইহারই চারি পার্শ্বে ট্রাম গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সহজে তাহা দূর হইতে নয়নগোচর হয় না। সৌন্দর্য্য ইহাতেই শত গুণ বাড়িয়াছে। সুবিধার জন্য প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ ও নিম্ন অংশ হইতে ট্রামে পৌছিবার জন্য প্রচ্ছন্ন লিফট্ ও সুড়ঙ্গ পথ আছে। লর্ড সেলবোর্ন বলিয়াছিলেন, যে, এই প্রাসাদটি পৃথিবীর মনোরম হর্ম্মরাজির মধ্যে প্রধান। প্রিটোরিয়াতে বিদ্যালয় সকল আধুনিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, সন্নিকটেই নির্দ্দিষ্ট মিঃ ক্যাসিম এডামের গৃহে যাইয়া স্নান করিয়া আবার ভোজের উৎসবে পীড়িত হইতে হইল। বৈকালে ভারতীয় বন্ধে বয়োস্কোপে যাইয়া বক্তৃতাদি হইল। হিন্দী ভাষাতেই ভাবের আদান প্রদান শেষ করিয়া ফার্ষ্ট ইস্‌লাম ইনিষ্টিটিউটে যাওয়া হইল। মিঃ জে, এইচ্ মোহম্মদ নিজ অর্থ ব্যয়ে এই স্কুলটি করিয়া দিয়াছেন। বাড়ী ও সংলগ্ন বাগান সুন্দর; কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব এবং সাধারণ ভারত-



মেগ্নিস্‌কোপ পর্ব্বতোপরি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের অপূর্ব্ব উদ্যান-সংলগ্ন প্রাসাদ

দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করিতেছে; ট্রান্সভাল ইনিভার্সিটিতে আর্ট ও সায়েন্স কলেজ ও কৃষি বিদ্যালয় আছে; কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানে ভারত-বাসীর প্রবেশের সুযোগ নাই।

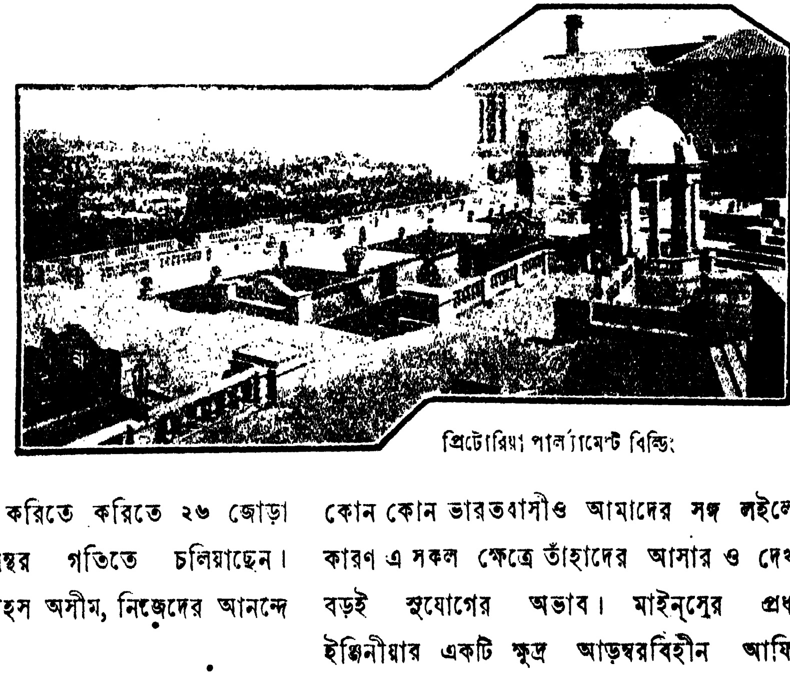
আমাদের প্রথমে মেয়মন্ লাইব্রেরীতে যাওয়া হইল, সেখানে মাল্যদান করিয়া প্রবাসী ভারত-বাসিগণ আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ বক্তৃতার ছড়াছড়ি হইল না। তারপর বাসীদের যেন প্রীতিরও অভাব মনে হইল। এই স্কুলটী "ইণ্ডিয়ান লোকেসানে"ই অবস্থিত। আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল—বাসস্থানগুলি বিশেষ আরামপ্রদ নহে, স্থানে স্থানে জঘন্যও বলা চলে। কয়েকজন ভারতীয় ও কাফ্রি রোগী ছিলেন। আমরা নিখিলকে প্রেরণ করিলাম। এক ঘরে একজন ভীষণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত—অবস্থা সঙ্গীন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এক

ফোঁটাও ঔষধ পড়ে নাই। অপর ঘরে একজন টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত, তাহারও অবস্থা এই রকম; কিন্তু চিকিৎসা অভাবে ঘরে পড়িয়া মরিলেও, দাতব্য নির্দ্দিষ্ট হাসপাতালে ইহারা যাইতে চাহে না—এ প্রহেলিকার শেষ কবে হইবে!

৫ই তারিখে গাড়ীতে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া জে, মোহাম্মদ সাহেবের মটর গাড়ীতে মিঃ জি, এস্ বাজপাই ও নিখিলকে সঙ্গে করিয়া হার্টজস্‌বেটস শ্রুট্ ড্যাম দেখিতে যাইলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। লেডি সেনহিল হোটেলের সম্মুখ দিয়া, যো হা ট হোটেলের পার্শ্ব দিয়া প্রায় যখন ২০ মাইল আসিয়াছি, তখন একটি বৃহৎ ক্যারাভান দেখিলাম — স্বামী ও গৃহিণী পুত্র কন্যা সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের ভার লইয়া চলন্ত আবাসগৃহের ব্যবস্থা করিতে করিতে ২৬ জোড়া গরুর সাহায্যে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। ইহাদের উদ্যম ও সাহস অসীম, নিজেদের আনন্দে নিজেরাই থাকে।

প্রায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানের নিকটে পৌঁছিলাম। অনুচ্চ পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রখর ইলেকট্রিক আলোকে আলোকিত অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ-পথ পার হইয়া আমরা ড্যামের অপরাংশে গাড়ী হইতে নামিলাম। নদীটী ছোট; রেনফোর্স্‌ড্ জমান অভিনব প্রাচীর দ্বারা পর্ব্বত-গাত্র হইতে জলের গতি ইচ্ছামত রোধ করিয়া সহরের জন্য জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং এই জলেরই বেগের সাহায্যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

পর দিবস ৬ই প্রাতে আমাদের ডেপুটেশনের স্যার জর্জ্জ পাডিসন্ ও লেডি প্যাডিসন নিখিল ও সৈয়দ রেজা আলি সাহেবকে লইয়া দেখা করিতে আসিলেন। কারণ আমি একাই মিঃ মোহাম্মদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বাকী সকলে সেলুনেই ছিলেন। প্রস্তুত হইয়া ২২ মাইল দূরে প্রিমায়ার ডায়মণ্ড মাইনস্ দেখিতে যাওয়া হইল

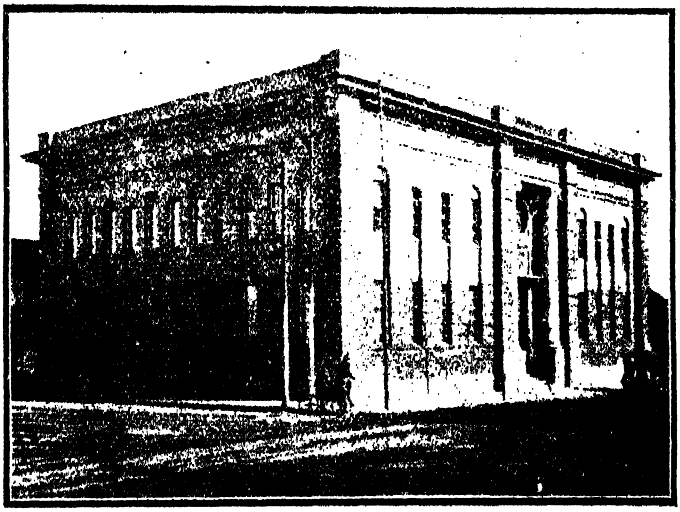


প্রিটোরিয়া পার্ল্যামেন্ট বিল্ডিং

কোন কোন ভারতবাসীও আমাদের সঙ্গ লইলেন, কারণ এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের আসার ও দেখার বড়ই সুযোগের অভাব। মাইনসের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার একটি ক্ষুদ্র আড়ম্বরবিহীন আফিসে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তথাপি স্বয়ং আসিয়া আমাদের গাড়ী হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রধান সহকারীকে আমাদের ঘুরাইয়া দেখাইবার ভার দিয়া সৌভাগ্য প্রকাশ করিলেন।

প্রথমে আমরা গ্রাইণ্ডিং রুমে গেলাম। এখানে কাফ্রি-কুলির সাহায্যে গুঁড়াইয়া কাঁচ বা

অপর কোন দ্রব্য হইতে হীরক বাছাই হইতেছে। তৎপরে আমরা ওয়াশিং রুমে গেলাম। এখানে দোদুল্যমান গলিত চর্ব্বি আচ্ছাদিত জলের দ্বারা ক্রমান্বয়ে বিধৌত বিকটশব্দকারী বড় বড় মঞ্চের শ্রেণী দেখিলাম। কোথাও এক একটি বড় ছোট কাঁচে মার্ব্বেলের ন্যায় পদার্থ জমাট চর্ব্বিতে আটকাইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রদর্শক বুঝাইলেন, যে হীরকই কেবল এই ভীষণ কম্পন সহ্য করিয়া চর্ব্বিতে লাগিয়া থাকিবে। অপর একজন একটি প্রকাণ্ড হাতলযুক্ত খোন্তার দ্বারা ঐ হীরকগুলি উঠাইয়া পরিস্কৃত করিবার স্থানে নিক্ষেপ করিল। আমাদের পরিদর্শন দিবসে ৪ ইঃ ব্যাস পরিমাণের একখানি হীরক পাওয়া গিয়াছিল। বেলা ১২টার সময়ে আমরা ব্লাষ্টিং দেখিতে গেলাম। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার কত নিম্নে জানি না, কুলি মজুরেরা কার্য্য করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন সত্যই পিপীলিকার সার মাটি বহিয়া ছোট ছোট ট্রলি গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে। একটি অতি বৃহৎ স্বাভাবিক গভীর উপত্যকা। স্থান-বিশেষে এত মাটি কাটা হইয়া গিয়াছে, যে বিপদ্-চিহ্নস্বরূপ রক্ত-পতাকা উড়াইয়া কর্ম্মিদিগকে বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। রোপ্-রেল সাহায্যে ইঞ্জিনীয়ারগণ সাবধানে উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরে আসিতেছেন। এই রোপ্-রেল সাহায্যে যে কেজ উঠিতেছে ও নামিতেছে তাহা চতুর্দ্দিক ঘেরা হইলেও, অপর কাহাকেও চড়িতে দেওয়া হয় না; কারণ এই অতি উচ্চ স্থান হইতে নীচে যাইতে যাইতে মাথা ঘুরিয়া দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইবারও ইতিহাস আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাইম-ফিউসযুক্ত ডিনামাইট ইত্যাদির সাহায্যে মাটি উড়াইয়া দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সহস্র সহস্র কুলি যথাযথ গহ্বরে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল এবং পর পর চারিদিক্ হইতে ভীষণ গোলাবর্ষণের ন্যায় শব্দ হইল এবং উত্থিত ধূম প্রায় সমগ্র স্থানটী আচ্ছন্ন হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া গা রোমাঞ্চিত হইল। ধূঁয়া কাটিয়া গেলে আবার পিপীলিকার সার দেখা দিল, আবার মাটী কাটাই ও ট্রলি বোঝাই করিয়া বিপুলকায় ষ্টীম-ক্রেমের সাহায্যে তারের টানে ট্রলি চলিতে লাগিল।



"করনার হাউস" -ডায়মণ্ড বিল্ডিং (এখান হইতে কোটী কোটী টাকার হীরক আমদানী ও রপ্তানী হয়)

এক একটি হীরক খনির কার্য্য এক এক অভিনব প্রথায় পরিচালিত হয়। একটি খনি দেখা হইলে সব খনি দেখা হইল, একথা কিছুতেই

বলা চলে না। প্রধান ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন ; কিন্তু আমাদের শীঘ্রই ফিরিতে হইল। প্রিটোরিয়া রোটারি ক্লাবের হেন্‌রী এডাম, জে, এ, গ্রে'র সহিত আলাপ হইল।"

অপরাহ্নে ভামিলিয়ান ষ্ট্রীটে 'বাস্‌টন লজে' গেলাম, তথা হইতে মিঃ পিলের সহিত লোকেসনে ওরিয়েন্টাল সিল্ক ষ্টোরে গেলাম। দোকানটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং বৃহৎ। দুঃখের বিষয় সমস্তই বিলাতী সিল্কের আমদানী। মালিকের সহিত ভারতীয় সিল্ক ব্যবহারের বিষয়ে আলাপ করিলাম, বড় বেশী আশা পাইলাম না; তথাপি ভারতের কয়েকটি বড় বড় দেশী সিল্ক ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়-পত্র দিলাম।



ওয়েসেল্‌টন হীরক-খনি

সাউথ এফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ফুটবলের দলের দলপতি মিঃ বাব মহারাজ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক পরিশ্রম করিলেন। এখন তাঁর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাঁর নিজের দেহও এখন খেলাধুলার উপযুক্ত নাই। মনে হয়, এখান হইতে অন্ততঃ একটি ফুটবল দল ইউনিয়নে যাইয়া ওখানকার উচ্চ দলের সহিত খেলাধূলায় ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির চেষ্টার প্রয়োজন। ক্রিকেটে, সাঁতারে, হকীতে, ফুটবলে, টেনিস ইত্যাদিতে এখানে বা বিলাতে সাফল্য লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ৪ঠা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখে ব্লুমফনটেনে এক সাউথ এফ্রিকান এমেচার এথেলেটিক এসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাউথ এফ্রিকান এম্পায়ার গেম্‌সের বিষয়ে বিষম বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরে স্থির হয়, যে "কলর বারের" জয় সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে হইবে এবং এই অভিপ্রায়ে ইউনিয়নের আধুনিক অবস্থানুসারে ভারতবর্ষ বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিস প্রভৃতি দেশ হইতে কোন খেলোয়ারকে এই প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। এমন কি, ইহা বজায় রাখিতে যদি অসভ্যতার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাও করিতে হইবে।

Bloemfontein, April 1931.

"At the annual meeting of the South African, Amateur Athletic Association the holding of the Empire games in S. A. in 1934 was discussed and it was decided to uphold the "Colour Bar" and in view of the conditions existing in the Union not to permit the Athelets from Countries like India and the West Indies to participate even at the risk of appearing to be discourteous."

সন্ধ্যার সময়ে ট্রেণে ফিরিয়া সান্ধ্য-ভোজন শেষ করিয়া পুনরায় জোহানেসবার্গে পৌছিলাম। পূর্ব্ব-৭ই সকাল ১০টার সময়ে দ্রুতগামী ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে কিম্বার্লি পৌছিলাম। অভিনন্দনের পালা শেষ করিয়া স্থানীয় মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নানা কথা আলোচনার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের ভারতবাসীর প্রতি অকারণ বিদ্বেষের কথা তুলিলাম। মুখে সহানুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেও, আসল কাজে তাহাদের চেষ্টার যথেষ্ট অভাব। ধীরে ধীরে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ করিতে না পারিলে, কোন পক্ষেই শ্রেয়ের সম্ভাবনা নাই।

৮নং ক্রাউড ষ্ট্রীটে মিঃ আহাম্মদ মহম্মদের



হীরকখনির সাধারণ দৃশ্য

পরিচিত বন্ধুগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত। যদিও অল্পক্ষণ পরে আমাদের পুনরায় কিম্বার্লির পথে দৌড়াইতে হইবে, তথাপি ইসমাইল কুভেডিয়া, খারস, টাভেরী ইত্যাদি বন্ধুগণ নাছোড়বন্দা। বৃদ্ধ কুভাডিয়ার বাড়ী গেলাম। শরীর আর বহে না, একথা কেই বা মানে.! নিখিলকে ফলবিক্রেতা টাভেরা জেহাঙ্গীর লইয়া গেল এবং ট্রেণ ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একরাশ আম, পিচ, আপেল ইত্যাদি ফল লইয়া আসিল—অত্যন্ত বিষাদভরে বিদায় লইল এবং পুনরাগমনের জন্য বার বার নিমন্ত্রণ করিল।

বাড়ীতে পুনরায় অভিনন্দন হইল। তৎপরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সহর প্রদক্ষিণ করিয়া এক তামিল অধিবাসীর চকোলেট ও লেমনেডের দোকানে যাওয়া হইল। ইঁহাদের পারিবারিক অবস্থা দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ হইল। এ প্রদেশে হীরকখনির ছড়াছড়ি, এমন কি চাষ করিতে করিতে অনেক ভাগ্যবান্ চাষী হীরক পাইয়াছে ও পাইতেছে। ওয়েসলটন ডায়মণ্ড মাইন্‌সের কার্য্য কতকটা বড় কয়লার খাদের প্রথা অনুসারে চলিতেছে। বিপুলকায় লিফ্‌টের সাহায্যে মানুষ ও খাদের মৃত্তিকা ক্রমাগত ভূ-গর্ভ হইতে উঠিতেছে, এবং

রেল ট্রলির সাহায্যে দূরে পুনরায় সংশোধিত হইতে চলিয়া যাইতেছে। কোথাও গোলোযোগ বচসা নাই, কলের মত নির্ভুলভাবে কার্য্য করিতেছে, ২০০০ মানুষও কলের মতই কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। কোথাও অবিশ্বাসের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিলাম না, কারণ কোথাও কোন পাহারার বন্দোবস্ত নাই। কোথাও কোথাও ১২০০ ফিট হইতে ৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত নীচে মাটি খোঁড়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে জলের প্রস্রবণ আসিয়া গভীর কূপের সৃষ্টি করিয়া শেষভাগে কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে, কোথাও বা আগ্নেয়গিরির অভ্যুত্থান হইয়া বিভ্রাট ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। এত পরিশ্রম ও কোটি কোটি অর্থব্যয় কতকাংশে বৃথা হইয়াছে। নানা প্রকারের খনি দেখিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া আমরা হীরকের ভাণ্ডারে গমন করিলাম। মিঃ চ্যাপমান অতি যত্নে বিভিন্ন রং ও গঠনের হীরক দেখাইলেন। লাল, সাদা, হল্‌দে, সবুজ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের স্বভাবচিত্রিত হীরক দেখিলাম। আজকাল দু'একটি হীরক পাওয়া গিয়াছে, যাহা রাজভাণ্ডারের হীরকের অপেক্ষা বড় এবং মূল্যবান্। জানি না, কত কোটি টাকা মূল্যের হীরক সেই আফিসে ছিল। এই দিবস ব্রিটিশ এজেণ্ট ৩২ লক্ষ টাকার হীরক কিনিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানেও একটিও প্রহরী দেখিলাম না। কারণ প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বিশ্বাসী ও যথেষ্ট বেতন পায়। উপরন্তু এ সকল হীরক যতক্ষণ না কাটিয়া পালিস্ হইতেছে, ততক্ষণ ইহার দাম বিশেষ কিছুই নাই। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এক টুক্‌রা হীরা কাটাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বৃদ্ধ মিঃ উলবার্গের গাড়ী চড়িয়া আরো খানিক ঘুরিয়া



প্রিটোরিয়ার সহরের একটী জনাকীর্ণ রাস্তা

আসিলাম। পথে তাঁহার সহিত আলোচনায় বুঝিলাম, যে তিনি জুদিগকে এবং এসিয়াটিক বিল এবং অপর পীড়নের ব্যবস্থা সকলকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন। রাত্রের ভোজন শেষ করিয়া সিটি হলের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে যাইতে হইল। মিঃ এম্ ম্যাকলিয়ড (এফ্রিকান পিপলস্ অর্গ্যানিজেশনের সহকারী সভাপতি), মিঃ জে, সি ষ্টেপনস্ (ন্যাশানাল বণ্ডের সহকারী সভাপতি), আইসাক্

পি জোস্থয়া এ, পি, ও সহকারী সভাপতি বক্তৃতা করিয়া সম্মানিত করিলেন।

৯ই প্রাতরাশের পর আমাদের সেলুন কেপটাউন অভিমুখী ট্রেণে যুড়িয়া দেওয়া হইল। বিখ্যাত মরুভূমি কারুর মধ্য দিয়া প্রায় সমস্ত দিন কাটিল। পথের দৃশ্য আদৌ মনোরম নহে। ক্রোশের পর ক্রোশ অনুর্ব্বর জমি পতিত রহিয়াছে, কোথাও কোথাও উইণ্ড-মিলের সাহায্যে জল তোলা হইতেছে। সামান্য লোকের বসতি বা চাষ দৃষ্টিগোচর হইল। গরম অত্যন্ত মনে হইতে লাগিল। ডার্ব্বানের পূর্ব্ব পরিচিত ফল-বিক্রেতা মিঃ দেশাই ও অপরাপর কয়েকজন বন্ধু প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধ হইয়াও বহু দূর হইতে আমাদের সহিত ষ্টেশনে দেখা করিলেন ও সুপক্ক সুমিষ্ট নানারূপ ফল দিলেন।

১০ই প্রাতে উচ্চেষ্টার ষ্টেশনে মিঃ প্যাটেলের বিদুষী কন্যা আসিয়া মালা দিয়া তাঁদের গ্রামের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। আমরাও তাঁহাদিগকে জলযোগ করাইলাম। ট্রেণ অল্প সময় দাঁড়াইলেও তাঁদের আন্তরিকতা আমাদের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই মেয়েটির বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট, কিন্তু সুযোগ অভাবে মনোমত শিক্ষালাভের সুবিধা পাইতেছে না। এ ভাবে কত নরনারী শিক্ষার অভাবে নিজেদের চির অন্ধকারেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছে—ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে পারে না? এ সকল বিষয়ে অপরাপর মেম্বরদিগের সহিত সর্ব্বদাই আলাপ আলোচনা চলিয়াছে এবং আমাদের ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।



সিটী হল ও রেলওয়ে ষ্টেশন—কিম্বার্লি

(ক্রমশঃ)



গ্রামের পথে

[আশ্রমী লিখিত]

যে জাতি পরাধীন হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে কোন কাজ সহজে হয় না। উত্তেজনার পর উত্তেজনার ঢেউ তুলিয়া কতদিন মানুষের প্রাণশক্তি সজাগ রাখা যায়! সেদিন চরকা, তকলি, তাঁতের ধূম পড়িয়াছিল, আজ তাহা কোথায়? প্রাবৃটের নদী যেমন কয়েকদিনের জন্য দুকূল হানিয়া শূন্য বালুচর-বুকে পড়িয়া থাকে, আমাদের সকল প্রকার উৎসাহ উত্তেজনা এইরূপ বর্ষার প্রবাহ ব্যতীত আর কিছু নয়। দোষ দিব কার? আমরা স্বখাত সলিলেই ডুবিয়া মরি।

'সঙ্ঘ' খাদিব্রতী। চিরদিনের ব্রত, উৎসাহে উত্তেজনার যুগে সহজে রক্ষা হয়; অন্য সময়ে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া বাঁচিতে হয়। খাদির মর্ম্ম মানুষ এখনও বুঝে নাই। কিন্তু হুজুগে বুঝাবুঝির বালাই থাকে না। সে উত্তেজনার দিনে পশ্চিম-বঙ্গে খাদির ক্ষেত্র স্থায়ীভাবে প্রস্তুত করার জন্য আমরা একটী ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করিয়াছিলাম।

বিলাতী সূতা না হইলে তাঁতীর তাঁত চলে না, কিন্তু সূতা সেদিন খরিদ করিবে কে? সত্যাগ্রহীর ধন্না ঠেলিয়া ব্যবসায়ী সূতা খরিদের ভরসা ছাড়িয়াছিল, তাঁতীর ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল। এই সুযোগে খাদির বুনান কার্য্য চালাইতে পারিলে, খাদির বিস্তারের সঙ্গে বেকার তাঁতীদের অন্ন-সংস্থানেরও উপায় হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামের দিকে আমরা হানা দিয়াছিলাম।

সূতার অভাবে তাঁতিদের যে বসিয়া থাকিতে হয় না, সে প্রমাণ আমরা করিয়াছি। আমাদের চটুল সঙ্ঘে যে পরিমাণে সূতা উৎপন্ন হয়, স্থানীয় তাঁতীদের যোগান দিয়া যথেষ্ট উপচিত হয়। এই-হেতু সূতা সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হয় নাই। কিন্তু দেশ পরাধীন, সে ব্যথার চেয়ে আমাদের রুচির দায় বড় হইয়া উঠিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্যে পড়িল—কাজ করিবার প্রবৃত্তি দেশের জন্মিয়াছে; কিন্তু আত্মম্ভরিত্বের প্রভাব এমনই, কর্ম্ম-সাফল্যের অপেক্ষা কর্ম্মী আত্মগরিমার দিকটায় যেন অধিক দৃষ্টি দেয়। এই খাদির কাজ আজ সেই হুজুগের সহায়ে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ যে বাড়িত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—যদি উৎসাহটা কর্ম্মিদের মুঠার মধ্যে না রাখিয়া যথাক্ষেত্রে তাহা নিয়োগ করা হইত। সকলেই চাহিয়াছিল—এই সুযোগে একটা কিছু করার যশঃ অর্জ্জন করিতে; খাদির কাজেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব হয় নাই। এই অন্ধতা হইতে আমরা যদি মুক্তি না পাই, তবে ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারময় হইবে।

খাদির কাজে বাহির হইয়া ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা ততখানি না হইলেও, পল্লীর পরিচয়

যেটুকু পাইয়াছি, তাহা গঠন-নীতিকের কাজে লাগিবে—আমরা তাহারই একটী সামান্য পরিচয় দিব।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি—পূর্ব্ববঙ্গে জোলারা যে কাপড় বুনে, তাহা অপেক্ষা এ দেশের তাঁতীরা ইহাতে যদি হাত দেয়, তবে তাহা উৎকৃষ্ট হইবে; ইহা ব্যতীত, এই সকল শিল্পীরা নানারূপ কাপড়ের পাড় বুনিতে পটু থাকায় খাদির উন্নতি ইহাদের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু খাদি-প্রীতি যতদিন না দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা অন্তর দিয়া গ্রহণ করেন, ততদিন ইহার সম্ভাবনা নাই। আজ আবার অবাধেই পূজার বাজারের জন্য মিহি সূতায় সর্ব্বত্রে তাঁত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; ব্যাপারী মহাজনের দাদন খাইয়া, বাংলায় এই সকল শ্রমজীবী রুচির দায়েই দেশের পায়ে কুড়ুল মারিতেছে। দায়ী দেশের শিক্ষিত শ্রেণী—তাঁহারা কি দেশের এই দুর্দ্দিনে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না!

তারকেশ্বর হইতে বি, পি, রেলে চড়িয়া গোপীনগর ষ্টেশনে নামিলাম। এই অঞ্চলে অসংখ্য তাঁত চলে, বিলাতী সূতায় পূজার বাজারে মিহি সৌখীন কাপড়ের চাহিদার মন যোগাইয়া এই সকল তাঁতীদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। এই সময়ে খাদি-প্রীতি প্রবল হওয়ায় উহাদের দিন অচল হইয়াছিল।



গোপীনাথের ভাঙ্গা মন্দির

ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইয়া মাঠের পরেই গ্রামের রাস্তা। মার্চ্চ মাসের শেষ শীতের জীর্ণপত্র বসন্তের বাতাসে ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে, পথ তো ঢাকা পড়িয়াছে; অধিকন্তু পথিকের সংশয় হয়, বুঝি ইহা পথ নয়। আমাদের মনে হইল—গভীর অরণ্যেই প্রবেশ করিতেছি। বাংলার পল্লী অরণ্যালয়ই বটে! বন্ধুটীর পরিচিত স্থান না হইলে আমাদের হয় তো আবার ষ্টেশনেই ফিরিতে হইত; কিন্তু তিনি এই নিশ্চিহ্ন শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত পথের উপর দিয়া আমাদের লইয়া চলিলেন। দুই দিকে ভীষণ অরণ্য। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী; কিন্তু বনের মধ্যে এমনই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, যে মধ্যস্থলে গহ্বর না থাকিলে উহার অস্তিত্ব নির্ণয় সম্ভব নহে।

তারপর কচুরি পানা, খুপি পানায় যেটুকু জল তাহাও আবৃত করিয়াছে। পথের ধারে ইষ্টক-প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইল। একটী প্রাচীন দেবমন্দির একদিন নবীন অতিথি বটকে বোধহয় বুকে আশ্রয় দিয়াছিল; আজ পুরুভুজের মত উহা তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। কত কথা মনে হইল—দুইশত তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হয় তো এই গ্রাম সমৃদ্ধশালী ছিল, কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার এই মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহাদের আর পরিচয় দিবার কিছুই নাই, সব লোপ পাইয়াছে। প্রেতমূর্ত্তি এই জীর্ণমন্দির আরও অনেকদিন তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আমাদের সঙ্গী বন্ধুটীর বাড়ী এই গ্রামে। তাঁর পল্লীবাসে পৌছিয়া গ্রাম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলাম। বন্ধু বলিলেন—গ্রামখানি আদিতে ক্ষুদ্রই ছিল, মধ্যে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল, পরিণামে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামের ইতিহাস জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। বন্ধু কহিলেন, অন্য সকল গ্রামের উত্থান পতনের মত এ গ্রামেরও উহার একটা করুণ ইতিহাস আছে। এই গোপীনগর গ্রামের পাশেই ইচ্ছাপুর নামে আর একটী গণ্ডগ্রাম আছে; পাশাপাশি এই দুইখানি গ্রামের ইতিহাস এইরূপ—ধনিয়াখালির নিকট "বসো" গ্রাম এখনও খুব বিখ্যাত, এই "বসো" গ্রামের জমিদার বংশেরই একজন বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ানী লইয়া এই গ্রাম পত্তন করেন। "বসো" গ্রামের জমিদারবংশের খ্যাতি ও মর্য্যাদা এককালে বর্দ্ধমানরাজের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন ইঁহাদের কর্ম্ম স্বীকার করায় নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, তাহার ফলে গোপীনাথ সিংহ এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি বর্দ্ধমানের রাজসরকারে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রামে সেই সময়ে যে সকল অন্ত্যজ-শ্রেণী ছিল, তাহাদের অর্থ ও জমি দান করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাসের ব্যবস্থা করেন। কয়েকঘর মুসলমানও পূর্ব্বে এই গ্রামে বাস করিত, এই সময় হইতে তাহারাও স্থানান্তরিত হয়। গোপীনাথ সিংহ নিজের স্ত্রীর নামে ইহার পার্শ্বেই ইচ্ছাপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর সহধর্ম্মিনীর নাম ছিল—ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছাপুর গ্রামে তিনি নিজের বাটী, বাগান, পুষ্করিণী, ঠাকুরবাড়ী ও কাছারীবাড়ীর সহিত বৈঠকখানাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁর দেবালয়ের শেষ চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। হাতীশালার নাম আছে, চিহ্ন নাই। ইহা গ্রামের পরিবর্ত্তে রাজবাটীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। নিষ্কর জমি দান করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে ও দানশীলতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ তাঁহাকে গোষ্ঠীপতির আসন দিয়াছিলেন। শুনা যায়, নিতান্ত অসময় হইলে এই সম্মান তাঁহারা কলিকাতার শোভাবাজারের রাজাদের নিকট অর্থবিনিময়ে বিক্রয় করেন।

বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই পরশ্রী-কাতর। গোপীনাথ সিংহের এই খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁর সহকর্ম্মীরা ঈর্ষান্বিত হয়েন। ইঁহাদের মধ্যে একজন, যাঁর বিরুদ্ধ আচরণে গোপীনাথ সর্ব্বস্বান্ত হয়েন, তাঁহার বাস গোপীনগর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে দশঘরা নামক স্থানে। তিনিও উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন, রাজার বিশেষ পরিচিত। বর্দ্ধমানরাজ একদিন বাহির হইয়া দেখিলেন—ইনি এক গজকাটী লইয়া রাজবাটীর পরিমাপ করিতেছেন তিনি হাসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ ব্যক্তি তখন গম্ভীর হইয়া বলিলেন —"মহারাজ! গোপীনাথের রাজবাটীর সহিত

আপনার রাজবাটীর তুলনা করিতেছি, হয় ত তাঁহার ভবনই বৃহৎ হইবে।" রাজা বুঝিলেন, গোপীনাথ তাঁহার ষ্টেট্ হইতেই প্রচুর সম্পদ্ আহরণ করিয়াছে। তিনি গোপীনাথের এতখানি সমৃদ্ধি সহিলেন না। গোপীনাথের ভবন লুট হইল। ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া গুপ্তধন পর্য্যন্ত লইয়া আসা হইয়াছিল। গোপীনাথ রাজার এই মনোভাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; তিনি এইহেতু আত্মগোপন করেন, নতুবা বন্দী হইতেন। ইহার পর যাহা হইবার তাহাই হইল। গোপীনাথ "বসো" গ্রামে লজ্জায় আর ফিরিলেন না। গোপীনগরেই সামান্য লোকের মত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁর অবনতির সঙ্গে গ্রামেরও অবনতি ঘটিল। দুই হাজার বাসিন্দা এক্ষণে দুইশত ঘরে পরিণত হইয়াছে। তাঁর বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা আজ বিপদের কারণ হইয়াছে; সংস্কারের অভাবে উহার জল অবিশুদ্ধ হওয়ায় দূষিত বায়ু সৃষ্টি করে। মশককুলের দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসী অস্থির। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত গ্রামের নিত্য সহচর। সম্প্রতি দুই একটী নলকূপ বসাইয়া গ্রামবাসী কোন গতিকে টিকিয়া থাকায় ব্যবস্থা করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস গুমরিয়া বাহির হয়। সহরে ভীড় করিয়া দেশোন্নতির চীৎকার শুনি। চাই যে অসংখ্য কর্ম্মী—পেটে ভাত নাই বলিয়া হাহাকার কেন? দলে দলে এই সকল গ্রামে যদি তরুণেরা হানা দেয়, দেশগঠন-যজ্ঞ সফল হইতে পারে। বাঙ্গালীর সে প্রাণ কোথা!

তাঁত ও চরকা আশ্রয় করিয়া এই কাজেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের কথা, খাদি ব্যবহারের বাহিরের দিক্‌টা দেখিয়া যে হিসাব আমরা বাহির করি, তাহার দায়ে এত বড় কাজ হইতে কর্ম্মীদের বিমুখ করার প্রবৃত্তি নিজেদের পায়ে যে কুড়ুল মারিয়া মরা, একবার তাহা ভাবিয়াও দেখি না।

সারারাত্রি আর ঘুম হইল না। পল্লীর প্রাণ চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথার কথা নিবেদন করিল। শুনিতে পাই, ভারতের দশ ভাগের নয় ভাগ লোক এখনও গ্রামে বাস করে; বিশেষ, বাঙ্গালায় শতকরা ছয় জন লোক সহরবাসী—তবুও গ্রামের এমন অনাদর কেন! কেমন করিয়া দেশের সে প্রাণ জাগিবে, যে প্রাণের কলরবে এই শ্মশানসদৃশ গ্রামগুলিতে আবার জীবনের কলরব উঠিবে!

প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁতীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিলাম। সেদিন তাহারা বেকার বসিয়াছিল—সঙ্গেই সূতা ছিল, পাইয়া কৃতার্থ হইল। সূতা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। গোপীনগরে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের এই শোচনীয় দুরবস্থা দূর করার ক্ষীণ আশা জাগিল। কিন্তু হায় রে কপাল! খাদির উত্তেজনা শেষ হইতে না হইতে আবার ব্যাপারীর টাকা ও মিহি সূতার মোহে ইহারা আমাদের বিদায় দিল। খাদিব্রতী কতখানি প্রাণ লইয়া যে গ্রামে আশ্রয় চায়, তাহা শ্রমজীবিদের বুঝাইবার অবকাশ দেয় না দেশের শিক্ষিতশ্রেণী—তাহাদের দায়েই ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের শ্রী ফিরান সম্ভব হয় না। যদি খাদিপ্রীতি আমাদের স্থায়ী হয়, গাঁটের প্রত্যেক কড়িটিই এই সাধু উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে গুণান্বিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু সম্মোহন হইতে আমরা আর কি মুক্ত হইব?

অপরাহ্ণে মাঠের মুক্ত হাওয়ায় প্রাণের সাড়া মিলিল। তখন ধান কাটা শেষ হইয়াছে; ৩।৪ ইঞ্চি ধানের গোড়া মাটীর বুকে গাঁথা আছে, মটর কলাই হইয়াছে। কচি কচি দানা বড় মধুর লাগিল, কোন্ ক্লাস ভাইটামিন পাইলাম—তত্ত্ববিদ্

তাহার বিচার করিবেন। মাইল খানেক দূরে মাঠের মাঝে সারি সারি কুঁড়ে ঘর দেখিয়া সেদিকে অগ্রসর হইলাম—যেন যজ্ঞশালা। ছেলেবেলায় গল্পই শুনিয়াছিলাম—রাক্ষসেরা প্রকাণ্ড কটাহে গরু, মহিষ, ছাগ, মনুষ্য রন্ধন করিত। কটাহ প্রায় তদ্রূপই বটে, কিন্তু রাক্ষসের আহার প্রস্তুত হয় নাই, গুড় জাল দেওয়া হইতেছিল। ফুটিয়া ফুটিয়া রসে যে গাদ উঠিতেছে, তাহা বৃক্ষশাখার সাহায্যে উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। লোকগুলি খুব ব্যস্ত। পূর্ব্বে আখশালে প্রত্যেক পরিদর্শক দুই এক আটী আখ বিনামূল্যেই উপহারস্বরূপ পাইত। আজ হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে, দারিদ্র্য-রাক্ষসীর ভ্রূকুটীতে কৃষকেরা কৃপণ হইয়াছে। কিন্তু তবুও রীতি আছে; অতি দুঃখেই সে কাহিনী শুনায়, ভদ্রলোক দেখিলে টুল পাতিয়া বসিতে বলে, বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ দিয়া নলেন গুড় খাইতে অনুরোধ করে। দরিদ্র দেখিলে গালি দেয়, তাহাদের উঞ্ছবৃত্তি সাম্‌লাইতে পারে না।

বাংলায় আর শামসাড়া আখের চাষ নাই, শৃগালের উৎপাত ও মানুষের দৌরাত্ম্যে ইহার চাষে লাভ নাই; মাঠ হইতেই আখ লোপাট হইয়া যায়। উপস্থিত যে আখের চাষ হয়, অনেকে ইহা সাহেবী আখ বলে; কেহ বলে কাবুলী, আবার অনেকে ইহাকে জাপানী বলিয়া জানে। এই আখের মাঝখানটা ফাঁপা, ছাল এত শক্ত যে মানুষ কেন, শৃগালের তীক্ষ্ণ দন্তও ইহাতে বসিবে না; গুড়ও হয় ঈষৎ লবণাক্ত। কৃষক এই আখের চাষ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু চাষীরা বলে—পূর্ব্বের ন্যায় এই আখের ভিতর বাহির আর তেমন



চাষীরা আখ মাড়াই করিতেছে

রুক্ষ কর্কশ নয়, ছাল ক্রমেই নরম হইতেছে, রসও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং মিষ্ট হইতেছে, মধ্যের ফাঁপাও নীরেট হইতেছে। চার পাঁচ বৎসর পরে হয় তো এই আখই শামসাড়ায় রূপান্তরিত হইবে। দুঃখের সহিত হাসিও পাইল। হায়রে বাঙ্গলা! তোমার উর্ব্বরা মৃত্তিকায় যে প্রাণের সৃষ্টি হয়, সে সাধ করিয়া কি শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে, রূপে-রসে-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! তোমার আমের

বনে যে ঘ্রাণ মিলে, তাহাতে কেন মন মাতিয়া উঠে; মালঞ্চে যে ফুল ফুটে, তাহাতে এত মধু কোথা হইতে আসে—সে কথা যে ভুলিতে পারি না মা! তোমার পীযুষপূরিত স্তনে কত সুধা এই অত্যাচারী অনাচারী উদ্‌ভ্রান্ত জাতিকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছ। তাই না কবি গাহিয়াছেন—"এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

প্রয়োজন হয় না, মানুষ হাঁটিয়াই পার হইয়া যায়। আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিখ্যাত বেগুয়ার হানার সন্নিকটস্থ হইলাম। এইখানেই আমাদের পার হইতে হইবে। জল গভীর না হইলেও, প্রখর স্রোতঃ বহিতেছিল। বর্দ্ধমানবাসীর এক অপবাদ আছে—"কোঁচা লম্বা কাছা টান", দামোদর পারের সময়ে কথাটা মনে পড়িল। কোঁচা যতই লম্বা হউক, তাহা হাতে করিয়া গুটাইয়া ধরা যায়; কিন্তু কাছা ধরিয়া কত টান দিব? আমাদের এক বন্ধু রণে ভঙ্গ দিয়া তীরে উঠিলেন। আমরাও বেগতিক ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, এক ব্যক্তি সরাসরি জলে নামিয়া পার হইতে লাগিল। তাহার অনুসরণ করিয়া আমরাও



দামোদরতীরে রবিশস্যের ক্ষেত

উত্তীর্ণ হইলাম। নদীর কোন্‌দিকে কতখানি জল এইস্থানের অধিবাসিবৃন্দের তাহা জানা আছে; নূতন ব্যক্তির পক্ষে, অল্প জল মনে করিয়া পার হওয়ার প্রচেষ্টা বিপজ্জনক হইতে পারে।

এইস্থান হইতে দামোদর নদ পাঁচ ছয় মাইল হইবে। অপর পারে, আমাদের একটী ক্ষুদ্র শাখা-সঙ্ঘ্ আছে; তাহা পরিদর্শন করার কথাও ছিল। বর্ষার দামোদর যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিস্মিত হইবেন। শীতের শেষে সে উচ্ছ্বসিত জল-কল্লোল যেন স্বপ্নের মতই শেষ হইয়াছে। বিস্তৃত নদীবক্ষ বালুরাশিপূর্ণ, স্বর্ণরশ্মির মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে; মধ্যভেদ করিয়া কাকচক্ষুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ নির্ম্মল জলধারা বহিতেছে। খেয়ানৌকার

দামোদরের অপর পারে যে সকল গণ্ডগ্রাম আছে, সেগুলি পরিদর্শন করিয়া বুঝিলাম—অর্থ ও ও কর্ম্মীর অভাব না হইলে, এই সকল স্থানে খাদি ও চরকার বেশ প্রচলন হইতে পারে। অনেকের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের এই বিষয়ে

উৎসাহও দেখিলাম। কিন্তু এই উৎসাহ কার্য্যতঃ কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা "ফলেন পরিচীয়তে।"

আমাদের শাখা-আশ্রমে যাইতে হইলে, আর একটী নদী অতিক্রম করিতে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে একখানি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। বর্ষায় মাঝি পারাপারের ভার লয়। এ-সময়ে পারের যাত্রীদের কাণ্ডারী হইতে হয়। আমরা অবলীলাক্রমে পার হইলাম।

১৩২০ সালের বানে, বেগুয়ার হানা, কুমির-কোলার হানা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর সংস্কারের ব্যবস্থা হয় নাই; এইহেতু এই-স্থানের কৃষকদের দুরবস্থার সীমা নাই। দামোদরের বন্যা বাড়িলেই কৃষি নষ্ট হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ আবাদ করিয়া যে সামান্য শস্যসঞ্চয় হয়, তাহাতে গৃহস্থের দিন চলে না; জমিদারের খাজনার দায়ে লোকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে আমরা এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

দামোদরের কিনারায় বিস্তৃত জমিতে রবি-ফসলের আবাদ হইয়া থাকে। কৃষকের এই আশা-ক্ষেত্রটুকু আছে বলিয়াই তাহারা এখনও টিকিয়া আছে।

আমাদের আশ্রম রায়নগরে। গ্রামে ঢুকিতেই এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা চক্ষে পড়ে। ইহার পাড় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘে, উচ্চে ১২।১৪ ফুট হইবে। সংস্কারের অভাবে জলশূন্য। চতুর্দ্দিকে বাব্‌লা গাছের বন—ইহা আয়কর। বাব্‌লা কাঠ খুব শক্ত; গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙ্গলের মুড়া প্রভৃতির জন্য প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দীঘিতে জল থাকিলে ইহা হ্রদের ন্যায় শোভা পাইত। পূর্ব্বে ইহার দৃশ্য বড় মনোরম ছিল, প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হইত। এই দীঘি সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। লোকে বলে, ইহাতে ট্যাংরা মাছ জন্মে না; তাহার কারণ,



প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের শাখা-কেন্দ্র—রায়না—(বর্দ্ধমান)

রায়নার সুবিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক বজ্রাঙ্কুশ-ভট্টাচার্য্য একদিন এই দীঘিতে স্নানান্তে আহ্নিক করিতে-ছিলেন, এক ট্যাংরা মৎস্যের কাঁটার আঘাত পাইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। যন্ত্রণায় তাঁর ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া "ট্যাংরা মাছ পঞ্চত্ব-লাভ করুক" তিনি এই অভিসম্পাত প্রদান করেন। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, দীঘিকায় যত ট্যাংরা মাছ ছিল সব মরিয়া ভাসিয়া উঠিল। সেই হইতে এই জলে আর ট্যাংরা মাছ জন্মে না। তান্ত্রিক-

সাধক বঙ্কাঙ্কুশ ভট্টাচার্য্যের অনেক মাহাত্ম্যের কথা শুনা যায়। তিনি বামাচারী তান্ত্রিক ছিলেন, শ্মশানে শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রবাদ, তিনি অমাবস্যায় চন্দ্র দেখাইয়াছিলেন।

রায়না একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এখানে পোষ্টঅফিস, রেজিষ্টারী অফিস, থানা, বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ের ষ্টেশন, হাট, হাইস্কুল এবং বহু ভদ্রলোকের বাস আছে। ষ্টেশনের নিকট আর একটী প্রকাণ্ড দীঘি আছে। ইহার নাম "রায় খাঁ"। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাড়, জল থৈ থৈ করিতেছে। পদ্মবনে ফুটন্ত কমলের শোভা কত মনোরম, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না। ইহাতে যথেষ্ট মাছ জন্মায়। মাছ ধরিয়া স্তূপাকার করা হইলে ভীড় জমিয়া যায়। সেন রাজাদের সময়ে এই দীঘি খনন করা হয়। 'রায়' শব্দ নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, এই হেতু দীঘির নাম "রায় খাঁ" রাখা হইয়াছিল।

গ্রামের অন্য পার্শ্বে দুই শত বিঘা উচ্চ জমি পড়িয়া আছে। দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, ইহার উপর একদিন বিশাল অট্টালিকা ছিল। এই স্থানের নাম 'বাতান ভাঙ্গা'; ইহার চতুর্দ্দিকে গড় ছিল বলিয়া মনে হইল। স্থানটীর নামের তাৎপর্য্য বুঝা গেল না; কিন্তু এই স্থানে রাজপ্রাসাদ অথবা দুর্গ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুনা যায়, সেন রাজদের সময়ে এই গড়বন্দী সেনানিবাসে অসংখ্য সৈন্য বাস করিত। রায়নগর, সেনাপাড়া ও এই গড়টী পাশাপাশি বিদ্যমান। রায়না-গড় যে ক্রমে রায়নগরে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা করা আমাদের কর্ম্ম নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্থানটী পরীক্ষা করিলে প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায় হয়তো বাহির হইতে পারে।

বাংলার পল্লী-চিত্র অন্তরে আঁকিয়া প্রাচীন বাংলার গর্ব্বকাহিনী স্মরণ করিলাম। বাংলার বারভূঁইয়ার বীরত্বের কাহিনী মনে পড়িল। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী বীরও তো রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে; বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া পাঠান মোগলও বাংলা-জয়ে ইতস্ততঃ করিয়াছে। হায় বাঙ্গালী, তোমাদের সে নষ্টগৌরব আর কি উদ্ধার হইবে না!

সন্ধ্যায় রায়না-সঙ্ঘে উপাসনা শেষ করিয়া সারারাত্রি চিন্তায় চিন্তায় বিনিদ্র অবস্থায় কাটিল। কেবলই মনে হইল—১০ হাজার বাঙ্গালী যদি আজ গঠন-ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করে, সঙ্ঘের স্বপ্ন সার্থক হয়, এবং তাহা হইলে এই বাংলায় এমন একটা দুর্দ্ধর্ষ জাতি আজও গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহারা পৃথিবীজয়েও পরাঙ্মুখ হইবে না। বাঙ্গালী জাতিগঠন-যজ্ঞে দলে দলে যদি অগ্রসর হয়, দশ বৎসরে জাতিটা রুশের চেয়েও বড় হইয়া উঠে; কিন্তু সে ধৈর্য্য ও সাহস আমাদের আছে কি?



তন্ত্রশাস্ত্রে ভাব-ভেদ

[শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ]

(৩)

"কুলার্ণবতন্ত্রে" অষ্টম পঠনে সপ্তবিধ আসবোল্লাসের বর্ণনা আছে; ঐ সপ্ত উল্লাসের নাম:—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনা ও অনবস্থ অর্থাৎ মানুষের মদ খাইয়া ক্রমশঃ যে সপ্তবিধ অবস্থা ঘটে, উহার বর্ণনা আছে। উহার মধ্যে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত ও উন্মনা অবস্থায় মানুষের যেরূপ মতিবিভ্রম ও কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানহীনতা হয়, উহার বর্ণনা পাঠ করিয়া পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে অতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া আমি কুলার্ণবতন্ত্র আদ্যোপান্ত বেশ তন্ন তন্ন ভাবে দেখিয়াছিলাম। সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিবার পর আমার মনে এই ধারণা হয়, যে উক্ত সমালোচক গ্রন্থখানির অন্য কোন অংশই দেখেন নাই, কেবল যেখানে ঐ সপ্তবিধ উল্লাসের বর্ণনা আছে, উহাই দেখিয়াছিলেন এবং উহার ভাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার লোক তিনি পান নাই। "কুলার্ণবে" আরম্ভ উল্লাস সম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে, যে—তত্ত্বত্রয়ং স্যাৎ আরম্ভঃ। এই তত্ত্বত্রয় কি, এবং কি জন্য তত্ত্বত্রয়ের উল্লেখ করা হইল, ইহা যদি কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে ঐ যে পরের অবস্থাগুলি, সে সম্বন্ধে তাঁহার কতক অন্যরূপ ধারণা হইত; কারণ, এই তত্ত্ব-ত্রয় অর্থে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। এইখানে সাধককের মনে অশুদ্ধ তত্ত্ব, শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্ব ও শুদ্ধ তত্ত্বের বিচারের বীজ বপন করা হয়। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে জানিতে চান, তাঁহারা "গন্ধর্ব্ব"-তন্ত্র কিংবা কাশ্মীর রাজসরকার হইতে প্রকাশিত ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা তাহা না পারিবেন, তাঁহারা স্যার জন উড্‌রফ্‌ রচিত "শক্তি ও শাক্ত" নামক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার কতক আভাষ পাইবেন। সময়ান্তরে আমি 'প্রবর্ত্তক'-পাঠকদিগের নিকট এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার চেষ্টা করিব। এই যে সপ্ত উল্লাসের কথা বলিলাম, ইহার ত্রিবিধ অর্থ আছে। গ্রন্থ-শেষে "কুলার্ণবে" লিখিত আছে, যে সাধারণ লোকের পক্ষে এই অষ্টম উল্লাস পাঠ নিষেধ; কেননা, সাধারণ লোক উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। আর উহার সব ব্যাখ্যা সাধারণের নিকট করাও নিষেধ, উহার ব্যাখ্যা গুরু উপযুক্ত শিষ্যকে দিয়া থাকেন; আর শিষ্যের অধিকার-ভেদে ঐ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এখনকার দিনে 'অধিকার' শব্দটী প্রয়োগ করিলে, এ দেশের যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকেন। অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট কথাপ্রসঙ্গে এই শব্দটী

প্রয়োগ করাতে তিনি একেবারে কথাই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে সকলেই সর্ব্ব বিষয়ে অধিকার, কেহই "ছোট বড়" বলিয়া কথা বুঝিতে পারেন না, সকলেই বড় হইলেন, সকলেই নেতা হইলেন, তবে ছোট কে রহিল! যাঁহারা নেতা হইলেন, তাঁহাদের অনুসরণ করিবার লোক কোথায় রহিল—তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। এখানে অধিকার-ভেদ বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে কেহ স্থূলভাবে শিবের বাক্য গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যেখানে সুধাপানের কথা আছে সেখানে প্রকৃত সুধা বা সুরা পানই বুঝিবেন; যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে দেখিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সুধার অর্থ অন্যরূপ, তাঁহারা ইহাতে জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পান। যাঁহারা পরভাবে দেখিবেন, ঐ সুধার অর্থ তাঁহাদের নিকট অন্যরূপ। তবে স্থূলদর্শীর সংখ্যাই বেশী। আমরা সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এবং স্থূল সুধাই পান করিয়া থাকি এবং স্থূল পান করিয়া যাহা ফল তাহাই আমাদের ঘটে। তবে যাঁহারা এই স্থূলভাবে পান করেন, তাঁহারাই আবার এই সম্বন্ধে তান্ত্রিক সাধকদিগের প্রতি বিশেষরূপে কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা তান্ত্রিক সাধকদের এইটাই একটী প্রধান দোষ, এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকটেও সংস্কারের পর সাধারণ আসবও বিশুদ্ধ রক্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের যজমানগণ যে যথেচ্ছ সুরা পান করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই বক্তব্য নাই। তান্ত্রিক সাধক সংস্কার না করিয়া উহার আঘ্রাণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পূর্ব্বেও বলিয়াছি, যে হুলেও সাহবের মতে "শিক্ষিত ভারত" (Educated India) খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের পালিত পুত্র (Foster Child); সুতরাং তাঁহাদের কথাই শিরোধার্য্য—তাহারা কি ভুল বলিতে পারেন? তাঁহারা যাহা মন্দ বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই মন্দ; কেননা, উঁহাদের মত নিরপেক্ষ সদাশয় লোক আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের মনে একথা একবার উঠে না, যে আমাদের এই ব্রহ্মণ্য সমাজে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কিরূপ সদ্ভাবে দিন কাটাইয়া আসিতেছে। যদি কোন শাক্তের কন্যার বৈষ্ণবের সহিত বিবাহ হয়, তবে তাহাকে কিছুই করিতে হয় না; কিন্তু যদি একজন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের রোমানক্যাথলিক পাত্রের সহিত বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তাহার যে পূর্ব্ব ধর্ম্মবিশ্বাস ভ্রান্তমূলক, ইহা বিশেষ ঘটা করিয়া স্বীকার করিতে হয় ও পূর্ব্ব বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজার বিবাহের সময়ে এইটি ঘটিয়াছিল। আবার ইহাও দেখা যায়, যে এইরূপ যদি খৃষ্টীয় দুইটী সম্প্রদায়ের বর ও কন্যা হয়, তবে তাহাদের দুইবারও বিবাহ করিতে হয় অর্থাৎ কন্যা যদি রোমানক্যাথলিক হয়, তাহা হইলে রোমানক্যাথলিক গির্জ্জায় একবার বিবাহ হইবে, আর বর যদি প্রোটেষ্টাণ্ট হয় তবে প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জায় আবার বিবাহ হইবে। ভগবান একবার রোমানক্যাথলিক হইলেন, একবার প্রোটেষ্টাণ্ট হইলেন। ইঁহারাই আবার আমাদিগকে সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া থাকেন। আমাদের ভিতর যাহারা পাশ্চাত্য প্রথারীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। তাহারা যদি হোটেলে যাইয়া দুই একটী পেগ (Peg) গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্যটীতে কোন প্রকার দোষ দেখিতে পান না; ইহার কারণ এই, যে ইংরাজ ঐ কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু কুলমার্গবর্ত্তী ব্যক্তি যদি সংস্কৃত সুধা পান করেন, তবেই সর্ব্বনাশ। কুলশাস্ত্র বলে,

অসংস্কৃত সুধা পান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, যাহারা অসংস্কৃত সুধা পান করেন, তাহারা পশু; কিন্তু এখনকার দিনে অসংস্কৃত পানই চারিদিকে চলিতেছে, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক নাই এবং ঐ সুরা কিম্বা মৎস্য মাংস যা কিছু, যদি উচ্চপদস্থ কোন বিশিষ্ট লোকের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সম্মানের বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু কুলসাধক কোন প্রকার পানীয় বা আহার্য্য শোধন না করিয়া কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি প্রতিপদেই মনে রাখেন, যে আমি যাহা করিতেছি, ইহা পরমাত্মার কাজ; আমি যাহা গ্রহণ করিতেছি, ইহা পরমাত্মাকেই অর্পণ করা হইতেছে; এইরূপ আহার বিহার সম্বন্ধে তিনি যাহা করেন, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ঐ স্বভাবগত বিশ্বাস কখনও বিচলিত হয় না। ইহাই প্রকৃত কুলসাধকের পথ। সুতরাং প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত ও উন্মনা অবস্থায় তিনি যাহা কিছু করেন, উহা উক্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়; আর তিনি যাহা কিছু করেন, উহা নিজের গুরু বা চক্রেশ্বরের সম্মুখে করেন ও চক্রের মধ্যেই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ আছে উহা যদি কেহ দেখেন, তাহা হইলে যে ব্যাভিচারের কথা অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন, উহা কখনও স্থূলভাবে লওয়া যায় না। আমি 'কুলার্ণ"বতন্ত্রের একটী ইংরাজী সংস্করণ এক ইংরাজ রাজপুরুষকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি আদ্যোপান্ত পুস্তকখানি পড়িয়া উহাতে দূষণীয় কিছুই দেখিতে পান নাই; তবে তিনি বলেন, যে এখন আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে উহার যথার্থ তত্ত্ব গ্রহণ করিবার অধিকারী লোক অতি বিরল। যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহারা চীৎকার করিতে পারিবেন না; আর চীৎকার করিবার লোকই এখন বেশী হইয়াছে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বুঝিবার লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশের যাঁহারা নেতা বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন, তাঁহাদের নিজের যে শাস্ত্র আছে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কিনা জানা যায় না। থাকিলেও অতি অল্প। ঐ ইংরাজ রাজপুরুষ এইকথা বলিতে পারিলেন, তাহার কারণ এই, যে তিনি স্বধর্ম্মচ্যুত হন নাই। নিজের ধর্ম্মে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিজের ধর্ম্ম তিনি জানেন; কিন্তু আমরা পৌত্তলিকতা ও কালীঘাটে পূজা দেওয়াকে কুসংস্কার বলিয়া থাকি। তবে জিজ্ঞাসা করি—যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা এই গত মহাযুদ্ধের পর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, উহা কি কালীঘাটের পূজার রূপান্তর নহে! এইরূপ অনুষ্ঠান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই করিয়া থাকে। আমরা সেজন্য কাহারও দোষ দিই না, অন্যলোকে আমাদের নানারূপ কথা বলিয়া থাকেন।

পুষ্পদন্তরচিত মহিম্নস্তোত্রে উল্লেখ আছে, যে মানুষ ঋজু বক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া সেই একই গন্তব্যস্থানে যাইতেছে; ইহাদের পরস্পরের বিবাদ করিবার কোন কারণ নাই। "ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়" নামক তন্ত্রগ্রন্থ শ্রীকুলের শীর্ষস্থানীয়; উহা নাগভট্ট-বিরচিত। নাগভট্ট সাধক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রণী। ঐ "ত্রিপুরাসার-সমুচ্চয়" নিম্নলিখিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকের সপ্তম অবস্থার কথা বলিয়াছেন—

"এতস্যাঃ পরতঃ পরাৎপরতরং নির্ব্বাণশক্তেঃ পদম্
শৈবং শাশ্বতমপ্রমেয়মমলং নিত্যোদিতং নিষ্ক্রিয়ম্।
তদ্বিষ্ণোঃ পদমিত্যুশন্তি সুধিয়ঃ কেচিৎ পদং ব্রহ্মণঃ
কেচিদ্ধংসপদং নিরঞ্জনপদং কেচিন্নিরালম্বনম্॥"

—যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তাহারা আর্থার এভেলন (Arthur

Avalon) রচিত 'Serpent Power' নামক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার অনেকটা বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। ঐ গ্রন্থ "ষট্‌চক্রনিরূপণ" নামক গ্রন্থের অনুবাদ ও ইহাতে এভেলন সাহেব অনেক টীকা-টিপ্পনীও দিয়াছেন। নাগভট্টরচিত শ্লোকের একটী শ্লোক ইহাতেও আছে। আমার মনে হয়, যে উক্ত ষট্‌চক্রনিরূপণ "ত্রিপুরাসারমুচ্চয়ে"র পঞ্চম পটল অবলম্বন করিয়াই লিখিত। উহা কুণ্ডলিনী সাধনের বিবরণ। আবার এই কুণ্ডলিনী সাধন যে কেবল শক্তিমার্গী সাধন করিয়া থাকেন তাহা নয়; মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও ইহা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—'রসভাবপ্রাপ্ত' নামক একখানি অপ্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থ। উহাতে লিখিত আছে—

"থাকুক অন্যের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
পৃকৃতি স্পর্শন্ তেঁহ না করেন কভু
বাহেতে পৃকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়
বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয়।"

—তবে দুঃখের বিষয় এই, যে কোন একজন সাহিত্যিক এই বিধবাব্রাহ্মণী পড়িয়াই স্থির করিলেন, যে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু সে কালের উক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকার যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দোষারোপ করিতে পারেন না, একথা একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না, তাহার কারণ, আমরা আমাদের ভাষা বুঝি না; এবং শ্বেতাঙ্গ গুরুরা আমাদের স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাশ করিয়াছেন। তিনি যদি জানিতেন, যে "বিধবা ব্রাহ্মণী" কুণ্ডলিনীর নামান্তর, তবে বোধ হয় তাঁহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার অবসর থাকিত না।

"পরশুরাম কল্পসূত্রের" টীকাকার এই সপ্ত অবস্থার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাকে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। আরম্ভ উল্লাসের অর্থ এই, যে উপাসনা বিষয়িণী ইচ্ছামাত্র আছে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার অভাব। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্র পাঠেচ্ছা যখন বলবতী হয়, উহা তরুণোল্লাস। উক্ত শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া যে মনের সুখ, উহা যৌবনোল্লাস। শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ধ্যান করিবার সময়, ইহা প্রৌঢ় উল্লাস। উহার পর ধ্যানে কিঞ্চিৎ অধিকার লাভের অবস্থা প্রৌঢ়ান্তোল্লাস। ঐ ধ্যানের দ্বারা মনোলয় শক্তি অর্জ্জন দ্বারা উন্মনোল্লাস পাওয়া যায়। তৎপরে যখন ঐ শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অনবস্থ উল্লাস। আমার ইচ্ছা ছিল, যে "যোগবাশিষ্ঠে" যে সপ্তজ্ঞানভূমিকা ও সপ্ত অজ্ঞানভূমিকার কথা আছে, উহা এইখানে কিছু লিখিব। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু পাঠক যদি যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণের ১১৭, ১১৮ সর্গ নিজে দেখিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আমি যাহা লিখিব তাহা অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিবেন। আমিও সম্বন্ধে আর বিশেষ লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।



সঙ্কলন ও সমালোচনা

সঙ্কলন

—:০:—

সভ্যতার মাপ—

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীই স্বতন্ত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান না জানিলে, ভারতের জাতীয়তার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় না। ভারতের সভ্যতা—সাধনামূলক। Cultureই ইহার প্রাণ। এই কাল্‌চার বা সাধনা—জ্ঞান, অনুভূতি বা চৈতন্য-প্রতিষ্ঠ। আর ইহাই যে খাঁটি, নিষ্পাপ, কল্যাণময় উত্তম মানবসভ্যতারই যথার্থ মাপকাঠি, ইহাও গভীর চিত্তে ভাবিলেই উপলব্ধি করা যায়। এ যুগের পল্লবগ্রাহী শিক্ষার কুহেলিকা ভেদ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রজ্জ্বলিত জীবনসাধনা এই মহা-সত্যকেই দীপ্তিময় করিয়া জগতের চক্ষে ধরিতেছে। তাঁরই জীবন-বাণীর প্রতিধ্বনি "রাষ্ট্রবাণী" আমাদের শুনাইতেছেন :—

"বস্তুতঃ সভ্যতার মাপ বস্তু নয়—সভ্যতার মাপ জ্ঞান। যে জাতের যত জ্ঞান বেশী সে জাত তত বেশী সভ্য। যাহাদের জ্ঞান যত কম তাহারা তত অসভ্য। জ্ঞানটাই বা কি? যদি সভ্যতার মাপ বস্তুর ব্যবহার দিয়া, বস্তুর অধিকার দিয়া, বাস্তব সম্পদ্ দিয়া না করি, কে বা কোন জাতি সভ্য তাহা যদি জ্ঞান দ্বারাই মাপ করি, তাহা হইলেই বা কি হয়? কিসের জ্ঞান? জিনিষপত্র তৈরীর জ্ঞান? অর্থাৎ রসায়নবিৎ বা পদার্থবিদের জ্ঞান? দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান? ভাষার জ্ঞান? আইনের জ্ঞান? না ডাক্তারীর জ্ঞান? কোন জ্ঞান থাকিলে ব্যক্তি ও জাতিকে জ্ঞানী বলিব—সভ্য বলিব? যে সকল জ্ঞান ব্যবহারিক শাস্ত্র জ্ঞান, তাহা ত আমাকে আবার বস্তুতেই আনিয়া ঠেকাইবে—যাহাতে অফুরন্ত কড়ি জড় করা যায়, যাহাতে বসিয়া খাইতে পারা যায়, যাহাতে সুক্ষ্ম তর্ক করিতে পারা যায়, সেই সকলই শিখাইবে। ইহাতেই বা সভ্যতা কি করিয়া আসিবে? ইহার উত্তরে ভারতবর্ষ বরাবর একটা কথাই বলিয়া আসিয়াছে, যে সমস্ত খণ্ড জ্ঞান যে এক জ্ঞানের সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সমুদ্রে ডুব দাও। সেইখানে যে জ্ঞান পাইবে তাহাই পরমার্থ জ্ঞান।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ, আত্মদর্শন—এই সকলকেই জ্ঞান বলে। ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান।

যাহার অধ্যাত্ম জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানী। অধ্যাত্ম জ্ঞানই জ্ঞান ও ইহাই সত্য। ইহার অন্যথাই হইতেছে অজ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান বা অসভ্যতা। এই মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ভারত যে এককালে শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।"

ভারতের পতন—এই জ্ঞানের উচ্চ শিখর হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার কারণেই ঘটিয়াছে। "রাষ্ট্রবাণী" সে কথাও বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"কোনও দুর্ব্বলতার দিনে, কোনও পতনের মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষকে ইউরোপ ভুলাইয়া তাহাকে অসভ্য করার পথে লইয়া চলিয়াছিল। যেখানে গেলে জ্ঞানের মৃত্যু হয় ও অজ্ঞানের মোহকূপ ও অসভ্যতার পাঁকে পড়িতে হয়, সেই পথে সে আজও তাহাকে লইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের নামে সে তাহাকে শঠতা করিতে শিখাইয়াছে, বিচারালয়ে গিয়া মিথ্যার দ্বারা ন্যায় কেনাবেচা করিতে শিখাইয়াছে, জাতির সহিত জাতির বিদ্বেষ বাড়াইয়া, দ্বন্দ্ব বাড়াইয়া, অপ্রয়োজনীয়ের প্রয়োজন বাড়াইয়া বিপথে লইয়া চলিয়াছে।"

প্রতিকার—জ্ঞানের পুনরুদ্ধার। ইহাই ভারতের

নূতন বুদ্ধ গান্ধীজির জীবনের শিক্ষা। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন সঙ্কেত। ইহাই ভারতের স্বধর্ম। স্বাধিকার বা স্বরাজ লাভের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। জাতীয়তার ঋষি শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ে এই অব্যর্থ বাণীমন্ত্র যেদিন রুদ্রতালে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল সেদিন তিনিও এ জাতিকে এই আলোর পথেই ডাক দিয়া গিয়াছিলেন :—

"আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না—জ্ঞানের বল। ক্ষত্র-তেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে—সেই তেজ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

এই জ্ঞানের ব্রহ্মবীর্য্য হৃদয়ে জাগাইয়া কোথায় সেই তরুণ সেনানীর দল, যারা নব ভারতের মুক্তি-সাধনা সিদ্ধ করিবে ?

পুণ্য প্রসঙ্গ—

মহাত্মা প্রসঙ্গে আর একটী পুণ্যচিত্র অন্য সংখ্যার "রাষ্ট্রবাণী" হইতে সঙ্কলিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"খোলা ছাদে গান্ধীজি ঘুমাইয়া ছিলেন। ৩টায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য করিয়া যখন পুনরায় ছাদে আসিলেন, তখন বোম্বাই'এর স্বেচ্ছাসেবিকারা ছাদ জুড়িয়া জড় হইয়াছেন। সেবিকায় ছাদ ভরিয়া গিয়াছে।......তখন প্রায় প্রার্থনার সময় হইয়া আসিয়াছে। গান্ধীজি প্রার্থনার উপক্রমে মীরা বেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবদাস কোথায় ?" "সে রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছে।" "মহাদেব ?" "উপস্থিত নাই।" "গীতা ?" মীরা বেন বলিলেন "গীতা গৌরগোপাল পড়িবে।" গান্ধীজি—"গৌরগোপাল আছ ?" "হাঁ, আছি।" সে প্রাতে গৌর-গোপালের কপালে দুঃখ লেখা ছিল। প্রার্থনা হইয়া গেল। গৌরগোপাল গীতা পড়িতে লাগিল। তাহার উচ্চারণ অশুদ্ধ, বহি দেখিয়া পড়িলেও সে ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়িতেছিল। পড়া হইলে পর গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মীরা বেন, গৌরগোপাল পড়িতে পারিবে, একথা তুমি কেন বলিয়াছিলে ? গৌর-গোপালকে পড়িতেই হইবে, এমন ত নয়। প্যারীলাল উপস্থিত ছিল। সেই ত পড়িয়া থাকে। গৌরগোপাল, তুমিই বা কেন পড়িলে ? তুমি আজ প্রায় চার মাস আছ। গীতা পড়িতে ইচ্ছা করিলে শিখিয়া লইতে পারিতে। আমার সঙ্গে যাহারা থাকে তাহারা ত শিখিয়া লয়। তোমার পড়া ভুল, আমার বোধহয় তোমার অর্থবোধও নাই। এমন পড়া নিরর্থক। সামাজিক প্রার্থনায় কেবল কি উচ্চারণ করিলেই হইল। উহার কি অর্থবোধ থাকা চাই না, উহাতে কি হৃদয় থাকা চাই না ! পড়া ব্যর্থ হইয়াছে। এ তো পরীক্ষা দেওয়ার স্থান নয়, যে মীরা বেন বলিয়াছে তাই পরীক্ষা দিতে হইবে। নিজের মর্য্যাদা (সীমা) বুঝিয়া চলিতে হয়। বিনয়ের সহিত অস্বীকার করিলেই পারিতে।"

তারপর সেবিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে গান্ধীজির কথাই শুনিবেন, প্রশ্ন নয়। একজন সেবিকা একখানা চিঠি ও খাতা রাখিয়া গেলেন। বলিলেন—একটা প্রশ্ন আছে। উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। গান্ধীজি বলিলেন —"হাঁ, বেশ।" তারপর গান্ধীজি সেবিকাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,

"তোমরা যে সকলে তিনটায় উঠিয়া এখানে আসিয়াছ সে জন্য ধন্যবাদ। ভোর তিনটায় উঠিয়া আসা তোমাদের পক্ষে শক্ত। তোমরা প্রেমের বশীভূত হইয়া আসিয়াছ। কিন্তু তোমরা সেবার টানেও আসিতে পারিতে। তোমরা যে আমার প্রতি প্রেমের টানে আসিয়াছ, সেবার টানে আস নাই, তাহার প্রমাণ কি জান ? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রতিদিন ৩টায় উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত আছ ? অনেকেই না, বা কেহই না। তাহা হইলেই দেখ, যদি সেবার জন্য হইত, তবে প্রতিদিনই এই প্রকার করা সম্ভব হইত।

কিন্তু এই ভোরে উঠাতে কষ্টই বা কি ? কষ্ট ত নাইই, বরঞ্চ দেহ ও মন সুস্থ থাকে। ভারতবাসীরা এই রকম বরাবরই উঠিয়া আসিয়াছে, উঠিয়া থাকে। এখানকার রোদ এ রকম, যে দুপুরের তাপে কাজ করার চেয়ে সকাল সন্ধ্যায় কাজ করায় ভাল হয়। চাষের কাজ দুপুরে করা যায় না। চাষারা সেই জন্যই তো খুব ভোরে উঠিয়া চাষ আরম্ভ করে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও সেই সময়েই শ্রম করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যেমন শীঘ্র উঠে, তেমনি শীঘ্র শুইয়া পড়ে। আমি তো গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি। একটু বেশী রাত্রিতে গ্রামে গিয়া আলো

দেখিতেই পাই নাই। দুই কারণে বেশী রাতে আলো দেখিতে পাওয়া যায় না। এক কারণ দারিদ্র্য, আলো জ্বালাইবার তেল নাই। দ্বিতীয় কারণ—শীঘ্র শোয়ার অভ্যাস। শীঘ্র শুইলে তবে না শীঘ্র উঠিতে পারা যায়। তোমরা গ্রামে গেলে ইহাই দেখিতে পাইতে—ইহাই শিখিতে। আমি একথা বলিতেছি না, তোমরা সকলেই গ্রামে ফিরিয়া যাও। তাহা সম্ভব নয়। তোমাদের কাহারও পতি আছে, কাহারও পিতা আছে, কাহারও ছেলেপিলে আছে—তাহাদের সঙ্গে সহরেই থাকিতে হয়। তবু তোমরা মাঝে মাঝে গ্রামে যাইতে পার। বস্তুতঃ তোমরা যে সেবিকা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দাও, সে কি বোম্বাই'এর সেবিকা বলিয়া? না তোমরা ভারতের সেবিকা? ভারত কোথায়? ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে। সেই গ্রামেই শিক্ষার জন্ম যাইতে পার। অনেক কিছু শিখিবার আছে। তোমরাও গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে পার, স্বদেশী ভাবনা দিতে পার, তাহাদিগকে বিদেশী কাপড় পরিতে বারণ করিতে পার। তাহারা কিছুই জানে না, কেন পরিবে না তাহাও জানে না। তোমরা বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব না জাগাইয়া তোমাদের নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি জাগাইবার ভার লইতে পার। তোমরা খাদিদ্বারা বিদেশী বস্ত্র বয়কট করার কথা শিখাইতে পার। খাদির দ্বারা—মিলের দ্বারা নয়। মিলের দ্বারা বিদেশী বহিষ্কার করিয়া গ্রামের কি লাভ? আমেদাবাদ বা বোম্বাইয়ের লক্ষপতির ঘরে আরও কিছু আসিলে গ্রামের গরীবদের লাভ কোথায়? কিন্তু তাহারা যদি খাদি পরে, তবে সমস্ত পয়সা গ্রামেরই লাভ হয়। সে যদি নিজে সূতা নাও কাটে, তবে তাহার যে প্রতিবেশী কাটে, যে প্রতিবেশী বোনে তাহার লাভ হয়। ইহাই অর্থশাস্ত্র। তোমাদের ভিতর শিক্ষিতা ভগ্নী আছেন। তাঁহারা অর্থশাস্ত্র পড়িয়া থাকিবেন। অর্থশাস্ত্র এক এক দেশের জন্ম এক এক রকম। যে শাস্ত্র বিলাতে খাটে তাহা জর্ম্মনীতে খাটিবে না। যাহা জর্ম্মনীতে খাটে তাহা এদেশে খাটিবে না। প্রত্যেক দেশেরই নিজ নিজ অর্থশাস্ত্র আছে। ভারতবর্ষের অর্থশাস্ত্র বলে ঐ কথা—খাদি তৈরী কর, খদ্দর পর।

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। এ ভাল কথা। সঙ্ঘ রাখার প্রধান কথা হইতেছে—নিয়ম পালন করা; সময়ের নিয়ম পালন করা। এটি না হইলে, কোন সঙ্ঘই গড়িয়া উঠিতে পারে না। তোমরা যখন পিকেট করিবে তখন যাহাকে যেখানে কার্য্যের 'ডিউটি' দেওয়া আছে, তাহার ঠিক সময়ে অবশ্যই সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া চাই। যদি না হও, তবে নিশ্চয়তা রহিল না—সঙ্ঘও রহিল না।

এই নিয়মপালনের দিক্ দিয়া প্রাতে উঠিয়া প্রার্থনা করার অভ্যাস ভাল। দিনের কাজ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া আরম্ভ হয়। প্রার্থনা করিতে সংস্কৃত জানা আবশ্যক নাই। গীতা উচ্চারণ করিতে পার। হৃদয় হইতে যে ভাষা বাহির হয়, হৃদয়ের উপর তাহার প্রভাবও হয়। এই জন্ম প্রার্থনা আরবীতে হোক, পার্সীতে হোক, যে ভাষা বুঝি না সেই ভাষায় হোক, তথাপি যদি উহা হৃদয় হইতে উচ্চারিত হয়, উহার প্রভাব যে শুনিবে, যে হৃদয় দিয়া শুনিতে চাহিবে, তাহার উপর হইবেই। আসল কথা, হৃদয় হইতে অর্থযুক্ত বাক্য উচ্চারিত হওয়া চাই। আজকার যে রকম গীতা পড়া হইয়াছে সে রকম হইলে চলিবে না। উহা শিখিয়া লইও না। সামাজিক প্রার্থনার আবশ্যক আছে। কিন্তু যখন আজকার মত ভাবে সামাজিক প্রার্থনা করা হয় তখন তাহাতে সমাজ-সেবা হয় না, সমাজদ্রোহ হয়।

তোমরা যে পিকেট কর, তাহা তো শান্তিপূর্ণ ভাবে কর। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতির সর্ত্তের জন্যই কি ওরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছ? পিকেটিং বরাবরই শান্তিপূর্ণভাবে করিতে হইবে—যুদ্ধবিরতির শান্তিপূর্ণ সর্ত্ত থাকুক আর নাই থাকুক। তাহা ছাড়া বিদেশী কাপড়ের দোকানদারকে ফাঁকি দিও না, লোভের ফাঁদে ফেলিও না। এ কথা বলিও না, যে এত মাসের জন্ম বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ কর। উহা বরাবরের জন্যই বন্ধ করিতে হইবে। স্বরাজ হইলেই আমরা বিদেশী কাপড় কিনিব কি? তাহা ত কিনিব না। সেইজন্ম দোকানদারদিগকে সাফ্ ঐ ব্যবসা ত্যাগ করিতে বলিবে। স্বরাজ হইলেই কি আর খাদির আবশ্যক থাকিবে না? তাহা ত নয়। খাদির সঙ্গে স্বরাজ যুক্ত। একটা না চলিলে আর একটা চলিবে না—এই কথাটা আমি আবিষ্কার করিয়াছি। সেই জন্ম তোমরা নিজেরা যে খদ্দর পরিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট নহে। বাড়ীতে বাক্সে যদি বিদেশী থাকে তাহা জ্বালাইয়া দিও। যদি মিলের থাকে তাহা গরীবকে দিয়া দিও। সকল সময়ে পরার জন্ম কেবল খদ্দর রাখিও। এইবার পালাও। অনেক কথা বলা হইয়াছে, আমার ঘাড়ে কাজ চাপিয়া আছে, এখনি বসিতে হইবে। তোমরা এইবার উঠ—ভাগো—পালাও। প্রণাম?—না, না,

মনে মনে করিও—উহাতে অনেক সময় লাগে যে—তোমরা পালাও।" মেয়েরা হাসিয়া কেহ হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল, কেহ বা উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।"

উপদেশটুকু সবখানিই প্রায় তুলিয়া দিলাম। কি সঙ্ঘধর্ম্মী, কি দেশব্রতী—উভয়েরই পক্ষে কথাগুলি অমূল্য

বাংলার মা ও ছেলে—

বাংলার মা বীরপ্রসবিনী, কিন্তু আজও তাঁরা আপনাকে চিনেন না। বাংলার ছেলে মায়েদের যাহা বলিতে চায়, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বীর সহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের এই পত্রখানিতে সরল করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা বড় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। এই মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানের হৃদয়ের কামনা কি মায়ের জাতির মর্ম্মস্পর্শ করিবে না?

রামকৃষ্ণ তাঁহার বৌদিদিকে লিখিতেছেন—

"তোমার চিঠিতে জানিলাম—মা নাকি কোথায় ঠাকুর পূজা করিতে গিয়াছিলেন। সত্য বলিতে কি মধ্যে মধ্যে এই ঠাকুরদেবতাগুলির উপর আমার বড় রাগ হয়। তাঁরাও কিছু পরিমাণে আমাদের অবুঝ মা বেচারীদের দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছেন। এই মায়ের জাতিটা এমনই পাগল—'ছেলে' ছাড়া তাঁরা আর কিছুই জানেন না। এই মাতৃত্বের কাছে আমি মাথা নোয়াইতেছে। কিন্তু 'আমার ছেলে, আমার ছেলে' করিয়া মা-দের জীবন কেবলই বিষময় হইয়া উঠিতেছে; এঁরা ছেলের জন্য না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই। দিন নাই, দুপুর নাই—কোথায় ঠাকুরের পায়ে ধন্না দিতে চলিলেন। সময়ে অসময়ে পূজা পার্ব্বণ, ব্রত, মানাৎ, না করিতেছেন এমন-কিছু নাই। কিন্তু এইগুলি দেখিয়া আমার কেবল কষ্ট লাগে। ইহাতে মায়েদের দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলে। মায়েরা যখনই ঠাকুর পূজা করেন, দেবতাকে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করেন, তখন নিজেদের ছেলেদের মঙ্গল-কামনা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না। নিঃস্বার্থভাবে সমুদয় শুভ অশুভ ভগবানের পায়ে সমর্পণ করিতে তাঁহারা পারেন না, তাঁহারা জোর করিয়া ঠাকুরের কাছ হইতে নিজের ছেলের মঙ্গল আদায় করিতে চাহেন। কিন্তু পাথরের ঠাকুর—সে কি শুনে? দুনিয়ার সকল ছেলেমেয়ের কথা তাঁহাকে ভাবিতে হয় কি না। এই নিমিত্ত তাঁহার অনন্ত লীলায় আমাদের মানববুদ্ধির খেই হারাইয়া যায়। তাঁহার মঙ্গলহস্ত সকলের উপর রহিয়াছে। কিন্তু মায়ের জাতি তাহা বুঝেন না, ভগবানের ইচ্ছার উপর তাঁহারা নিজের ছেলেদের বিলাইয়া দিতে পারেন না। ফলে, যত পূজাই করুন, প্রণাম করিয়া কপাল ভাঙ্গুন, কিছুতেই তাঁহাদের ইচ্ছামত ছেলেদের পাইতে পারেন না। যে মা পারেন, তিনি অনেক শক্তিময়ী। আর যে ছেলের তেমন মা আছে, তাহার মত সৌভাগশালী ব্যক্তিও পৃথিবীতে নাই। জানি, ইহা খুব শক্ত কথা। কিন্তু একথাও ধ্রুব সত্য, যতদিন 'নিজের, নিজের' করিয়া মায়েরা কাঁদিবেন ততদিন দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। দুনিয়ায় এত ছেলেমেয়ে আছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন মায়েরা নিজের ছেলের স্বরূপ দেখিতে পাইবেন তখনই তাঁহাদের মাতৃত্ব সার্থক হইবে; আর সেইদিনই তাঁহারা শান্তি পাইবেন। ঠাকুরের কাছে 'নিজের ছেলে ফিরিয়ে দাও,—দাও' করিয়া যতই তাঁহারা কাঁদিতে থাকেন, ঠাকুর ততই বাঁকা হইয়া বসেন, হয় ত মুখ ফিরাইয়া হাসেন। তাঁহার কষ্টিপাথরে পৃথিবীর সকল নরনারীর কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। তাহা উত্তীর্ণ হইলে, সত্যই নিঃস্বার্থ ও কামনাশূন্য ভক্তির দরকার। যতদিন মনের সে অবস্থা না আসিবে ততদিন এঁরা শুধু কাঁদিবেন আর জপ, তপ, পূজা, সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। প্রকৃত মঙ্গল তাঁদেরও আসিবে না, তাঁদের ছেলেদেরও না।

তোমার কাছে আমার অনুরোধ—তোমরা মাকে যেখানে সেখানে যাইতে দিও না। আমাদের ঠাকুরঘরে বসিয়া তিনি যে শান্তি পাইবেন, দূরে ঠাকুর দেবতার কাছে তার চেয়ে বেশী কিছু পাইবেন না। তীর্থ শুধু তাদের জন্য—যাদের মনের প্রসারতালাভ করিয়াছে, যাঁরা খুব কম 'আমার, আমার' করেন, প্রকৃত শান্তির অধিকারী তাঁরা।......"

বাংলার মা যোগ্য-সন্তানের যোগ্য-জননী হউন —এই প্রার্থনা।

বাংলার সঙ্কট—

"সঞ্জীবনী" লিখিতেছেন :—

"আষাঢ় মাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই সময়ে আউস ধান, তিল ও নূতন পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা কিছু

টাকা সঞ্চয় করে। কিন্তু এবার কাহারও টাকা নাই। এমন দুর্দ্দশা বাংলা দেশে কখনও হয় নাই।

চাউলের অভাব নাই অথচ নরনারী উপবাস করিতেছে। এক মণ চাউল তিন টাকায় পাওয়া যায়, চাউল এমন সস্তা বিগত ৫০ বৎসরে হয় নাই, তবু লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

বাংলার জমিদারের হাতে টাকা নাই, এই জুনের কিস্তির সদর খাজনা অনেকেই দিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানেন, সদর খাজনা না দিলে জমিদারী নীলাম হইবে, তবু নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে পারেন নাই। বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় বহু সংখ্যক লোন আফিস আছে, কোন আফিসেই টাকা নাই। গ্রাম্য মহাজনদের হাতে এক কপর্দ্দকও নাই—সুতরাং ঋণ পান নাই।

কৃষক যাহা পাইয়াছে সেই দামে আউস ধান তিল ও পাট বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে তাহাদের দুই চারিদিন চলিয়াছে, আর একটী টাকাও তাহাদের হাতে নাই। বাংলার মত দেশ যে এমন অর্থশূন্য হইতে হইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।"

পরে ইহার কারণ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা জানাইতেছেন :—

"বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর অর্থশোষণ হইতেছে। বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ, বেহার ও উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়া কুলী, ধোপা ও নাপিতের কাজ করিয়া বাংলার অর্থ লইয়া যাইতেছে। অবাঙ্গালী মুচি আসিয়া বাঙ্গালীর টাকা নিজের ঘরে সঞ্চয় করিতেছে। পাঞ্জাবী মোটর ড্রাইভার আসিয়া বাংলার অর্থ স্বদেশে পাঠাইতেছে। গুজরাট, কচ্ছ, মাড়োয়ার ও পঞ্জাব হইতে বহু লক্ষ লোক আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছে এবং [বাঙ্গালীর কোটী কোটী অর্থ নিজের দেশে প্রেরণ করিতেছে।

বাঙ্গালী যথার্থই সকলকে কুটুম্ব মনে করিতেছিল; কিন্তু এখন এমন দশা হইয়াছে, বাঙ্গালীর সকল অর্থ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী এখন ফকির। পাটই বাঙ্গালীর ভরসা। সেই পাটের দর যদি না বাড়ে, তবে বাংলা বাঁচিবে না।

অর্থাভাবে ইউরোপের বাণিজ্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং বাংলায় পাট, চাউল, চা ও চামড়ার রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে বিদেশীয় টাকা বাঙ্গালী আর পাইতেছে না। তাহাও বাঙ্গালীর অর্থশূন্যতার আর এক প্রধান কারণ।

অবাঙ্গালীরা বাংলার টাকা টাকা লইয়া গিয়াছে। অপর দিকে বাঙ্গালীর উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে—সুতরাং বাঙ্গালী আজ ফকির।"

বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" সম্পাদক কতকটা স্বরূপ-চিত্রই দিয়াছেন। কিন্তু পাট ছাড়া কি বাঙ্গালীর বাঁচিবার আর পথ নাই? লেখক প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণাপত্রে কিছু আশার সঙ্কেত দেখিয়াছেন :—

"অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, মিঃ হুভারের কার্য্যের ফলে, ইউরোপ ভারতবর্ষ হইতে চাল, গম, পাট চা ইত্যাদি ক্রয় করিবে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে বাংলা বাঁচিবে—নতুবা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

কিন্তু একথা তিনি যে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রত্যয় করেন না, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে :—

"সে যাহা হউক, বাঙ্গালী ভিন্ন বাঙ্গালীকে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। যে সকল বাঙ্গালী পাটের ব্যবসায় করিতেন, তাঁহারা মিলিত হইয়া পাটের ব্যবসায় করুন। বাঙ্গালীর পাট বাঙ্গালী ক্রয় করুক। বাঙ্গালী ক্রেতা যত উচ্চ মূল্যে সম্ভব বিদেশী মহাজনদের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিন।

স্বদেশ-প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মহাস্বার্থত্যাগের সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালী জন্মভূমিকে বাঁচাইবার জন্য পাট-ক্রয় করুন। সেই পাট যেমন রামগোপাল ঘোষ, যেমন শ্যামাচরণ বল্লভ সাক্ষাৎভাবে বিদেশী মহাজনদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন, তেমনি করুন। অবাঙ্গালীরা নামমাত্র দামে চাষার পাট ক্রয় করিয়া বাঙ্গালীকে যে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে সে পথ বন্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে রক্ষা করুন। যদি এই কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত না হন, তবে দুই এক মাসের মধ্যে বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু নরনারী

মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে, বাংলার যত শুভ অনুষ্ঠান সমস্ত বন্ধ হইয়া যাইবে, বাংলা দেশ ভারতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রদেশের অপেক্ষা হীন হইয়া যাইবে।"

স্বার্থত্যাগ, তথা সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থত্যাগেরই প্রয়োজন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনই দ্বিমত নাই। আমাদের মনে হয়, শুধু পাট কেন, ধান, চাল, চা অথবা বস্ত্রশিল্প—সর্ব্ববিষয়েই একটা গঠনকরী সঙ্ঘনীতি বাঙ্গালীর জাতি হিসাবে নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়াছে। কংগ্রেস রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া এ বিষয়ে অনেক কিছুই করিতে পারিতেন—কিন্তু বাংলার কংগ্রেস আজ দলাদলি ও অন্তরবিরোধে ছন্নছাড়া—সেখানে কাজ করিবে কে? তাই নূতন শক্তি জাগাইয়াই বোধ হয় বাঙ্গালীকে আর একবার আত্মরক্ষা ও আত্মগঠনের আয়োজনে ব্রতী হইতে হইবে। এই গঠন-যজ্ঞের নীরব সাধকবৃন্দ আজ ঘর ছাড়িয়া কি বাহিরে আসিবেন না?

পুস্তক-পরিচয় ও সমালোচনা

মুক্তিপথে—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বাংলায় এক উদীয়মান্ খাঁটি কবির পরিচয় পাইয়া আমরা সত্যই আশান্বিত ও পুলকিত হইয়াছি। জনৈক সুপ্রসিদ্ধ নেত্রীস্থানীয়া মহিলা আমাদের একবার বলিয়াছিলেন, বাংলার স্বদেশীযুগের উন্মেষে সাহিত্যের কলকণ্ঠ শত সহস্র সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, সে জাগরণযুগের মধ্যে ছিল স্বভাবনিহিত মহাকাব্যের উপাদান—মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যুগে এই জাগরণ ভারতব্যাপী হইলেও, ইহা নীরস ও কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়, কেন না ইহার ফলে প্রবুদ্ধ জাতি-চেতনা স্বভাব-সুন্দর নব-সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই—কথাটা যে ব্যর্থ তাহা এই একটী মাত্র কাব্যগ্রন্থ পড়িলেও স্বতঃই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। প্রভাতবাবুর কণ্ঠে সত্যাগ্রহের হৃদয়-গীতাই জয়ধ্বনি তুলিয়া বাহির হইয়াছে—একটা সহজ স্বচ্ছ, নৈসর্গিক কবি-প্রেরণার অনাবিল প্রাণস্রোতঃ বুকে লইয়াই। তাই কবিতাগুলির মধ্যে অনিবার্য্য হৃদয়াবেগ তরঙ্গ তুলিয়া ছন্দোবন্ধে যে কলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা জয়যাত্রী মানবাত্মারই মুক্তি-অভিসারে পদক্ষেপধ্বনি। বাঙ্গালী সত্যাগ্রহকে প্রাণ দিয়াই বরণ করিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের কথা নয়। কেন না,—

"ভারতের প্রান্তে বসি মন্ত্র দিল গুরু,
মুক্তিপথে রক্তহীন যজ্ঞ হল সুরু—"

এখানে মানবগুরুর কণ্ঠ দিয়া বাঙ্গালী আজ মহামানবেরই মুক্তি-আহ্বান শ্রবণ করিয়াছে—কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই ত' কবি গাহিতে পারিয়াছেন—

"ব্যথিত ভগবান ব্যথিত ধরা,
পাপের পরিণাম হয়েছে সুরু।
মোদের সেনাপতি আজ অখিলপতি
মোদের গুরু আজ জগদ্গুরু।"

—আর দেশবাসীকে সেই অনুভূতির তারে ঝঙ্কার দিয়াই ডাক দিয়াছেন—

"গুরু বলি, নেতা বলি, রণক্ষেত্রে সেনাপতি বলি,
আত্মার আত্মীয় বলি—দেহ তাঁরে প্রাণের অঞ্জলি।"

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"
—এ মহাসত্য যে জাতির প্রাণের কথা, তাহারই মুখে এ উদাত্ত ঘোষণা শোভা পায়—

"হে কবি, যে নব গীতা
যে মহাভারত হতেছে রচিত, তুমি তার রচয়িতা॥
মোর মত ঘনকৃষ্ণ মসীরো মাঝে
তোমার লেখনী রত আজ তব কাজে;
যে উদার শ্লোকে আজি লোকে লোক
জোগায় জীবন নব—
হে মহাতাপস, সে মহাকাব্য, সকলি রচনা তব।"

কবি একটী আঁচড়ে কেমন সহজ ছন্দে এই আন্দোলনের একটা স্বরূপচিত্র দিয়া ফেলিয়াছেন—

"তারাই মেয়ে, তারাই দেশের ছেলে
অটল যারা নির্য্যাতনের মাঝে;
মর্‌ছে তবু, সর্‌ছে না কাজ ফেলে
পথে পথে ফির্‌ছে মায়ের কাজে।
অগ্নিদাহে সর্ব্বহারা তবু—
অত্যাচারে মান্‌লে না যে কভু;
আজ ব্যথা তার বুঝ্‌ছে জগৎ-প্রভু,
আজ যশে তার সারা জগৎ ভরা।
মিছেই তোদের জ্ঞানের অহঙ্কার,
মিছেই তোদের মানবদেহ ধরা!"

দেশের নারীকে তিনি ডাকিয়া কহিয়াছেন—

"হয় মৃত্যু, নয় জয়
—ক্ষুদ্র গৃহসুখ যাক্ টুটে।

* * *

যে দেয় সে দিক্ গ্লানি—নিজ ঘরে
রাজেন্দ্রাণী, জাগ তুমি আপন গৌরবে।
যাহা কিছু অমলিন নিঃশেষে করুক লীন
তোমার কল্যাণ শঙ্খধ্বনি,
জাগো দেবি, শক্তি-স্বরূপিণি!"

ভাইফোঁটার দিনে, তরুণ কবির মনের দুয়ার খুলিয়া গিয়া বৃহৎকেই আত্মীয়বেশে পুলকোচ্ছ্বাসে অভিনন্দিত করিতেছে—

"আজ হয়েছে ঘরটা কিছু বড়—
বোনের সংখ্যা আজকে কিছু বেশী;
ভাই-দ্বিতীয়ার সকাল বেলায় তাই
আড়ম্বরের নাইকো কোন লেশই!

* * *

আমার দেশের যেথায় যত বোন
ভাই-দ্বিতীয়ায় ভায়ের সোহাগ করে—
আজ মনে হয় তাদের সবার কাছে
একটী ফোঁটা আছে আমার তরে।
আমায় তারা চেনে না, মোর তায়
কি-ই বা ক্ষতি, কি-ই বা আসে যায়?
আমি তাদের সবাইকে যে চিনি,—
ঘরে ঘরে সবার আমি ভাই।
পরের নিষেধ ঘিরেছে চৌদিকে
ঘরের নিষেধ সরেছে আজ তাই।"

কেমন সহজ, কেমন সুন্দর! কবিকেও তিনি আকুল স্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন—এ মহাজাগরণে—

"কবি—সে কি শুধু কথা কবে?
শুধু নিজ গৃহকোণে রবে?"

না, শুধু কথা নয়, হওয়ারই জন্য তার তপস্যা চাই।

"আগে ত' মানুষ হ'-রে
কবি হস্ তার পরে—
না হলেও দুঃখ কিছু নাই।"

"আপন জীবনটারে শুধু তুই করে' যারে
একখানি কাব্য মনোহর।

কে তা' বোঝে, কে না বোঝে
কাজ কি তাহার খোঁজে?
নিজে হবি সার্থক সুন্দর।
সত্য বলে' যা জানিবি, নির্ভয়ে বরিয়া নিবি,
যত হোক কর্কশ কঠোর;
কিছু ফিরে চাহিবি না;
দীপকে বাজিবে বীণা
প্রতি পদে প্রতি কাজে তোর।"

লেখক স্বয়ং এই জীবনের দীক্ষাই বরণ করিয়া মহামানবের মুক্তিস্রোতে প্রাণ মিলাইয়াছেন—কবিতাগুলি এই তীর্থযাত্রীরই পথের সঙ্গীত—প্রাণের অভিসারের অকুণ্ঠ ইতিহাস অবারিত ভাষা ও ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভূমিকায় লেখক স্বীকার করিয়াছেন—ইহা ঠিক কবিতার বই নহে—প্রাণের ইতিহাস। কিন্তু প্রাণের সত্য ইতিহাসই যে খাঁটি কাব্য। তাই এই নবীন কবিকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি।

মেবার মহিমা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। রাজস্থানের বীর-কাহিনী সহজ পদ্যগাথায় প্রকাশিত। ছন্দ অনেকটা সে যুগের কাশীবাসী কৃত্তিবাসী অনুসরণে বিরচিত বলিয়া, সর্ব্বজনবোধগম্য হইয়াছে; কিন্তু আধুনিক মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিতগণের কতটা তৃপ্তিদান করিবে বলিতে পারি না। বইখানি ছেলেদের বিশেষ উপযোগী।

সাধক কণ্ঠহার—দেবকীনন্দন ধর্ম্ম-প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের উজ্জ্বল মণি—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পবিত্র পদাবলীকে মূল উপাদান করিয়া এই "সাধক কণ্ঠহার" বিরচিত হইয়াছে। যে কাব্যের বিষয় পরম অমৃত তাহা নিজ গুণেই ভাষায় ছন্দে ও ভাবতরঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। রসিক জনের ইহা বিশেষ উপভোগ্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

১। রামায়ণম্ (১ম খণ্ড)—শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর, এম-এ, পি, এচ, ডি।

২। উনিশ শ' পাঁচ সালের বাংলা—আর্য্য পাব্লিশিং হাউস।

৩। বিপ্লববাদী—শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল।

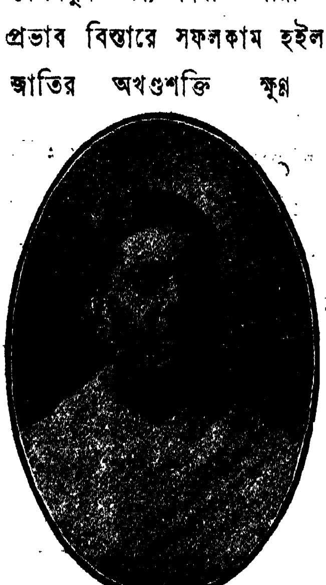
৪। বধূবরণ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।



প্রবাহ

৺দেশবন্ধু স্মৃতিবার্ষিকী—

বাংলার ভাবমূর্ত্তি স্বর্গত দেশবন্ধুর বাৎসরিক স্মৃতিপূজায় বাঙ্গালীর প্রাণ একবার করিয়া সাড়া দেয়। আজ পাঁচ বৎসর হইল দেশবন্ধু ইহলোকে নাই, তাঁহার ত্যাগতপস্যা, প্রতিভা ও জাগ্রত ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গালীকে আর প্রত্যক্ষতঃ তেমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে না। দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্যবর্গ আজ রাষ্ট্রপ্রাধান্যের জন্য পরস্পর কলহ-রত—রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মাথা হেঁট হইলেও, তাঁহাদের আন্তরিক লজ্জাবোধের নিদর্শন এখনও প্রস্ফুট দৃষ্টিগোচর হয় না। দেশবন্ধুর বাংলা আজ লজ্জায় মুখ ঢাকা দিয়াছে। দেশযজ্ঞে বাঙ্গালীরই একদিন পৌরহিত্যের অধিকার ছিল। রাজা রামমোহন হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই অধিকাররক্ষার স্বাভাবিক ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেদিন পর্য্যন্ত বাংলার গৌরব ধারাবাহিকভাবে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। যেদিন বাংলার যুগপূর্ব্বের চিন্তাকেই সারা ভারত অন্তরে গ্রহণ করিয়া ব্যাপকতর রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবযুগের শুভ সূচনা করিল, ভারতের তপোমূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধীর বিশুদ্ধ দেহে অবতীর্ণ হইয়া যুগ-সাধনার নিয়ন্ত্রণ-ভার সহসা আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তাঁহারই অগ্নিময় স্পর্শে ভোগজীবনের মোহঘোর চিরতরে ঘুচাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন পণ্ডিত নেহেরু ও বাংলার দেশবন্ধু। সেদিন সুপ্তিভঙ্গের উৎসব—চারিদিকে অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গেল। প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় এই ত্যাগবীরদ্বয়ের চরণতল হইতে ত্যাগ ও করুণার রশ্মিধারা বিচ্ছুরিত হইয়া বাংলা ও ভারত প্লাবিত করিল। গুরু শিষ্যের হইয়া পড়িলেন। দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা মহাত্মার গুরুভাবকেও অতিক্রম করিয়া যুগসাধনারই আর একটা নূতন পর্য্যায় রচনা করিল। বাংলার রাষ্ট্রমন্ত্র আর একবার দেশবন্ধুর মধ্য দিয়া সারা ভারতে আপনার প্রভাব বিস্তারে সফলকাম হইল; কিন্তু ইহাতে জাতির অখণ্ডশক্তি ক্ষুণ্ণ হইল। মহাত্মা অশ্রু-সিক্ত-নয়নে নতমুখে এই নব-প্রভাব বরণ করিয়া বিরাট্ হৃদয়ে যথাসাধ্য সকলকেই স্থান দিতে চেষ্টা করিলেন। দার্জ্জিলিঙের শৈল-শৃঙ্গে দেশবন্ধুর সহিত নিবিড়তর পরিচয়ে মহাত্মা বাঙ্গালীর হৃদয়শক্তির নিঢ় মর্ম্ম অবগত হইলেন ও নিজ হৃদয়ে তাহা সংহরণ করিয়া লইলেন। এই রুদ্র সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি 'একে একে শুধু দেশবন্ধু নয়, পণ্ডিত নেহেরুরও মহাতীর্থযাত্রা প্রত্যক্ষ করিলেন—তারপর স্বরাজ-সংগ্রামের অখণ্ড বিজয়মুকুট আবার নিজের শিরে ধারণ করিয়া দেশ ও জাতির অদ্বিতীয় যুগনেতার আসন পুনরধিকার করিলেন। ইহা



৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বাংলার পরাজয়। কিন্তু দেশবন্ধুর অমর ইচ্ছার জয় রুদ্ধ হইবার নয়। তাই আজ "রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে" অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রমহামণ্ডলের একমাত্র প্রতিভূরূপে নির্ব্বাচিত মহাত্মা দেশের ইচ্ছা বরণ করিয়া সন্ধিপ্রচেষ্টায় অগ্রসর। আমরা জানি, ইহা দেশবন্ধুরই শেষ ইচ্ছা। গত যুগের যে রাষ্ট্রনৈতিক ভুলের (blunder) জন্য দেশবন্ধুপ্রমুখ মহাত্মার প্রতি অনুযোগ পোষণ করিতেন, এবার তাঁহাদেরই অভিজ্ঞতা তিনিও মানিয়া লইয়াছেন। ইহাতে তপস্যার যুগ আজ রাষ্ট্রীয় বুদ্ধিচালনার নিকট ম্লান হইয়া পড়িল কি না কে জানে—কিন্তু ম্লান হইলেও, এ ছায়া সাময়িক। সন্ধি-পর্ব্বের অবসানে জয় কিম্বা পুনর্যুদ্ধ—কি ভারতের অদৃষ্ট-লিপি তাহা জানা না থাকিলেও, দেশবন্ধুর জীবন-মরণের সাধনা ভারতের জীবনে কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। আজ দেশবন্ধু নাই, কিন্তু তাঁর অমর আত্মা যুগ-সাধনায় বাঙ্গালীকেই আজও অগ্রগামী নেতৃরূপে সেখানে দাঁড়াইতে তারস্বরে আহ্বান করে, বাঙ্গালীর প্রাণ সেখানে এখনও সাড়া দেয় না কেন? দেশবন্ধু যে নবজাতি-গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সংঘর্ষণে সে স্বপ্ন সিদ্ধ করার শুভ অবসর জীবনে পান নাই—কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের পর, আজও কি তাঁর সাধের বাঙ্গালীজাতি তাঁর হৃদয়-স্বপ্নের মর্ম্ম অবধারণ করিবে না? দেশবন্ধুর স্মৃতি-পূজা—বাঙ্গালী, এবার জীবন দিয়া অনুষ্ঠানের সুরু কর। বাংলায় গঠন-যজ্ঞ পূর্ণ হৃদয় ও পূর্ণ প্রাণ লইয়া এবার আরম্ভ হইয়া যাক্। এই জাতিগঠনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীই আবার যোগ্য পুরোহিতের বেশে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভারতকে নবজাতি রচনায় আহ্বান করিবে। ইহাই দেশবন্ধুর মরণাতীত মর্ম্মবাণী। ইহাই তাঁহার যোগ্য স্মৃতি পূজা। বাঙ্গালী এই মহাব্রতে দীক্ষা লও। দেশবন্ধুরই হৃদয়নিহিত সৃষ্টিমন্ত্র জাতি-সংগঠনের মধ্য দিয়া সিদ্ধ ও বস্তুতন্ত্র করিয়া তোল।

বিদেশের সহানুভূতি

ভারতের অভিনব মুক্তিসংগ্রামের বড় দিক্—জগতের গতানুগতিক সংস্কার ঘুচিয়া ধীরে ধীরে একটা নূতন দৃষ্টির উন্মোচন। বিরুদ্ধস্বার্থ জাতি ইহার মর্ম্ম হয় ত এখনও ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহিবে না, স্বতঃ-দীপ্ত সত্যের প্রতি চক্ষু মুদিয়া উদাসীন থাকিবে বা কদর্থ করিবে; কিন্তু যেখানে উচ্চ প্রাণ ও নিঃস্বার্থ ভাবুকতা সেখানেই ইহার উদার ও স্বচ্ছ মহিমা উত্তরোত্তর প্রতীয়মান হইবে। ভারতের নিরস্ত্র-সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া বিদুষী ইংরাজ মহিলা শ্রীমতী মার্গারেট কাজিন্‌স্ কলম্বো হইতে লিখিতেছেন—"...গত বৎসরের অহিংস-সংগ্রাম ভারতীয় নরনারীর অপূর্ব্ব সঙ্কল্পশক্তি, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—এ বৎসর সন্ধি-সাধন পর্য্যায় চলিয়াছে। আজ তাই আমার বাণী—এই সন্ধিপর্ব্বে কংগ্রেসের সংহতিশক্তি আরও দৃঢ় ও অটুট করিয়া তোলা হউক।... ভারতের এই সংগ্রামনীতির জয় শুধু ভারতেই সম্মান ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহার দ্বারা সর্ব্বজাতির সম্মুখে এক নূতন আদর্শনীতি সংস্থাপিত হইবে—বিশ্বজাতির যে নিরস্ত্রীকরণ মহাসভার শীঘ্রই অধিবেশন হইবে, তাহাতে এই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের খুবই প্রয়োজন হইয়াছে।"

শুধু শ্রীমতী কাজিন্‌স নহেন, আমেরিকার সহানুভূতিপরায়ণ নেতৃমণ্ডলী ভারতের প্রতি তাঁহাদের সমবেদনার মর্ম্মপ্রকাশের জন্য যে বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারও সংবাদ আসিয়া

পৌঁছিয়াছে। গত ৫ই জুন সকাল ৭-২০টা হইতে আধ ঘণ্টা কাল সারা নিউইয়র্ক সহরে আগামী লণ্ডন মহাসভায় মহাত্মার স্বরাজলাভের শুভ প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য রেডিওযোগে আমেরিকার সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থনবাণী দিকে দিকে ঘোষণা করা হইয়াছিল। নিউইয়র্কের সর্ব্বপ্রধান হোটেল -এষ্টর হোটেলে নেতৃবর্গের এক প্রকাণ্ড সম্মিলনীতে সেনেটর রয়াল-এফ-কোপলেণ্ড—যিনি আমেরিকান কংগ্রেসে হিন্দু-নাগরিকের অধিকারসূচক বিধান ও অন্যান্য অনুরূপ বিধানের প্রস্তাবনা করেন—তিনি এই রেডিও-প্রোগ্রামের উদ্বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাঁহার পরে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের জজ প্রধান রাষ্ট্রবিদ্ আইরিশ-আমেরিকার সর্ব্বজনমান্য নেতা ডানিয়েল-পি-কোহালন এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর, ভারতের প্রবাসী তরুণ শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ "আমেরিকার অভিমত ভারতের কতখানি আনুকূল্য" করিতে পারে তৎসম্বন্ধে চিন্তাকর আলোচনা করেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বক্তাগণের মধ্যে মিঃ আপ্‌টন ক্লোজ, সামরিক নেতা মেজর ইউনিয়ন কে, কিওেড, ধর্ম্মমণ্ডলীর (Federal Council of Churches) নেতা মিঃ ফ্রান্সিস-জে-ম্যাক'ওনেল এবং রেমণ্ড রবিন্স স্ব স্ব মণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভারতের প্রতি সহানুভূতিবার্ত্তা প্রকাশ করেন।

অতঃপর, এই স্মরণীয় সম্মিলনীক্ষেত্রে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে মহাত্মাজীর প্রতি সম্মাননাসূচক একটী মহাভোজ দেওয়া হয়—উহা "Gandhi Testimonial Dinner" নামে প্রখ্যাত। অতঃপর এই মহাভোজের চিত্র "টেলিভিষণ" যন্ত্রযোগে সারা দেশময় সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত করা হয়। ইহা ব্যতীত আমেরিকার ৪৪,০০০ চলচ্চিত্রে যাহাতে এই ঘটনাচিত্র প্রদর্শিত হয়, তাহারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল

ভারতের প্রতি আমেরিকার এইরূপ সহানুভূতি-পূর্ণ অভিমত গঠনের জন্য শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধারাবাহিক উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়।

সোমেশচন্দ্র—

বন্ধুবর সোমেশচন্দ্র প্রতিভার দিগ্বিজয়ী গৌরব লইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। আমেরিকা তাঁহাকে "আশ্চর্য্য ভারতের আশ্চর্য্য সন্তান" বলিয়া অভি-নন্দন করিয়াছে। আর তাঁহার সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াও তাহারা ততোধিক বিস্মিত—এমন সারল্য, সংযম, তপস্যার আদর্শমূর্ত্তির সম্ভব শুধু তপঃক্ষেত্র ভারতেই, ইহা আজ আর অস্বীকৃত নয়। প্রাচ্যের এই এক যোগদীক্ষিত সন্তানকে প্রতীচ্য যে কি চক্ষে দেখিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা আমেরিকান মনীষি-লিখিত বিস্ময়পূরিত প্রশংসা-চিত্র হইতে অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত বসুকে আমরা বহু পূর্ব্ব হইতে জানি। তাঁহার আশ্চর্য্য মনস্বিতার পরিচয় আমাদের স্বগৃহে সাক্ষাৎকারেই পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিজমুখে যে জীবনপরিচয় শুনিয়াছিলাম তাহাতে ভারতের তপোবীর্য্যেরই যোগ্য নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হই নাই, পরন্তু মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ভারতের যোগ—তথাকথিত "মিষ্টিসিজম্" নহে। যোগ জীবেরই ঈশ্বরাংশের বিভূতি। ইহা অনুশীলন-সাপেক্ষ। তরুণ বয়স হইতেই সোমেশচন্দ্র মনঃ-সংযমের শক্তি আপনার মধ্যে অনুভব করিয়া তাহার অনুশীলনে রত হন। গণিতের চর্চ্চায় তাঁহার এই শক্তির প্রথম স্ফুরণ হয়। ঐ গণিতাঙ্ক মনোমধ্যে

কষিয়া সঠিক উত্তর নির্ণয়ে তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহার বাল্যকালের সঙ্গী ও শিক্ষকবৃন্দ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্কুলের ইনস্পেক্টর তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রথম উৎসাহ দান করেন। তদবধি তিনি ইহার অনুশীলনে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরিশেষে মনে মনে শত সংখ্যার দ্বারা শত সংখ্যার গুণনেও অকাতরে নির্ভুলাঙ্কে উপনীত হওয়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতা অর্জ্জন করেন। বিবাহ



শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু

করিলে এই সংযমশক্তি হ্রাস পায়, এই ভ্রান্ত ধারণার তিনি নিরসন করিয়া প্রতিপন্ন করেন—দাম্পত্য সাধনায়ও ব্রহ্মচর্য্যের স্থান আছে। সংযম-নিষ্ঠ প্রেমের অনুশীলন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই পরিণয়ের অধ্যাত্ম লক্ষ্য—ভারতের গাহর্স্থ্যধর্ম্মের এই পবিত্র আদর্শ তিনি কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। মৃত্যুর ব্যবধানেও এই প্রণয়ের অমর বন্ধন ঘুচিবার নহে—এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের অবকাশ কখনও ঘটে নাই। তাই যেদিন হইতে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইল, সেদিন হইতে তিনি ত্যাগব্রতে একান্ত ভাবে ঝাঁপ দিয়া অমর:সম্বন্ধ বুকে করিয়া অটুট ব্রহ্মচর্য্য ও যোগধর্ম্ম অনুশীলন করিতেছেন। সোমেশচন্দ্র মহাত্মা ভোলাগিরির মন্ত্র-দীক্ষিত শিষ্য। তাঁহার অপূর্ব্ব তপস্যা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনঃশক্তিকে যৌগিক সংযমশক্তিতে পরিণত করিয়া অপার্থিব বিভূতি দান করিয়াছে। এই বিভূতি দর্শনে পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত; কিন্তু ভারতের অমর ধর্ম্মে বিশ্বাসী সাধক ইহাতে যোগেরই মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত ও আশান্বিত। আজ একটী সোমেশচন্দ্র নহে, ভারতীয় যোগবিদ্যার সাধন ও অনুশীলনে শত সহস্র যোগবিভূতিমান্ ও তপোমূর্ত্তি সোমেশচন্দ্র আবির্ভূত হউক—ভারতের জগজ্জয়ী প্রতিভা ও চরিত্রের প্রভাব আবার জগতে সনাতন সভ্যতার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া মানবেতিহাসের মহাযুগ ফিরাইয়া আনুক।

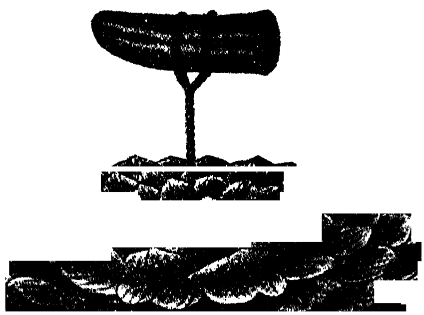
বুদ্ধের দন্ত—

সিংহলে বুদ্ধদন্ত সম্বন্ধে একটী বিচিত্র ইতিহাস কিম্বা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের ৮০০ বৎসর পরে যে "দন্দাদবংশ" (বুদ্ধ-দন্তের ইতিহাস) বিরচিত হয়, তাহাতে পাওয়া যায়, ক্ষেমা নামে অন্যতম বুদ্ধশিষ্য মহাগুরুর চিতাক্ষেত্র হইতে এই দন্তটী কুড়াইয়া লন ও দন্তপুরে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের করে তাহা সমর্পণ করেন। কলিঙ্গরাজ স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ইহা সংস্থাপন করেন ও ইহার পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

ইহার পর, এই পবিত্র দন্ত পাটলীপুত্রে নীত হয়। তথায় ইহার বহু অলৌকিক মাহাত্ম্যের কাহিনী প্রচলিত আছে। যথা—জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে উহা নিক্ষেপ করিলে, উহা শতদল কমলরূপে উপরে ভাসিয়া উঠে। পাষাণে নিষ্পিষ্ট হইলেও তাহা চূর্ণ হয় নাই। পরিশেষে, শ্রমণ সুভদ্র উহা পাষাণ-সংলগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে গুহশিব নামক কলিঙ্গরাজ পুনরায় তাহা নিজ রাজধানীতে লইয়া আসেন ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিঙ্গরাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, রাজা স্বীয় জামাতা দন্তকুমারকে ইহা দিয়া বলেন—তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, ইহা যেন সিংহলরাজকে প্রদান করা হয়। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ নিহত হইলে, কন্যা হেমমালা তাহা তাঁহার মাথায় গুঁজিয়া স্বামীর সহিত গোপনে তাম্রলিপ্তি বন্দরে উপস্থিত হন ও সিংহলের অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করেন। ২৯৮ খৃঃ সিংহলরাজ কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণের রাজ্যকাল। রাজকুমারী ও জামাতা সিংহলে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভিনন্দিত করা হয় ও তাঁহাদের নিকট হইতে এই পুণ্যসামগ্রী পাইয়া মেঘবর্ণ অতি সযত্নে ইহা সুরক্ষিত করেন। সিংহল বার বার তামিল জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত, তখন পবিত্র দন্ত দ্বীপের নানাস্থানে গোপনে রক্ষা করা হইত। পাণ্ড্যগণ দ্বীপ জয় করিয়া রাজধানী হইতে উহা ভারতে লইয়া যান। পরবর্ত্তী সিংহলরাজ স্বয়ং মাদুরায় উপস্থিত হইয়া সখ্যের বিনিময়ে উহার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন ও সিংহলে উহা ফিরাইয়া আনেন।

১৫৬৬ খৃঃ পর্ট্টুগীজগণ সিংহল জয় করেন ও সেই সূত্রে দন্ত আবার গোয়ায় আনীত হয়। বর্ম্মার বৌদ্ধরাজ অগাধ মূল্য দিয়া উহা কিনিতে চাহিলেও, গোয়ার আর্চ-বিশপ উহা দিতে অস্বীকৃত হন ও রাজপ্রতিনিধির অনুমতিক্রমে উহা ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে আর্চ-বিশপ উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বহস্তে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন ও সেই ভস্ম ও অঙ্গার সর্ব্বজনসমক্ষে নদীগর্ভে ফেলিয়া দেওয়া হয় ও সেই স্থানে উক্ত মর্ম্মে একটী স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হয়।

সিংহলবাসীর বিশ্বাস, দন্ত যাহার অধিকারে সিংহলরাজ্য তাহারই হইবে। তাই রাজবংশীয়গণ হস্তীদন্ত হইতে আর একটী সেইরূপ দন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাই মৌলিক বুদ্ধদন্ত বলিয়া প্রচার করেন।



বুদ্ধ-দন্ত

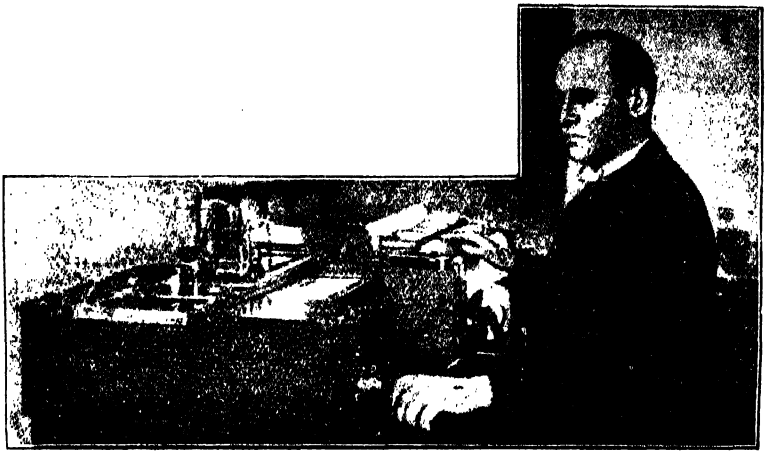
বর্ত্তমান কৃত্রিম-দন্ত প্রাচীন রাজধানী কান্দী সহরে সংরক্ষিত আছে। উহা তারযোগে একটী হিরণ্ময় পদ্মের উপর ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। চারিদিকে মণিমুক্তার ঝালরের মধ্যে-উহা অতি সংগোপনেই থাকে ও কচিৎ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, মন্দিরসংস্কার-কালে এই পবিত্র দন্ত বাহির করা হইয়াছিল ও সিংহলবাসী জনসাধারণ তাহা দেখিতে পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থবোধ করিয়াছিল।

দন্তের এই চিত্রখানি সেই সময়েই জনৈক ইংরাজ মহিলা কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। দন্তটী দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ও মহিলার নিম্নাঙ্গুলীরই সদৃশ ঘনতাবিশিষ্ট।

সিংহলে প্রতি বৎসর মহোৎসব করিয়া এই কৃত্রিম দন্তপূজা সম্পন্ন হয়। এই মিথ্যার উপচারে সত্যের পূজা কি জাতির হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে ?

অন্ধের চক্ষুদান—

যে মহাপ্রাণ অন্ধ মানবের বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রথম তাঁহার সহানুভূতিকে রূপ দিয়াছিলেন—'ব্রেইল" অক্ষর প্রণালী (Braille System) উদ্ভাবন করিয়া, তিনি বিশ্বসংসারের প্রণম্য। পরের সাহায্যে জ্ঞানের আলো লাভ করিয়া অন্ধ তাহার বিধাতার অভিশাপ কতকটা দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরের সাহায্যটুকুও তাহার সহজ জ্ঞানলাভের পথে কত অসুবিধার কারণ তাহা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞানের অঘটনঘটনকরী ক্ষমতায় এ অসুবিধাও এবার বুঝি ঘুচিল! আমেরিকার মাসাচেসেট প্রদেশের অধিবাসী মিঃ নার্নবার্গ "বিশাগ্রাফ" নামে এক নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ যে কোনও পুস্তক অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবে। সম্প্রতি কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ মিঃ অরুণচন্দ্র সাহা এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, এই যন্ত্রের একাংশে পুস্তকখানি স্থাপন করিলে, আলোক-প্রক্ষেপের সাহায্যে উহার অপরাংশে সঙ্গে সঙ্গে যে আক্ষরিক প্রতিচিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাহা স্পর্শযোগ্য হওয়ায় সহজেই অন্ধের পাঠ্য হইবে। এইরূপে অন্ধ ব্যক্তি স্বয়ং যন্ত্র ঘুরাইয়া যে কোন মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি অনায়াসে পড়িয়া যাইবে। এ বড় কম সুবিধা নহে। অন্ধকে এই স্বাধীন পাঠাধিকার দান করিয়া, মিঃ নার্নবার্গ বঞ্চিত মানবাত্মার যে পরম উপকার সাধন করিলেন, তাহা চির কৃতজ্ঞতা ভরে মানব জাতি স্মরণ করিবে। মিঃ নার্নবার্গকে আমরা ভারতের পক্ষ হইতে এই উদ্ভাবনার জন্য অভিনন্দন করিতেছি।



মিঃ নার্নবার্গ—"বিশাগ্রাফে"র আবিষ্কর্তা

মিঃ হুভারের শুভ-চাল—

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জগতের অর্থনীতিক্ষেত্রে এক শুভঘোষণায় একদিনেই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধের

সময় ২১ কোটী পাউণ্ড ঋণ দিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশ কিস্তিবন্দি করিয়া ঋণ শোধ করিতেছেন। গত বৎসর আমেরিকা এই কিস্তিতে ৭২ কোটি টাকা পাইয়াছিল। মিঃ হুভার ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী জুলাই হইতে এক বৎসর কাল ইউরোপের নিকট প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিবেন না।



প্রেসিডেণ্ট হুভার

মিঃ হুভার বলিয়াছেন, ইউরোপীয় রাজ্যসমূহ পরস্পরের নিকট যে টাকা পাইবে, তাহাও তাঁহারা এক বৎসর কাল আদায় করিবেন না। সুতরাং প্রায় ১০০ কোটি টাকা ইউরোপের নানা দেশের লোকেরা ব্যবসায়বাণিজ্যের জন্য খাটাইতে পারিবে।

কাহার নিকট কত পাওনা আছে

ধনকুবের আমেরিকার নিকট হইতে অনেকেই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই তারিখে কাহার নিকট আমেরিকার কত পাওনা ছিল, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	কত ডলার
গ্রেট বৃটেন	৪,৪২৬০০০,০০০
ফ্রান্স	৩,৮৬৫,০০০,০০০
বেলজিয়াম	৪০৪,৭৫০,০০০
ইটালী	২,০১৭,০০০,০০০
পোল্যাণ্ড	২০৯,:৫৭,৭২৬
রুশিয়া	৩০৩,৬২৯,৬৯৮
জেকো-শ্লোভেকিয়া	১৭০,০৭১,০২৩
অষ্ট্রীয়া	২৪,০৩৯,৭৭৩
গ্রীস	১,৯৭০,০০০
রুমাণিয়া	৬৩,৭৬০,৭৬০
জুগোশ্লাভিয়া	৬১,৮৫০,০০০
আর্ম্মেনিয়া	:৮,৪২১, ৫১

ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিও আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর, জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আমেরিকার ১১,৬৩৬,৭৭৮,৬৪০ ডলার পাওনা আছে।

এই প্রস্তাবে জর্ম্মণী উল্লসিত। ক্ষুরধার-বুদ্ধি ইংরাজও ইহা আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিয়া লইয়াছে। ফ্রান্সেরই ইহাতে বিশেষ ক্ষতি। ফ্রান্স তাই এ প্রস্তাবের খুব সতর্ক ভাবেই উত্তর দিয়াছেন।

ভারতের চাওয়া

—:০:—

ভারতের ধর্ম্ম যদি এমনই শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল এবং এখনও তাহার বীর্য্য নষ্ট হয় নাই, তবে ভারতের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। ভারত-ধর্ম্মে জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবে সদুত্তর মিলিবে। কথায় কথা বাড়ে। তর্ক-যুদ্ধে বিশ্বাসের জয় কোথায় দেখিয়াছ?

আজ আমাদের ফরাসী ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় যে একটু প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করি। চন্দননগরের অধিবাসিবৃন্দ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, রাষ্ট্র-তন্ত্রে সাদায় কালায় ভেদ রাখিব না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যে সাধনা তাহা সাধ্যে না কুলাইলেও, এই অনুভূতির একটা মূল্য আছে।

ফরাসীর উপনিবেশসমূহে এক প্রকার শাসননীতি প্রবর্ত্তিতনয়। যোগ্যাযোগ্য ভেদে বিভিন্ন আইন প্রচলিত হইয়াছে। আফ্রিকায় সিনেগেলিদের সাম্যবাদের আদর্শে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ফরাসী ভারতে তাহা হয় নাই। ইণ্ডো চায়নার অনেক স্থানে ব্যবস্থাপক সভায় ফরাসী অধিবাসিদের প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার পর্য্যন্ত নাই। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নয়, ইউরোপের জাতিসঙ্ঘ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যান্তর্গত হইলেও, উহাদের সভ্যতা ও আদর্শের একটা ঐক্য আছে, সেই আদর্শের মাপ-কাঠিতেই শাসনাধিকার কোথায় কি ভাবে কতটুকু দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাপ হয়। সিনেগেলিদের আত্মবৈশিষ্ট্য নাই, বর্ণভেদ আছে; কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ইউরোপ বোধহয় অতিক্রম করিয়াছে—এইজন্যই ইউরোপের সভ্যতা আজ জগজ্জয়ী হওয়ার পথে। ফরাসী ভারত যদি ভারতীয় ভাব ও আদর্শ বিসর্জ্জন দেয়, সিনেগেলিদের ন্যায় ফরাসী জাতির সহিত তুল্যরূপেই তাহার রাষ্ট্রাধিকার পাইবে।

মানুষের স্বাধীনতা দুঃসাধ্য সামগ্রী নহে। বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যই এই পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা যদি ছাড়িতে পারা যায়, আর কিছু না হউক, অষ্ট্রেলিয়া ক্যানেডার মত স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারও ব্রিটিশ ভারত পাইতে পারে। আজ গৌণভাবে বাঁচার তাগিদই বড় হইয়া উঠিতেছে। তাই এই সয়তানী সংশয় ভারতের ধর্ম্মবাদের উপর; কেননা ইহাই তো বৈশিষ্ট্যবাদ ভাঙ্গিতে দেয় না।

পঙ্গু নপুংসক জাতি আত্ম-মর্য্যাদা-রক্ষায় আজ অসমর্থ; তাই আত্মবিক্রয়ের দিকটা বড় করিয়া দেখিতে চায়, দেখাইতে চায়। সম্মোহিত অর্ব্বাচীন যুগের তরুণের চিত্ত হয়তো ইহাতেই বশীভূত হইবে। বিজেতার আদর্শ ও সভ্যতা লইলেই যদি বিজিতের ব্যথামোচন হয়, তবে ধুতি ছাড়িয়া প্যাণ্টালুনে দোষ কি, পাগড়ীর পরিবর্ত্তে হ্যাট্, মন্দিরের বিনিময়ে গির্জ্জার দুয়ারে মাথা ঠেকাইতে বিশেষ আপত্তির কোন কথা নাই।

মনের মতটী না হইলে স্বামীর পত্নীকে, পত্নীর স্বামীকে নাকচ করার অধিকারটাই তো আজ বড় জিনিষ! সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করার দুঃখ অকারণ। দ্বাদশবর্ষের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা ঢের বাঞ্ছনীয়। খ্যাতিলাভের পথ যদি সহজসাধ্য হয়, দুর্গম পথে যাত্রা করিবে কোন আহাম্মুখ? ইহার জন্য খ্রীষ্টান

পাদরীর গলাবাজীর আর প্রয়োজন নাই ; এই দেশেই অনেক বাবাজী গড়িয়া উঠিয়াছেন, ইঁহাদের মুখের মিষ্ট বাণী শুনিয়া আমরা বিভোর হইয়াছি। ভারতের বর্ণ, ধর্ম্ম, সমাজ, আচার বিচারের কথা শুনিলেই আজ চারিদিক্ হইতে চীৎকার উঠে। বলিহারি, রাজার জাতির শিক্ষার প্রভাব! যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও যেমন, "তোর শিল তোর নোড়া"—জাতির দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া আমাদের কাবু করিয়াছে—শিক্ষা সভ্যতা, আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক বাড়ুর্য্যে, চাটুয্যে খাড়া হইয়াছেন ইউরোপের জয় দিতে। ইউরোপ প্রভুর আসনে নিরঙ্কুশ ভাবে বসিয়া থাকিলেই চলিবে, আমরা নিজেরাই আত্মঘাতী হইয়া নিঃশেষ হইব। দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে, জাতির বৈশিষ্ট্যলোপ কতগুণ মারাত্মক তাহা ভাবিয়া দেখার মেধা আজ লোপ পাইয়াছে!

বাঁচাটাই যদি বড় হইত—যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মরিবেন কেন? শিখের বলিদান হইবে কেন? নিজের অনুভূতির উপর এই জ্বলন্ত বিশ্বাস মানুষ মৃত্যুর মূল্য দিয়া জগতে চিরস্থায়ী করিয়া যায়—ভারতের সমষ্টিপ্রাণ আজ কি সে আত্মধর্ম্মের মহিমা বিসর্জ্জন দিবে?

একটা জাতি আজ মরণপথে; মৃত্যু নিবারণ করার করুণা কাহারও নিকট হইতে পাওয়ার প্রার্থনা নিঃস্ব ভীরুর পক্ষেই শোভা পায়। ভারতে কি আজ একজন বীর ক্ষত্রিয় নাই, একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ নাই, প্রতাপ দধীচির মত আত্মদান করিয়া মৃত্যু ছানিয়া অমৃত বাহির করিবে?

ভারতের "অমৃতস্য পুত্রাঃ" কেবল কি স্বপ্ন? ভারতের অপ্রাকৃত নারীচরিত্র শুধু কি কল্পনার বস্তু? ভারতের মুক্তি মোক্ষের অনুভূতি, মনুষ্যত্বের অধিকারবাদ সবই কি অলীক দুঃস্বপ্ন? আজ এইটা প্রমাণ হউক—আমাদের প্রতি বিন্দু রক্তপাতে। নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্কে শিরায় শিরায় ভারতের যে দিব্য সংস্কার ও অনুভূতি তাহা বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। যীশুর মত মরণপণই করিব, আত্মবিশ্বাস তবুও ছাড়িব না। একটা সমষ্টি-চেতনার এই জাগরণ যদি সত্য না হয়—আমি সত্য, আমার মরণবরণই তবে এ জাতির মহিমাবোধকে প্রবুদ্ধ করুক।

কথার ঝাঁজ বলিয়া অবিশ্বাসী আজ তুড়ি দিয়া আমায় উড়াইতে চাহিবে। কিন্তু ইহাই আমার জীবনব্রত সার্থক হওয়ার প্রথম পর্য্যায়। উপেক্ষায় যদি না টলি, অত্যাচার ঘিরিয়া ধরিবে। সত্যের ইহাই তো অগ্নিপরীক্ষা! আজ ব্যষ্টির ধর্ম্ম নয়, সমষ্টির সত্য বক্ষে ধরিয়া ভারত দাঁড়াইয়াছে। ভারতের স্থূল কলেবর যদি পৃথিবীর পীড়নে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তার ধর্ম্ম ও আদর্শের প্রভাব জগজ্জয় করিবে। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের প্রাণ লইয়া একদল নারী পুরুষের অভ্যুত্থান আমরা অতি স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছি।

'ভারত' 'ভারত' করিয়া মরার চেয়ে ইহার বৈশিষ্ট্যলোপ হওয়াই শ্রেয়ঃ। সে এই লয়ের ভিতর দিয়া জগৎকেই পাইবে। ভারতের অহঙ্কার জগতের সত্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে, ভারত-বাসী সে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী হইতে মুক্তি লইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন দিক্। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি বলিয়া একটুও ইতস্ততঃ করিব না, অসহায় দুর্ব্বল বলিয়া এক মুহূর্ত্তও কুণ্ঠা করিব না। আমরা এই কথার উত্তরে সমুচ্চকণ্ঠেই বলিব—এই লোপের পথে ইউরোপই পথপ্রদর্শক হউক না! তাহাদের ঐশ্বর্য্যবল, অস্ত্রবল, বিজ্ঞানের বল বড় বলিয়া কথাটা যদি অসম্ভব মনে হয়, আমাদের বিশ্বাসের বল, অধ্যাত্ম বল, ভাবানুভূতির বলও তুচ্ছ নয়! অন্যের কাছে ইহা নগণ্য হইতে পারে, আমাদের কাছে ইহা

সেকেণ্ডে সাতটা গোলা ছোঁড়ার কামানের চেয়ে অধিক শক্তিসমন্বিত সামগ্রী—আমি রিক্তহস্তেই আমার বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হইব। বন্দুক, তরবারী, লাল পাগড়ী, কারাগার, ফাঁসীর রজ্জু—কোন ভয়েই আমার অস্তিত্ব কম্পিত নয়, অটল হিমাদ্রির ন্যায় ইহা শাশ্বত। এই আত্ম-বিশ্বাস যতক্ষণ একজন ভারতবাসী বুকে ধরিয়া স্থির পদে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ভারতের "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে না।

আত্মপ্রত্যয়হারা মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, গলার জোর ছাড়া এই সকল কথার সারবত্তা প্রমাণের কোন যুক্তি আছে কি? পাল্টা প্রশ্ন কি চলে না, যে আজ কালবশে বিপন্ন হইয়াছি বলিয়া আমার আভিজাত্য বিসর্জ্জন দিবার কি যুক্তি? মরণই তো চরম কথা নহে; মানুষের অনুভূতি, সঙ্কল্প, কর্ম্ম ও ভাবপ্রেরণা মৃত্যু কি কোথাও ব্যর্থ করিতে পারিয়াছে! এই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষের দেহ-লয়েই তো বন্দী গুণাবলী জগৎ ছাইয়াছে! কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্ম আজ যে তরঙ্গে তরঙ্গে পৃথিবীর চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তার করে, ইহা কি ভাবের অমর বীর্য্য নহে? ইউরোপের মনীষি-মণ্ডলী অস্বীকারের ত্রুটি করে নাই, তবুও যে সোপেন হাওয়ে, প্লেটো হইতে ইমারসন্ বার্গসন্ পর্য্যন্ত ভারতের তত্ত্বে প্রতিভাবান্, এ কথা যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ ইউরোপের বাহুতে অসুরের বল, প্রাণে রুদ্রের হুঙ্কার শুনিয়া ঘুরাইয়া নতি জ্ঞাপনের যে সুবচন উপদেশ, তাহা আত্ম-বিক্রীত ভীরুর উক্তি। ইউরোপের অহঙ্কার আজ দুর্জ্জয় বেশে জগতের দুয়ারে স্বর্ণ শাসনদণ্ড হস্তে উপস্থিত—গললগ্নীকৃতবাসে নিরুপায় যে সে দণ্ডবৎ হইবে; আপনার সত্তায় সত্তাবান্ ভারতের প্রাণ স্ব-মহিমায় উন্নত শিরে অতিথিকে সম্মান দিবে, কিন্তু আত্মবিক্রয় করিবে না। প্রবল প্রতাপশালী রাজশক্তির সুসজ্জিত প্রাসাদকক্ষে কটিবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া ভারতের ভাগবত ভিক্ষু যেমন সদর্পে তুল্যাধিকার দাবী করে, নিখিল ভারতের প্রাণ আত্মস্বাতন্ত্র্যের অমর বীর্য্যে তেমনই অপরাজেয় জাতি-রূপে বেশভূষাহীন নগ্ন-মূর্ত্তিতেই দাঁড়াইবে - কোন দৈন্যে সে কাতর নয়। মমতা ভীরুতার বেশেই দেখা দেয়—মরুক ভারতের নরনারী রোগে দারিদ্র্যে, হউক দস্যুর হস্তে লাঞ্ছিত অপমানিত দেশের নারী পুরুষ, এই মহাসংগ্রামে আজ পরাজয়ের দুঃখকে অধিক করিয়া দেখিলে চলিবে না, আজই ন্যুব্জপৃষ্ঠে নতি জ্ঞাপন করিয়া আত্মরক্ষাকে বড় করিলে চলিবে না। মৃত্যু অথবা জয়, এই দুই ছাড়া তৃতীয় পথে ভারতের জাতি পা বাড়াইতে প্রস্তুত নয়—এই কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভারতের ধর্ম্ম চায়—বিশ্বজয়ী হইতে। বিশ্বের উপধর্ম্ম স্বসৈন্যে ভারত আক্রমণ করিয়াছে। মানুষ, তুমি আজ অসহায় নিরুপায় বোধে মাথা নত করার যুক্তি দাও, ভারতের আশ্রয়চ্যুত পরধর্ম্মে অনুরাগী তোমার কথা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে না। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধবিবরণ তোমরা শুনিয়াছ, ভার্দ্দুনের কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছ, সেদিন ইউরোপের মহাশ্মশানে স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল; আর ভারতের কুরুক্ষেত্রে শুধু কি তার কৃষিসম্পদ্, খনিজ সামগ্রী, রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বিধর্ম্মী হানা দিয়াছে, ওগো না—ভারতের ভাণ্ডারে যে ধর্ম্মামৃত মানুষের শান্তি ও আনন্দের যে মহাসঞ্জীবনী সুধা, তাহাই আজ অপহৃত করার নিগূঢ় অভিসন্ধি লইয়া নানা ছলে, মর্ত্ত্যের জীব দলবদ্ধ হইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। হাসিয়া প্রশ্ন করিবে—এ মহারত্ন ঘরে থাকিতে

জগতের বুকে এমন হতভাগ্য জাতি বলিয়া তবে গণ্য হও কেন? মৃত্যুশেলবিদ্ধ ভারত-সৈনিক, আজ বিকারঘোরে এই আত্মগ্লানির কথা উচ্চারণ কর, জীবনের আসক্তিবশতঃ তুমি নিহত হইয়াছ—আততায়ীর অগ্নি-গোলক বুক পাতিয়া বহিবার সামর্থ্য এ জাতির আছে, তাই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে তাহারা নিঃশঙ্ক। এই ঘোরতর সংগ্রামে প্রাকৃত মৃত্যু বড় কথা নহে, অপমৃত্যুর সংখ্যাধিক্য হইলেই প্রতিপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা অধিক। বন্দুকের গুলিতে কয়জনের প্রাণ শেষ হয়—শিক্ষা ও সভ্যতার তীক্ষ্ণ বাণে দেশে হাজার হাজার তরুণের অপমৃত্যু ঘটে। তেলেগু, পাঠান সৈন্যের সাহায্যে ইংরাজ ভারত জয় করিয়াছিল; এইবার এই সব বিশ্বাস-হারা দুঃখকাতর মানুষের সমষ্টি লইয়া আমাদের বুদ্ধি জয় করিতে চায়। এখনও আমাদের পরাজয়ের দিন শেষ হয় নাই। পাঠান মোগলের আক্রমণে আমরা প্রাণে আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেও এ জাতির মৃত্যু হইল না, মহারত্ন ছাড়িল না দেখিয়া আমাদের মস্তিষ্কবৃত্তিতে অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও ভারত বাহ্যতঃ ব্যথিত পরাজিত, মুমূর্ষু বলিয়া বোধ হইলেও, ভিতরে ভিতরে জয়ের আশাই জাগিয়া উঠিবে। এই শেষ আক্রমণ প্রতিহত হইলে, ভারতের আদর্শবাদ জয়ের নিশান উড়াইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে।

ভারতের ধর্ম্ম ও আদর্শবাদ শ্রেষ্ঠ এবং শাশ্বত। ইহাই তো অসংখ্য প্রকার বিপৎপাতে ও সংঘর্ষে প্রমাণিত হয়। ইহাই তো ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বের অসাধারণ বীর্য্যের পরিচয়। এই ধর্ম্ম আমরা পাইয়াছি; কিন্তু অনুশীলনের সুযোগ পাই নাই, বহিরুপদ্রবে আমরা বহুদিন বিপন্ন আছি।

হিন্দু ভারতের প্রতাপ ও বীরত্বের ইতিহাস আজ তো আর চাপা দিয়া রাখিবার বিষয় নয়; হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার লুঠ করিয়া হিন্দুর বিজ্ঞানবাদ মূল করিয়া, প্রকৃতির আশ্রয়ে ইউরোপের নানা জাতি আজ উন্নতির চরম সোপানে, ইহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইব কেন? আবার মুক্তির বাতাস বহিবে, ভারতের দুয়ারে যে আততায়ীর দল শান্তিভঙ্গ করে, তাহাদের বল রোধ হইবে—আবার আমরা অবকাশ পাইব আত্মানুশীলনের। আমরা পাইয়াছি জীবনের সন্ধান—সে পথে চলার উপক্রম মাত্র, চতুর্দ্দিক্ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা শুনিয়া আমরা সহস্র বৎসর কেবল আত্মরক্ষাই করিতেছি। আজ আত্মদান করিয়া রণক্ষান্তির প্রস্তাব কোন কারণে যেন আমাদের রসনায় উচ্চারিত না হয়, আমাদের জয়ের দিন শীঘ্রই আসিবে।

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!"

আমরা ধর্ম্মের যথার্থ সংজ্ঞা মাত্র আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি; ইহার সম্যক্ আচরণ করিয়া এখনও আমরা ধর্ম্মগত জীবন লাভ করি নাই—এই অবস্থায় ধর্ম্মই আমাদের অধঃপতনের হেতু, 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া আমরা সব ব্যর্থ করিয়াছি, এই অনুযোগের কি কোন মূল্য আছে? গীতার এই বাণী যে কত মূল্যবান্ তাহা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ," ধর্ম্মের নামেই আমরা এতদিন রক্ষা পাইয়াছি, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলাম কোথা?

এই কথায় বিস্মিত হইবার কোন হেতু নাই। বহির্বিজ্ঞানের সত্যতা, বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কারে আজ ইউরোপের যে উদ্যম, অন্তর্জগতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া মৌলিক সত্য নির্দ্ধারণের জন্য ভারতে দলের পর দল কত উৎসাহে আত্মদান করিয়াছেন, তাহাও কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়! এবং যে পরম সত্য ও তাহা লাভের যে রাজপথ, তাঁহারা

আবিষ্কার করিয়াছেন—সম্মুখের অনন্ত ভবিষ্যৎ আর কি কখন তাহা নাকচ করিতে পারে?

যাহারা ইহার প্রয়োজনের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর, তাহারা একান্ত মতিভ্রান্ত মানুষ। যাহা কিছু করে তার মূলে থাকে আনন্দের তাগিদ—এই আনন্দ-বস্তুটা আজ মানুষের একান্ত খেয়ালের সামগ্রীই হইয়া থাকিত, যদি ইহার অব্যর্থ সূত্র আমরা না পাইতাম। আজ ঘরে সুইচ্ টিপিলেই নিরক্ষর ব্যক্তিও বিদ্যুতের আলো পায়; কিন্তু আকাশের এই শক্তি পৃথিবীর বুকে টানিয়া আনার যে তপস্যা তাহা কয় জন অবধারণ করে? ইহাতো বহির্জগতের বিষয়—অন্তর নিঙাড়িয়া যাঁহারা জীবন বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি।"

—তাঁহাদের তপস্যার দিকটা উড়াইয়া দিবার বিষয় নয়।

ভারতের মানুষ অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য অটল-প্রতিষ্ঠ হইয়া জগতের চরম সভ্যতা দিতে যে ভিত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই আমাদের তত্ত্ব। অতঃপর আমাদের কর্ত্তব্য—প্রয়োজন-নিরূপণের যে মন্ত্র ঋষির কণ্ঠে উদ্গান উঠিয়াছে, তাহার সাধন ও তদনুগত জীবনগঠনের তপস্যা। এই সুযোগই আমরা চাহি; এইজন্যই আমাদের স্বাধীনতার দাবী। স্কার্ট পরিধান করিয়া আমাদের তরুণীরা পথে ঘাটে হাওয়া খাইয়া বেড়াইবে বলিয়া আমরা আজ মুক্তির পথে পা বাড়াই নাই, বাদ্‌লার দিনে ওষ্ঠপুটে দু'চার পেগ্ বিলাতী মদ্য দিবার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মুক্তির সন্ধানে বাহির হয় নাই, মটরের সংখ্যা বাড়াইয়া ভারত বহিরৈশ্বর্য্যের পাল্লা দিবার জন্যও অকাতরে প্রাণ বলি দিয়া স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী নহে। বিলাস ও ব্যসনের গুরুভারে ইউরোপ ও আমেরিকার জীবন যদি চাপা নাও পড়ে, তত্রাচ তাহারা শীঘ্রই প্রশ্ন তুলিবে সেই ভারতের ঋষির মতই "কেনেষিতং পতন্তি প্রেষিতং মনঃ"—এই সব কোথা হইতে প্রেরিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে; তাহার উত্তর ভারতের মুখ হইতেই শুনিতে হইবে এবং সে দিন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

তর্ক করিয়া, যুক্তি দিয়া ভারতের প্রয়োজন মানুষকে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা ধৃষ্টতা। অজ্ঞান-নিবৃত্তির উপায় বাক্য নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়—জীবনের সহিত জ্ঞানবস্তুর ঐক্য। তাহার যে সাধনা তাহাই তো এ জাতির শিক্ষা ও তপস্যা। ধর্ম্ম তো এ জাতির দুর্জ্ঞেয় বস্তু নহে, অবৈজ্ঞানিক নহে। ভারত বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে হইলে, যে চরিত্র চাই—তাহা তো বেদান্তের ঋষি অধিকারী নির্ণয় করিতে গিয়া এক নিঃশ্বাসে ব্যক্ত করিয়াছেন। ত্রিশ টাকার বেতনভুক্ত নকুরীর জন্য নিজের গুণের কথা নিবেদনপত্রে প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়; তুমি ভারতের—তারও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। যখন সে চরিত্র লাভ কর নাই, তখন "আঙ্গুর টক" বলিয়া তোমাদের কথা গ্রাহ্য করিবে কে?

ভারত বলিয়া যে জাতি সে জাতির প্রত্যেককে "কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া, নিতান্তনির্ম্মলশান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ" হইতে হইবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চরম উদ্দেশ্যসাধনের সূত্র আমরা জীবন দিয়া সিদ্ধ করি নাই; অতএব ধর্ম্ম আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, এ কথার প্রমাণ নাই। বরং বলিব "নাম পরশনেই ঐছন হইল" অর্থাৎ এখনও টিকিয়া আছে, অন্যের

পরশে "জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যমমেয়ং" হইলে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ!

পরিশেষে, আজ গুরু বলিয়া যে জাতির পদাঙ্কানুসরণ করিতে চাও, তাদেরই একজন মনীষীর কথা কাণ দিয়া শ্রবণ কর, যদি পশ্চিমের হাওয়ায় চৈতন্য জাগ্রত হয় :—

"If we met these sons they would save us out of our own scepticism. Our atheism is repudiated by their very existence in which we have a right of entry. It is that discovery of the spiritual that makes us believe in the destiny of humanity, whereby man can live himself."

ভারত এই স্বপ্রতিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞের জাতি চায়, আর এই জাতির স্বরাজ ও স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রসূত নহে; তাহা নিজস্ব স্বতন্ত্র ও জগতের আদর্শস্বরূপ হইবে।

কৃষি

[শ্রীসন্তোষবিহারী বসু]

(অধ্যক্ষ, 'বিশ্বভারতী'—কৃষিবিভাগ)

সাধারণতঃ—কৃষি অর্থে, ক্ষেত্রজাত উৎপন্ন শস্য ও উহার আনুসঙ্গিক কার্য্যাদিকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক একটু ভাবিলে দেখা যায়, যে পুরাকালে উহার কার্য্যবিধি একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ অনেক জিনিষই উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিয়া, অসাক্ষাৎভাবে, নানানপ্রকারে দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা করিত।

তখনকার দিনে বিনিময় (exchange) ছিল, শুধু এক পরস্পরের উৎপন্নজাত দ্রব্যের ভিতর দিয়া, পরস্পরের কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া, পরস্পরের সুখ, দুঃখ ও সহানুভূতির ভিতর দিয়া। ইহাই ছিল প্রকৃত বাঁধন ও ইহাই ছিল অমূল্য ধনসম্পদ্। হিংসা, দ্বেষবিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইহার ভিতর তিলার্দ্ধ স্থান পাইত না। এই এক বিনিময়ের দ্বারা সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। এই বিনিময় টাকায় ক্রয় করা যাইত না। সেইজন্য গ্রাম্য সম্পদটীর উপর বাহিরের লোকে বড় একটা বেশী উপদ্রব করিতে পারিত না। এই বিনিময়ের দ্বারাই-শিক্ষা দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইত, এবং ইহার দ্বারাই একটা জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিত। এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তি প্রতি গ্রামে গ্রামে বিরাজ করিত। সুতরাং এই যে কৃষি, ইহার উৎকর্ষ-সাধনার জন্য নানানপ্রকার গবেষণা—আধুনিক যাহাকে research বলে—চলিত; এবং উহার ফলে বহু নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত, যাহা আধুনিক বহুব্যয়-সাধ্য গবেষণার দ্বারাও বাহির করিতে সম্যকরূপে

সমর্থ হয় নাই। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে চাষের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা আজ এক শত দেড় শত বৎসর ধরিয়াও ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ এখনও পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা Individual plant seletion'এ বিদেশে কার্পাস-চাষের যে উৎকর্ষ সাধন করা হইতেছে, সেটা এ দেশীয় গবেষণামূলক প্রথা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে পার্থক্য এইখানে, যে বিদেশীয়েরা ক্রমাগত নূতন নূতন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, আর আমরা উহা হইতে ক্রমশঃই নিবৃত্ত। উপস্থিত পৃথিবীতে যত কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার ৬০ ভাগ এমেরিকাতে, প্রায় ৩০ ভাগ ভারতবর্ষে ও ৬।৭ ভাগ মিশরের; কিন্তু উহার গুণানুগুণ হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান উপস্থিত সব নিম্নস্তরে। যে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া বিদেশে আজ প্রত্যেক ফসলের স্থায়ী উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে; অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যে ইহার প্রত্যেকটীই বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কৃষিকার্য্যে ক্রমান্বয়ে অবহেলা হেতু ভারতীয় কৃষককুল আজ এতটা অবজ্ঞার পথে অবতরণ করিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে কৃষি অতিমাত্র জটিল ব্যাপার। সুতরাং উহাকে অনায়াসসাধ্য করিয়া লইতে গেলে, যত প্রকার বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তি উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে কৃষিকার্য্যটী নানা প্রকার জটিল ব্যাপারবেষ্টিত; সুতরাং কৃষিকার্য্য-প্রণালীর প্রতি স্তরেই কৃষকের বিশেষ বুৎপত্তি থাকা দরকার। বীজ হইতে গাছ হয়, আর গাছ হইতে বীজ হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে কত যে অন্তরায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধারণতঃ যাহাকে বীজ বলা যায়, উহা একটী অতি ক্ষুদ্র জীবিত গাছ ব্যতীত আর কিছুই নয়—একটী আবরণের ভিতর থাকিয়া রীতিমত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকে, অবশ্য খুব সামান্য পরিমাণে। উপযুক্ত সময়ে বীজটী মাটীতে পড়িলে, উহার আবরণ ফাটিয়া প্রথমেই অতি ক্ষুদ্র একটী শিকড়ের মতন বাহির হয়। এই অবস্থায় উহার কোনও প্রকার খাদ্যের দরকার হয় না; কারণ উহার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে এই অবস্থায় খাদ্য যোগাইবার সংস্থান পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত থাকে। তবে এই সময়ে উহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া, খুব বেশী পরিমাণে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়; সুতরাং এই অবস্থায় মাটীর ভিতর বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিতে হয়। বীজটী কোনও কারণে মাটীর গভীরতম স্তরে পৌছিলে, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ এ অবস্থায় যে পরিমাণ বায়ুর দরকার তাহা ঐ স্থানে থাকে না। সুতরাং ঐ বীজটী মরিয়া যায়। আর একটু পরে, ঐ ক্ষুদ্র শিকড়টী ক্রমান্বয়ে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া খাদ্যের অন্বেষণে মাটীর ভিতর চলিতে থাকে, এবং যতক্ষণ না কোনরূপ খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে, ততক্ষণ মাটীর আবরণ ভেদ করিয়া শাখা প্রশাখা উপরে বাহির হয় না। এই অবস্থায়, মৃত্তিকা-কণার পরস্পরের ব্যবধানের ভিতর যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু ও জল থাকিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বৃষ্টির কিংবা অন্য কোনও প্রকার অতিরিক্ত জল এই সময়ে যাহাতে জমিতে না দাঁড়াইয়া অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হয়।

এইরূপে মাটীর ভিতর শিকড় বিস্তার করিলে পর মাটী ভেদ করিয়া ঐ গাছটী উপরে আসিয়া

পড়ে ও ক্রমশঃ বড় হইয়া শাখা প্রশাখা ছাড়িতে থাকে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার খাদ্যের পরিমাণটাও বাড়িয়া যাইতে থাকে।

জল, বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা—এই তিনটী উদ্ভিদ্ খাদ্যের প্রধান উৎপত্তির স্থান। ইহার মধ্যে প্রায় পনের আনা বায়ুমণ্ডল ও জল হইতে, বাকি এক আনা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। কয়েকটী ধাতব পদার্থ ব্যতীত, আর বড় বেশী একটা মৃত্তিকা-কণা হইতে গ্রহণ করে না। কিন্তু এই উপাদানগুলি সামান্য হইলেও, একটী অন্যের দ্বারা পরিপূরণ করা যায় না। অর্থাৎ উদ্ভিদ্ খাদ্যের ১৩টী উপাদানের মধ্যে কোনওটীকে বাদ দেওয়া যায় না। এই সমস্ত উপাদানগুলিও কাঁচা অবস্থায় দিনের বেলায় পাতায় চালিত হয় ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমস্ত দিন ধরিয়া উহা পরিপাক হইয়া রাত্রে নানা জায়গায় চালিত হয়। এক কথায় পাতাগুলি চুলার বা উনুনের, ও সূর্য্যের আলোটী আগুনের কার্য্য করে। আর পাতার এই সবুজ রংটী সূর্য্যের কিরণকে আকর্ষণ করিয়া রন্ধনের কার্য্যে লাগায়। আর পাতার তলার দিকের খুব ছোট ছোট ছিদ্রের দ্বারাও গাছ নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রচুর পরিমাণে ফেলে, এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পে পরিণত হইয়া বাহির হইয়া যায়। এক ভাগ খাদ্য মৃত্তিকা হইতে লইতে হইলে, প্রায় ১০০০০ ভাগ জলের প্রয়োজন হয়; এই জলের শতকরা ৬০ ভাগ গাছের শরীরের ভিতর থাকে ও বাকি অতিরিক্ত জলটী বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া যায়।

বায়ুমণ্ডল ও জল হইতে উদ্ভিদ্ যে উপাদানগুলি গ্রহণ করে, উহা এক প্রকার অফুরন্ত; আর মৃত্তিকা হইতে যে সামান্য উপাদানগুলি গ্রহণ করে, যদিও একপ্রকার অফুরন্ত (মাটী বিশেষে কম বেশী), কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ একটী ফসল উঠিয়া যাইবার পর আর একটী ফসল লইবার আগে, উহার অপচয়টী পরিপূরণ করা মৃত্তিকার পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যে যে উপাদান-গুলির অপচয় হয়, উহা বিভিন্ন প্রকারের সার দিয়া পরিপূরণ করিতে হয়।

সারের দ্বারা, বিশেষতঃ জৈবিকসার, যথা গোবর, খোল ইত্যাদি শুধু যে উদ্ভিদ্-খাদ্যের উপাদানগুলির অভাব মোচন করে তাহা নহে, উপরন্তু মৃত্তিকাকণার জলধারণের শক্তিকেও বাড়াইয়া দেয় ও মৃত্তিকার উত্তাপকে কতক পরিমাণে পরিচালিত করে। মৃত্তিকাতে উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ থাকাও বিশেষ দরকার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে উদ্ভিদ্খাদ্য গ্রহণের পক্ষে মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়; সুতরাং এই জলের অভাব হইলে সেচন দিতে হয়। সেচন দ্বারা খাদ্য যে শুধু গ্রহণোপযোগী হয় তাহা নহে, ইহার দ্বারা উদ্ভিদ্শরীরের উত্তাপ-সংরক্ষণকার্য্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। সেচন বা বৃষ্টির পর মাটীতে উপযুক্ত পরিমাণ রস বা বাত থাকিতে থাকিতে, কোদাল দ্বারা একটি ফোঁড় দিয়া মাটীকে বেশ ঝুরঝুরে করিয়া দিতে হয়। কারণ জল পাইলেই শিকড়ের কার্য্য খুব বাড়িয়া যায়, সুতরাং উহাকে খুব নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলার হেতু মাটীতে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু (Carbon dioxide) জমিয়া যায়। এই দূষিত বায়ুকে বাহির না করিয়া দিলে, গাছের স্বাস্থ্যহানি হয়। সুতরাং সেচনের পর পরিষ্কার বায়ুচলাচলের পথকে প্রশস্ত রাখিতে হয়। ফোঁড়ের দ্বারা আগাছা নষ্ট হইয়া যায় ও বাত বা রস বাঁধ হয়। সময় বুঝিয়া জমিতে ফোঁড় দিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সারে ও সেচনে, এবং সময়ে ভাল ফসল পাওয়া যায়।

ফসলের রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা অনেক পূর্ব্ব হইতে করা ভাল। সুতরাং ফসল কাটিয়া লইবার পরেই সম্ভবপর হইলে, টাঙ্গী বা কোদাল দিয়া জমিকে গভীর ভাবে খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে যাবতীয় পোকার বাসা ও ডিম নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া জমির চারিধারের আগাছা-গুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়া জমিটাকে পরিষ্কার রাখা দরকার এবং সময়ে সময়ে বিশেষতঃ রোগ দেখা গেলে, জমির চারি ধারের আলের মাঝে মাঝে শুকনা পাতার স্তূপ জ্বালিয়া দিলে, উহাতে নানা প্রকারের পোকা আসিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। ফসলের ভিতর যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যের আলো ও বাতাস খেলিতে পায়, তাহার প্রতি বীজ বা চারা বপনের সময় হইতেই বিশেষভাবে নজর রাখিতে হয়। ইহাতে ফসলের রোগের উৎপাত কম হয় এবং ফুল ও ফল ধরিবার শক্তি বাড়িয়া যায়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীরই নিজ নিজ বীজ নির্ব্বাচন করিয়া প্রত্যেক বারেই রাখা কর্ত্তব্য। নিজ নিজ অভিমত গাছ পছন্দ করিয়া পরে উহাদেরই বীজকে নির্ব্বাচন করা দরকার। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও এই ভারতীয় পদ্ধতিটীর প্রচার বহুল পরিমাণে হইতেছে, অবশ্য এই পদ্ধতিটীর ফসল অনুযায়ী পরিবর্ত্তন হয়। বীজনির্ব্বাচনের পর, বীজগুলিকে উপযুক্ত স্থানে রাখাও বিশেষ দরকার।

"বরষা"

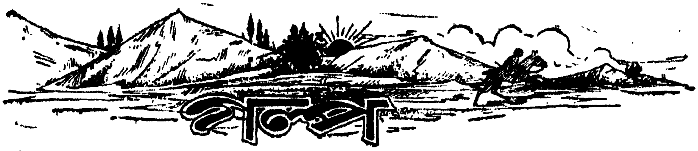
[শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়]

ওগো দীপ্তনয়না, কৃষ্ণবসনা, চটুলচরণা বরষা
বিরহীর প্রাণে জাগাও তুমি নূতন প্রাণের ভরসা?
এনে দাও তারে তড়িৎছটার কত না আশার বাণী,
তব সুশীতল বারিধারায়, ভুলে যায় মান অভিমানী!
শস্যে, পুষ্পে, কত সাজে তুমি সাজাও মোহন ধরা,
বসনাঞ্চল পরশে তোমার প্রকৃতি আপনহারা!

লয়ে আস তুমি, আঁচল ভরিয়া বরষ শ্রমের ফল,
শ্যামলাঞ্চল উড়ায়ে তোমার চির অস্থির চঞ্চল!
যে দিকে তোমার, ফিরাও নয়ন, বরষে আশীষধারা,
এ সুন্দর রূপ, মনোহর তব, সকল বন্ধনহারা!
চরণে জড়ায়ে শত ফুলদল, অধরে মধুর হাসি
হাতে লয়ে আস, সাধনার ধন, মুছে নিতে শোকরাশি!

হে মোর চিত্ত পাগল-করা, তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর,
তোমার প্রভায় উজল করেছে, জীর্ণ হৃদয়কন্দর!

* *
*



নারী-প্রগতি

—:০:—

— ৪ —

"একি পাগলের মত কথা বল্‌ছেন !"

"কথাটা নূতন, তাই আমায় পাগল বল্‌ছ !"

"শুধু নূতন নয়, এ যে আত্মঘাতী হওয়া !"

বিন্দু চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

সুধীর তাহার বিষণ্ণ ও পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি যদি রাজী না হও, আমার আর ভবিষ্যৎ নেই। বরং এইজন্যই আমি ব্যর্থ হবো।"

বিন্দু উত্তর দিতে পারিল না। তার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল।

সুধীর বলিল—"তোমার আপত্তি কিসে ?"

বিন্দু নীরব রহিল, সে তখন ভাবিতেছিল—"হায় বিধাতা, বিধবা কি এমনই অসহায় !"

সুধীরের প্রতি তার মমতা ও স্নেহ এমন ভুজঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া তাহাকে যে দংশন করিবে, একথা স্বপ্নেও সে ভাবে নাই; সুধীরের মত সচ্চরিত্র যুবক একজন সামান্য নারীর জন্য এমন মতিভ্রান্ত হইবে, ইহা যদি সে কল্পনা করিত, তবে নিকট আত্মীয় মনে করিয়া সে সুধীরের এত কাছে কিছুতেই ঘেঁষিত না। যদুবাবুর এই ক্ষুদ্র আশ্রমটীর উপর সুধীরের অনাবিল আন্তরিকতা দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখানে আর যাহারা আছে, সকলেই উপকৃত হইলেও, প্রতিষ্ঠানটীর উপর কারও বড় দরদ ছিল না; যদুবাবু যেন ইহাদের লইয়া দায়ে পড়িয়াছেন, আর সেই দায় কথায় কথায় ভারী করিয়া জটিল সমস্যা সৃষ্টি করাই যেন ইহাদের কর্ম্ম। সুধীর যদুবাবুর আপনার লোক, অথবা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়াই হউক, সকল দিক্ দেখিয়া চলার প্রয়াস করিত। কেহ কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইত; কিন্তু পরস্পর ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহারা এমনই গণ্ডগোল সৃষ্টি করিত, যে এক এক দিন আশ্রমে হাঁড়ী চ'ড়িত না, তর্কে কলহে দিবারাত্রি কাটিয়া যাইত। যদুবাবুর ধৈর্য্যের সীমা নাই, তিনি বলিতেন, "দুটী প্রাণ আসলে যদি মিলিতে চায়, তবে মহাপ্রলয়ের ভীষণ সংঘর্ষ ভেদ করিয়াই তাহা সম্ভব হইবে। আজিকার এই অশান্তি, অকথ্য বিষোদ্গার ভবিষ্য সৃষ্টির অব্যর্থ লক্ষণ !" বিন্দু আসিয়া আর কিছু না হউক, আশ্রমের নিত্য জীবনযাত্রার পরিপাটী ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুধীরের সাহায্যেই সে ইহাতে সমর্থ হইয়াছিল। অন্যান্য মেয়েদের শ্লেষবাক্যে, বিরক্তিতে সে বিচলিত হয় নাই; তাহার মুখের উপর যাহা বলিবার নয় এমন সকল কথা বলিয়া তাহারা তাহার অপমান করিত। সুধীরের কাছেও লজ্জায় এই সকল বিষয় সে উত্থাপন করিত না, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা লইয়া সে যদুবাবুর আশ্রমে একটা শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল। যদুবাবু গুণমুগ্ধ হইয়াই বলিতেন, "সুধীরের মত ছেলে,

ও বিন্দুর মত আর গোটা কতক মেয়ে পাই তো, একটা নূতন জগৎ গ'ড়ে তুলি।" এই কথায় তলে তলে প্রচ্ছন্ন অগ্নি-প্রবাহ জ্বলিয়া উঠিত। বিন্দু আশঙ্কা করিতেছিল, একদিন বা এই দিক্ হইতে একটা প্রলয় কাণ্ড না বাধে; কিন্তু আজ অকস্মাৎ অভাবনীয় দিক্ হইতে তাহার উপর যেন মৃত্যুশেল পড়িল। সে কথার উত্তর দিল না।

সুধীর বলিল—"আমি আজ একেবারেই নির্লজ্জ হয়েছি। তুমি বিধবা, হয়তো এই তোমার আপত্তি, অথবা কাকাবাবু একথা শুন্‌লে বিরক্ত হবেন—এই সকল চিন্তা তোমার নয়, আমার। আমি হাজার বার ভেবেছি। যদি লোকলজ্জার কথা বল, হৃদয়ের দাবী এই সামান্য কারণে চেপে রেখে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকা ভীরুতা ব'লেই মনে হয়।"

সুধীর আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিন্দুর মুখে ভাষার স্পন্দন অনুভব করিয়া সে নীরব হইল। বিন্দু কথা বলিল—"সুধীরবাবু, কথাগুলি সবই তো আপনার দিকের; আমারও তো একটা দিক্ আছে!"

সুধীর—"নিশ্চয়! সেই কথাই তো শুন্‌তে চাই। তোমার সম্মতিই আমায় জীবন দেবে, এ কথা মনে রেখো।"

"কিন্তু আমারও জীবনের দিক্ দেখে চলা কি আপনার ধর্ম্ম নয়?"

সুধীর স্তম্ভিত হইল।

বিন্দু বলিল—"আমি বিধবা। বিধবার জীবনের আগুন নিভে আস্‌ছে, এই তার জীবন। ফুৎকার দিয়ে তাকে জ্বালিয়ে তোলা অত্যাচার নয় কি!"

সুধীর অস্থির হইয়া বলিল—"এ প্রকাণ্ড হেঁয়ালীর কথা। জীবন নিভে আসে, সেটা কি জীবন! পুরুষের ধর্ম্ম—নারীকে বাঁচিয়ে তোলা। তুমি নিভে যাবে আমার চক্ষের সম্মুখে—কি বল্‌ছ বিন্দু!"

সমস্ত হৃদয়খানি নিঙড়াইয়া এই কথা কয়টা বাহির হইল। সুধীর সদুত্তর পাইবে, আশা করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু বজ্রপাতের মত নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তাহার মাথা নত হইয়া পড়িল।

বিন্দু বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন! যদি একদিনও আপনার অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে আর একটু অনুগ্রহ করুন—আমায় ভায়ের বাড়ী পৌঁছে দিন।"

হায়, অকৃতজ্ঞ নারী! তোমার আর জীবনের মূল্য কি? একটা পুরুষ তার সমস্ত ভবিষ্যৎ অকাতরে ডুবাইয়া অনির্দ্দিষ্ট জীবনপারাবারে ঝাঁপ দিতে চায়, তুমি তারে আশ্রয় দিয়া সার্থক হইবে না!

সুধীরের মাথা ঘুরিতেছিল। সে কি একটা কঠোর বাক্য প্রয়োগ করার জন্য মাথা তুলিয়া দেখিল—বিন্দু প্রস্থান করিয়াছে!

আহারের সময়ে যদুবাবু আজ যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিল, এমন বোধহয় বহুদিন ঘটে নাই। আশ্রমে চাঁপা বলিয়া একটা মেয়ে বহুদিন হইতে আছে। সে খুব মুখরা, কিন্তু যদুবাবুর প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধার বিনিময় না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকিত না, গলার আওয়াজে বাড়ী মাথায় করিত; কিন্তু সময়ে অসময়ে সে প্রাণ ঢালিয়া এই আশ্রমটীকে রক্ষা করিত। সুধীরের উপরও তার অনুরক্তি ছিল; কিন্তু সুধীর সে দিকে লক্ষ্য দিত না। অন্যান্য ছেলেরা "চাঁপা দিদি" বলিতে অজ্ঞান। চাঁপার অন্তরে যে আগুন

ধরিয়াছিল, তাহা গুমিয়া গুমিয়া পুড়িত; কেহই তাহার অন্তরের স্পর্শ পাইত না।

বেলা বাড়ে, তবুও নূতন কর্ত্রী বিন্দুর কাজে গা নাই, বিছানায় পড়িয়া আছে। কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করিয়া কোন ফল না হওয়ায়, চাঁপা কাজে নামিয়া পড়িল। সে যখন আশ্রমের কর্ত্রী ছিল, তখন একরূপ ব্যবস্থায় আশ্রমের কাজ চলিত; বিন্দুর হাতে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চাঁপার ইহা ভাল লাগে নাই। সে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া শেষে নীরব হইয়াছিল; কিন্তু শ্লেষবাক্য তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত। বিন্দু চাঁপা দিদির সহিত মিশিবার যতই চেষ্টা করিত, ততই সে বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রতিপদে অপ্রস্তুতে ফেলিবার চেষ্টা করিত। বিন্দুর প্রতি যদুবাবু ও সুধীরের একযোগে সহানুভূতি থাকায় কার্য্যতঃ সে কোন বাধাই বড় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইত না, এই হেতু উদাসীন হইয়াছিল। আজ হঠাৎ এই ভাবান্তরে সে বিস্মিত হইল; বক্রদৃষ্টিতে সুধীরের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার সমস্ত মুখখানি যেন কে অন্ধকারে লেপিয়া দিয়াছে, তলে তলে যে একটা কাণ্ড বাধিয়াছে, তাহা সে অনুমানে বুঝিল। সুধীরকে শুনাইয়া বলিল—"কাঠ খেলে অঙ্গার বাহির হয়!" কিন্তু সুধীর আজ যেন নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায়। চাঁপা অস্থির হইয়া বিন্দুর ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল, অনেক টিপ্পনীও করিল—কিন্তু এই দুইটী জীব যেন একই বজ্রাঘাতে আজ অবসন্ন। হাড়ে হাড়ে সে জ্বলিয়া গেল। কিন্তু যথাসাধ্য কাজ সারিয়া, আহারের ঘণ্টা বাজাইয়া, সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদুবাবু বলিলেন—"চাঁপা! আজ সব যেন ছন্নছাড়া, বিন্দু গেল কোথা!"

চাঁপা মুখ বাঁকাইয়া তরঙ্গিণীকে বলিল—"হাবার মত দাঁড়িয়ে দেখিস্ কি? ছাই ফেল্‌তে আমরা ভাঙ্গা কুলা, যেন দুটী পেটের ভাত যুগিয়ে সব মাথা কিনে নিয়েছে! এলেন কি না রাজনন্দিনী, সোহাগ দেখে কে? কৈ বাবা, আজ এই অসময়ে কোমর বেঁধে দাঁড়াল না তো!"

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিল—"অন্নময়টা কিসে হ'লো—বিন্দুর অসুখ করেছে নাকি!"

চাঁপা—"আপনি ভাল মানুষ, চুপ ক'রে খেয়ে যান। বিন্দু! বিন্দু!! বিন্দু!!! আর আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি! এতদিন বিন্দু ছিল কোথা!"

যদুবাবু অধিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সুধীরকেও তো দেখ্‌ছি না!"

অন্যান্য ছেলেরা মুখ টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল, যদুবাবুর যেন তৃপ্তি হইল না; নীরবে ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চাঁপা বলিল—"খাওয়া শেষ হয়েছে, এখন বলি—ঐ মাগীটা ডাইনী; আপনি পুরুষ মানুষ, ও সব বুঝ্‌বেন না, সুধীরদাকে—"

যদুবাবু প্রবীণ হইলেও যৌবনের স্মৃতি তিনি একেবারে মুছিতে পারেন নাই; চমকিত হইয়া বলিলেন—"বলিস্ কি চাঁপা! তাই ক'দিন ধ'রেই সুধীরকে কেমন বিমনা ভাবে দেখ্‌ছি। এ্যাঁ, এ যে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা! সুধীর কোথা?"

ছেলেরা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। কয়েকজন মেয়েও কৌতূহলবশতঃ চাঁপা দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুবাবু সম্মুখে এতগুলি ছেলে মেয়ে দেখিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন—"এই অপ্রাকৃত সৃষ্টির মূলে মহাভাব যদি পুষ্ট না হয়, তবে সৃষ্টিটার পতন অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের মধ্যে একজনও যদি আমার কথা তলিয়ে বোঝ, তবে আমি সার্থক হবো।" চাঁপার দিকে সুতীব্র দৃষ্টি স্থাপন

করিবামাত্র, চাঁপা বিজ্ঞের মত বলিল—"আপনার মুখ চেয়ে আমরা তো আকাশের বজ্র মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি। কোত্থেকে ঐ বালাই এনে ঢোকালেন, সব ছারখারে দিলে! এখনও বিদেয় ক'রে দিন্, সব দিক্ রক্ষা হবে।"

যদুবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুগপৎ সংশয় ও প্রত্যয় তাঁহার অন্তর তোলপাড় করিতে লাগিল—বিন্দু তো তেমন মেয়ে নয়; কিন্তু আজ বিন্দুর সঙ্গে সুধীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝে এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহা খুবই আপত্তিজনক। চাঁপার অস্পষ্ট কথায় ও আশ্রমের আব্‌হাওয়া হইতে ইহা তিনি এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধরিয়া লইলেন। যদুবাবুর আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একবার মনে করিলেন—বিন্দুর কাছে সরাসরি গিয়া সমস্তটা জানিয়া লন; তারপর মনে হইল, অনুমান যদি মিথ্যা হয়, বিন্দুর মনে অকারণ ব্যথার আঁচড় দেওয়া হইবে। এক্ষণে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কল্পনা যতখানি রঙ দিয়া ঘটনাকে আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহার সবখানি সত্য তো না-ও হইতে পারে। চাঁপার কথার ইঙ্গিতে তিনি যাহা ভাবিয়া লইয়াছেন, তাহা মিথ্যাই হউক—এইরূপ ভাবিয়া হঠাৎ যেমন উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তেমনই নরম হইয়া বরং উল্টা কথা বলিলেন—"চাঁপার সব বাড়াবাড়ি, তিলকে তাল করা তোর স্বভাব। লোকটা কয়দিন এসেই যেভাবে শ্রম দিয়েছে, তাতে শরীর ভাল থাকাই আশ্চর্য্য। বিন্দুর খবর নিয়ে আমায় জানাইও। সুধীরের ম্যাচ্ দেখার বাই গেল না। ছোঁড়া বুঝি গড়ের মাঠে দৌড়েছে!" এই বলিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁপাও আসিল। তিনি চাঁপাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে মুখ তুলিবামাত্র সম্মুখে সুধীরকে দেখিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কিন্তু এ-কি! সুধীর নিরতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত যদুবাবুর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—"কাকাবাবু! আমার মনটা অসম্ভব রকমের খারাপ হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। এই অবস্থায় দু'দিন



চাঁপা উর্দ্ধশ্বাসে দরজার কাছে গিয়া সুধীরের পাঞ্জাবীর খুঁট ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া ম্লানমুখে বলিল—"সুধীর-দা'—"

ঘুরে আসি, বেশী দেরী হবে না।" এই বলিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

যদুবাবু হাঁ-হাঁ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সুধীর এক নিমিষেই তাহার চক্ষের বাহির হইয়া গেল। তার পায়ের শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, খুব দ্রুত সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে।

চাঁপা উর্দ্ধশ্বাসে দরজার কাছে গিয়া সুধীরের পাঞ্জাবীর খুঁট ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া ম্লানমুখে বলিল—"সুধীরদা'—"

সুধীর দেখিল—চাঁপার চক্ষের কোণে মুক্তা-ধারা ঝরিতেছে; কিন্তু সে জোর করিয়াই তাহার হাত ছাড়াইয়া পথের অসংখ্য লোকস্রোতে মিশিয়া গেল।

চাঁপা জীবিত কি মৃত তাহা বুঝিবার উপায় নাই—সমস্ত পৃথিবীটা তাহার চক্ষের সমক্ষে তখন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে।

* * *

"যদুবাবু! পিঁজরার ভিতর এতগুলি মেয়েকে আট্‌কে রেখে ভাল কাজ করছেন না! কয়েকজনকে ছেড়ে দিন্। বাহিরের হাওয়ায় তারা মানুষ হ'য়ে উঠুক। আপনার আশ্রমের তাতে নামও হবে!"

যদুবাবুর মন ভাল ছিল না।

সুধীর প্রস্থান করার পর, বাহিরের দিক্ হইতে আশ্রমে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই; বরং যদুবাবুর অতর্কিতে যে মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা একপ্রকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহজ অবস্থাই আসিয়াছে। বিন্দু অধিকতর উৎসাহে কাজে মন দিয়াছে। সুধীরের অনুপস্থিতে ছেলেদের মধ্যে বরং আনন্দের মাত্রাই বাড়িয়াছে। সুধীরকে তাহারা বাহ্যতঃ অগ্রাহ্য করিলেও, তাহার প্রভাব সকলকে যেন চাপিয়া রাখিত। আশ্রমে সে যেন ছিল একমাত্র জগদ্দল পাথর। অবাধ হাস্যকৌতুকের সুযোগ কেহ পাইত না। সুধীরকে ঠেলিয়া ফেলার সমবেত চেষ্টাটাই বিপ্লব সৃষ্টি করিত। অনেক আঘাত সহিয়া সুধীরই জয়ী হইত। সুধীরের সহিত ছেলেদের এই অন্তঃসংগ্রাম আশ্রমের একটা মহা অশান্তির কারণ হইত। সুধীর প্রস্থান করিলে ছেলেদের উল্লাসের সীমা রহিল না, সকলেই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ পাইল মেয়েদেরও এই একই অবস্থা। সুধীরের সতর্ক-দৃষ্টি তাহাদের যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিত। আজ মুক্তির হাওয়ায় তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু চাঁপাদিদিকে দেখিয়া এই আহ্লাদের সবখানি যেন ক্রমে ফুটিয়া উঠার অবকাশ পাইল না। দুই একদিন যাইতেই সকলে দেখিল—চাঁপাদিদি সুধীরের চেয়ে অধিক ভারী হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মুখে হাসি নাই, কথা নাই। যে দিকে চাহে, যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। হাসিতে গিয়া, চাঁপাদিদির চক্ষের সহিত চক্ষু পড়িবামাত্র সে হাসি ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়, পরিহাসবাক্য অর্দ্ধস্ফুট হইয়াই শুদ্ধ হয়। সুধীরের কর্ত্তব্য চাঁপাদিদিকে পাইয়া বসিয়াছে।

বিন্দুর উপর চাঁপার আর রাগ নাই; বরং সকল কার্য্যই তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া করে। বিন্দু চাঁপার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিল। এই আশ্রমে সে যে এই মেয়েটীর কত বাধা হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া অন্তরে দুঃখ অনুভব করিত। চাঁপার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভাল লাগিত না; কিন্তু মুখে কিছু বলিত না। আশ্রমের আলো বাতাস তাহার আর সহ্য হইতেছিল না।

সে সময় পাইলে, ভাবিত—বিধবার উপর পুরুষের জুলুম কেন? সুধীরের প্রতি চাঁপার এই অকৃত্রিম অনুরাগ কি সে বুঝে নাই? চাঁপা সুন্দরী, যুবতী; তবে কেন সে বিন্দুকে এতখানি অপমান করিল? হিন্দুনারী বিধবা হইলে, তাহার যে সবই শেষ হইয়া যায়! ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা সখের বস্তু হয়। তাহা কি কখন কারও নিজস্ব সত্য বস্তু হইতে পারে! ছিঃ! মনে করিলেও, শরীর শিহরিয়া উঠে।

একদিন সমাজ-সংস্কারকের দল আসিয়া তর্ক করিতেছিল। যদুবাবুর মতের সহিত বিন্দুর

বিরোধ নাই। কিন্তু তাহারা বলে বিধবার বর্ত্তমান মনোভাবের পশ্চাতে আছে, বহুদিনের প্রভাব, সংস্কার; উহা উল্টাইয়া দিতে হইলে, দীর্ঘদিন ধরিয়া আবার বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কারের প্রবর্ত্তন চাই। বিন্দু অনেক ভাবিয়াছে; কিন্তু ছিঃ, এই দেহখানি একদিন যে লুটাইয়া দিয়া সে একজনকে বড় সুখী করিয়াছিল, তাহার সে লুব্ধদৃষ্টির স্মৃতি তো মুছা যায় না! জীবনটা কি ভাড়াটিয়া বাড়ী, যে খালি হইলেই বাসাড়িয়ার আস্তানা করিতে হইবে! পুরুষের দিক্‌টাও সে একবার ভাবিয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহা অনধিকারচর্চ্চা বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। দেহটা তৈজসপত্রের মত একান্ত বস্তু বলিয়া মনে করিতেও তাহার মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়।

যদুবাবুর কাছে একজন মহিলা আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা উত্থাপন করিলে, যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। চাঁপা ও বিন্দু সেইখানে বসিয়া রুমালের পাড় সেলাই করিতেছিল। নবাগতা মহিলা যদুবাবুর নিকট উত্তর না পাইয়া তাহাদের মুখের দিকে চহিল। বিন্দু বলিল—"ওঁর শরীরটা কয়দিন ধরে' বড় খারাপ; আপনার বক্তব্য কি, আমাদের সঙ্গেই আলোচনা করুন।

মহিলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"বলাবলি কি আর আছে! আপনারা কি খবর রাখেন না—দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামে দলে দলে বাংলার অন্তঃপুর খালি ক'রে মেয়েরা ছুটেছে! ছাই আশ্রম নিয়ে হবে কি,. যদি দেশের দুর্দ্দিনে আপনাদের সাহায্য না পাওয়া যায়!"

চাঁপা হেঁট হইয়াই রুমালের মুড়ি সেলাই করিতে লাগিল। যদুবাবু একবার চাহিলেন, উত্তর দিলেন না। বিন্দু বলিল "কি করতে হবে বলুন!"

মহিলা বলিল—"আমাদের কয়েকজন বাছাবাছা শক্ত মেয়ে চাই, মেদিনীপুরে যেতে হবে। সব অশিক্ষিতা নারী—তাদের উপর কি যে অত্যাচার হচ্ছে, কাগজ প'ড়ে দেখ্‌ছেন তো! কলিকাতায়ও কাজ অনেক। এইজন্য যদুবাবুর কাছে দু'চার জন লেডি ভলেণ্টিয়ার চাইতে এসেছি।"

দেশের খবর বিন্দু সবই রাখিত। মেয়েদের সাহস ও ত্যাগের যে পরিচয় সংবাদপত্রে বাহির হইত, তাহাতে তাহার গর্ব্বই বোধ হইত। তার ব্যর্থ জীবনভার দেশের সেবায় ঢালিয়া দিলে সে কৃতার্থ হয়, এমন কথাও কতবার ভাবিয়াছে। আশ্রম হইতে সরিয়া পড়ার তার একটা প্রবল ইচ্ছাও হইয়াছিল। তাই সে যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বলেন! এ সব কাজেও আমাদের দু' একজন যোগ দিলে মন্দ হয় না!"

যদুবাবু উদাসীন হইয়াই বলিলেন—"বেশ তো, তুমি যাবে!"

চাঁপা বিন্দুর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল, বিন্দু হাসিয়া বলিল—"আমার খুব ইচ্ছা।"

যদুবাবু মুখে কিছু না বলিলেও, সুধীর চলিয়া যাওয়ায় সে যেন তাঁর চক্ষুশূল হইয়াছিল। বিন্দুর কথায় তিনি সায় দিলেন। চাঁপা আপত্তি করিল; কিন্তু বিন্দু তাহা শুনিল না। সুধীর চলিয়া যাওয়ায় তাহার বুকের একাংশ পাঁজর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বিন্দুকে ছাড়িয়া দিতে সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল। কি জানি কেন তাহার মনে হইল—সব শেষ হইল। সুধীর আর এ আশ্রমে ফিরিবে না!

— ৫ —

অতি বিস্তীর্ণ নদী। সমুদ্রের মতই সীমাহীন। খেয়ার নৌকায় পারাপারের যাত্রী দেখিয়াই মনে হয় অন্য কূলে লোকালয় আছে। এই নদীর

উপকূলে বালু-চরে সারি সারি হোগ্‌লার কুঁড়ে বাঁধা। লবণ-যুদ্ধের ইহা সৈন্যনিবাস। নারী পুরুষ একত্র হইয়া আজ ভারতের মুক্তি চাহিয়াছে। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে, উৎসাহে হৃদয় নাচিয়া উঠে। নিরস্ত্র ভারতবাসী আজ এই সামান্য লবণ প্রস্তুত করার অছিলায় স্বাধীনতার স্বপ্নকে মূর্ত্ত করিতে উদ্যোগী। বুদ্ধিমান্ লোকে ইহা হাসিয়া উড়াইত; কিন্তু শাসকবর্গ বিষয়টাকে খুবই গুরুতর করিয়া লওয়ায়, সর্ব্বজন-চক্ষে ইহার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বিন্দু এই দলে আসিয়া যোগ দিয়াছে।

নদীর উপর পাড়ে নারিকেলের বাগান। পুলিশের থানা বসিয়াছে। লবণ যুদ্ধের সৈনিক-গণের কর্ম্ম—একবার করিয়া আল বাঁধিয়া জল আট্‌কান, উনান ধরাইয়া হাঁড়ি চাপান ও মার খাওয়া; যুদ্ধের ইহাই বিশেষ ভঙ্গী। পুলিশের লাঠী খাইয়া খুব যে জখম হয়, তাহাকে বাঁশের মাচায় শয়ন করাইয়া অবস্থামত শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়। বিন্দুর উপর এইরূপ সেবার ভার পড়িয়াছে।

নগর গ্রাম হইতে নিত্য খবর আসে। হাতে-লেখা দৈনিক সংবাদপত্র পড়িয়া এই সেনানিবাসের নারী পুরুষ চমকিয়া উঠে। অহিংস সংগ্রামনীতি এমন বীভৎস মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিবে, ইহা কেহ কল্পনা করে নাই। কিন্তু হিংসার দিক্‌টা এক পক্ষই আশ্রয় করিয়াছে; নিরীহ অহিংস সৈনিকের হাত পা মাথা ভাঙ্গার সংবাদ ছাড়া, এক একটা গ্রামের উপর নানাপ্রকার উপদ্রবের কথা পড়িয়া সকলের চক্ষে জল গড়াইয়া পড়ে। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের প্রাণে আজ দেশহিতৈষণার এ আগুন কেমন করিয়া জ্বলিল, তাহা ভাবিয়া অনেকে বিস্মিত হয়। কেহ কেহ মহাত্মার জয় দিয়া উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন যোগায়। বিন্দুর দিন একপ্রকার কাটিয়া যাইতেছিল।

খবর ক্রমে খুবই সাংঘাতিক আসিল। গোপীনাথপুর, গোকুলনগর, বেতালদিঘী প্রভৃতি গ্রামের লোক সত্যাগ্রহ করায়, তাহাদের বাড়ী ঘর লুট হইয়াছে, কাহারও ঘরে আগুন ধরিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, আত্মীয়স্বজন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পত্নী, দুহিতা, জননী, অভিভাবকহীন অবস্থায় নানাপ্রকার বিপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য লোক ধৃত হইতেছে। মৃত্যু-সংবাদও আসিতে লাগিল।

বিন্দু শুনিল এইবার তাহাদের কেন্দ্র আক্রমণ করা হইবে। যিনি নেতা ছিলেন, তিনি সকলকে বুঝাইলেন—আক্রমণের সময়ে কেহ যেন ধৈর্য্যহীন না হয়, ক্রোধবশতঃ আক্রমণকারীকে আঘাত না করে, কটু কথা না বলে। সকলে স্থির হইয়া এই চরম দুর্দ্দশা মাথায় বহিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল। সকলে আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ঝড়ের মত একদল পুলিশ প্রহরী আসিয়া তাহাদের অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ দিল। কেহই কথার উত্তর দিল না। তাহাদের পুনঃ পুনঃ অনুযোগ উপেক্ষিত হওয়ায়, হুকুম হইল—ঘর ভাঙ্গিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হউক, লবণ প্রস্তুত করার দ্রব্যাদি গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়া থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইল না। "মহাত্মার জয়" বলিয়া সত্যাগ্রহী সৈন্য-বাহিনী ভাতের থালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, লবণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্র আগ্‌লাইতে গড়াগড়া শুইয়া পড়িল। বিন্দু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, সে কি ভীষণ কাণ্ড! পুলিশের কাজ আইনভঙ্গনীতির প্রশ্রয় না দেওয়া; কিন্তু দেশের লোক তাহা বুঝে না, প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির কথা অমান্য করিয়া তাহারা স্থান ত্যাগ করিবে না—জোর করিতেই হইবে, এই হেতু যাহা হইবার তাহাই হইল।

অতিশয় সতর্কতার সহিত পুলিশের লোক আইন-ভঙ্গকারীদের ধৃত করার চেষ্টা করিলে কি হইবে, বাধ্য হইয়া তাহাদের ইহার ঘাড়ে তাহার ঘাড়ে পা দিয়া ফেলিতে হইল, জোর করিয়া হাঁড়ি কড়া কাড়াকাড়ি হওয়ায় উভয় পক্ষই আহত হইল। দুই একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ বিরক্ত হইয়া লাঠী তুলিল, সে লাঠী একান্ত নিরস্ত্র লোকের উপর তেমন জোরে পড়িল না, মানুষের হৃদয় বলিয়া বস্তুটা ইহাতে বাধা দিল; তবুও পক্ষাপক্ষ বিরুদ্ধ বোধ প্রবল থাকায়, আঘাত একেবারেই যে না হইল তাহা নহে। চতুর্দ্দিকে 'আঃ' 'উঃ' 'বাপ্' শব্দ উঠিল। বিন্দুর হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পুলিশের লোক কর্ত্তব্য সমাপন করিতে অধিক বিলম্ব করিল না; তাহারা চলিয়া যাইবার সময়ে নেতৃপক্ষ কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

অতঃপর বিন্দুর কাজ আহতদের উঠাইয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। সে যেমন অগ্রসর হইবে, একজন পুলিশের লোক তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিল, বিন্দুবাসিনীকে স্থান ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু সে তাহাতে রাজী হইল না। তখন সে ব্যক্তি খাতায় তাহার নাম টুকিয়া বলিল —"আপনাকেও গ্রেপ্তার করা হ'লো, পুলিশে চলুন।"

বিন্দুবাসিনী আপত্তি করিল না। কিন্তু তাহাকে ধৃত করায় চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আপত্তি টিকিল না, পুলিশের লোক নিকটবর্ত্তী কয়েকজন লোককে সঙ্কেত করিয়া বলিল—"এঁকে থানায় নিয়ে চল।"

বিন্দু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কতকগুলি লোকের অনুসরণ করিল। পুলিশের লোকেদের সঙ্গ হইতে সে ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছিল, ঘটনা-স্থলে গণ্ডগোল বাধায় কেহ কারও দিকে লক্ষ্য রাখার অবসর পায় নাই। সে কিছুদূর গিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গে যাহারা আসিতেছিল, তাহারা প্রায় সবই সরিয়া পড়িয়াছে, সে যাহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহাকে পুলিশের লোক বলিয়া সে তখন কোন সন্দেহ করে নাই। চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া চাহিল—পথ জনবিরল হইয়াছে। খুব দূর হইতে আর্ত্তনাদধ্বনি যেন তাহার কর্ণগোচর হইতেছিল।

"এখানে আমায় নিয়ে এলে কেন? থানা কোথা!"

সে ব্যক্তি কোন কথা বলিল না, বক্র লুব্ধ দৃষ্টিপাতে বিন্দুর দিকে কেবল কটাক্ষ করিল।

প্রকাণ্ড আম বাগান, মধ্যস্থলে একখানি অতি নগণ্য কুঁড়ে ঘর। আম বাগানের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট পায়ে-চলা পথের ধারেই এই ঘরখানি। অপ্রশস্ত দাওয়ায় ভাঙ্গা একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল। সেই লোকটা তাহাকে বলিল "একটু জিরিয়ে নিই, ঐখানে দু' দণ্ড ব'সো।"

বিন্দুর ইহা ভাল লাগিল না। তাহার মনে হইল বুঝি বা সে কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াছে। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—লোক জনের কোনই চিহ্ন নাই, তার সঙ্গে যাহারা আসিতেছিল তাহারা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, চীৎকার করিলেও সাড়া পাইবে না। লোকটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—কি ভীষণ অসুরাকৃতি! ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল। গায়ের জোর এখানে কোনই কাজের নয়, সে কাতোরক্তি করিয়া বলিল—"দোহাই বাবা, আমায় আলো থাক্‌তে থানায় নিয়ে চল, আর যদি তুমি পুলিশের লোক না হও, আমায় সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও, তোমায় টাকা দেব!"

সে ব্যক্তির মুখে কদাকার হাসির রেখা ফুটিল, কাছে ঘেঁসিয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া কি বলিল—বিন্দু কেবল বুঝিল, সোহাগ করিয়া বলিতেছে ঐখানে বসিবার জন্য। তাহার পা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। দাওয়া উঁচু ছিল না, সে এক পা

বাড়াইয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমি যদি পুলিশের লোক নও তবে আমায় সঙ্গে নিলে কোন ভরসায়!"

সে কোন কথা বলিল না, হাতের মোটা লাঠীটা কোলে লইয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল। যত বেলা যায়, বিন্দু উৎকণ্ঠিত হইয়া কাতর অনুনয় করিয়া থানায় অথবা লবণ-যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া আসিতে বলে; সে কোনই সাড়া দেয় না। লোক জনের বসতি বোধহয় এ দিকে একেবারেই ছিল না, নিস্তৃত রাত্রের মত সকল দিক্ গম্‌গম্ করিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল, ঘনঘন ঘন হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আমায় এখানে রাখার তোমার উদ্দেশ্য কি? এখুনি চীৎকার করবো, আমায় নিয়ে চল।"

সে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল—"চেঁচাবি তো, মাথায় লাঠী মারবো। ব'স্ ঐখানে—খিদে পায়, রেঁধে খা; হাঁড়ি-কুড়ি সব আছে।"

বিন্দুর মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। বুকের ভিতর অজ্ঞাত আশঙ্কায় হু হু করিয়া উঠিল, চক্ষে অজস্র জল গড়াইল। তাহার অনুনয় বিনয় কোনই কাজের হইল না।

সর্ব্বনাশ! একজন লোক দেখা দিল বটে, কিন্তু তারও আকৃতি দস্যুর ন্যায়। সে কটাক্ষপাত করিয়া বিন্দুর দিকে চাহিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে কি বলিল। বিন্দু তাহার একবর্ণও বুঝিল না, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। কিছু পরে আরও দুইজন আসিয়া দাওয়ায় বসিল। তখন বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাগানের মধ্যে খস্ খস্ শব্দ শ্রুত হইল, বোধহয় নিশাচর শ্বাপদ প্রাণী বাহির হইয়াছে। বিন্দু মৃত-কল্প হইয়া বসিয়া রহিল।



লোকটী কোন কথা বলিল না। হাতের মোটা লাঠিটা কোলে লইয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল।

বিন্দু নিস্পন্দ, তাহার চলৎশক্তি রহিত হইয়াছিল। একজন চালের বাতা হইতে গাঁজার কলিকা পাড়িয়া আসর জমকাইয়া বসিল। দাওয়ার এক পাশে কেরোসিনের ডিবে জ্বলিল। মহাকাল মাথার উপর ডানা মেলিয়া হুস্ হুস্ করিয়া উড়িয়া যায়; বিন্দু তাহার শব্দ যেন স্পষ্টই শুনিতে পাইল।

তাহার মনে হইল—নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছে, বুকে যেন পাথর চাপিয়া বসিতেছে। মনে হইল—মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সত্যই সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তার অচেতন শরীর তক্তা-পোষের উপর লুটাইয়া পড়িল!

* * *

সংবাদপত্রে খবর বাহির হইল—"সোনাদহের নিকটবর্ত্তী নদীচরে সত্যাগ্রহ সেনানিবাস ভঙ্গ করিয়া পুলিশ আইনভঙ্গকারীদের থানায় লইয়া আসিবার সময়ে এক মেয়ে আসামী সরিয়া পড়ে; অনেক খোঁজ করিয়া সে দিন তাহার সন্ধান মিলে নাই, পরদিন খোঁজ করিয়া বেচু সর্দ্দার বলিয়া এক ব্যক্তির ঘরে তাহাকে পাওয়া যায়। আসামী সত্যাগ্রহী বলিয়া তাহার ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। আসামীর নাম শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে সে যে এজেহার দেয়, তাহা লোমহর্ষণকর। রাত্রে বেচু সর্দ্দারের বাটীতে কয়জন দুর্ব্বৃত্ত নাকি তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে! বেচু সর্দ্দার ধৃত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে। ইত্যাদি—

সুধীর এই সংবাদ পাঠ করিল। সে স্তম্ভিত

ছয় মাস পরে, মেদিনীপুরের জেল-দরজায় সুধীর দাঁড়াইয়াছিল। গেটের কাছে ভীড় হইয়াছে। বহু সত্যাগ্রহী নারী পুরুষের আজ মুক্তির দিন।

যথাসময়ে গগন-ভেদী "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির সহিত সুধীর দেখিল—শীর্ণমূর্ত্তি বিন্দু উদাসনয়নে অন্যান্য কারামুক্ত সঙ্গীগণের সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সমবেত জনতার মধ্যে উৎসাহের ধুম পড়িয়া গেল।

পুলিশ জেলের সম্মুখে জনতা দূর করার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মোতায়েন ছিল। কাজেই কেহ অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল না, দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িল। স্থানীয় যাহারা, তাহারা সঙ্গীগণের সহিত প্রস্থান করিল। অনেকের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব আসিয়াছিল, কারও কারও গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া দেওয়া হইল, অভিনন্দনের ত্রুটি রহিল না। বিন্দু একাকিনী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল; সে আজ কোথায় যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না, অকস্মাৎ সুধীর তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দু একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিল, তেমনই লজ্জায়, অনুতাপে তার মূর্ত্তি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষের কোলে কোলে জল রেখা দেখা দিল।

সুধীর বলিল—"বিন্দু, তোমার জন্যই ভাড়াটিয়া গাড়ীখানা এনেছি। উঠে ব'সো—চল এখন বাসায় যাই।"

বিন্দু বিনাবাক্যে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সে গাড়ীর ডগ্‌সিটে বসিয়াছিল, সুধীর ডাকিয়া তাহাকে পাশে বসাইল।

বিন্দু কোন আপত্তি করিল না—গাড়ী ছুটিল সহরের দিকে।

(ক্রমশঃ)



মত ও পথ

দেশের হাওয়া—

চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। হইতে ধনী, মহাজন, জমিদার পর্য্যন্ত আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যাঁহারা চাকুরীজীবী তাঁহাদের উৎকণ্ঠার অবধি নাই, তালপাতার টাটটুকু উড়িলেই হইল। ভারত ও ব্রহ্মপ্রদেশের রেল কোম্পানীতে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের চাকুরী যাওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, আরও ততোধিক সংখ্যক লোকের চাকুরী যাওয়ার কথা উঠিয়াছে; পাটকলেও শতকরা কুড়ি পঁচিশ জন লোকের চাকুরী যাইবে, সওদাগরী আফিসে তো কথাই নাই। গভর্ণমেণ্টের চাকর বলিয়া আজ আর ভরসা নাই! কে কবে অন্নহীন হয়! এত আতঙ্কে সংসার সমাজ সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লীতে পল্লীতে যে ঋণদান-সমিতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশে মেঘ জমিয়া উঠে, চাষার কাজে উৎসাহ নাই, আজ ঋণ করার সুযোগও তারা পায় না; মহাজনের মরাই-ভরা ধান, কিন্তু দর উঠিল না; তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। দোকানদার সারাদিন পণ্য সামগ্রী আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকে, খরিদ্দার নাই। বাঙ্গালী জাতি এক মুঠা ভাতের সংস্থান হইলে নিশ্চিন্তে দিন কাটাইয়া দিত; আজ তাহারও অভাব হওয়ায়, মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! কলিকাতার রাজপথে ভদ্রসন্তান আজ জুতায় কালি দিবার জন্য মুচির পেশা মারিতে উদ্যত। ময়মনসিং জিলায় কোন কোন পল্লীতে ডাক্তারের পকেট হইতে ভিজিটের টাকা কাড়িয়া লওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতেছে, চুরি ডাকাতির সংবাদ আর পড়া যায় না—উপায় কি?

অনেকের অবস্থা এখনও সচ্ছল হইতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে দেশের এই দুর্দ্দিনে অনেকেই হয় তো এখনও নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে পারেন; কিন্তু জাতির দুরবস্থা মোচনের জন্য আজ সবাইকে উদ্যত হইতে হইবে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, সহরের চাকুরীজীবীরা আর খাদিপরিধানে রাজী নহেন, ইহাতে নাকি চাকুরী যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা আছে। খাদির কাজে যে কয় লক্ষ টাকা বাংলার পল্লীকে এখনও দুই মুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া দেয়, তাহাও বুঝি বন্ধ হয়! সহৃদয় দেশ-বাসীকে আজ প্রতিকারের জন্য উঠিয়া-দাঁড়াইতে হইবে।

এই সঙ্কটদিনে আমরা যদি সংযুক্ত জীবনশক্তি উদ্যত করিয়া দাঁড়াইতে পারি, কেবল দুরবস্থার প্রতিকার হইবে না, ভবিষ্যতের জন্য আমরা একটা শক্তিশালী জাতিরূপে মাথা তুলিতে পারিব।

যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, বড় বড় যৌথ কারবার করুন; কিন্তু ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে আমরা বৃহৎ

কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব, এবং বিধাতার এই বজ্র মাথায় ধরিয়া ইহা আশীর্ব্বাদে পরিণত করিব।

হুজুগের উত্তেজনায় আমরা চরকা ধরিয়াছিলাম। নিজের প্রাণের দায়ে না হইলেও, দেশের দায়ে প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্ত্তের অবকাশটুকু আবার চরকায় নিয়োজিত করুন। তুলার মূল্য আট আনা, পাঁজ ও সূতা কাটিয়া মেহনতের মূল্য হিসাব করিলে চলিবে না; সংযুক্তশ্রমে আমাদের বস্ত্র উৎপাদন করিয়া লজ্জানিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের যতখানি সাহায্য দেশ চাহিবে, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে" প্রত্যেকে আধ ঘণ্টা করিয়া চরকা কাটে; "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র মানুষের শ্রমে তাঁত চলে—আমরা বস্ত্র-সঙ্কটে পিছাইব না, ইহা অবধারিত। টাকার দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে; কিন্তু শ্রম তো কেহ কাড়িয়া লয় নাই। আসুন, আমরা বিন্দু বিন্দু শ্রমশক্তিকে সংযুক্ত করিয়া দেশে বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করি।

দ্বিতীয়তঃ, পল্লীকে বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঠ পড়িয়া আছে; বেকার জীবনযাপন করার অপেক্ষা দেহ-রক্ষার জন্যই আজ শাক সব্‌জী, শস্য উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া আমরা সুসম্বদ্ধ বিরাট্ পরিবার-রূপে গড়িয়া উঠিব। দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া আজ্ আর সমবায়ের নামে দোকান খুলিলে চলিবে না। এই সকল শস্যক্ষেত্রগুলি আমাদের সংসারপ্রতিপালনের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ হইবে। একটী আশ্রম বা সঙ্ঘ যাহা করিতে পারে, জাতিও সমাজ-জীবনে তাহা প্রবর্ত্তন করিয়া স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে। সঙ্ঘ নবজীবনের প্রবর্ত্তক, পথপ্রদর্শক। সমস্যার সমাধান করিতে তাহারা সতত অগ্রগামী। আমরা নিঃসংশয়ে এবং নির্ভীককণ্ঠে জাতিকে ডাক দিয়া বলিতে পারি, দেশের এই দুর্দ্দিনে আপনাকে বড় করিয়া রাখার দায় না থাকিলে ভয়ের কোন কারণ নাই; বরং আমরা এই সুযোগে একটা দুর্দ্ধর্ষ জাতি হইয়া মাথা তুলিব। আসুন, এক একটা বৃহৎ পরিবাররূপে আমরা খণ্ডে খণ্ডে সংহতিবদ্ধ হই। মুক্তি-যজ্ঞে কত মহাপ্রাণ বলি পড়িতেছে; ক্ষুদ্র সংসারের উঞ্ছ ভোগবিলাস ছাড়িয়া যদি এই পথে আমরা অগ্রসর হই, বিধাতার বজ্র আশীর্ব্বাদরূপেই আমাদের অমর করিয়া তুলিবে।

দু-সংবাদ—

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা না হইলে মহাত্মা রাউণ্ড টেবিল সভায় যোগ দিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী-সভার সভ্যগণ তাঁহাকে ইহা হইতে বিরত হইতে দিবেন না। মহাত্মাও সংহতির মর্য্যাদারক্ষার জন্য বিলাতে যাইবেন কিন্তু এই যাওয়া কতখানি ফলপ্রসূ হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মনে ক্রমেই ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইতেছে।

অহিংস-সংগ্রাম বন্ধ করার সময়ে বিলাতের লোকের যে মনোভাব ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। লর্ড আরউইনের সহৃদয়তা বিশেষ কাজের হইবে না; তিনি ভারতের পক্ষে অনেক কথাই বলিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাঁহার কথায় তাঁহার দেশ যে আর কর্ণপাত করিবে, অবস্থা দেখিয়া তাহা আর মনে হয় না।

রক্ষণশীলদলের এক বড় সভায় প্রায় ৬৫০ জন সভ্য উপস্থিত হইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন—ভারতের নূতন শাসনসংস্কারে ব্রিটেনের স্বার্থসংরক্ষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চাই; আর স্বাধীন ভারতের কথা সভায় যদি পুনরুত্থাপিত হয়, তাহা হইলে রক্ষণশীল-

দলের কেহই রাউণ্ড টেবিল সভায় আর যোগদান করিতে প্রস্তুত নহেন।

ভারতের প্রবীণ রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত পেটেল বিলাতের আব্‌হাওয়ায় থাকিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতেছেন এবং এইজন্যই তিনি কুণ্ঠাহীন হইয়া বলিয়াছেন—"Irwin-Gandhi agreement was premature."



সর্দ্দার ভি. জে, পেটেল

বিলাতের খুব কম লোকই ভারতের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এবং মহাত্মার নেতৃত্বে যে বিপুল আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা অতিশয় লঘুভাবেই বিলাতের লোক গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রিটনের স্বার্থরক্ষণের প্রসঙ্গ লইয়া আজ যে কথা উঠিয়াছে, দিল্লীর চুক্তিতে তাহার বিপরীত কথাই ছিল; ভারতের স্বার্থরক্ষার দিক্‌টা সর্ব্বাগ্রে দেখিয়া ব্রিটনের স্বার্থ যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা হইবে—এই সর্ত্তেই মহাত্মা রণক্ষান্তির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। মহামতি পেটেল বলেন, ব্রিটনের রক্ষণশীলদল যদি স্বার্থ-রক্ষণনীতির অজুহাতে রাউণ্ড টেবিল সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করে, আর লেবার দলের পক্ষ হইতে ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের জন্য বাস্তবরূপে কিছু পাওয়ার আশা না দেওয়া হয়, তবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মার গোল টেবিল সভায় যোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না, বার বার ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযুক্ত পেটেলের সংশয় অকারণ নহে। ব্রিটনের একদল রাষ্ট্রীয় পক্ষ মনে করেন—এত সহজে বিজিত ভারতকে স্বাধীনতার অবকাশ দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ভারত ব্রিটনের অধিকারচ্যুত হইলে, তাহার যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া এই সকল রাষ্ট্রবিদ্‌গণ এখন হইতেই শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; একজন তো এক-প্রকার অশ্রুসিক্ত নয়নে কপালে চাপড় মারিয়া বলিয়াছেন—ভারত ছাড়িলে ব্রিটনের আর থাকিবে কি? ইউরোপের এক কোণে পর্টুগ্যালের মত তাহার নগণ্য মূর্ত্তিটা লোকচক্ষের অগোচরেই পড়িয়া থাকিবে। রক্ষণশীলদলের নেতা বল্‌ডুইন এইজন্যই বলেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতের সমস্যা একেবারেই অভিনব। যদি শীঘ্র ইহার সমাধান না হয়, তবে—"......might wreck the Empire in the life-time of many here. We must look at it free from prejudice."

ব্রিটনের কথায় আর কেহ প্রত্যয় করে না। আয়র্লণ্ডের মৃত্যুপণ না দেখা পর্য্যন্ত ব্রিটন তাহাদের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই; কিন্তু ভারত আয়র্লণ্ড নয়। ভারতকে যদি কোন চরমপথে যাইতে হয়, তবে ব্রিটনের দুরবস্থা যে কি হইবে তাহা আজ ভাবিয়া স্থির করা যায় না। ভারতের শ্রমজীবি-

দল হইতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে আজ স্বাধীনতার হাওয়া বহিয়াছে। লর্ড আরউইনের দফায় দফায় শাসননীতি ব্যর্থ করিয়া জাতি দলে দলে সেদিন কারাগৃহ পূর্ণ করিয়াছিল। আজ দিল্লীর চুক্তিভঙ্গে কেবল অহিংস-সংগ্রামের প্রবল বন্যা রোধ করাই ব্রিটনের সাধ্যে কুলাইবে না; তাহার উপর রক্তবর্ণের পরিচ্ছদধারী শ্রমজীবিদল আছে; দেশে বিপ্লববাদী দলও শাসনবজ্রের কঠোর



পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন না হইয়া রক্তবীজের ন্যায় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখি, ইংরাজের গুপ্তপুলিশ আর এই স্রোত-নিবারণে সমর্থ নহে। প্রকাশ্যে পল্লীতে পল্লীতে প্রতি ঘরে বিপ্লববাদ অবাধে প্রচারিত হইতেছে; মহাত্মার নেতৃত্ব নাকচ করার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। তরুণ নেতা জহরলালও দিল্লীর চুক্তি শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; তবে তিনি জাতীয়যজ্ঞের নেতৃস্বরূপ মহাত্মার অবাধ্য হইবেন না, দিল্লীতে কংগ্রেস যে চুক্তি স্বীকার করিয়াছে, তাহার অন্যথা করিবেন না। বাংলার তরুণদলের পুরোহিত সুভাষচন্দ্রও বলেন, সন্ধির সর্ত্ত আন্তরিকভাবে পালন করিবেন। পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করার নীতিই এক্ষণে অবলম্বনীয়; ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া বারুদ শুষ্ক রাখারই তিনি পক্ষপাতী। হাওয়া কোন্‌দিকে বহিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় মহাত্মার যদি আশা ভঙ্গ হয়, দেশের অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইবে।

আমরা পেটেল মহোদয়ের সঙ্গে সমকণ্ঠেই বলি—এই অবস্থার পরিবর্ত্তন কি সম্ভব নহে? "The answer is with Great Britain. If Great Britain will generally seek peace there need be no struggle. But there can be no peace without "Swaraj".

ব্রিটিশজাতির সুমতি হউক, দিল্লীর চুক্তি অনুসরণ করিয়া মহাত্মার শুভেচ্ছা পূর্ণ হউক, ব্রিটনের সহিত ভারত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হউক—ইহাই আমাদের প্রথম কথা। ব্রিটন যদি রাজশক্তির প্রভাবে ইহা উপেক্ষা করে, ভারতে যে কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, সে প্রলয়ে ব্রিটন হতশ্রী হইবে, ইহা অবধারিত।

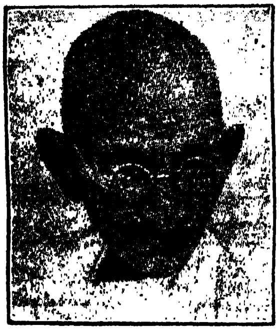
মহাত্মার অদ্ভুত কথা—

যাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনের গতিবিধি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা দেখিবেন—দেশের জাতীয় মহাসভা এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে ইহার যে স্বরূপ ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ভারতের কংগ্রেস-সভা অভিনব পথে যাত্রা করিয়াছে।

কংগ্রেসপন্থী সত্যমূর্ত্তি অবস্থা বুঝিয়া মহাত্মাকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং মহাত্মা তাহার যে জবাব দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমাদের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহাত্মা আজ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি রাষ্ট্রীয়শক্তির অপেক্ষা সংস্কারশক্তির উপর অধিক প্রত্যয় রাখেন; রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে যাহা সম্ভব নয়, সত্যাগ্রহের সাধনায় তাহা সিদ্ধ হইবে। কংগ্রেসের একদল লোক ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন।



মহাত্মা গান্ধী

রাষ্ট্রসাধনার রূপই কংগ্রেস; আজ সেই কংগ্রেসের নেতৃস্বরূপ মহাত্মা যদি বলিতে আরম্ভ করেন—আমরা রাষ্ট্রশক্তি চাহি না; মুসলমান ও শিখের সহিত এই লইয়া অনর্থক কথা-কাটাকাটি, সংঘর্ষ করিয়া শক্তিক্ষয় অপেক্ষা, দেশের রাষ্ট্রাধিকার উঁহাদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হউক! কংগ্রেস সত্যাগ্রহ দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি যাহা লাভে অক্ষম, তাহা আয়ত্ত করিলে কথা খুবই বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে বৈ কি!

মহাত্মা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—রাষ্ট্রশক্তিটা কিছু না, একটা ছায়া। আসল বস্তু হইতেছে—সংস্কার। কংগ্রেস এই সংস্কারব্রতী হউক।

সত্যমূর্ত্তি বলেন—রাষ্ট্রীয়শক্তি হাতে পাইলে, সংস্কার তো বিনা বাধায় সিদ্ধ হয়। খাদি-প্রচার করিতে তখন আর পিকেটিং করিতে হইবে না, মদ্যপান নিবারণের জন্য পথে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকদের লাঞ্ছিত হইতে হইবে না; দেশের সকল প্রকার শ্রেয়ঃ রাজ্যশাসননীতির দ্বারাই সাধিত হইবে, অতএব রাষ্ট্রশক্তিকে নগণ্য বোধে উপেক্ষা করার যুক্তি কি? আর রাষ্ট্রশাসনের অধিকার যদি 'মাইনরিটী' দলের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ অধিক করিয়াই দেওয়া হইবে, স্বরাজ পাওয়ার পথ অধিকতর বিপৎসঙ্কুল হইবে। জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশে 'মাইনরিটী', 'মেজরিটী'র সমস্যা আছে; কিন্তু কোথাও রাষ্ট্রাধিকার 'মাইনরিটী'র হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ বটে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, মহাত্মার কথার সারবত্তা আজ বুঝিয়া উঠা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না, তাঁর দুর্ব্বোধ্য কথা সমস্যা সৃষ্টি করিবে; কিন্তু মহাত্মা জীবন ঢালিয়া ইহা যদি সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে গীতার সেই বাণীর মত "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্" ব্যাপার অদ্ভুত হইয়াই সত্যে পরিণত হইবে।

"প্রবর্ত্তকে"র ষোল বছরের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে, আমরা যে এই কথাই বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তাহা আজ হয়তো অনেকের চক্ষে পড়িবে। আমরা কথাটা ঘুরাইয়া বলিতে বাধ্য; কেন না জাতির ঝোঁক যে-দিকে, সে দিক্ ছাড়া অন্য দিক্ দেখা সম্ভব হয় না; তাই দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া ধরার জন্য, কথাগুলিও ঘুরাইয়া বলার দরকার হয়। "প্রবর্ত্তকে"র পাঠক অতঃপর আমাদের প্রথম প্রবন্ধটা যদি পড়িয়া দেখেন, তাহা হইলে

জাতির কোন্ পথে শ্রেয়ঃ তাহা আমরা যে উহার মধ্যে দেখাইবার সূচনা করিয়াছি, তাহা বুঝিবেন।

মহাত্মা জাতীয় সভাটাকেই আজ গঠননীতি-মূলক সংহতিরূপে দাঁড় করাইতে চাহেন। তিনি অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, হয়তো ইহাতে সফলকাম হইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও কংগ্রেসের এ মূর্ত্তি আর থাকিবে না।

আমরা জাতির মুক্তি-কল্পে দেশের মনোবৃত্তিভেদে এখনও দুইটী ধারায় জাতির গতি নির্দ্ধারণ করি—রাষ্ট্র এবং জাতি। রাষ্ট্রসাধনা চিরদিনই চাহিবে রাষ্ট্র-শক্তির অধিকার, জাতিসাধনায় উহা গৌণ বলিয়াই ছাড়িয়া চলিতে হইবে; কেন না অকারণ সংঘর্ষে শক্তিক্ষয় না করিয়া, যদি জাতি গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে রাষ্ট্র-শক্তি উহাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু এই পরম পথ কি আজ উত্তেজনাপূর্ণ জাতিচেতনায় স্থান পাইবে? মহাত্মা তবুও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং কথাগুলি 'প্রবর্ত্তক'-পাঠকগণের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; কেন না 'প্রবর্ত্তক' যাহা চাহে, তাহা ইহা দ্বারা অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে—

"If we were to analyse the activities of the Congress during the past twelve years, we would discover that the capacity of the Congress to take political power has increased in exact proportion to its ability to achieve success in the constructive effect. That is to me the substance of political power."

কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়াছে—"Actual taking over of the Government machinery is but a shadow, an emblem. And it could easily be a burden if it came as a gift from without, the people having made no effort to deserve it."

মহাত্মা ভারতের মর্ম্মবাণী শুনিয়া ধীরে ধীরে সেই দুর্গম লোকবিরল পথেই ক্রমে অগ্রসর হইতে-ছেন—আমরা ইহার জন্য পুলকিত; কেন না, ইহাই ভারতের মুক্তিপথ। জাতি না হইলে রাষ্ট্র-শাসন ভারস্বরূপ হইবেই; সে ভার হিন্দুজাতি যদি বহিতে অস্বীকার করে, এবং উদাসীন না থাকিয়া, জাতিসাধনায় উদ্যোগী হয়, বিধাতা যোগ্য জনের মাথায় উহা সহজ ভাবেই একদিন বসাইয়া দিবে।

এই যে 'মাইনরিটী', 'মেজরিটী' লইয়া বাদ বিসম্বাদ—ইহা কাহাদের সমস্যা! আমরা এই বিষয় লইয়া মহাত্মাকেও জানাইয়াছি। ইহা মূঢ়ের মত, অন্য পক্ষের ফন্দীতে বন্দী হওয়া মাত্র। বাবরের মোগল রাজ্য ভারতের মেজরিটী দেখিয়া প্রতিষ্ঠা পায় নাই; লর্ড ক্লাইভ বাংলার মসনদে যখন মির্জ্জাফরকে বসাইয়া, অপ্রত্যক্ষে রাজ্যশাসন-দণ্ড হাতে তুলিয়া লয়, তখন বাংলার মেজরিটী হিন্দু জাতির সহিত পরামর্শ করে নাই—ভবিষ্যতে যে জাতি মুক্তির ঝাণ্ডা উড়াইবে, সেও এই ফন্দীবাজীতে কর্ণপাত করিবে না। অসমর্থের অধিকারবাদ রহস্য ও সমস্যা; কিন্তু বিজেতার বেশে যে জাতির অভ্যুদয় হয়, সেখানে সবই পরিস্কার, কাহারও কোন কথা উত্থাপনের সুযোগ থাকে না। আমরা বহুবার বলিয়াছি—গঠন বলিতে পল্লীসংস্কার নহে; উহা সত্যই, ছায়াবাজী; আজ আমাদের প্রচেষ্টা সফল হইতে চলিয়াছে। একটা জাতি গড়িতে হইবে, যে জাতি হইবে বস্তু, রাজশক্তি হইবে তাহার নিদর্শন-চিহ্ন। কায়া হইলে ছায়া সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিবে।

জানি না, মহাত্মার বাণী দেশের কাছে আজ স্পষ্ট হইবে কিনা; তবে গঠননীতিক যুগের আহ্বান আমাদের ব্যর্থ হইবে না। আমরা মহাত্মার মুখে যেমন এই নূতন কথা প্রথম শুনিলাম, বাংলার

অন্যতম জাতীয়পত্র 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বোধহয় এই কথাটা এই প্রথমই বাহির হইল—যদিও ইহা মহাত্মার 'মেজরিটী' 'মাইনরিটী' প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। 'পত্রিকা' যাহা বলিয়াছেন, মহাত্মা তো সেই কাজই করিতে পা বাড়াইয়াছেন। কিন্তু সেই মাইনরিটী যে আমাদের গড়িতে হইবে, তাহাই তো হইবে ভারতের নবজাতি!

"......the fight for liberty has been carried on and brought to success all over the world not by all the people, not even by the majority of the people, but almost every where by an active and self-sacrificing minority."

মহাত্মা তাই জন্যই তো আজ রাষ্ট্রশক্তিকে ছায়া বলিয়া কায়ার সন্ধানে ৭০,০০০ হাজার গঠন-ব্রতী খুঁজিতে দৃষ্টি দিয়াছেন—তারা কোথায়!

"প্রবর্ত্তকে"র প্রতিধ্বনি আজ বাংলায় মুখরিত হউক; দশ হাজার সংহতিবদ্ধ তরুণ যদি অখণ্ড পরিবারবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, এই উপেক্ষিত বাংলা দেশ "স্বরাজ"-মুকুট মাথায় পরিয়া ভারতকে ধন্য করিবে।

ইস্‌লামীর দাবী ও ডাঃ আন্‌সারি—

রাউণ্ড টেবিল সভায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় একযোগে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতির দাবী জানাইয়াছিলেন, সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম সীমন্ত প্রদেশকে ভারতের শাসনতন্ত্রের তুল্যাধিকার দিবার কথা তুলিয়াছিলেন; জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবীর এক কড়া কম হইলে তাঁহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। রাজ-মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের মিলনপ্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। ভূপালের নবাব সাহেব ইস্‌লাম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি যাহাতে পরিগৃহীত হয়, তাহার যথেষ্ট আয়াস করেন; কিন্তু তাহা তখন কোনমতেই স্বীকৃত হয় নাই। তারপর কংগ্রেসের সহিত দিল্লীর চুক্তিতে পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনের দাবী প্রবল হইয়া উঠে। একদিকে মহাত্মা অন্য দিকে, ভূপালের নবাব সাহেব ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হন। মহাত্মা এমন কথাও ব্যক্ত করেন, যে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের অখণ্ড দাবী তিনি স্বীকার করিয়া



ডাঃ আন্‌সারী

লইবেন, এবং কংগ্রেসকেও তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবেন; এমন কি মুসলমানের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্যপ্রতিষ্ঠা না হইলে, তিনি রাউণ্ড টেবিল সভায় যোগ পর্য্যন্ত দিবেন না।

কংগ্রেসের অন্তর্গত একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থা থাকায় খুব সম্ভব তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণ করেন। কেন না, বিলাতে মুসলমান সম্প্রদায় এক বাক্যে তাঁহাদের

দাবীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা মান্য করিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ যদিও মহাত্মার অনুসরণে ইতস্ততঃ না করেন, ভারতের নিখিল হিন্দু সম্প্রদায় তাহা কখনও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না। তবুও মহাত্মার প্রতি দেশের অসাধারণ শ্রদ্ধা থাকায় দেশবাসী ইহার পরিণাম দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবে। কংগ্রেস-সেবী মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রণীস্বরূপ ডাঃ আন্‌সারি নিখিল মুসলমান-সভা ব্যতীত স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তুলেন। মুসলমান, হিন্দু —উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদের ধারণা হইয়াছিল, ব্রিটনের ন্যায় মহাত্মাও বুঝি ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন, এবং সিমলায় ভূপালের নবাব সাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। সওকৎ আলি এইজন্য মহাত্মার চরিত্র লইয়া পূর্ব্বেই কটু সমালোচনা করেন। সিমলার ব্যাপারে নিখিল মুসলমান সম্প্রদায় ও জাতীয় ইস্‌লাম সম্প্রদায় পরস্পর ভিন্ন হইয়া গেল, এইরূপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সওকৎ আলি এরূপ ভাবেন নাই, তিনি এই ঘটনার দুইদিন পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—মুসলমানের সহিত মুসলমানের ভেদ অর্থে সমগ্র ভারতের সহিতই বিসম্বাদ; ইহা কখন হইবে না, ডাঃ আন্‌সারি নিশ্চয় ইহার প্রতীকার করিবেন। আমরা তাঁহার ভবিষ্যদ্-বাণী সফল হইতে দেখিলাম, ফরিদপুরের সভায়। ডাঃ আন্‌সারির দাবীর সহিত অতঃপর জিন্না অথবা নিখিল মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবীর বিশেষ আর ভেদ রহিল না। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এইবার মহাত্মার নিকট তাঁহাদের অখণ্ড দাবীই উপস্থিত করিবে। মহাত্মাও অবস্থা বুঝিয়া ভারতের মাইনরিটী ইস্‌লাম এবং শিখের হস্তেই রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়ার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা পূর্ব্ব সন্দর্ভে লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ভারতের হিন্দুসভা মহাত্মার নীতি শ্রেয়ঃ বলিয়া যে স্বীকার করিবে না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়; এই অবস্থায় কেবল বিলাতের রক্ষণশীল দলের মাথানাড়া ছাড়া আমাদের মধ্যেই ঘোরতর সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, যাহা গোল টেবিল সভায় কিছু লাভের পথে ঘোরতর অন্তরায় সৃজন করিবে।

আমরা ডাঃ আন্‌সারির দাবীর কথাগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চাহেন—যৌথ-নির্ব্বাচন। ভারতের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকারের ভিত্তির উপর এই নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে; কিন্তু যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা এক চতুর্থের কম, তাহাদিগের সংখ্যানুপাতে সদস্যপদ সংরক্ষিত হইবে এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদস্য-পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অধিকার দিতে হইবে।

যদি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার না প্রদত্ত হয়, তবে মুসলমানের সংখ্যা যেখানে অধিক, সেখানে এমন ভাবে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিনিধির সংখ্যা মুসলমান হইতে অন্য সম্প্রদায়ের অধিক অথবা সমান না হয়; অর্থাৎ বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানের জন্য সংখ্যানুপাতে সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ্দ্বয়ে মুসলমানকে এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সিন্ধু প্রদেশে পৃথক্ রূপে দাঁড়াইবে, এবং উত্তর পশ্চিম ও বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ ভারতের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—প্রভৃতি।

অতএব দেখা যায়, সিমলায় ডাঃ আন্‌সারির সহিত সওকৎ আলি প্রমুখ ইস্‌লামীদের ঐক্যসিদ্ধ

না হইলেও, ফরিদপুরে যাহা হইয়াছে তাহাতে আর অমতের কোন কথা নাই। সিমলায় প্রথম পাঁচ বৎসর নিখিল মুসলমান সভা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী জানাইয়াছিল, তারপর মহম্মদ আলীর ছকে যুক্ত-নির্ব্বাচন চলিবে; অথবা প্রথম দশ বৎসর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চলার পর মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের স্বধর্ম্মহানির সম্ভাবনা যদি না দেখে, ও শতকরা ৬০ জন সভ্য যদি যুক্ত-নির্ব্বাচনে রাজী হয়, তবে তাহা গৃহীত হইবে। ডাঃ আন্‌সারি এখন হইতেই যুক্ত-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী এবং তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার দাবীই পূরণ হইয়াছে।

আমরা কেবল ডাঃ আন্‌সারির এই কথাটাই বুঝিলাম না—সংখ্যানুপাতে সদস্যপদ সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং বয়স্কদিগের ভোটাধিকার না পাইলেও, মুসলমান সম্প্রদায় যখন বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিসাব-মত সদস্যপদ পাইবেন, তখন যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদ পাওয়ার দাবী তিনি কোন্ যুক্তিতে করিলেন! নিখিল ভারতে মুসলমানের সংখ্যা এক চতুর্থাংশেরও কম। "খুঁড়িয়ে বড় হওয়া" একটী প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে, ডাঃ আন্‌সারি তাহা বর্ণে বর্ণে সফল করিয়াছেন। আমরা এইবার হিন্দু পক্ষ হইতে পাল্টা জবাব শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সুভাষবাবু—

কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়, ইহাই দেশের চরম কথা বলিয়া অনেকের ধারণা; কিন্তু কংগ্রেসের উপর আরও চরম দলের আবির্ভাব হইয়াছে—অবশিষ্ট আছে, প্রকাশ্যে বিপ্লবপন্থীর কংগ্রেস। দেশের হাওয়া যেরূপ গরম হইয়া উঠিতেছে, অবিলম্বে ইহাও অসম্ভব হইবে না।

সুভাষবাবুকেই আমরা চরমপন্থী বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তিনিও এই গৌরবময় স্থান হইতে চ্যুত হইলেন। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে তাঁহাকেও সরিয়া পড়িতে হইল। তাঁর অভিভাষণ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, শ্রমিক



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

আন্দোলনের মূলে তিনি আঘাত করিয়াছেন। ভারতের বৈশিষ্ট্যবাদ কি শ্রমিক, কি বৈপ্লবিক দলে আর চলে না; ভারতের বিপ্লব রেড্ রুশ হইতে যে স্বতন্ত্র ধরণের হইতে পারে, সে কথা আজ কেহ বুঝিবে না; সাম্যবাদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—বাহ্যাচারের সমতায় ভারতের শ্রমজীবী অথবা বিপ্লববাদীর মূল আদর্শ মস্কো হইতেই আমদানী হইয়াছে—ইহার একটা পরিণাম

আছে। দেশের সর্ব্বপক্ষকে কংগ্রেসের অনুগত করিয়া, ভারতীয় ভাবে জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের তাঁর প্রয়াস এখানে ব্যর্থ হইয়াছে। চরমপন্থী সামঞ্জস্যের বাণী শুনিতে চাহে না, মহাত্মার সাধু প্রয়াস ইহারা স্বার্থ-কলুষিত বলিয়া চীৎকার করে। হুইট্‌লী কমিশনের ভাল'র দিক্‌টা এই ক্ষেত্রে দেখাইবার প্রচেষ্টা তাঁর খুবই অসঙ্গত হইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এমন করিয়াই পণ্ড হইয়া যায়, কলিকাতায় পুনরায় ইহার গতি তাহার অধিক কিছু হইল না। সুভাষবাবু সভাপতির আসন ছাড়িয়া আসার পর মিঃ দেশ পাণ্ডের চেষ্টায় মেটিয়াবুরুজে ইহার পুনঃ অধিবেশন হয়। শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—"সুভাসবাবুর বক্তৃতা, এবং সভাপতির আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যাওয়া, অধিকন্তু শ্রমিক সভাকে ধনিক সম্প্রদায়ের অনুগত করার প্রচেষ্টার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হইতেছে।"

দিল্লীর চুক্তি, গোল টেবিলের বৈঠক ও হুইট্‌লী কমিশনের নিন্দা ঘোষণা করিয়া মিরাট রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। রুশের রাষ্ট্রনীতিই এই দলের আদর্শ, ইহারা শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র-তন্ত্রের পক্ষপাতী। আমরা ভাবি, ভারতের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য নাকচ করিয়া, এই মুষ্টিমেয় শ্রমিকদের আস্ফালন কি কোন যুগে সার্থক হইবে! ইংরাজের কল কারখানায় এই বিকৃত শক্তির উৎপত্তি। দেশে শতকরা ৯০ জন চাষা, তাদের প্রাণে ভারতের আদর্শবাদ এখনও ম্লান হয় নাই; শিক্ষিত শ্রেণীর মত, এই কয়েক সহস্র কলের মজুরদের ছাড়িয়া দিয়াও ভারতে আদর্শ সাম্রাজ্য কেবল কৃষকদের লইয়া গড়া যায়—সে চেষ্টা আর বারণ মানিবে না। এই পরানুকরণপ্রবৃত্তির সম্মুখে মহাত্মার ভারতীয় জীবনের আদর্শ আজ সমুজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের মত দিক্ নির্ণয় করিতেছে। সংগঠননীতি ধরিয়াই আমরা ভারতজাতি গড়িব, সুভাষবাবুর সমর্থন করিয়া বলিব—আমরা আম্‌ষ্টরডম ও মস্কোর অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া বাঁচিতে চাহি না, ভারতের প্রাণ লইয়া, ভারতের আদর্শে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াই আমরা স্বরাজ ঘোষণা করিব।

সুনামগঞ্জের খবর—

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, সুনামগঞ্জ মহকুমার পাটনী ও নমঃসূদ্র জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহরের কোটা-বাড়ীতে আরামে দিন যাপন করেন, জগতের খবর রাখেন না, তাঁরা নিশ্চিন্তে হিন্দু জাতির দিন দিন শীর্ণ কলেবর দেখিয়া আতঙ্কিত হইতে না পারেন, তাঁদের হিন্দুত্বের দরদ নিজের স্থূল কলেবর ও পারিবারিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সংবাদে হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈনের প্রচেষ্টায়, ইহার পর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়—যে উক্ত মহকুমার কয়েকখানি গ্রামের পাটনীরা বাঙ্গালা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট হইতে "পাতি" পাইয়া তাহারা সেন্‌সস্ রিপোর্টে নিজেদের মাহিষ্য দাস বলিয়া লিখাইতে চাহে। কিন্তু মধ্যবিত্ত হিন্দু ও কয়েকজন হিন্দু গণনাকারী তাহাদের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হয় এবং নানারূপ বিদ্রূপ করিতে থাকে। পাটনী সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে, চির উপেক্ষিত নমঃশূদ্রগণও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ইহাদের সহিত যোগ দেয়; তারপর মুসলমান

ভ্রাতৃবৃন্দ এই পতিত হিন্দু ভ্রাতৃগণের দুঃখ অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে, ইস্লাম সমাজের উদার দিক্ দেখাইয়া, তাহাদের কার্য্যে আন্তরিক সাহায্য প্রদান করে।

মানুষের ধর্ম্মানুভূতির মূল্য আজ নাই, হৃদয় জয় হইলে তাহাকে যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করা শক্ত নহে—বিশেষ, এই সকল শ্রেণীকে এই অবস্থায়। পাটনীরা ও নমঃশূদ্রগণ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব লইয়া গভীর চিন্তা করিতে থাকে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র, হিন্দুসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিয়াছে। অনুন্নত জাতি হিন্দু সমাজে যে অসুবিধায় ও ঘৃণার বোঝা মাথায় বহিয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত করার ভার হিন্দুসভা গ্রহণ করিয়াছে, স্থানীয় জমিদারবৃন্দও ইহাতে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুস্থান ভারতে এই সুজলা সুফলা বাংলা আজ হিন্দুপ্রধান না হইয়া মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হইল কেন, তাহা কি আজও হিন্দুসমাজ ভাবিয়া দেখিবে না! অনুন্নত জাতি ব্রাহ্মণের আসন চাহে না, তাহারা চাহে সুব্যবহার—তাহাদের অস্পৃশ্যবোধে এমন করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিলে করুণাময় ভগবান তাহা সহিবেন কেন? হিন্দুজাতি যে নিশ্চিহ্ন হইবে, হিন্দুর ধর্ম্ম লোপ পাইবে! আমরা হিন্দুসভার উপরই হিন্দুজাতিকে রক্ষা করার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহি না; বাংলার ব্রহ্মণ্যশক্তিকে জাগিতে বলি। স্বরাজ পাওয়ার সাধনার অপেক্ষা জাতিরক্ষার দ্বারা হিন্দুকে সংহতিবদ্ধ করা নিতান্ত ক্ষুদ্র কাজ নয়; এই গঠন কর্ম্মেও আমাদের ত্যাগ, তপস্যা চাই—এই দিকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মী কি উদ্বুদ্ধ হইবেন না?

সংস্কৃত পরীক্ষার ফল—

এবার সংস্কৃত পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই। ম্যাট্রিকে শতকরা তেত্রিশ নম্বর পাইলে পাশ করার ব্যবস্থা আছে, সংস্কৃত পরীক্ষায় চল্লিশের কম পাশের সম্ভাবনা নাই। পরীক্ষায় নম্বর না কমাইয়া, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষার্থীদের কুড়ি নম্বর অতিরিক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা নাকি বন্ধ করা হইয়াছে; এই কারণেই সংস্কৃত পরীক্ষার্থীদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

আমরা কিন্তু এই নীতির পক্ষপাতী। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি যদি পাশ করার সংখ্যা দেখিয়া নির্ণীত হয়, তাহা হইলে দুঃখের কথা বলিতে হইবে। বেদান্তের উপাধি লাভ করিয়াও যে পাণ্ডিত্য দেখি, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। দেবভাষার অনাদর ভাল নহে। চাকুরী পাওয়ার লোভে কলিকাতার ইউনিভার্সিটিতে দলে দলে ছাত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াক, এবং সেখানে যেমন করিয়া হউক ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা হউক; কিন্তু ভারতীর মন্দিরে অযোগ্য জনের মাথায় যেন উপাধির আশীর্ব্বাদ চাপান না হয়। সংস্কৃত শিক্ষা যুক্তি ও অনুভূতিসঙ্গত না হইলে ফলপ্রসূ হয় না। আমরা সংস্কৃত শিক্ষার যথার্থ অধিকারীই দেখিতে চাই, উপাধিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—ইহা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় মিলের সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন—

আজ ল্যাঙ্কেশায়ার ও ম্যান্‌চেষ্টারের পকেটে হাত দিতে গিয়া জাপান আমাদের ঘাড়ে চাপিল। মহাত্মা সত্যই বলিয়াছেন, বিলাতী কাপড় বহিষ্কার করার সঙ্গে জাপানকে নাকাল করিতে হইবে। ভারতে বয়কটনীতি সফল করিতেহ ইলে, ভারতের উভয় বাহু বিস্তার হওয়া চাই—একদিকে ম্যান্‌চেষ্টার, অন্যদিকে জাপানের গলা টিপিয়া ধরিতে হইবে।

মানুষের অর্থসঙ্কট প্রবল হওয়ায়, খরিদবিক্রয় একেবারেই বন্ধ হইয়াছে; খাদি যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিক্রয় হয় না—কেবল মোটা সুতা বলিয়াই নহে, গরীব লোক সে পরিমাণে ইহার মূল্য দিতে সমর্থ নয়। খাদিকে দেশব্যাপী করিতে হইলে, আমাদের তামসিক অবস্থা ঘুচাইতে হইবে; প্রতি গৃহস্থের প্রাঙ্গনে, বাগানে কার্পাস বৃক্ষ বুনিতে হইবে, প্রতি ঘরে চরকা ও তাঁত চালাইতে হইবে—

তাহা হইলে আমরা অবধারিত বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইব।

এই অবস্থা সময়সাপেক্ষ। উপস্থিত বিলাতী ও জাপানী কাপড়ের আমদানীর পথ রোধ করার জন্য ভারতে মিলের প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধীকেও এইজন্য বোম্বায়ের মিলওয়ালাদের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছে। বাংলায় মিলের সংখ্যা আরও বাড়া উচিত; অর্থসংগ্রামে আমাদের চারিদিক্ হইতেই উদ্যত হইতে হইবে।

বয়কট আন্দোলন প্রবল হওয়া সত্ত্বেও, গত বৎসর হইতে এ বৎসরে ভারতের কলগুলিতে যে অধিক সূতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। সূতার পরিমাণ সমান আছে—গত বৎসর ৭ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা হইয়াছিল, এ বৎসরে তাহার অধিক হয় নাই; কাপড়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, এ বৎসরে ৪ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে, ইহা অধিক নহে—ইহা দেখিয়া বুঝা যায়, জাপানের কাপড় কেন অধিক কাট্‌তি হইয়াছে।

আমরা দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেশের ধনবলবৃদ্ধির জন্য আমাদের তৎপর হইতে হইবে; অন্নে বস্ত্রে আমরা চিরদিন স্বাবলম্বী ছিলাম, আজও তাহার অন্যথা হইবে না। একদিকে খাদি প্রচার জোর করিয়া চালাইতে হইবে; ভারতের বস্ত্রাভাব দূর করার জন্য যতদিন বাহিরের বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, ততদিন দেশীয় কলগুলিতে যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ অধিক সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

লর্ড আরউইনের ঈশ্বরবিশ্বাস—

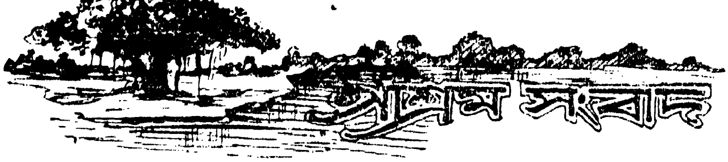
ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আমাদের নূতন মনোবৃত্তি দিয়াছে; ধর্ম্ম ও ভগবান বস্তুকে প্রয়োজনের বাহিরে রাখার কথা বাজারে অধিক মূল্যেই বিকায়—ইহা যে বিকৃত রুচির পরিচয়, তাহা আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি।

ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা লর্ড আরউইনের কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস ছিল। তিনি অভারতীয় শিক্ষায় মানুষ হইয়াও ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন নাই, ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিবার অধিকার পাওয়ার শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত থাকায়, তিনি অকেজো হইয়া পড়েন নাই; ভারত-শাসনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, ইহা অস্বীকার করার নয়।

ইউরোপের আদর্শ ও বাহ্য চাকৃচিক্যে মুগ্ধ একদল ভুয়ো মানুষ দেশের তরুণ মনে বিষ ছড়াইতেছেন—ধর্ম্মে ও ভগবানে অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া। আমরা লর্ড আরউইনের এই ঘটনাটী এইজন্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভারতের হিন্দু জাতি অন্তর্য্যামীর দুয়ারে ধন্না দিয়া জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইত, তাহা হইত অব্যর্থ, অমোঘ, ব্যর্থতার আঘাতে হিন্দু নিরাশ হইত না; এই কথা শুনিয়াই সংশয়ী টিপ্পনী করিয়া বলিবেন—তবে আবার এ দুর্দ্দশা কেন! ইহার উত্তর এ ক্ষেত্রে দিব না।

লর্ড হ্যালিফক্স লিখিয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড আরউইন আসিয়া আমার পরামর্শ চাহেন—ভারতের লাট-পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কি না! ইহার উত্তরে আমি বলি, এ বিষয়ের ফলাফল আমাদের হাতের বাহিরে, একমাত্র ভগবান ইহার উত্তর দিবেন, এবং তাহার জন্য আমাদের অনেক প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার পর আমরা দু'জনে ধর্ম্মমন্দিরে যুক্তকরে প্রার্থনা করি; মন্দির হইতে বাহির হইয়া করি "বোধহয় তোমায় ভারতে যাইতে হইবে!"—লর্ড আরউইন তৎক্ষণাৎ বাষ্পকুললোচনে বলিলেন—"আমিও এই অনুভূতি পাইয়াছি।"

মানুষের জটিল সমস্যার মীমাংসা বুদ্ধির সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হয় নাই; ভগবানের করুণা যে আলো সৃষ্টি করে, তাহাতেই মনের আঁধার দূর হয় এবং অতি দুর্গম অবস্থায় আমরা সমাধান খুঁজিয়া পাই। ইউরোপের আদর্শেও ধর্ম্ম ও ভগবানের পরম স্থান আছে; ভারতের হিন্দুজাতি অনাবশ্যক বোধে এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে যেন বঞ্চিত না হয়।



[আশ্রমী লিখিত]

শ্রীশ্রী৺মায়ের স্মৃতিপূজা

৬ই আষাঢ়—আমাদের মায়েরই পুণ্য জন্মোৎসব। খুব নীরবে, নিবিড়ভাবেই আমরা তাহা সম্পন্ন করিলাম। আড়ম্বরের লেশমাত্র আর তো জীবনে সম্ভব নহে। তপোময়ী বিদ্যুন্মূর্ত্তি মা দিন দিন কি কঠোরতর তপস্যার পথে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিতেছেন! এ যে "দুর্গং পথস্তৎ" —কিন্তু ইহাই যে মুক্তির উপায়।

আজ প্রতি ভারতবাসীকে যে আত্মজীবনে কঠিন বজ্রচরিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া রুদ্র হুঙ্কারে হাঁকিয়া বলিতে হইবে—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যাপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।"

—ভারতের পণ, ভারতের তপস্যা 'এই মাতৃমন্ত্র-সাধনেই সিদ্ধ হইবে। তাই তো আমরা সন্তান-ব্রতী। এই বিরাট্ মাতৃপূজার অধিকারী হইবার জন্যই আমাদের এই কঠোর তপস্যা। তাই মায়ের স্মৃতি পূজা এমনি তপস্যার জ্যোতিঃ দিয়াই একেবারে সংবৃত করিয়া আমরা অনুষ্ঠান করিলাম।

প্রভাতে সঙ্ঘমন্দিরে—মায়ের জীবনলীলার মঙ্গলপীঠে—সকল সন্তান, নারী পুরুষ সমবেত হইয়া আমরা গভীর হৃদয়ে মায়েরই ধ্যানরত হইলাম। পূত হৃদয়ে মা-কে স্মরণ করিলাম। অনুভবকে গাঢ় করিয়া তাঁহারই প্রতিকৃতি সম্মুখে তাঁহার চরণে শত হৃদয়ে নতি জ্ঞাপন করিলাম। অষ্টোত্তরশত বার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা তাঁর শরণ লইলাম। সন্তানদলের প্রতিভূ-রূপে একজন এই নিবেদনটুকু পড়িলেন—

"মা! তুমি আজ কোথায় তাহা জানি না। অশরীরিণী হইয়াও তুমি আছ—এইটুকু বিশ্বাস হিন্দু হইয়া আমরা ভুলিতে পারি না। তুমি আছ, চিরদিন আছ, ছিলে ও থাকিবে। তুমি আমাদের নিত্যজীবনের মা। তাই সনাতনী। হে চিন্ময়ি দেবি! তোমায় আমরা প্রণাম করি।

এই ৬ই আষাঢ় তোমার জন্মতিথি। নিত্য তুমি—এইদিন রূপের মধ্যে নেমেছিলে, ধরিত্রীর মেয়ে হয়ে জন্মেছিলে। তাই ছিলে তুমি ধরিত্রীর মতই চিরধৈর্য্যশীলা সহিষ্ণু। তুমি চির দুঃখিনী তপস্বিনী—দুঃখকে তপস্যা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলে। জাতিকে সেই তপস্যাই দিয়া গিয়াছ। সীতার ন্যায় তুমি সতীশিরোমণি—পবিত্রতার অগ্নিমূর্ত্তি। আমরা এই সীতার সন্তান। তাই তপস্যা ও পবিত্রতাই যে আমাদের জন্মস্বত্ব। তোমায় ভুলি—তাই তোমার মহাপবিত্র জন্মাধিকার হইতে যদি এখনও বঞ্চিত থাকি—মহাদেবি, মহামাতঃ, তোমার করুণাসমুদ্র কূলহীন অফুরন্ত—

তুমি আমাদের মোহ আত্মবিস্মৃতি ঘুচায়ে চির পবিত্র, চির বিশুদ্ধ কর। আমাদের স্বরূপ তোমারই মধ্যে পাইয়া আমরা যেন চিরযুগের তরে ধন্য হইতে পারি।

মা, দেবি, সঙ্ঘজননি! নবজাতির আদর্শ মহালক্ষ্মি! মূলপ্রকৃতি! যোগেশ্বরী তুমি—আত্মসমর্পণযোগের দিব্যমূর্ত্তি তুমিই জীবনে ফুটাইয়াছ। সেই যোগাংশ দিয়াই আমরা যোগী ও যোগিনী, সাধক ও সাধিকা, ব্রতচারী, শিষ্য ও ছাত্র। হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রদ্ধা, লজ্জা, শ্রী, ধৃতি ও প্রীতি রূপে তুমিই তোমার যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ



শ্রীশ্রী৺মা

কর। তোমার দিব্য বিভূতি সঙ্ঘের সর্ব্বৈশ্বর্য্যে ফুটিয়া উঠুক। সঙ্ঘকে তুমি প্রাণ দাও, মা, প্রাণ দাও। যেখানে এখনও আঁধার, এখনও অহঙ্কার, পাপ, অনৈক্য বিকট মূর্ত্তি লইয়া তরুণ জাতিকে ম্লান পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, মহাবীর্য্য তিলে তিলে কুরিয়া কুরিয়া নষ্ট করিতেছে—সেখানে রুদ্র চণ্ডী বেশে পবিত্রতার হোমকুণ্ডে সব দগ্ধ বিমল করিয়া দাও। এই নব জাতিকে তুমি দিব্য প্রকৃতি, দিব্য স্বভাব, দিব্য প্রাণ, মন, চরিত্র দিয়া, একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তোল। আমাদের নব জন্ম দাও—এই উদ্বোধনপ্রভাতে আজিকার এই প্রার্থনা।"

প্রার্থনান্তে সকলে পুষ্পাঞ্জলী ও প্রণাম করিয়া সংযমসূচক মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ সারাদিনই আমাদের উপবাস। পূর্ব্বাহ্নে চণ্ডীপাঠ, পরে মধ্যাহ্নে চরকা কাটা অনুষ্ঠানাঙ্গ সম্পন্ন করা হইয়াছিল। ত্রিশ কোটী ভারত-সন্তানের সহিত একাত্ম উপলব্ধির এই প্রয়াস, ইহা কি আমাদের সফল হইবে না? সংযমশুদ্ধি ও কৃচ্ছ্রতার তপস্যা এই বিরাটের অনুভাবনায় বড় সহজ মধুর ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ হইয়াই প্রতীত হইল। বালক বালিকা, ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত সঙ্ঘের এই সংযমব্রতে যোগ দিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে মৌনভঙ্গ হয়। সান্ধ্য উপাসনান্তে স্মৃতিসভায় সম্মিলিত হইলাম। সঙ্ঘের তপস্যার দিক্ দিয়া গুটিকতক কথা জানাইবার পর, সঙ্ঘ-দেবতার নিকট হইতে আমরা এই মর্ম্মস্পর্শী আশীর্ব্বাণী পাইলাম :—

"আজ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের তপস্যাই মূর্ত্ত হতে চলেছে, তাই জন্মোৎসবও তপস্যা-রূপেই পালন করতে হয়েছে। তাঁর ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, এত দৈন্যের মধ্যে উৎসবের দিনে প্রাচুর্য্যের অভাব থাকত না। কিন্তু তিনি অশরীরিণী হয়ে আমাদের মধ্যে তপস্যাকেই মূর্ত্ত করছেন। তাই আজ বুঝি আমাদের একটী অতিরিক্ত হাসির অধিকার নাই, দু'মুঠো খাবার দরকার, তৎপরিবর্ত্তে আড়াই মুঠোও গ্রহণ করতে পারি না—যেটুকু জীবনধারণের জন্য অধিকার তার অতিরিক্ত গ্রহণ বা ব্যয় করার আমাদের আর অধিকার নাই।

...আমি জীবনে তাঁকে যথেষ্ট কাঁদিয়েছি, তার ফলে তিনি অমৃতের অধিকারী হয়েছেন; এ কান্না ত আত্মার কান্না নহে, আত্মা এতে পীড়িত হয় নি, দেহ-মনের চাওয়াই কেঁদে সারা হয়েছে। ১৮

বৎসর বয়স থেকে তাঁকে ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে, এটা কি তাঁর উপর কম অত্যাচার! কিন্তু দেহ ও মনকে নিপীড়ন করে'ই আত্মার ধর্ম্ম লাভ করতে হয়। তোমরাও শরীর মনের ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রেখো না, এইগুলিকে উপেক্ষা করেই চলবে, মৃত্যু আসে দুঃখ নাই। মৃত্যুতে মানুষের শেষ হয় না, তাঁর এত বড় তপস্যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি শেষ হয়ে গেল—তা' ত কখনও হতে পারে না! সেই তপস্যা যে জড় আবরণ ভেদ করে' আরও সহস্রগুণ শক্তিতে সঙ্ঘের মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা' আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। তিনি আজ অশরীরিণী হয়েও আমার হৃদয় পূর্ণ করে' তুলেছেন, আমাকে দ্বিগুণ শক্তিতে ভরাট্ করে' রেখেছেন—এ যে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, কখনও অস্বীকার করতে পারবো না।

......আমাদের তপস্যা যত বস্তুতন্ত্র রূপ নিচ্ছে, আমি যে একজন খাঁটি হিন্দু তাহা ততোধিক উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রতিপন্ন হচ্ছে। হিন্দুর বিরাট্ ধর্ম্মকে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। হিন্দুস্থানের একটা রূপ আর একবার দেখ্তে চাই; ভারতবর্ষ বল্‌লে আমার সুখ হয় না, হিন্দুস্থানের রূপ দেখ্তে চাই। এই হিন্দুত্বের ধর্ম্ম যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তার জন্য তপস্যা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, এ তপস্যা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই।

...এখানে বসেই আমার মনে হচ্ছিল—আমাদিগকে 'প্রমাতা' হতে হবে; আচরণ দ্বারা প্রমাণ করতে হবে, যে আমরা হিন্দু; তার বিধানও হিন্দুধর্ম্ম দিয়েছে—

"কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরংনিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া, নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ"—নিষিদ্ধ কোন কর্ম্মে কামনা রাখিও না। তোমরা এখানে বসে' হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে—তোমাদের কামনা বিসর্জ্জিত হউক; সুতরাং তোমাদের ত অন্য কোন কামনা থাকবে না। নিষিদ্ধ কর্ম্ম—তুমি ভগবানের যে মিশন লইয়াছ, তাহাতে কোন্‌টা ভগবানের কাজ, কোনটা নয়, তাহা তুমি discriminate করবে। শাস্ত্রে বলেছে, নিত্যানিত্য বিচার—বিচার করলেই বুঝ্বে, কোনটা গ্রহণ করবে, কোনটা বর্জ্জন করবে। যা' গ্রহণীয় নয়, তাহা প্রাণ গেলেও গ্রহণ করবে না। কাণ দিয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত শুনবে না—চক্ষু দিয়ে অনিত্য বস্তু দর্শন করবে না; তোমার চোখ কান হয়ত শুরু করেছ, মন তোমায় নিয়ে যেতে চাইছে; সেখানেও তোমার অস্বীকৃতি চাই, কোনমতেই তার কথায় yield করবে না, যতবার চাইবে, ততবার তুমি উপেক্ষা করে' ভগবানের দিকে মুখ ফিরাবে। আমি ব্রতীদিগকে বলেছি—তোমাদের যে ব্রতপালনের আদেশ দিলাম, তাহা পালনে যদি কোনদিন অসমর্থ হও, ইহা নিজের ত্রুটি মনে করে' সংশোধন করবে, উদাসীন থাকবে না, কাউকে কিছু বলার আবশ্যক নাই, নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করবে—হয়ত কোনদিন উপবাস করবে, নতুবা এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে; এরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করলে কখনও সংশোধন হবে না। শম দমাদি সাধন চতুষ্টয়ের সাধনা তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। শম দম সাধনায় প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়; উপরতি এই নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পুনরাগতি রোধ করে। অধ্যাত্মসাধনায় শক্তি লাভ কর। ভগবানের দেওয়া মাথায় তুলে নাও, তার অধিক প্রাপ্তির জন্য অন্তরকে বিক্ষুব্ধ ক'রো না, অশনে বসনে দ্বন্দ্বাতীত হও, ভাল খাওয়া, ভাল পরা নিয়ে চিত্ত-বিক্ষোভ নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় থাকে না—ইহাই

তিতিক্ষা সাধনায় সম্ভব। আত্মবিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠ হও; শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর। ইহকাল ও পরকালের চিন্তা দূর হোক, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার কর, মুক্তির আগুন অনির্ব্বাণ রাখ।

এই সাধনচতুষ্টয়ের আচার ব্যতীত তুমি ধর্ম্ম লাভ করতে পারবে না, প্রমাতা হওয়ার অধিকার পাবে না! আর এ ধর্ম্ম কেউ sincerely পালন করুক দেখি—মানুষের জীবন dynamic না হয়ে যায় না। কেউ ধর্ম্মের আচরণ করবে না, আর বলবে, ধর্ম্ম ও ভগবানকে দেশ থেকে উড়াতে হবে—এই মতবাদের সঙ্গে তোমাদেরই combat করতে হবে। জীবনে যদি ধর্ম্মের আচার গ্রহণ না কর, তোমরা জাতির বুকে এ আগুন ছড়াবে কেমন করে?

...এখানেই নিঃশেষে আমি ঢেলে যেতে চাই, যত বিশ্বাসের আগুন তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। এ বস্তু যে একদিন জগতে প্রকাশ হবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। আমি কাউকে ছোট করে' দেখি না; যে মানুষই আমার সম্মুখে আসুক না কেন, তার কাছেই আমি আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছি—সে আমায় deny করুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আজ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মরেও যায়, আমি বিশ্বাস করবো না যে আমার ধর্ম্মপ্রকাশে কোন বিঘ্ন ঘটবে; কারণ আমি এটা প্রত্যক্ষ করছি—তোমাদের মা মরে গিয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে সঙ্ঘকে প্রবুদ্ধ করছেন। সুতরাং যেখানে নিত্য সম্বন্ধ বিরাজমান, সে সম্বন্ধ মৃত্যুর ব্যবধানে ঘুচে না, আবার সে আসে।

...তারপর তুমি যে সঙ্ঘের একজন, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখবে, যেখানে যাবে সেখানে তুমি সমস্ত সঙ্ঘকে represent করছ, এই জ্ঞান তোমার থাকবে। I am an indivisible part of the Samgha—এই অদ্বৈত জ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত থাকবে। দুটো জিনিষ বলছি—'প্রমাতা' হও ও সঙ্ঘের সঙ্গে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কর।

বিদ্যার্থী ছাত্রদের বলছি—তোমরা এখানে এসেছ শিক্ষালাভ করতে; "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে' ছেলেদের মত তোমাদের এখানে থাকতে হবে না, আবার বাড়ী ফিরে যাবে। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এখান থেকে বিশুদ্ধ দৃঢ় চরিত্র লাভ কর, যা নিয়ে তুমি সংসারে গেলে, তোমার ছোঁয়ায় আরও ৫ জন গড়ে' উঠতে পারে। শুধু স্কুলের শিক্ষাই শিক্ষা নয়, এখান থেকে এমন শিক্ষা লাভ কর, যা' জীবনে কখনও ভুলবে না। মেধাকে বৃদ্ধি কর। মেধা কি—যা দিয়ে ভগবানের ভাব ধারণাগত করা যায়। যা ভগবানের নয় তা' অগ্রাহ্য করবে, যে বস্তু ভগবানের তাহাই গ্রহণ করবে; ভগবানের impression যত বাড়াবে মেধা ততই বাড়বে। কোন পাপ আশ্রয় দিও না, তোমাদের জীবনও আমি পবিত্র করে' তুলবো।

...আমি আজ শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করছি—তোমরা বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ কর, ভগবানের মানুষ হয়ে যে মিশন তোমরা গ্রহণ করেছ, তাহা পালনের যোগ্য অধিকারী হও।"

***

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ
পল্লীসংস্কার সমিতি

গত রবিবার "যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরে" "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ পল্লীসংস্কার সমিতি"র সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারাণচন্দ্র দত্ত গত বৎসরের যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন, তাহাতে জানা যায়,

ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বিস্তর বাধা বিঘ্ন ও যুবক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য ঠেলিয়া সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত পল্লীর উন্নতি সাধনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইলেও, কাজ এখনও অনেক বাকী। ইহার জন্য পল্লীর প্রাণের সহিত কর্ম্মিগণের প্রাণ আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহা সময়সাপেক্ষ ও তপস্যাসাপেক্ষ।

অতঃপর, শ্রীযুক্ত মতিবাবুর প্রস্তাবনায় আগামী বর্ষের জন্য নূতন কার্য্যকরী সমিতির গঠন করিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়

***

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের নূতন পল্লীকেন্দ্র

(সংবাদদাতার পত্র)

গোমদণ্ডী গ্রামে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ পল্লী-গঠন বিভাগের এক নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩রা জুন বুধবার দুর্গাপুরের জমিদার একনিষ্ঠ পল্লী-সাধক শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এই কেন্দ্র উদ্বোধনসভা সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী সঙ্ঘের পল্লীগঠনবিভাগের এক সুদীর্ঘ বিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীপাঠের পরে প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক কয়েকটী অবস্থা- ও সময়োপযোগী কবিতা আবৃত্তি হয়। তৎপরে এই নূতন কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা, সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চৌধুরী অবৈতনিক বিদ্যালয়গৃহ-নির্ম্মাণে পল্লীবাসীর আগ্রহ এবং আন্তরিক ও আর্থিক সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সমাজগঠনমূলক যে ব্যাপক কর্ম্ম সঙ্ঘ এখানে আরম্ভ করিতে চাহেন তাহাতে পল্লীবাসীর আরও ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সহজ সরল ভাষায় জগতের নানা দেশের পল্লীর শিক্ষা ও অর্থনীতির কথা বিবৃত করেন। সারা জীবন পল্লীসেবারত থাকিয়া তিনি যে সব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন সে সব কথাও তিনি কর্ম্মীদের কাছে ব্যক্ত করেন। তৎপর ছাত্রদের অভিনয়ান্তে সভাপতি ও সমাগত সভ্যদের ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ হয়।

৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রের নব-নির্ম্মিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। প্রথম দিনেই প্রায় ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিল। প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর। শীঘ্রই এখানে সঙ্ঘের নিজস্ব সমবায়নীতিতে পল্লীর রাস্তা-নির্ম্মাণ, পানীয় জল, মৎস্যচাষ প্রভৃতির আয়োজন করা হইতেছে।

***

প্রবর্ত্তক-চতুষ্পাঠী

গত বৎসরের সংস্কৃত পরীক্ষায়, "প্রবর্ত্তক-চতুষ্পাঠী" হইতে শ্রীমতী অমিয়বালা বসু ও শ্রীমতী অমিয়প্রসূন দত্ত "সামবেদে" আদ্য ও কুমারী রেণুবালা ঘোষ "মুগ্ধবোধে"র আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

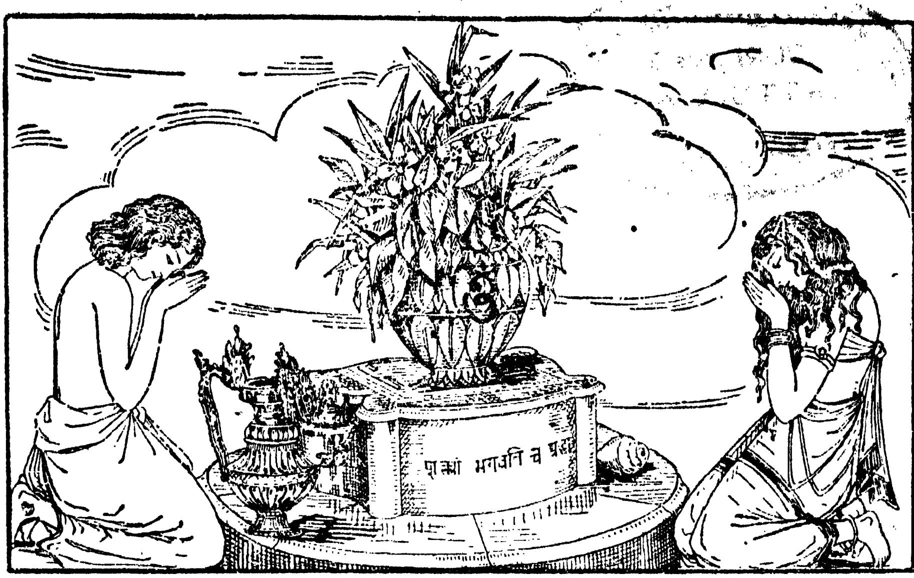


কালী

"ভ্রূকুটী কুটিলাৎ তস্যা ললাট ফলকাদ্ দ্রুতম্ ।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাঽসিপাশিনী ।
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ।
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তি মহাসুরান্ ।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

Prakash Press, Calcutta.



১৬শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

ভাদ্র,
১৩৩৮

রাষ্ট্রচক্র ও জাতিগঠন-যজ্ঞ

—:০:—

জাতি-গঠন-যজ্ঞ এবং রাষ্ট্রশক্তিলাভের আন্দোলন —এই দুইটী আমরা পৃথক্‌ভাবে দেখিতেছি। কোন কোন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান যেরূপ রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া অবাধ গতি ধরিয়া চলিতে চায়, জাতি-গঠননীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের; কেন না, জাতি বলিতে তাহার দেশ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও আছে—এই দুই বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া অথবা অস্বীকারে রাখিয়া কোনদিন জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। তথাকথিত পল্লীসংস্কারের কাজ, ধর্ম্মপ্রচার, সমাজসংস্কার চলিতে পারে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেশের এই দুর্দ্দিনে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের 'প্রাণ্' বলিয়া বস্তু নাই। টবের গাছের মত এইগুলি সৌন্দর্য্যের কারণ হইতে পারে, পরন্তু প্রাণের সাড়া এই সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা স্বরাজ্যহারা হতভাগ্য জাতি; দাসত্বের কঠিন নিগড়ে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ—সমস্তখানি জীবন দিয়া মুক্তির প্রচেষ্টাই আমাদের ধর্ম্ম—সে মুক্তি-প্রয়াস যে ভঙ্গী, যে আকারেই প্রকাশিত হউক, মূলতঃ মুক্তি ভিন্ন উহার দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকিবে না। আর এই মুক্তি আদৌ ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নহে, একটা জাতির সহিত অবিভাজ্যরূপে আমি সংজড়িত; কাজেই জাতির মুক্তি-ব্রতই আমার

ব্রত, আমার তপস্যা, সাধনা—সবই এই একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলেই প্রয়োগ করিতে হইবে।'

ভারতের রাষ্ট্রান্দোলনে আজ যাঁহারা অগ্রণী তাঁহারাই আজ জগদ্বরেণ্য পুরুষ; তাহার কারণ, জীবনের সার্ব্বাঙ্গীন সত্যটা আজ এই ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম্মজীবনের প্রজ্জ্বলিত আগুন কোথায় কে ঢাকা দিয়া রাখিতে পারে? ফুৎকার দিয়া যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়, সে কৃচ্ছ্র সাধ্য অগ্নির অস্তিত্ব মানুষের প্রাণে আগুন জ্বালে না; আপনাকে পৃথিবীর বুকে রক্ষা করিতেই যুগ যুগ অতিবাহিত হয়—প্রলয়সৃষ্টির সাধ্য সেখানে কোথা!

রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে মুক্তির পতাকা গগন জুড়িয়া উড়িয়াছে; দারিদ্র্য হইতে মুক্তি, নির্য্যাতন হইতে মুক্তি, পাপ ও আসক্তি হইতে মুক্তি। এই সকল আশায় জাতির প্রাণ ক্রমেই জাগিয়া উঠে, বন্ধনমুক্তির লক্ষণ-স্বরূপ স্বতঃই এইগুলি স্বপ্রকাশ হইবে। কোন্ হিমালয়ের গহ্বরে কোন্ সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবের মুক্তির তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জাতির মুক্তির মূলে কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তুর উপলব্ধি আর আমাদের উৎসাহ দেয় না, কৌতূহল সৃজন করে না; অনুমান যুক্তি প্রত্যক্ষ হইয়া যেখানে মূর্ত্ত, সেইখানেই মানুষ অন্বেষণ করিতে ছুটে সেই বীর্য্যকে, যাহা আশ্রয় করিলে ভারত সিদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, ভারতের জাতি মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে। আজ চতুর্ব্বর্গের সন্ধান মানুষ এই জাগ্রত কর্ম্মক্ষেত্রেই লাভ করিবে বলিয়া আশা পাইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যে ধর্ম্মক্ষেত্র, তাহা সপ্রমাণ হওয়ার শুভদিন উপস্থিত; তাই তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবন ভিত্তি করিয়া পাপের নানা মূর্ত্তি সর্ব্বজনগোচর হইয়া পড়ে। ন্যক্কারজনক ক্ষেত্র হইতে এই পাপই যে সাধু তপস্বীর মূর্ত্তিতে আমাদের অধঃপতনের দিকটাই আরও বড় করিয়া তুলিতে চায়, তাহা যেন ক্রমে মানুষ অবধারণ করিতে করিয়াছে। সাহিত্যে কাব্যে, জীবনের বিচিত্র কর্ম্মজীবনে, তীর্থে মন্দিরে, লোকালয়ের বাহিরে নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দরে, আশ্রমে, সাধুর আস্তানায় মহামায়ার চক্রান্ত যে লীলায়ত, তাহা এক নিমেষেই চক্ষে পড়ে। আজ নির্জ্জন কথাটার এই সত্য মর্ম্ম উপলব্ধি হয়, যে একজন ছাড়া অন্যে আসক্ত নয় সেই এই উত্তম স্থান লাভ করে। বায়ুহীন প্রদেশেও মানুষ একা নয়, সেখানেও পঞ্চভূতের উৎপাত সহ্য করিতে হয়। জাতির মুক্তিতপস্যায় ধর্ম্ম বিরাট্ মূর্ত্তিতে প্রকট; তাই মিথ্যা, তামস আর সত্য ও তপস্যার ছদ্মবেশে আমাদের ভুলায় না। আজ জাতির মুক্তি আশ্রয় করিয়া সত্য মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর; অন্ধকার চক্ষের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। এইজন্যই বলিয়াছি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন ব্যক্তির জীবন অতিক্রম করিয়া জাতির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তখন আমরা সত্যের উপলব্ধি করিতে একটা আকার পাই—উহা বস্তু হইয়া দেখা দেয়। ভারতের আজ এই সৌভাগ্য-যুগ কি আগত নয়!

যে কথা বলিতে চাই তাহার জন্যই মনের মাঝে যে বাণী গুমরিয়া উঠে, তাহা ব্যক্ত না করিলে সে কথা যেন প্রকাশ হয় না—তাই এই অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা।

তারপর কথা হইতেছে, ব্যক্তির মুক্তি অতিক্রম করিয়া জাতির মুক্তিপ্রয়াস তো ব্যর্থ হইতে পারে! এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু একবার অতীতের দিকে যদি দৃষ্টি ফিরাইয়া ধরি, তাহা হইলে দেখি—ভারত ব্যক্তিজীবনের বিশ্লেষণে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াছে, ব্যক্তির মুক্তিপথ

আবিষ্কার করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে এবং অধিক অবান্তর কথায় বক্তব্য অধিকতর অস্পষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহা সপ্রমাণ করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে বিরত হইলাম। মানবচরিত্রের অতি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিকের বস্তু বিশ্লেষণের ন্যায় আত্মতত্ত্বের যে কি গভীর আলোচনা ভারত করিয়াছে, তাহা প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের যে অল্পমাত্র আস্বাদ পাইয়াছে, সে বুঝিবে। পরাধীন জাতি স্ব-জাতির শিক্ষায় সাধনায় বঞ্চিত; তাহাদের আজ ভাষায় বুঝাইতে পারিব না, ব্যষ্টি-মানুষের মুক্তিকামনা চরিতার্থ করার জন্য ভারতের প্রাচীন পুরুষেরা কি প্রশস্ত রাজপথ না প্রস্তুত করিয়াছেন! অধিকারী এবং প্রকৃত অভিলাষী হইলে আমরা অসংশয়ে অনায়াসে এ ভব-বন্ধন মুক্তির সন্ধান পাইব। কিন্তু এই ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি মায়াকে অতিক্রম করে না—এই হেতু জীবন্মুক্তির সন্ধান পাইয়াও আজ আমাদের দুর্গতির অবধি নাই। ভগবানের এই কষাঘাত আমাদের জীবনগতি আরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; তাই আজ জাতির অগ্রপুরোহিতবৃন্দ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও আত্মমুক্তির দায়ে ইহবিমুখ নহেন, একটা জাতিকে বন্ধন-মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প।

এই কথার উপরও প্রশ্ন হইতে পারে—ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তিপ্রয়াস যেরূপ মায়াকে অতিক্রম করে না, জাতিগত মুক্তির প্রেরণায় এই মায়ার প্রভাব যুক্তিমত কথঞ্চিৎ ক্ষীণকায়া হইলেও, ইহাও তো মায়ার অধীন, একথা স্বীকার করিতে হয়। আমরা এই যুক্তিযুক্ত কথা অস্বীকার করি না; কেননা জাতির মুক্তিই সবখানি নয়, মানবজাতির মুক্তি ও সিদ্ধির উপর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সর্ব্বসাফল্যময় হইবে, এবং ইহাই সৃষ্টির মূলে ভগবানের অব্যর্থ বিধান—সেই বিধানই বিশ্বজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ একই কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভারতই সর্ব্ব প্রথমে এই ভাগবত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াছে; এইজন্যই আজ ভাগবত সঙ্কেতেই সে এই পথে চির অগ্রণী হইবে।

ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনায় সিদ্ধ ভারত আজ জাতিগত মুক্তিব্রতে দীক্ষা লইয়াছে। অতীতের কর্ম্মচক্র এখনও আপনার তালেই পূর্ব্ব পথেই অনুবর্ত্তন করে—ইহা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু নিষ্পন্দচিত্ত মানুষের কাণে ভগবানের ডাক আসিয়া পৌছিয়াছে; তাহাদের অভিনব পথে যাত্রা করিতে হইবে। প্রাচীন রীতিনীতি প্রথার উপর যে বিরাগ বিদ্বেষ কদাকার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, তাহা অশুদ্ধি হেতু; পরন্তু ভারতের সনাতন জাতিকে আজ পথের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ জাতি ব্যক্তিজীবনের চরম আদর্শ মোক্ষের উদ্দেশ্যে যে নিয়ম ও বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, জাতির মুক্তির জন্য তাহার প্রয়োজনমত বর্জ্জন ও সংস্কার এবং নূতন নিয়ম ও শৃঙ্খলা গড়িয়া লইবে; তাই আমূল বিপ্লব বাধিয়াছে। স্বভাবের বশে কর্ম্মচক্র গতানুগতিক ধারায় এখনও আবর্ত্তিত; তাই প্রাচীনকে যাঁহারা জীবনপণে ধরিয়া আছেন তাঁহারা আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এখনও স্থান পাইতেছেন। যেদিন ভারতের কর্ম্মচক্র একেবারে নূতন পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে, সেদিন নূতনকে বরণ করায় অসমর্থ প্রাণ কালবশেই বিদীর্ণ হইবে, নিশ্চিহ্ন হইবে—অতীতের ইতিহাস ইহার প্রমাণ-স্বরূপ সাক্ষ্য দেয়।

আজ ভারতের সাধনা জাতির মুক্তি-লক্ষ্যে প্রবর্ত্তিত। ব্যষ্টিজীবনের শক্তি, ঐশ্বর্য্য, অধ্যাত্মবল, ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে; কিন্তু তাহার জাতিগত তপস্যা যে দিন হইতে আরম্ভ

হইয়াছে, অতীতের ক্ষেত্র হইতে তাহাদের ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে হইয়াছে, এবং আজ মাথা রাখিবার ঠাঁইটুকুও নাই, মাটীর উপর ভর দিয়া যে দাঁড়াইবে, তাহাও বুঝি শেষ হয়! এই প্রলয়-সঙ্কটে চতুর্দ্দিকে যে অভাবনীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, ইহা অবধারিত। মানুষ যেন বাধ্য হইয়াই চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে; চতুর্দ্দিক্ হইতে যত ধ্বনি আসিয়া তাহার কর্ণ স্পর্শ করে, তাহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া সে কলরব করে। চতুর্দ্দিকের কর্ম্মপ্রভাবও তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ব্যক্তির মত জাতিরও যে একটা নিজস্ব জীবন-ধারা আছে, তাহা আজ ধরিবার সুবিধা নাই। আমাদের এই কথাগুলিও আজ কত লোকের নিকট যে দুর্ব্বোধ্য মনে হইবে, তাহা বুঝার সঙ্গে আমরা যে সত্য অবস্থার কথাই ব্যক্ত করিতেছি, এইরূপ বোধও থাকিয়া যাইতেছে—এইরূপ সর্ব্বত্র; কাজেই এখন কেবল কলরব, চীৎকার, কর্ম্মক্ষেত্রে উৎকট বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য অবস্থা আসিতেই পারে না। কিন্তু সব স্থির হইয়া সত্যই স্থায়ী হইবে। অসংখ্য মিথ্যার মাঝে সত্যের সুর ঝঙ্কৃত হইলেও, তাহাও আজ মিথ্যা বলিয়া গ্রাহ্যের বিষয় হইবে না; কিন্তু অনন্ত তৈলধারা যে জলন্ত প্রদীপের বুকে ঝরিয়া পড়ে, দীপালীর কোটী প্রদীপ নিভিবার পর সে সনাতন আলোর সন্ধান জাতি পাইবে। আজ অসংখ্য কোটী বাণীর ভিতর সত্যের সাড়া একটী ক্ষীণ ধ্বনির মতই অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকুক, যদি সব রেশ শেষ হইলে এ বাণী অমর হয়, তখন ইহার অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব।

ভারতের শক্তি সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধজাতি নির্ম্মাণে উদ্যত—ইহা ব্যর্থ হইবে না। আজ বিশ্বজাতির ধূয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন, বর্ত্তমানে তাহার মূল্য একটী কাণাকড়িও নহে। হিন্দুজাতিকে আত্মপ্রকাশ দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে—প্রতি স্তর বস্তুতন্ত্র-রূপে না গড়িয়া ভবিষ্যৎকে রূপ দেওয়ার তাহার অধিকার নাই। আমাদের আজ এই জাতির মুক্তি-ব্রত ভিন্ন অন্য গতি নাই—ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অতীতের আবর্ত্তে পড়িয়া থাকিলেও যেমন কাহারও পরিত্রাণ নাই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আশ্রয় করিয়াও কেহ নিরাপদ্ থাকিবে না; বর্ত্তমান আজ সবখানি সত্য লইয়া জাতিকে সার্থক করিবে।

তাই আজ রাষ্ট্রই জগদ্বরেণ্য ক্ষেত্র। হিমালয়ের ঋষিমণ্ডলীও মহাত্মাকে তাই যোগীশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। কথাটা বেফাঁস বলিতেছি না; তিব্বতপ্রত্যাগত একজন ইংরাজ সাধু জর্জ লিক্ এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন সার্থক করার উদ্দেশ্যে স্বর্গের অনুরূপ মর্ত্ত্যের বুকেও সপ্তর্ষিমণ্ডলী আছে; তাঁহারা মহাত্মার পন্থাই এই ভবিষ্য কৃতযুগের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে—জাতিকে সিদ্ধ করার, জাতির প্রাণে সত্যের অমৃতসিঞ্চনের ব্যবস্থাই হইতেছে এ যুগের ধর্ম্ম। ভারতের রাষ্ট্র সে ধর্ম্মক্ষেত্র সৃজন করিয়াছে; মহাত্মা এই কুরুক্ষেত্রের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—জগতের দৃষ্টি এই দিকে স্বতঃ প্রসারিত হওয়া বিচিত্র কথা নহে।

এইবার আমাদের বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিব। জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য রাষ্ট্র-শক্তির অপেক্ষা গঠনশক্তির সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনের কথা মহাত্মাই স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্র-শক্তি হাতে থাকিলেই জাতিকে যুগোপযোগী গড়িয়া তোলা যাইবে, এমন কোন কথা নাই। আইনের বশে মানুষের স্বভাব বদ্‌লায় না; শিক্ষায় সাধনায় মানুষ চরিত্রের রূপান্তর সাধন করে। এই শিক্ষা ও

সাধনার নিয়ম যদি রাজবিধান হয়, তবে ইহা অনায়াসসাধ্য হইবে, এমন যুক্তিও সমীচিন নহে; কেননা বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রপতি গণমতের অনুবর্ত্তী; জনগণের চরিত্র যেরূপ হইবে, রাষ্ট্র বিধান তদনুরূপ হইবে—অতএব গণচরিত্র যদি অসমম্পূর্ণ হয়, গুণ ও ধর্ম্মের বৈচিত্র্যে বিকৃত ও স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা সাধনার বিচিত্র বিধান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে; মানুষের সত্তা তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না। ইংরাজের শিক্ষা যেমন কালবশে প্রতিক্রিয়ামূলক হইয়া জাতিকে অতিষ্ঠ করিয়াছে, ইহাও যথাসময়ে ততোধিক অসন্তোষের কারণ হইবে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ন্যায়, জাতি-স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতির নিয়ম। স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব যদি চিরস্থায়ী হয় অথবা সাময়িক হয়, তবে তদনুসারে তাহার স্থান ও কাল নিরূপিত হইবে। এক্ষণে ভারতে যে জাতি রাষ্ট্র-মুক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ, তাহার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি সত্য হয়—সাময়িক অথবা নিত্য স্থায়ীরূপে; তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্র-শক্তি মিশ্রগুণযুক্ত হইবে। যতই সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া ইহা ভারতের উপর প্রবর্ত্তিত হউক, মিশ্র শক্তি সত্তার অভাব কখন পূর্ণরূপে পূরণ করিবে না। অভাবে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ক্রমে ইহা বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ রূপে যে দেখা দিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদিও প্রকৃতি এই নিয়মেই অসংখ্য ভেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করিতে ছুটিয়াছেন; কিন্তু এই গতির একটী তাল ও ছন্দ আছে। স্বগত ও স্বজাতি ভেদ আমরা মানিয়া লইতে শিখিয়াছি। এই ভেদের মধ্যে সমবেতভাবে চলার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বিজাতীয় ভেদ লইয়া বস্তুতঃ এক পা অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের সহিত মানুষের এখন যে বিজাতীয় পার্থক্য জ্ঞান, ইহা তিরোহিত হওয়ার উপায়স্বরূপ ভারতে এইরূপ একটী জাতির অভ্যুত্থান যদি ভাগবত বিধান হয়, সে ক্ষেত্রে কোন কথা নাই। ভারত এখন সেই পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে—যদি তাহাই হয়, তবুও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য দিক্‌টাও দেখিয়া চলিতে হইবে।

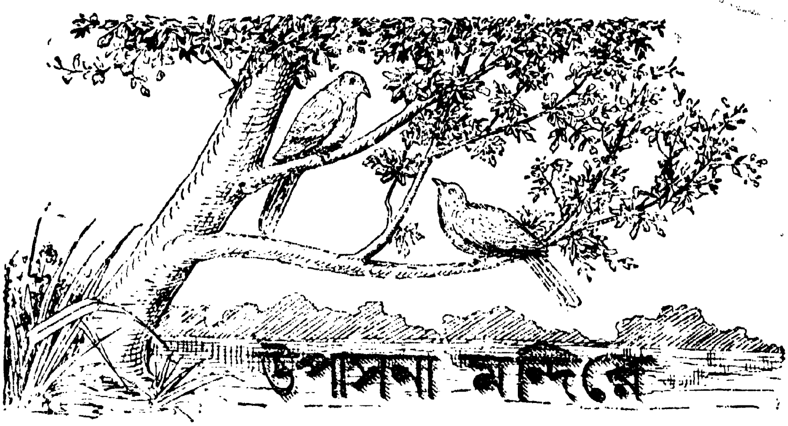
রাষ্ট্র-শক্তি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা হয় কংগ্রেসের উপায় শ্রেয়ঃ করিব, নতুবা জগতের ইতিহাসে স্বাধীনতালাভের যে চির পথ আছে, সেই বিপ্লবকে বরণ করিয়া লইব। কংগ্রেসের শক্তি—বিদেশীর রাষ্ট্রতন্ত্রকে অসহযোগ অস্ত্রে নাকাল করা। অন্যদিকে বিপ্লবীর বজ্র একান্ত উপেক্ষার নহে—এইজন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সর্ত্ত করিয়া বর্ত্তমান রাজশক্তি বিরোধের চেয়ে সদ্ভাব-রক্ষায় স্বভাবতঃই যত্নবান্ হইবে। এই সুবিধার ফলেই কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ কতকটা রাষ্ট্র-শক্তি নিজেদের হাতে লইয়া জাতিকে শনৈঃ শনৈঃ মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে দিতে কৃতসঙ্কল্প। হিংসার অস্ত্রে যে রক্ত ধরিত্রীর বুক কলঙ্কিত করে, তার একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে; ইতিহাসের নজির তুলিয়া তাহা বোধহয় সপ্রমাণ করার প্রয়োজন হইবে না। এইজন্য ভারতের চরিত্রে অসাধারণ সহিষ্ণুতা থাকায়, কংগ্রেসের পথ অধিকাংশ লোক বরণ করিয়া লইবে; কিন্তু এই পথে রাষ্ট্র-শক্তি অধিকার করায় ভারতের মিশ্রজাতিকে তাহার অংশ দিতে হইবে। ফলে, রাষ্ট্র-শক্তি কোন বিশেষ স্বতন্ত্র জাতির হস্তে নিয়মিত হইবে না। পক্ষান্তরে শাসনতন্ত্রে যাহারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে; অতএব স্বতন্ত্র জাতির দাবী কারণে অকারণে যতদিন জাতি-স্বাতন্ত্র্য ততদিন রাষ্ট্র-শক্তিকে স্থির হইতে দিবে না। ইহা বুঝিয়াই মহাত্মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন —জাতি-গঠন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন; রাষ্ট্র-শক্তি তাহার উপর ভর করিয়াই দাঁড়াইতে পারে।

অন্যদিকে, বিপ্লবীর প্রচেষ্টাও নগণ্য নহে। বিপ্লব ততদিন আত্মঘাতী হওয়ার পথে, যতদিন তাহা কৃতকার্য্য না হয়। যেদিন বিপ্লবের সাফল্য, সেদিন তাহা আর নিন্দার্হ নহে, জয়ের উৎসাহে তাহার মহিমা জগৎ ছাইয়া কীর্ত্তিত হয়। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। কিন্তু মূলে গঠনের সুযোগ ইহার মধ্যে আদৌ না থাকায় বিপ্লবের দ্বারা এক প্রকার শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়, শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পরিবর্ত্তন ব্যতীত মানুষের ভাগ্যচক্রে অধিক সুযোগ দেখা যায় না; অন্য-পক্ষের হাতে প্রায় পূর্ব্ববৎ শাসনদণ্ড পরিচালিত

হইতে থাকে, জাতির যে পরম শ্রেয়ঃ তাহা আয়ত্তে আসে না। রুশে এই নীতির বিপরীত ঘটনার আভাস পাওয়া যাইতেছে; ইহা সিদ্ধ হইলে জাতির স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় নূতন কথায় সংযোজিত হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত সকল জাতিই হাঁপ ছাড়িতেছে। বিপ্লবের পরে এইহেতু রুশ যে সুযোগ পাইল, তাহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে; তবুও পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক, গঠনের একটা যুগ জাতিকে গ্রহণ করিতে হয়। বিপ্লবের পর চতুর্দ্দিকে হিংসাপ্রতিহিংসার ঘাতপ্রতিঘাতে জাতি আর আত্মগঠনের সুযোগ পায় না। বিজয়ীদল রাষ্ট্রতন্ত্র হাতে লইয়া বিরুদ্ধপক্ষকে দমন করিতেই ব্যস্ত থাকে; পরে শাসনদণ্ডই আবার জাতির নিয়ামক হয়—মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার যে সাধনা, তাহা প্রবর্ত্তন করা ঘটিয়া উঠে না।

বিপ্লবীর পক্ষে গঠননীতি সঙ্গে লইয়া চলা সম্ভব নয়। কংগ্রেস যুগপৎ তাহা সিদ্ধ করিয়া চলিতে পারে; এইরূপ যুক্তি হয় তো একেবারে অসঙ্গত নাও হইতে পারে; কংগ্রেস রাষ্ট্রশক্তিলাভের আদর্শ সম্মুখে রাখায়, উহার তাগিদ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে রাষ্ট্রশক্তির আদায়ের সুযোগ সে ছাড়িতে পারে না। সুযোগান্বেষী মনোবৃত্তি সবখানি দেখিতে পায় না, দেখাও চলে না; এইজন্য আত্মবৈশিষ্ট্য বলিয়া বস্তুর গৌরববোধ এইক্ষেত্রে তিরোহিত হয়। হয় তো ধীরে ধীরে এইভাবে রাষ্ট্রশক্তিলাভ করিয়া কোন দেশ ধনে, সম্পদে, প্রাচুর্য্যে বড় হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু মানুষ তো বাহিরের সামগ্রী বহিতে জন্মে নাই, সে অন্তরের দিক হইতে বাড়িয়া উঠিতে চায়, অন্তরের ঐশ্বর্য্য দিয়া জগৎ ভরাইয়া তুলিতে চায়। সে ধরণীর বক্ষ নিঙড়াইয়া যে অমৃত আবিষ্কার করিতে আসিয়াছে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে চাহে না। রোমরাজ্যের মত ভার বহিয়া দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকার উপায় ইহার মধ্যে নাই, বরং বিশ্বকে ধূলাচ্ছন্ন করিয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা এই ক্ষেত্রে অধিক। ভারতের প্রাণ তাই সে পথে উদ্বুদ্ধ নয়; বাহিরের প্রভাব যতই তাহাকে চঞ্চল করুক, আসলে সে প্রাণ বিদ্যুৎ-শক্তির স্পর্শ ইহাতে অনুভব করে না।

এইজন্য আর এক তৃতীয়-পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে; রাষ্ট্র ও জাতিসাধনা তাই পৃথকরূপেই দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস যদি যুক্তিজালে ইংলণ্ডের রাজশক্তিকে পরাভূত করিতে না পারে, তাহাকে হয় স্বাধীনতার জন্য গতানুগতিক পথকেই প্রশ্রয় দিতে হইবে, নতুবা জাতিসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্তিলাভের দিকে যদি অধিক ঝোঁক থাকে, তাহা হইলে কংগ্রেস পরিপূর্ণভাবে গঠন-কার্য্যে সফলকাম হইবে না। ঘটনার পর ঘটনা সৃজন করিতে না পারিলে রাষ্ট্রসাধনায় উত্তেজনা রক্ষা হয় না; উত্তেজনার প্রবল বন্যায় সৃষ্টির বনিয়াদ স্থায়ী হয় না। আর যদি গঠনের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রশক্তিলাভের পথেই কংগ্রেস অগ্রসর হয়, তাহা হইলে উহার রাষ্ট্রচক্র বলিয়া যে খ্যাতি, তাহা লোপ পাইবে। ভারতের গঠন-নীতি ব্যাপক মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে; কিন্তু তাহা হইলেও দেশে প্রবল রাষ্ট্রসংহতি লোপ পাইবে না, অন্যত্র বিরাট্ রাষ্ট্রচক্র গড়িয়া উঠিবে। সাগর-সঙ্গমে নদীর ন্যায় প্রকৃতি সহস্র ধারায় মানুষের অভীষ্টসিদ্ধ করার পথ খুলিয়া দেয়। রাষ্ট্র ও জাতি —এই উভয় সাধনা কখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে, কখন বা সম্মিলিত যাত্রায় ভারতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। আমরা এই জাতি-সাধনার কথাই আগামী সংখ্যায় বিবৃত করিব।



আমাদের প্রমাণ কর্‌তে হবে—ধর্ম্মজীবন জগতের সর্ব্বজাতির উপরে—অপরাজেয়, বলে-বীর্য্যে-ঐশ্বর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যদি তা' না হয়, তবে পরাজয়ের জন্য ধর্ম্মকে মানুষ কি কারণ বরণ করে' নেবে? ধর্ম্ম আমাদের আয়ুঃ, যশঃ ও সম্পদ্‌ দিবে, ধর্ম্ম আমাদের সংহতি, জাতি ও সাম্রাজ্য দিবে, ধর্ম্মপ্রাণ মৃত্যু জয় কর্‌বে—এই ধর্ম্ম যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই ইহার অমর বীর্য্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হবে।

ধর্ম্ম দুষ্প্রাপ্য বা দুঃসাধ্য বোধে ইহা বর্জ্জনীয় নয়। জীবের পক্ষে ধর্ম্মলাভ সর্ব্বশ্রেয়ঃ। ধনসম্পদ্‌, জগতের ঐশ্বর্য্য গৌণ; মুখ্য ধর্ম্ম-বস্তু। এই হেতু আজ একটা সর্ব্বহারা জাতি এই দুর্ল্লভবস্তু লাভে যত্নবান্‌, উদ্যত। আমরা সেই জাতিরই রূপ। আমাদের তাই জীবন দিয়ে প্রমাণ কর্‌তে হবে—ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করে' কেমন করে' একটা জাতি সর্ব্বজয়ী হয়। প্রাচীন, অতীত—যা কিছু অনুসরণ করে' আমরা ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, নির্ব্বীর্য্য হয়েছি, ধর্ম্ম বলে' আমরা তা' বরণ কর্‌ব না। ধর্ম্ম—ঈশ্বর-চেতনা সতত জাগ্রত রাখা, এই অনির্ব্বাণ আগুনের মধ্যে নিয়ত বাস করা। এই আয়োজন এখানে হয়েছে।

ইহাতে অবহেলা যেখানে সেখানে ধর্ম্ম-বিরোধী ভাব আছে। তাই সতর্ক হও। প্রবর্ত্তিত আচার উপেক্ষা করিও না। যথানিয়মে নীতির অনুসরণ করে' জীবন উদ্যত কর। আমাদের এই জীবন-সমষ্টি আশ্রয় করে' ভারতের সনাতন মূর্ত্ত হ'তে চায়। এই গুরু দায়িত্ব ভগবান স্বয়ং বহন করবেন। তুমি কেবল সরল নিষ্কলুষ চিত্তে তাঁর অনুশাসন পালন কর। মহাসিদ্ধি আমাদের সম্মুখে।

* * * *

পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি জাগুক। অবকাশহীন জীবনের কথা মূর্ত্ত হোক। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম—যাহা যজ্ঞ, যাহা ভগবানের আরাধনা, তাহা যদি অনাহত হয়, আপত্তি কি ?

যত বাধা, যত সমস্যা, বিচার করে', চিন্তা করে' দূর হবে না, মীমাংসা পাওয়া যাবে না—কেবল হবে বিশ্লেষণ। বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীকে অতিক্রম করা যায় না, শক্তি দিয়ে উল্লঙ্ঘন সম্ভব। তাই আজ মহাশক্তির উদ্বোধন চাই। উঠে দাঁড়াও। নুব্জ মেরুদণ্ড সোজা কর। বিস্ফারিত বক্ষে সম্মুখে এগিয়ে চল। কোনও অন্তরায় তোমার নাই। লক্ষ্য আমাদের সিদ্ধ হবেই।

আগামী দ্বাদশবর্ষ আমাদের ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, অভাব নাই, ক্লান্তি নাই; কারও সঙ্গে বিবাদ নাই, কোথাও ব্যথা নাই, সমস্যা নাই, বিঘ্ন নাই—আছে অবিরাম জীবনের আহুতি। উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি কর। গগন পবন মুখরিত হোক। আর আপূর্য্যমান প্রাণের ঝরণায় পৃথিবীর বুক প্লাবিত হোক। ইহাই আনন্দ, ইহাই জীবনের চরম সার্থকতা।

সে প্রাণ, সে মহাজীবনের উৎস—ভগবান। যে প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করে, সতত ভাগবত চৈতন্যে অবস্থান করে, সে যদি অনন্তের সন্ধান না পায়, তবে এই সব মিথ্যার প্রয়োজন কি ? হে মন্ত্র-সিদ্ধ জাতি, হে বিশ্বাসীর সঙ্ঘ, তোমাদের জীবন-যজ্ঞ কি কারণ ব্যর্থ হবে ? কি কারণ অন্যের মত সহজ ও সাধারণ হবে ? অসাধারণ প্রাণ উদ্বুদ্ধ কর। উঠে দাঁড়াও—আমাদের মহাযাত্রা কোনও কারণে নিষ্ফল হবে না।

* *
*

জাতি-প্রতিষ্ঠা

—:০:—

ভারতের মুক্তি সম্ভব, এ বিশ্বাস যেমন করিয়াই হউক, অনেকেরই বুকে জাগিয়াছে। এ মুক্তি রাষ্ট্রীয় মুক্তি—অর্থাৎ ব্যবহারিক আত্মশাসনের কর্তৃত্ব। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতে এ আশা ও আকাঙ্ক্ষার জাগরণ অকালে ও অকারণে ঘটে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মুক্তির অধিকারী যে জাতি, সে জাতির দিকে সমুচিত দৃষ্টিপাত এখনও বড় একটা করি নাই। ইহার কারণ, ইহা অন্তর্দৃষ্টি; বর্ত্তমান যুগের বহির্মুখী শিক্ষা দীক্ষায় গঠিত আমাদের পক্ষে সে দৃষ্টি সুলভ ও সহজ নয়। ইহার অন্য কারণ—জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি আজ যেমন প্রবল, যেমন বীভৎস ও উৎকট মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানে উহা দেখা দিয়াছে, তেমন প্রবল, বীভৎস ও উৎকট হইয়া ইতিপূর্ব্বে উহা দেখা দেয় নাই। এই ভেদবুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে স্বার্থমূলক নহে, পরন্তু পরকীয় অর্থাৎ তৃতীয়পক্ষেরই স্বার্থপোষক। পরস্পরের বুকে শেল হানিয়া শত্রুপক্ষের আনন্দ-বর্দ্ধন একদিকে, অন্যদিকে মুক্তিস্পৃহা—মনোবৃত্তির বিপরীত আকর্ষণে আমরা বিপর্য্যস্ত। "এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে" বাঁধিয়া অখণ্ড জাতিগঠনের কল্পনা এখনও স্বপ্ন মাত্র; সাধনার সিদ্ধি এখনও বহুদূরে।

* * *

কিন্তু এইখানেই সমস্যা। যাঁহারা রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এই সমস্যার মীমাংসায় কৃতসঙ্কল্প ও সেই বিশ্বাস লইয়াই নির্ভীকহৃদয়ে আগাইয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণপণ উদ্যম সর্ব্বথা অভিনন্দনীয়। আমরা গোড়ার দিক্ দিয়াই বিষয়টা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, যদি দুর্ব্বলতার বীজ অন্তরে রাখিয়া আমরা মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া থাকি? এই গোড়ায় গলদ থাকিতে, আমাদের মুক্তিলাভও অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়—কল্যাণ তো দূরের কথা। স্বরাজ্যলক্ষ্মী দুর্ব্বলের অঙ্কশায়িনী কখনও হন না।

* * *

পরাধীন জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা—ভেদের সমস্যা। এই ধারণাই সচরাচর বদ্ধমূল; তাই বিভিন্ন উপাদানরাজির মধ্যে মিলন ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার এত প্রয়াস। কিন্তু ধারণাটী কি সর্ব্বতোভাবে সত্য? আমাদের মনে হয়—ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভেদ পরাধীনতার লক্ষণ, কিন্তু লক্ষণ মাত্রেই কারণ নয়। তাই ভেদের মধ্যে মিলন-স্থাপনের প্রয়াস স্বাভাবিক হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনানুরূপ সফল হয় না। চিকিৎসা যখন নিদান ধরিয়া হয় না, তখন হঠাৎ কোথাও যদি আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তাহা বিস্ময়েরই কারণ হয়; তাহা ধরিয়া নূতন আবিষ্কারের চিন্তাসূত্র মিলিতে পারে, কিন্তু ব্যাধির প্রতিকার উহারই উপর নির্ভর করা যায় না। যে জাতি পরাধীন হয়, সে জাতি বিজেতার সহিত শক্তিপরীক্ষায় হীনতর বলিয়াই পরাধীন হয়। এই শক্তিহীনতাই কারণ। যেখানে শক্তির অধিক মাত্রায় প্রকাশ, জয়ের লক্ষণ সেইখানেই ফুটিয়া উঠে। কোন উপাদানে কত শক্তি নিহিত,

তাহা উপাদানেরই ধাতু ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে। একটী ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করিয়াও যেমন অগ্নিশিখা দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে, সমস্ত খাণ্ডববনের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সেখানে দাহন-ক্রিয়া নিবারণে সমর্থ হয় না, তেমনি ইতিহাসে এক জাতির উপর আর এক জাতির আধিপত্য-সূচনাও অনেক সময়ে এইরূপেই ঘটিয়াছে দেখা যায়। বাবর আসিয়া যেদিন হিন্দুস্থান অধিকার করিলেন, সেদিন সমস্ত হিন্দুস্থানের সমষ্টি-বীর্য্য ও প্রতিরোধ-ক্ষমতার তুলনায় তিনি তৃণখণ্ড মাত্র। কিন্তু এই তৃণখণ্ড অবলম্বন করিয়াই যে জ্বালাময়ী বহ্নিশিখা উড়িয়া আসিয়াছিল, তাহা সমস্ত ভারতের বীর-জাতির স্বাধীনতা-রক্ষার প্রয়াস নিষ্ফল করিল—হিন্দুস্থানের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চিতাশয্যা রচনা করিল। এই তৃণখণ্ডই ভয়ের জিনিষ, যদি দাহ্য রূপে আমরা যে কোনও কারণে প্রস্তুত হইয়া থাকি। ভারতের হিন্দু-বীর্য্য বহু দীর্ঘ শতাব্দীর ভোগাবসানে এমনই একটা অবসন্ন মুহূর্ত্তে কাল যাপন করিতেছিল, যাহা যে কোনও পর-জাতির আক্রমণের সুযোগ ও আবহাওয়া সকল দিক্ দিয়াই উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাই দাহ্য অবস্থা। আর এই অবস্থার আহ্বানে সাড়া দিতে যে কোনও আসন্ন বা দূরবর্ত্তী উপকরণই যথেষ্ট। গজনীর মামুদ কিম্বা বাবর অথবা লর্ড ক্লাইব ও ওয়ারেন হেষ্টিংস্—ইহারা তৃণখণ্ডই, কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট অগ্নিশিখা রূপে যখন যে ভাবে প্রয়োজন সহজেই ব্যবহৃত হইয়াছে ও প্রায় অবলীলাক্রমে উদ্দেশ্যসাধনে সফলকাম হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কেন না, যেটুকু প্রতিরোধ ও বাধা, তাহা যতই পরিমাণে ও অনুমানে দুরতিক্রম্য বলিয়া তখন প্রতীয়মান হউক, বিরুদ্ধ প্রাণশক্তির তুলনায় তাহাদের সংবেগ (momentum) ও অন্তর্বীর্য্য (morale) যে তৈলহীন দীপশিখার ন্যায় নির্ব্বাণের পর্য্যায়ে ক্রমশঃ উপনীত হইতেছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই অস্তমান শক্তির সহিত উদীয়মান শক্তির দ্বন্দ্বপরীক্ষায় উদীয়মান শক্তিরই জয় হইবে, ইহা অবধারিত। ইতিহাসে ঘটিয়াছেও তাই। ভারতের কুরুক্ষেত্র—পানিপত অথবা পলাশী, যেখানেই যখন ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকুক, প্রকৃতির বিধানে এই অবসাদের যুগেই জয়লক্ষ্মীর অঙ্ক-পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। চঞ্চলা কমলাকে সুস্থির করিয়া বাঁধিবার যে সাধনা তাহা যে পক্ষে যখন যে ভাবে দেখা দিয়াছে, তখন সে ভাবে সেই পক্ষেরই আশ্রয়-গ্রহণে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। এই ঐতিহাসিক শিক্ষা বড় নির্ম্মম হইলেও, আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে ; নহিলে লক্ষণকেই নিদান বলিয়া যদি আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া অনর্থক উহারই প্রতীকারে সময়, সাধনা ও আত্মদানের ব্যর্থ অপচয় করি, তবে তাহা দিয়া তো গন্তব্য লক্ষ্যে উপনীত হইব না, পরন্তু ব্যর্থ ধনাগমের পরিকল্পনায় অব্যবসায়ীর মত ক্রমাগত মূলধন-ক্ষয়ে যেমন পরিশেষে কোটী-পতিকেও পথের ভিখারী সাজিতে হয়, তেমনি আমরাও শক্তিহারা হইয়া একেবারেই সর্ব্বস্বান্ত হইব, বাঁচিয়া উঠিবার ও বিপন্মুক্ত হইবার এখনও যেটুকু সুযোগ ও সম্ভাবনা তাহাও আর পাইব কি না কে জানে !

* * *

নিদান—শক্তির অভাব। এই শক্তি এক বা বহু আধারে প্রকাশ পায়। তখন আর সকল শক্তি ও অবস্থার সমবায় বাধা ও প্রতিকূলতার ছলেও সেই নির্ব্বাচিত শক্তিরই ক্রমশঃ অনুগামী হইয়া পড়ে। কারণ, শক্তিই মন ও অবস্থাকে অনুকূল এবং প্রস্তুত করিয়া লয়। শক্তি-প্রয়োগেই

শক্তিবৃদ্ধি—বিরুদ্ধতার বিষদাঁত ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায়। শেষে ধূমান্বিত বহ্নির মত যেটুকু আবেগ ও উচ্ছ্বাস তখনও জমিয়া থাকে, তাহা কালাকালে দুই একবার বিস্ফোরণের আকারে ফুটিয়া বাহির হইলেও, বুঝিতে হইবে—সে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ বিজেতার ক্ষতিকর না হইয়া প্রয়োজনেরই সাধক হয়। কেন না, এরূপ বিস্ফোরণের মুক্তি-দ্বার (Safety-valve) দিয়াই অবশেষ বাধাশক্তির নিঃশেষে তেজোহরণ হইয়া যায়। তাই বিদ্রোহের অবসানে, দমনকারীর শিথিল মুষ্টিই আরও দৃঢ়তর হয়, অস্থির ইতস্ততঃ-ভাব দূর হইয়া গিয়া চিরদিনের জন্য আধিপত্যের কায়েমী সুব্যবস্থারই বন্দোবস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সিপাহী-বিদ্রোহের পর, এইরূপই বণিগ্ রাজ ঘুচিয়া কায়েমী রাণীর সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। ইহাতে বিজেতারই সুযোগ সুবিধা বাড়ে, বিজিতের শক্তিহরণে তাহার পরাধীনতার আয়ুঃ আরও উগ্রতর লাঞ্ছনার ভাগ্যলিপি ললাটে আঁকিয়া মৃত্যু অথবা চির পরাজয়ের কোলে আত্মলয়ের জন্যই প্রসারিত হয়। এমন কত বিজিত জাতি শেষে বিজেতার চরণে স্বীয় আত্মবৈশিষ্ট্য চিরতরে লয় করিয়া তাহার সহিত মিশিয়া তাহারই রক্তপুষ্টি করিয়াছে, এ দৃষ্টান্তেরও ইতিহাসে অভাব নাই। এক সভ্যতার লোপে অপর সভ্যতার অভ্যুদয় এমনই করিয়া অনেক সময়ে সম্ভবপর হইয়া থাকে।

* * *

জাতির প্রতিষ্ঠা—অর্থে, শক্তিরই প্রতিষ্ঠা। হিন্দুস্থানে যেদিন হিন্দুই অধিকারী ছিল, সেদিন-কার শক্তি-সমস্যা ভেদেরই সমস্যা। অখণ্ড জাতি অন্তর্ভেদেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা কিম্বা ইংরাজ-ঘটিত সমস্যা —ইহার কোনটাই তো ভেদের সমস্যা বলিয়া মনে হয় না। ভেদ তো স্বাভাবিক; বরং এখানে মিলনের প্রয়াসটাই সমধিক অস্বাভাবিক মনে হয়। প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ হিন্দু-যবনে মিলনের প্রচেষ্টা যে কখনও হয় নাই তাহা নহে। পরাজিত গ্রীকরাজ সেলুকাসের কন্যাকে পরিণয়-সূত্রে আত্মস্থ করিয়া, হিন্দু সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত উন্নত হিন্দুমহিমা নত করেন নাই, বিশুদ্ধ হিন্দু-বীর্য্যও সে শোণিতসংমিশ্রণে ম্লান ও অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই; পরন্তু আরও বীর্য্যবন্ত ও ঐশ্বর্য্যশালীই হইয়াছিল অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তী সম্রাট্ বিম্বিসার ও অশোকের সমধিক মহিমোজ্জ্বল গৌরবযুগই তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। সেদিন সে কন্যাগ্রহণ যে ছিল বিজয়ীরই বিলাস ও ততোধিক বীর-জাতির রাষ্ট্রকৌশল—অতএব তাহা শক্তিমত্তারই পরিচয় বলিয়া গৌরবময় ও সুফলপ্রসূই হইয়াছিল। আকবর যেদিন বিজয়-গৌরবে মহিমামণ্ডিত হইয়া পরাজিত রাজস্থানের হিন্দুরাজগণকে কন্যাদানে আহ্বান করিলেন, সে আমন্ত্রণ যাঁহারা গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সহিত ভাগ্য-সূত্র সংগ্রথিত করিলেন, তাঁহারা বিজয়দৃপ্ত দিল্লীশ্বরেরই বাহুবল ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধন পূর্ব্বক বাবরের অস্থিরপ্রতিষ্ঠ মোগল সাম্রাজ্যের কায়েমী বনীয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। ইহা মিলন বটে, কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে কাংস্য পাত্রের সহিত মৃৎপাত্রের মিলনের ন্যায়, বিজেতৃপক্ষেরই গৌরব ও অভ্যুদয়-বৃদ্ধিরই কারণ। এরূপ মিলনে বিজিত প্রজার পরাধীনতার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি এবং ভারবৃদ্ধিই হয়, মিলনের কোনও মনুষ্যোচিত সুফল তাহার দাসভাগ্যে আসিয়া জুটে না।

* * *

আজও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা দেশে নাকি খুব বিকট মূর্ত্তিতেই জাগিয়াছে। মোহ-যুগের সামাজিক

শান্তি ও মিলন যদি মোহান্তে স্বপ্নভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইলে তো চলিবে না। হিন্দু মুসলমানে এতদিন তো এমন বিরোধ ছিল না, এই সকল অভিজ্ঞতার উক্তি এই কারণেই আমাদের কাণে অত্যুক্তি বলিয়াই লাগে। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ শক্তির জাগ্রত অবস্থায় সেদিন পর্য্যন্ত ছিল বই কি! বিজেতা ও বিজিতের মিলন —সে কি খাঁটি ও বিশুদ্ধ মিলন? আর তাহা কি এদেশে কোনদিন সম্ভবপর হইয়াছে? গুরু নানকের উদার ধর্ম্মভিত্তির উপর যে মিলন-প্রয়াস, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কি রক্তের আধিক্যভার তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিখ সম্প্রদায়কে বিজিত হিন্দু পক্ষেই ঝোঁক দিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিল না? ইহা হিন্দুত্বেরই জয়—পরাধীন রক্তস্রোতঃ ছাঁকিয়াও যেটুকু ভেল্কী খেলা সম্ভব নানকজী তাহাই খেলিয়া গেলেন—পরবর্ত্তী দশগুরু আসিয়া তাঁহার সেই শুভপ্রয়াস উদারতর আদর্শক্ষেত্র হইতে টানিয়া কেমন করিয়া ভারতের বাস্তব জীবনের সহিত সুরে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহার কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মিলন—হিন্দু মুসলমানের মিলন নহে, হিন্দুর সুপ্তবীর্য্য ও তদাশ্রিত সনাতন ধর্ম্মেরই মহিমা একটা ছাঁচের মধ্যে সুদূর ভবিষ্যতের কোনও একটা অনাগত সম্ভাবনাকে রূপ দিতে সেদিন হয়ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—ছাঁচ সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অথবা নূতন ও বৃহত্তর আকারে অনুরূপ প্রয়াস আবার ভারতের ইতিহাসে কোন দিন সম্ভবপর হইতে পারে বৈ কি!

* * *

তাই ভেদের ক্ষেত্রে মিলনের প্রতিষ্ঠাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান বলিয়া মনে হয় না। বাঁচিতে হইলে, পরস্পর প্রতিবেশী রূপে বাস করিতে হইলে আমাদের মিলিয়া মিশিয়াই থাকিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একই সত্যপীরের দরগায় সত্যনারায়ণ বলিয়া ধন্না দিলেই যেমন সত্যকার ধর্ম্মগত মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি আইনের ভয়ে বা অধিকারের লোভে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও স্থায়ী ভাবে কার্য্যকরী হইবে, ইহা আশা করা যায় না। হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসাই ভারতের মুক্তির উপায় কি না, তাহা রাষ্ট্রবিৎ বলিবেন; ভারতে জাতিগঠনের উপায় যে ইহাই নয়, তাহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। ভারতে জাতি-নির্ম্মাণের শক্তি কোনও অখণ্ড ক্ষেত্র হইতেই আসিবে, ইহা ঠিক। কিন্তু সে অখণ্ডতা শক্তিরই অখণ্ডতা, তাহা উপাদান-রাজির সমবায় বা সংহতি নহে। এইরূপ সংহতি-গঠন রাজনৈতিক চাল হইতে পারে বটে, যাহাকে ইংরাজীতে "ডিপ্লোমেসী" বলে। রাষ্ট্র-জগতের পক্ষে ইহা মহাধর্ম্ম; কিন্তু জাতি-গঠনের ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না। জাতি-গঠনের নীতি—সঙ্ঘনীতি। কিন্তু সঙ্ঘ—Federation of Faiths অথবা Federation of Statesও নহে। ইহাই অখণ্ড নীতি অর্থাৎ এক বিশ্বাসের ধর্ম্মিগণ মিলিয়াই সঙ্ঘরচনা হয়। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘনীতি কিরূপে প্রযুজ্য, তাহা বারান্তরে বলিব। জাতি-সাধকবৃন্দের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ময়মনসিংহের তরুণ কবি

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ]

এ জেলার নিভৃত পল্লীতে কত কত সাহিত্য-সেবী জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং অর্থাভাবে ঐ সকল গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে না পারায়, তাঁহাদের গুণ গরিমা সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত। অদ্যকার প্রবন্ধে ঐ শ্রেণীর একজন তরুণ সাহিত্য-সেবীর পরিচয় দিতেছি। পাঠকগণ! কবি অল্পবয়সে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, শ্রবণ করিলে পুলকিত হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ১৩৩৭ সনের "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় (কার্ত্তিক সংখ্যায়) "পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত" নামে তাঁহার কতিপয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। জেলা ময়মনসিংহ নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মদনপুর দরগার সন্নিকট সরিষাবাটী নামক পল্লীতে প্রবন্ধোক্ত তরুণ কবি শ্রীযুক্ত জালাল উদ্দিন খাঁ ১৩০১ সনের বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সদর উদ্দিন খাঁ। ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া কেন্দুয়া ও পরে নেত্রকোণা হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; ইং ১৯১২ সনে স্কুল ত্যাগ করেন, এ সময়েই কবিতা লিখা এবং বাউল সঙ্গীত রচনার স্পৃহা জন্মে এবং কলম দোয়াত কাগজ লইয়া বসিলেই যে বিষয়ে চিন্তা করেন, ঐ বিষয়েই কবিতা এবং গান রচনা করিতে পারেন। বাউল সঙ্গীত রচনাতে তাঁহার ঐকান্তিকী চেষ্টা নিহিত হয়। বাড়ীর সন্নিকট চন্দন-কান্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট গিয়া তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বের নানা উপদেশ গ্রহণ করেন; ক্রমেই তাঁহার রচনাশক্তির বিকাশ হয় এবং ঐ সকল স্বরচিত গান তিনি ভাবগদগদ চিত্তে যখন গাইতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতৃ-মণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রসনিমগ্ন থাকেন। ঐরূপ গানে মুগ্ধ হইয়া অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ৯টী মেডেল তাঁকে পুরস্কার দিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গীত "স্বরাজ সঙ্গীত" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। "স্বরাজ" নামক যন্ত্রের বাদ্য সহকারে ঐ সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। কিছু কাল হইল "শরদ্ যন্ত্রের" অনুকরণে ঐ অভিনব বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে; লোকে উহাকে "স্বরাজ যন্ত্র" নামে অভিহিত করিয়াছে। এ জেলার অন্তর্গত বাজিতপুরের সূত্রধরগণই উহা ভাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রবন্ধোক্ত তরুণ কবির গানগুলি ঐ "স্বরাজ যন্ত্র" সহকারে গীত হয় বলিয়াই লোকে কবির গানকে "স্বরাজসঙ্গীত" বলে। কবিও ঐ জন্য গ্রন্থের নাম "আপনতত্ত্ব বা স্বরাজ সঙ্গীত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দো-লনের সঙ্গে ঐ সকল সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক নাই। ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহোদয় তরুণ কবির সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কবিকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল, আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কুমারপাড়া গ্রামে মহম্মদ আলীম বেপারীর বাড়ীতে একদিন রাত্রিতে তিনি গান করিয়াছিলেন; প্রায় ১০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়া প্রকাণ্ড আসর হইয়াছিল। তিনি যে বাড়ীতে গান করিয়াছিলেন, ঐ বাড়ীর সন্নিকট সেখ ছৈয়দালীর বাড়ীতে গোয়াল ঘরে অগ্নি লাগিয়া ঘরটী ভস্মসাৎ হইয়াছে এবং গরুও দগ্ধ হইয়াছে; শ্রোতৃবর্গ তাঁহার মনোমুগ্ধকারী সঙ্গীতে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছেন, যে ঐ দিকে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই। এ আসরে মহম্মদ আলীম বেপারী একটী রৌপ্য-পদক দানে কবিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি "আপন তত্ত্ব বা স্বরাজ সঙ্গীত" নামে যে বাউল সঙ্গীতের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ সরস ও সরল ভাষায় অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে অনেক কবিই সমর্থ হইবেন না। ইতিমধ্যে উক্ত কবি তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সহ আমাদের বাড়ীতে

আসিয়াছিলেন এবং স্বরচিত ৫।৬টী গানও নিজে গাইয়াছিলেন। ঐ সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি, এরূপ গভীরভাবপূর্ণ সঙ্গীতরচনায় অনেক বড় কবিও সহসা সমর্থ হইবেন না। তাঁহার রচিত বাউল-সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি পাঠে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হইয়া উচ্চ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থ মুদ্রণের সাহায্য কল্পে ৪২৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং সহৃদয় দেশবাসীকে ঐ উপাদেয় গ্রন্থ মুদ্রণের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আশাকরি দেশবাসী ঐ তরুণ কবিকে ঐ গ্রন্থ মুদ্রণে সহায়তা করিয়া বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবককে সম্মান প্রদর্শন করিবেন। তাঁহার স্বরচিত "পাগল চিন যাইয়া তারে" এই গানটী যখন নিজে ভাবপূর্ণ আবেগ হৃদয়ে গাইতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীভগবানের অসাধারণ অনুগ্রহ এবং পূর্ব্বজন্মের অসাধারণ সুকৃতি ব্যতীত ঐ শক্তি জন্মে না। শাস্ত্রে আছে, "গানাৎ পরতরং নহি"—সঙ্গীতই উপাসনার শ্রেষ্ঠ পন্থা; সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত সঙ্গীত দ্বারাই সিদ্ধ সাধক হইয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে ৩।৪ রাত্রি জাগরণ করিয়া গান করিলেও শরীরের কোনও ক্লান্তি বোধ করেন না; সাংসারিক কার্য্যকলাপ বা স্ত্রী পুত্র পরিবার কাহার প্রতিই লক্ষ্য নাই, সর্ব্বদা ভাবেই বিভোর আছেন। কবির অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ভাটিয়াল রাগিণীতে বিরহ-বিষয়ক বহু সঙ্গীত আছে; প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য এই, যে প্রাচীন বয়সে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বিখ্যাত ভক্ত-কবি বিজয়নারায়ণ "প্রার্থনা শতকং" রচনা করিয়া প্রত্যেক কবিতায় এবং কবিভূষণ মহেশচন্দ্র "প্রেমপুষ্পাঞ্জলি" কাব্যে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিশ্লষণে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা পাঠে প্রাণ আপনা হইতে ভাগবতভাবে বিভোর হইয়া উঠে। আশাকরি, প্রবন্ধোক্ত তরুণ কবি ভবিষ্যতে ঐ শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইবেন। হুতাশন কখনও বেশীদিন ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে না। শুনিয়া সুখী হইলাম, গৌরীপুরের বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় ও কৃষ্ণপুরের ভূম্যধিকারী ও "তীর্থের পথে" নামক গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি তরুণ কবিকে গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "আপনতত্ত্ব স্বরাজ সঙ্গীত" গ্রন্থে স্বরচিত প্রায় ৩০০ তিন শত বাউলসঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নেত্রকোণা টাউনের নিকটবর্ত্তী বাইশ চাপড়া গ্রামনিবাসী শ্রীমহম্মদ রসিদ উদ্দিন বাউল সঙ্গীত রচনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ইনিও স্বরাজ-যন্ত্র সহযোগে গান করিয়া থাকেন এবং "স্বরাজ সঙ্গীত" নামে স্বরচিত সঙ্গীত সন্নিবেশিত করিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; বারান্তরে এ জেলার তরুণ কবিগণের বিবরণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার বাসনা রহিল।

জেলা পাবনার অন্তর্গত খলিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মনসুর উদ্দিন এম, এ মহোদয় নানা দেশীয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া "হারামণি" নামে একখানা গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; ঐ গ্রন্থে বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ঐ গ্রন্থে এ জেলার বাউল সঙ্গীতও কতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাউল গানের বিশেষত্ব—ভাষা সরল, ভাব গম্ভীর, কথা সহজ, সুর প্রাণস্পর্শী; বাউলের প্রত্যেক গানেই তত্ত্বোপদেশ আছে; ঐ সকল অমূল্য সঙ্গীত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে দেশের একটী বিলুপ্ত রত্নোদ্ধার হয়।

ব্রজ-স্মৃতি

(রামকেলি—ধামার)

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ।

কোন্ কালে ওগো তুমি, সেই বৃন্দাবনে,
যে খেলা খেলেছ, তাহা আজো জাগে মনে।

নাই সে রাধিকা, যে তব শ্রীচরণে,
সঁপেছিল দেহ মন, জীবনে মরণে ;
নাই সে কদম্বতল, নাই সে যমুনে,
মধুর মুরলীধ্বনি, নাই নিধুবনে।

শ্যামলী ধবলী নাই, নাই শুকশারী,
কোকিল গাহে না আর, না নাচে ময়ূরী ;
রাখাল বালক নাই, গোপের কুঁয়ারী,
ধন্য করেছিলে যারে, তুমি হে মুরারী।

অতীত চলিয়া গেছে দূর ব্যবধানে,
তবু সেই বংশীরব, আজও বাজে মনে ;
হৃদিরাসমঞ্চে তুলি, আজি এই ক্ষণে,
বিরাজিছ শ্যামচাঁদ শ্রীরাধার সনে।

রামকেলি—তেতালা (ব্যবহার)—ম বাদী, ঋ ধা কোমল

অস্থায়ী

```
   ০                 ১                 +                 ৩
II[ ঋা  গা  মা  মা | পা  -া  পা  পা | দা  -া  -া  দা | পা  -া  পা  পা I
    কো  ন্  কা  লে   ও  গো  তু  মি   সে  ই  বৃ  ন্   দা  ০  ব  নে

   ০                 ১                 +                 ৩
    মা  গা  গা  ঋা | গা  -া  মা  মা | গা  -া  গা  গা | ঋা  -া  সা  সা I
    যে  খে  লা  খে   লে  ছ  তা  হা   আ  ০  জো  জা   গে  ০  ম  নে
```

অন্তরা

```
   ০                 ১                 +                 ৩
II  পা  দা  দা  সা´ | সা´ -া  সা´ সা´ | ঋা´ -া  ঋা´ সা´ | না  -া  সা´ সা´ I
    না  ই  সে  রা    ধি  ০  কা  ০    যে  ত  ব  ০     শ্রী  চ  র  ণে

   ০                 ১                 +                 ৩
    ঋা´ ঋা´ ঋা´ ঋা´ | ঋা´ ঋা´ ঋা´ গা´ | ঋা´ ঋা´ ঋা´ সা´ | না  -া  সা´ সা´ I
    সঁ  পে  ছি  ল    দে  হ  ম  ন    জী  ব  নে  ম    র  ০  ণে  ০
```

০ ১ + ৩
পা দা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | না র্সা না না | দা -া পা পা I
না হি সে ক দ ম্ব ত ল না হি সে য মু ০ নে ০

০ ১ + ৩
পা দপা মা মা | পা পমা গা গা | গা মা গা গা | ঋা -া সা -া I
ম ধু র মু র লী ধ্ব নি না হি নি ধু ব ০ নে ০

সঞ্চারী

০ ১ + ৩
II সা ঋা মা মা | মা -া মা মা | মা -া মা মা | মা -া মা -া I
শ্যা ম - লী ধ ব লী না হি না হি শু ক শা ০ রী ০

০ ১ + ৩
মা -া মা গা | মা দা পা পা | মা -া গা সা | ঋা -া সা -া I
কো কি ল গা হে না আ র না ০ না চে ম য়ূ রী ০

০ ১ + ৩
সা সা -া সা | সা -া সা সা | ঋা ঋা ঋা সা | ন্া -া সা -া I
রা খা ল্ বা ল ক্ না হি গো পে র কু ঙা ০ রি ০

০
সা ঋা মা মা | মা -া মা মা | গা গা গা মা | ঋা -া সা সা I
ধ ০ ন্য ক রে ০ ছি লে যা রে তু মি হে মু রা রী

আভোগ

০ ১ + ৩
II পা দা দা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | র্ঋা -া র্ঋা র্সা | না -া র্সা র্সা I
অ তী ত চ লি য়া গে ছে দূ র ব্য ব ধা ০ নে ০

০ ১ + ৩
র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা | না -া র্সা র্সা I
ত বু সে ই বং শী র ব আ ০ জো বা জে ০ কা ণে

০ ১ + ৩
পা দা র্সা র্সা | সা -া র্সা র্সা | না র্সা না না | দা -া পা পা I
হৃ দি রা স ম ঞ্চে দু লি আ জি এ ই ক্ষ ০ ণে ০

০ ১ + ৩
পা দপা মা মা | মা পমা গা গা | গা মা গা সা | র্ঋা -া সা -া II
বি রা জি ছ শ্যা ম চাঁ দ শ্রী রা ধা র স ০ নে ০

* * *



বৈদিকযুগ

[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'অথ য ইচ্ছেদ্দুহিথ মে পণ্ডিতজায়ত' ইত্যাদি স্ত্রী-শিক্ষারই সমর্থক। ঋগ্বেদের ১০।১১৬।১ আজী (Race-course) ৪।৩২।২৩ দ্রুপদস্থিত পুত্তলিকা (stage) ১০।১০৭।১০ মন্ত্রে দেবালয়ের উল্লেখ আছে। 'সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" মন্ত্রে রাস্তার' (Mile-stone) থাকার সাক্ষ্য দেয়। সুবর্ণমুদ্রার ব্যবহার, রথ, জাহাজ, সমুদ্রগমন, দ্বীপজয়, উপনিবেশ-স্থাপন - সকল সভ্যতার অঙ্গই বেদে পরিদৃষ্ট হয়; বরং ইউরোপের ইতিহাসে যাহা দেখা যায় না, তদ্রূপ ইতিবৃত্তে ঋঃ ১০।১০২।২ মন্ত্রে মুদ্গলপত্নী ইন্দ্রসেনা রথপরিচালনে শত্রুজয় করিয়াছেন—বর্ণিত আছে। আকাশে গমন বেদে নাই বলা চলে না; ইন্দ্র, অশ্বিনীযুগল, মরুদ্গণ আকাশমার্গে রথবাহনে চলিতেন, তাহা কল্পিত বলিলেও, রামায়ণে পুষ্পকবিমানে রামসীতার লঙ্কা হইতে আগমনে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীগণের আকাশমার্গে বিচরণের যন্ত্রাদি ছিল, স্বীকার করিতে হয়। ঋঃ ১।৫৮।৩ মন্ত্রে, হিরণ্ময় নৌকা অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করে, বর্ণিত আছে। ইহাকে কেহ কেহ অর্গস্ (Argos) নামা নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্য কেহ সূর্য্যই ঐ নৌকা, এরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন; তবে মানুষ মারার কল, সেল, হাউট্জার, বোম, ইত্যাদি থাকার প্রমাণ নাই। মহাভারতাদিতে শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র বর্ণিত আছে। অত্রি-বংশের তেত্রিশজন ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা এবং বিশ্ববারা ও অপালা ঋষিকার নাম পাওয়া যায়। পুরাণে অত্রিতনয়-ত্রয় চন্দ্রমা, দত্তাত্রেয় ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা চন্দ্রমা অত্রিনেত্র-সম্ভূত; সোম, চন্দ্রমা, ভূমিপুত্র (ঋঃ ৯।৪২।৪); অধুনা মঙ্গলগ্রহ ভূমিসুত বলিয়া অভিহিত হন। ঋগ্বেদে যে সপ্তর্ষির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র একজন।

বিশ্বামিত্র—ইনি ঋগ্বেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। পুরাণে বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু বেদে ৩।৫৩।৯-১১ মন্ত্রে আমরা উভয়কে সুদাসের পুরোহিত দেখিতে পাই এবং ঐক্ষ্বাক হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ও মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মা, এরূপ ঐতেরেয় ব্রাহ্মণের ৭।৩।৭ ও ১৩ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়—যাহাতে শুনঃসেফ যুপবদ্ধ ছিলেন।

যুপবদ্ধ শুনঃসেফের স্তুতি ঋগ্বেদের ১।২৪।৩০ সুক্তে বর্ণিত আছে। বিশ্বামিত্রবংশীয়গণকে তদীয় পিতামহ কুশিকের নামানুসারে কৌশিক-বংশ বলা হয়। বিশ্বামিত্রের পিতা গাধি, তৎপিতা কুশিক। কুশিক ঔষিরথনন্দন। ইহারা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইহাদের অনুবীতে

ভূসম্পত্তি ছিল, ইহা ঋঃ ৩।৫৮।৭, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭।১৮ "জহ্নুনাং আধিপত্যে দেবরাতং". ইত্যাদি মন্ত্রে জানা যায় অর্থাৎ জহ্নুরাজ্য দেবরাতকে দেওয়া হইল। কুশিকগণ তৃৎসুদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন, বুঝা যায় (ঋঃ ৩।৫৩।২১-২৪ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)। বিশ্বামিত্র আপনাদিগকে ভারতবংশীয় বলিয়াছেন। (ঋঃ ৩।৫৩।২৪ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য); ইহাতেও বিশ্বামিত্রকন্যা শকুন্তলা ভরতের মাতা হইতে পারেন না। উপরোক্ত ঋঃ ৩।৫৩।২১-২৪ মন্ত্রে ভরতবংশীয়গণ কর্ত্তৃক "বশিষ্ঠ তৃৎসুগণ প্রতি অভিসম্পাত" বর্ণিত। এইজন্য নিরুক্ত টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। Roth ও Maxmuller বলিয়াছেন, "তাঁহারা ঋগ্বেদের যে হস্তলিপিসকল পাইয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশে এই মন্ত্রগুলি নাই।" মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, 'রাজা ত্রিশঙ্কুর বিষয়ে দেবগণ স্বর্গগমনে বাধা জন্মাইতেছেন জানিয়া, বিশ্বামিত্র দক্ষিণ ধ্রুবাদিলোক সৃষ্টি করিতেছেন এবং শ্রবণাদি বৎসরান্তকাল নির্দ্দেশ করিতেছেন; তাহাতে দেবগণ বিশ্বামিত্রকে শান্ত করিতেছেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র জ্যোতিষ্কাদির গতি-সংস্কারে যত্নবান্ ছিলেন দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে কৃত্তিকাদি বৎসরের উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ধনিষ্ঠার পরে শ্রবণা নক্ষত্র; উহাতে উত্তরায়ণ আরম্ভসহ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বর্ষ গণনা আরম্ভ করিতে চাহিয়াছিলেন, বুঝা যায়। বিশ্বামিত্রের পিতা গাধি ও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্রপুত্রগণ মধ্যে দেবরাত (শুনঃসেফ) গৃহীত পুত্র, মধুচ্ছন্দাদি ঔরসজাত পুত্র। পুরণ অষ্টক, কত, প্রজাপতি, বাচা, রেণু ও ঋষভ—ইহারা সকলেই বিশ্বামিত্রপুত্র ও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মধুচ্ছন্দাপুত্র জেতা ও অঘমর্ষণ, এবং কতপুত্র উৎকীল—ইঁহারাও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাতের পুত্র; যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং পৌরাণিক মতে তিনি সূর্য্য হইতে তপস্যাবলে শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ শ্লোকে—"যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাত-স্তথা স্থূযু মহাব্রতঃ।"—ইত্যাদি মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্যকে দৈবারতি বলা হইয়াছে। মহাভারতের বাক্যে আত্মজ শব্দের অর্থ পুত্র পৌত্রাদি গ্রহণ করিলে ঐ যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাতের পুত্র হইতে কোন বাধা থাকে না। পুরাণাদিতে বৈশম্পায়নশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় গুরুর সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় গুরু-আদেশে গুরুদত্ত বিদ্যা ত্যাগ করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়া শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, এইরূপ বর্ণিত আছে। এই বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণুরাতের পুত্র বটেন। ঋগ্বেদের "চরণব্যূহ" গ্রন্থে ও মহা-ভারতের ১২ স্কন্দ ও অ ৫৫ শ্লোকে বাষ্কলীশিষ্য অপর এক যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর পাওয়া যায়। বাষ্কলী বৈশম্পায়নের গুরুভ্রাতা পৈলের শিষ্য; এতদ্ব্যতীত মহাভারতের সভাপর্ব্বে তেত্রিশ অধ্যায়ের ৩৪ ও ৩৫শ শ্লোকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দ্বৈপায়ন ব্রহ্মা, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু, ঋষভ উদ্গাতা, ধৌম্য হোতা ও তৎ-সহকারী স্বরূপ বসুপুত্র পৈল ছিলেন, দেখিতে পাই। ইহাতে ব্যাসশিষ্য জৈমিনী, জন্মেজয়, সর্পসত্রের বক্তা বৈশম্পায়ন, সুমন্ত, কেহই ঋত্বিক্ ছিলেন বলে না; সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের অধ্বর্য্যু ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নশিষ্য বা বাষ্কলীশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য হইতেই পারেন না। কারণ যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উপস্থিত থাকিতে অর্ভক তৎ-ত্যাজ্য শিষ্য অধ্বর্য্যু

হইবে, ইহা সম্ভবপর নয়; কারণ অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদে যিনি প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন তিনিই হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেককালে যুবক থাকা সম্ভবপর নহে; কারণ উভয় ঘটনার মধ্যে অন্যূন ১৫০ বৎসর গত হইয়াছে। কারণ রাজা পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন ও ৩৬ বৎসর বয়সে রাজা হন, রাজসূয়জ্ঞের অন্ততঃ ১৫ বৎসর পর পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং জন্মেজয়ের ১০০০ বৎসর রাজত্বের সময়ে সর্পসত্রে মহাভারত পাঠ হয়। উক্ত ১০০০ বৎসর স্থলে মাত্র ৩৯ বৎসর লইলেও ১৫০ দেড় শত বৎসর হয়; ইহা মহাভারত আদিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়ে আছে। এই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেককারী যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়ন-শিষ্য হইলে বালক ব্রহ্মচারী হইতেন, ব্রহ্মিষ্ঠ বিশেষণে বিষেশিত হইতেন না। এই রাজসূয়ের অধ্বর্য্যু প্রবীণ থাকার সাক্ষ্য মহাভারতই দিয়াছেন। এইরূপ পরিশেষে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে দৈবারতি—যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য বলা হয়, তিনি বৈশম্পায়নশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য নহেন বা হইতে পারেন না। উভয়ের সময়-মধ্যে সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে সপ্তম মন্ত্রে বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য থাকার কথা বর্ণিত আছে। মহাভারত পাঠ করিলে উদ্দালক আরুণি অতিশয় প্রাচীন ঋষি ছিলেন, বুঝা যায়; কারণ হিমালয়ের পাদদেশে সরস্বতীর তীরে তাঁহার যে আশ্রম ছিল, তাহা উদ্দালক-তীর্থ নামে পরিচিত এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি এই তীর্থদর্শনের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ইন্দ্রসভা বর্ণনায় মহর্ষি উদ্দালক আরুণি ও তদীয় পুত্র শ্বেতকেতু উক্ত ইন্দ্রসভায় বিরাজমান এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের তৃতীয় মন্ত্রে "ইমানি শুক্লানি যজুরষি বাজসেনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে" আছে। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি যে বেদোক্ত অদ্বৈতবাদকে বর্দ্ধিতকলেবর করিয়াছেন, তদীয় শিষ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে পূর্ণাবয়বে পরিণত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জৈমিনীশিষ্য যোগাচার্য্য হিরণ্যনাভ—যাঁহার নিকট বেসশল্য যাজ্ঞবল্ক্য যোগলাভ করেন, বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদে কতিপয় ঋষি প্রাজাপত্য বলিয়া উল্লিখিত হন। যথা—দক্ষিণা (ঋঃ ১০।১০৭ সূক্ত), সংবরণ (ঋঃ ৫।৩৩।৮), বসুকৃত (১০।২৬ সূক্ত), যজ্ঞ (ঋঃ ১০।১৩০ সূক্ত), প্রজাবান (ঋঃ ১০।১৮৩) হিরণ্য-গর্ভ (২০।১২১) বিষ্ণু (ঋঃ ১০।১৮৪ সূক্ত), যক্ষনাশন (১০।১৬১ সূক্ত) পতঙ্গ (১০।১৭৭ সূক্ত) এবং পরমেষ্ঠি প্রজাপতি (১০।১২৯) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিতাপস (ঋঃ ১০।১৪১ সূক্ত), অগ্নি-পাবক (ঋঃ ১০।১৪০), অগ্নিসচীক বৈশ্বানর (১০।৫১-৫৩ সূক্ত) অগ্নিচাক্ষুষ (১০।১০৬) এবং অগ্নি আঙ্গিরস ঋষি। অগ্নিতাপস হইতে মন্যু (ঋঃ ১০।৮৩-৮৪ সূক্ত) এবং ধর্ম্ম্য (ঋঃ ১০।১০৪) সূক্তে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অগ্নি আদিরস হইতে শ্যেন (ঋঃ ১০।১০৮), বৎস (ঋঃ ১০।১৮৭ সূক্ত), কেতু (ঋঃ ১০।১০৬) ও কুমার (ঋঃ ৭।১০১-১০২) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সূর্য্য—অর্থাৎ বিবস্বান্ (ঋঃ ১০।১০৩), সূর্য্য হইতে যম (ঋঃ ১০।১৪), যমী (ঋঃ ১০।১৫৪), অতিতপা (ঋঃ ১০।৩৭), চক্ষু (১০।১৫৮), বিভ্রাট (ঋঃ ১০।১৭৫), ধর্ম্ম্য (ঋঃ ১০।১৮১), সূর্য্যা (ঋঃ ১০।৮৫) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

ইন্দ্র—ঋগ্বেদে তিনজন ইন্দ্র পরিদৃষ্ট হয়:—(ক) ইন্দ্র (ঋঃ ১০।১৮৬), (খ) ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ

(১০।৪৯-৫০), (গ) ইন্দ্র মুষ্কজন (ঋঃ ১।৩৮) সূক্তের দ্রষ্টা।

ইন্দ্র হইতে জয় (ঋঃ ১০।১৮০); অপ্রতিবস্থ (১০।১০০) ; স্বর্গহরি (১০।৯৬) ; বসু (১০।২৭-২৮); বিমদ (১০।২৩) ও বৃশাকোনি (ঋঃ ১০।৮৬) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অপসব্ মনু—অপ্সব হইতে মনু, মনু হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে অগ্নি (৯।১০৩)।

ত্বষ্টা—ত্বষ্টা হইতে ত্রিসিরা (১০।৮-৯) ; ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ (ঋঃ ২।১১।১৯) ; (ঋঃ ১০।৮।৯) ; স্মরণ্য (ঋঃ ১০।১৭।১) ; ঈশ্বর, বিষ্ণু ও অগ্নি (৯।১০৯) ; ইন্দ্রানী (ঋঃ ১০।৮৬) ; শচী (১০।১৫৯) ; পৌলমী (১০।১৫৯) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অদিতিবংশ—অদিতি হইতে দক্ষ (১০।৭২।৪) ; দক্ষ হইতে অদিতি (ঋঃ ১০।৭২।৪, ৬।৫০।২) ; অদিতি হইতে দেবগণ (১।৮৯।১০) এবং মাতলী (ঋঃ ১০।১৪৩।৩) মন্ত্রের দ্রষ্টা।

গোপায়নবংশ—ঋগ্বেদে গোপায়ন বা লোপায়ন বংশীয় বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু ও বিপ্রবন্ধু নামক ঋষি (ঋঃ ৫।২৪ ও ১০।৫৭-৬০) সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা শক্তি-শিষ্য এক গোপায়ন জানা যায় ও ঋঃ ৮।৭৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা এক গোপায়ন আত্রেয় পাওয়া যায়; ইঁহারা আত্রেয় বলিয়া কথিত হন না—সুতরাং শক্তি-শিষ্য গোপায়ন বা লোপায়ন হইবে। ইঁহাদের মন্ত্রে জীবাত্মার পিতৃলোক ও দেবলোকে গমন এবং পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেহধারণের উল্লেখ আছে।

যামায়ণবংশ—যামায়ণবংশীয় কতিপয় ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—শংখ, দমন, দেবশ্রবা ও সঙ্কুসুক। ইঁহারা ক্রমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পঞ্চদশ হইতে উনবিংশ সূক্তের দ্রষ্টা এবং অত্রি, সাংখ্য, ঊর্দ্ধকৃতানি, ইঁহারা যথাক্রমে ঋগ্বেদের ১০।১৪৩-১৪৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ও কুমার ঋঃ ১০।১৩৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। কুশের উপর পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডাদি-দান বর্ণিত আছে। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিসত ইত্যাদি পিতৃগণের বর্ণনা আছে। ১০।১৫।১৬ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

বাতরশনাবংশ—বাতরশনাবংশীয় পুতি, বাতযুতি, বিপ্রযুতি বৃশাণক; কবিক্রত, এতশ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও কেশিন—ইঁহারা সকলেই ঋঃ ১৩।১৩৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বাতায়নবংশ—বাতায়নবংশীয় অনিল (ঋঃ ১০।১৬৮) ও উরু ঋঃ ১০।১৮৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। উরুপুত্র অঙ্গ ও তদীয় পুত্র হর্বির্দ্ধান; যথাক্রমে ঋঃ ১০।১৩৮ ও ঋঃ ১০-১১-১২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

তার্ক্ষ্যঅরিষ্টনেমি—তার্ক্ষ্যপুত্র অরিষ্টনেমি ঋঃ ১০।১০৮ সূক্তের ও সুপর্ণা ঋঃ ১০।১৪৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

শারঙ্গা—শারঙ্গা ও তদীয় পুত্র জারিতা, দ্রোণ, সারীসৃক্ক ও স্তম্বমিত্র; ইঁহারা ঋঃ ১০।১৪২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। মহাভারতের সভাপর্ব্বে খাণ্ডবদাহন-কালে শারঙ্গাদির অগ্নি হইতে রক্ষা বিষয়ে উক্তি দৃষ্ট হয়। এই সূক্তের মন্ত্রার্থ দৃষ্টেই মহাভারতের উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে মনে হয়।

ভরত—ঋগ্বেদে বহু রাজার নাম আছে। তন্মধ্যে দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের নাম—ঋঃ ৬।১৬।৪ মন্ত্রে ও ৭।৮।৪ মন্ত্রে আছে। এই ভরতের নামানুসারে ভারতবংশ ও ভারতবর্ষ এবং মহাভারত ইত্যাদি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৩ অধ্যায়ে এই রাজর্ষিবংশাদি-প্রবর্ত্তক ভরতের বিষয়ে আছে।—"ভরতাদ্ভারতী কীর্ত্তি র্যেনেদং ভারতং কুলম্"; তথায় ৬৩ অধ্যায়ে ভরতানাং মহাজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে। এই ভরত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা ঐঃ ব্রাঃ বর্ণিত

আছে এবং মর্ম্মনার দেশে বহু হস্তিদান করেন; সাচীগুণে অগ্নিচয়ন করেন, যমুনাতীরে ৭৮টী অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গঙ্গাতীরে বৃত্রঘ্ন নামক স্থানে ৫৫টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; তাহাতে প্রাচীন ঋষি মামতেয় দীর্ঘতমা অভিষেককারী পুরোহিত ছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বয়ং আপনাদিগকে ভারতবংশীয় বলিয়াছেন। ভরতের পৌত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও অপয়া নদীতীরে বাস করিতেন। ঋঃ ৩।২৩।৪ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়, ইহারা বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহারা বিশ্বামিত্রদৃষ্ট তৃতীয় মণ্ডলের ৩.২৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি; সুতরাং বিশ্বামিত্রের বা তাঁহার পিতার সমসাময়িক যজমান বা শিষ্যশ্রেণীভুক্ত, ইহা বুঝা যায়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

[ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভিষগাচার্য্য বি-এ, এম্-ডি, এফ-এ, এস্-বি]

প্রথমেই প্রশ্ন এই—**আয়ুর্ব্বেদ কি?**

যে শাস্ত্রে আয়ুঃ সম্বন্ধে আলোচনা আছে ও যাহা পাঠ করিলে আয়ুঃ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাদশ বিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরীপ্রণীত বিদ্যাবিশেষ, তাহার লক্ষণ—

হিতাহিতম্ সুখং দুঃখং আয়ুস্তস্যহিতাহিতম্।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তম্ আয়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে।

—চরক।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধির্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যন্তে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে।

—ভাবপ্রকাশ।

তাঁহা হইলে আমরা আয়ুর্ব্বেদে কি হিত, কি অহিত, ব্যাধির নিদান ও আরোগ্য, এবং উপায় কি?—এই সকল বিষয় জানিতে পারি।

আয়ুঃ আছে, এইরূপ পদার্থকে আমরা চেতন পদার্থ বলি। উদ্ভিদেরও আয়ু আছে, তাহাও চেতন পদার্থ। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদে জীব ও উদ্ভিদের আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বর্ণিত আছে। সেই কারণে আমরা আয়ুর্ব্বেদে—

নরায়ুর্ব্বেদ—

পশ্বায়ুর্ব্বেদ—

গোচিকিৎসা—

হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ—

এতদ্ব্যতীত উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, হরিণ প্রভৃতি চিকিৎসার গ্রন্থ ছিল। ইহাই মূল ৬৪কলা-প্রসঙ্গে ধৃত তির্য্যগ্‌যোনি-চিকিৎসিত বিদ্যা।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ

তরুচিকিৎসা

আরামরোপন

এইরূপ আয়ুর্ব্বেদ নানা ভাবে বিভক্ত দেখিতে পাই।

বেদ মানে জ্ঞান। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ইহা আমি বিশ্বাস করি। আয়ুর্ব্বেদ বেদের উপর

প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদও ভগবান-কর্তৃক প্রণীত। ব্রহ্মা স্মরণ করিয়া লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ লিখিয়াছিলেন; সে আয়ুর্ব্বেদ বা ব্রহ্মসংহিতা আমরা পাই নাই। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ পাইয়াছি; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ পাই নাই।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপবেদ। অথর্ব্ববেদ হইতে আমরা চিকিৎসাবিষয়ক বহু তথ্য জানিতে পারি। তবে অন্যান্য বেদেও চিকিৎসাবিদ্যার বিবরণ পাই। কাহারও কাহারও মতে আয়ুর্ব্বেদ ঋক্‌বেদের উপবেদ।

ঋগ্‌বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ।

—"চরণব্যূহ"-ব্যাসকৃত

শুক্ল যজুর্ব্বেদে আমরা আয়ুর্ব্বেদের বহু মূল-সূত্র দেখিতে পাই; একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

অন্যা বো অন্যাভবত্যন্যান্যস্যা উপাবত।
তাঃ সর্ব্বাঃ সংবিদানা হৃদন্ন প্রাবতা বচঃ॥

—শুঃ যঃ মাঃ, ১১, ৮৮

ইহার অনুবাদ (৮৮ কণ্ডিকা):—

হে ওষধিসকল! তোমাদিগের মধ্যে একজন একজনের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং আর একজন আর একজনের প্রভাব হ্রাস করে; এতাবতা তোমরা মিলিত হইলে অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন হইয়া থাক। অধুনা তোমরা সকলে আমার উপকারার্থ একমত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভাব হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা রোগনাশ-করণে আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখা ১২ অঃ

৮৮ কণ্ডিকা—সামাশ্রমীকৃত অনুবাদ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসায় এখনও ঠিক এইভাবে ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়।

১ম মূল ঔষধ—Principal drugs.
২য় সহায়ক ঔষধ—Adjuvants.
৩য় নিয়ামক ঔষধ—Correctives.
৪র্থ বাহক ঔষধ—Vehicles.

চরকও বলিয়াছেন—

ভিষগৌষধসংযোগৈশ্চিকিৎসাং কর্ত্তুমর্হতি।

চিকিৎসক হেতু যুক্তি সহকারে ঔষধদিগের সংযোগ বিয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবেন।

যজুর্ব্বেদের আর একটী শ্লোক –

সাকং যক্ষ্ম প্রপত চাষেণ কি কিদী বিনা।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকন্নশ্যনিহাকয়া॥

—শুঃ যঃ মাঃ ১২, ৮৩।

ইহার অনুবাদ:—

হে ব্যাধিসকল! তোমাদের নিদান কফ, পিত্ত, বাতের সহিত তোমরা পলায়ন কর। রোগীর হাহাকার নিবারিত হউক।

—সামাশ্রমীকৃত অনুবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ কতদিনের?

বেদ কতদিনের কেমন করিয়া বলা যায়, তাহা বলিতে পারি না। জ্ঞান নিত্য, অনন্ত; বেদও অনাদি, অনন্ত, অপৌরুষেয় ও স্বয়ম্ভূ। তবে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বিভক্ত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বর্ত্তমান আকারে কতদিন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা একটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সে উপায়ও নাই; কেন না, মূল আয়ুর্ব্বেদ আমরা দেখিতে পাই নাই; তবে কেমন করিয়া বলিব, কত দিনের! তবে চরক ও সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বেদ কতদিনের, তাহা একটা অনুমান করিয়া বলিতে পারি।

আয়ুর্ব্বেদের সময় নির্দ্দেশ করিতে গেলে আমাদিগকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের সেই গণ্ডীটী অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহাদের মতে, পৃথিবীর বয়স ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর। মনে যদি এই

ধারণা থাকে, তাহা হইলে সকল ঘটনাই ঐ সময়ের মধ্যে ঘটিবে। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে ভগবান বুদ্ধদেবকে বাদ দেওয়া চলে না; তাঁহার আবির্ভাব-কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী, ইহা প্রমাণসহ। সুতরাং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমাদের ঘুরিতে হয়। ইহা আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইতে হইলে তাঁহারা বড়ই নাচার। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহারা বেদ বুদ্ধদেবের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইতে আরম্ভ ধরিয়াছেন, তাহার বেশী দূরে যাইতে স্বীকৃত হন না। কিন্তু ইজিপ্টদেশের রাজবংশের তালিকা তাঁহাদিগকে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে, প্রায় খৃঃ জন্মের ৮।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। এদেশেও পাটলীপুত্র নগরের খননে, মহেঞ্জো ডারো ও হরপ্পার পুরাতন কীর্ত্তি আবিষ্কারে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে অনিচ্ছুক। মেসোপটোমিয়ার অন্তর্গত বোগাজ কয়ীতে আবিষ্কৃত একখানি দলিলের মধ্যে চারি জন বৈদিক দেবতার নাম দেখিয়া বিশেষতঃ নাসত্যের নাম দেখিয়া, আয়ুর্ব্বেদ কত দিনের আপনারা অনুমান করিতে পারেন। পৃথিবীতে মানবজাতির বয়স অন্ততঃ ৫০ হাজার বৎসর, ইহাই বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমোন্নতিতালিকা (chronology) নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থকারদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়-চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও, ভ্রম-প্রমাদ-দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। 'History of Indian Medicine' গ্রন্থে এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদের কাল-বিভাগ

পূর্ণাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ

ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন প্রজা-সৃষ্টির পূর্ব্বে; পরে প্রজাদের উপকারার্থ স্মরণ করিয়া সেই পঞ্চম বেদ লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে—পঞ্চম বেদ—লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ; প্রজাসৃষ্টি পরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ।

এই কালে পুরোহিত ও বৈদ্য রোগোপশমের জন্য নিযুক্ত।

ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মাদ্বর্ত্ততে ভিষগাত্মকম্॥

ব্রহ্মা, আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়া, দক্ষ প্রজাপতিকে, দক্ষ অশ্বিনী কুমারকে, তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ধন্বন্তরী ও ভরদ্বাজ মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ধন্বন্তরী ও ভরদ্বাজ হইতেই লোকসমাজে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রথমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রচারিত হয়। ব্রহ্মাকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক গ্রন্থ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণাঙ্গ। আয়ুর্ব্বেদ—

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ব বেদস্য
অনুৎপাদ্যেব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ
কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ।
—সুশ্রুতসংহিতা

পরে মানুষ অল্পায়ুঃ ও অল্পমেধাযুক্ত হইয়া পড়িলে ব্রহ্মা পুনরায় পঞ্চম বেদস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন।

ততোঽল্পায়ু ষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং—
ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।　　—সুশ্রুতসংহিতা।

যথা—　শল্য—ব্রণবিজ্ঞান, যন্ত্র, শস্ত্র, অগ্নিপ্রয়োগবিধি।

শালাক্য—শলাকা চিকিৎসা।

কায়চিকিৎসা—সার্ব্বাঙ্গিক রোগনিদান ও চিকিৎসা।

ভূতবিদ্যা—গ্রহ-প্রতীকার, রোগের নিদান ও চিকিৎসা। ইহাকে দৈবব্যপাশ্রয়ও বলা যায়।

কৌমার ভৃত্য—শিশুপালন বিধি ও তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যরক্ষা।

অগদতন্ত্র—বিষ-চিকিৎসা।

রসায়ণতন্ত্র—শারীরিক পুষ্টিজনন-বিধি।

বাজীকরণতন্ত্র—শুক্রদোষ সংশোধন ও তদ্বর্দ্ধনোপায়।

এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জানা চাই—

পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, রসায়ণতত্ত্ব, আত্মনিরূপণ, আয়ুস্তত্ত্ব, স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

ঋগ্‌যজু সামাথর্ব্বাখ্যান্‌ দৃষ্টা বেদান্‌ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্যং তেষামর্থঞ্চ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌবিভুঃ।

ভাস্কর কাশীরাজ, দিবোদাস অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি শিষ্যগণকে সেই পঞ্চম বেদে—

প্রদদৌ পঠয়ামাস।

সে ভাস্কর চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষক ও প্রচারক বলিয়া সমাদৃত; সেই মহাপুরুষের নাম চরক বা সুশ্রুতগ্রন্থে না থাকার কারণ কি?

আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ দুইটী স্তর।

ভাস্করের পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ভাস্করযুগে। এবং সংগ্রহকাল প্রজাপতি যুগে, আর উদয়কাল সৃষ্টি পূর্ব্বে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদয়কাল প্রজাসৃষ্টির পরে; সংগ্রহ-কাল দক্ষ প্রজাপতি যুগে; প্রচার ধন্বন্তরী ও ভরদ্বাজের যুগে। কাহারও মতে, দক্ষ প্রজাপতি আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন।

আত্রেয়শিষ্য অগ্নিবেশ আয়ুর্ব্বেদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। "হেতুঃ লিঙ্গৌষধজ্ঞান"—Etiology Diagnosis and Medicine; তাহাতেই আয়ুর্ব্বেদ ত্রিস্কন্ধ, ত্রিসূত্র বলিয়া খ্যাত।

আয়ুর্ব্বেদ কি বৈজ্ঞানিক?

একটা কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, যে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানসম্মত নহে। কি হইলে বৈজ্ঞানিক বলা যায়, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ভূয়োজ্ঞান-বলে মানুষ অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। ভূয়োদর্শনলব্ধ ফলকে Empiric বলে; কিন্তু দৃষ্টফলের যদি কারণ অনুসন্ধান করিয়া সফল-কাম হওয়া যায় বা ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা আবিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে তখন সেই ভূয়োজ্ঞান বিজ্ঞান পদবীর দাবী করে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। দেখা যাউক, বর্ত্তমান এলোপ্যাথিক চিকিৎসা—যাহা অবিসংবাদিত রূপে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ধৃত ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রভেদ কি? উভয় চিকিৎসাতেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

রসায়ণ—Chemistry
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—Botany
জীববিদ্যা—Zoology
শারীরবিদ্যা—Anatomy
দেহতত্ত্ব—Physiolcgy
দ্রব্যগুণ—Materia Medica
স্বাস্থ্যবিদ্যা – Hygiene
কায়চিকিৎসা—Inner Medicine
শস্ত্র চিকিৎসা—
(শল্য, শালাক্য) Surgery and Eye-diseases
ধাত্রীবিদ্যা—Midwifery and Gynaecology

শিশুচিকিৎসা—
(কৌমার ভৃত্য) Pædiatrics
নিদান—Pathology
আশুকমৃত পরীক্ষা—Post-mortem Examination
আয়ুর্ব্বেদ ব্যবহার—Medical Jurisprudence
দেবতাপূজন—Prayer. Faith Cure
আরোগ্যশালা—Hospital

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে আয়ুর্ব্বেদে প্রাচীন যুগ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্ববিষয়ের আলোচনা হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ ব্যবহার সম্বন্ধে এক্ষণে কোন গ্রন্থ দেখা যায় না বটে; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা পরাশর, আপস্তম্ভ, সম্বর্ত্ত, বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

পরাশর বলেন—একটী গোহত্যা হইলে মৃত গরুর রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, গো-শরীরে কোন ব্যাধি ছিল কি না। Post Mortem Reports সম্বন্ধে আমরা চরক বা সুশ্রুতকৃত গ্রন্থে কোন নিদর্শন পাই না; কিন্তু "আশুকমৃত-পরীক্ষা" নামে ইহার আলোচনা ও ব্যবহার চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। যাঁহারা মনে করেন, যে আয়ুর্ব্বেদে পরীক্ষা (Experiment) বলিয়া কোন প্রক্রিয়া নাই, তাঁহাদিগকে কালনাথশিষ্য শ্রীঢুণ্ঢুকনাথবিরচিত রসেন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত কথাগুলি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতং ন কৃতং ন তল্লিখামি।
যৎকর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং
প্রৌঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ॥

যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন করি নাই, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে যেগুলি কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে সেইগুলিই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূতেন্দ্রকর্ম্ম গুরবো গুরবস্তএব।
শিষ্যাস্তএব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে॥

যে সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া তাহা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া গুরু সমক্ষে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রশংসনীয় শিষ্য। তদ্ভিন্ন উভয়বিধ গুরু শিষ্যই অভিনেতা মাত্র।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

ঋষি প্রভৃতি পরীক্ষকদিগের প্রণীত শাস্ত্র আপ্তাগম।

—চরক। সূঃ। ১১ অঃ।

জীবশরীরে যিনি সূক্ষ্মতম বিভু বলিয়া কথিত, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, এই স্থলে জ্ঞানচক্ষু বা তপশ্চক্ষুর প্রয়োজন হয়—

ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমোবিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ॥
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃস্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্ট শ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপ স্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধিকারী হইতে হইলে শাস্ত্র-দৃষ্টি চাই; প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা চাই, আর জ্ঞানচক্ষু বা তপশ্চক্ষুও প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক; আবার কলাশাস্ত্রের অন্তর্গত। বাৎসায়নোক্ত ৬৪ কলার মধ্যে। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও কলা—Science and Art.

আয়ুর্ব্বেদ কি স্থিতিশীল ?

আয়ুর্ব্বেদ কখনও এক ভাবে স্থিতিশীল নহে ; যাহাতে জীবনীশক্তি আছে তাহা কখনও এক ভাবে থাকিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া এমন একখানি গ্রন্থ বা জিনিষ হইতে পারে না, যাহা চিরকাল একভাবে ছিল বা থাকিবে।

চরক বলিয়াছেন—

তদেব যুক্তভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যঃ যঃ প্রমোচয়েৎ ॥

তাহাই উপযুক্ত ঔষধ, যাহাতে আরোগ্য লাভ হয় ; তিনিই উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, যিনি রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। যতদিন এই সূত্র ভিষকৃগণ মানিয়া চলিবেন, ততদিন আয়ুর্ব্বেদ একভাবে থাকিতে পারে না। কি উদার ভাব, ইহাতে কোন প্যাথি (Pathy) নাই ! যে ঔষধে রোগ ধ্বংস হয়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদগ্রাহ্য। বেদের আয়ুর্ব্বেদ, চরকের আয়ুর্ব্বেদ নহে ; সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বেদে কত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন লক্ষিত হয়, বেদবর্ণিত প্রথা কত লোপ পাইয়াছে। বিশপলায় লৌহময়ী কৃত্রিম জঙ্ঘা সম কোনরূপ ব্যবস্থা পরে দেখিতে পাই নাই। অথর্ব্ববেদোক্ত স্ফোটক জ্বর চরকে বা সুশ্রুতে বর্ণিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদে মূত্র-নিঃসরণ জন্য যে ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, সুশ্রুতে তাহা স্থান পায় নাই ; সুশ্রুতে Catheter বা মূত্রনিঃসারক নল-যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। বাগ্‌ভটে কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যচেষ্টা ! পরে রস-চিকিসকগণের ব্যবহৃত রসব্যবহার চরক সুশ্রুত হইতে কত ভিন্ন। রসচিকিৎসায় চরক বা সুশ্রুতের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। শরীর-বিদ্যার কথা ধরুন—বেদে শরীরের মোটামুটী বর্ণনা, চরকে অল্প কথায় ; কিন্তু সুশ্রুতে শারীর-বিদ্যা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত, তবে ধমনী (nerve) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, ষট্‌চক্র বর্ণনা প্রভৃতি তন্ত্রেই বিশেষ ভাবে আলোচিত ; কিন্তু সমস্তই আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে পারদ ও অহিফেনের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। আর এই দুই ঔষধ না হইলে এখন কবিরাজী করাই চলে না। ঔষধের পরিমাণ ও মাত্রা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম করিয়া দেওয়া হয়। বিদেশ-জাত ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধ বাগভট তাই বলিয়াছেন—

যস্য দেশস্য যজ্জন্তু-স্তজ্জন্তু সৌষধং হিতম্।
দেশাদন্যত্র বসতস্তস্তল্য গুণমৌষধম্ ॥

যে যে দেশের হোক, তত্তদ্দেশজ ঔষধ তাহার পক্ষে হিতকর ; স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর বাস করিলে তদ্দেশীয় ঔষধসমূহ হিতকারী হইয়া থাকে।

যদি বিদেশীয় ঔষধের উপাদান স্বদেশে চাষ করিতে পারি, তবে তাহা নিজ দেশীয় লোকের পক্ষে হিতকর হইবে ; এইজন্য সিংকোনা (ভারতবর্ষীয়) আয়ুর্ব্বেদগ্রাহ্য।

আয়ুর্ব্বেদ কি কুসংস্কারপূর্ণ ?

আমাদের শাস্ত্রে অনেক বর্ণনা রূপকরূপে কল্পিত। ১। আমরা বসন্ত রোগে শীতলা দেবীর পূজা করি। শীতলার মূর্ত্তি ও ধ্যান আমি 'History of Indian Medicine Vol. I. Introduction'এ বুঝাইয়াছি। তাঁহার বাহক গর্দ্দভ কেন ? গর্দ্দভ দুগ্ধ-বসন্ত বা মসূরিকা রোগের প্রতিষেধক ও ঔষধ ; বসন্ত রোগী রাসভ-দুগ্ধে আরোগ্যলাভ করেন। ২। যমের বাহন মহিষ। যম বা অন্তক সান্নিপাতিক জ্বর। ইহাতে গ্রন্থিপাক ও অজ্ঞানতা ভয়প্রদ লক্ষণ। মহিষপিত্তের অঞ্জনে জ্ঞানশূন্য রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হয়। ৩। ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল। বিড়াল-স্পর্শ বাধক বেদনায় ও যোনিব্যাপদ্

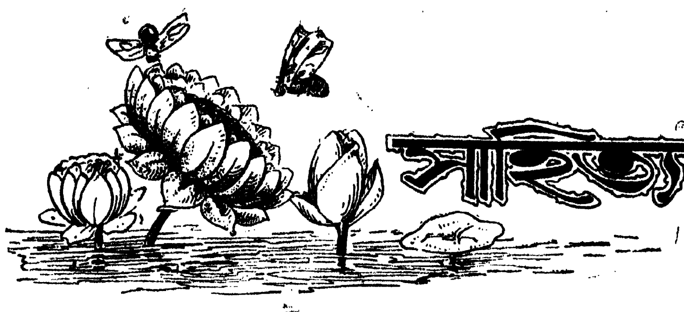
রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত। বিড়াল-দুগ্ধ, মার্জ্জার রোম, অস্থি ও পুরীষ ব্যবহারে স্ত্রী-রোগে সুফল পাওয়া যায়। ৪। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, হস্তী ও উচ্চৈশ্রবা অশ্ব। ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদে কেশ-মূলস্থ স্নেহ। ইন্দ্রলুপ্ত বা খালিত্য রোগে ঐ স্নেহ-পদার্থ নষ্ট হয়—তাই রোগের নাম ইন্দ্রলুপ্ত; চলিত কথায় টাক। হস্তীর মাংস ও দন্ত, এবং ঘোটকের লালা এই রোগের ঔষধ। ৫। অগ্নির বাহন ছাগ। ছাগ-দুগ্ধ দাহের ঔষধ। ছাগবিষ্ঠা-চূর্ণ ও ছাগরক্ত অগ্নিদগ্ধজ ক্ষতরোগে উপকারী। অগ্নিবোহিনী রোগে ছাগদুগ্ধ হিতকর। জঠরাগ্নির বিকারে, যথা ভস্মক বা অত্যগ্নি রোগে ছাগদুগ্ধ মহৌষধ। ৬। মনসার বাহন সর্প; মনসা গ্রহদুষ্ট ব্যাধি; সাপের খোলস তাহার ঔষধ। ৭। বায়ুর বাহন মৃগ; মৃগমাংস বায়ুনাশক। বায়ুজনিত অশূলরোগে মৃগমাংস-স্বেদ উপকারী। হৃৎশূল ও পৃষ্ঠশূলে মৃগশৃঙ্গের পুটপাকভস্ম ঘৃতসহ সেবনীয়। ৮। জরাসুর ত্রিপাদ, ত্রিশির রূপে কল্পিত হইয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার গূঢ়ার্থ জ্বরলিঙ্গ বর্ণনা। এইরূপ রূপক, ছবি, চিহ্ন ব্যবহার ইয়ুরোপে রসায়ণ-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা—

একখানি পুরাতন "বান্ধব" নামক মাসিক পত্রিকার ১২৮৩ সালে শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা পড়িতেছিলাম। "চক্রদত্ত" নামক গ্রন্থের সমালোচনায় সমালোচক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আশ্রয় বিহনে বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে। ধন্বন্তরী যে শাস্ত্রের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন, যে শাস্ত্র সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি মনস্বিবর্গের উপদেশধারিতে পরিবর্দ্ধিত এবং চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে পল্লবিত হইয়াছিল; আজ রামচরণ শীল ও গুরুচরণ শীল প্রভৃতি কবিরাজ-বর্গের ক্ষুরধার বুদ্ধিতে সেই শাস্ত্র ভূতলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে; এবং যাহার ইচ্ছা সেই উহাকে পদতলে দলন করিতেছে। কবিরাজ বা চিকিৎসক হইতে গেলে আমাদের দেশে আর এক মাস কালও শিক্ষা বা অধ্যয়ন করিতে হয় না; ওষধীসংগ্রহের জন্য একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না; ঔষধের পরিচয় লাভের জন্য কাহারও নিকট কিছু শিক্ষা করিতে হয় না, এবং তেমন উৎকট ব্যাধির লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও ক্ষণকাল ভাবিতে হয় না। কারণ চিকিৎসকেরা ঐরূপ গুণশীল-সম্পন্ন এবং চিকিৎসকেরা এইক্ষণে কবিরাজ। অনেকে নৈষধের দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই চিকিৎসক হয়; অনেকে চিকিৎসক হইবার জন্য একটী পুঁটুলী মাত্র সংগ্রহ করেন। এমতাবস্থায়ও যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মৃতপ্রায় হইয়াও পৃথিবীতে জীবিত রহিয়াছে, ইহা আয়ুর্ব্বেদের সামান্য মহিমা নহে।"—এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত, একথা বলিতে পারি না।* শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য কমিয়া যাইতেছে; তবে সাধারণের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)



দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

(৭)

[আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা কিম্বা ভারতবর্ষে ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসিগণের অবস্থাপর্য্যালোচনার জন্য যে মন্ত্রণাসভার (Conference) কথা চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। তার প্রধান কারণ, ঐ সময়েই রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় বৈঠক লণ্ডনে বসিবে। এই ব্যাপার যেরূপে হয় সাঙ্গ হইবার পর, দক্ষিণ আফ্রিকা কন্‌ফারেন্স বসিলে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমি বার বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি এবং বার বার বলিব, যে ভারত-ভাগ্যচক্রপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপনিবেশবাসী-দিগের ভাগ্যোন্নতি না হইলে মঙ্গল নাই ও স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নাই। সে ভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে যাক্, ক্রমশঃ অবনতি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। পিনাং, মালয়, সিংহল এবং বর্ম্মাতে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় নির্য্যাতন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গত বৎসরের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে, যে পিনাং, মালয় এবং সিংহলে ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিতেছে। বর্ম্মার যে সকল অংশে বিদ্রোহযুদ্ধের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও ভারতীয় নিগ্রহ বিশেষভাবে চলিয়াছে। অলসপ্রকৃতি বর্ম্মার অধিবাসী এতদিন তাহার ভূমিলক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিল, ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা গায়ের রক্ত জল করিয়া সে ভূমি-সম্পদ্ রক্ষা করিয়াছে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনের নিরন্তর চেষ্টায় বর্ম্মার কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হইতে উন্নততর পদবীতে উঠিয়াছে। নেটালে যাহা ঘটিয়াছে, বর্ম্মাতেও তাহা ঘটিতেছে; "Go back to India"—এই ধ্বনি উভয় প্রান্তেই উঠিয়াছে। অতএব রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের স্থায় অধিবেশনে এই সকল ব্যাপারের সম্যক্ বিচার ও সংস্কারবিধির প্রয়োজন।

বর্ম্মায় অকারণ ভারত-নির্য্যাতন ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি করিয়া স্থানীয় গভর্ণর ও বড়লাট সাহেবের নিকট ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ডেপুটেশন পুনঃ পুনঃ গিয়াছে। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, অভয়দান ও আশ্বাসবাণীর অভাব নাই কিন্তু আসল কাজ কিছুই হইতেছে না। নেটালে বোয়র-দমন যুদ্ধে স্থানীয় ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্ট অজস্র শ্রম ও রক্তপাত করিয়াছিলেন, বর্ম্মা-বিদ্রোহদমনেও ঠিক তাহাই হইতেছে; কিন্তু ভারতবাসীর ইহাতে মৌলিক লাভ হইতেছে না, হইবেও না।

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন লণ্ডনে হইবে। সে সময়ে জেনারেল হার্টজ্ হগ প্রমুখ দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে উপস্থিত থাকিবেন; জেনিভা কন্‌ফারেন্সেও তাঁহারা যাইবেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে ধরপাকড় করিয়া ভারতবর্ষের উপকারের চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। গত বৎসর এই চেষ্টা আমি লণ্ডনে ও জেনিভাতে যতদূর সম্ভব করিয়াছি, ফলও বোধহয় কিছু ফলিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে পুনর্বিচার-সভার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছে। এ বৎসর যে সকল ভারতবাসী রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স, ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স, কিম্বা জেনিভা লিগ্ অফ্ নেশন্সে (League of Nations) প্রতিনিধিরূপে যাইবেন, তাঁহাদের সকলের এ বিষয়ে অতি গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং জেনিভা গমন করিতেছেন; তিনি চেষ্টা করিলে অনেক ফল ফলিতে পারে। এ সকল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণ যে যাহা করিতে পারেন করুন, তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা কন্‌ফারেন্স বৈঠক বসিলে অপেক্ষাকৃত মঙ্গল সম্ভাবনা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীগণ মহাত্মা গান্ধীর তদুপলক্ষে উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছেন—এ প্রার্থনা সমীচিন।

জুলাই মাসের শেষে ও আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে বোম্বাই সহরে লিবারেল ফেডারেশন সভার বৈঠক হইয়াছিল; সেখানে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেল দলের যে সকল লোক রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিরূপে যাইতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, যে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন

বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক ইংরাজ আছেন—তিনি প্রিটোরিয়ার বিশপ; তাঁহার ফটোগ্রাফ "প্রবর্ত্তকে"র কর্ত্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্ত্তি, অকুতোভয়, ধর্ম্মপ্রাণ, ন্যায়তৎপর এই খৃষ্টীয় বিশপের আনুকূল্যে অনেক সুফল সম্ভাবনা।

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের পর শীতকালে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রীষ্মকালে ভারত-সচিব স্যার ফজলী হোসেন তাঁহার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাজপাই সাহেব, স্যার জর্জ্জ করবেট এবং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত-সমস্যা মীমাংসা চেষ্টায় নেটালে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ-সভা করিবেন। এ সময়ে গান্ধী মহাত্মার সেখানে উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়।]

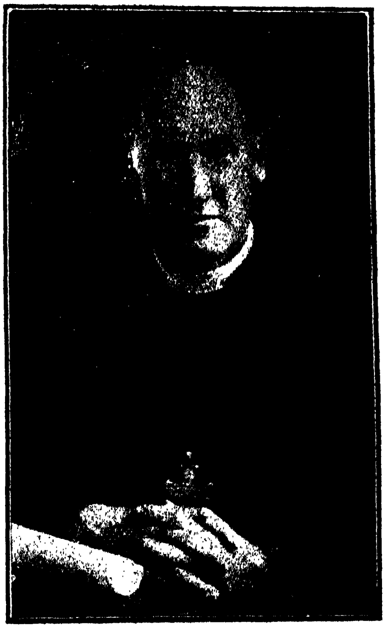
ডার্ব্বাণে ৫ ঘণ্টা, জোহানেসবার্গে চারদিন, প্রিটোরিয়ায় তিন দিন, কিম্বার্লীতে দুই দিন—বাকী কয়েকদিন রেলওয়েতে কাটিয়াছে।

সকল স্থানেই রেলওয়ে হোটেল, মোটর ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমাদের সম্মান ও সুবিধার জন্য হইয়াছে; সকল স্থানেই ভারতীয় অধিবাসিগণ আমাদের আরামের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছে, যতদূর সম্মান দেখাইবার দেখাইয়াছে, অল্পদিনের মধ্যে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই আমি তাহাদের বন্দোবস্তে তাহাদের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছি।

৪ দিন হইল কেপটাউনে পৌছান হইয়াছে; তিলার্দ্ধ সময় নাই; দিন রাত কথা, কাজ অকাজ চলিয়াছে। অন্য স্থানের অপেক্ষাও এখানে ভারত-বাসিগণের মধ্যে দলাদলি বেশী, তাহা মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে, তাহার মধ্যে যথাসাধ্য কাজের আয়োজন হইতেছে; ভ্রমণ-কাহিনী পূর্ণভাবে লেখা অসম্ভব। প্রকাণ্ড একখানা গ্রন্থ না লিখিতে পারিলে ডার্ব্বাণ, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, পোচেস্‌ট্রুম, কিম্বার্লী, কারু ও কেপ-টাউনের যথেষ্ট বর্ণনা সম্ভব হইবে না।

ডাক্তার গুল (Gool) এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তাঁহার পিতামাতা ও ভগ্নীগণের যত্নে আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত। হোটেলে বাস করিব না, তাঁহাদের যত্নে এ প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

হুগলী জেলার অনেকগুলি মুসলমান এখানে বহুকাল আছে। ইহারা চিকণের কাজের ব্যবসা লইয়া আসিয়াছিল; এখন হকারের (ফিরিওয়ালার)



প্রিটোরিয়ার বিশপ

কাজে মাসে পঁচিশ ত্রিশ পাউণ্ড রোজগার করে। অন্য ভারতবাসীও যতদূর সম্ভব যত্ন করিতেছে; বাঙ্গালীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইলেও যথেষ্ট আত্মীয়তা করিতেছে।

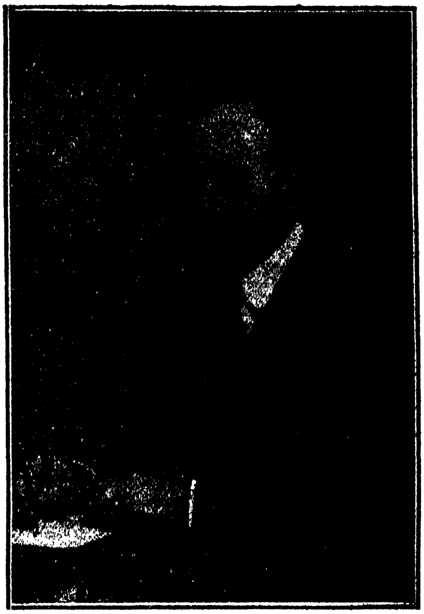
রোটারী ক্লাব হইতে রয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার ডন্ সাহেবের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এরূপ স্থানে ইহা বড় গৌরবের কথা; সেই জন্য সে সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর—মহাপ্রান্তর। গাছ পালার বাড়াবাড়ি নাই, ছোটখাট ঝোঁপ, ফণীমনসা ইত্যাদির প্রাচুর্য্য। সামান্য ক্ষেত খোলা কোথাও দেখা যায়। চাষবাস থাক না থাক, তারের বেড়ায় প্রকাণ্ড সব ক্ষেত ঘেরা, কেহ যেন দখল না করিতে পারে। পাহাড়ের নীচে, পাহাড়ের গায়ে, সমতলে ক্রোশের পর ক্রোশ শত শত ক্রোশ জমি পড়িয়া রহিয়াছে; আঁচড়াইলে ফসল হয়; এমন সব জমি পড়িয়া রহিয়াছে; চাষীর অভাবে চাষ হয় না, কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। কালা কাফ্রীর জমি কিনিবার বা খাজনা করিয়া লইবার অধিকার নাই, ভারতবাসীরও নাই। সাদা অধিবাসী শুদ্ধ ইংরাজ বা ডচ্ নয়; সাদা চামড়া লইয়া গ্রীক, ইহুদী, রাশিয়ান যে যেথান হইতে আসিয়া জুটিয়াছে, সে তাহা দখল করিয়া ঘিরিয়া বসিয়া আছে; লোকবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল কিছুই নাই, অথচ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। শ্বেতরাজ্য এই প্রকাণ্ড মহাদেশে এইরূপে স্থাপিত, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী হইবে—অবিবেকী শ্বেতঅধিবাসীর ইহাই ধারণা। তাহা হইবার নয়, হইবে না—যেখানে পারিয়াছি দৃঢ়কণ্ঠে একথা স্বতঃ পরতঃ বলিয়াছি, বলিতেছি ও বলিব। তবে যে কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে একথার প্রকাশ্য আলোচনা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, উচিত নয়; তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিব্রত হইবে এবং আমাদের দেশের লোকেরও ক্ষতি হইবে।

Broad-cast বক্তৃতায় কেপটাউনে এই কথা মোলায়েম ভাবে বলিয়াছিলাম; "Cape Times" সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসীর নিকট শ্বেত-অধিবাসীর বিপদ্ নহে, বিপদ্ যাহা কিছু তাহা আদিম কাফ্রী অধিবাসিগণের নিকট। তাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পাইবার চেষ্টা ক্রমশঃ করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা লাভও করিতেছে। যদি শ্বেতবাসিগণের অবিবেচনায় বিপদ্ হয়, তবে এই কাফ্রী অধিবাসীগণের নিকট হইবে, মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর নিকট নয়। ভারতবাসীর নূতন আমদানী বন্ধ হইয়াছে; ১,৬০,০০০ মাত্র ভারতবাসী সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে—স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা সবই ইহার মধ্যে। তাহারা অধিকাংশ অশিক্ষিত অতি দরিদ্র, ভারতবর্ষ তাহারা বহুকাল ত্যাগ করিয়াছে। প্রায় শত-করা সত্তর জন এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাদের স্থান নাই; জেলা, গ্রাম, কুটুম্ব, কাহারও নাম পর্য্যন্ত অধিকাংশ লোক জানে না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া কোথায় তাহারা দাঁড়াইবে জানে না; সেখানে তাহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে গণ্য হয় ও হইবে। যাহারা বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের অসুবিধা যথেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত অধিবাসিগণ তাহাদের যেন তেন প্রকারেণ বিদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। জাহাজ-ভাড়া, গাড়ী-ভাড়া, ভারতবর্ষে "স্থিতবিত" হইবার জন্য দশ বিশ পাউণ্ড মূলধনের লোভ দেখাইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার লোক গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে এখান হইতে বিদায় হইয়াছে। আফ্রিকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে তাহাদের অসুবিধা অধিক, তজ্জন্য তাহারা আর যাইতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্য আইনের কৌশলে তাহাদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা হইতেছে; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে। সামান্য কুলী মজুর দোকানদার হইয়া, কিছু কিছু ক্ষেত খোলা করিয়া তাহারা সংসারযাত্রার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আলস্য

জানে না, মদ খায় না, জুয়া খেলে না; চরিত্রগত দোষ তাহাদের নাই; চুরি, জুয়াচুরি, মামলায় তাহারা যায় না। সামান্য লাভে কাজ করে; যাহারা তাহাদের সহিত কাজ কারবার করে সকলেই তাহাদের উপর তুষ্ট, তাহাদিগকে চায়, তাহারা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইলে জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে বলে, নানা অসুবিধা হইবে মনে করে; অথচ সাদা লোকে এই সাদা কথাটা মুখে স্বীকার করে না, প্রকাশ্যে বলিতে রাজী নয়। ফেউ লাগার মত ভারতবাসীর পশ্চাতে সকলে লাগিয়াছে। ভারতবাসীর বিনাশ ও ধ্বংস তাহাদের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য; স্বতঃ পরতঃ তাহা সাধন করিবে। Reyburn নামে একজন ইউনিয়ন পার্ল্যামেণ্টের মেম্বার কাগজে স্পষ্ট লিখিয়াছে—"This may not be fair, but we do not care"—স্পষ্ট হউক, অস্পষ্ট হউক এই একমাত্র ধূয়া।

কেপটাউনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমরা এক রকম সঠিক জানিয়াই বাহির হইয়াছি, যে পার্ল্যামেণ্টের ও গভর্ণমেণ্টেরও মত তাই এবং আমাদের চেষ্টা কোন ক্রমেই সামান্য বিষয়েও ফলবতী হইবে না। কেবল গভর্ণর জেনারেল Earl of Athlone কিছু মাত্র অনুকূল—তাহাও ইংলণ্ডের খাতিরে; কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা কিছুমাত্র এখানে নাই এবং ইংলণ্ড গভর্ণমেণ্ট নামে ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাদের অনুকূলে সে ক্ষমতার পরিচালনা করিবে না। গত বোয়র যুদ্ধের উপলক্ষ হইয়াছিল, ডচ্‌দিগের দ্বারা ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার ও অনাচার। এখন ইংরাজ ও ডচ্ অধিবাসিগণ অন্যান্য সকল বিষয়ে মতে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই বিষয়ে "এক জীউ এক প্রাণ" হইয়া ভারতবাসীর সমস্ত অধিকার ক্রমশঃ হরণ করিয়াছে এবং করিবে। ১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই বিষয়ের বিষম প্রতিবাদ হয়। বহুদিনব্যাপী Passive Resistance হয়; শত শত নরনারী জেলে নির্য্যাতিত হয়। সপুত্র সস্ত্রীক গান্ধী মহারাজ জেলে যাইয়া মরণাপন্ন হয়েন। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী Smutts'এর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপিত হয়, যে ভারতবর্ষ হইতে আর কেহ রোজগারের জন্য এখানে আসিবে না, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার

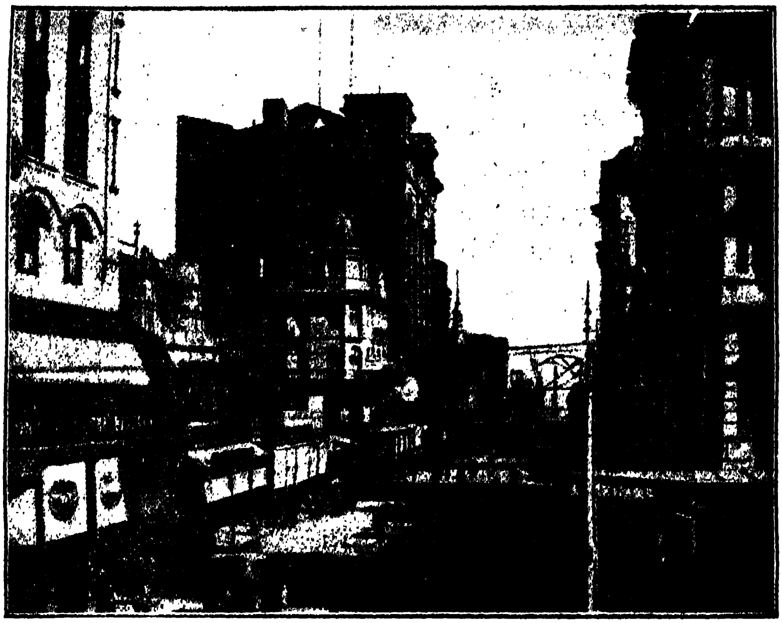


লর্ড আথলোন

কিছুমাত্র থাকিবে না এবং তাহাদিগকে আর অন্যরূপে বিপদগ্রস্ত বা অধিকারচ্যুত করা হইবে না। এ সন্ধি সত্ত্বেও, ১৯১৪ সাল হইতে ভারতবাসীর উপর নানা বিষয়ে নির্য্যাতন চলিতেছে; তাহাদিগকে স্থানান্তর করিয়া, তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া সহর ও গ্রাম হইতে দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে জন্তু জানোয়ারের মত নির্দ্দিষ্ট ঘেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমাগত

চলিতেছে। আফ্রিকান্ অধিবাসিগণের সহিতও এই ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ল্যাঙ্গ কমিশন (Lange Commission) নামে কমিশন স্থির করে, যে এরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া ভারতবাসিগণকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা অন্যায়। এখন সে কথা ঠেলিয়া, ১৯১৪ সালের গান্ধী স্মাটস্ (Gandhi—Smutts agreement) সন্ধির বিপরীতে ভারতবাসীর সামান্য যাহা অধিকার আছে, তাহারও প্রত্যাহারের চেষ্টা হইতেছে।

আমাদের ডেপুটেশনের এ সকল কথার প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার নাই। আমাদের চির-সুহৃদ্ এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব (Rev. Mr. Andrews) আমাদের পূর্ব্ব হইতে আফ্রিকায় আসিয়া সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে ও প্রকাশ্য সভায় এবং গণ্যমান্য লোক জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া এ সকল বিষয়ে আলোচনা ও বাদানুবাদ করিয়াছেন; তাহাতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। তাঁহার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া "Cape Times"এর মত সংবাদপত্রে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বেও কয়েকবার তিনি এখানে আসিয়া অকুতোভয়ে এইরূপ কার্য্য করিয়া অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে শুধু অপমান নয়, প্রহার ও অত্যাচার পর্য্যন্ত সভ্য শ্বেতঅধিবাসিগণ করিয়াছেন ও করাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে পশ্চাদপৎ হন নাই। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শীঘ্র বিলাতে যাইয়া এ বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করিবেন এবং নূতন বড়লাট উড (Mr. Wood) (লর্ড আরউইন)কে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ত কিছুই করিতে পারেন না—আমাদের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফললাভের কোন সম্ভাবনাই নাই এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সহায়ে এ বিষয়ে গুরুতররূপে হাত দিয়া অপদস্থ হইতে সম্মত হইবেন, তাহা বোধহয় না। "হিতবাদী" পত্রের স্তম্ভে বিদুষী মুসলমানী সোফিয়া খাতুন যথার্থই লিখিয়াছেন, যে আমাদের ডেপুটেশন আসল



কেপটাউনের একটী রাস্তা

কথাটা "ধামাচাপা" মাত্র দিয়াছেন; এখন 'ধামা' খুলিয়া তাহা মীমাংসা করিতে হইবে। সে সময়ে "ধামাচাপা" দিতে না পারিলে, সাময়িক সমূহ বিপদের গুরুতর সম্ভাবনা ছিল। সে সম্ভাবনা এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। অক্টোবর মাসে Imperial Conference'এর অধিবেশনের কথা হইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেখানে কথা তুলিয়া যদি কিছু কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে যাহা হয় হইবে; নতুবা ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

আবার বিপদের উপর বিপদ্ এই, যে সামান্য সংখ্যক ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা আছে তাহাদের মধ্যে, বিশেষতঃ কেপটাউনে বিষম মত-পার্থক্য। একদল মনে করিতেছে ও বলিতেছে, যে ভারতবর্ষ হইতে গোলমাল করিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকান্ গভর্ণমেণ্ট ও লোকেদের নিকট অধিকতর বিপন্ন করা উচিত নহে; লাথি ঝাঁটা খাইয়া তাহারা যাহা হয় করিয়া এখানে হাতে পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া লইবে; যখন ভারত-গভর্ণমেণ্ট অথবা ভারতপ্রতিনিধিগণ দ্বারা তাহাদের বিপদ নিবারণের কোন উপায়ই নাই, তখন বিপদ্ আর বাড়াইয়া কাজ নাই। তাহারা যাহা হয় করিয়া কাদায় গুণ পাতিয়া পড়িয়া থাকিবে। বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতায় মিটিং করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, Retaliation'এর ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করা তাঁহাদের মত নয়। বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতায় যে সব মিটিং ও Resolution হইয়াছে, তাহার সংবাদ এখানে আসিয়া অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

Retaliation—অর্থাৎ ইটের বদলে পাটকেল মারার অবকাশ ভারতবাসীর পক্ষে অতি অল্প। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে যে আইন পাশ হইয়াছে কাউন্সিল-অফ্-ষ্টেটে আমিই তাহার প্রস্তাব করি। আইন ত পাশ হইয়াছে; কিন্তু Retaliation'এর রাস্তা বড় দেখা যায় না। সে বিষয়ে তদন্ত করাও আমাদের ডেপুটেশনের অন্যতর কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ও হীরক ইউরোপের বাজার হইয়া ভারতবর্ষে যথেষ্ট যায়। তাহা বন্ধ করিতে পারিলে, কিছু কাজ হইতে পারে; কিন্তু তাহা করে কে এবং হইবে কিরূপে! দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা করাচি ও বম্বে বন্দরে গিয়া ভারতবর্ষের কয়লা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রিত হইতেছে; Sukkur Barrage প্রভৃতি প্রকাণ্ড পূর্ত্তকার্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করা হইতেছে। সে আমদানী বন্ধ হইলেও বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে বহুসংখ্যক ভারতবাসী কর্ম্ম করে, তাহাদের অন্ন ত প্রথম যাইবে; তারপর তাহাদের প্রয়োজনীয় চাউল, দাল, ঘি, ময়দা, কাপড় যাহা ভারতবর্ষ হইতে আসে, হয় তাহার আমদানী বন্ধ হইবে, না হয় দারুণ মাশুল বসাইয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিবে। অতএব Retaliation'এর পথ কোথায়?

Gunny (গুণ চটের থলিয়া) যথেষ্ট আমদানী হয়, পাট এখনও কোথাও পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্ব আফ্রিকায় Tanganika প্রভৃতি স্থানে Seisal নামে পাটের মত এক রকম জিনিষ চাষের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দামে ও গুণে তাহা পাটের কাছেও আসিতে পারিবে না। মনে কর—Gunny'র আমদানী বন্ধ হইল, তাহাতেও কাজ হইবে না; কারণ ভারতনির্য্যাতনে দক্ষিণ আফ্রিকা এতই বদ্ধপরিকর, যে তাহার "বাজরা" "জনেরা", "ভূট্টা" (Maize mealy) যাহা কিছু ইউরোপে চালান হইয়া তাহার ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি

করিতেছে এবং যাহার জন্য Gunny'র যথেষ্ট প্রয়োজন, তাহা Gunnyতে না পাঠাইয়া জাহাজের খোলে খোলা অবস্থায় পাঠান হইবে; না হয় ডাণ্ডি, লিভারপুল ইত্যাদি স্থান হইতে ডবল দাম দিয়া Gunny খরিদ করা হইবে। ভারতবর্ষ ডাণ্ডিতে পাট বা থলিয়া পাঠাইবে না, এ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের নাক কাটিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিবে—ইহা তো বোধ হয় না। অতএব যথার্থ Retaliation'এর অবকাশ অতি অল্প। যেখানে যথার্থ ক্ষতি করা অসম্ভব, সেখানে শুধু আলপিন ফুটাইয়া ফল নাই।

আমি নিজে কাউন্সিল-অফ্-ষ্টেটে Retaliation অস্ত্র প্রয়োগের কথা তুলিয়াছিলাম; কিন্তু বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানে এখানে তাহার পথ ত দেখিতে পাইতেছি না।

ডার্ব্বান, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কিম্বার্লী, কেপটাউন সকল স্থানেই এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা গবেষণা যথেষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিগণ এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নয়; তাহারা বলে, এখন ওসব কথা থাক্।

অতএব আমাদের কার্য্য অবসান। ২২শে জানুয়ারী (১৯২৬), ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইবে। Governor General'এর Speech from the Throne'এ বোধহয় সব কথার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই কথা বলিতে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তদন্ত সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে। Bill, after Second Reading, Select Committee Reference হইলে ইচ্ছা করিলে ভারতপ্রতিনিধি সে কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন নিবেদন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইবে না এবং তাহাতে আমরা স্বীকৃত হইলে ফলতঃ কিছুই হইবে না; অপমান ও অশ্রদ্ধা যথেষ্ট হইবে। আমার দৃঢ় মত এই, এবং ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বরদিগকেও তাহা জানাইয়াছি—তাঁহারাও এ বিষয়ে একমত; ভারত গভর্ণমেণ্টকেও তাহা জানান হইয়াছে, তাহারাও একমত। যদি Second Reading'এর পরে না হইয়া পূর্ব্বে



কেপটাউনের সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাধারণ দৃশ্য

Select Committee হয় তাহা হইলে আইনের মূলমন্ত্র (principle) সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও হইতে পারে। জোর করিয়া জন্তু জানোয়ারের মত নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার জেদ ছাড়িয়া দিয়া অন্য উপায়ে যদি তাহাদের মন্তব্য সাধিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের আপত্তি করা উচিত নয়; কিন্তু এই সামান্য বিষয়েও যে তাহারা ত্রুটি স্বীকার করিবে, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না।

সকল স্থানেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, যে ভারতবাসীরা ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট সাধুতা ও সৌজন্য প্রকাশ করে। তাহাদের প্রতি অভিযোগ এই, যে তাহারা অল্প-লাভে সন্তুষ্ট, ধার দিয়া খরিদ্দারকে বাধ্য করে, ইউরোপীয় ধাঁচায় থাকে না ও নিজেদের ও চাকর-বাকরের উপর যথেষ্ট খরচ করে না; কাজেই সাদা দোকানদার তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠে না। উপযুক্ত পরীক্ষা করিলে প্রকাশ হইবে ও হইয়াছে, যে তাহাদের বিরুদ্ধে সকল কথাই অমূলক। তাহারা কাল, এই তাহাদের অপরাধ। ভারতীয় দোকানদারের সংখ্যা, ভারতীয় অধিবাসিগণের সংখ্যা বাড়িতেছে না, কমিতেছে; তাহাদের খরচ যত অল্প মনে করা যায়, তাহা নয়; প্রায় ইউরোপীয়দিগেরই মত নানা কারণে তাহাদের খরচ বেশী—একথা Lange Commission তদন্তের পর স্বীকার করিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাহারা যে পশ্চাৎপদ তাহা স্বীকার না করিবার যো নাই; কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ তাহাদের নহে। গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীতে ও Licensing Board-এ (Cape town ছাড়া) তাহাদের প্রতিনিধি নাই। কাজেই তাহাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কেহ নাই। জোহেনাসবার্গে ও প্রিটোরিয়াতে ভারতবাসীদের সাধারণ বাসস্থান ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখিয়া কান্না আসে। তাহাদের মধ্যে ধনকুবের কেহ কেহ আছে; কিন্তু তাহারাও দেশবাসীর অভাবের প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দৃষ্টিহীন—দুঃখ এই। গভর্ণমেণ্টের ও মিউনিসিপ্যালিটীর দোষের কথা যেমন বলিতেছি, তেমনি একথাও বলিতে হয় ও বলিতেছি। কিন্তু যাহাই বল, তাহারা ভারতবাসী হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার লোক; দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য জন্য তাহাদিগকে আনা ও রাখা হইয়াছে। এখন ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে চক্ষু টাটাইলে চলিবে কেন? তাহাদের রাজকীয় অধিকার Political, Municipal and Civic Rights বজায় থাকিলে তাহারা প্রতিনিধি সাহায্যে Parliamentএ, Municipaltyতে ও Licensing Boardএ নিজ নিজ স্বার্থ বজায় করিতে পারিবে। তাহা না থাকাতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে তাহাদের দুঃখ Union Governmentকে জানাইতে হইতেছে। বড় মানুষের ঘরে না বুঝিয়া গরীব ব্রাহ্মণ কন্যা বেচিয়া বড় মানুষের জ্ঞাতি কুটুম্বের দ্বারা কন্যার সন্তানসন্ততির উপর অত্যাচার যেমন বন্ধ করিতে পারে না, আমাদের দশাও তাই। বড় মানুষের দেউড়ী কিম্বা খিড়কী হইতে আমাদের এখন দৌহিত্র ও দৌহিত্রসন্তান-গণের সংবাদ "তত্ত্ব" লইতে হইতেছে। সাশ্রুনয়নে গললগ্নীকৃতবাসে ভিক্ষা মাগিতে হইতেছে, তাড়না খাইতে হইতেছে। বাস্তবিক অবস্থা এই!

কুমারের মাটীর মত ভারতবাসীকে মাথায় করিয়া আনিয়া এখন পায়ে দলন করা হইতেছে। তাহাকে না হইলে চলিবে না, তাহার দ্বারা অনেক সুবিধা হইয়াছে ও হইবে জানিয়াও বিষম ভ্রমে পড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত অধিবাসী এই অমানুষিক নির্য্যাতনের চেষ্টা করিতেছে। ভোটের জোরে আইন পাশ হইবে, অত্যাচার বাড়িবে, হয় ত কিয়দংশ ভারতবাসী আইনের প্রতিবাদ-চ্ছলে পুনরায় Passive Resistance আয়োজন করিবে; কিন্তু তাহাতে ফল-সম্ভাবনা কম। অধিকাংশের প্রতি অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না।

(ক্রমশঃ)

পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সময়-বিশেষে সকল দেশই সকল দেশকে আক্রমণ করিয়াছে; এমন দেশ প্রায় নাই, যে তাহা এককালে রাজা হইয়া অপর দেশের উপর রাজত্ব না করিয়াছে; বস্তুতঃ এক এক কালে এক এক দেশ করিয়া প্রায় সকল দেশই এককালে পরের উপর রাজত্ব করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসে লেখা পড়ার মধ্যে যাহা আছে, তাহা দেখিলে ওরূপ অনুমান করিবার প্রবৃত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

অপরের কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের ভারতবর্ষে নানা দেশের মধ্যে এই ব্যাপারের অসদ্ভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। বঙ্গ, মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, কাণ্যকুব্জ, মালব, গান্ধার, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় সবই এক এক সময় সম্রাট্ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কিছুদিন হইতে ভারতের ভাগ্যে এমনই ঘটনাপরম্পরা ঘটিয়া আসিতেছে, যে মনে হয়, ভারতে বুঝি আর প্রাচীনভাব থাকিবে না, প্রাচীন ভারত বোধ হয় বিলুপ্ত হইবে। হয় ত সেণ্টপিটাসবার্গ, পেট্রোগার্ড, লেনিসগার্ড'এর মত কালক্রমে ভারতের নামটাও বুঝি বদলাইয়া যাইবে। বর্ত্তমান ভারতে যে সব ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে ভারতবাসীই তাহার পূর্ব্বভাব পরিত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর। আজকাল অনেকেই বলিতেছেন—"পুরাতন ভাব সব মুছিয়া ফেল, পুরাতন কথা সব ভুলিয়া যাও, পুরাতন না ভুলিলে আর আমাদের সত্তা পর্য্যন্ত থাকিবে না ইত্যাদি।"

এখন দেখা যাউক, এই ভাবটা ভাল কি না, এবং কেনই বা আমাদের এই ভাবটা আসিল! আমাদের উপর দিয়া স্মরণাতীতকাল হইতে অনেক ঝড় ঝাপ্‌টা চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কই এরূপভাব বোধ হয় কখন ভারতবাসীর হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ভারতবাসী নিজের নিজত্ব ত্যাগে উদ্যত কখন হয় নাই।

এখন প্রাচীন ভাবটা ভাল কি মন্দ—এই বিষয়টা ভাবিলে কি মনে হয়, তাহাই দেখা যাউক। প্রাচীনভাব ও বর্ত্তমানভাবের প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রাচীন কালটা পরলোকচিন্তাপ্রধান ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালটা দেখিলে মনে হয়, ইহা ইহলোকচিন্তাপ্রধান হইয়াছে। প্রাচীনকালেও যে ইহলোকের চিন্তা ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু ইহলোকচিন্তাটা গৌণভাবে ছিল, মুখ্য চিন্তা ছিল—পরলোকবিষয়ক। বর্ত্তমানে কিন্তু পরলোকচিন্তা গৌণ এবং ইহলোক-চিন্তাই মুখ্য। আজকাল আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কিছু করি, দানধ্যান যাহা কিছু করি, শিল্পবাণিজ্য যাহা কিছু করি, বিদ্যাশিক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা যাহা কিছু করি, সকলেরই উদ্দেশ্য—সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সকলেরই লক্ষ্য—দু'পয়সা কিসে হয়। পূজাপাঠ, জপতপ, ব্রতউপবাস প্রায় একপ্রকার অন্তর্দ্ধান করিতে বসিয়াছে, যাগযজ্ঞাদি ত প্রায় একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাহ্নিক এখন সময় নষ্ট করার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; উপনয়নটা আছে, কিন্তু তাহা নামমাত্র; বিবাহ আর সংস্কার নহে, উহা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অন্যতম উপায় বিশেষ। আর

সেইজন্য উহা উঠাইয়া দিবার চিন্তাও মনোমধ্যে আলোচিত হইতেছে। আজ আদর্শ—আমাদিগের পাশ্চাত্য জগৎ; লক্ষ্য আমাদের—পাশ্চাত্যসভ্যতা, পাশ্চাত্য হাবভাব ইত্যাদি।

আচ্ছা, ইহার ফল কি? ইহার ফল, ইহার প্রবর্ত্তকগণ বলেন—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা; সুতরাং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি ইহার ফল। বাস্তবিক কথাটা অতি সত্য; ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাধীনতা না থাকিলে কোন জাতিই বাঁচিতে পারে না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত দূরের কথা! কিন্তু তাহা হইলেও যেরূপ হইয়া বা যে অবস্থা লাভ করিয়া আমরা এই স্বাধীনতা চাহিতেছি বা স্বাধীন হইয়া যেরূপ হইতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই রূপটা বা সেই অবস্থাটা কত দূর বাঞ্ছনীয়, তাহা ত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

এই বিষয়টা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই—আমরা যে ভাবটা আমাদের স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও পরে চাহিতেছি, অর্থাৎ যে ভাবটাকে স্বাধীনতার উপায় ও ফলরূপে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সে ভাবটা কিন্তু আমাদের অভীষ্ট নহে; কারণ এই ভাবটা আজ আমাদের পাশ্চাত্য ভাবেরই অনুরূপ ভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতারই প্রতিচ্ছায়াবিশেষ—ইহা আজ পাশ্চাত্যগণও ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না; যেহেতু তাঁহারাই বুঝিতেছেন—এই পাশ্চাত্য ভাবটী কোন জাতির কি স্থায়িত্ব, কি উন্নতির অনুকূল নহে। অবশ্য আমরা ভাবি, এই পাশ্চাত্যের ভাবটী যদুবংশ-ধ্বংসের পূর্ব্বে যদুবংশের ভাববিশেষ। ইহার পরিচয় যদি দিতে হয়, তাহা হইলে আমরা গীতার কথার দ্বারাই দিতে পারি। গীতায় ১৬শ অধ্যায়ে ইহাকে আসুরসম্পদ্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে, এই আসুর ভাবটী আজ পাশ্চাত্য সমাজে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া থাকে এবং তাহা প্রবল বেগে আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। গীতার সেই শ্লোকগুলি এই—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

অসুরস্বভাব পার্থ! যাহাদের হয়।
শৌচ সত্য বা আচার তাদের না রয় ॥ (২)
নাহি জানে ধর্ম্ম যাহা প্রবৃত্তিবিষয়। (৩)
না জানে অধর্ম্ম যাহা নিবৃত্তিবিষয় ॥ (৪)

প্রবৃত্তির যোগ্য যাহা তাহা ধর্ম্ম হয়।
নিবৃত্তির যোগ্য যাহা অধর্ম্ম সে হয়॥
এ সব কিছুই তারা কিছু নাহি বুঝে।
ঐহিক সুখের তরে সংসারেতে মজে॥
জগৎ অসত্য বলি' তারা করে জ্ঞান।
তাহে অস্বীকার করে বেদাদি প্রমাণ॥ (৫)
অথবা অস্থির বলি' জগৎ সংসার।
ভোগ মাত্র বাঞ্ছা করে অতি দুর্নিবার॥
ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্মের ব্যবস্থারহিত।
তাহা অপ্রতিষ্ঠ বলি' ভাবয়ে নিশ্চিত॥ (৬)
যাহা কিছু ঘটে—হয় স্বভাবের ফলে।
ভাবিয়া ঈশ্বর নাহি মানে কোন ছলে॥ (৭)
জগৎ-উৎপত্তি হেতু-নির্ণয়ের তরে।
স্ত্রীপুরুষসংযোগেরে হেতু মনে করে॥ (৮)
তারো হেতুনিরূপণ আবশ্যক হলে।
স্ত্রীপুরুষ-কামকেই সৃষ্টিহেতু বলে॥ (৯)
এইরূপ দৃষ্টি তারা করি' সমাশ্রয়।
নষ্টবুদ্ধি হ'য়ে ক্রমে সদ্‌বুদ্ধি ত্যজয়॥ (১০)
এইরূপ অল্পবুদ্ধি হয়ে' ধনঞ্জয়!
তারা মানে এক মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়॥ (১১)
তাহে হয় তারা উগ্রকর্ম্মপরায়ণ।
সর্ব্বভূতে দয়াধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন॥ (১২)
জগতের শত্রু হয়ে জগতের নাশে।
সতত প্রবৃত্ত রয় তারা পরিশেষে॥ (১৩)
দুষ্পূর কামনা, দম্ভ মদ অভিমান।
আশ্রয় করিয়া তারা ওহে মতিমান্॥ (১৭)
মোহবশে দুরাগ্রহসমাযুক্ত হয়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব আরাধনাযুত রয়॥ (১৯)
এই মন্ত্রে এই দেব আরাধনা করে'।
মহানিধি লাভ হবে ভাবয়ে অন্তরে॥
কভু বা মারণ, কভু স্তম্ভন মোহন।
উচাটন, কভু বশীকরণ সাধন॥

এইরূপ নানা ঘোর কর্ম্মে হয় রত।
তাহে মদ্যমাংস অপবিত্র সেবারত॥
যতদিন মৃত্যু নাহি করে আগমন।
অসীম চিন্তায় তারা থাকি' নিমগন॥ (২০)
কাম উপভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ।
কামভোগ পুরুষার্থ ভাবি' অনুক্ষণ॥ (২২)
কত শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া।
কামক্রোধে বশীভূত নিয়ত থাকিয়া॥ (২৪)
কামভোগ চরিতার্থ করিবার তরে।
অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে॥ (২৫)
মনোমাঝে করে তারা কতই চিন্তন।
অদ্য মম লাভ হল এই সব ধন॥
এই মনোরথ পূর্ণ হইবে আমার।
এই ধনে পূর্ণ রয় আমার ভাণ্ডার॥ (২৬)
পুনঃ এই ধন মম হবে উপার্জ্জন।
আমি এই শত্রু এবে করেছি নিধন॥ (২৭)
অপর শত্রুও আমি করিব বিনাশ।
আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ জগতে প্রকাশ॥ (৩০)
আমি সুখী বলবান্, আমিই ঈশ্বর।
আমি ধনী, আমি মানী কুলীনপ্রবর॥ (৩৬)
আমার সদৃশ আর আছে কোন্‌জন।
দীন জনে আমি দান করিব অর্পণ॥ (৩৮)
যাগাদি করিব আমি দৈবের উদ্দেশ্যে।
আমোদ করিব আমি মনের হরিষে॥ (৪০)
এরূপ অজ্ঞানে তারা বিমুগ্ধ হইয়া।
নানা ইষ্ট বিষয়েতে প্রবৃত্ত থাকিয়া॥
তাহাদের চিত্ত রহে বিভ্রান্ত সতত।
এরূপে হইয়া মোহজালে সমাবৃত॥ (৪২)
কামভোগে রত রহে তারা অনুক্ষণ।
দারুণ নরকে শেষে হয় নিমগন॥
নিজেকে নিজেই মহা পূজনীয় ভাবে।
সাধুগণ যারে কিন্তু সেরূপ না ভাবে॥ (৪৪)

নম্রতাবিহীন তাহে সেই জন হয়।
ধনহেতু মান মদ সমন্বিত রয় ॥ (৪৬)
অবিধিপূর্ব্বক আর দম্ভসহকারে।
যাজ্ঞিকাদি নাম মাত্র লভিবার তরে ॥ (৪৭)
সেই জন যজ্ঞ আদি করে অনুষ্ঠান।
যাহা কিন্তু নাহি হয় যজ্ঞের সমান ॥
বল দর্প, কাম ক্রোধ আর অহংকার।
সমাশ্রয় করি' তারা ওহে গুণাধার ॥ (৪৯)
নিজ দেহে অবস্থিত অন্তর্য্যামিরূপে।
পরদেহে অবস্থিত অবতাররূপে ॥
আমাকে প্রকৃষ্টরূপে দ্বেষ করে' থাকে।
যে হেতু অসূয়ারূপ প্রবেশে তাহাকে ॥ (৫০)
হিত উপদেশ যেই দেয় গুরুগণ।
তাহাতে যে অজ্ঞানাদি দোষ উদ্ভাবন ॥
তাহাই অসূয়া দোষ ওহে ধনঞ্জয়।
তার বশীভূত হয়ে মোর দ্বেষী হয় ॥

—পদ্যগীতা।

এই স্থলে যে পঞ্চাশটী ভাবের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি আজ পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে বোধ হয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিলে অত্যুক্তি না। আর এই ভাবগুলি আজ আমাদের সমাজেও প্রবলবেগে প্রবেশলাভ করিতেছে। আর এই আসুর ভাবের ফল কি, তাহাও গীতামধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে—ইহার ফল বন্ধন। যথা—"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায়নিবন্ধায়াসুরী মতা।" অর্থাৎ দৈবীসম্পদের ফল—মোক্ষ এবং আসুরীসম্পদের ফল—বন্ধন।

অনেকে বলেন, পাশ্চাত্য সমাজে দোষ থাকিলেও, পূর্ব্বের সাধারণ মানব হইতে বর্ত্তমানের সাধারণ মানব অনেক পরিমাণে সুখী। যেমন পূর্ব্বে রাবণ রাজাই পুষ্পকরথে আকাশে বিচরণ করিতে পারিতেন; আজ কিন্তু যেই ব্যক্তি দশটী টাকা খরচ করিবে, সেই এরোপ্লেনে আকাশে বিচরণ করিতে পারে। পূর্ব্বের সভ্যতার ফলে যোগী ঋষিই দূরশ্রবণ, দূরদর্শন করিতে পারিতেন; আর আজ রেডিও ও টেলিভিসনে রাস্তার মুটে মজুরও সেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। বস্তুতঃ কথাটা যে একেবারে সত্য নহে, তাহা নহে; কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে বিরাট্ বিরাট্ কলকারখানার জন্য কতলোক যে গৃহহীন কুলি মজুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা কি এই সঙ্গে ভাবা উচিত নহে? আমাদের সমাজের পূর্ব্বকালের একটী দরিদ্র ব্যক্তি আর বর্ত্তমানের একটী দরিদ্র ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন বা নৈতিক জীবন তুলনা করিলে, আমাদের পূর্ব্বের সমাজে সুখ ও পবিত্রতা অধিক ছিল—বেশ বুঝা যায়।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি—স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা যদি পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ করিয়া চলি, তাহা হইলে আমরা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিব না, আমরা পক্ষান্তরে তাহার অসদ্ব্যবহারই করিব। আজ যখন দেশব্যাপী একটা স্বাধীনতার স্পৃহা বলবতী হইয়াছে এবং তাহার জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টাও চলিতেছে, তখন পূর্ব্ব হইতেই ইহার ফল বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। ইহার সদ্ব্যবহারের ফলবিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক—আমাদের মনে এখন এমন ভাব কেন আসিল, যে আমরা আমাদের প্রাচীনের সব জিনিষই পরিত্যাগ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিতে বসিয়াছি; আমরা এখন প্রাচীনের সকলই বিষয় মন্দ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি—কেন আমাদের এত প্রাচীনবিদ্বেষ উপস্থিত হইল?

আমরা দেখিতে পাই, যে যখন আত্মহত্যা করে, সে তখন মরিতেই চাহে। আমরা যখন মুমূর্ষু অবস্থায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করি, তখন আমরা মরিতেই চাহি; এমন কি, যে ব্যক্তি কখনই মৃত্যুচিন্তা করে না, মৃত্যুর নামে অতিশয় ভীত হয়, সে ব্যক্তিও মৃত্যুর প্রাক্‌কালে জ্ঞান থাকিলে মরিতেই চাহে। এজন্য বিজ্ঞগণের একটা উক্তিই আছে "মরিতে ইচ্ছা না করিলে যম লইয়া যান না।" এখন তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমরা যে প্রাচীনের সন্তান, যে প্রাচীন ভাবেরই ফলস্বরূপ, যে প্রাচীন ভাবটা আমদের নিজত্ব, আমাদের জাতীয়তা, আমাদের জীবন, সেই প্রাচীনকে যদি আমরা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কি আমরা জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে জাতীয় মৃত্যুই কামনা করিতেছি না? বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, আমরা যেরূপ প্রাচীন ভাব, প্রাচীন রীতিনীতি, প্রাচীন আচারব্যবহার বর্জ্জন করিয়াছি এবং করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি, তাহাতে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য, আমাদের জাতিগত যে বৈলক্ষণ্য, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা কিছু আছে, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। এখন প্রত্যেক জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য বিনষ্ট হইলে যদি সেই জাতির বিনাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জাতিগত ভাবে আমরা যে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।

আমরা শাস্ত্রচর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছি, পূজা অর্চ্চা শ্রাদ্ধতর্পণ ত্যাগ করিয়াছি, খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্জ্জন করিয়াছি, বেশভূষাও বহুলপরিমাণ পরিত্যাগ করিয়াছি, পূর্ব্বপুরুষের উপর সম্মানবোধ বিসর্জ্জন করিয়াছি, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে অসভ্য অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হই না, আর ইহাতেই তুষ্ট না হইয়া আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের মূল যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃতভাষাকেই স্বেচ্ছাধীন-শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে গণ্য করিবার জন্য প্রযত্ন করিতেছি; পতিপত্নীসম্বন্ধ-চ্ছেদের জন্য আইন করিতে উদ্যত হইয়াছি; অসবর্ণবিবাহ, বিজাতীয়বিবাহ প্রবর্ত্তনে প্রস্তুত হইয়াছি, এমন কি বিবাহসম্বন্ধের উচ্ছেদ সাধনেও সচেষ্ট হইয়াছি। কোন একটা জাতির এই সবগুলি যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে আর পূর্ব্বের জাতি বলা যাইতে পারে? আর এইরূপ হইলে, এই নূতন জাতি কি হিন্দু নামটীও ত্যাগ করিবে না? প্রত্যুত আর্য্য বা হিন্দুনামও যে ত্যাগ করিবে, তাহার নিদর্শন দেখা দিয়াছে। এইজন্য মনে হয়, আমাদের জাতির আজ মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত।

বাস্তবিকপক্ষে কোন জাতির জাতীয়তা যদি বিনষ্ট করিতে হয়, আর তাহার উপায় কি যদি একবার ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—বল-প্রয়োগের দ্বারা একার্য্য সাধন হয় না, অস্ত্র-শস্ত্র বিষাদি প্রয়োগেও একার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্য কোন বাহিক উপায়দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; তবে যদি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া শিক্ষার দ্বারা তাহাদের মতিগতি এবং তাহাদের অন্তরটা বদলাইয়া দিতে পারা যায়, আর তাহার ফলে যদি তাহারাই তাহাদের নিজত্ব ত্যাগ করিতে উৎসাহিত হয়, তাহা হইলেই এই কার্য্যটী সুগম ও সুসাধ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে তাহাই আজ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

আমরা যে সব এবং যে জাতীয় পুস্তক পড়িব, তাহার নির্ব্বাচনভার আমাদের নাই; আমাদের মধ্যে যাহারা আমাদের ভাব অল্পবিস্তর ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদেরই হস্তে এই ভার অর্পিত

হইয়াছে; আমাদের মধ্যে যাঁহারা গুরুস্থানীয় ও পণ্ডিত, তাঁহাদের হস্তে এবিষয়ের কোন ক্ষমতা নাই। প্রাচীন বিদ্যায় যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা প্রাচীন আচারসম্পন্ন, তাঁহাদের নিকট এবিষয় পরামর্শ গ্রহণ করাও হয় না। এই সকল ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের যথোচিত পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় না; সুতরাং দারিদ্র্যবশতঃ ইঁহারা দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী, হীনতেজঃ এবং শক্তিহীন। ইঁহাদের নিকট বিদ্যা শিখিয়া কোন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তি ইঁহাদের পারিশ্রমিকের দশগুণ অধিক পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন; ইহার ফলে সমাজে ইঁহাদের কথার মূল্য থাকে না। পাণ্ডিত্য ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত না হইলে তাহা লোকের আদরণীয় হয় না, ইহা সকলই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। যেমন একই কার্য্য একজন বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তি করিলে বিদেশীর পারিশ্রমিক অধিক হয়, এস্থলেও তদ্রূপ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন পণ্ডিত ও প্রাচীনভাবাপন্ন পণ্ডিত একই শিক্ষকতা করিলে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতের পুরস্কার অধিক হইয়া থাকে। এই যে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সংস্কৃত স্বেচ্ছাধীন পাঠ্য হইতেছে—ইহার নেতা কাহারা? ইহার নেতা কতকগুলি ইংরাজি-শিক্ষিত হেডমাষ্টার এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ স্বেচ্ছাচারী কতিপয় মহাত্মা; এই যে নারী সমাজের পরিবর্ত্তনোন্মুখতা, ইহার নেতা কাহারা? ইহারও নেতা কতকগুলি পাশ্চাত্যশিক্ষিতা মহিলা। ফলতঃ কিছুদিন হইতে আমরা এমনই শিক্ষা পাইয়াছি, যে এখন আমরাই আমাদের নিজত্ব, আমাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আর যে জাতি নিজের আত্মগৌরব বিস্মৃত হয়, তাহার ধ্বংস হইতে কয়দিন বিলম্ব হয়! বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে আমরা একদিন জগতের সকল উত্তম বিষয়ে গুরু ও প্রধান ছিলাম। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে আমাদেরই সন্তান আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বসতি করিতেছে।

যাঁহারা প্রাচীন গৌরব ভুলিয়া, প্রাচীন মহত্ত্ব বর্জ্জন করিয়া মহান্ হইতে চাহেন, তাঁহারা কি একবার ভাবেন না, যে আমরা যাহাদের নিকট অধম হইয়া রহিয়াছি, যাহাদের নিকট পরাজিত বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছি, আমরা যাহাদের দ্বারা রক্ষিত, আমরা যাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া জীবিত, যাহারা আমাদের গুরু হইয়া বসিয়াছেন, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজের শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান ব্যতীত, নিজের মহত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কখনই আমরা বিজয়ী হইতে পারিব না। প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে জয়ের কারণ, কেবল বল নহে, কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, নিজের অজেয়ত্ব জ্ঞান, "আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী" হইব—ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়জ্ঞানও বিজয়ের হেতু হইয়া থাকে। আর আমাদের প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধে আমাদের এই নিজ শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া আমাদের কখনই জন্মিতে পারে না। মল্লযুদ্ধে যখন একজন একজনের বুকের উপর বসিয়া থাকে, তখন কি পরাজিত ব্যক্তি নিজের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করিতে পারে? কখনই নহে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের উভয়ের অতীতের কথা স্মরণ করি, যে সময়ে পাশ্চাত্যগণ আমমাংস ভক্ষণ করিতেন, অঙ্গে উল্কি পরিতেন, তখন আমাদের সভ্যতা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইলে আমাদের এই শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান জন্মিতে পারে; আর শ্রেষ্ঠের সন্তান শ্রেষ্ঠই হয়, এই নিয়মের বলে আমরা যত্ন করিলে আমরা একদিন আবার শ্রেষ্ঠ হইব—ইহাই বিশ্বাস হয়।

আর এই বিশ্বাসের ফলে ভবিষ্য যুদ্ধে আমাদের জয়ের আশা সুনিশ্চিত হইতে পারিবে। অতএব আজ যদি আমাদিগকে আবার উঠিতে হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের অতীত গৌরব বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদের অতীত গৌরব, আমাদের অতীতের আত্ম-মর্য্যাদাই আমাদিগকে আবার উন্নত করিবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে আজ আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টিহীন বা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছি। বর্ত্তমান শিক্ষাই আজ আমাদিগকে জাতীয় নিধনের পথে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাই আমাদিগকে আত্ম-হত্যা করিতে উৎসাহিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য ভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা এতদিন আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছিল। তাই আমরা পূর্ব্বকালের পাশ্চাত্য আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মুসলমান রাজত্বকালেও আমাদের দেশে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ অদ্বিতীয় মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। শক হুন চীনের আক্রমণেও আমরা আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য ভাবের আক্রমণে আমরা যে কেবল স্থূলদেহে পরাধীন হইয়াছি তাহা নহে, সূক্ষ্মদেহেও পরাধীনতা স্বেচ্ছায় বরণ করিতেছি। আমরা নিজেরাই নিজেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাই আজ পাশ্চাত্যগণের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ, ইহাই আজ আমাদের বিরুদ্ধে আসুর-ভাবের নৈশ আক্রমণ, ইহাই আজ পাশ্চাত্যগণের অতর্কিত আক্রমণ। আর এইজন্য এই আক্রমণ আজ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ আক্রমণ হইয়াছে।

আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন, স্বাধীনতার বিনিময়ে আমাদের প্রাচীন আচারব্যবহার, প্রাচীনের ভাব সকল আদর করিতে পারা যায় না। ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলে যদি স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাই কর্ত্তব্য। স্বাধীনতার তুলনায় সকলই হেয়। ধর্ম্ম যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতার ফলে তাহা আবার আসিবে। পরাধীনের ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই সম্ভব হয় না, ইত্যাদি।

অবশ্য এ কথার মধ্যে যে কতকটা সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা বলা তখনই আবশ্যক, যখন ধর্ম্মকর্ম্ম ও স্বাধীনতা পরস্পরে বিরোধী হয়। পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে হইলে, অপরটীকে বিসর্জ্জন করা আবশ্যক হয়; অন্যথা তাহা কখনই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্মের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধিতা নাই। মহাভারত রামায়ণের সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ কথার সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে আমাদের ধর্ম্মমধ্যে ইহাই কথিত হইয়াছে, যে যোগী ও ঋষিগণ সমাধিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যে ব্রহ্মলোকে গতি লাভ করেন, সম্মুখ সংগ্রামে দেহ ত্যাগ করিলে নিহত ব্যক্তি সেই ফল লাভ করেন। গীতামধ্যে বলা হইয়াছে "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।" পূর্ব্বে পলায়ন বা পরাজয় বীরের নিকট অজ্ঞাত বিষয় ছিল। সুতরাং পূর্ব্বের ধর্ম্মাচরণ, অন্য কথায় যথার্থ শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকর্ম্ম আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। এমন কি, রাজপুতপ্রাধান্যের সময়েও যুদ্ধে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় বিষয় ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বৃদ্ধ নেপালীকে দুঃখ করিতে শুনিয়াছিলাম, যে সে যুদ্ধে মরিতে পারিতেছে না। অতএব আমাদের যাহা প্রকৃত ভাব, আমাদের যাহা শাস্ত্র-সম্মত আচারব্যবহার, তাহার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ নাই। আজ যে মহাত্মা গান্ধি মহারাজ সমগ্র

ভারতকে একত্র করিয়া বৃটীশসিংহকেও বিচলিত করিয়াছেন—ইহাও সেই ধর্ম্মেরই বলে।

আমাদের পরাধীনতার ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, অধর্ম্মই আমাদের পতনের কারণ। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যে জয়চন্দ্রের বিবাদ, যাহার ফলে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য আজ পর্য্যন্ত অস্তমিত রহিয়াছে, তাহার মূল স্ত্রী-সম্ভোগ-বাসনা কি নহে? আর এটা কি অধর্ম্ম নহে? সেই যে সেকেন্দর বাদসাহ পুরুরাজকে পরাজিত করিলেন, তাহারও মূল কি তক্ষশিলার রাজার বিশ্বাসঘাতকতা নহে? আর বিশ্বাসঘাতকতা কি ধর্ম্ম? এইরূপে যতই চিন্তা করা যাইবে, দেখা যাইবে—অধর্ম্মই আমাদের পতনের কারণ। যাঁহারা আজ স্বাধীনতার জন্য ধর্ম্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা মহাভ্রম করিতেছেন। বস্তুতঃ, স্বাধীনতার ফল হইতেছে—নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ। ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন জীবনে ধন্য জ্ঞান হয় না, জীবন সার্থক বোধ হয় না। সুতরাং আজ যাঁহারা ধর্ম্মবর্জ্জনে উৎসাহিত হইতেছেন, তাঁহারা এতদপেক্ষা ভ্রম আর করিতে পারেন না।

আচ্ছা, এই যে আমাদের পরাধীনতা, ইহার মূল কি আমাদেরই আত্মীয়স্বজনের স্বার্থপরতা নহে? ইহার মূল কি আমাদের স্বজাতিদ্রোহিতা নহে? ইহার মূল কি নিজের সুখসম্ভোগলালসাধিক্য নহে? এই যে আইন দ্বারা সমাজবন্ধনের উচ্ছেদচেষ্টা, ইহার মূলে কি নিজ নিজ অভিসন্ধিসাধন নহে? যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন—এই বর্ত্তমান স্বাধীনতাস্পৃহার মধ্যে কত লোকের মনে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযমিতা কত পরিমাণে লুক্কায়িত আছে? বস্তুতঃ এ সব বিদূরিত না হইলে আমাদের স্বাধীনতা পশুপক্ষীর স্বাধীনতা হইতে উৎকৃষ্ট স্বাধীনতা হইবে না। আজ যে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, তাহাতে তাহারা অন্তরে কিরূপ সুখী, তাহা কি কেহ দেখিতেছেন না? সুখ অন্তরের ধর্ম্ম, বাহিরের কোন জিনিষই সুখদান করিতে পারে না। যদি অন্তরে কোন ব্যক্তি সুখের সন্ধান না পায়, যদি অন্তরে ত্যাগভাব না থাকে, তবে কি সুখ সম্ভব হয়? অতএব আজ আমাদের এই সব চিন্তা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত। আমরা যদি আজ ইহা করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার দোষেই তাহা হইবে, ইহা বলিতে হইবে।

অবশ্য কেহ হয় ত বলিবেন—আজ আমাদের এই যে স্বাধীনতার বাসনা, তাহা আমাদের এই শিক্ষারই ফল; সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষাকে নিন্দা করা উচিত নহে। ইহা পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ বলিয়া উপেক্ষা বা দ্বেষ করাও উচিত নহে।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ আমরা অত্যাচারের পীড়নে, দুরবস্থার পেষণে আজ স্বাধীনতার অভিলাষী হইয়াছি। আমরা বোধ হয়, কতকটা পাশ্চাত্যের স্বাধীনজাতির ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া ইহার লাভে প্রয়াসী হইয়াছি, এবং কতকটা মানবের আজন্মসিদ্ধ সংস্কারবশে ইহার জন্য প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা, যে ত্যাগ, সংযম, দয়া, পরোপকার, ভগবদারাধনামূলক ধর্ম্মজীবনের অবাধ অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীনতা, তাহা এখনও আমরা অধিকাংশ লোকেই বুঝি নাই। কোন সময়ে কোন একজন অতি সৎপ্রকৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতের সহিত কথা-বার্ত্তায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনারা ঠিক্ আমাদের পথে আসিয়া আমাদিগকে হটাইতে পারিবেন না—ইহা একেবারে নিশ্চিত জানিবেন।" আমি তাহাতে বলিয়াছিলাম, যে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যখনই বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখনই ভগবান্

অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং এদেশের প্রকৃতিতে তাহাই হইবে জানিবেন।" ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহাই আমরা অতিশয় ভয় করি।" জানি না, ভগবান্ বর্ত্তমানে আমাদের কোন মহাত্মার মধ্য দিয়া সেই কার্য্য করিবেন কি না। অতএব স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া আমাদিগকে তজ্জন্য অগ্রসর হইতে হইবে, আর সেই সঙ্গে তাহার প্রতিবন্ধকও দূর করিতে হইবে।

যাহা হউক, আমরা যদি আজ আমাদের নিজত্ব ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাদের পুনরভ্যুত্থান অতি সুদূরপরাহত; অথবা তাহা অন্য জাতির অভ্যুদয়, তাহা আমাদের অভ্যুদয় নহে। এই নিজত্বত্যাগের ব্যবস্থা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার ভিতর দিয়াই চলিতেছে। অতএব এই পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণের জন্য আমাদিগকে এখন সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। এদপেক্ষা ভীষণ আক্রমণ ইহার পূর্ব্বে আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

চেতনা

[আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার]

চেতনার দুর্গ দেহ? এই যার সীমায় সীমায়
নিরখি পরিখারূপে অন্ধকার, মগ্ন জড়িমায়?
এ কি জড়! বহে ঝড় অফুরন্ত গতির বর্ত্তনে;
অঙ্গে পরমাণুপুঞ্জ সঞ্চরিছে অধীর স্পন্দনে।

অণুর প্রবাহে দেহে, ঢেউ লাগে চেতনার কূলে;
বেদনে বাসনা জাগে রসের সেচন মূলে মূলে।
চেতনের সখা তুমি অচেতন, নও তুমি কারা;
বেদনে বাড়াও তুমি চেতনায় আনন্দের ধারা।

জড়ের অন্তরে লেখা আছে তার জন্ম-জয়-গীতা;
প্রলয়ের বহ্নি যবে জালিয়া মৃত্যুর চণ্ডচিতা
দহিয়া দহিয়া জড়ে উগরিল মৃত্যুঞ্জয়ী দেহ
কোথা ছিল সেইদিন জড়গর্ভে জীবনের গেহ!

এড়ায়ে দাহের মৃত্যু, বিকশিয়া জীবনের সার
জীবের জন্মের তরে সিন্ধুকে সে দিবে উপহার।
বাড়িল জীবের বংশ, 'নাই ধ্বংস' উচ্চারিল ধরা
এই জড়পিণ্ড তবে নয় কি জীবন-রসে ভরা?

আরও বিবর্ত্তনে সে কি ফুটিয়া বে চেতনায়!
ঘোষিবে অশেষ বিশ্বে—জড়ে ও জীবনে ভেদ নাই।
চেতনে সঞ্চারি রস আজিও সে ঘুরিছে উল্লাসে;
স্ফুরিবে না চেতনা কি আরও তার নিশ্বাসে--উচ্ছ্বাসে?

নিগূঢ় চৈতন্য যেন স্মরি জন্ম-ইতিহাস তার,
আলিঙ্গিয়া অঙ্গে কহে—জাগ তুমি আমার আধার।
অচ্ছেদে অভেদে দোঁহে অসীমায় চলিব বিহরি,
সারা বিশ্ব একদিন সংজ্ঞাভরে জাগিবে শিহরি।

অজড় অমর জড়; অমর চৈতন্য তার নয়?
হে আত্মন্! জাগ তুমি চেতনায় জাগায়ে অভয়।
কোটি কোটি যুগান্তরে সারা জড়ে বিকশিবে প্রাণ;
চৈতন্য লীলার নাই অনন্তে অশেষে অবসান।

কোটি কোটি যুগ, সে ত একবিন্দু অনন্ত সাগরে।
হে চেতন, হে আত্মন্, বিশ্বানন্দে জাগ রে জাগ রে॥



নারী-প্রগতি

— ৭ —

সুধীরের আজ বাসায় ফিরিতে অসম্ভব বিলম্ব হইয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ সুদর্শন ছাড়া আর কাহাকেও বড় উৎকণ্ঠিত দেখা গেল না। সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রন্ধন-কার্য্য শেষ করিয়া সরিয়া পড়ে; কিন্তু আজ বাবুর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় মা'জীকে একা রাখিয়া বাহির হওয়ায় বাধিতেছিল। ঘরের মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে বিন্দু বসিয়া রুমাল সেলাই করিতেছিল। আড়াল হইতে সুদর্শন কয়েক বার তাহার দিকে কটাক্ষ করিয়া বুঝিয়াছিল, তাহাকে বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাওয়া যাইবে না; বরং ধমকানি খাইতে হইবে। সে একবার ঘর আর একবার বাহির—এইভাবে ছুটাছুটী করিতেছিল।

বাবুকে দেখিয়া অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিল—"বাবু, এত দেরী!"

র বলিল—"তোরা কোন খোঁজ রাখিস্ না; সহর তোলপাড় হ'য়ে গেল—আজ প্রাণ নিয়ে ফিরেছি, এই ঢের!"

সুদর্শন হাঁ-করিয়া বাবুর দিকে চাহিল। তাহার অন্যত্র তাড়াতাড়ি ছিল, বাবুর বাড়ী কাজ সারিয়া নায়েবপাড়ায় সরকারদের বাড়ীতে কয়েকখানা রুটী সেঁকিয়া দিবার কাজও সে লইয়াছিল। সন্ধ্যার পরই সেখানে যাইতে হয়; আজ সরকার-গৃহিণী দু'কথা শুনাইবে—কিন্তু খবরটা না লইয়াও সে নড়িতে পারিল না।

সুধীর বলিল—"ছোঁড়াগুলো হুজুগ পেলে হয়; কি যে শিখেছে, কথায় কথায় স্কুল কলেজে ধর্ম্মঘট করবে। এতদিন মুসলমান ছাত্রেরা মুখ বুজে সবই মেনে নিয়েছে, আজ আর শোনে নি!"

সুদর্শন বাবুর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসিয়া উপরের বারান্দায় বাকী কথাগুলি শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল। সুধীর একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তারপর স্কুলের ছুটীর সময়ে দাঙ্গা; এই ঘটনা নিয়ে লাঠালাঠী। বস্, কি ব্যাপার! পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত কার সাধ্য পথে বেরোয়!"

সুধীর ইতস্ততঃ চাহিয়া বলিল—"দেরী কি সাধ ক'রে হয়েছে; সদর রাস্তায় ভদ্রলোকের চলাচল বন্ধ, গলিপথ দিয়ে হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বেরিয়ে তবে পরিত্রাণ পাই!"

সুদর্শন বিস্মিত হইয়া বলিল—"সেই হাট-লুটের মত কাণ্ড বলুন!"

সুধীর বলিল—খবরটা কাগজেই পড়েছি; আজ যা চক্ষে দেখ্‌লুম, মানুষের উপর মানুষের এমন বিদ্বেষ কল্পনা করা যায় না।"

সুদর্শন—"বছরে দুটো চারটে দাঙ্গা লেগেই আছে; সময় সময় কাজকর্ম্ম বন্ধ হ'য়ে যায়—আবার সেই রকম না হয়।"

সুদর্শনের এই কথাটা নূতন বলিয়া মনে হইল না। সে ব্যাপারটা জানিয়া লইয়া অবশিষ্ট যে কয়টা কাজ সারিবার ছিল, তাহা শেষ করিয়া যথারীতি প্রস্থান করিল।

সুধীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্রদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল—বিন্দু একাগ্রমনে রুমালের খুঁটে রেশমী সূতার ফুল তুলিতেছে; ঘরের বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুদর্শনের সহিত তাহার কথোপকথন বিন্দুর কাণে আসিয়া যে পৌছায় নাই, তাহার ভাব দেখিয়া ইহা সে বুঝিয়া লইল। সেও বিনা বাক্যব্যয়ে পিরান ছাড়িয়া, তোয়াল হস্তে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পথে আলো জ্বলিয়াছে, পথিকেরা পূর্ব্বের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে চলিতেছে; আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, সুধীরের বুকে যেন বৃশ্চিকদংশনের স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল।

ফিরিবার পথে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসা, রাস্তার ধারেই একতলা কোঠাঘর; ছাদে অবগুণ্ঠনে এক রমণী বসিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় সুধীরকে বলিলেন—"দেখুন মহাশয়, উৎকণ্ঠাটা কাদের অধিক. দশহাত কাপড়খানার আঁচলটুকু মাথায় দিয়ে যে বাকীটুকু থাকে, তা' বোধহয় বিশ্ব জুড়ে এঁরা ছড়িয়ে রাখেন। দেরী দেখে গৃহিণী ছাদে এসে হাঁ-ক'রে তাকিয়ে আছেন!"

সুধীর কথাটা প্রথম তলাইয়া বুঝে নাই। উপরের দিকে দৃষ্টি দিবা মাত্র, এক তন্বীকে দ্রুত প্রস্থান করিতে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কথা বুঝিয়া লইল। দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র, ভিতরের খিল ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয়কে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে হইল না; তাঁর আগমনপ্রত্যাশায় সত্যই একখানি আকুল হিয়া যে কি উৎকণ্ঠায় এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা সুধীর বুঝিল। পণ্ডিত মহাশয় সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হেড্‌মাষ্টার মহাশয়, কাল স্কুলে যাওয়া দায় হবে, গৃহিণী এখন সহজে ছাড়্‌ছেন না।" পণ্ডিত মহাশয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দোরের ফাঁক দিয়া যে সাড়ীখানির কথঞ্চিৎ সুধীরের চক্ষে পড়িল, তাহা এক যুগলদম্পতির প্রেমের নিশান বলিয়াই তাহার মনে হইল।

এই ঘটনাটা খুব বড় হইয়া সুধীরকে আকুল করিয়া তুলিল। হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের পত্নীর ন্যায় সেখানে দুটী আকুল দৃষ্টির চাহনীর প্রতীক্ষা তাঁর মিথ্যা আশা - আজ সে খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সুদর্শন তাহার চক্ষের সম্মুখেই বাহির হইয়া গিয়াছে, তবুও বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল—'সুদর্শন!" একবার মনে হইল—গলার সাড়া পাইয়া বিন্দু ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহার অনুযোগ শুনিবে; কিন্তু সে আশাও নিষ্ফল হইল। অতিশয় বিরক্ত হইয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"তোমার রুমাল সেলাই আর শেষ হয় না—খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আজ হয় নি নাকি?"

একবিন্দু বিচলিত বা বিস্মিত না হইয়া ছুঁচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিন্দু বলিল—"কেন? ঠাকুর সব ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে গেল যে!" তারপর চক্ষু তুলিয়া ঘরের একপাশে খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া, পুনরায় রুমালের খুঁটে ছুঁচ ফুঁড়িয়া বলিল—"চক্ষু দুটা চেয়ে কথা বল্‌ছ না!"

বিন্দুর কথার উপর একটু ধমক দিয়া সুধীর বলিয়া ফেলিল—"কেন, রুমাল সেলাই ছেড়ে কি তুমি একবার উঠ্‌তে পার না!"

বিন্দু আশ্চর্য্য হইয়া সুধীরের দিকে চাহিল। এরূপ কর্কশকণ্ঠে বিন্দুর কথার উপর জবাব সে এই প্রথম শুনিল। সুধীরের চক্ষু দেখিয়া বুঝিল, সত্যই সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিয়াছে। একবার মনে হইল—প্রত্যুত্তর দিয়া প্রতিশোধ লয়; কিন্তু মনের আবেগ দমন করিয়া স্থিরকণ্ঠেই

বলিল—"কোনদিন তো এসময়ে খাবার দিতে উঠি না, আজ তোমার নূতন কথা শুন্‌ছি!"

সুধীর বলিল—"চিরদিন একই ভাবে ব্যাপারটা না-ও চল্‌তে পারে।"

বিন্দুর আর ধৈর্য্য রহিল না। সে বলিল, "ঠিক কথা, সে দিন এলেই তার ব্যবস্থা হবে।"

সুধীর চমকিয়া উঠিল। বিন্দুকে সে যথাবিধি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু বিন্দু তাহাতে রাজী হয় নাই; বলিয়াছিল—"হিন্দু নারী অথবা পুরুষের একবারই বিবাহ হয়, তারপর বিধাতার বাজ যদি একজনের মাথায় পড়ে, তবে বাকী জীবন নিঃসঙ্গ হ'য়েই কাটাতে হয়। অসংযমী ব্যাভিচার করে; গ্রহ চক্রে আমি বিপন্ন। ব্যাভিচার পরিণয় ব'লে চালিয়ে, জগদীশ্বরের রাজ্যে পাপকে প্রশ্রয় দেব না।"

সুধীরের যুক্তি বিন্দুর মতপরিবর্ত্তনে সমর্থ হয় নাই; শেষে দু'জনের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়, যে যতদিন সুধীর তাহাকে আশ্রয় দিবে, সে তাহার অনুগত হইয়া থাকিবে। এই আনুগত্যের ধারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়; এইজন্য সুধীর বিন্দুর এইরূপ সম্মতিই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া তাহাকে আর এই বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করে নাই—কিন্তু যত দিন যায়, বিন্দুকে লইয়া সে ততই বিব্রত হইয়া পড়ে। কেবল সেবার তাগিদে সে যে অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, এরূপ স্বার্থপরতা তাহার ছিল না। বিন্দুকে পাইয়া অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক, তাহা আরও প্রবল হইয়া তাহাকেই পুড়াইয়া খাক্ করিতেছিল। বিন্দু যন্ত্রের ন্যায় সকল কাজই করিয়া যায়। সংসারের যখন যেটীর প্রয়োজন তখন সেটী গুছাইয়া, সুধীরের কোনদিকে যাহাতে অসুবিধা না হয়, তাহার দিকে তার খুবই সজাগ-দৃষ্টি ছিল; কিন্তু হৃদয়-বস্তুটা আত্মসেবার কয়েকটা যন্ত্র হইলেই পরিতৃপ্ত হয় না; হৃদয়ের দাবী বিন্দুকে একদিনও স্পর্শ করে নাই, সে এদিকে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিত।

সুধীরের মনে আজ পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহ-লক্ষ্মীর কথাটা বিচিত্র স্বপ্নের মত আঁকিয়া উঠিতেছিল। জগতে এমন দুইটী হৃদয়ের বিনিময় যদি নিবিড়ভাবে খেলিয়া সবখানিকে মাঝে মাঝে অভিষিক্ত না করে, তবে সংসার বলিয়া বস্তুর সত্যতা কিসে? সব যে মরুভূমি! কাকাবাবুর আশ্রমে যে বৃষল-জীবনের রুক্ষতা, তাহা হইতে মুক্তির প্রচেষ্টায় তার যে এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়া—সেখানে বিন্দু যদি বুক পাতিয়া তাহাকে আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে—উঃ! —ভাবিলে তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়ে; ইচ্ছা হয় ছুটিয়া আবার সে ফিরিয়া যায়—পিতৃব্যের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে সত্যই ব্যর্থ হইয়াছে।

সুধীর কথা বাড়াইল না। সজসনয়নে সুদর্শনের রক্ষিত জলখাবারের ঢাকা খুলিয়া, দুই চারিখানা লুচি ঠেলিয়া মুখে গুঁজিয়া দিল; তারপর এক গেলাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিল। বিন্দু ছুঁচের ফোঁড়ে বার বার আঙ্গুল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।

* * *

"সুধীরবাবু! সুধীরবাবু!!"

পণ্ডিত মহাশয়ের গলা।

সুধীর সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতলের বারান্দায় আনিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই তর্ তর্ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজেই বলিলেন— "ভারি বিপদ মহাশয়, সে একেবারে মাথার দিব্য! ছেলেরা স্কুল ধর্ম্মঘট করে, সে একটা রঙ্গ; আর

এখানে—আরে বাপ্, একেবারে সর্ব্বনাশ!" সুধীরের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া সে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, ব্যাপারটা কি? রাত্রে যে বড় পথে বেরিয়েছেন!"

পণ্ডিত মহাশয়—"একেবারে নিরুপায় সুধীর বাবু! তিনি অন্নজল পরিত্যাগ কর্‌বেন; অন্ততঃ কালকের দিনটা বুঝ্‌লেন, আমার ছুটী মঞ্জুর কর্‌বেন।" তারপর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিলেন—"আপনার ও-সব ব্যাপার নেই, তা' মরুক-গে; পকেটে একটা বিড়ি আছে, আপত্তি নেই তো! দিয়াশিলাইটা—" বলিয়া পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। সুধীর দেখিল—হঠাৎ বিন্দু বাহির হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে দিয়াশালাই দিল। পণ্ডিত মহাশয় সসম্ভ্রমে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—'দাও মা! আহা গৃহলক্ষ্মী নয় তো, যেন রাজলক্ষ্মী। তা' সুধীরবাবু, সংসারে মাসী পিসী কেউ নেই, সারাদিনটা মাকে বোধহয় মুখ বুজেই থাক্‌তে হয়; তা' মধ্যে মধ্যে, এই তো কাছেই আমাদের বাড়ী—কেমন মা! সুধীরবাবু কি বলেন!'

বিড়ি ধরাইয়া মুখ হইতে ধূম বাহির করিয়া বলিলেন—"ব্যাপার ভুলোটা এসে আগেই শুনিয়ে দিয়েছে, বুঝ্‌লেন; এখন কালকের দিনটা কোন মতেই রাস্তায় বেরুতে দেবেন না, বলেন—স্কুল নয় যমপুরী! দাঙ্গা লে'গই আছে। খবরের কাগজ-গুলো আরও গোলযোগ বাধায়। কোথায় কুমিল্লায় না ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় হেড্ মাষ্টারকে ছুরি মেরেছে না সেদিন! মশায়, চাকুরীটুকুও না যায়! শেষে কি করি, মাথায় হাত দিয়ে দিব্য করে' এসেছি; কালকের দিনটা বুঝেছেন—এইজন্য দৌড়ে এলুম!"

পণ্ডিত মহাশয় একবার দক্ষিণ হস্ত, একবার বাম হস্ত দিয়া বিড়ি টানেন; আর অসংলগ্ন কথা বলেন। সুধীর বুঝিল, কাল পণ্ডিত মহাশয় স্কুল হইতে ছুটী চাহেন; কেন না, দাঙ্গার কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহিণী ভয় পাইয়াছেন; তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে কিছুতেই দু' একদিন ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা' পণ্ডিত মহাশয়! কাল না হয় ছুটীর ব্যবস্থা হলো, এমন অবস্থায় আপনি চাকুরী করবেন কি করে!"

জোরে বিড়ি টানিতে টানিতে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"সুধীরবাবু! পিতৃঋণ কিছু আছে, নইলে জমি জায়গা দেখ্‌লে পেটের খোরাক চ'লে যায়। কয়েকটা নগদ টাকার দরকার। কথায় বলে, অবলা ভীরু, ওদের স্বভাব এই; ঘর ছেড়ে কি বেরুতে দেয়, জোর ক'রে যা' কিছু করি। এই এতক্ষণ হাঁ করে' দোরের দিকে চেয়ে আছে। একালে মেয়েগুলো এ রকম হয় না।" সম্মুখে বিন্দু দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি বল মা!"

বিন্দু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সুধীর বলিল—"সে যুগের মত মেয়েরা আজ একেবারেই অচল ভারী বোঝার মত ঘাড়ে চেপে বসেছে—কেমন না পণ্ডিত মহাশয়!"

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"আরে না না; ও-সব আপনাদের বিকৃত রুচির কথা সুধীরবাবু! মনে কিছু করবেন না—পত্নীর সমস্তখানি হৃদয়টা যদি উপুড় হয়ে পুরুষের বুকে চেপে না পড়ে, তবে বাহিরটা নিয়ে টানাটানি একেবারে ইৎরোমি। মানুষ বড় কথা ব'লে, মেয়েদের মর্য্যাদা দিতে চায়; কিন্তু ভিতরে ঐ জমি জায়গার মত ভোগের ক্ষেত্র ক'রেই এদের

রাখ্‌তে চায়। নারীর মহিমা—তার এই আত্ম-বিসর্জ্জনে; এইখানেই তো পুরুষের প্রতিষ্ঠা। এ মহাদান শোধের বস্তু নয়; দান প্রতিদানের হিসাব খতিয়ে দেখা এখানে অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। আজ যে কাতর দৃষ্টিটুকু আমায় আশ্রয় করে' স্থির উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে, ঐ প্রসন্নদৃষ্টির শক্তি দিয়াই তো ভবিষ্যৎ গ'ড়ে উঠ্‌বে! তা' না হ'লে আমরা বাঁচ্‌লুম্ কি করে! আর আমাদের রক্ষার অন্য উপায় কি? পতি পত্নীর মধ্যে এই যে মহা আকর্ষণ—উপহাস ক'রে যাই বলি, ইহার মধ্যে বিধাতারই নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে সুধীরবাবু! যে হতভাগ্য, সে এই দাম্পত্যজীবনের রহস্য থেকে বঞ্চিত—সৃষ্টির আদি ও অন্ত এইখানেই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।"

পণ্ডিত মহাশয় সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। বিন্দু দাঁড়াইয়া ছিল; পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি দুর্ব্বোধ্য বোধ হইলেও, অন্তরের বীণায় যেন উহা মোচড় দিয়া অব্যক্ত ধ্বনি সৃজন করিল। সে বসিয়া পড়িল। সুধীর বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়, আপনাদের কাছে যা' একান্ত সহজ ও স্বভাব, তা' পাকিয়ে প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠে; আর তারই ব্যাখ্যায় এক বিপুল সাহিত্যের সৃজন হয়—কাজেই ঐগুলোকে একান্ত অকেজো বোধে ত্যাগ ক'রেই আমাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয় না। আপনি বল্‌ছেন কি? ছেলেবেলায় হোঁচট্ খেয়ে উঠানে দশবার আছাড় খেতুম, আবার ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে ছুট্‌তুম্—খেলারই আনন্দে। আমাদের বিয়েটা এমনই উঠা পড়ার মত সামান্য ঘটনা। জীবনের আনন্দ যেদিকে যখন ছুট্ করায়, দৌড়তে হবেই। অসাড় প্রাণ তাই আঁৎকে উঠে—সহজটাকে এমন সহজভাবে নিতে; কেন না, তার জড়িয়ে থাকায় আছে আত্মপ্রসাদ; কিন্তু তৃপ্তি সেখানে কোথা!"

সুধীর বক্রদৃষ্টিতে বিন্দুর দিকে একবার চাহিল। বিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল।

পণ্ডিত মহাশয় আকুলকণ্ঠে বদন বিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ.হাঁ, বলেন কি সুধীর-বাবু! আনন্দের ডাকে কি জীবনটাকে নাকচ করে' ছুট্‌তে হবে! সে তো অক্ষম, একেবারে আত্মহারা গর্দ্দভ। আনন্দের আশ্রয় এই জীবন। জীবন যদি হারায় ছুট্‌তে গিয়ে, আনন্দের ডাকও অর্দ্ধপথে নীরব হবে—শুন্‌বো কি দিয়ে? জীবনের আর সবই ঘটনা বলুন, আপত্তি নেই; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই তিন গ্রন্থী জীবন-গ্রন্থী, প্রাণের নিত্যতা এইখানেই ধরা পড়েছে; নইলে মানুষের সঙ্গে ঐ মুহূর্ত্তের প্রাণ নিয়ে কৃমির জন্ম মৃত্যুর তফাৎ কোথা! আপনি কি বল্‌ছেন—বিশেষ মা-লক্ষ্মীর সাম্‌নে!"

সুধীরের তর্ক করার অভ্যাস ছিল। সে পণ্ডিত মহাশয়ের কথার উত্তর দিতে গিয়া কোথায় আঘাত করিয়া বসিবে, তাহার হুঁস না রাখিয়া বলিল—"কৃমির মত প্রাণ মানুষের নয়, তা' দুইয়ের আকৃতি দেখেই বুঝা যায়; এই অসদৃশ তুলনা নিরর্থক। জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা—এক্‌সিডেণ্ট; মৃত্যু ত তার সমাধান; বিবাহটাও তাই, একটা সাময়িক চুক্তির মত—যতক্ষণ মিলে মিশে থাকা যায়; অসম্ভব হ'লে ছাড়াছাড়ির ফাঁকটা বুজিয়ে দিতে মানুষের সাধ্যি এখানে ভেঙ্গে চুর হবেই, পণ্ডিত মহাশয়!"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই; বিষয়টা নূতন বলিয়া তাক্ লাগিবার কথা; কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এই অনাচার নীরবে মানিয়া লইলেন না, বলিলেন—"মানুষের এতখানি

অমর্য্যাদা মানুষ করতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি নি।"

সুধীর উত্তেজিত হইয়া বলিল—"সেটা পুরুষের স্বার্থবশতঃ; নারীর গলায় শিকল দিয়ে টেনে নিয়ে চলায় তার অনেকখানি যে স্বার্থ আছে, পণ্ডিত মহাশয়!"

পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"রাম বল! আপনার কথার উত্তরে বরং এই বলা যায়, পুরুষের সুবিধা বরং এইখানে অধিক। পুরুষ চায় ভোগ, নারী তার যোগান দিয়ে যায়; সে ভোগটা যতক্ষণ ঐহিক, শরীর সম্বন্ধীয়, ততক্ষণ তার একটা সীমা আছে; অন্ধ পুরুষ সেখানে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র, ক্ষুণ্ণ হয়—বিষণ্ণ হয়ে ভাবে এই শেষ! নারীর কোলে যদি আকাশের চাঁদ এই সময় উদয় না হতো, তার চক্ষের অশ্রু বোধহয় সহস্রধারায় ব'য়ে যেতো; ধর্ম্ম এখানে স্বয়ং নারীর ক্রোড়কে সান্ত্বনা দিয়েছে। এই যুগসন্ধিতে সকল পুরুষকেই চঞ্চল হ'তে দেখা যায়; যেখানে সুশিক্ষা, ভারতের নিয়ম সংযম মূর্ত্ত, সেইখানেই ইহকাল পরকাল রক্ষা পায়—নয়তো সব ভেসে যায়, পাপের জয় হয়। বিশ্বসমাজে অশান্তির আগুন—শুধু কি রাজ্য, ঐশ্বর্য্যের অভাব হেতু হৃদয় তৃপ্তিহীন, সে যে অমৃতের সন্ধান চায় নি; বিষপত্রের কানায় কানায় ছুটে' জীবনসমস্যার কি সমাধান সম্ভব, সুধীর বাবু!"

সুধীর উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ঐ আপনাদের কথায় কথায় নিয়ম সংযম, আর ইহকাল পরকাল; মানুষ অভাবটাকে বড় কথা দিয়ে চেপে রেখে দিলে তার বৃহত্তর জীবনের আশা চিরদিনই নৈরাশ্যময় হবে, কোন দিন এই দরকচা প্রাণ নিয়ে বিশ্বের কল্যাণসাধন তার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

পণ্ডিত মহাশয় ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁর বিড়িটা নিভিয়া গিয়াছিল। বিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের বিড়িটার দিকে চাওয়া মাত্র দিয়াশালায়টা আগাইয়া দিল। তিনি তাহা ধরাইয়া ঠোঁটের ডগায় লইয়া গিয়া বলিলেন—'নিয়ম সংযম খাঁটি সত্য জীবনের স্বভাব-প্রকাশ, পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। জগতে যা' কিছু বড় কাজ হয়েছে, এই আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ প্রাণকে ভিত্তি ক'রে; যার ভিতর অনাশ্রয় ভাব, অতৃপ্তির জ্বালা, সে অস্থির; ইহকালের ঝোঁক তার যেমন ব্যর্থ হয়, পরলোকের দিক্‌টাও তার কাছে তেমনি ঝাপ্‌সা, সে দু'কূল হারা। আজ পুরুষের স্বার্থ নারীদের বুদ্ধিকে হার মানাতে আবার নূতন ফন্দী বার করেছে—একনিষ্ঠ প্রেমের বিনিময়ে স্বভাব মনকে ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করেছে। তাদের স্বভাব পুরুষের অনুগত হওয়া; কাজেই এ ফাঁদেও তারা পা দিতে ছুটবে। এই দুঃখটা এক দিক্‌কেই পুড়িয়ে ছাই ক'রবে না; আমাদের অবশিষ্ট যা' কিছু আছে, তা' একেবারে শেষ ক'রে দেবে। কথায় কথায় রাত অনেকখানি হ'লো—আজ আসি, সুধীর বাবু! হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, এখানে এসে তার সন্ধান পেলুম। আপনারা চাইছেন নারীর প্রগতি; কিন্তু দুর্গতির পথই প্রশস্ত করছেন।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিন্দু গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আয়ুষ্মতী হও মা, সতীর আসন অধিকার কর।"

পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন—বিন্দুর চক্ষে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সুধীর অকস্মাৎ বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়, ইনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নন, বোধহয় সে কথা জানেন না।"

পণ্ডিত মহাশয়—"না"! এই বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। সুধীর বলিল—"বিবাহের বন্ধন

উনি গলায় তুলে নিতে রাজী নন, আমরা চুক্তি-বদ্ধ ভাবেই আছি।"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বিন্দুর দিকে চাহিলেন—সত্যই তো, তাঁহার সিঁথীতে তো সতীশোভন সিন্দুররাগ নাই—এ কি বিচিত্র সৃষ্টি!

বিন্দু বলিল—"আপনি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—মানুষের মরণেই কি তার সব শেষ হয়!"

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বড় শক্ত কথা মা, ইহা তো প্রমাণসাধ্য নয়, অনুভূতির বিষয়; সে অনেক যুক্তির কথা। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মত অনুভূতির প্রমাণ যে অকাট্য, তা' কোন পণ্ডিতই অস্বীকার করেন নি; দেহ-লয়ে, মানুষের সঙ্কল্পাত্মক মন-ও-বুদ্ধি-যুক্ত সূক্ষ্ম দেহের নিত্যতার কথা শ্রুতিতেও আছে, যুক্তিযুক্তও বটে, অনেকে তা' অনুভূতি-গ্রাহ্যও করেছেন; কিন্তু সে কথা কেন, মা!"

বিন্দু বলিল—"আমার একবার বিবাহ হয়েছে, একবার দেহ দান করেছি; পুনরায় সে দেহ দিয়ে কোন পুরুষের সেবা প্রবঞ্চনা নয় কি!"

পণ্ডিতমহাশয়—"শতবার! সহস্রবার!!"

সুধীর অস্থির হইয়া বলিল—"দেহটা নিয়েই কি মানুষের অন্তর সবখানি পূর্ণ হয়, না তার জন্য হৃদয় কোথায় দায়ী হয়েছে—উহা ভালবাসার একটা দিক্ মাত্র!"

পণ্ডিত মহাশয় জবাব দিলেন—"ভালবাসার ঘর-দোরের মত আবার দিগ্বিদিক আছে নাকি, বস্তুটা কোনাকুনির ধার ধারে না', সুধীর বাবু! জানা অজানায় কোথায় ছাড়িয়ে পড়ে, কালবশে অঙ্কুর হয়ে দেখা দেয়, স্থান কাল, জীবনমরণের ভেদ বিদীর্ণ ক'রেই; এই জন্যই ভারতে একনিষ্ঠ প্রেমের এত মর্য্যাদা। ভগবান টগবান, ধর্ম্মটর্ম্ম উড়িয়ে দিলেও, এই বাস্তব বস্তু উড়্‌বে না; তাই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে জিনিষটা যতবার ফাঁকি ব'লে মানুষ সহজ জীবন চেয়েছে, প্রেমের বীর্য্য পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে তাদের দর্প চূর্ণ করছে। ভোগের নেশায় পুরুষ নারীকে উপেক্ষা করে বলে', মায়ার দরদে তাদের যদি প্রতিশোধ নিতে স্বেচ্ছাচারের পথে পুরুষের মতই এগিয়ে যেতে বলি, তবে তাদের দুর্গতিই বাড়বে; তারা যে ধরিত্রীর মত আমাদের ধারণ করে আছেন, তাদের স্নেহ প্রেমের সীমা অতি দুরাচার পুরুষও উল্লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবে না, নারীমহিমারই জয় হবে! মা, বুঝ্‌ছি তুমি স্বামীহারা বিধবা; বিধবার ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবে দয়া, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। পুরুষের সঙ্গ আজ আছে, কাল নাও থাক্‌তে পারে; কিন্তু যদি আপনাকে ফিরে পাও, তবে আশ্রয় থেকে আশ্রয়ান্তর খুঁজে ন্যাকা সাজ্‌তে হবে না—তবে আজ বড় হেঁয়ালিতে পড়্‌লুম।"

সুধীরের দিকে চাহিয়া অব্যক্ত ব্যথায় বলিলেন—"আসি সুধীর বাবু, আমার ছুটীটা যেন বাহাল থাকে।" অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি সেইখানে রাখিয়াই পণ্ডিত মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

সুধীর ও বিন্দুর মাঝে আজ যেন বৃহৎ নদী বহিয়া গেল, দু'জনের কাছে দু'জন আরও অধিক অস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র

—:০:—

শাস্ত্র, যুক্তি আর অনুভূতি এই তিনের সাহায্যে হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্মগত করা যায়। আজ যাঁরা ধর্ম্ম বস্তুটার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতে উদ্যত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম বস্তুটাকে উপলব্ধি করার জন্য এই যে বিধান, তাহার অনুসরণ তাঁহারা কোন দিন করিয়াছেন কিনা—আর যদি না করিয়া থাকেন, একান্ত ইহা অনাবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের তাঁহাদের কি অধিকার আছে?

হিন্দুজাতি স্বরাজ্যহারা, বাহিরের আঘাত সহিয়া সুদিনের প্রতীক্ষায় তাহার ধৈর্য্যটুকু অন্তরাঘাতে যে নিঃশেষ হয়—তাহা কালাপাহাড়ের দল কি বুঝেন না! ইহা নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া আত্মঘাতী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধির কারণ—দেশের প্রতি খাঁটি দরদ নহে, বিলাসের মোহ। অন্যকে প্রবঞ্চিত করা যায়; কিন্তু নিজের অবস্থা দেখিয়া এই কথা তাঁরা কেন যে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন না, তাহা আমাদের নিকট সমস্যা বলিয়াই মনে হয়।

আমরা দেখি আত্মত্রুটি যতক্ষণ, ততক্ষণ বস্তু-বিশেষের জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়; বস্তুকে চক্ষে দেখিয়া, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া, বস্তু-বিজ্ঞান কণ্ঠস্থ করিয়াও যথার্থ জ্ঞানের অভাব যে পূরণ হয় না, তাহা সামান্য অনুধাবনেই বুঝা যায়। যে বস্তুকে জানিতে হয়, জানার সুরটী সেই বস্তুর সহিত যতক্ষণ না ঐক্য পায়, ততক্ষণ তাহা কি আয়ত্তে আসে? মার্জ্জিতবুদ্ধি, তথাকথিত অর্ব্বাচীন যুগের মনীষিমণ্ডলী এই বিজ্ঞাননীতিকে উপেক্ষা করেন কি প্রকারে? প্রেমিক না হইয়া কে কোথায় প্রেমের সন্ধান পাইয়াছে? প্রেমবস্তুর সহিত প্রেমিকের একাত্মতাই প্রেমলাভের অব্যর্থ নীতি। জ্ঞান সম্বন্ধে সেই একই কথা। ভারতের এই সহজ দার্শনিক তত্ত্ব কেন—জানি না, পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণের কাছে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়! খুব সম্ভব ভারতীয় শিক্ষার ধারাই আমরা হারাইয়াছি; কিন্তু আশ্চর্য্য, ভারতীয় মস্তিষ্কে কিন্তু জগতের বিজ্ঞান, যুক্তি অনুভূতগম্য হয়। তাহার কারণ, ভারত একটা সার্ব্বজনীন প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিল; ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সঙ্কীর্ণতাদোষদুষ্ট নহে, দেশ ও কালভেদে ইহা বিশ্বের মূল সুর হইতে স্বতন্ত্র হয় নাই। যেমন এক মূল সুরই সপ্তস্বরের জন্মক্ষেত্র, তদ্রূপ ভারতের জ্ঞান জগতের বিচিত্র প্রতিভার জন্মক্ষেত্র। কথাটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বিদেশী যদি মুখ ফিরায়, তাহা সহা যায়; কিন্তু ভারতবাসী বালুর উত্তাপস্বরূপ বিমুখ হইলে দুঃখ রাখার আর অবধি থাকে না।

ভারতীয় শিক্ষা সাধনার উপর বক্রদৃষ্টিপাত বিদেশীর দিক্ হইতে খুব স্বাভাবিক। তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে; কিন্তু স্বদেশবাসীর অনাস্থা কোন স্বার্থপরতন্ত্র নহে; ইহা দাস-মনোবৃত্তিবশতঃ অন্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই আত্মহারা জাতিকে আজ রক্ষা করিতে হইবে—তর্কে নহে, যুক্তিতে নহে, প্রকাশ্য দিবালোকের মত যে চাকচিক্যে উদ্‌ভ্রান্ত এই তরলচিত্ত

একদল লোক প্রমাণাভাবে নিজের দেশের শিক্ষা ও আদর্শকে উপেক্ষা করিতেছে, সেই শিক্ষা ও আদর্শের ভাস্বর-মূর্ত্তিই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের ধারণা হইয়াছে—যে ধর্ম্ম, যে বিজ্ঞান দেশের সার্ব্বাঙ্গীন শ্রীসাধনে অক্ষম, অসমর্থ, সে জাতির সবখানি বুঝিবার দরকার নাই—বৃথা সময়-ক্ষয় মাত্র; ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ যে আদর্শ ও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্বের উন্নত জাতিসঙ্ঘ মাথা তুলিতেছে, তাহাদের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। ইহারা কিন্তু মুক্তির নামে কত বড় পরবশ্যতার বগ্‌লস্ গলায় পরিতে চাহে, তাহা ভাবিয়া দেখে না। সুখের লাগিয়াই ঘর বাঁধিতে চায়; সে ঘর বহুবার অনলে পুড়িয়া যার ছাই হইয়াছে, সে গভীর অভিজ্ঞতা যাহার জন্মিয়াছে, সে তো ইহাতে প্রলুব্ধ হইবে না। যে পিরীতি তুরীয়বস্তু হইলেও, তাহাকে বস্তুতন্ত্র করার মন্ত্র পাইয়াছে—মন্ত্রের সাধনে সে ধৈর্য্যহীন হইবে কেন? এই ভারতীয় ভাবের মানুষকে আজ আর অস্পষ্ট হিঁয়ালীর ঘরে বসিয়া মালা ফিরাইলে চলিবে না; তাহার সর্ব্বপ্রয়োজন শেষ হইলেও, উন্মার্গগামী লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করার জন্যও তাহাকে বাহির হইতে হইবে। সেই যুগ আসিয়াছে, দিন যে আগত—তাহা এই ভারতের ধর্ম্ম ও আদর্শ-বাদের বস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই। 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' এই ভাবকেই মূর্ত্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প, সর্ব্বত্যাগী।

সৃজনের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে, তার দিগ্‌দর্শন সম্যক্‌রূপে সংশোধিত হওয়ার দরকার ছিল বৈ কি! নতুবা এক একটী বস্তুর গুণ লইয়া এত বিচার কিসের জন্য? সকলেই তো জানে—মানুষ জাগিয়া থাকে, ঘুমায়, আবার সুষুপ্তির ঘোরে অকাতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে অখণ্ড জ্ঞানের স্থিতিটুকু অবধারণ করিবার জন্য, অধ্যাত্ম লেবরেটারিতে গবেষণার টেষ্টটিউবে ইহার বিচার করিতেই এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। অখণ্ডজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা বুঝিয়াছে—জ্ঞান অদ্বৈত বস্তু, অবস্থা ভিন্ন; তাই তো এক অখণ্ড রাজ্য-পাশে খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত কেন, জগৎকে বাঁধিয়া তোলার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প একজন ভারত-বাসীর মধ্যেও দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করিয়াছে! ভাবের স্বপ্নের এ অমর বীর্য্য কি কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে? আঘাতে আঘাতে ইহা যে সহস্র ধারায় জগৎ ছাইয়া দিবে! হাঁ, আবার বলি—দরকার হইয়াছে; এই গলার জোরকে জগতের মাটি পাথর ফুঁড়িয়া মূর্ত্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্যই বলিতেছি—ভারতীয় ভাবের ভাবুক, সংসার-ধর্ম্ম, স্ত্রী পুত্র, গৃহসম্পদ, শত সহস্র কোটী লোকের ভোগের ক্ষেত্র থাকুক, তোমরা কয়েক সহস্র মানুষ কি নির্ম্মম হইয়া বাহির হইতে পার না! এক সহস্র মানুষ যদি মিলে, ভারতের তপোবীর্য্য যে কি দুর্জ্জয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া অসম্ভব হয় না; কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজও "কোটীতে মিলে গুটী" প্রবাদই ঘুরিয়া ফিরিয়া সত্য হয়! কি অসাধারণ ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও সাহস বুকে লইয়া এই নবযুগের উপযোগী এক মুষ্টি মানুষকে স্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা যদি কেহ ভুক্তভোগী থাকেন, বুঝিবেন।

একদল মানুষ চাই—যারা ধর্ম্মের বিকৃতি আত্মবিশ্বাসের প্রলয় আগুনে দগ্ধ করিয়া উন্নতগ্রীব কেশরীর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। ধর্ম্মের মূলে ছিল, শিক্ষা সাধনার একটা অব্যর্থ নীতি। আজ এই ধর্ম্ম-বস্তুটাকে বুঝিবার জন্য, আমাদের করণীয় হইয়াছে, বড় জোর কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা; মুদ্রণ-যন্ত্র এই দিক্ দিয়া আমাদের সুযোগ দেয় নাই, বরং শিক্ষার বিষয়কে লঘু করিয়াছে। যাহা

সাধ্য তাহা উপন্যাসের মত পাঠ্য হইলে তাহার আর মর্য্যাদা থাকে না; বস্তু মাত্রেরই ধর্ম্ম, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধ জ্ঞানের উপরই ইহার সম্যক্ উপলব্ধি নির্ভর করে, এবং ইহার জন্য যে বিধান গ্রন্থে মিলে, তাহা যথাক্রমে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। এইটুকুও যিনি জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁর জ্ঞানের পরিধি মিলে না; মাসিক সাহিত্যে তিনি হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে আজ অতি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হয়েন। হায় অদৃষ্ট! ইহা কি "পৃথিবী গোলাকার"—ভূগোলের এই সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া, পৃথিবীর অনুমান করার মত বস্তু! সাধনা শুধু শব্দ নয়, তার একটা অভ্যাস আছে, 'প্র্যাক্‌টিস্' আছে; তাহা যদি না করা হয়, ভারতের ধর্ম্ম কোনদিন জীবন্ত হইয়া আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদান করিবে না। সেই বাজে কথাটা আর শুনিতে ইচ্ছা হয় না, 'যে ধর্ম্ম যদি ছিল বাপু, তোমাদের এমন দুর্দ্দশা কেন?' একেবারে রাবিশ —জগতের বিবর্ত্তণধারার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ইহাদের বোধগম্য হয় নাই।

গ্রহণ ও বর্জ্জনে জগচ্চেতনা ক্রমবিকাশমান। বর্জ্জন যখন বেদনার কারণ, তখন বুঝিতে হইবে—গ্রহণের যুগ আসিয়াছে। ইংরাজীতে 'ইনার্শিয়া' বলিয়া কথাটা আমাদেরও ছিল।

'উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীক্ষ্যতে।'

উপাদান-কারণ নষ্ট হইলেও, তৎকার্য্য কিয়ৎকাল বর্ত্তমান থাকে। যে অবস্থায় যে উপাদান-শোধনের অভিলাষে আমরা বর্জ্জননীতি আশ্রয় করিয়াছিলাম, তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; এখনও তাহার জের আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে মাত্র। ভারতের আসল ধর্ম্মটা গ্রহণ বর্জ্জন, আত্মোপলব্ধির কারণ মাত্র নহে; তাহা হইতেছে পরম ভোগবাদ। আনন্দ যাহার বিষয়, সে কাঙ্গাল হইবে কেন; কিছু হইতে বিরত, বিমুখ হইবে কেন? তাহার শ্রুতি যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—জগতের আদি অন্ত আনন্দেরই ঢেউ। যে আনন্দ-বস্তুটা প্রকাশত্মক। এই জন্যই তো সৃষ্টির উপায় মায়াকে আমরা নিত্য অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছি; আর এই জন্যই তো ভগবান যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য "আত্মানং সৃজাম্যহম্" বলিয়া পাঞ্চজন্যে ফুৎকার তুলিয়াছেন। এই মায়া যাঁর, তিনিই তাহা সংহরণ করিতে পারেন। তুমি আমি তাঁরই বিগ্রহ। বিগ্রহের সৃষ্টি-লয়-বোধ মূল বোধ-চৈতন্যের 'প্রোজেক্‌সন্'—একটা উৎক্ষিপ্ত গুণ, তাহা অন্তর্য্যামীর প্রয়োজন সিদ্ধ করে; মানুষ সেই প্রয়োজনসিদ্ধি-রূপ ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া যখন "অহং কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে, তখনই বিকৃত সৃষ্টি। পরোক্ষ, অপরোক্ষ—অনুভূতির দুইটা দিক্। একটা দিকেই ঝোঁক দিয়া ঝুলিয়া পড়ে অজ্ঞানী। তাই তো বলিয়াছি, ভারতের ধর্ম্ম-বস্তুটা কেবল গ্রন্থাধ্যয়ন নহে; তাহার যুক্তি আছে। যুক্তি বিকৃত হয়, যদি তাহা অনুভূতিময় হইয়া না উঠে। এই অনুভূতির জন্যই সাধনা। সম্প্রতি সংস্কৃত-শিক্ষা প্রবেশিকায় বাধ্যতামূলক না করার ব্যবস্থা সমর্থন করিতে গিয়া এক ব্রাহ্মণসন্তান গ্রাজুয়েট বলিয়া বসিয়াছেন—"ইংরাজী অনুবাদ পড়িলেই যখন সব জানা যায়, তখন সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য এতখানি সময় আর না দিলেও চলিবে।"—কি অদ্ভুত যুক্তি! সংস্কৃত কেন, কোন ভাষার গ্রন্থই অনুবাদ পড়িয়া তৃপ্তি মিলে না, বিষয়টা জানা যায় মাত্র; কিন্তু সংস্কৃত-শাস্ত্রে যে ভারতের ধর্ম্ম-বস্তু নিহিত, তাহার অনুবাদ একেবারেই নগণ্য। এক অভ্যাসযোগের অনুবাদ "হ্যাবিট" পর্য্যন্ত গড়াইলে প্রমাদের সীমা নাই; তারপর শম, দম, উপরতি আছে—যে শব্দের প্রতি বর্ণটী জগৎ-

সৃষ্টির মূল সুরের সহিত ছন্দ মিলাইয়া উদ্গীত, যার "স্ব-র্ঘ-প্লু" সপ্তসুরের অন্তরে অন্তরে লীলায়িত, যাহা নাদে, মূর্চ্ছনায়, ব্রহ্মযন্ত্র নারদের বীণা, জীবনের তারে তারে ঝঙ্কার তুলে; সে ভাষার প্রতি এরূপ অনাদর শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? এই শ্রেণীর পণ্ডিত যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তবে তাহার কূট অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবোধ না হইলে, ইহা নিরর্থক—তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অতিশয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিবেন।

শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গমের সহিত বিচারের দ্বারা ইহার মধ্যে যে শাশ্বত সত্য আছে, তাহা উপলব্ধির প্রথম সোপান শ্রবণ, তারপর মননের কথা। শ্রবণ বিশুদ্ধ-শ্রুতি না হইলে সম্ভব নয়; এইজন্য ছাত্রদের অধ্যয়নকে তপস্যা নামে অভিহিত করা হইত। কথাগুলি খুব যে গুরুবস্তু তাহা নহে। আমরা একেবারে স্বভাব, স্বার্থ হারাইয়া কূলহারা হইয়াছি; তাই বলিয়া বসিব 'বাপ্-রে, এত কাজ!'—এইজন্য বিদ্যাও হইতেছে চৌদ্দ-পোয়া!—দুর্ভাগ্য ভারতের!

দেশের তরুণদের নিজের ঘরে ফিরিতে হইবে—এত কথা তাহার সঙ্কেত মাত্র। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতি; ইহার উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দরকার। কথাগুলি সাধনায় বুঝা যায়, নতুবা ভাষা মাত্র। আর শাস্ত্রপাঠের জন্য, ইহার প্রবেশিকার দ্বারে পৌঁছিতে হইলে সদাচারপরায়ণ হইতে হইবে। এই শিক্ষা নিম্ন শ্রেণীতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজ যেমন ইংরাজী ম্যাট্রিকের জন্য, শনৈঃ শনৈঃ গোড়া হইতে প্রস্তুত হইতে হয়, জ্ঞানলাভের সেইরূপ উপাদানসংগ্রহ বর্ণমালার সহিত ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত; এইজন্যই শিশুবোধ-ব্যাকরণেই অ আ, ক, খ প্রভৃতি কণ্ঠবর্ণ; এই কয়েক ছত্র আজও পাঠ্যপুস্তক হইতে নিশ্চিহ্ন হয় নাই—সে কথা বুঝাইব কাহাকে?

এক্ষণে বুঝিবার বিষয় হইতেছে—ধর্ম্ম আমাদের ছাড়িলে চলিবে না, পাইতে হইবে। তাহার জন্য আজই বিরাট্ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই; ষড়যন্ত্র-কুশলী বিপ্লবীর মতই, ভারতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-গণকে আজ সংগোপনে উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিতে হইবে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—লয় বা মুক্তি নহে, মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা হিমালয়ের পবিত্র গুহা নহে; ধর্ম্মের প্রকাশ এই জীবন-ক্ষেত্র। আজ সর্ব্বত্র মিথ্যার প্রচার; সে প্রভাবে আচ্ছন্ন হইলে চলিবে না। আমারই এক উদ্যোগী শিষ্য বদরীনাথ দর্শনে বিভোর হইয়াছে। যুক্তি বলিবে, ইতিহাস বলিবে—বৌদ্ধযুগের জয়চিহ্ন আত্মসাৎ করিয়া উহা হিন্দুর পুনর্জ্জয়ের স্মরণ-লিপি মাত্র; বৌদ্ধস্তূপের স্মারকলিপি, আজ পাশ্চাত্যের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। হিন্দু গভীর অধ্যাত্মবাদী; ধর্ম্মক্ষেত্র-গুলিকে অনির্ব্বচনীয় শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ—কোথাও যন্ত্র, কোথাও চক্র, কোথাও প্রস্তর, কোথাও বা ভাস্কর্য্যের বিচিত্র নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশাল হিন্দুজাতিকে আত্মধর্ম্মে সজাগ রাখার প্রয়াস করিয়াছে। সর্ব্বত্র চাই, যুক্তি ও অনুভূতি—তবেই আমরা বিরাট্ হইয়া উঠিতে পারিব; সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের বিগ্রহরূপে ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিব। আমরা যে নারায়ণ; কিন্তু চাই জ্ঞান; সে জ্ঞান হিন্দুর বিপুল শাস্ত্রগ্রন্থে থরে থরে সজ্জিত—ভারতের প্রাণ সেদিকে উদ্বুদ্ধ হইবে কি?

সপ্তবাসি

(উপন্যাস)

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

৫

শশিশেখর সেই যে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কেহ আর তাহার খোঁজ পাইল না। ভবেশ ভাবিয়াছিল, এখন না আসুক, দু'ঘণ্টা পরে আসিবে। পরেও যখন আসিল না, ভাবিল —দিনের বেলা না হয় যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু রাত্রে? অথচ ভবেশের চোখের সুমুখে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, কিন্তু শশিশেখরের দেখা নাই। খাবার জায়গা করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে কনকবরণী তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছিল, 'যাই যাই' করিয়া রাত্রি বারোটার পর উঠিল। খাওয়া তাহার একরকম হইল না বলিলেই হয়, কনকবরণীর এত অনুরোধ সত্ত্বেও ভবেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া আবার তাহার সেই নীচের ঘরে গিয়া বসিল। রাত্রে আহারাদির পর নীচে সে বড়-একটা যায় না, দোতলায় তাহার শোবার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে। অন্যদিন হইলে ইহার জন্য কনকবরণী বলিতে তাহাকে আর কিছু বাকী রাখিত না; কিন্তু আজ আর সে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া নরু তাহার নীচের ঘরে দিতে আসিয়াছিল, ভবেশ বলিল,—'যাস্‌নে শোন্!'

নরু সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

ভবেশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খেয়েছিস্?'

নরু বলিল, 'আজ্ঞে না।'

ভবেশ বলিল, 'খেয়ে কি কর্‌বি বল্ দেখি?'

নরু একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'খেয়ে? আজ্ঞে······এঁটো বাসন-কোসন্ তুলে' রান্নাঘরটা জল দিয়ে ধুয়ে ···· '

ভবেশ বলিয়া উঠিল, 'ওরে না না হতভাগা, তা জিজ্ঞেস্ করিনি, তারপর কি করবি?'

তাহার পর আর কোনও কাজ তাহার নাই। কি যে জবাব দিবে নরু ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। হতভম্বের মত হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করিতে লাগিল।

ভবেশের হাতের কাছে কলিকার তামাক পুড়িতেছিল। সেদিকে খেয়াল তাহার নাই। গড়্‌গড়ার নলটা হাতে লইয়া বলিল, 'ঘুমোবি ত? ······কোন্ ঘরে ঘুমোস্?'

নরু বলিল, 'আজ্ঞে, কোনোদিন এই ঘরে, কোনোদিন এই পাশের ঘরে।'

ভবেশ বলিল, 'তারপর? ঘুমোবি ত' ঠিক মরা মানুষের মত, ডেকে ডেকে কেউ যদি মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করে' ফেলে তবু উঠ্‌বিনে, কেমন?'

ঘুম তাহার সত্যই বড় খারাপ, ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না—তাহা সে নিজেও জানে। নরু ঈষৎ হাসিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশ বলিল, 'হাসি নয়, শোন্! আজ তোকে ঘরে শুতে হবে না, দরজার এই পাশটাতে ওই রকের ওপর শুবি।'

বলিয়াই কি যেন ভাবিয়া সে হাত নাড়িয়া আবার কহিল, 'না না শোন্, ওখানে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকালে ত' চলবে না, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর্। সদর দরজার পাশের এই ঘরটাতেই শুবি। শুবি একেবারে জানালার কোল ঘেঁষে। ডাকলেই সাড়া দিস্ হতভাগা, চট্ করে' উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিস্। ভয়ে-ভয়ে শশী আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস্ করে ত' বলিস্—'মামা তোমার কিছু…' বলিয়াই একটা ঢোঁক্ গিলিয়া কথাটা শেষ করিল, 'কিছু বল্‌বে না। তুমি চুপ করে' শোও।' - যা খেয়ে নিগে যা।'

বলিয়া নরুকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া ভবেশ তাহার কোঁচার খুঁটে চোখ দুইটা লুকাইয়া মুছিয়া লইয়া গড়্‌গড়ার নলটা টানিতে আরম্ভ করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘরের কাজ সারিয়া নরু কোন্ সময় নীচে নামিয়া আসিয়া মনিবের নির্দ্দেশমত পাশের ঘরের জানালার কাছে শুইয়া পড়িয়াছে।

তামাক খাইতে খাইতে ভবেশ হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সহসা দরজার কাছে খুট্ করিয়া কিসের শব্দ হইতেই ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, শশী?'

দেখে শশী নয়, তাহার স্ত্রী কনকবরণী!

নিঃশব্দে হাতের লণ্ঠনটা মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, আর-একটা লণ্ঠন নিভাইয়া দিয়া, তক্তপোষের উপর হইতে গড়্‌গড়াটা সরাইয়া, রাস্তার দিকের খোলা জানালাটা সে বন্ধ করিতে যাইতেছিল, ভবেশ নিষেধ করিল; বলিল, 'থাক্, ওটা বন্ধ কোরো না।'

কনকবরণী বলিল, 'ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে?'

ভবেশ বলিল, 'না।'

কনকবরণী তখন ধীরে-ধীরে বাহিরের খোলা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ওঠো একবার, চাদরটা পেতে দিই ভাল করে'।'

ভবেশ উঠিল না। বলিল, 'থাক্।'

কনকবরণী সেদিন আর কোনো কথার প্রতিবাদ করিল না। বালিসটা স্বামীর মাথার নীচে দিয়া নিজেও সেই তক্তপোষের একপাশে নিঃশব্দেই শুইয়া পড়িল।

রাত্রির মধ্যে ভবেশ যে এমন কতবার চমকিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। খানিকটা ঘুমাইয়া, খানিকটা জাগিয়া, খানিকটা বা কত রকমের কত বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিটা কোনোরকমে কাটাইয়া দিয়া প্রভাতে যখন সে শয্যাত্যাগ করিল, মনে হইল, বুকের ভিতর হইতে কিসের যেন একটা গুরুভার ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, বেদনায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ভরিয়া আছে।

উঠিয়াই সে প্রথমে সদর দরজার কাছে গেল। দরজা তেমনিই বন্ধ। খুলিয়া একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার উপর এদিক-ওদিক যতখানা দৃষ্টি যায় তাকাইয়া দেখিল। তাহার পর ঘরে আসিয়া প্রত্যেকটি ঘর ভাল করিয়া দেখিয়া স্নানের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

স্নান করিয়া চা খাইয়া জামাজুতা পরিয়া ভবেশ বাহির হইয়া যাইতেছিল, কনকবরণী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়?'

ভবেশ বলিল, 'আসি।'

'আসি' বলিয়া সেই যে সে বাহির হইয়া গেল, সারাদিনের পর বাড়ী ফিরিল রাত্রে।

মুখের চেহারা দেখিয়া কনকবরণী কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। জুতা-জামা খুলিয়া ভবেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই বলিল, 'নাঃ, সেখানেও যায় নি।'

এতক্ষণে কনকবরণী কথা বলিতে সাহস করিল। বলিল, 'পিসি থাকলেও বা যেতো। এখন আর কার কাছে যাবে সেখানে?'

ভবেশ মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, 'তবে সে গেল কোথায়?'

কনকবরণী বলিল, 'ফিরে সে আসবে নিশ্চয়।'

চুপ করিয়া খানিক্ ভাবিয়া ভবেশ বলিল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

কিন্তু মনের আশা তাহাদের মনেই রহিয়া গেল।

অনুসন্ধানের ত্রুটি ভবেশ করে নাই। পুলিশে খবর দিয়াছে। খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে। ফটো থাকিলে বোধহয় তাহাও ছাপিয়া দিত।

শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না।

শশিশেখর নিরুদ্দেশ!

খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভবেশের চোখের সুমুখে শুধু সেই ছবিখানি ফুটিয়া ওঠে।—গায়ে একখানি গেঞ্জির উপর পরনের কাপড়খানি জড়ানো, খালি পা, শুষ্ক ম্লান মুখ, কপালের উপর মাথার কোঁকড়ানো কালো চুলগুলি আসিয়া পড়িয়াছে......!

কখনও মনে হয়, হেঁটমুখে সজলচক্ষে সে দাঁড়াইয়া, আর তাহার চোখের সম্মুখে রামায়ণের কয়েকটি ছিন্ন পত্রে ধূ ধূ করিয়া আগুন ধরিয়াছে!

কখনও-বা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে হয় ত কোন্ রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে,—কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই, করুণা করিয়া কেহ তাহাকে ডাকিয়া হয় ত দু'টা কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই!

কিম্বা হয়ত' কোনও গৃহস্বামী দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিল। করুণাময়ী স্ত্রী তাহার এ বদান্যতা সহ্য করিতে পারে নাই। চোর অপবাদ দিয়া মারিয়া হয়ত তাহাকে আবার তাড়াইয়া দিয়াছে। শশিশেখরের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ!...

ভবেশ শশিশেখরের খোঁজ পাইল না।

কিন্তু আমাদের সে খোঁজ রাখিতে হইয়াছে। না রাখিলে এইখানেই গল্পের যবনিকা টানিয়া দিতে হইত।

নরু যখন তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল, শশিশেখর তখন সেখান হইতে বহুদূরে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা সে রেল-ষ্টেশনে চলিয়া যায়। যাইবামাত্র দেখে, প্ল্যাটফর্ম্মে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দাঁড়াইয়া আছে। শশিশেখর আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহারই একটি কামরার একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

প্রত্যেক ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীখানা একবার করিয়া দাঁড়ায়। শশিশেখরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। এখনই হয়ত কেহ আসিয়া তাহার কাছে টিকিট চাহিয়া বসিবে, না দিতে পারিলেই গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবে।

কিন্তু ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে গাড়ী বহুদূর চলিয়া আসিল, টিকিট তাহার কাছে

কেহই চাহিল না। জানালার কাছটিতে মুখ রাখিয়া শশিশেখর বাহিরের পানে তাকাইয়াছিল। বেলা ক্রমশঃ পড়িয়া আসিতেছে। লাইনের দুই পাশে কোথাও-বা দিগন্ত-বিস্তৃত শুক্‌নো ধানের মাঠ, কোথাও-বা ছোট ছোট গ্রাম! গরুর পাল লইয়া রাখাল-বালক গ্রামে ফিরিতেছে। লাইনের ধারের পুষ্করিণীতে গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া জ লইতে আসিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে পুকুরের পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ট্রেণ দেখিতেছে। শশিশেখরের মনে হইতেছিল, গাছে-ঢাকা ছোট্ট ঐ গ্রামে যদি তাহার বাড়ী হইত, আর সে যদি এমনি বহু দূর দেশে চাকুরি করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার মাও অমনি পুকুরের জলে কলসী ভাসাইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইত, গাড়ী হইতে হাত নাড়িয়া সেও জানাইয়া দিত যে, সে এই গাড়ীতেই চলিয়াছে।

মা'র কথা মনে পড়িতেই শশিশেখরের মনে হইল, সে একা, তাহার মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, বোন্ নাই, আত্মীয়স্বজন গৃহসংসার—কেহ কোথাও নাই! এত বড় এই বিরাট্ পৃথিবীর মধ্যে এমন একটিও মানুষ নাই, যে তাহাকে স্নেহ করে। শুষ্ক নীরস কঠিন এই পাষাণী ধরিত্রীর উপর আজ সে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় চলিয়াছে জানে না, এম্‌নি করিয়াই না জানি তাহাকে তাহার সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলিতে হইবে। কত দুঃখ, কত আঘাত, স্নেহহীন কত নিষ্ঠুর অভিশাপ যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কে জানে! ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাহিরের কোনও বস্তুই তখন আর ভাল করিয় দেখা যায় না। গাড়ীর ভিতর আলো জ্বলিয়াছে। সারা রাত্রি ধরিয়াই গাড়ীটা যদি চলে ত' বড় ভাল হয়। সকালে সে গাড়ী হইতে নামিবে। তাহার পর কি করিবে জানে না।

তাহার পাশেই একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বসিয়াছিল। বয়স বোধকরি তাহার মামার চেয়েও কিছু বেশি। শশিশেখরকে হাতের ইসারা করিয়া বলিল, 'এই! হঠো হঠো, জেরা হঠ্ যাও উধার্!'

শশিশেখর একটু সরিয়া বসিল।

মাথার উপরের 'বাক্স্' হইতে লোকটি একটা 'টিফিন্ ক্যারিয়ার্' নামাইল। নামাইয়া বেঞ্চের উপর বেশ করিয়া চাপিয়া বসিয়া এলুমেনিয়ামের বাটিগুলি বাহির করিয়া খাবার খাইতে লাগিল। খাইবার সে কী অপরূপ ভঙ্গী! একখানি করিয়া লুচি তুলিয়া লয়, বেশ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লোলুপদৃষ্টিতে সেটিকে বার-কতক্ দেখে, তাহার পর হাত দিয়া ভাঁজ্ করিয়া প্রকাণ্ড বড় তাহার মুখের 'হাঁ'র ভিতর লুচিটি ঢুকাইয়া দিয়াই একটি একটি করিয়া ভাজা আলু মুখের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিতে থাকে, আর মনের আনন্দে পা নাচাইতে নাচাইতে এদিক্-ওদিক্ তাকায়।

চোখের সুমুখে তাহার এই খাওয়া দেখিয়া শশিশেখরের মনে পড়িল, কখন্ সেই বেলা দশটার সময় চারটিখানি ভাত সে খাইয়াছে, তাহারপর এই এখনও পর্য্যন্ত একটু জলও সে খায় নাই। এতক্ষণ সেকথা সে ভুলিয়াই ছিল। এইবার যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে।

কিন্তু সেকথা ভাবা বৃথা। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই যে, কিছু কিনিয়া খাইবে!

শশিশেখর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ীটা যে-ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, প্রকাণ্ড ষ্টেশন। চারিদিকে

আলো, ফিরিওয়ালাদের চীৎকার, কতরকমের কত খাবার মাথায় লইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কত যাত্রী উঠিতেছে, নামিতেছে;—শশিশেখর ম্লানমুখে সেইখানেই চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। একবার ভাবিল, এইখানেই নামিয়া পড়ে; আবার ভাবিল, না, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, রাত্রে নামিয়া কাজ নাই, একেবারে সকাল হইলেই নামিবে। হিন্দুস্থানী লোকটির খাওয়া তখন শেষ হইয়াছে। বাটির অবশিষ্ট লুচি-তরকারি সে প্লাট্‌ফর্ম্মের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেইখান হইতেই ডাকিতে লাগিল, 'পানি-পাঁড়ে! পানি-পাঁড়ে!'

কোথা হইতে দুইটা হ্যাংলা কুকুর ছুটিয়া আসিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত লুচি কয়খানি লইয়া খাওয়া-খাওয়ি সুরু করিয়া দিল। রুগ্ন কঙ্কালসার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ট্রেণের যাত্রীদের কাছে বোধকরি ভিক্ষা করিতেছিল, কুকুরের মুখে অতগুলি খাবার দেখিয়া তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, দু'জনেই একসঙ্গে ছুটিয়া আসিতে গিয়া কুকুরের গায়ে হোঁচট্ খাইল কি ছেলেটা ঠেলিয়া দিল কে জানে, মেয়েটি খানিক্ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া টাল্ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সর্ব্বৎ-ওয়ালার চাকা-দেওয়া ঠেলা-গাড়ীটায় ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, আর ঠিক সেই অবসরে ছেলেটা হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কুকুরদুইটার মুখ হইতে লুচিকয়খানি একরকম জোর করিয়াই টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া অন্যদিক্ দিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। মেয়েটাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিছন ধরিল,—'আমাকেও একটু দে রতন্!'

পানি-পাঁড়ে জল দিতে আসিয়াছিল। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জানালার বাহিরে দুইটি হাত বাড়াইয়া তাহারই উপর জল লইয়া আল্‌গোছে ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইতে লাগিল।

শশিশেখরের কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল। তবু সে তাহার সেই ছোট ছোট হাতদুইটি জানালার বাহিরে বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিয়া বলিল, 'জল খাব।'

পানি-পাঁড়ে তাহার সেই কলাই-করা গেলাস দিয়া শশিশেখরের হাতের উপর জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, 'পিও।'

কিন্তু হাতের উপর মুখ রাখিয়া আল্‌গোছে কেমন করিয়া পান করিতে হয় তাহা সে জানে না। অঞ্জলি-ভর্ত্তি জলটুকু মুখের কাছে আনিয়া পান করিতে গিয়া দেখে, আঙুলের ফাঁক দিয়া সমস্ত জলটুকুই মাটিতে পড়িয়া গেছে, মুখে যেটুকু গেল তাহাতে তাহার শুষ্ককণ্ঠ ভিজিল কিনা সন্দেহ।

জলের জন্য শশিশেখর আবার হাত পাতিল। পানি-পাঁড়েও আবার তাহার বাল্‌তি হইতে গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া তাহার সেই প্রসারিত অঞ্জলি-পুটে জলও একটুখানি ঢালিয়া দিল; কিন্তু শশিশেখরের দুর্ভাগ্য, বাঁশী বাজাইয়া হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)



বীরের অভিযান—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে'
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে'
স্ব-কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

—ইহা যাহাদের জীবনে কবি-কল্পনা মাত্র নয়, তারাই জগতের বীরজাতি। সেই "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—জয়লক্ষ্মী সর্ব্বক্ষেত্রে তাহাদিগকেই বরণ করিয়া লইবে, ইহা বিচিত্র নয়। দুর্গম গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে বার বার নয়বার অভিযানের পর দশম অভিযান এইবার সত্যই সফল হইল। গাড়োয়াল-রাজ্যের শৈলচূড়া কামেট তিব্বতীয়গণের নিকট "কাঙ্গমেড" অর্থাৎ অধঃ-তুষার স্তর বলিয়াই পরিগণিত। সারা ব্রিটিশসাম্রাজ্যে ইহা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ-শৃঙ্গ। এ পর্য্যন্ত গিরি-রাজ্যজয়ের সর্ব্বোচ্চ উদ্যম "জনসং" শৃঙ্গারোহণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল—ইহা "দিরেনফার্থ অভিযান" নামে সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু এই "জনসং" শৈলচূড়া কামেট অপেক্ষা ১০০০ হাজার ফুট নিম্নস্থিত। এবার কামেট অভিযানের উদ্যোক্তা—এক ব্রিটিশ বাহিনী। ইহার নেতা মিঃ এফ, এস, স্মিথ। বৈজ্ঞানিক যুগের এই বিস্ময়কর কীর্ত্তির বিজয়-লাঞ্ছনা তাঁহারই উন্নত ললাটে সুচিহ্নিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে মিঃ সি, এফ, মীড দুইবার অসমসাহসিক প্রয়াসের পর, ২৩,৫০০ ফুট উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও অতিশীতজনিত অবসন্নতায় পরিশেষে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ২১শে জুন রবিবার, তাঁহার বীর সহতীর্থবৃন্দ এবং শৈলারোহণপটু অকুতোভয় ভারতীয় অনুচরগণের সহায়তায় মিঃ স্মিথ ২৪,৪৪৭ ফুট উচ্চ কামেটশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বিজয়পতাকা প্রোথিত করেন।



কামেট অভিযানের নেতা—মিঃ এফ, এস, স্মিথ

এ অভিযান তরুণেরই অভিযান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে ছয়জন তরুণ সর্ব্বপ্রথম এই তুষার-কিরীট দলিত করিয়া জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তেত্রিশের ন্যূনবয়স্ক এই



কামেট গিরিশৃঙ্গমালা

অভিযানে নিরক্ষর ভারতীয় কুলি মজুরগুলি কম সহায়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু ইহারা হস্ত স্বরূপ। মস্তিষ্কের পরিচালনাভাবে সারা ভারতই আজ বীরজাতির যন্ত্রপুত্তলিকা মাত্র।

রণনেতার ভবিষ্যদ্বাণী

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণসম্রাট্ কাইজার উইলিয়মের প্রধান সমরসচিব জেনারেল লুডেণ্ডর্ফ এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ভাবী সমরের কাল-মেঘচ্ছায়ায় ইউরোপের গগন আজ ঘনতমসাবৃত, ইহার সম্বন্ধেই তাঁহার পূর্ব্ব-সতর্কতাবাণী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিৎ মাত্রের প্রণিধানযোগ্য। আদার ব্যাপারী হইলেও, ইউরোপের এই ঘোর দুর্ভাগ্যকল্পনা সুদূর এশিয়াবাসী আমাদের মনেও কৌতূহলের সহিত আতঙ্কেরও সৃষ্টি করে।

জেনারেল লুডেণ্ডর্ফ বলেন—এবার ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রের সমর-কেন্দ্র হইবে দক্ষিণ জর্ম্মণী ও দক্ষিণ অষ্ট্রিয়া। তিনি মহাযুদ্ধের তারিখ পর্য্যন্ত যেন অভ্রান্ত কণ্ঠে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। এই দিনই ভাগ্যদেবতার সঙ্কেতে ইউরোপের মাথায় আবার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর এ মহাযুদ্ধে এবারও ইংলণ্ডকে খুব ভাল করিয়াই লাগিতে হইবে।



জেনারেল লুডেণ্ডর্ফ

যুদ্ধ বাধিবে—ফ্রান্সের সহিত ইতালীর। ফরাসীপক্ষে যাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইবে তাহারা ক্ষুদ্র বেলজিয়ম, রুম্যানিয়া, পোল্যাণ্ড, জেকোশ্লো-ভেকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া; পক্ষান্তরে, ইতালীর মিত্ররূপে দাঁড়াইবে ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, তুর্ক ও রুষিয়া। এ যুদ্ধ হইবে গত যুদ্ধের চেয়ে কল্পনাতীত অধিক নিষ্ঠুর, অধিক বর্ব্বরতাময়।

এই "ভাবী মহাযুদ্ধ" গ্রন্থে জেনারেল লুডেণ্ডর্ফ যেন পরিদৃশ্যমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াই আরও

বলিতেছেন—ভয়ঙ্কর রক্তস্রোতে ভাসাইয়া ফ্রান্সের দুর্জ্জয়বাহিনী ইতালীর রণচমূকে ইতালীর অভ্যন্তরে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে; ইতালীতে বাধিবে অন্তর্বিপ্লব —ফ্যাসিসিজমের পতন হইবে। ধর্ম্মসম্রাট্ পোপ স্পেনে পলাতক হইবেন; কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই, তিনি নিহত হইবেন। বার লক্ষ বেলজিয়াম ও সাত লক্ষ ফরাসী সেনা হানোভার জয় করিয়া হামবার্গ অভিমুখে ধাবিত হইবে। তিন লক্ষ ব্রিটিশবাহিনী চতুর্দ্দশ দিনে কীল-বন্দরে অবতরণ করিয়া অসীম সাহসে ফ্রেঞ্চ ও বেলজিয়ানদিগকে তাড়াইয়া ডেনমার্ক অভিমুখে অগ্রসর হইবে। ভীরু ইতালী এক প্রকার যুদ্ধই করিবে না। তাহার অভিযানের উদ্দেশ্য— ক্যাথলিক-বিরুদ্ধ প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া সমগ্র ইউরোপকে পোপের পদানত করা। রুষিয়ার সহিত মুসোলিন ইতিপূর্ব্বেই সন্ধিবদ্ধ হওয়ায়, ইতালীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ধর্ম্মগুরু পোপেরই যন্ত্রপুত্তলিকারূপে বৈপ্লবিক ফ্রান্সকে শত্রু রূপেই দেখিবে অথচ রুষকে মিত্র রূপেই যুদ্ধকালে পাইবে—রুশকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া, ফ্রান্সকে বিনষ্ট করিতে চাহিবে।

লুডেণ্ডর্ফ দেখাইয়াছেন — ইংরাজে ও বেলজিয়ানে যুদ্ধসমাপ্তির পূর্ব্বেই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নূতন রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিবে। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও ধর্ম্মমূলক অন্তর্বিপ্লবে নিমগ্ন হইবে। যুদ্ধের গুরুভার জর্ম্মণীর স্কন্ধেই ঘটিবে। পরিণামে জর্ম্মণী হইবে—ধ্বংস-যজ্ঞের শ্মশান।

সেনানীর এই ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী রণক্লান্ত ইউরোপ কি আজ কাণ পাতিয়া শুনিবে?

মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা—

ইউরোপ শুক্রাচার্য্যের দেশ। দৈত্যগুরু মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন। মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করার বিধান দিতে দেব দৈত্য উভয় পক্ষ হইতে আবহমান কাল ধরিয়া চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচ্য পাইয়াছে অধ্যাত্ম অমরত্বের বিধান, পরাবিদ্যার সাধনা—"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" প্রতীচ্য চলিয়াছে জরামৃত্যু জয় করার পথে—কেমন



মিঃ মলে মার্টিন

করিয়া ইহজগতেই জরা ব্যাধি কম করিয়া, শেষে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত এড়াইয়া সুদীর্ঘ ভোগজীবন অটুট রাখিবে। অষ্ট্রিয়ার ডাক্তার বানরগ্রন্থীবিৎ ভরনফের যৌবনদায়িনী বিদ্যা ইতিমধ্যেই নানা দেশে পরীক্ষিত হইয়া বৃদ্ধকে যৌবন ফিরাইয়া দিতে প্রযুক্ত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে রুষিয়ার বৈজ্ঞানিক ভেক বা কুকুরের সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড লইয়া

কৃত্রিম জীবনীশক্তির সঞ্চারে ক্ষণকালের জন্য জীবিতবৎ প্রক্রিয়া প্রদর্শনে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর এক ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক মিঃ ডব্লিউ মর্লে মার্টিন সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন—মৃত্তিকা-গর্ভে নিহিত বহু যুগের মৃত জীবকঙ্কালে তিনি নবজীবন সঞ্চারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষাগারের টেবিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র হইতে মৃত মৎস্য, টিকটিকি ও অন্যান্য প্রাণিনিচয় সহসা জীবন পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছেন —জীবদেহের মৌলিক জীবাণু (protaplasm) অমর। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গিরিগুহায় পড়িয়া থাকিলেও, তাহার তত্ত্ববস্তুর ধ্বংস হয় না। এরূপ গতাসুঃ জীবদেহের অস্থিপঞ্জসার নিস্পন্দ কঙ্কালে, যাহার মেরুদণ্ডটি মাত্র অবশিষ্ট এবং মুণ্ড ও পদের একটা প্রয়াস মাত্র দেখা যায়, তাহাতে জীবনের বুদ্বুদ জাগিয়া উঠিল, সেগুলি কঙ্কালটীকে সাবয়ব করিয়া গড়িয়া তুলিল এবং পরিশেষে তাহাতে গতির প্রক্রিয়াও ফুটিয়া উঠিল—ইহা তাঁহার চক্ষের উপরে সম্ভব হইয়াছে, আর তিনি তাই দৃঢ়নিশ্চয়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন—"প্রাণ অমর। দেহই মরে, আর কিছুই নয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহের সারবস্তু যে মৌলিক জীবাণু তাহা অবিনশ্বর। অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। কাল তাহাকে নষ্ট করিতে অসমর্থ।"

শুন ভারত, তোমার অমরগীতামন্ত্রের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি জাগ্রত জাতির কণ্ঠে কেমন বিজয়ী সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

"নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

—শুধুই আত্মা তো অচ্ছেদ্য অদাহ্য নয়, প্রাণও অমর। তাই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দীক্ষাগুরু শুক্রাচার্য্যের কণ্ঠধ্বনিই মিঃ মার্টিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে—

"I am going to produce Man from the rock, one day. It is just a question of time."

দেবভূমি ভারত, তুমি আজ শুধু উৎকর্ণ হইয়া এ দম্ভোক্তি শ্রবণ কর; আর গৃহকোণে বসিয়া প্রাচীন শাস্ত্র উল্টাইয়া বল—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

বিজ্ঞানের জয়—

বিজ্ঞানবলে মানুষ দেশ ও কালকে সম্পূর্ণ জয় করিতে না পারিলেও, অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছে। আমেরিকার অধিবাসী মিঃ হেরল্ড গেটি এবং মিঃ উইলি পোষ্ট সাত দিনে বিমানপোতে পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। তাঁহারা



মিঃ উইলি পোষ্ট ও মিঃ হেরল্ড গেটি

রুষিয়ার মস্কো নগরে নিরাপদে পৌছিয়াছেন—এ পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জর্ম্মনীর প্রসিদ্ধ পুষ্পকরথ "গ্রেফ জেপলিন" ২০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছিল। বর্ত্তমান বৈমানিকদ্বয় "গ্রেফ জেপেলিন"কে পরাস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।



স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সহিত কথোপকথন

[শ্রীমতিলাল রায়]

কথা খুবই জমিয়া উঠিয়াছিল। পিতৃতুল্য জ্ঞানবৃদ্ধ স্যার সর্ব্বাধিকারী আমার অন্তরের কথাগুলি মর্ম্ম দিয়াই শুনিতেছিলেন। উপাসনার সময় হইল, কাজেই দুইজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া পড়িলাম; তিনি সোফারকে ডাকিয়া আমায় বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশলাভের সুযোগ হয় নাই, আমার কথাই বিশ কাহন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁর হৃদয়ের স্পর্শটুকু আমায় ধন্য করিয়াছে।



নিজ ভবনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কথাগুলি অন্তরঙ্গের সহিত যেমনভাবে হয় তেমনিই হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আমার সহিত যাহারা ছিল, এই প্রসঙ্গ "প্রবর্ত্তকে" বাহির করা তাহাদের একান্ত ইচ্ছা হওয়ায় ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইহার সমর্থন করায়, আমি বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ— বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার মত করিয়া আমি গুছাইয়া সতর্ক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করি নাই; দ্বিতীয়তঃ—এই সকল প্রসঙ্গ নানা ভঙ্গীতে "প্রবর্ত্তকে" বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে—একদিক্ দিয়া ইহাতে আত্মকথাপ্রচার দোষ জন্মে, অন্য দিক্ দিয়া একই প্রসঙ্গের পুনরুক্তিতে পাঠকদিগের বিরক্তিরও আশঙ্কা আছে। তাঁহাকে কুণ্ঠিত হইয়া ইহা ব্যক্তও করিলাম; কিন্তু

তিনি আগ্রহসহকারে বলিলেন—"আপনাদের কথা বাহিরের লোক তেমন জানে কৈ! আরও অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন আছে; কাজটা কি কম হইয়াছে, এক একটী ছেলে যেন রত্ন—"...... আমার কাছে আসিয়াছিল, সে যে এমন শ্রুতিধর তাহা কি জানি! "প্রবর্ত্তক" পড়িয়া অবাক্ হইয়া দেখি, একটী কথাও বাদ পড়ে নাই। মানুষ অনেকগুলি গড়িয়াছেন, ইহাই তো যথেষ্ট; তারপর এমন স্বাবলম্বীর সাধনা আর কোথায় হইয়াছে, ইহাই আমায় বড় আকৃষ্ট করিয়াছে। আপনাদের আশ্রমের কথা খুব প্রচার হওয়া ভাল; আপনার এই কথাগুলি "প্রবর্ত্তকে" বাহির করিতে পারেন।" তাঁর আদেশ অস্বীকার করার উপায় রহিল না। আমার অনুরক্ত সহকারীর লেখাটা আমি নিজেই লিখিলাম; কেননা, ভক্তির আতিশয্য হইতে কতকটা রক্ষা পাইব।

অক্ষয়-তৃতীয়ার উৎসবে বাঙ্গলার মনীষিবর্গের সহিত আলাপ পরিচয়ের একটু সুযোগ পাইয়াছি। এই বৎসর বৈষ্ণবচূড়ামণি পরমভক্ত জ্ঞানপ্রবীণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় উৎসব-সূচনায় অগ্রপুরোহিত হইয়া আমাদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে'র প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে জড়াইয়া পড়ায়, তাহাদের জীবন অবকাশহীন হইয়া পড়িয়াছে; বৎসরান্তে শিক্ষা, সাধনা, সমাজ ও দেশের হিতকর নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের বিচিত্র রেখাচিত্রে, দ্রব্যসামগ্রীর সমাবেশে উৎসবক্ষেত্রকে কয়েকদিনের জন্য শিক্ষাসাধনার তীর্থরূপে গড়িয়া তোলার কার্য্য একপ্রকার আমাকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমান্ ....'র সাহায্যে কেবল ছাত্রগণের শ্রমেই এবার অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়; এই হেতু উৎসবারম্ভকালে এমনই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যাহার জন্য সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে যথাসময়ে আনিতেও সমর্থ হই নাই। তিনি সদাশয় ব্যক্তি, হৃদয়বান্ পুরুষ—একপ্রকার নিজেই সঙ্গী দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সহিত প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের আবাহনটুকু করিয়াই সারাদিন আর সাক্ষাতের অবসর পাই নাই। তাঁর সঙ্গে কথাই ছিল এখানে আসিয়া আমার সহিত নিবিড়ভাবে অনেক কিছু আলোচনা করিবেন; তাহা একেবারেই সম্ভব হয় নাই। এই জন্য আমার যে কি কুণ্ঠা হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিবার ভাষা পাই নাই। এই ত্রুটির মার্জ্জনা চাহিতেই তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হইবার সুযোগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তিনি সে সুযোগ দিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন এবং তাঁর হৃদয়ের পরিচয় ও স্পর্শ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

প্রাতঃকালেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্থির হইয়াছিল। কলিকাতার কর্ম্মমুখর রাজপথের ধূলি উড়াইয়া প্রাতঃসমীরণ আশ্রমের নীরব মুক্ত আব্‌হাওয়ার সহিত ইহার কত যে পার্থক্য, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিল। প্রায় ৯ টার সময়ে স্যার সর্ব্বাধিকারীর ভবনের দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইলাম। প্রখর সূর্য্যকিরণের ঢেউ অলিন্দে উঁকি মারিতেছিল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বারান্দায় বসিয়া এক ভদ্রলোকের সহিত বিষয়-সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন, দেখিবামাত্র সাদর অভিনন্দন করিলেন, নিজের সৌভাগ্যের কথা জানাইয়া আমায় নিরতিশয় লজ্জা দিলেন। এই প্রতিভাশালী মহাশয় ব্যক্তির বিনয়নম্র ব্যবহারে আমি বিস্মিত হই নাই; কলিকাতার মত স্থানে এই উচ্চ অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে স্যার সর্ব্বাধিকারী বর্ত্তমান যুগের উচ্চ শিক্ষার

চরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি যে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন—হিন্দুর ব্যবহারগত ছন্দ ও রুচির বিকার এই ক্ষেত্রে তাই সম্ভব হয় নাই।

তিনি দ্রুত তাঁর সুসজ্জিত বসিবার ঘরখানিতে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মক্রটির কথা উত্থাপন করিবামাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন —"একেবারে পরের মত বলিতেছেন—কাজটা খুব বৃহৎ, ব্যস্ত ছিলেন খুবই, তাহার জন্য কি হইয়াছে! শরীর ভাল থাকিলে আবার আমার যাইবার ইচ্ছা আছে।"

প্রথমেই বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ উঠিল। "অক্ষয়তৃতীয়া"র প্রদর্শনীতে এ বৎসর "চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও ইহার ধারাবাহিক পরিণতি"র ইতিহাস মূর্ত্তির সাহায্যে পরিস্ফুট করার আয়োজন হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম সমাজবিবর্ত্তনে যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ভিতর খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিই ছিল; ভগবানের মুখ হইতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ইহার উৎপত্তি যে রূপক, ইহা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নজীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শিত হওয়ায়, বর্ণাশ্রম জন্মগত, জাতিগত অপেক্ষা গুণগত যে অধিক, ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছিল এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সময়ে ইহার পরিচয়প্রসঙ্গে আমার উক্তিটুকু শুনিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন —আমরা বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিতে চাই। দীর্ঘ যুগের গবেষণায় ও সাধনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে সমাজশৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অকস্মাৎ ভাঙ্গিবার প্রয়াস কোন সনাতন হিন্দুই নীরবে সহ্য করিতে পারেন না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মী স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাই সভাক্ষেত্রেই আমার কথার মিষ্ট অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জিনিষটা সুস্পষ্ট করার জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন হওয়া মাত্র আমি বলিলাম—"সেদিন বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম, বোধহয় সেটা তেমন সুস্পষ্ট হয় নি; কেন না, আপনার স্পষ্টই ধারণা হয়েছিল যেন আমরা বর্ণাশ্রম ভাঙ্গতেই চাইছি, প্রকৃতপক্ষে এ-ভাবের কথা আমি বল্‌তে চাই নি। আমার বলার উদ্দেশ্য—মানুষের মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠ গুণের প্রকাশ হয়, তার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রকাশ কে বাধা দিবে? গলায় পৈতা দিলেই তো ব্রাহ্মণ হয় না; এই পরম অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে—এই ঔদার্য্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই যদি দেখান, তবে যারা ব্রাহ্মণত্ব চায়, তারাই বেশী দায়ে পড়্‌বে। জাতি-ব্রাহ্মণ হ'লেই তো ব্রাহ্মণ হয় না, গুণাধিকার তো সহজ নয়! জন্মগত সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকার অর্জ্জন সহজ হয় না; অনাচারী হিন্দুসমাজ, অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ কি সহজ হবে—বিনা তপস্যায় ইহা সিদ্ধ হওয়ার উপায় নাই। ব্রাহ্মণসমাজ অনর্থক কেন সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট হবে! ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করা; ভারতের ধর্ম্মই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ যদি নূতন সৃজন গড়ে' তুলে, তবেই তো ভারতের দান, ভারতের ঔদার্য্য তুলনাহীন হবে। হিন্দুর ধর্ম্ম উদার, বিরাট্; কিন্তু কালবশে স্বার্থই আমাদের কাছে বড় হ'য়ে উঠেছে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব হারিয়ে সঙ্কীর্ণতাকে ধর্ম্ম ব'লে আশ্রয় করেছি; আচারই বড় হয়েছে—বস্তু গেল কোথা! প্রতিক্রিয়াবলে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধাচারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যে নিজে হিন্দু। তাই হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুর জীবনে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক—এই আকুলতা

নিয়েই তো সব বাধার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। পুরাণে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে—কত অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের আসন অধিকার করেছেন; সেদিন নাকি ব্রাহ্মণের আর্যদৃষ্টি ছিল, অধিকার ছিল; এই অধিকার-শক্তি আজ নাই—তবে তো আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! অবস্থা ঘটনায় যাহা যায়, তাহা তো শাশ্বত বস্তু নয়। আমার মনে হয়, বস্তু যায় নাই, আমরাই গেছি। এবার মেলায় এই বিষয়ে ঋগ্বেদ থেকে শাস্ত্রপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করে' দৃষ্টান্ত সহযোগে এই জিনিষটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি—ব্রহ্মণ্যশক্তিই জাগুক, তবেই গুণগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।"

স্যার সর্ব্বাধিকারী নীরবে কথাগুলি শুনিতেছিলেন। যুগের সঙ্কেত ব্যক্তি যেমন উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সমাজের অবস্থাও ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমাজকেও তাই যুগস্রোতে অগ্রসর হইতে হবে; কিন্তু এই অগ্রগতির ধারা কখনও সরল ঋজু, কখনও বা উদ্দাম ও প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। এই শেষোক্ত পর্য্যায়কেই আমরা বিপ্লব বলি। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ন্যায় এই সামাজিক বিপ্লবও ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ। যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত সমাজ-সেবক, তাঁহারা এই অশান্তিযুগ সাবধানে পরিহার করেন, ধীরে ধীরে উন্নতির বিধান সমাজ-জীবনে প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হন; অন্যথা বিপ্লবের ছন্দে সমাজের সনাতন ক্রমভঙ্গ হওয়ারই সম্ভাবনা।

ধীরচিত্ত উচ্চশিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি দেবপ্রসাদবাবু যুগের আব্‌হাওয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করিয়াও, সনাতন সমাজনীতি অটুট রাখিয়াই অগ্রগমনের পক্ষপাতী। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" যে নবজীবনের অন্তপ্রেরণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আজ দেশের উন্নতি-যুগ দেখিতে চায়, এবং তাহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা করে না, তাহা ভাগবত-চেতনারই বিদ্যুৎশক্তি; সমাজ ও জাতিকে পুনর্গঠন করিতে এই উপাদানই তারা দেশময় ছড়াইয়া দেওয়ার আয়াস করিতেছে। মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু প্রথমে আমাদের নবজীবনের এই সাড়া বিপ্লবের লক্ষণ বলিয়া আশঙ্কা করিলেও, ইহা বিশুদ্ধপথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনায় যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইলেন, এইরূপ মনে হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"হাঁ, সমাজকে উপেক্ষা করা চলে না, তাকে সঙ্গে নিয়েই চল্‌তে হবে। হিন্দুর সকল শাস্ত্রে না হোক্, অন্ততঃ গীতায় স্ত্রী শূদ্রেরও সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম-সাধনায় অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে; সেই অধিকার ক্রমশঃ সকলকে দিতে হবে বৈ কি!'

কথা আর এই দিক্ দিয়া অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হইল না। এইবার রুশের বলশেভিকবাদ আসিয়া পড়িল। তিনি আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি যে রুশের বলশেভিকদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছি, তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন। আমি তাই নিবেদন করিলাম—"ভারতের মাটীতে রুশের কেন, অন্য কোন বীজ শিকড় গাড়্‌তে পারে না। ভারতের যে একটা নিজস্ব উচ্চ আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর সে আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্য যে একটা পরিপূর্ণ মানবসভ্যতা, তা' যে আমাদের প্রাণ দিয়েই রাখ্‌তে হবে। আমরা যদি আজ নিজেদের একেবারে বিপন্ন মনে করি, ধৈর্য্য হারাই, তবে নিজস্ব প্রতিভা ও জীবনের স্বপ্ন হারিয়ে জগতের কাছে সব দিক্ দিয়েই কাঙ্গাল হয়ে' দাঁড়াবো। যার কিছু দেওয়ার নাই, সে বাঁচ্‌বে কেন? এই তত্ত্ব আমি অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করি, আর "প্রবর্ত্তকে" দীর্ঘদিন সেই কথাটুকু বুঝাইবার জন্যই দরদ দিয়ে লিখে আস্‌ছি।

আমার বলশেভিকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—একদিন এদের কথা যে সমগ্র রুশবাসী শুনে নাই, একদল লোকই আত্মবিশ্বাস-বলে যেমনই মাথা তুলে দাঁড়ালো, অমনি তারা তাদের বিশ্বাসের পতাকাবহনের জন্য কোটী লোক সংগ্রহ করে' নিলে; তারাই আজ রাশিয়াকে শাসন করছে, নূতন মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা দিতে সাহস করছে। আমি বলি, ভারতেও তাই সর্ব্বাগ্রে একদল লোক চাই, যারা সনাতনতত্ত্বে জীবন ঢেলে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে, লোকসংখ্যার দিক্ দেখ্‌বে না—তত্ত্বের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে' আত্মবিশ্বাসের জয় দেবে; একমুঠা মানুষই ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে পারে। আমাদের বহির্ম্মুখী দৃষ্টিটা অন্তরের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সকল স্থানের সার্থকতার দিকটা প্রায় দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রয়োগ করি। দরকার হইয়াছে একটা সমষ্টির—এইরূপ একদল বিশ্বাসীর সঙ্ঘ।"



সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ঠাকুর-ঘর

আমার মনে হইল—তিনি যেন আমার কথার ভিতর ডুব দিয়াই সঙ্ঘের উদ্দেশ্যটাই তলাইয়া বুঝিতে লাগিলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া প্রসন্নবদনে স্থির হইয়া রহিলেন; আমিও নীরব ছিলাম। মনে হইল—আর কথার প্রয়োজন নাই; অন্তরে অন্তরে আত্মীয়তার অনুভূতি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এই মহানুভব ব্যক্তির সাহচর্য্যে সেই সৌভাগ্যবোধ অনুভব করিলাম। এইরূপ নীরব নিথর ভাব ভঙ্গ করিয়া আমার এক বন্ধু সহসা বলিলেন—"আপনি......পড়েছেন?"

পরাধীন জাতির জীবনে সৃষ্টির তপস্যা কোন দিক দিয়াই বাধাহীন নহে; মুক্তিকামী নবীন জাতিকে সাধনার যজ্ঞক্ষেত্রে বিন্দু বিন্দু আত্মদানের আহুতি ঢালিয়াই সবখানি সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। এই নিবিড় তপস্যার মর্ম্মতল উপরের ভাসা ভাসা পরিদর্শনে বা আলোচনায় স্পর্শ করা যায় না; একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সেক্ষেত্রে মানুষের স্বচ্ছ সহানুভূতি-স্রোতঃ আবিল ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কোনও সাময়িকপত্রে, সঙ্ঘ সম্বন্ধে সামান্য বক্রোক্তি ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল; সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন হওয়া মাত্র, ইহা লইয়া আলোচনা যাহাতে অধিক দূর অগ্রসর না হয়, এই উদ্দেশ্যে বলিলাম—"সঙ্ঘবদ্ধ-জীবন এদেশে নূতন; এ ভাবে কাজ করার পথে অনেক বাধা বিপত্তি—তাই ইহার বিরুদ্ধে কেবল কথাই বল্‌বে না, হয় তো

বিরুদ্ধাচরণও দেখা দেবে। সেদিকে দৃষ্টি না রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখ যেন বিষণ্ণতার আঁধারে মলিন হইয়া পড়িল; তিনি তীব্র বেদনা-ভরা সুরে বলিলেন—"লেখাটা আমি পড়েছি, এরূপ লেখা আমি approve করি না। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য এরূপ ভ্রান্ত লেখা হয়েছে; আপনাদের সঙ্গে লেখকের আলোচনা হ'লে আপনাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হবে।"

আমার সঙ্গী বন্ধু কথাটা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন, বলিলেন—"আমাদের জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর পেতেন; কেবল সংশয় আশ্রয় ক'রে হঠাৎ একটা মিশন সম্বন্ধে তাঁর মত বুদ্ধিমান্ লেখকের সমালোচনায় আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আমাদের আশ্রমে নারী পুরুষ কি ভাবে থাকে, তার কোন খোঁজ না নিয়েই অযথা কটাক্ষপাত করেছেন; তারপর ব্যাঙ্কের কথাটাও absurd হয়েছে—মেলার রিপোর্ট বইটাই তিনি ব্যাঙ্কের রিপোর্ট মনে করে' হিসাব দাখিল করেছেন। দেশের লোকের মনের অবস্থা আপনি জানেন, ভাল দিক্‌টা কেউ দেখে না, ছুঁতা পেলে অনিষ্ট করার মানুষই বেশী—এই রকম false report তিনি হঠাৎ লিখে ফেল্‌লেন কেন, আমরা বুঝে উঠ্‌লুম না!"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন—"আপনারা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবেন, তিনি সব কিছু জান্‌লে নিজেই ভুল সংশোধন করে' নেবেন। আমি তাঁকে জানি, হয়তো অন্য একটা impression থেকে তিনি এইরূপ লিখেছেন।"

এই প্রসঙ্গ আমার খুবই অপ্রিয় বোধ হইতেছিল। অন্তরে অনেক কথা গুমরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন—"মেলার রিপোর্টটাই ব্যাঙ্কের রিপোর্ট মনে করে' তিনি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে লিখেছেন, তা আমি বেশই বুঝেছিলাম।" তারপর কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সব বিষয়সম্পর্কের কথায় 'প্রবর্ত্তকে'র পাতা ভর্ত্তি করিব না।

দেবপ্রসাদবাবু বলিলেন—"ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে কাজ আপনাদের ওখানে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে কতখানি সংযম ও সতর্কতা আবশ্যক তা আমি বক্তৃতায় বলেছি। যতদিন মা-ঠাকুরুণ (সঙ্ঘমাতা) জীবিত ছিলেন, ততদিন ভয়ের কোন কারণ ছিল না; তাঁর চক্ষের সম্মুখে কোথাও কিছু হওয়া বা ঘটা সম্ভব নয়—তাঁর অভাবে এই জিনিষটা কি ভাবে রক্ষা হবে তা আমি খুবই ভাবি, কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানের দুর্ণাম আমার কানে এসেছে।" পুনরায় পূর্ব্ব পত্রিকার লেখককে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "... একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; সেখানে কোনও প্রতিষ্ঠানের দুর্ণাম তিনি বিশেষভাবেই শুনেছেন, সেই impression তাঁর রয়েছে; আপনাদের 'সঙ্ঘে'ও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা শুনে সেই ভাবটাই যেন প্রকাশ করে' ফেলেছেন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন—"আমারও আগ্রহ আছে—ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ জান্‌বার; আপনার কাছে শুন্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হবো।"

তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আমার জীবন-বেদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র জীবন যে পরস্পর সংযুক্ত জীবনের পরিচয়—এখানে তো কোনদিন কিছু হিসাব করিয়া হয় নাই, স্কীম্ অনুসারে কিছু গড়ে নাই—

সেই কথাই দেবপ্রসাদবাবু আমায় সসঙ্কোচে প্রকাশ করায় বাধ্য করিয়াছেন।

আমার তাঁহাকেই মনে পড়িল—যাঁর স্নেহাঞ্চল-তলে ভাই বোনের মত এখানকার সঙ্ঘজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে; আর মনে পড়িল, তাঁর পুণ্য-প্রভাবের কথা—সম্বন্ধের ব্যাভিচার অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া তিনি এই তীর্থের মহিমা আজও কিরূপে রক্ষা করিতেছেন। আজ আমি যে জীবন-ক্ষেত্রের বহুদূরে, নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন লইয়া দিন গুণিতেছি! তবুও কোনই ত্রুটি নাই, কোথাও আতঙ্কের লেশ নাই—একি অশরীরিণী সতীর অমর প্রভাব নহে! আমি বলিলাম—"দেবপ্রসাদবাবু, সঙ্ঘ পুরুষ ও নারী এই দুই জীবনের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে; তিনিই ছিলেন সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র। সেদিন ততটা বুঝি নাই, আজ বুঝিতেছি—তাঁর জীবনের স্পর্শেই একদল নারী ও পুরুষ পবিত্রতা ও সংযম রক্ষার সন্ধান পেয়েছে। খাঁটি হিন্দুধর্ম্ম তিনিই সকলের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে সঞ্চারিত করে' গেছেন। আমি অনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতেই ছুটে চলেছি। ৯ বৎসর বয়সে তাঁকে বিবাহ করেছিলাম। তিনি বড় হওয়ার সঙ্গে সংসারধর্ম্মেই মন দিয়েছিলেন; কিন্তু একটা আঘাত খেয়েই বুঝ্লুম—passion life'টা অতিক্রম কর্‌তে হবে। তাঁকে গ্রহণ কর্‌তে হলো আঠার বছর বয়সেই ব্রহ্মচর্য্য; কিন্তু একদিনের জন্যও তো তাঁকে এইজন্য চঞ্চল হ'তে দেখিনি। আমি ব্রতরক্ষায় বহুবার বিচলিত হয়েছি; কিন্তু তাঁর পণভঙ্গ হয় নি, কাজেই সঙ্কল্প-রক্ষা হয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সংসার-ধর্ম্ম ছেড়েছি—বাহিরের কাজেই ব্যাপ্ত থাক্‌তুম, স্বদেশী যুগের সব ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে গেল। তিনি ছিলেন নিত্য-সঙ্গিনী—সকল কাজে, সকল অবস্থায়। তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন—পতির ধর্ম্মই নারীর ধর্ম্ম, পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য দেবতা নাই; এ শিক্ষা আমি তাঁকে দিই নাই, ভারতের হাওয়ায় বুঝি এ মন্ত্র ঘুরে বেড়ায় শুদ্ধ আধার আশ্রয় করে'। তিনি কোন অপার্থিব বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন; শেষদিন পর্য্যন্ত জগদ্ধাত্রীর ন্যায় আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করেছেন। আপনারা বল্‌ছেন—তিনি গত হয়েছেন; আমি কিন্তু এখনও তাঁর অস্তিত্ব আরও ভাল করে' অনুভব কর্‌ছি। 'আত্মসমর্পণ' বলে যে ধর্ম্মটা আমি আশ্রয় করেছিলাম, তা তাঁর জীবনে মূর্ত্তি নিয়ে আমায় ধন্য করেছে; আমি বুঝেছি, মানুষ যখন তার সব ভোগ বাসনা অহঙ্কার ইষ্টের চরণে কায়মনোবাক্যে আহুতি দেয়, তাতে লয় হ'য়ে যায়, ভগবানের শক্তিই তাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে। স্ত্রী স্বামীতে, শিষ্য গুরুতে, পুত্র পিতায় যথার্থ আত্ম-নিবেদনে যদি সমর্থ হয়, এই আত্মসমর্পণ যোগ সেখানে সিদ্ধ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন শিক্ষা না পেয়েও—কেননা শিক্ষা দেওয়ার অবসর পাই নি—আত্মসমর্পণ সিদ্ধ করেছিলেন; তিনি ইষ্টবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুকে আশ্রয় দেন নি। আজ হিন্দুর শাস্ত্র আমার কাছে মূর্ত্ত, "অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগঃ"—যে নিষ্ঠার মন্ত্র সে তো আর শব্দ নয়, আমি যে প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর এই প্রত্যক্ষ জীবনসাধনাই ছিল ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা দিবার গ্রন্থ। কেহ জানুক আর নাই জানুক, একদিন গ্রন্থশেষে সকলেরই চমক হ'লো—তাদের অধ্যয়ন সাঙ্গ হয়েছে।'

আমরা এই আত্ম-কথাগুলি তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন বুঝিবার জন্য, একবার তাঁর দিকে চাহিলাম—প্রবীণ পুরুষ স্যার দেবপ্রসাদের অন্তরের তারে আঘাত পড়িয়াছে; হিন্দুর জীবনযাত্রার মূল

তন্ত্রটী যেন তিনি আমার কথায় বুঝিয়া বড় আনন্দের সহিত ইহা শ্রবণ করিতেছেন। আমি সাহস পাইয়া বলিলাম—

"যারা "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র ভিত্তিস্বরূপ, তাদের বুক থেকে ভোগবাসনার বীজ পুড়ে' ছাই হয়ে' গেছে—তাঁর তপস্যাই ইহাদের চিরযুগ রক্ষা করবে। এই বিশ্বাস আজ কথা; কিন্তু যত দিন যাবে, তত ইহা বস্তুতন্ত্র হ'য়ে উঠ্‌বে। আজ যে আমি দূরে দাঁড়াতে ভরসা পেয়েছি, তা' এই বিশ্বাসের জোরেই। আপনি আমার ছেলেদের দেখেছেন, মেয়েদের দেখ্‌লে আরও আশ্চর্য্য হবেন—তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একবিন্দু সংশয় হবে না। আমি এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর ইহধাম-ত্যাগের কথা জেনেছিলুম—নিশ্চয় জেনেছিলুম; তাই তাঁকে সাম্‌নে রেখেই ভবিষ্যতের আয়োজন করে' তুল্‌তে উদ্যত হয়েছিলুম্‌।" দেবপ্রসাদবাবু আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি বলিলাম—"কথাটা বুজ্‌রুকী বলে' আপনার মনে হবে না; কেন না, আপনার প্রবন্ধে Vision সম্বন্ধে যে কথা পড়েছি, তাতে এ বিষয়ে আপনি সংশয়ী নন—আমি Visionই পেয়েছিলাম।" প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে সে দীর্ঘ কথা এখানে আর ব্যক্ত করিলাম না; তবে তাঁর মৃত্যু সন্নিকট বুঝিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম, কেবল সেই কথাটাই এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। আমি সকল কথার শেষে তাহাই তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম।

"কলিকাতার পার্ক সার্কাসে তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল। বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করার পর দেখি—দুইটী মৃত-কঙ্কাল করপুটে তাঁর শয্যাশিয়রে দাঁড়িয়ে আছে; দৃষ্টির দোষ ভেবে চক্ষু বিস্ফারিত কর্‌লুম্‌—না সত্য! শীঘ্রই তাঁর শেষ হবে—ব্যথিত কণ্ঠের প্রশ্নে সঙ্কেতেই উত্তর পাইলাম—তারপর সব মিলাইয়া গেল। অপরাহ্নে তিনি উদাসভাবে চাহিয়া বলিলেন—"আমার বুকটা অন্য রকম হয়ে' গেছে!" তারপর যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, সেটা inertia, প্রাণ তাঁর শেষ হয়েছিল।

এইদিন থেকে তিনি আর সঙ্কেতসূচক শব্দে আমায় আহ্বান করেন নাই, কণ্ঠে সতত বাণী বাজিত—'ভগবান!" পতিকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা দিতে সে তপস্যা ভুলিবার নয়। মরণের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও আমি দূরে ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ বুকের ভিতর সহস্র বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভূত হওয়ায়, দৌড়িয়া তাঁর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখি, তিনি আমার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ চাহিতেছেন। কথা ছিল, মরণের আক্রমণবেগ তিনি স্বীকার না করেন; দেখিলাম, তিনি অসাধারণ সংগ্রাম কর্‌ছেন কেন। আর শরীরকে কষ্ট দেওয়া—কাণে কাণে বল্‌লুম—"তোমায় যেতে হবে, সময় হয়েছে।" সে কি আকুল করুণ দৃষ্টি! আমায় ছেড়ে যাওয়ার স্বপ্নও তাঁর ছিল না; কোথায় যাবেন—এই প্রশ্নের সঙ্গে চক্ষে তাঁর জলধারা দেখা দিল। আমার তখন গীতার কথাই মনে হইল—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

—তিনি পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, ওষ্ঠপুটে হাসির রেখা ফুটিল—এক মুহূর্ত্তে নীরব হইলেন। ছেলেরা চীৎকার করে' উঠ্‌লো, আমি নিস্পন্দ। এখনও মনে হয়, এই হৃদয়টা ভারী হয়ে রয়েছে; তিনি এইখানেই স্থান ক'রে নিয়েছেন—মরণেও সম্বন্ধ শেষ হয় না। হিন্দুধর্ম্মের সমাজনীতির উপর এইদিন থেকে আমার আসল শ্রদ্ধা। পুরুষপ্রকৃতির মিলন-তত্ত্ব দেহগত নয়। পতিহীনা নারীর ভিন্ন

পতি গ্রহণ অদ্ভুতা। পুরুষের পক্ষেও এই একই কথা। পতি পত্নীর মধ্যে এই অপার্থিব মিলনতত্ত্বের কথা ভুলে আমরা দেহের সম্বন্ধই বড় করে' তুল্‌ছি—দুর্নীতিই তাই সংস্কার ব'লে' প্রতীতি হয়।"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"হাঁ। কিন্তু সকলের পক্ষে এই celibacy তো সম্ভব নয়; যারা বিবাহ কর্‌তে চাইবে, তাদের বাধা দেবেন না। বিবাহ সংসার কর্‌লেও কাজ করা যায়।"

আমি বলিলাম—"আমি তো কাউকে force করি নি; যারা বিবাহ করেছে তাদের একটা period সংযমের মধ্যে থাকার কথাই বলি; আর তারা যে আদর্শ চক্ষে দেখেছে, নিজে থেকেই থাক্‌তে বাধ্য হয়; কারণ, এই passion-life অতিক্রম করার পরই বিশুদ্ধ দাম্পত্য-জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়। যতক্ষণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ প্রেমবস্তুর উপলব্ধি হয় না—আমি ইহা স্পষ্ট অনুভব করেছি। যেদিন থেকে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ ছেড়েছি, সেইদিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় আরম্ভ হয়েছে।"

"আমি কয়েকজনের বিবাহ দিয়েছি; তাদের মধ্যে দুই জন এই পবিত্র জীবনযাপন কর্‌ছে, পতি পত্নী একত্রই থাকে। যারা পারে নি, তারা বাইরে গেছে; কেন না, আশ্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রতী আছে, সেখানে ভোগবাদ এখনও চলা সম্ভব হয় নি। একজনের এবার দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হবে; তারা স্বাধীনভাবে অতঃপর যেরূপ জীবন ইচ্ছা কর্‌বে, আমার আর বাধা নেই।"

দেবপ্রসাদবাবু উৎসুক হইয়া বলিলেন—"আপনি কি অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ।" আমি মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিলাম। কথা শুনিয়া যাঁহারা তাহার সত্য অন্বেষণ করেন, এযুগে তাঁরা প্রশংসার পাত্র। '...'এর বিবাহ অসবর্ণ। তার বিবাহ সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত বলিলাম। "প্রবর্ত্তকে" ইহা বাহির হইয়াছে; এই হেতু, এই বিষয়ের আর পুনরুক্তি এখানে করিলাম না।

দেবপ্রসাদবাবু যেন আশ্চর্য্য হইয়াই সকল কথা শুনিলেন, তারপর প্রসন্নমুখে বলিলেন—"দেশটা কি! আপনাদের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অতি বিকৃত করে' অনেক কথাই কয়জন বল্‌তে এসেছিল; আমি তাদের বল্লুম—"আমি তাদের নিজের চক্ষে দেখেছি। তারা যে জিনিষটা গড়্‌তে চাইছে, সেখানে sincerity আছে। ছেলেগুলিকে আমার রত্ন বলে' মনে হয় চরিত্রে এবং প্রতিভায়; তবে হয়তো দু' একটী ছেলে দুষ্টও থাক্‌তে পারে, তা' এই সৎ সংসর্গে সব ভাল হয়ে' যাবে।" তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সত্যি মতিবাবু, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে' দেখেছি, তারা যেমন সরল, তেমনই খাঁটী; প্রতিষ্ঠানটী তো গড়েছেন, আর তারা তা' রক্ষা করার জন্য জীবনপাত করে' চলেছে।"

এ-কথায় আমার গর্ব্ব বোধ হইল; কিন্তু এ দুর্ব্বলতাটুকুও আমি ভগবানের চরণে দিয়া স্থির হইলাম। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বড় স্নেহ ও মমতার দরদ লইয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"শুনুন মতিবাবু! কারও কথা শুনে কিছু করা আমার স্বভাব নয়। যেটা নিজে বিশ্বাস করি, নিজের চক্ষে দেখে, নিজের কাণে শুনেই করি; আর সেটা নির্ভীকভাবেই ব্যক্ত করি। ত্রুটি দেখ্‌লে খোলাখুলি বলা আমার স্বভাব; ভিতরে রেখে চেপে চলা আমি ভালবাসি না। আপনাদের

উৎসবের বক্তৃতায় সঙ্ঘ সম্বন্ধে যা' আমার মনে হয়েছিল, তা' আমি স্পষ্টই বলে' এসেছি।"

আমি বলিলাম—"আপনাকে এইজন্য ধন্যবাদ দিই। মানুষের শুভ ইচ্ছা থাকলে, সে ব্যক্তি সত্যের সন্ধান নিতে কৃপণতা করবে না। কারও কিছু প্রশ্ন থাকলে, তার উত্তর আনন্দের সহিত দেওয়া যায়। ত্রুটির কথা স্বীকার করায় ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী। কিন্তু মানুষের মন বড় বিষাক্ত, যেন প্রতিহিংসার ভাবটাই বড়, একটা দুরভিসন্ধির ভাব রেখেই চলে—ইহা বড় মারাত্মক।"

দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন—'মতিবাবু, একটা কথা বলি, আপনার সঙ্ঘ থেকে যারা বাহির হয়ে' গেছে তারাই আপনার শত্রু, অন্যে নয়—এই কথাটা আপনাকে বলে' রাখলুম।"

আমার মনে হইল, দেববাবুর কাছে যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য আসিয়াছিল তাহারা এই ধরণের লোক হইবে। আমি বলিলাম —"অসংখ্য লোক আমার কাছে এসেছে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর অনেক হয়েছে; যারা গেছে তাদের মত আমিও জানতুম না, সঙ্ঘ ক্রমে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দলে গিয়ে দাঁড়াবে। তপস্যা মূর্ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই eliminate করলে, তাদের বিরুদ্ধভাব থাকার কারণ আমি বুঝি না! আমি কখনও কারও বিরুদ্ধে মন্দ ভাব পোষণ করি না; সঙ্ঘের দুয়ার খোলাই আছে, ইচ্ছা করিলে বাহির হওয়া ও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য কিছু নয়। আমার মনে হয়—reactionary-forces এই মানুষগুলিকে বিদ্বেষী করে' তুলেছে। ইহা মানুষের স্বভাব—ইহাতে দুঃখ করার কিছু নাই।"

দেবপ্রসাদ বাবু এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলেন। বুঝিলাম, তিনি অনেক কাজ ছাড়িয়া এতখানি সময় ব্যয় করিতেছেন; ফিরিলে বলিলাম—"আপনার অনেক সময় নষ্ট করছি, আপনারও তো অনেক কাজ!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কাজ তো রোজই করি, কাজের কি শেষ আছে! আপনার মুখ থেকে এত কথা শোনার সৌভাগ্য কি আমার রোজ হবে! বলুন, আরও কিছু শুনি।"

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"সঙ্ঘের খরচও তো কম নয়! সব চেয়ে বেশী আমায় মুগ্ধ করেছে, আপনাদের এই স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা; একটা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার জন্য একযোগে এতগুলি লোকের পরিশ্রম খুবই আশ্চর্য্য বিষয়—বিষয়সম্পত্তি কি ভাবে রক্ষা করবেন?"

আমায় আবার গোড়ার কথা কিছু বলিতে হইল। এই সঙ্ঘকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রথমেই আমার শতকরা ৯৲ টাকা সুদে লক্ষ টাকা ঋণের কথা বলিলাম; কিন্তু দুঃখের দিকটাও দেখাইলাম—সে টাকার এক পয়সাও যে আজ নাই, যারা ইহার জন্য আসে নি, তাদের হাতেই টাকা পড়েছিল—অনভিজ্ঞ ব'লেই অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে; আর অনেকে টাকার লোভ সংবরণ করতে না পেরেও আমায় বঞ্চিত করেছে। কোথাও আমার অবিশ্বাস ছিল না; টাকা ধার করেছিলুম্ আমি, দিয়েছিলাম যাদের, তাদের কাছ থেকে কোন রসিদপত্র নিই নি—তা' যাক্, তারপর একদল দরদী লোক এসে নূতন ক'রে অনেক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললো, ঋণও নূতন ক'রে করেছি—যারা যে প্রতিষ্ঠানে, তাদের নামেই সেইসব কারবার।"

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তারপর!'

আমি বলিলাম—"আমার কিছু নাই, যদি তারা প্রতারণা করে, আমি আবার ডুবুবো; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমায় বঞ্চনা করবে না।। আজ

যারা এগিয়েছে, তারা সঙ্ঘের মানুষ, একেবারে সর্ব্বত্যাগী উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল। অনেকে বলেন, "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" বিষয়সম্পত্তি রেজেষ্টারী করা ভাল। তাঁরা হয় ত মনে করেন, সব আমার নামেই আছে; বস্তুতঃ তা' নয় – আমার পিতৃধন বসতবাটীটিও আজ পরের হস্তে, সর্ব্বাগ্রে নিজের ভিটাই আমি বন্ধক দিয়েছি। সবাই যখন ভিতর থেকে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন সকলে মিলে সঙ্ঘের সম্পদ্ অখণ্ড করে' তুল্‌বে, আমি জানি আমার বিশ্বাস ব্যর্থ হবে না—আর এইটার প্রতীক্ষায় আছি।"

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বোধহয় কথাগুলি শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কেবল বলিলেন—"আপনি দেখ্‌ছি সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অতিক্রম করেছেন, জগতের কোন অভিজ্ঞতাই বাকী রাখেন নি!"

আমি আর কি উত্তর দিব, নিজের অবস্থাটা তো খুবই জাগ্রত, জলন্ত; হাসিয়াই বলিতে হইল, "হাঁ। ভগবান্ আমায় সব দিয়েছিলেন, আবার সবই কেড়ে নিয়েছেন—আজ আমায় কাঙ্গাল করেছেন। আমার এই সুখ—আজ আমার কিছু নাই, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি সব দূরে সরে গেছে; আমি কিন্তু একটা বস্তুতে আশ্রয় পেয়েছি বৈ কি! তা' না হ'লে দাঁড়িয়ে আছি কি নিয়ে? সে আমার তত্ত্ববস্তু, ভগবান ধীরে ধীরে সবখানি অধিকার করছেন, এইটাই আজ highest delight in my life."

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার সম্বন্ধে সব কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত ব্যবহারজীবী, ধীরে ধীরে জেরা করিয়া সব কথাই বাহির করিয়া লইলেন, শেষে শ্রীঅরবিন্দের কথাও উত্থাপন করিলেন। সে বিষয় আমি এই ক্ষেত্রে উত্থাপন করিব না, দেববাবুকে ইহা বিশেষ করিয়াই বলিয়াছি।

১২টায় উপাসনা। ঘড়ির কাঁটা ক্রমেই আগাইয়া চলে। একটু ইতস্ততঃ করিতেই তিনি বলিলেন—"আপনি এইবার ব্যস্ত হয়েছেন।" আমি বলিলাম—"বাসায় ছেলেরা অপেক্ষা করছে—১২টায় আমাদের উপাসনা।"

তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। আমি অনেক নিষেধ করিলাম; কিন্তু তিনি শুনিলেন না—সে যে কি নিবিড় মমতা ও আত্মীয়তার আবেষ্টন তাহা আমি কোনদিন ভুলিব না। তিনি দ্বিতল হইতে সিঁড়ি বহিয়া নীচে আসিলেন; সোফারকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া কথা সুরু করিলেন—"মতিবাবু, আপনার কথাগুলি ছবির মত অপূর্ব্ব! মা-ঠাকুরুণের পরলোক-গমনেও দেখ্‌ছি—আপনি নিঃস্ব হননি, এ কি জানেন!"—এই মনস্বীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। কি গভীর ভক্তির প্রবাহ বুকে যেন উজান দিয়া ছুটিল! তিনি বিস্ফারিত নয়নে বলিলেন—"পার্থসারথির বুকে বাহিরের দিক্ থেকে হাজার হাজার বাণ বিদ্ধ হয়েছে, তবুও তিনি বিচলিত নন্; কেন না, হৃদয়ে যে হৃদি-লক্ষ্মী বিরাজ করছেন। একবার আমার সঙ্গে আসুন—আপনার মেলায় গিয়ে যে সব পুতুল দেখেছি, তাতে মনে হয় আপনার হাতে খুব ভাল কারিগর আছে; এই চিত্রটী আপনার মেলায় দেখাবেন।"—এই বলিয়া আমায় আবার উপরে লইয়া গেলেন; সমস্ত কথাবার্ত্তার পর এই মুহূর্ত্তটাই আমার সৌভাগ্যক্ষণ মনে হইল; এইখানে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব এক হইয়াছে। আমি দেবপ্রসাদ বাবুর মহাতীর্থক্ষেত্র ঠাকুর-ঘরে গিয়া তাঁর সঙ্গে উপনীত হইলাম।

প্রশস্ত কক্ষ সংলগ্ন একখানি ছোট্ট ঘর। প্রস্তর-মণ্ডিত সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। বেশভূষা সবই সতীসাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর হস্তেই যে সুবেশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। এই গৃহদেবতা ব্যতীত আরও অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। বাংলার এই মনীষী এত বড় পৌত্তলিক —খাঁটি হিন্দু-ধর্ম্মের চূড়ান্ত অনুভূতি কি গভীর ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন! এইখানেই এই অধ্যাত্ম-শিল্প বুঝি সত্য পূজা পাইয়া ভারতের স্বপ্ন সার্থক করিয়াছে। তিনি দুইটী মূর্ত্তি বাহির করিলেন—একটি পার্থসারথির। সত্যই এই মূর্ত্তির বক্ষে কয়েকটা সূচ্যগ্র তীর বিদ্ধ; বক্ষের বাম কোণে লক্ষ্মীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। আমি মূর্ত্তি দেখিব কি, স্যার সর্ব্বাধিকারীর ভক্তিনত দৃষ্টির মাধুর্য্য দর্শন করিব—ভাবিয়া পাইলাম না। তিনি নৃসিংহ মূর্ত্তিটী দেখাইয়া বলিলেন—"ঠাকুরের ভীম করালমূর্ত্তি কি শোভা পায়! জগতের ধর্ম্মরক্ষায় তিনি এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও, দেখুন নয়নে কি করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু!" তাঁর প্রাণস্পর্শী কথাগুলি ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

বিদায় লইতে বাধিতেছিল—মনে হইল, এতক্ষণ আমার কথায় সময়ব্যয় হইল, তাঁর হৃদয়ের বাণী শোনা হইল না তো! এই আধুনিক যুগের ইংরাজী শিক্ষায় ও সভ্যতায় যে হৃদয়খানি অনাবিল, বাহিরের ঐশ্বর্য্যে ও মর্য্যাদায় মলিন হয় নাই, সে হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শ ভাল করিয়া গ্রহণ তো করা হইল না! কিন্তু উপাসনার তাগিদ বড় হওয়ায় ক্ষুণ্ণ মনেই বিদায় হইলাম। তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। স্যার সর্ব্বাধিকারী একজন খাঁটি বাঙ্গালী; রাজনগরীর বুকে তাঁর প্রাসাদ বাঙ্গালীর গৃহ; সেখানে বাঙ্গালীর হৃদয় ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া ধন্য হইবে। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর এখনও যেন দিবার কিছু আছে; কিন্তু গ্রহণের তাগিদ কোথা—আমরা যে আজ সম্মোহনগ্রস্ত আত্মহারা জাতি!

জন্মাষ্টমী

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়]

অষ্টমীর উপবাস করি নাই কেন তুমি জান ?
মানি না তাঁহার জন্ম, জন্ম যাঁর তুমি ভাই মান।

বর্ষপঞ্জিকায় তুমি জন্মতিথি পেয়েছ যাঁহার,
মহাকালপঞ্জিকায় খুঁজি জন্মতিথি পাই না ত তাঁর!
জাতকের মৃত্যু ধ্রুব। কই? স্মরি তাঁর মৃত্যুদিন
কর না ত শোকঘটা—তাহে কেন রও উদাসীন?

জন্মজরা-মৃত্যুহীন সে আমার শাশ্বতকিশোর
অষ্টমী নবমী নয়—পূর্ণিমাই শুভদিন মোর।
রহিলাম প্রতীক্ষায়, অনশনে বিশুষ্ক বদনে,
মধু পিয়ে তাঁর সনে মাতি রাস-হোলী ও ঝুলনে।



রুষের অভ্যুত্থান—

রুষে বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, জগতের শাসনতন্ত্র ও জীবননীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন-সাধনে এই জাতিটার কর্ম্মপ্রচেষ্টা কি অসাধারণ রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভারতের মত পরাধীন জাতির লক্ষ্য করিবার বিষয়। রুষের আদর্শবাদের অনুসরণনীতি ভারতের পক্ষে মারাত্মক; কিন্তু দুরবস্থার ভিতর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার যে কৌশল ও ব্যবস্থা তাহা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

রুষের এই বলশেভিক-তন্ত্র অধিক দিন প্রতিষ্ঠা পায় নাই। জগতের সকল জাতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রুষজাতি কেবল নিজের পায়ে ভর দিয়াই বিশ্বজয়ী হইতে চাহে—এই মহাবীর্য্য সে কেমন করিয়া পাইল, ভাবিবার বিষয় নহে কি?

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন তরুণ একটা দেশ-হিতকর কর্ম্মচক্র গড়িয়া তুলে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা লোকচক্ষের অগোচরেই ছিল, কেহ এই দলটাকে গণনার মধ্যেই আনিত না; কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহার অস্তিত্ব সর্ব্বজনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাই বলশেভিকদলের শিশু-অবস্থা। তারপর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে, যখন ইহা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রুষের রাষ্ট্রনীতিক চক্র ডুমা ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইল, সেদিন ইহার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। সেদিনও এই দলের অন্যতম নেতা মারতভ্ বলশেভিক দল হইতে ভিন্ন হইয়া মেনশেভিক দল গড়িয়া



লেনিন

তুলিলেন; কিন্তু রুষের নিরক্ষর শ্রমজীবী দল লেনিনের ভিতরে তাহাদের প্রাণের সাড়া পাইল। সামঞ্জস্যবাদী মারতভ্ হতবল হইয়া পড়িলেন। তারপর লেনিন শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে রুষের অত্যাচারী সম্রাট্ জারের পতন সম্ভব করিয়া, এক নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন।

এখনও অর্দ্ধশতাব্দীকাল অতিবাহিত হয় নাই; রুষের এই জন্মযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সে জগতে যে বিপ্লব সূচনা করিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার। লেনিনের প্রাণশক্তি এই অল্পকালের মধ্যে এত বড় দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছিল। তাঁর তিরোধানে রুষ নিরাশ হয় নাই; ষ্ট্যালিনের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নব্যরুষ আজ জগতের সম্মুখে সকল অন্তরায় বিদীর্ণ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে—এই মহাযজ্ঞ রুষে আরম্ভ হইয়াছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রুষ নিজের ঘর গুছাইয়া লওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, ইহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। এই কর্ম্মসাধনের জন্য রুষের হিসাবের অঙ্ক তার সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যকে নখদর্পণে আনিয়াছে। আজ প্রত্যেক ঘোড়া, গরু, ভেড়া, শূকর, এমন কি একটী ছোট্ট শশক পর্য্যন্ত বে-হিসাবে খরচ করার কাহারও অধিকার নাই; রুষের জমির একটু সামান্য অংশ পর্য্যন্ত অব্যবহারে পতিত থাকার উপায় রাখা হয় নাই—রুষকে আজ নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে জানিয়াছে, কেন না, তাহার এই নব্য সভ্যতার সমর্থন করার মানুষ আর কোথাও নাই। তাহাকেই আত্মধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহা বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতে হইবে।

রুষের যন্ত্র-শালা সচল সরব, দিবারাত্রি এক হইয়াছে; রেলের প্রত্যেক গাড়ীখানি, সমুদ্রবক্ষে বৃহৎ অর্ণবপোত হইতে মাছ ধরার ক্ষুদ্র নৌকাটীও রুষের গঠন-তন্ত্রের হিসাবে চলিতে ফিরিতে



মিঃ ষ্টালিন

আরম্ভ করিয়াছে—চেতন অচেতন দেশের সবখানি জীবন একযোগে শত বৎসরের কাজ দশ বৎসরে শেষ করিতে চায়। ইহাই বোধহয় গীতোক্ত "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" বাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ভারতের চক্ষু কি উন্মীলিত হইবে না?

যদি রুষ এই প্রথম পর্য্যায় যথারীতি সুসম্পন্ন

করিতে পারে, তাহা হইলে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রভাতে তার ললাটে সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রদীপ্তচ্ছটায় জগৎ ঝলসিয়া যাইবে ; সে তাহার শিক্ষা সভ্যতার আদর্শ বিশ্বব্যাপী করার জন্য বাহির হইবে। তাই বিশেষজ্ঞেরা বলেন—রুষের এই অভ্যুত্থান সফল হইলে, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জগতে মহাবিপ্লব আরম্ভ হইবে ; কেন না, রুষের এই প্রাণশক্তি পৃথিবীর গতানুগতিক জীবনধারার পথ আগুলিয়া ধরিবে, বিশ্বর বর্ত্তমান বিধান উল্টাইয়া দিবে—জগতে অর্থনীতিক জীবন শুধু নয়, সমস্ত জীবন-নীতির মূলেই ঘা পড়িবে। এই সকল ভবিষ্যতের কথা—রুষের এই প্রাণ কোথা হইতে আসিল!

আজ আমরা বাঙ্গালী জাতিকে সচেতন হইতে বলি। রুষের এই নবজাগরণের মূলে বিশাল জাতি তাহাদের সহিত যোগ দিতে হাত বাড়ায় নাই ; বরং আদর্শ লইয়া বহুবার একমুষ্টি মানুষের মধ্যে শতবার সহস্রবার দলাদলি ঘটিয়াছে ; আত্মস্বার্থের কণা মাত্র যেখানে ছিল, একে একে সব খসিয়া পড়িয়াছে ; শেষে লেনিনের সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণশক্তি দুর্জ্জয়বেশে রুষের বিপ্লব সিদ্ধ করিয়া, সেই শক্তিই অখণ্ড মূর্ত্তিতে রুষকে এমন করিয়া গড়িতে চায়, যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা আর কাহারও হইবে না। ষোল কোটী রুষের মানুষ এক জাতি ও এক সম্প্রদায়গত নহে ; কিন্তু আজ তাহারা একযোগে জন্মভূমির গৌরবরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা কেহ করে নাই।

তাহারা দেশের দরদ হৃদয়ের সবখানি দিয়া অনুভব করিয়াছিল, তাহারা "দুধ ও তামুক" এক সঙ্গে খাইতে চাহে নাই ; নিবিড় নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্মজীবনের দীক্ষা লইয়াছিল, কোথাও ঔদাসীন্য স্থান পায় নাই। দেশের মনীষিবর্গের সদুপদেশ, ভিত্তিহীন আদর্শবাদ তারা গ্রাহ্য করে নাই ; অন্তর্য্যামীর অনুসরণ করিয়া ত্যাগ ও তপস্যার বলেই দুঃসাধ্য যাহা তাহা সিদ্ধ করিয়াছে। ভারতে এইরূপ একদল মানুষের আজ অভ্যুত্থান কামনা করি। ভারতীয় তপস্যায়, ভারতের সনাতন আদর্শবাদ লইয়া একটা নূতন জাতির সৃষ্টি সার্থক হোক ; সেই অপরাজেয় জাতির শক্তি ও প্রতিভায় আজিকার জাতি ধর্ম্মের ভেদ এক মুহূর্ত্তে কোথায় লোপ পাইবে, তাহার ঠিকানা থাকিবে না। আজ নপুংসকের মত গলার জোরে যাহা করিতে চাহি, তাহা অন্তরের বলেই সিদ্ধ হইবে।

ভারতের স্বরাজতন্ত্রে বেতন-সমস্যা—

ছেচল্লিশ বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের রাজকর্ম্মচারীদের মোটা বেতন-প্রসঙ্গ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে ; কংগ্রেসের বৈধী আন্দোলন অহিংস সংগ্রাম পর্য্যন্ত গড়াইল, এবং দিল্লীর চুক্তি অনুসারে রণক্ষান্তি হইয়াছে। কংগ্রেসে-প্রতিনিধিস্বরূপ মহাত্মা বিলাতের গোল-টেবিল সভায়, স্বরাজ অথবা ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠন মানসে যোগদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতের ভবিষ্য রাষ্ট্রতন্ত্রে রাজকর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে এবার করাচী কংগ্রেসে ইহাই স্থির হইয়াছে—ভারতের রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই ৫০০৲ টাকার অধিক বেতন পাইবেন না। ভারতের মাথাপ্রতি আয়ের হিসাবে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা যে অল্প হয় নাই, তাহা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

জাপানের প্রতি মানুষের গড়প্রতি চারি আনা আয়—দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা মাসিক বেতন

পান ১০০০৲ টাকা; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ ৬০০৲—৮০০৲ টাকার অধিক বেতন পান না; সরকারী দপ্তরখানায় ১১০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা বেতনের ব্যবস্থা আছে। "প্রধান বিচারপতির বেতন ১০০০৲ টাকার অধিক নহে; অন্যান্য বিচারকগণ ১৫০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা বেতন পান। প্রধান পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ বেতন পান ৭০০৲ টাকা, অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ ২৫০৲ টাকা ৩০০৲ বেতন প্রাপ্ত হন, পুলিশ প্রহরী ও সার্জ্জন ৬০৲, ৭০৲ ৮০৲ এইরূপ বেতন পায়। এই অবস্থায় ভারতের রাজকর্ম্মচারিগণের সর্ব্বোচ্চ বেতনের হার ৫০০৲ টাকা অন্যায় হয় নাই।

মহাত্মার হিসাব অন্যায় হয় নাই। যে দেশের অধিবাসী প্রতিদিন ছয় পয়সাও জীবনধারণের জন্য উপায় করিতে নাকের জলে চক্ষের জলে হয়, সে দেশের রাষ্ট্রশাসনে সহস্র সহস্র অর্থের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী বিসদৃশ; তবে আমাদের মনে হয়, ইহার উপর ভাতা বলিয়া একটা জিনিস আছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনধারণের ব্যবস্থা যতই ছোট করিয়া লওয়া হউক, মহাত্মাকেও যখন মোটর রেল করিয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে হয়, তখন এই খরচটা রাজপুরুষ-গণের পক্ষেও যে দরকার হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। মানুষের পেটের দায় আর কতটুকু! সেদিন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে, মানুষ চাদরের খুঁটে চিড়া ছাতু বাঁধিয়া পাওদালে শেষ করিত; আজ ঝনাৎ করিয়া কয়েকখণ্ড রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় না করিলে মুলুক যাওয়া বন্ধ হইবে। এই হিসাবটা সংযুক্ত করিলে, আমাদের মনে হয়—বেতনের হার কিছু বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা একটা অভিজ্ঞতা হইতে কথাটা বলিতেছি। ফরাসী ভারতে স্বভাবতঃ রাজপুরুষগণের বেতনের হার অল্প; কিন্তু ভাতায় তাহা এক-প্রকার পোষাইয়া যায়। তবে ব্রিটিশ ভারতে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী,…তদর্দ্ধং রাজসেবায়াম্" ইহা যে বিপরীত দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। ভারতের স্বরাজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মোটাবেতনলোভী আবার একদল লোক না মাথা তুলে! দলাদলির মূল যে স্বার্থ, তাই আশঙ্কা আমাদের—অমূলক নহে।

আমাদের এই কথাটা যে একেবারেই কাল্পনিক নহে, তাহা সেফ্‌গার্ড প্রসঙ্গ লইয়া "স্পেক্টেটর" কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তরে মহাত্মার উক্তির মর্ম্ম হইতেই ইহা বুঝা যায়। "স্পেক্টেটর" কাগজের সম্পাদক মহাশয় বলেন—ভারতের লোকেদের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে 'সেফ্‌গার্ড' লইয়া এতটা মাথা ঘামাইতে হয় না। মহাত্মার উত্তর—ভারতে যদিও আমরা বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়, যদিও আমরা খুনোখুনি করি, আমাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, তবুও ভৌগলিক তত্ত্বানুযায়ী আমাদের দেশ এক ও অখণ্ড, আমরা একজাতি। ভাষা এক হইলেই অখণ্ড জাতীয়তা সিদ্ধ হয় না; আর অন্তঃকলহে কুকুরের মত খেয়োখেয়ি করিলেই যে এক অখণ্ড জাতি ছন্নছাড়া হয়, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ভারতের সিভিলিয়ন কি ভারতের উপর যথার্থ শুভেচ্ছা পোষণ করেন; তাঁহারা কি ভারতজাতির সহিত যথার্থ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন? আমাদের মনে হয়, ভারত-শাসনে ব্রিটেনের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থই বিষের মত আমাদের অন্তর্বিবাদের কারণ—স্বার্থশূন্য রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থাপরিবর্ত্তনে আমরা যথার্থরূপে জাতিগঠনের সুযোগ পাইব।

ভারতের ঋণ—

উদীয়মান তরুণ জাতিকে আজ এই সকল শ্রুতিকটু প্রসঙ্গ লইয়া বিশেষভাবেই আলোচনা করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা কোন্ পথে আসিবে, সে তর্ক, সে বিচার মনুষ্যবুদ্ধির অতীত; ভারতের বিধাতৃ-পুরুষ সে সমস্যা সমাধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের কিন্তু সকল দিক্ দিয়া স্বাধীন জাতির ভাব ও চরিত্র লইয়া আজ দাঁড়াইয়া উঠিতে হইবে।

কংগ্রেস এই পথে জাতিকে অতি দ্রুত আগাইয়া দিতেছে। গয়া ও লাহোর কংগ্রেসে ভারতের ঋণ-প্রসঙ্গ লইয়া গভীরভাবে আলোচনা হয়। ভারতের মুক্তি-ব্রত লক্ষ্য করিয়া, বিদেশী সংবাদপত্রে নানা ভঙ্গীতে বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী প্রায় বাহির হয়; এইজন্য স্থির হইয়াছিল, এই বিষয়ে ভারত সত্যই কতটা দায়ী, তাহার একটা খাঁটি হিসাব বাহির করা। এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত বাহাদুরজী, ভুলাভাই দেশাই, কে-টি-সা, জে, সি, কুমারাপ্পা, এই চারিজন অর্থনীতিক শাস্ত্রে সুনিপুণ ব্যক্তির সহযোগে এক কমিটী গঠিত হয়। ইঁহারা দীর্ঘদিনের শ্রমে কংগ্রেসের সম্মুখে যে হিসাবে দাখিল করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল করিয়া প্রণিধান করা উচিত। স্বরাজ্যসাধনের পথে এই ঋণদায়-মুক্তিরও যে সঙ্কট, তাহাও আমাদের ন্যায়তঃ সমাধান করিতে হইবে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে—আইরিশ জাতি যেদিন স্বরাজ-পতাকা উড়াইয়া জাতির যে চরম সৌভাগ্য তাহা লাভ করে, সেদিন তাহার ঘাড়েও বিপুল ঋণের বোঝা চাপাইয়া দিতে ব্রিটন চেষ্টার কসুর করেন নাই, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। রুষ বিপ্লবী; সে গায়ের জোরেই সবনাকচ করিয়া স্বাবলম্বীর সাধনা লইয়াছে। দেশমুক্তির অধিকার পাইলেও এই ঋণভারের নৈতিক বাধা সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। ভারতকে তাই পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য সাবধান হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ডি, এন, বাহাদুরজী প্রমুখ ভারত-ঋণ-কমিটীর সভ্যবৃন্দ এই কয়টী ছত্রে ঋণের পরিমাপ ও কারণ সর্ব্বসাধারণের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া কি উপকার যে সাধন করিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে। যে জাতি আজ মুক্তিকামী, তাহাদের প্রত্যেকের এই ঋণের অঙ্ক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। নৈতিক বাধা অনেক সময়ে অজ্ঞত্বপ্রযুক্ত অকারণ পীড়া দেয়। তাই পরিস্কাররূপে বুঝিয়া ঋণবোধ প্রকৃতপক্ষে যতটুকু ততটুকুর দায়ই আমরা বহিব। আজ হইতেই আমাদের মনকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে ঋণের বোঝা তাহার হিসাব ও কারণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে:—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোম্পানীর বহিঃসংগ্রামের খরচ	৩৫,০০০	কোটী টাকা।
১৮৩৩ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর মূলধনের সুদ	১৫.১২০	কোটী টাকা
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের খরচ	৪০,০০০	,,
ব্রিটিশরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে ১৮৫৭ হইতে ৭৪ সালের সুদ	১০.০১০	,,
ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সম্পত্তি খরিদ বাবদ	১২.০০০	,,
১৮৫৭ হইতে ১১০০ বহির্যুদ্ধে খরচ	৩৭,৫০০	,,

১৯১৫ হইতে ১৯২০ ইউরোপের যুদ্ধে ভারতের দান	৩৮৯.০০০	কোটী টাকা
১৯১৪ হইতে ১৯২০ ইউরোপের যুদ্ধে খরচ	১৭০.৭০০	
১৮৫৭ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত খুচরা খরচের হিসাব	২০.০০০	,,
ব্রহ্মপ্রদেশের জন্য	৮২.০০০	,,
১৯১৬ হইতে ১৯২১ ভারতশাসন প্রবর্ত্তনে ক্ষতির মাত্রা	৩৫.০০০	
রেল কোম্পানি দখল করায়	৫০.০০০	
অন্যান্য রেল নির্ম্মাণে	৩৩.০০০	
মোট	৭২৯.৭০০	

প্রকৃত দেশের উন্নতিবিধানে ৫৮ কোটী টাকা ব্যয় যুক্তিসঙ্গত, অন্য ব্যয়ের জন্য ভারতকে দাবী করা চলে না। কোন দেশই নিজের উন্নতি অবনতির হিসাব ব্যতীত অপরের দায়ভার বহন করে না; এমন কি ব্রিটেনের অধীনস্থ ডোমিনিয়ন রাজ্যগুলিও নিজেদের দেশ ও বাণিজ্য ব্যাপারে সমুদ্রপথরক্ষায় অর্থব্যয় করে। ভারত কামধেনুর মত সর্ব্ব ব্যাপারেই দোহিত হইয়াছে। ধনে প্রাণে একটা জাতিকে চিরপঙ্গু করিয়া রাখার এই নীতি আদৌ যে সমীচিন হয় নাই, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন। ভারতের স্বরাজলাভের সুদিনে এই ঋণ লইয়া যে বুঝাপড়া হইবে—সেদিন ভারতকে স্পষ্ট বলিতে হইবে, এতথ নি ঋণভার সে বহিবে না। শস্যশ্যামলা মণিরত্নশালিনী ভারত আজ ঋণভারপীড়িতা; নিখিল বিশ্ব যার শুন্যদুগ্ধে আজ শক্তি ও সম্পদের অধিকারী, সেই ভারতের মাথায় পরাধীনতার বোঝা চাপাইয়া ব্রিটনবাসী নিশ্চিন্ত থাকে নাই, গুরু ঋণের বোঝা অকাতরে চাপাইয়াছে। পরাধীনতার মহাপাপ এমনই বটে!

হিন্দু-মুসলমান—

জাতির জয় যখন হয়, তখন কি অংশ হিসাব কষাকষি চলে, আমরা একথা বহুবার বলিয়াছি। আজ তো জাতির জয় নহে, ভারতের মিশ্রশক্তি ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনপ্রার্থী। এই প্রার্থনার শক্তি রক্তারক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শাসকের অন্তর স্পর্শ করে নাই। এখন চুক্তির কথা। সে চুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন সবাই—তাহার কারণ, অংশতঃ জয়ের অধিকার পূর্ণজয়ীর যে অধিকার তাহা নহে; বরং ইহাতে সুবিধা-বাদীরই 'পাথরে পাঁচকিল' হয়—হইয়াছেও তাই; প্রতিপক্ষেরও ইহাতে সুবিধা অনেকখানি।

বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের দাবীর সুরটা কিছু কড়া ধরণের—যেন আজ তারাই ভারত জয় করিয়া ইংরাজের সঙ্গে সর্ত্তবদ্ধ হইতে আগাইয়াছেন, হিন্দুজাতিটার বিপুল অস্তিত্ব খাটো করিবার হইলে তাহারও ত্রুটি হইত না। ধুনার গন্ধে মনসার নৃত্যও আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশী সংবাদপত্রগুলি এমন 'নেতি'র মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে জীয়ন্ত মাছে পোকা ধরিয়া যায়, হিন্দুস্থান ভারতে হিন্দুকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নূতন শাসনতন্ত্রে ভাগাভাগির হিসাব দেখিলে মনে হয়—রাজকর্ত্তৃপক্ষ, মুসলমান-সম্প্রদায়, আর ভারতে এক অস্পৃশ্যজাতি নামে প্রবল সম্প্রদায় মাথা তুলিয়াছে; তাহারাই আজ সবের অধিকারী; হিন্দুজাতিই নগণ্য, অক্ষম, অপদার্থ, অনুগ্রহের ভিখারী। কথায় সব হয় না; বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ যাহা, তাহা

উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। আজ মনে হয়, কাবুল কান্দাহারও যে একদিন হিন্দুজাতির বাসভূমি ছিল! জোয়ার ভাঁটার মত জাতি-সংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে—তবে আজিকার অনেকখানি কাগজে কলমে, হিসাবের খতিয়ানে সুদিন আসিলে ভারতে হিন্দুপ্রাধান্যই মাথা তুলিবে। বোধ হয়, তাই হিন্দুজাতির অস্তিত্বজ্ঞান আজ ভয়ের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আমরা এইরূপ ভাবপোষণের পক্ষপাতী নহি; বিধাতা যে অবস্থায় আমাদের ফেলিয়াছেন, তাহা বহিবার শক্তিই চাহি। জাতীয়তার ক্ষেত্রে ধর্ম্মভেদ মারাত্মক নহে; আমরা হিন্দু-মুসলমান, অস্পৃশ্য, শিখ অবিভাজ্য-রূপেই দাঁড়াইতে চাই। এইজন্যই কংগ্রেস সংযুক্ত-জাতির ক্ষেত্রভূমিরূপে গড়িয়া উঠে—এইখানেই আমরা মিলিত জীবনের মহাশক্তির অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিব।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তার মর্ম্মগ্রাহী যাঁহারা তাঁহারা ইহা পরিষ্কার রূপেই বুঝেন। এই জন্যই কংগ্রেসের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁহারা ভারতে স্বরাজের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা চাহেন। সওখৎ আলি প্রমুখ ইস্লামধর্ম্মিগণের অপেক্ষা তুলনায় ইঁহারা স্বীয় ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন অংশে উদাসীন নহেন, অনুমাত্র অল্পদরদী বলিয়াও তাঁহাদের মনে করার কোন কারণ দেখি না।

আজ আমরা যদি একবাক্যে ব্রিটিশ পার্ল্যা-মেণ্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাবীর কথাটা জানাইতে পারিতাম, আর সেই দাবীটা উপেক্ষা করিলে ভারতের ত্রিশকোটী নরনারী তাহার প্রতিবাদে প্রচণ্ডবেশে দাঁড়াইবে—এই সত্যটা ব্রিটিশজাতির মনে আঁকিয়া দিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে বোধহয় ভারতের স্বাধীনতালাভের পথ ভবিষ্যতে রুধিরাক্ত কর্দ্দমময় হওয়ার অবসর হইত না। এইজন্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিলের জন্য মহাত্মার এতখানি অন্তরের দরদ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সওখৎ আলি ইহার মধ্যে ছলনাই দেখিলেন, একেবারে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"Can Mr. Gandhi not fight a clean battle and not hit below the belt?"

সওখৎ আলির মস্তিষ্কবৃত্তির স্থূলতা বশতঃ মহাত্মার আন্তরিকতার মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিতে



মৌলনা সওখত আলি

পারেন নাই। মহাত্মা তাঁহার সহিত যদি চুক্তি করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে ইস্লাম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তিই হইত। মহাত্মা ইস্লামীদের মধ্যে ভেদ রাখিতে চাহেন নাই; কিন্তু 'কংগ্রেস কি দিবে' ক্রুদ্ধ স্বরে সওখৎ আলি ইহা ব্যক্ত করা মাত্র, তাঁর সেই অখণ্ড পদমর্য্যাদা কি ক্ষুণ্ণ হইল না! মহাত্মা

এই সত্যটাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কথার মধ্যে আমরা সওখৎ আলিকে ক্ষুণ্ণ করার সন্ধান পাই নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"……Congress has offerd a compromise. Maulana Shaukot Ali when he was with the Working Committee angrily said 'Why do you continually ask me what I want? I have told you what I want. Why dont you tell me what you would give?"

এইখানেই সওখত আলি ভারতের সংযুক্ত জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন—তিনি তাহাতেই গর্ব্ব অনুভব করেন; কিন্তু ইহা নিছক অন্ধতা। অতঃপর কংগ্রেস সওখৎ আলি প্রমুখ মুসলমান সম্প্রদায়কে যাহা দিতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। আমরা ভারতের জাতীয়তার মুখ চাহিয়া ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিব না। এখানে সম্প্রদায়গত স্বার্থ দেখিলেও, এই অবস্থায় সর্ব্বধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মিলিত জীবন সম্ভব করিতে হইলে, ইহা ব্যতীত উপায় নাই; ইহাতেও যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ-বিশেষ নিজেদিগকে ভারতের এই জাতীয়তার সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন, তবে তাহার মূলে জাতির মুক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই সংশয় হয়।

জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় প্রত্যেকের মর্য্যাদা রাখিয়াই কংগ্রেস যে ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইস্‌লামধর্ম্মীর আর হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর ভয় অথবা সংশয় কিছুই থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমরা মোটামুটি ইহার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

মুসলমান সম্প্রদায় চাহিয়াছিলেন—ভারতের সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানে ভারতের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ব্রিটিশশাসনের তুল্য অধিকার—কংগ্রেস তাহাতে আপত্তি করে নাই; সিন্ধুপ্রদেশকেও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়ায় কংগ্রেস বাধা দিবে না; ধনসম্পদ্ বিদ্যা-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বয়ঃস্থ ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার দেওয়ায় মুসলমানের স্বার্থ কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমন্তে, সিন্ধুদেশে, বাংলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানের আধিপত্যই ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুই তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থার দাবী করিতে পারেন। এইরূপ ভোটের ব্যবস্থা থাকায় লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীতে মুসলমান সম্প্রদায়ই বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিন্দুর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে।

ব্যবস্থাপক-সভার কেন্দ্র-ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের শতকরা তেত্রিশ জন প্রতিনিধির দাবীর মীমাংসা—ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ায়, এক্ষণে হওয়া সম্ভব নহে। তাহা না হইলে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় ও নিখিল ভারত মোস্‌লেম সভার সকল প্রকার দাবীর সামঞ্জস্যই কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ করিয়াছেন; তবুও যদি কেহ সংযুক্ত জাতি-জীবনের পক্ষপাতী না হন, এই কংগ্রেস অথবা হিন্দুজাতিকে ইহার জন্য ভবিষ্যতে আর দায়ী করা চলিবে না।

রাউণ্ডটেবিল সভায় নূতন সভ্যনিয়োগ—

আঠার জন নূতন সভ্য রাউণ্ডটেবিল সভার কার্য্যে নূতন করিয়া নিয়োগ করা হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে মৌলনা সওখৎআলি, মৌলভি মহম্মদ সাফি দাউদি, সৈয়দআলি ইমাম, শ্রীমতী সরোজনী নাইডু, স্যার মহম্মদ ইকবাল, পণ্ডিত

মদনমোহন মালব্য ও মহাত্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান অভেদে ভারত-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী মাত্র একজন জাতীয়পন্থী-মুসলমানসংহতির সভ্য গ্রহণ করা হইয়াছে; ইনি হইতেছেন স্যার সৈয়দআলি ইমাম। গত এপ্রেল মাসে লক্ষ্ণৌ জাতীয় মুসলমানসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া,ইনি যুক্তি-নির্ব্বাচন-নীতি যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ডাঃ আন্‌সারি ও আবুল কালাম আজাদকে এই সঙ্গে সংযুক্ত করা হইলে সুখী হইতাম। স্যার আলিইমাম স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতি প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে একা দাঁড়াইয়া কি করিবেন! ভারতে একদল জাতীয়তাবাদী মুসলমান যে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত অস্বতন্ত্র হইয়া স্বরাজপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্, এই প্রমাণ রাউণ্ডটেবিল কন্‌ফারেন্সে তাহা হইলে ভাল করিয়াই প্রদর্শন করার সুযোগ হইত। কর্ত্তৃপক্ষগণ জাতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ন্যায্য বিচারে কুণ্ঠা করিয়াছেন—এক্ষেত্রে ইহাই সপ্রমাণ হয়।

কাশ্মীরে রক্ত-গঙ্গা—

গত রাউণ্ডটেবিল সভায় দেশীয় রাজন্যবৃন্দ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—ব্রিটিশ ভারতের মত এই সকল স্বাধীন-রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের অগ্নিশিখা কোনদিন জ্বলিয়া উঠে নাই। অকস্মাৎ কাশ্মীরের ঘটনায় সে গর্ব্ব দূর হইয়াছে। আমরা দেশীয় রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের বীভৎস বিরোধ-দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

ঘটনার মূলে—একজন হিন্দু পুলিশ কর্ম্মচারী এক মুসলমান সহকর্ম্মীর কোরাণের প্রতি নাকি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন; বিচারে এই মুসলমানকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়; অপর হিন্দু পুলিশ-কর্ম্মচারীকে পেনসন্ দিয়া বিদায় দেওয়া হয়—তারপরই ইহা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ আন্দোলন হইতে থাকে। তিনজন মুসলমান প্রতিনিধি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তাহাদের বন্দী করা হয়। কাশ্মীররাজ্যে শতকরা ৯০ জন মুসলমান। দীর্ঘদিন তাহারা হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত বিনা বিরোধে শান্তির সহিত বাস করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু যুগের হাওয়া যখন অন্যরূপ, তখন পূর্ব্বের অবস্থা আর ফিরিবে না। যাহা হইবার সবই হইয়াছে—হিন্দুর ঘরদুয়ার লুট, হিন্দুর প্রাণবধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছুরই বাকী থাকে নাই। শান্তিরক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুগের যে অব্যর্থ বিধান, তাহারও ক্রটি হয় নাই; গুলি চলিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তে কাশ্মীররাজ্য রঞ্জিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা এই ভীষণ উপদ্রবের উপলক্ষ মাত্র। আসলে, মুসলমান সম্প্রদায় হইতে রাজসরকারে অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারীর নিয়োগ হয় না, মুসলমানগণ সুবিচার পায় না; তাই রাজ্যশাসন-নীতির বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন—অতএব শাসননীতির পরিবর্ত্তনের তাগিদ করা হইয়াছে। কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায় চাহে, যে ধর্ম্মে কর্ম্মে তাহাদের কোনরূপ বাধা যেন না দেওয়া হয়, স্বাধীনমত প্রকাশে এবং সভাসমিতি করিতে রাজ্যশাসন-নীতি যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে; সংবাদপত্রপ্রচার, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা, সামরিক শিক্ষা, রাজ-সরকারের চাকুরী, এমন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তন, যাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার বজায় থাকে, এবং কোন হিন্দু মুসলমান হইলে বর্ত্তমান আইনে সে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা বিরত করা।

কাশ্মীররাজ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা হইলে, শাসননীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, আমরা দেখিবার জন্ম উদ্‌গ্রীব রহিলাম। একটা বিষয় আমাদের কেবলই ভাবিয়া দেখিতে হয়, জগতের সর্ব্বত্রই মানুষ অধিক অধিকার আদায়ের জন্য রক্ত মোক্ষণই করিয়া থাকে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সমানভাবে সকলে বিনা উপদ্রবে আদায় করিতে পারে না। মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এমন যে অহিংস আন্দোলন, তাহাও অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে; কিন্তু এক বৎসরে ভারতে এই অজুহাতে উপদ্রবের আগুনও অল্প জ্বলে নাই। শক্তি বলিতেই আমরা পাশবিক বলকেই লক্ষ্য করি; ইহার কারণ, আর অন্য কিছু নয়—মানুষ যে স্তরে বাস করে, সেই স্তরের সম্পদ্‌ ও বীর্য্যের যে রূপ, তাহাই অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। এই আসুরিক-সম্পদ্‌ লইয়াই পৃথিবীতে এখনও ভোগ ও অধিকারবাদের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় ভাবের নব সংগ্রাম-নীতি মহাত্মাকে অনুসরণ করিয়া যদি সাফল্যলাভ করে, সমগ্র বিশ্বই রক্তপাত-রূপ বীভৎস কার্য্য হইতে মুক্তি পাইবে।

কংগ্রেস ও বিপ্লব—

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সাবেক যুগের বাক্য-আস্ফালনও নহে এবং বিপ্লবীদের রুদ্র হত্যানীতিও নহে। অহিংস অসহযোগ-নীতি তেমন সাফল্যলাভ না করায়, অহিংস আইনঅমান্য নীতি ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের মনীষিবর্গ যখন একটা সুষ্ঠুনীতি আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার প্রয়াস করিতেছেন, তখন ধৈর্য্যহীন অন্যপক্ষের ইহার পরিপন্থী হওয়ায় শ্রেয়ঃ হয় নাই; কিন্তু মুক্তিকামনা যে ক্ষেত্রে যে প্রত্যয় লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তদনুরূপ অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কোন রক্তপন্থী যতই যুক্তি দিয়া অহিংস সত্যাগ্রহীকে তাহার অব্যর্থমতের প্রতি প্রত্যয় স্থাপনের যতই চেষ্টা করুক, অন্তরে অন্তরে খাঁটী সত্যাগ্রহী কোনদিন এই যুক্তি স্বীকার করিবে না; অন্য পক্ষেও সেই একই কথা। প্রদেশে প্রদেশে মহাত্মা জন্মিলেও, বিপ্লবপন্থীকে এই ভীষণ নরহত্যারূপ মহাপাপ হইতে নিরস্ত করা সম্ভব হইবে না।

আমরা দেখি—হিংসাকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া মাত্র এক পক্ষ চীৎকার করিয়া প্রকাশ্যক্ষেত্রে যাঁহারা কর্ম্মরত, তাঁহাদের উপরেই গালিবর্ষণ করেন, এবং হাতের কাছে যাহাকে পাওয়া যায়, তাহার উপর দণ্ডবিধান করিয়া দেশে আতঙ্কের আব্‌হাওয়া টানিয়া আনার জন্য নূতন নূতন আইনের প্রবর্ত্তন হয়, ইহা আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি না; বরং ইহা দ্বারা রাজশক্তিরও যেমন উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয় না, বৈধীভাবে দেশের মুক্তিকামনায় স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্ক লইয়া যাঁহারা আগাইতে চান, তাঁহাদের অকারণ বাধা দিয়া বিপ্লবপন্থীরই কর্ম্মে সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

আমরা সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হওয়া মাত্র বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশের লক্ষণ চট্টগ্রামে ভীম-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে দেখি, এবং সেই সঙ্গে রাজকর্ত্তৃপক্ষও বাংলার প্রচণ্ড শাসনদণ্ড উদ্যত করেন—সঙ্গে সঙ্গে ৪৫৪ জন ১৯৩০-এর আইনে কারাবন্দী হয়; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রেস-আইনও প্রবল-মূর্ত্তিতে চলিতে থাকে। কিন্তু ইহার ফল ভাল হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এইরূপ কঠোর বিধান প্রবর্ত্তন না করিলেও ফল যে ভাল

হইত, এমন কথাও বলা যায় না। তবে দেশের আব্‌হাওয়া উত্যক্ত না হইলে, বিপ্লববাদীরা লোকমতের অপ্রত্যক্ষ প্রশ্রয় পাওয়ার সুযোগ পায় না; কঠোর শাসননীতির ফলে বহুলোককে উদ্বেজিত করা হয়; উদ্বেজিত লোকসংখ্যা যত অধিক হইবে, বিপ্লবীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা ততই অধিক হইবে—সর্ব্বজাতির ইতিহাস হইতে এই প্রমাণ আমরা ভূরি ভূরি প্রদর্শন করিতে পারি।

জাতি স্বাধীনতা চাহিয়াছে। সে পথ রুদ্ধ থাকিলে নিরাশ হইবার কথা। কিন্তু মহাত্মাই এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া হত্যাকাণ্ড হইতে দেশকে বিরত রাখার সুযোগ দিয়াছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই এই সুযোগ গ্রহণ করিবে। কেননা, রক্ত-বিনিময়ে যাহা মিলে, তাহা চিরদিন রক্ত দিয়াই রক্ষা করিতে হয়; আত্মার শক্তি যে জয় আয়ত্ত করে, তাহা আত্মার দিব্যধর্ম্মে শাশ্বত-কাল স্থায়ী হয়—ভারত এই সনাতন পথের সন্ধান পাইয়াছে।

কংগ্রেসের কর্ত্তব্য—হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা। ইহা সহজ কাজ; অতএব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ইহা করিয়াছেন। সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে যে কথা অন্য পক্ষের তাহা প্রকাশ্যে বলার উপায় নাই; তাহারা গোপনপত্রে তাহা করিয়া থাকে। সত্যটাকে বিদ্বেষবশতঃ আমরা যেন বিকৃত করিয়া না বুঝি। স্পষ্টতঃ, দেশে অসংখ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে; কংগ্রেস ভারতের সবখানি নয়। কেবল কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত রাজপুরুষগণ পরামর্শ করিয়া ভারতের ভাল মন্দ কিছু করেন না; কিছু করিতে হইলে সর্ব্বদলের প্রতিনিধি একত্র করেন। বিপ্লব-বাদীদের যে দল তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই; থাকিলেও রাষ্ট্রসমস্যার পথে সামঞ্জস্যবাদ যে কত বড় প্রয়োজন, তাহা হয় তো তাহাদের স্বীকৃতির মধ্যে নাই। এই অবস্থায় এ দলটার উচ্ছেদপ্রবৃত্তি ছাড়া রাজশক্তিরও যেমন অন্য কামনা নাই, ভিন্ন ভিন্ন দলেরও এই একই কথা। তবে বিপ্লবীর আনুকূল্যে অনেক শ্রেণীর লোক দেশ ও সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে; বিপ্লবীকে সাহস দেওয়া, তাহাদের মূলোৎপাটনের পথে নানা উপায়ে অন্তরায় সৃজন করা ইহাদের কাজ। তাই সব দেশেই দেখা যায়, প্রকাশ্যক্ষেত্রেও একদল লোক চিরদিন সুবিধা পাইলেই বিপ্লবপন্থী-দের সাহায্য করিয়া চলে। এই প্রকারের কাজ বন্ধ করার জন্য রাজ্যশাসন-নীতির প্রয়োজন আছে, এবং প্রতিবাদ সমর্থনে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবেই। এই শাসনকলটা এই হেতু বিচার করিয়া যদি প্রয়োগ করা না হয়, ব্যবহার-দোষে দেশের সাধু প্রচেষ্টাই রুদ্ধ হয়; চিরযুগের যে বীভৎস নীতি তাহাই প্রশ্রয়ে ও বহুলোকের সহানুভূতিপুষ্ট হইয়া রক্তবিপ্লবই ডাকিয়া আনে—ভারত আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে।

আদর্শনীতির জয় ও ভারতে স্থায়ী স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার কৌশল সিদ্ধ করিতে হইলে, ভারতবাসীকে একান্ত অসহযোগী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা এই জন্যই দেখিতেছি, মহাত্মা আজ কত বড় সামঞ্জস্যবাদী হইয়াছেন; দিল্লীর চুক্তিরক্ষার জন্য সর্ব্বদলকে সুনিয়ন্ত্রিত করার সঙ্গে, দেশের রাজ-পুরুষগণের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁর মত উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাই আজ তাঁহার কার্য্যে তীব্র সমালোচনায় কাহারও ভরসা হয় নাই; নতুবা এতদিন বিরুদ্ধ কলরব উঠিত—সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ডঙ্কা বাজিত। কিন্তু ইহা নিছক হঠ-কারিতা। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য

প্রয়োজনমত সামঞ্জস্যবাদকেও আশ্রয় করিতে হইবে।

বিপ্লবকে দমন করার এই জন্য মুক্তিলাভের এই দ্বিতীয় নীতির প্রাবল্যই একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। শাসননীতি এখানে কোন মতে কৃতকার্য্য হইবে না। বিপ্লববাদী যাঁরা, তারা যখন মরণ তুচ্ছ করিয়াছে, তখন নিন্দা-প্রশংসার ডঙ্কা পিটিয়া তাহাদের যে নিরুৎসাহ করা যায়, উৎসাহ দেওয়া যায়, এই অসার যুক্তি বিজলী পাখার তলায় আরাম কেদারায় বসিয়া যাঁহারা মতামত প্রকাশের সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাই দিবেন—যাঁরা একটা আদর্শবাদের জন্য সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারা আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিবেন।

এমন দিন আসিতেছে—রাজশক্তির সহিত বিপ্লবীদের সংঘর্ষণ অপেক্ষা, দেশে যদি এমন দুইটা আদর্শবাদ খাড়া হয়, যাহাতে উভয় ক্ষেত্রেই ত্যাগ ও তপস্যা বাহ্যতঃ সমান, তাহা হইলে এই দুই দলের শক্তিপরীক্ষায় সংঘর্ষ আত্মবিরোধ বাধাইবে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই, আপাত-সুযোগপ্রার্থীর দল এই অবস্থায়, 'যা শত্রু পরে পরে' মনে করিয়া এই সময়ে আনন্দে আটখানা হয়েন। দেশের রাজশক্তিই এইরূপ দায়ে অধিক দায়ী হন। উক্তরূপ সংঘর্ষ অর্থে, ভবিষ্যতের জন্য একটা অকাট্য শক্তির অভ্যুত্থান; সে শক্তি আর সামঞ্জস্যবাদ বরণ করিয়া লয় না, ঋজু ও অব্যর্থভাবে প্রতিপক্ষকে নিষ্ঠুরভাবেই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে, মৈত্রী রক্ষার সুযোগ তাই কোন বিজিত জাতি বিজেতার সঙ্গে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য আমরা রাজশক্তিকে ধীরভাবে দূরদর্শী হইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলি। যদি বিপ্লববাদ সমাজের শত্রু, মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া সরল বিশ্বাস তাঁহাদের থাকে, তাহা হইলে আজ ভেদনীতির আশ্রয়ে আপাত অগ্রগামী দলটার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া আরও কিছু দিন তাহাকে অচল করিয়া রাখার কূটবুদ্ধি যেন তাঁহারা গ্রহণ না করেন, অধিকতর কঠোরনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া সদিচ্ছাপরায়ণ জাতির নেতৃবৃন্দকে যেন উদ্বেজিত না করেন। রাজ্যরক্ষার বিধান যদি জাতির হস্তে প্রত্যর্পিত হয়, এইরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড নিবারণে তখন জাতিই দায়ী; জাতিই তখন তাহা নিবারণ করিতে প্রাণপণ করিবে। রাজদণ্ড ধারণের বিন্দুমাত্র অধিকার দিব না, অথচ মুক্তিব্রতী বিপ্লবীদের মূল উৎপাটনে দেশ উদ্যত হইবে, ইহা যে আদৌ সম্ভব নহে! কথাটা গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উপায় নির্ব্বাচন করিলে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্র আর নিষ্ঠুর হত্যার রক্তে রঞ্জিত হয় না। যাহারা সত্যাগ্রহী—রাজ-কর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হউক, জগদীশ্বরের নিকট তাহারা এই প্রার্থনাই করিবে।

ভারতে বস্ত্র-সমস্যা ও খাদি—

বহিষ্কার-নীতির ফলে ভারতে বস্ত্রব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে বস্ত্র-আমদানীর হার শতকরা চল্লিশ, আর ভারতীয় মিলের উৎপাদনশক্তি শতকরা ১০৯ দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে দেশের সম্পদবৃদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু তবুও ভারত বস্ত্রে স্বাবলম্বী নহে; নিম্নের হিসাব দেখিলে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে:—

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের কলে বস্ত্র

	উৎপন্ন হইয়াছে	১১৬	কোটি গজ
,,	বিদেশ হইতে আসিয়াছে	৩২০	,,
,,	তন্ত্র বয়ন দ্বারা	১৪০	,,
		৫৭৬	,,

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতের কলে বস্ত্র

	উৎপাদনের পরিমাণ	২৪২	কোটি গজ
,,	বিদেশ হইতে আমদানী	১৯২	,,
,,	তন্ত্র বয়ন দ্বারা	১৫০	,,
		৫৮৪	,,

১৩.৩৩ গজ কাপড় মাথাপ্রতি খরচ হইয়াছিল ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে, ইহার মধ্যে ৯.৯৩ গজ কাপড় বিদেশের, ৩.৪০ গজ ভারতের। আর ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ১৩.১০ গজ কাপড় মাথাপ্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে; বিদেশ হইতে পাইয়াছি ৫.৯৭, আর ভারত যোগাইয়াছে ৭.১৫।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটি টাকার মূলধনে কলওয়ালারা লাভ করিয়াছে ৫০ লক্ষ টাকা। আমদানীর উপর শুল্কবৃদ্ধি হওয়ায় ভারতের কল-ওয়ালাদের সুবিধাও হইয়াছে অনেকখানি। ব্রিটন-জাত বস্ত্রাদির উপর শতকরা ২০৲ টাকা, আর অন্যান্য দেশের আমদানী বস্ত্রের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর হার ১৯২ কোটী গজ কাপড় এখনও আমরা কলের সাহায্যে উৎপন্ন করিতে পারি। পনর বছরে কলে আমরা ১২৩ কোটী গজ অধিক বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছি; আর তাঁতে ১৪০ কোটী গজের স্থানে ১৫০ কোটী গজ করিয়াছি মাত্র; মিলে ও তাঁতে এখনও অনেকখানি কাপড় উৎপাদন করিতে পারিলে, ভারত বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইবে, এ আশা আর কল্পনা নয়।

এইবার খাদির স্থানের কথা আলোচনা করিব। ১৫০ কোটী গজের মধ্যে খুব অল্পই খাদি আছে। তাঁতের কাপড় অর্থে, একমাত্র খাদি নয়। খাদি আন্দোলনের পূর্ব্বেও তাঁতের কাপড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত; অনেক ক্ষেত্রে বিলাতী সূতাই ব্যবহৃত হয়, এক্ষণে দেশী মিলের সূতাও ব্যবহৃত হইতেছে।

কলের কাপড়ের অপেক্ষা তাঁতের কাপড়ের দর অধিক। সৌখীন লোকেই তাঁতের কাপড় ব্যবহার করে। খাদির দরও অধিক, অথচ মিহিও নহে। মিহি হইলে এক্ষণে যে দর তাহার জন্য দিতে হয়, তাহা একেবারেই অসম্ভব ধরণের। এই হেতু অনেকে মনে করেন—খাদিটাকেও জোর করিয়া রাখা হইয়াছে; মিল বাড়াইলে যখন আমরা বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে পারি, তখন এই অসাধ্যসাধন করিতে গিয়া মানুষের বহুমূল্য সময় ও প্রয়াসটা ব্যয় করার কারণ কি?

খাদির হিসাব দেখিলে হতাশ হইতে হয়। বিশেষতঃ পাঁজ খরিদ করিয়া যাঁহারা কাপড় পড়িবার আশা করেন—পাঁজের দর সের-করা ৸৵০, বুনান খরচ যোগাইয়া কাপড়খানির দর প্রায় ২৲ পড়িয়া যায়; এইজন্য হুজুগের যুগে সূতাকাটা আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে সব বন্ধ হইয়া আসে।

সূতা অনুসারে যে দর দেওয়া স্থির হইয়াছে, তাহার একটী হিসাব দিলাম—আধসের ৬নং সূতার দর ৵০ ৮ নং।০, ১০ নং।৵০, ১২ নং ॥০, ১৫ নং ৸০, ১৮ নং ১৲, ২০ নং ১॥০ ২৫ নং ২৲, ৩০ নং ৩৲, তাহা হইলে বুঝা যায় ৸৵০ আনা পাঁজ খরিদ করিয়া যাঁহারা ৬ নং হইতে ১৪ নং সূতা কাটিবেন, তাঁহাদের ঘর হইতে প্রায় সবখানিই খরচ করিতে হইবে। বুনানের হিসাব দিতেছি—সাদাসিধে খাদি স্কোয়ার গজ ৴১৫, ডিজাইন অনুসারে।০ হইতে ৸০ আনা পড়ে।

আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া বার বার হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, ব্যবসা হিসাবে খাদিকে দাঁড় করান একেবারেই সম্ভব হইবে না। মহাত্মা ঠিকই বলিয়াছেন, খাদির কাজে—'there is no

competetion between hotels and domestic kitchens."

আমরা এইজন্য খাদিকে কৃতকার্য্য করিবার জন্য ধীরে ধীরে এই পথে অগ্রসর হইয়াছি—প্রথমে তুলা গাছ রোপণ করা। যে কোন স্থানে ইহা জন্মায়, এবং একবার গাছ হইলে ৩।৪ বছর গাছ তুলা দেয়। এই তুলায় প্রত্যেকে যদি প্রতিদিন অর্দ্ধ ঘণ্টা চরকা কাটে, অন্যূন মাসে ৩০০০ গজ সূতা তাহার হইবে; ইহা তাহার বস্ত্রসমস্যা সমাধান হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তারপর প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে সূতা পাট করা, টানা দেওয়া, তাঁত বোনার ব্যবস্থা—ইহা হইতে যতদিন বিলম্ব ততদিন বস্ত্রব্যবহার-সঙ্কল্পে, পল্লীতে পল্লীতে কেবল এইজন্য যৌথ-শ্রম দিতে হইবে; সূতার মূল্য দেওয়া নেওয়ার কথা রাখিলে চলিবে না—কেহ সূতা কাটিবে, কেহ পাঁজ করিবে, কেহ বা টানা দিবে, কেহ বুনিবে। এইরূপে এক এক পল্লীতে যদি ২০।২৫ জন মানুষ তাহাদের অবকাশমত শ্রম দেয়, সেই পল্লীস্থ সকলে এক প্রকার অতি সামান্য ব্যয়ে বস্ত্রব্যবহারের সুবিধা পাইবেন। আমরা এই বিষয় লইয়া আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম (সংযুক্ত-সম্পাদক) রবীন্দ্র-জয়ন্তী মেলার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় সপ্তাহকালব্যাপী প্রদর্শনীর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা সর্ব্বজনবিদিত করিয়া, এই নৈরাশ্যক্ষুব্ধ জাতির প্রাণে আশার আলো জ্বালাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। কবির সম্মান এখানে বড় কথা নহে; কবিকে দেশ যত জানিবে ততই জাতির গৌরববোধ উদ্বুদ্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ যে এই পতিত জাতির আশাকেন্দ্র, শক্তি ও প্রতিভার অতলস্পর্শী সমুদ্র—দেশের নরনারী ইহাতে অবগাহিত হওয়ার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইবে।

আমরা মেলার পরিকল্পনা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। এইভাবে প্রদর্শনীর কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কবির প্রতি দেশের শ্রদ্ধার্ঘ্যপ্রদান সার্থক হইবে। এই বিষয়ে "পত্রিকা"-সম্পাদক যে অনুযোগ



মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করি। মেলায় কবির গ্রন্থরাজী সর্ব্বসাধারণের প্রাপ্যবস্তু করিয়া দেওয়ার সুযোগ মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ করিলে, তাঁহারা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন; ব্যয়-মূল্যে তাঁর গ্রন্থরাজী খরিদ করার সুযোগ এই প্রদর্শনীর একটা বড় দিক্ হইবে। কবির পূজা ঘরে ঘরে হওয়ার ইহাই সহজ উপায়। আশা করি, এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে বিবেচনা

করিয়া, যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলন—

বর্দ্ধমানে এবার হিন্দু-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত এম, এস, এনি, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুগণ্যমান্য হিন্দু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্তের অভিভাষণ খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুসমাজের করণীয় সকল বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়া হিন্দুজাতির চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর অভিভাষণও সভাপতির যোগ্য হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। হিন্দুসভার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার অনুকূলে এই সভার আগাগোড়া যে আয়োজন হইয়াছিল, বক্তৃতায় ও রেজোলিউসনে তাহা ষোলআনা সিদ্ধ হইয়াছে। মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের অভিভাষণে আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যাপক মূর্ত্তিটিই ফুটিয়া উঠিতে দেখি। তিনি বেদ পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণগত বৈষম্যের মূল শিথিল করার প্রয়াস করিয়াছেন। হিন্দুসভার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—হিন্দুধর্ম্মের মহান্ ও উদার মর্ম্মবাণীর প্রচার; নিজেদের মহত্ত্ব বুঝিলে সেই মহত্ত্বের মধ্য দিয়া অন্যের মহত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তখন অন্য ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষভাব স্থান পায় না—হিন্দুসভার ইহাই সর্ব্ব প্রধান কাজ। কিন্তু সম্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দেশের রাষ্ট্রসভার অনুগত কর্ম্মের অনুসরণ। হিন্দুসভা ভারতের রাষ্ট্র-সংহতির সমরেখায় যদি চলিতে চাহে, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার ও সংগঠননীতি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইবে না। আমাদের করিবার অনেক কিছু আছে, তাহা অংশাংশিভাবে গ্রহণ করিয়া দলে দলে যদি সকল দিক্‌টা পূরণ করিয়া তুলিতে পারি, একদিন আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে একটা জাতিকে সৃজন করিতে পারিব।

হিন্দু সম্মিলনীর দিকে চাহিয়া আর একটা বিষয় ভাবিবার আছে। প্রত্যেক সভায় অস্পৃশ্যতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, শুদ্ধি, সংগঠন—এই কথাগুলির সমর্থনসূচক বাণীর ঝঙ্কার, আর এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানমূলক প্রস্তাব সমর্থন করা, একটা গতানুগতিক ছন্দে ইহা ঢালাই হইয়াছে। আমরা এইজন্য, কলিকাতার ওয়েলিংটন পার্কে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর অভিভাষণে যে সকল বাণী শুনিয়াছি, পর পর সকল সভায় তাহার প্রতিধ্বনিই শুনি। বর্ণাশ্রমের কৃত্রিম ভেদলোপের সেই একই উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কার্য্যতঃ আগাইতে না পারিলে, ঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড় টানার মত নৌকা অচল হইয়াই থাকে—হিন্দুসভার অবস্থা কতকটা তদ্রূপ হইয়াছে। ইহার কারণ, বাংলার নিখিল হিন্দুজাতিকে আমরা এক করিতে পারি নাই রাষ্ট্রক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও দলাদলি আছে; এই দলাদলি যদি একান্তই অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে যে দলটা হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান কামনায় আগাইবে, তাহাদের প্রতি বছর সম্মিলনী না করিলেও চলে। একটা সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মী-সঙ্ঘ সৃষ্টির প্রথম প্রয়োজন, যাহারা অবহিত হইয়া হিন্দুস্থানে হিন্দুর যে অমরবীর্য্য তাহার সন্ধান করিবে। এই অমর হিন্দুত্বের সহিত কর্ম্মীদের ঐক্যজ্ঞান অবিচল হইলে, তাহাদের চক্ষের দীপ্তি ও কর্ম্মের উদ্দাম জাতির

পূর্ব্বস্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। সংস্কারের নামে বর্ণাশ্রম ভঙ্গ করা, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা—এইগুলি আদৌ রেজেলিউশন সমর্থনের উপর না হইয়া, মানুষের জীবনপ্রকাশের ইহা অনিবার্য্য প্রয়োজন হইবে। হিন্দুসমাজের সত্তা যাহা করিবে, তাহা রোধ করিবে কে? আবার এমনও হইতে পারে, যাহা ভাঙ্গিতে চাহি, তাহারই পুনর্গঠনের উপর হিন্দুজাতির বিজয়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইবে। প্রকাশের ভঙ্গী লইয়া আলোচনা অপেক্ষা, আমরা হিন্দুধর্ম্মের যে মূলধারা কালপ্রবাহে অতলে ডুবিয়াছে তাহার উদ্ধার করার কাজেই, হিন্দু বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহাকে আত্মনিয়োগ করিতে বলি। ইহার জন্য আলোচনা, আন্দোলন চাই। মত ও পথের একেবারে মিল হইল না বলিয়া কোন হিন্দুরই আজ ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে, অথবা হিন্দুর সবখানির সহিত সামঞ্জস্য করিতে গিয়া, এখনই যে স্বপ্ন অনেকে দেখেন, তাহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া কাহারও বিমুখ হইলে চলিবে না। বিশাল হিন্দুসমাজকে আমূল উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে—বাংলার হিন্দুসমাজ কি এই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না?

রাউণ্ডটেবিলে মহাত্মার যোগদান বন্ধ—

গুজরাট প্রদেশে দিল্লীর চুক্তিভঙ্গ হওয়ার প্রসঙ্গ লইয়া কংগ্রেসের সহিত বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দিল্লীর চুক্তি যে মানিতে রাজী নহেন, তাহা সর্ব্বত্র যেরূপ শাসননীতির প্রচলন দেখা যায়, তাহা হইতে উহা বিশেষভাবেই সপ্রমাণ হয়; কিন্তু বিলাতের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর দিল্লীর চুক্তি উভয় পক্ষে পালনের পক্ষপাতী থাকায়, এতদিন তেমন গুরুতর বিপত্তি ঘটে নাই; কিন্তু বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নীতি চুক্তি-বিরুদ্ধ হওয়ার অভিযোগ ভারত গভর্ণমেণ্ট নাকচ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাউণ্ডটেবিল সভায় যোগ দিবেন না—ইহা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা ঘোষণা করিয়াছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও আর বিলাত যাইবেন না। অবস্থা সঙ্কটজনক হইল। আমরা এখনও ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সুবিচার পাওয়ার আশা রাখি। চুক্তি যদি কোথাও ভঙ্গ হয়, তাহার বিচার-প্রার্থনা উপেক্ষা করা আমরা যুক্তি বহির্গত বলিয়াই মনে করি।

নারী-সঙ্ঘ—

বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়মিত একত্র হইয়া কর্ম্ম করার সুবিধার জন্য একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য—জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একত্র হওয়া; মাতৃত্ববিজ্ঞান, শিশুপালন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার; নারীদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা। শ্রীমতী সুনীতি দেবী ইহার সম্পাদিকা। ৩৩।৩ নং ল্যান্সডাউন রোড, পোঃ এল্গিন্ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে। আমরা এই প্রচেষ্টার শুভ কামনা করি।



সঙ্কলন ও সমালোচনা

সঙ্কলন

—:০:—

স্বাধীনতার জীবনমরণ কাঠি—

আষাঢ়ের "স্বদেশে" ভাবুক ও বিশেষজ্ঞ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত "স্বরাজের অর্থনীতির" দিকে দেশবাসীর সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি সকলকেই, বিশেষতঃ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণকে গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি—

"এ কথাটী ভুলিলে চলিবে না, যে আজকালকার রাষ্ট্রনীতিতে অর্থের ব্যবস্থাটাই হইলে মৌলিক ব্যবস্থা। অর্থের সংগ্রহ, হিসাব ও বিনিয়োগের অধিকার যাঁর হাতে, তিনি সমস্ত শাসন-পদ্ধতির উপর একটা প্রকাণ্ড ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। কাজেই অর্থব্যবস্থার উপর আত্মকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের অপরাপর অঙ্গ ও বিভাগে যতই কর্ত্তৃত্ব থাকুক না কেন, তাঁকে চলিতে হইবে অর্থসচিবের অঙ্গুলীহেলনে। সুতরাং অর্থ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আত্মকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কোনও প্রকারেই রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিপূর্ণরূপে সার্থক করা সম্ভব হইবে না।

এই কারণে অর্থবিধি, মুদ্রাবিধি প্রভৃতি বিষয়ে লাট সাহেবের অখণ্ড কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিলে ভারতের স্বরাজ বহু পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং গোল টেবিল বৈঠকের এই ব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লওয়া অসম্ভব।

কিন্তু অপর পক্ষে এ কথাও সত্য, যে ভবিষ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যাতে খাজনার টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা না হয় তাহারও সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন না, অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি যদি সুদৃঢ় না হয়, তবে আমাদের দেশের মঙ্গলচেষ্টার সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যাইবে; আর ঋণের জন্য যদি পরদেশে হাত পাতিতে হয়, তবে লাট সাহেবের অধীনতার পরিবর্ত্তে আমাদের মানিয়া লইতে হইবে পৃথিবীর বণিক্‌সঙ্ঘের অধীনতা।

যাঁরা ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাকামী, তাঁদের এই বিষয়টীর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কেন না, এই অর্থব্যবস্থাই হইল দেশের স্বাধীনতার জীবন মরণ কাঠি।"

মৌলিকতা নাই কেন?

গত 'বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের" দর্শন-শাখার সভাপতি মনীষিপ্রবর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র আধুনিক ভারতীয় চিন্তায় যে মৌলিকতার দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"আমার বক্তব্য এই, যে ভারতীয় স্বাধীন চিন্তার ধারা ধর্ম্মমতের সহিত মিশিয়া গিয়া যেন বালুরাশির মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় দর্শনেও সময়ে সময়ে এইরূপ আত্মবিস্মৃতির যুগ আসিয়াছিল। ধর্ম্মমতের প্রাবল্যে দর্শনের অমল শুভ্র ধারাটী হারাইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও সেইরূপ একটী নিষ্প্রভতার যুগ আসিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মমত লইয়া যতই গর্ব্ব করি না কেন, যতই তাহার দার্শনিক ভিত্তি থাক না কেন, ধর্ম্মমত দর্শন নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা আর নিঃস্বার্থ দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন। আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারাকে পুনরায় জীবন্ত উৎসে পরিণত করিতে হইলে, ধর্ম্মমতের সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য চেষ্টা হইবে কেন? কৌতূহল জাগ্রত হইবে কেন? শ্মশানে বসিয়া শক্তির আরাধনা করিয়া সাধক কৈবল্য লাভ করিতে পারেন বটে; কিন্তু বিজ্ঞান প্রত্যেক পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্ররূপে গণণা করিয়া তবেই তো নূতন নূতন রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন।"

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার এই অনুর্ব্বরতার প্রকৃত কারণ—আমাদের মনে হয়, অধ্যাত্ম স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মানুভূতিরই অভাব। কেন না, অনুভূতিই চিন্তার উৎস। ভারতীয় সাধনার (Culture) সনাতন বৈশিষ্ট্য—এই অধ্যাত্ম অনুভূতি। ইহারই অনুপ্রেরণায় ও পরিস্ফুরণার্থে সহস্র ধারায় দার্শনিক চিন্তার সৃষ্টি। সেই উৎসমূল শুকাইলে, চিন্তানির্ঝরিণীও শুকাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সাম্প্রদায়িকতার মুক্তি হউক, কিন্তু গভীর ও সত্য ধর্ম্মানুভূতি লাভ করিয়া ভারতের সত্তা আবার বজ্রহুঙ্কারে সাড়া দিয়া উঠুক—শত সহস্র নব নব চিন্তাধারা ও প্রাণধারার কলগর্জ্জনে সারা জগৎ মুখরিত, স্পন্দিত, পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার যে বাধা, তাহা মিত্র মহাশয় ঠিকই ধরিয়াছেন। তাঁহার এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য—

"আমাদের যে মৌলিক চিন্তাশীলতার অভাব তাহার আর একটী কারণ—আমাদের শিক্ষাপ্রণালী। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক চিন্তা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা হয় সংস্কৃত না হয় ইংরাজীতে চিন্তা করেন। যাঁহারা হিন্দু ষড়দর্শন অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা সকলেই যে সে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন সে সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। কিন্তু ঐ সকল দর্শন শাস্ত্রে যে শেষ কথা বলা হইয়াছে, আর কিছুই বলিবার, বুঝিবার বা জানিবার নাই, এরূপ যাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের সংখ্যা বোধহয় বেশী নহে।.........কিন্তু এক্ষণে আমাদের মধ্যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোন কালে চলিত ভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু চলিত ভাষা না হইলেও, ইহা দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর ভাষা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে ফল এই হইত, যে আলোচনা, বিচার, অনুশীলনের অনেক সুবিধা হইত। এক্ষণে সে সুবিধার একান্ত অভাব। দর্শনশাস্ত্র পঠন পাঠন একান্ত পরিমিত। কয়জনেই বা পড়েন, কয়জনই বা আলোচনা করেন? নবদ্বীপের অবস্থা সে দিন দেখিয়া আসিয়াছি। যে নবদ্বীপ টোলের ছাত্রদিগের বাদ-বিতণ্ডায় এক সময়ে কোলাহলময় ছিল, এখন সেখানে দুই চারিটি দশটি ছাত্র দেখা যায়। টোলের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে, পণ্ডিতও বিরল। এইরূপ সর্ব্বত্র। সুতরাং আলোচনার অভাবে, প্রয়োগের অভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যাহারা ইংরাজীতে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি, তাহারা বিদেশীয় ভাষার পেষণে মৌলিকতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। স্বাধীন চিন্তা, মৌলিকতা, নব-তথ্যাবিষ্কারিণী প্রতিভা মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে। মাতৃভাষার সাহায্যে যেমন বস্তুজ্ঞান হয়, বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ হয়, ভিন্ন ভাষায় তাহা হয় না। জানি না, সংস্কৃত ভাষা তাহার পুরাতন বিভব ফিরিয়া পাইবে কি না। সে সম্ভাবনা যে আর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যদি সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমেয়। যদি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শিক্ষার পুনরভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হয়, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষার আশ্রয়—অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি।"

সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার পুনরভ্যুদয় আমরা সত্যই অসম্ভব বা সুদূরপরাহত মনে করি না। ভারতীয় স্বরাজসাধনা যদি সত্যই অন্তর্ম্মুখী ও আত্মনিষ্ঠ হয় এবং তাহা না হইলে যদি স্বরাজ-সাধনাই ব্যর্থ হয়, তবে ইষ্টলাভের অনিবার্য্য নির্দ্দেশেই যুগের স্রোতঃ আবার ফিরিবেই। যাঁহারা দরদী তাঁহারা আমাদের কথা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। বাংলার তরুণ তরুণী মাতৃভাষাচর্চ্চার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য মন্থন পূর্ব্বক অমৃতোদ্ধারেই যত্ন প্রকাশ করুন, ইহাই আমাদের আকুল নিবেদন।

সমালোচনা

—:০:—

রামায়ণ—আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত গৌড়ীয় পাঠ সম্বলিত। সম্পাদক শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর। এই রামায়ণখানি বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ্। তাই বাঙ্গালীর নিকট ইহা পরম আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। টীকা প্রাঞ্জল এবং সরল বঙ্গানুবাদটীও বাস্তবিকই মনোহর হইয়াছে। খণ্ডে খণ্ডে ইহা সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য হয়, এই কারণে ইহার মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে। মাসিক ১৲ (ভিঃ পিঃ তে ১৶০) মূল্যে এক এক খণ্ড প্রাপ্তব্য। বাংলার গৌরব কৃত্তিবাস ঠাকুর যে মহাগ্রন্থ হইতে তাঁহার অমরকাব্যের রসোপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীকে অমৃত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৌলিক পাঠের রসাস্বাদন এই গৌড়ীয় সংস্করণের রামায়ণ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে না। তাই বহুমূল্য রত্নসমুদ্র সদৃশ এই মহাকাব্য যথাযোগ্য পরিশ্রম ও যত্নসহকারে প্রকাশ করিয়া সম্পাদকদ্বয় বাঙ্গালীর যথার্থ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বধূবরণ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। বাংলার কথা-সাহিত্যে শৈলজাবাবু অজস্র মধুবৃষ্টি করিয়াছেন। "বধূবরণে" তাঁহার সেই রস-শিল্প অক্ষুন্ন আছে। বইখানি ছয়টী গল্পের সমষ্টি। "বধূবরণ" "অতিথরন্তী না পায় ঘর" প্রভৃতি গল্পগুলি বিষাদ-মধুর, প্রায় সবগুলিই বিয়োগান্ত—পাড়ি জমাইবার আগেই হঠাৎ পাঠকের চিত্ত আস্বাদনের কূল হারাইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। ইহাই নাকি ছোট গল্পের আর্ট—শৈলজাবাবুর লেখা এই রচনাশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—মহাত্মা গান্ধী লিখিত। অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মহাত্মার জীবন-সাধনা আজ বিশ্বের চিন্তা ও অধ্যয়নের সামগ্রী। সতীশবাবুর চিরপ্রাঞ্জল মনোমুগ্ধকারী ভাষা ও মর্ম্মানুবাদ মৌলিক রচনারই ন্যায় উপাদেয়, উপভোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহারই যুগান্তরকারী মহালীলা। তাই এ যুগের সাধক সাধিকা, কর্ম্মী ও ভাবুক মাত্রেই লোকোত্তর মহাপুরুষের এই জীবন-গঠনের খণ্ডচিত্র অনুধ্যান করিয়া নিবিড় শিক্ষা ও রসানুভূতি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যুগের বাণী যদি সত্যাগ্রহ হয়, তবে সে বাণীর প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন করিতে এই গ্রন্থপাঠে প্রচুর সহায়তা মিলিবে, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। বইখানি সর্ব্বজনসমাদৃত হউক, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রাপ্তিস্বীকার

অদ্বৈতসিদ্ধি—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। মূল্য ৫৲ টাকা। গৃহস্থের সাধনা—ডাঃ শ্রীচণ্ডীচরণ পাল সঙ্কলিত। মূল্য ৮০ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা (পদ্য) ॥০ পশুপতি সরকার প্রণীত, মূল্য।৵০ মাত্র। শ্রীশ্রীচণ্ডী (পদ্য) শ্রীপশুপতি সরকার প্রণীত, মূল্য ॥৴০ মাত্র।



[আশ্রমী লিখিত]

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বোধানন্দ উত্তর-বঙ্গের কয়েকটী স্থান ভ্রমণ করিয়া অম্বুবাচীর সময় বাঙ্গালীর শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। স্বামী অভয়ানন্দের আশ্রমে তিনি অবস্থান করেন। অকস্মাৎ ২৪সে জুন সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে পুলিশে ধৃত করে এবং ১২১ (ক) ধারায় গৌহাটী চালান দেয়। সে দিন একাদশী; এইজন্য স্বামী বোধানন্দ উপবাসী ও মৌন ছিলেন। এক রাত্রি গৌহাটী হাজতবাসের পর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাকে হাজির করিলে, স্বামী বোধানন্দ আত্মপরিচয় প্রদান করেন; কিন্তু সবজান্তা পুলিশ তাঁহাকে সাংঘাতিক বিপ্লবপন্থী বলিয়া স্থির করায় তাঁহাকে গৌহাটীর জেলে বন্দী রাখা হয়। স্বামী বোধানন্দ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যখন তিনি সর্ব্ববিষয়ে নিরপরাধী, তখন আদালতের বিচারে শীঘ্রই মুক্তি পাইবেন; কিন্তু ১১ই, ১৯শে এবং ২২শে জুলাই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাকে হাজির করা হইলেও কোন প্রতিকার না হওয়ায়, তিনি এই বিষয় চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে জ্ঞাত করেন। স্বামিজীর পরিচয়পত্র যথারীতি পাঠান হইয়াছিল। চন্দননগরের এড্মিনিষ্ট্রেটার বাহাদুর পরিচয় দিতে গিয়া এই কথা লিখিয়াছিলেন—"I had several occasions to visit Mr. Moti Lal Roy's Ashram known as Prabartak Samgha and my impression is that it is a cultural institution having a scope for religion as well as industrial training to youth.

"So for I have known there is nothing against Tajendra Lal Dhar (Bodhananda) or his party who seems to be travelling for pilgrimage in some holy places of the Hindus at present."

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা সত্ত্বেও গৌহাটীর পুলিশ বাহাদুরেরা তাঁহাকে বিপ্লবী প্রমাণ করার সঙ্কল্প ছাড়েন নাই। ১১ই আগষ্ট ইহা সপ্রমাণ করিতে চাওয়ায় তাঁহাকে জেলেই আটক রাখা হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় আসামের শাসনকর্ত্তাকে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সাক্ষরিত পত্রসহ স্বামীজীর মুক্তির দাবী জানাইয়া, স্বয়ং গৌহাটী যাত্রা করেন। সুখের বিষয়, তিনি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুযোগ জানাইবামাত্র, তিনি ১০ই আগষ্ট তারিখেই স্বামীজীকে মুক্তিদান করেন এবং শ্রীযুক্ত রায়কে এতখানি কষ্ট স্বীকার করিতে হইল বলিয়া পত্রযোগে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু দেশের এই অবস্থায় এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক বলিয়া স্বামীজীকে শীঘ্র আসাম হইতে বাঙ্গলায় লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় স্বামীজীকে কারামুক্ত করিয়া চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সদয় ব্যবহার উল্লেখ-যোগ্য। তিনি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের প্রতি শুধু সদ্ব্যবহার করেন নাই, বন্দী বোধানন্দের কারাক্লেশের মাত্রা অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া-ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র প্রদেশ-ভেদে অস্বতন্ত্র; কেবল সংশয়বশে একজন নির্দ্দোষীকে দীর্ঘ দেড়মাস-কাল বন্দী রাখার জন্য দায়ী কে? আমরা আশা করি, এই বিষয় লইয়া জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রোহিনী নন্দন চৌধুরী, এম্, এল্, সি, আসাম কাউন্সিলে প্রশ্ন তুলিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইহার সদুত্তর পাইব। আমাদের উকিল রোহিনী বাবুর সাহায্যের জন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

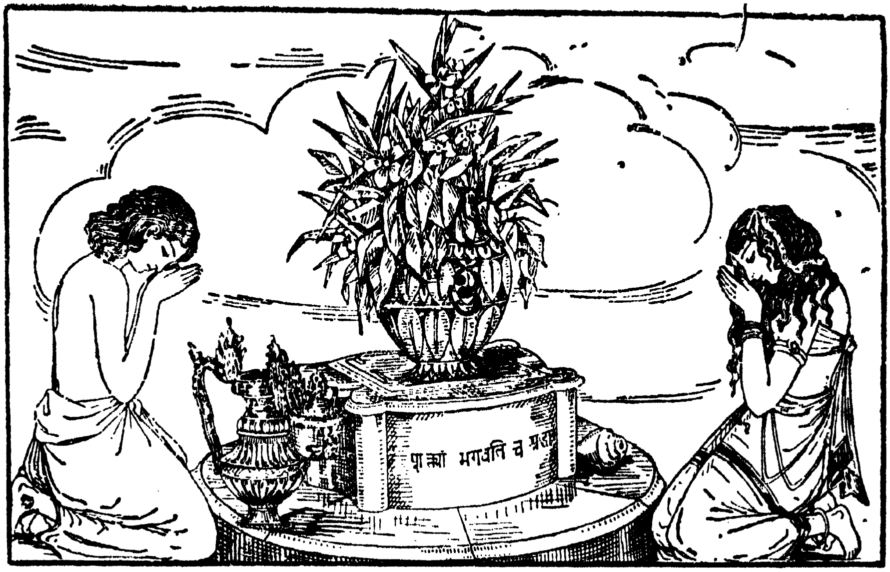
প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্,
৬৬ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



সন্তান

শিল্পী—শ্রীহেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



১৬শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রবর্ত্তক

আশ্বিন,
১৩৩৮

জাতির কথা

—:০:—

জাতি-সাধনার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, জাতি থাকিলে তবেই দেশের কথা—প্রাণ থাকিলে যেমন দেহ; জাতি নাই, আমাদের দেশও নাই। আমরা জাতি আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; কিন্তু থাকিলেও তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; না থাকিলে, যে জাতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তাহার অন্তর্গত হইতে হইবে, অথবা আমাদের স্বতন্ত্র জাতি-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, আমাদের জাতি আছে এবং এই ধারণার মূলে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবেই; আমরাও যদি তাহা উপেক্ষা করি, ছাই-ঢাকা আগুনের মত উহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবেই। যাহা আছে তাহা থাকিবেই, যদি সত্যের বীর্য্যে এই জাতি-বস্তু গড়িয়া উঠিয়া থাকে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মত, তুর্ক, আফগান, চীন, জাপানের মত ভারতেও একটা জাতি আছে—

এইরূপ ধারণা যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলে সেই জাতিটার সন্ধান সর্ব্বাগ্রে শ্রেয়ঃ ; কেন না, জাতিটা যদি না দাঁড়ায়, স্বাধীনতার জয়মুকুট কাহার মাথায় শোভা পাইবে ?

এক্ষণে, জাতি বলিতে আমাদের বর্ত্তমান ধারণায় বিষয়টা যে ভাবে আছে, তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাক্। জাতি বলিতে আমরা ভারতের অধিবাসিবৃন্দকেই বুঝি—হিন্দু, মুসলমান, পারসিক, শিখ, এমন কি ভারতীয় খ্রীষ্টানজাতিকেও আর বাদ দিতে পারি না। ইহার উপর আবার এক উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, অস্পৃশ্যজাতি। সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে—শতকরা কুড়ি জন, অথবা হিন্দু সংখ্যার তুলনায় শতকরা ত্রিশ জন হইবে। নূতন রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার পরামর্শসভায় ইহাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; এইহেতু ভারতের জাতি বলিতে ইহাদের স্থান আর অস্বীকার করিবার বিষয় নহে।

জাতি বলিতে যে অখণ্ড চেতনা ও স্বার্থের উপর ইহার অবস্থিতি নির্ভর করে, ভারতের অধিবাসিবৃন্দের ভিতর তাহা নাই। মহাত্মা গান্ধী অখণ্ড জাতিচেতনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যতই উচ্চকণ্ঠে বলুন—আমি হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি জাতির কল্যাণকামনায় দাঁড়াইয়াছি—একদিকে শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ, অন্যদিকে স্ব-স্ব-প্রধান ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া ইহা অস্বীকার করিবে এবং বস্তুতঃ এইরূপই দাঁড়াইয়াছে; এই অবস্থায় জাতি আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। জাতিসমস্যা খুব জটিল ; ইহার সমাধান চাই—উপেক্ষা করিয়া চলা যে আর সমীচিন নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমরা বার বার বলিয়াছি—স্বাধীনতার আন্দোলন অপেক্ষা জাতিগঠনের বা জাতি-উদ্ধারের আন্দোলন অধিক প্রয়োজন জাতি নাই, দেশ থাকিয়া লাভ কি ?

বিষয়টা অন্যদিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখা যাউক। ভারতের আকৃতিগত পরিমাপ ইংলণ্ডের কুড়িগুণ হইবে ; কিন্তু ইংলণ্ডে জাতিগঠনযজ্ঞ সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা কেবল নিজের দেশেই পরবাসী হইয়া থাকে নাই তাহা নহে, পরন্তু দিগ্বিজয়ীবেশে ভারতের উপর অটুট কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে। নিখিল ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় পরিমাপে ও লোকসংখ্যায় তুল্য এখনও তথাকথিত কয়েকটী স্বাধীন রাজ্য আছে—যেমন কাশ্মীর, হাইদ্রাবাদ। ইংলণ্ডের ন্যায় এই সকল স্থানেও যদি জাতি বলিয়া বস্তুটা প্রতিষ্ঠা পাইত, তাহা হইলে ব্রিটীশরাজকে ভারতের সম্রাট্-রূপে হয় তো দেখা যাইত না ; ভারতের অন্তর্গত জাতি-প্রতিষ্ঠ কাশ্মীর অথবা হায়দ্রাবাদের ন্যায় কোন একটী রাজ্যেরই ইহা অধীন হইত। কে না জানে, ভারত রুশ ছাড়া সমগ্র ইউরোপের তুলনায় ছোট নহে ! এই একটা বিপুল দেশ লইয়া জাতিসৃষ্টির সুবিধা না হইলেও, ফ্রান্স. জর্ম্মনী, ইংলণ্ড, জাপানের মত ভারতের যে কোন স্থানে জাতি-শক্তি জাগিয়া উঠিলে ভারতবাসী আজ একান্ত বিজাতীয় আদর্শ ও সভ্যতার আক্রমণে এমন করিয়া হয় তো বিপন্ন হইত না। এরূপ হওয়া যে আদৌ অসম্ভব ছিল না, তাহা পাঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুত্থান; মহারাষ্ট্রে একটা ক্ষাত্রজাতির উৎপত্তির ইতিহাস হইতে জানিতে পারি ; কিন্তু ইহাদের ললাটে ভাগ্যবিধাতা সে বিজয়াশীর্ব্বাদের রাজটীকা আঁকিয়া দেন নাই। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া তাহাদের শক্তি এমনই নিঃশেষ হইল, বৈদেশিক জাতির আক্রমণ সহিয়া তাহারা বিজয়ীবেশে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। ইহার কারণ দেখাইবার

যুক্তি অনেক আছে; ইংরাজ প্রতিহত হইয়া ফিরিলেও তাহারও যুক্তি আবিষ্কার অনায়াসেই করা যাইত। আসলে, ভারতে এইরূপ অসাধারণ শক্তি লইয়া জাতিগঠনের প্রেরণা জাগে নাই। হাজার হাজার যোজন দূর হইতে চারি কোটী ইংরাজ জাতিসংহতির বলে বিশাল ভারতবর্ষ অধিকার করিল! ভারতের যে কোন প্রদেশে এইরূপ কয়েক কোটী মানুষ যদি জাতিবীর্য্যের পরিচয় পাইত, তাহার পক্ষেও এই যশঃগৌরবের বিজয়মাল্যলাভ অসম্ভব ছিল না—তাহা হয় নাই, ইহার কারণ অনেক আছে, যুক্তিরও অভাব নাই; সে সকল প্রসঙ্গ এখন থাক্—আমরা এইক্ষেত্রে কেবল দিগ্‌দর্শনের জন্যই এইরূপ কথার উল্লেখ করিতেছি।

ইউরোপে ধর্ম্মভেদ ঘুচিয়াছিল—অনেকটা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে; কিন্তু অভেদধর্ম্ম হইলেও জাতিস্বাতন্ত্র্য তাহাদের ঘুচে নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জর্ম্মনী নিজ নিজ কোঠায় দাঁড়াইয়া স্ব স্ব দেশে স্বাধীনতার আস্বাদে অমর হইয়াছে। তাহারা কেমন করিয়া সংহতিবদ্ধ হইল, তাহা ইতিহাসপাঠকদের আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম ব্যতীত প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু মূলগত চরিত্রের পার্থক্য আছেই। কুলাচার বলিলে যদি জিনিষটা একেবারে পুরাতন ভাব আসিয়া অর্ব্বাচীনযুগের পাঠকদিগকে বিচলিত করে, এইজন্য বলিব—একটা বিশিষ্ট 'কাল্‌চার' জাতিগঠনের মূলে থাকে, এবং সেই 'কাল্‌চার'টায় জাতি যখন পরিপূর্ণ শক্তি অনুভব করে, তখন তার প্রেরণা বিশ্বজয়ী হইতে চাহে। ইউরোপেও এইজন্য একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। জর্ম্মনীর উত্থানে ও পতনের মূলে এই প্রেরণাই ছিল; এখনও বিশিষ্ট আচার ও আদর্শের স্বপ্ন লইয়া ইউরোপে জাতিস্বাতন্ত্র্যের এইরূপ প্রেরণা লীলায়িত হইতেছে—বিশেষ করিয়া রুশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই কথার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতেও তো এই একই মূলনীতি জাতিসৃষ্টির মূলে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে; জাতি বলিতে আমরাও একটা 'কাল্‌চারের' প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলাম। আমরা উপস্থিত এই বিষয়টার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব; কেন না, জাতিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, এই বিষয়গুলি একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের দেশেও যুগে যুগে খণ্ড খণ্ড স্থানে বিভিন্ন জাতিকে মাথা তুলিতে দেখি; ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যের ন্যায় এদেশেও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার জাতি বলিতে আমরা চাতুর্ব্বর্ণ্যও বুঝিতাম, কিন্তু এই চাতুর্ব্বর্ণ্যকে একজাতি বলিয়া বোধহয় উপলব্ধি করিতে পারি নাই; তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নহে; বৈশ্যজাতিরও রাজ্য ছিল, শূদ্র রাজার কথাও শুনা যায়। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধরাজগণের ভারতশাসন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা। পালবংশ, গুপ্তবংশ—এই সকলই বিশিষ্ট বর্ণসংহতির লক্ষণ ও ভারতের উপর শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ত্রুটি ধরিয়া আমাদের অবনতির কারণ নির্ণয় করি। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে কি দেখিলাম! জাতিবৃন্দ দলভেদে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিল; এই সুযোগে অন্য কোন শক্তিশালী জাতি ইউরোপের উপর যদি ঝাঁপাইয়া পড়িত,

ভারতের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, ইউরোপেও তাহার অন্যথা হইত না। কিন্তু জগৎটা এক্ষণে অন্য আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, শক্তির হিসাব করিতে শিখিয়াছে; কতখানি সামর্থ্য সঞ্চয় করিলে কি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে। —আমাদের মহারাষ্ট্রজাতি, শিখজাতি, রাজপুতজাতি, বাংলার বারভূঁইয়া সে হিসাব তখন করেন নাই; কাজেই ভারতের রাজ্য লইয়া পরস্পরের দ্বন্দ্বে বিদেশী সুযোগ পাইয়াছে, ভারতের রাজশক্তি হতবল হইয়াছে। এই সকল ঐতিহাসিক-তত্ত্ব বিশ্লেষণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা উপস্থিত জাতিনির্ম্মাণের অথবা জাতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, কর্ত্তব্যের দিক্‌টাই খোলসা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রান্দোলন হইতে নির্ম্মাণের কাজটাকে আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইয়াছে, এবং ইহা যে আর স্বপ্ন নহে, খেয়াল নহে, তাহা অনেকেই বুঝিবেন। কংগ্রেসকে জাতির জন্মক্ষেত্ররূপে দেখিলে, কংগ্রেসের সহিত আমাদের কোনই পার্থক্য নাই; কিন্তু কংগ্রেস যদি জাতি-আখ্যা গ্রহণ করে, আমরা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিব। জাতি আমরা গড়িতে চলিয়াছি, বা জাতির সন্ধানে আমরা বাহির হইয়াছি; বিষয়টা সিদ্ধ না হইলে তাহাকে জাতি আখ্যা দেওয়া যায় না। অতঃপর আমরা জাতি বলিতে কি বুঝি, সেই ভিতরের কথাটা উত্থাপন করিব, তারপর তাহার বর্জ্জন ও শোধনের যদি প্রয়োজন থাকে, তাহাতে কুণ্ঠা করিব না।

জাতি শুধু কথা নহে, গ্রন্থবদ্ধ ভাষা নহে—একটা সাবয়ব মানুষের মত তারও অবিভাজ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, একটা আকার আছে। যে আকার পাইলে মানুষ—মানুষ, জাতির ও তদ্রূপ বিশিষ্ট রূপ আছে, যাহা দেখিলে তাহাকে জাতি বলিয়া চিনিয়া লওয়ায় ভ্রম হয় না। কেবল আকৃতিগত লক্ষণ লইয়া জাতি নহে, জাতির সংজ্ঞা নিরূপণে শাস্ত্রকার বলেন, "লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্"—উহা লিঙ্গত্রয়-বিশিষ্ট না হয়; অর্থাৎ কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, এই উভয় লিঙ্গভাজী হওয়া চাই; জাতি বলিতে তাই নারী-পুরুষের সংহতি। কেবল পুরুষ লইয়া জাতি হয় না, কেবল নারীও জাতি নয়; ইহা সংজ্ঞা-সূত্রের পূরণ মাত্র, তার্কিকের মুখবন্ধ করার বিধান। আসল কথা, জাতির গোত্র লইয়া।

এইখানেই সামান্য ও বিশেষের ব্যবধান। গোত্র অর্থে—"গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্।" কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলে চলিবে না। ইস্রায়েলের বংশধরগণের গর্ব্বকাহিনী আমরা পাঠ করিয়াছি; সকল দেশেই বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধ আদিপুরুষের মহিমার উপরই জাতি প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এই মহিমাবোধই জাতির পরম ভিত্তি। যে জাতির মূলে মহিমার লোপ হয়, সে জাতি আর দাঁড়াইয়া থাকে না, ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হয়। মহিমাই জাতির ঐশ্বর্য্য; এই মহিমার গর্ভেই মহত্ত্বের উৎপত্তি। ভারত এই মহিমাবোধ কোথায় ছাড়িল, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হয়। পাশ্চাত্যের কুহকে সম্মোহনে ভারত ইহা ভুলিয়াছে; ইহা তো অধঃপতনের পরের কথা—আদৌ আমাদের পতনের কারণ কি, আমাদের প্রকৃতির মূলে যদি এই মহিমাবোধের অমরবীর্য্য থাকে, তাহা ভুলিব কেমন করিয়া? আত্মপ্রকৃতিই যে বিপথে পা বাড়াইলে বাধা দিবে! আত্মার ন্যায় প্রকৃতিও যে নিত্য, অমর শাশ্বত বস্তু। ভারত যদি স্বাধীন হয়, তবে এই অচেতন দেশটা তো স্বাধীন হইবে না, ভারতের

মানুষই স্বাধীন হইবে সে মানুষের গোত্র ও পরিচয় যদি হারাইয়া যায়, অবশ্য নূতন গোত্রগত তাহাকে হইতে হইবে; কিন্তু পূর্ব্ববৈশিষ্ট্য কি তাহাতে বজায় থাকিবে! অনেকে বলেন না-ই বা থাকিল, স্বাধীনতা হীনতা অপেক্ষা উহা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমাদের কথাটা আরও গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে। মুক্তির মাকাল ফল দেখিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেই যে আমরা সার্থক হইব, এমন কোন কথা নাই; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে কংগ্রেসের মধ্যে আজ যে আত্মকলহের ঘূর্ণাবর্ত্ত, আমাদের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই তাহা আবর্ত্তিত হইয়া আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে, যদি গোড়ার গলদ দূর করিয়া না আগাইতে পারি।

জাতি-সংজ্ঞার এই যে এতখানি বিচার, তাহার মূলে একটা অমূল্য প্রতিভার পরিচয় আছে—ইহাতে আশঙ্কা করিলে চলিবে না। যদি এই সংজ্ঞার অনুগত জীবন হইলে জাতির শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মন্ত্রকে আমরা উপেক্ষা করিব কেন! যতক্ষণ ছিন্ন শৈবালের মত আমরা উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই, ততক্ষণ কোন ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না; জীবনের স্থায়ী বস্তুতন্ত্র ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে হইলে আমাদের একটা শক্ত পরিমিত বিধানের অন্তর্গত হইতে হইবে বৈ কি! অতীত যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহার জন্য মূলতঃ এই ব্যবস্থাই দায়ী কি না, তাহা ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে। জাতি, গোত্র গোলক-ধাঁধা বলিয়া, যে অগ্রগামী রাষ্ট্র-সংহতি ইহা হইতে অব্যাহতি লইতে চাহে, তাহাকেও তো আজ স্বতন্ত্র জাতিবোধের আঘাতে নিরাশ হইতে হয়! মহাত্মা ভারতের তুঙ্গশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া যতই চীৎকার করিয়া বলেন, আমি নিখিল ভারতের মর্ম্মবাণী বহন করিব—হিন্দু না হয় নীরব হইয়াই থাকিবে, কিন্তু মুসলমান, শিখ, পারসিক, ভারতের খ্রীষ্টান, অস্পৃশ্যজাতি ব্যঙ্গচ্ছলেই তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবে—আমাদেরও কণ্ঠ আছে, আমাদেরও বহিবার শক্তি আছে; দয়া করিয়া এই ভারবহনের অধিকারটুকু ছাড়িয়া দাও। তাহার কারণ তো আর অন্য কিছু নয়—বিশিষ্ট জাতিমহিমা যে আমাদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিয়াছে। গোত্র, প্রবর, পুরোহিত যে হিন্দুরই আছে তাহা নহে; অন্য আখ্যায় সর্ব্বজাতির মূলেই স্ব স্ব আদিপুরুষের শক্তি ও বীর্য্য বর্ত্তমান। মানুষ স্বভাব-শক্তির বশেই তাই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে না, অন্যকে প্রতিভূ বলিয়া মানিয়া লইতেও চাহে না। ভারতে আজ এই লাঞ্ছনার চিত্র রেখায় রেখায় আঁকিয়া উঠিয়াছে। মানুষ বলে, পূর্ব্বে তো এরূপ ছিল না! আমরা বলি—ইতিহাস ভুলিলে চলিবে কেন? বিশিষ্ট বিশিষ্ট শক্তি বা সংহতির আত্মমহিমার অন্তরায়স্বরূপ যেখানে যাহা বাধা হইয়াছে, সে বাধা অন্যের মহিমাস্তম্ভ হইলেও তাহা ধরাশায়ী হইয়াছে। দুর্গমগিরিসমাকুল আসামের দেব-মন্দিরের গগনচুম্বী প্রস্তরমন্দিরগুলিও এই কারণেই বাদ যায় নাই, মাথা নত করিয়াছে; দেবমন্দিরের প্রস্তরখণ্ড পায়ের তলে পথের উপাদান হইয়াছে, ইহা যে স্বচক্ষে দেখিয়া বেড়াইতেছি। তাই বলিয়াছি, ছাই দিয়া আগুন ঢাকা থাকিবে না, জাতি-স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করিবেই—সে জাতি আমাদেরও আছে, তাহা না হইলে স্বাধীনতার মুকুট কোথায় শোভা পাইবে!

ভারতের জাতি এই গোত্র ও বংশের সীমায় যখন ঘনমূর্ত্তি ধরিল, তখনই ধরিত্রীর শ্রী দেখা দিল, তখনই মমতার স্বর্ণ-নিকেতন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ঐ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটীর শক্তি ও

ঐশ্বর্য্য, ঐ জড়ত্বের পরমাণুকণায় বীর্য্যের বিদ্যুৎ গৃহবাসীর প্রাণের সাড়া বলিয়াই তো! একটা দেশকেও পূর্ণ করে সম্পদে, গৌরবে, প্রতিভায়—দেশেরই অধিবাসী; তাই দেশ বলিলেই, তাহার অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। আর সেই অধিবাসীই সেই দেশের জাতিশক্তি, প্রাণশক্তি কি না, তাহার পরিচয় লইতে ইচ্ছা হয়। আজ নাটাল, ডার্ব্বানে বিদেশীর প্রতি এমন যে বিজাতীয় বিদ্বেষ, তাহার মূলে আছে জাতিমহিমার জয়। সে মহিমার সঙ্গে যে জাতি আপনাকে নিঃশেষে জড়াইয়া দিবে, তাহার বিপদ্ নাই। এইরূপ বহুজাতির আত্মদান লইয়াই তো জগতে বৃহৎ জাতির সৃষ্টি। ভারতে আজ একদিকে এখনও বিশ কোটীর অধিক হিন্দু; তাহাদের মর্ম্ম নিঙড়াইয়া দেখ, কত শক, হুন, যবনের রক্তবিন্দু এখনও গুমরিয়া মরিতেছে! আর এই যে হিন্দুস্থান ভারতে সাত কোটী মুসলমান—তার সবখানি কি জন্মগত অধিকার লইয়া মাথা তুলিয়াছে? না, তাহা নহে; এখানেও আত্মসাৎ করার ধর্ম্ম আছে। আমার মহিমার কোটায় তুমি যদি নিঃস্ব হইয়া মাথা নত কর, আত্মসমর্পণ কর, তোমায় আমার গোত্রেই দীক্ষা দিব। সে গোত্রের মূলে আছে আমার আদি মহিমার জাহ্নবীধারা। সে যে জীবনের চেয়ে মূল্যবান্, স্বর্গের চেয়ে পবিত্র; সে যে মুক্তি মোক্ষের অধিক দরদের বস্তু!

এইজন্য প্রশ্ন হয়, ভারত তবে কি নিজের কোট ছাড়িয়া মূলক্ষয় করিয়াছে? ভারতের হিন্দু আত্মমহিমা রক্ষা যেমন করিয়া রাখিতে হয়, তাহার কি কোথাও ত্রুটি করিয়াছে? সহজ উত্তর হইবে—তাহা না হইলে পতনের কারণ কি? আত্মমহিমার কথায় যদি এ জাতির হিয়ায় হিয়ায় দরদের শিহরণ উঠিত, তাহা হইলে জড়তায় আজ কণ্ঠ রুদ্ধ কেন? 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' যদি স্বভাব হইত, তবে স্বমহিমারক্ষায় প্রাণ দিতে দাঁড়াইলাম কৈ? আত্মগৌরব বলিতে তবে কি জাতির গৌরব অনুভব করি নাই! আজও তো জাতির জন্য, জাতির ধর্ম্ম ও আদর্শের জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ নই; কিন্তু রক্ত তো ঝুঁঝিয়া পড়ে—লক্ষ্যহীনের এই আত্মদান সৌভাগ্যের কারণ হয় না, নিছক আত্মহত্যাই হয়; বিদেশীর বাহুবল ও রাজ্যবলই ইহাতে বৃদ্ধি পায়।

গোত্রের উৎপত্তি জাতির আদিপুরুষের রক্তধারা ধরিয়া—তবে গোত্র-স্বাতন্ত্র্যে স্বজাতিভেদ করিলাম কেন? জাতির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্"—একই শাশ্বত বীর্য্য আমাদের আদি উৎপত্তির ক্ষেত্র। বৈচিত্র্য সেখানে এককে ঘিরিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু বিচিত্র যে বর্ণাশ্রম-চ্ছন্দ, তাহা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানের মত জাতি-স্বাতন্ত্র্য সৃজন করিল কেন? এ উত্তর আজ কে দিবে!

গুণভেদে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন যদি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ যে "চরণ", তাহা সমগ্র জাতিটার অধিকারভুক্ত হইত—সেইটাই তো আমাদের 'কাল্‌চার'। গুণভেদে কুলভেদ হওয়া তো শ্রেয়ঃ সাধন করে নাই; আজ হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান যদি ঈশ্বরবিধান হয়, তাহা হইলে ভারতীয় আচার ও আদর্শে আমাদের সবখানিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমরা তাই জাতি-বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিরক্ষার জন্যই আজ উদাত্ত কণ্ঠে বলিব—ভারত আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমি ভারতের জাতি। যেখানে আমরা সুযোগ সুবিধায়, বাধায় অন্তরায়ে কুণ্ঠিত হইয়াছি, সেইখানে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। জাতিসাধনার গঙ্গোত্রীধারা যেখানে রুদ্ধ

হইয়াছে, তাহা মুক্ত করিতে হইবে; মুক্তিব্রত সিদ্ধ করিবার জন্য, এই জাতিসাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আজ তাই আমরা দেখিতে চাই—অসংখ্য গোত্র, কুল, বংশধারা আশ্রয় করিয়া যে সহস্রধারা ভারত ভাসাইয়া গৌরবমুখরিত ছিল, তাহা পরস্পরের আত্মপরিচয় ক্ষুণ্ণ করিয়া যেখানে শুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানে সাম্য-সাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, আবার তাহাকে মুক্তি দিতে কাহারা যুগশঙ্খ হস্তে দেশের পুরোভাগে দাঁড়াইবেন! সেই নবসঞ্জীবিত জাতির মুখর কণ্ঠরোলে আবার ভারতের আকাশ বাতাস শব্দিত, ধ্বনিময় হইবে; আবার বীরেন্দ্রকেশরীর মত উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিব—আমরাও জাতি, আমাদেরও দেশ আছে; আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা মুক্তিব্রতী।

গোত্রভেদ, বর্ণভেদ যদি একত্বের অন্তরায় না হয়, তাহা হইলে ভারতে খ্রীষ্টানরাজ্য চিরস্থায়ী হইবে, অথবা আবার ইস্‌লামরাজ্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে—এই সকল ধ্বনির মাঝে আর একটা কণ্ঠ যদি বজ্রস্বরে বাজিয়া উঠে—ভারতে হিন্দুরাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির কারণ কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

আমরা কর্ম্মদোষে আত্মবিস্মৃতির কুহকে আচ্ছন্ন; আমাদের দেশ তাই বিদেশীর শাসনদণ্ড-তলে বিধাতারই ইচ্ছায়। যদি আমাদের সে অবসাদ দূর হয়, আমরা নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠি। কেবল আসক্তি ও মোহ বশতঃ অকারণ একটা জাতির স্কন্ধে অন্যজাতি চিরদিন ভর করিয়া ব'সিয়া থাকিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। এইজন্য, মুক্তিসাধনায় জাতির অভ্যুত্থানই আমরা কামনা করি। কথা বাড়াইয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। বাংলায় এমন প্রতিভাশালী নারীপুরুষ কি নাই, যাহারা দলে দলে এই জাতিসাধনায় যোগ দিবে!

'প্রদীপ আমার নিভে বারে বারে'

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী]

প্রদীপ আমার নিভে বারে বারে,
তোমার নয়নসলিলের ধারে,
　　কাটে না আঁধার ঘোর।
আলোক আলোক তারকার শিখা,
সে আদেশলিপি ললাটের লিখা
　　আজিও হয় নি মোর॥

হে প্রিয়া, আমার মোছ আঁখিজল,
মমবেদনায় ধুয়ে মর্ম্মতল,
　　উদার নয়নে চাও।
তরীর বাঁধন নিজে দাও খুলে
ভাসিয়া চলুক অপার অকূলে,
　　কেঁদে কেন গান গাও?

যায় যদি তরী দূর হতে দূরে,
তবু জেনো চির জীবনবধূরে
　　রেখেছি বুকের কাছে;
অযাচিতে যাহা ছিল সেইমত,
আজিও রয়েছে, র'বে অবিরত,
　　তনু মন যাহা যাচে॥



মানুষ ভগবানের নামে যত দেয় ততই সে গুণান্বিত আকারে বিশুদ্ধভাবে তা' ফিরে পায়। তাই দেওয়ায় কারও কুণ্ঠা নাই। কিন্তু ভাবনা ঐ ফিরে পাওয়ার। যে চতুর, আত্মজ্ঞানী, সে এইখানেই সতর্ক। ভাল মন্দ, সত্যমিথ্যা—সবই যে বোঝা। জীবন তো এই সকল বহিবার জন্য নয়। সে যে গঙ্গোত্রী-ধারার মত ভগবানের মহিমার প্রবাহ। সে বিশুদ্ধ ধারা যে দেশে, যে কালে প্রবাহিত হয়, সে দেশ ধন্য হয়, সে কালই কৃত-যুগ।

আজ এই উৎসর্গের মহাযজ্ঞে আপনার সব কিছু আহুতি দিয়ে, আশীর্ব্বাদরূপে আবার যা' ফিরে আসে, আমি তাই দিয়ে পূর্ণাহুতি দিই। হে নারায়ণ, আমায় মুক্তি দাও। তোমার দেওয়ার বোঝাও আমায় বইতে দিও না। আমায় মিলিয়ে লও তোমার মাঝে; এসো দুজনায় এক হয়ে যাই—ভেদের প্রাচীর তুলে আমায় বঞ্চিত কর না।

সে যে মধু। ধ্বনি—অমৃতলশীতল কণ্ঠের আহ্বান। ওগো মদনমোহন সুন্দর, ওগো সুধাসরোবর! আমি তোমার মাঝে অবগাহিত হয়ে যাই; আমায় আর জগতের চক্ষে তুলে ধ'র না।

তন্ময় করে' দাও। নিরবধি ভাবসমাধির অতল বারিধি-গর্ভে ডুব দিয়ে আমি তো রত্নসঞ্চয়ের সন্ধানে নামি নি—মরণের জন্যই ডুব দিয়েছি। আমায় আর ফিরিয়ে দিও না।

বস্তুকে আশ্রয় দেবে কে? বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করবে কে? বস্তুতে যার পরম রতি, বস্তুই যার চরম গতি, সে এই বস্তুর সহিত অভিন্ন। তার আর প্রতীক্ষা কেন? সাধনা কেন? সে তো বস্তু-স্বরূপ, স্পর্শমণি, আনন্দের আকর।

আশ্রয় দাও, আশ্রিতের সহিত এক হয়ে যাবে। মূলতঃ ভেদ নাই, ভাবনাও নাই। মায়া সত্য; ভেদও তাই নিত্য। মুক্তিও শাশ্বত। তুমি চাও কি? ভগবান কল্পতরু। তাঁর কিছু দিতেই বাধে না। সবই তিনি, সবই ঈশ্বর-বস্তু।

স্থান কালের ব্যবধান একেকে খণ্ড করে। দৃশ্যতঃ বিচিত্র বিভিন্ন; বস্তুতঃ সবই অখণ্ড, অদ্বয় তত্ত্ব। তাই ঐক্য সত্য। ভেদ ঐক্যেরই প্রকাশ। বাহ্যতঃ যাহা তাহাই তোমার সবখানি নয়—আমূল তুমি বিরাট্ অনন্ত। তাই তুমি আত্মস্থ মহাশিব। জড়ত্ব ও চৈতন্য স্বভাব-ভেদ মাত্র। গুণ রূপ, নির্গুণ সত্তা—তাই জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে অদ্বয় চৈতন্য অভিন্ন। তুরীয় চৈতন্যে ইহা অনুভূত। কিন্তু সে অনুভূতি অনির্ব্বচনীয়। ভাষা নীরব। নিষ্পন্দ, স্থির, কাণায় কাণায় শক্তি আপূর্য্যমান, তরঙ্গ-হিল্লোলের ফাঁকটুকুও নাই। প্রশান্ত নিথর সে আনন্দ, গভীর প্রগাঢ় শান্তি, সমাধি চরমেরই আস্বাদ দেয়। সবের শেষ, তাই আরম্ভের সূত্র এইখানেই।

তোমার পরিপূর্ণতা সৃষ্টির মূল। অন্তরে নিরেট শক্তির বীর্য্য, ভরাট্ শান্তি ও আনন্দের আকর, অফুরন্ত প্রকাশের উৎস। হে ঈশ্বর-চৈতন্য, তুমি উদ্বুদ্ধ হও, আত্মপ্রকাশ কর। হে অঘোর, আশ্রয়-আশ্রিতের রহস্যভেদ হোক।

* *
*

সাধক-বাণী

আমরা চাই জীবন। পূর্ণ, সুন্দর, মহৎ, উদার জীবন - যে জীবন সত্যের পবিত্র অখণ্ড মূর্ত্তি, শক্তি ও প্রেমের নিখুঁত অনবদ্য বিগ্রহ। মুক্ত আত্মার অনাবিল স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশই এই জীবনের স্বরূপ বা প্রকৃতি। জীবনকে এমনই স্বচ্ছ সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার একমাত্র উপায়—যোগ বা ইষ্টে আত্মসমর্পণ।

* * *

ইষ্ট কে? যিনি সতের মূর্ত্তি। জীবন দিয়াই এই সৎকে লাভ করিতে হয়। সৎ-অর্থে নিত্য-সিদ্ধ। জীবন যদি শুদ্ধ সিদ্ধ না হয়, কেমন করিয়া এ জীবনে নিত্য সত্যের প্রকাশ হইবে? সে জীবন বর্জ্জনীয়, যাহা দুষ্পূরণীয় আকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা-রূপে কামনার ভোগ্য আহরণেই নিয়োজিত হয়, সতের অভীষ্ট পূরণ করে না। কোন আকৃতি সতের, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? সেই জন্যই ইষ্টোপাসনা। যে ইষ্টের ধ্যানে জ্ঞানে তন্ময় হইতে পারে, তাহার হৃদয়ে আর দ্বিতীয় অভীষ্ট স্থান পাইতে পারে না। ইষ্টের ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা। ইষ্টনিষ্ঠাই প্রকৃত ইষ্টোপাসনা।

* * *

ইষ্টে স্থির যে, তারই জীবন কূলে কূলে আপূর্য্যমান হয়। স্থির-রতি—কামনার অটল বীর্য্য দান করে। এ কামনা—ইষ্টকামনা। অর্থাৎ যন্ত্রগত অভাব পূরণের আকুলতা নয়, পরন্তু আত্মারই বিদ্যুদ্বিলাস, অমিশ্র সত্তার বিশুদ্ধ আত্ম-প্রয়োজনের লীলা। যোগবুদ্ধি না হইলে যান্ত্রিক প্রয়োজন হইতে স্বতন্ত্র এই আত্ম-প্রয়োজন বোধগম্য হয় না। ইহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য। কাজেই বুদ্ধিযোগী বা অধ্যাত্মজ্ঞানী না হইলে, অনুভূতি-গোচর তত্ত্বকে ভাষায় বুঝান সম্ভব নহে। তবে সঙ্কেতের সাহায্যে সাধনরাজ্যের রহস্যোদ্ঘাটনের একটা চির প্রচলিত রীতি আছে। শিক্ষার্থী ও দীক্ষার্থীর জীবনে এ সঙ্কেতগুলির মূল্য বড় অল্প নহে।

* * *

বুদ্ধিযোগ—আত্মসমর্পণ-যোগেরই প্রথম ধাপ। বুদ্ধি বলিতে হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞান বুঝায় না। জ্ঞানযোগ বুদ্ধিযোগ হইতে স্বতন্ত্র। জ্ঞান অদ্বয় তত্ত্ব-বস্তু। জ্ঞানযোগ এই তত্ত্ববস্তুরই সাধনা। জ্ঞানীর লক্ষ্য মুক্তি। বুদ্ধিযোগী ঈশ্বরলীলার ক্রীড়াপুত্তলী-রূপে ইহ-জগতেই বিচরণ করিতে চাহেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া, তাঁহারই শক্তির তালে তালে উঠা বসা, চলা ফিরা করাই তাহার ধর্ম্ম। এই আত্মনিবেদনেরই প্রথম কেন্দ্র—বুদ্ধি। তাই গীতার আত্মসমর্পণযোগের প্রবর্ত্তক ও মহাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগের কথা সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া অতঃপর বুদ্ধিযোগের কথাই অবতারণা করিয়াছেন—

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥"

জীবন্মুক্তির প্রথম সোপান—বুদ্ধির যুক্তি। জ্ঞানযোগীর নির্ব্বাণ-লক্ষ্য হইতে ইহা একেবারে স্বতন্ত্র প্রস্থান।

বুদ্ধির যুক্তির জন্য চাই বুদ্ধির শুদ্ধি। কেমন করিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করা যায়? তাহার পূর্ব্বে, বুদ্ধি বলিতে বস্তুটিই বা ঠিক কোনটী? কি তার স্বরূপ, কি তার লক্ষণ ও ধর্ম্ম? গীতাকার স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয় দিয়াছেন। এই স্থিতপ্রজ্ঞা বুদ্ধিযোগের চরম ফল। ইহা এক প্রকার বুদ্ধির সমাধি—অবশ্য নিত্যে নহে, লীলায়; এই বিশেষত্বটুকু এক্ষেত্রে ভুলিলে চলিবে না।

* * *

বুদ্ধি চেতনার মস্তিষ্ককোষ বা চিন্তাযন্ত্র। কিন্তু এই চিন্তা আবল তাবল-চিন্তা নহে। আমাদের সঙ্কল্প বিকল্পের ক্ষেত্র হইতেছে মন; কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি নিশ্চয়াত্মিকা। অর্থাৎ ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র আজকাল "Intelligent Will" বলিতে যে চেতনবৃত্তির নির্দ্দেশ করে, তাহা কতক কতক বুদ্ধিবস্তুরই আভাস মাত্র। বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও অগ্র্যা না হইলে, চিদাত্মার নির্ম্মল অবভাস বা প্রত্যাদেশ গ্রহণে সমর্থ হয় না। এই জন্যই ইহা দর্পণ-স্বরূপ। দর্পণ নির্ম্মল হইলে, প্রতিবিম্ব অবিকৃত ও সুপরি-স্ফুট হয়। এই বুদ্ধিময় যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা অন্তরাত্মায় ঈশ্বরেচ্ছার যথার্থ মর্ম্ম ও ঈপ্সিত অবধারণ করিতে পারি। অব্যাভিচারী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—গীতায় যাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহাই মহাশক্তির অবতরণের প্রথম পাদপীঠ। তাই এই মৌলিক যন্ত্রকোষের শোধন ও সাধন সংসিদ্ধ হইলে, ভাগবত ইচ্ছার বিশুদ্ধ নাম ও রূপ অন্তরে ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রত্যাদেশ (Inspiration), প্রেরণা (Intuition) বা দর্শন (Vision)। এই দিব্য চিন্তাস্রোতের মুক্ত প্রণালী যখন অন্তরে আবিষ্কৃত হয়, তখন আর কর্ম্মের ধারানির্দ্দেশের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতে হয় না। জীবনের ব্রত—mission of life এইখানেই অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হয়। যে সাধক এই সঙ্কেত বুঝিয়াছে, সাধন-রাজ্যের প্রথম প্রবেশদ্বার তাহার নিকট অবারিতভাবে খুলিয়া গিয়াছে। এই বুদ্ধি-রূপ জ্যোতির্ম্ময় সিংহদ্বার দিয়াই অধ্যাত্মজীবনের অলৌকিক তত্ত্বরাজি অনুভূতির ক্ষেত্রে একে একে সমুদিত হয়। শেষে এই যোগসূত্র ধরিয়াই আমরা অনির্ব্বচনীয় মহাসত্যে উপনীত হইতে পারি। উহাই অদ্বয় ভূমিকা। জ্ঞানীর সমাধি ও বুদ্ধির সমাধি যখন একত্র যুক্তি পায়, তখন ঈশ্বরের বিচিত্র বিভূতিই সিদ্ধজীবনে আত্মপ্রকাশ করে।

* * *

"ময্যেব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়" —ইহাই গীতোক্ত আত্মসমর্পণযোগের সর্ব্বপ্রথম সূত্র। মনের সহিত বুদ্ধির নিবেদন করিতে হয়। সে বুদ্ধি কি?

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

বিষয়—পাঞ্চভৌতিক। ইহার মূল উপাদান—পঞ্চ তন্মাত্রা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটী মাত্রায় বা স্তরে সৃষ্টির যাবতীয় ভোগ্যবিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দবিধান করে। মাত্রাসমষ্টি—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ-রসাদি বিষয় আমরা গ্রহণ ও ব্যবহার করি। শব্দের সত্ত্বাংশে শ্রুতি বা কর্ণ ও রাজসাংশে বাগিন্দ্রিয়—ইহাই শ্রবণভোগের হেতু অর্থাৎ উপকরণ। আবার শব্দের তামস ভাগই স্পর্শ-তন্মাত্রায় পরিণত হয়। তদ্রূপ স্পর্শের সত্ত্বাংশে ত্বক্ ও রাজসাংশে পাণি; উহার তামসাংশ হইতেই রূপ-তন্মাত্রার অভ্যুদয়। রূপের সত্ত্বভাগ হইতে চক্ষুঃ ও রজোভাগ হইতে পাদ; উহার তামসাংশই রস-মাত্রায় পরিণতি

লাভ করে। রসের সঙ্গে রসনা ও রজোভাগে উপস্থ—ইহার তামসভাগ সেইরূপ গন্ধ-তন্মাত্রায় বিবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে, এই ভাবেই গন্ধের সত্ত্বাংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসা ও রাজসাংশে কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়রাজ্যের বিবরণ সম্পূর্ণ করে। এই মৌলিক তন্মাত্রা অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভূত পঞ্চীকরণ বিধি অনুসারে সুনির্দ্দিষ্ট ও বহুবিচিত্র হইয়া পাঞ্চভৌতিক জগৎপ্রপঞ্চ বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। মনই এই বিষয়গ্রহণের মূল কেন্দ্র। মন হইতে নিশ্চয়বুদ্ধি স্বতন্ত্র।

বুদ্ধিযোগে—এই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের দায় এড়াইয়া, মনকে বুদ্ধির অনুগত করার সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। মাত্রা-স্পর্শে সমবুদ্ধি থাকাই প্রথম অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ মনোজয় সম্ভব নহে। কেন না, বুদ্ধিও প্রাকৃতিক কেন্দ্র—প্রকৃতির এক গুণকে ভিন্ন গুণ দ্বারা অভিভূত করা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ জয় ও রূপান্তরিত করা যায় না। এইজন্য চাই বুদ্ধিশক্তির চেয়ে মহত্তর ও মৌলিক শক্তির আশ্রয়। সেই শক্তিই ভাগবত ইচ্ছা। মস্তিষ্কোর্দ্ধ সহস্রদল কেন্দ্রে এই ইচ্ছাময় ভাগবত পুরুষের অধিষ্ঠান। তিনিই ঈক্ষণে স্ব-প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন। সেই প্রকৃতি অঘটনঘটনপটীয়সী, অলৌকিক শক্তিময়ী ও সর্ব্ব-কর্ম্মের কর্ত্রী। ইনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী মহাশক্তি। ভগবান জীবাধারে অবস্থান পূর্ব্বক এই মহাশক্তির সহায়ে যোগ ও যাবতীয় জীবনলীলা নির্ব্বাহ করেন। ভগবানের জাগরণই যোগ। তাঁহার সুপ্তিভঙ্গে জী‌ভাবের শুদ্ধি ও জীব-প্রকৃতির রূপান্তরের সূচনা।

"এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা"—সেই উর্দ্ধস্থিতা পরাশক্তি বা চিন্ময়ী আত্মশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই প্রাকৃত বুদ্ধির স্তম্ভন করিতে হয়। ইহাকে ইংরাজীতে "Passivity" বলে। স্থির নিশ্চল বুদ্ধিপটে বিশুদ্ধ যোগশক্তির অভ্যুদয় হয়। সেই যোগশক্তিই মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়কে ছন্দিত ও পরস্পর শৃঙ্খলাপূর্ণ করিয়া তুলে।

জাতি-রক্ষার আহ্বান

আজও বাঙ্গালীর অন্তরের ব্যথা প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া গুমরিয়া মরে; বাংলাদেশ অশ্রুময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কেন এমন হইল!

বাঙ্গালী যাহা ভাবে তাহা করে না—করিতে জানে না। সে নিজের কাছেই অপরাধী হইয়া মাথা নীচু করিয়া থাকে; মেরুদণ্ড সোজা হয় না, কণ্ঠে শিবের বিষাণ বাজে না, চক্ষে দীপ্তি নাই; বাঙ্গালীর ম্লানমূর্ত্তি মানুষের আজ করুণা উদ্রেক করে। আবার জিজ্ঞাসা করি—কেন এমন হইল!

গলার জোরে আশার গান গাহিয়া লাভ কি? আশা কথা নহে; প্রাণ। সেই প্রাণ আজ

কোথায়! যে আগুন ছত্রভঙ্গ হয়, তাহার প্রতি কণায় অনেক বস্তু পুড়াইয়া ছাই করে; তাহা কি ছন্দবদ্ধ সঙ্গীতের তালে পুণ্য হোমশিখার মত, সংহতিবদ্ধ স্বজনের শক্তি! বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত প্রাণশক্তির দীপ্তি দেখিয়া উত্তেজিত হইও না—ইহা মরণের লক্ষণ। একটা জাতির অবশিষ্ট প্রাণশক্তি চতুর্দিকে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হয়; এখনও যদি ইহা শৃঙ্খলিত সুনিয়মবদ্ধ করা যায়, আমরা রক্ষা পাইতে পারি

বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা বাঙ্গালী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। বাংলার এই ধ্বংসস্তূপে যে রুদ্র ডমরু বাজাইয়া বাজাইয়া গান করে, যার তাণ্ডবনৃত্যে প্রলয়াগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে আজ শান্ত শিব সুন্দর বেশে সাজাইবে কে? স্থির করিবে কে? শান্তি ও আনন্দের নির্ঝর ঝরাইয়া কে তার চরণতল ধৌত করিবে? কে স্থিরাসনে বসাইয়া অন্নপূর্ণার মন্দির গড়িয়া তুলিবে? আজ কণ্ঠে কণ্ঠে হুঙ্কারধ্বনি সৃজনের নয়, ধ্বংসের—সে ভৈরবনিনাদ স্তব্ধ করিয়া, মহিম্নস্তোত্রে কে আজ বাংলার গগন পবন মুখরিত করিবে? সে সিদ্ধ শৈব, তন্ত্রসিদ্ধ মহাভৈরববৃন্দ কোথায়! শিবের শ্মশানবাস ঘুচাইয়া কে তাঁকে কৈলাসবাসী করিবে! সে যোজন যোজন বিস্তৃত সুখরাজ্য, কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিয়া গড়া স্বর্গ-সৃষ্টি চিরযুগ কি স্বপ্ন হইয়াই থাকিবে! স্বপ্ন দেখার যুগ কি শেষ হইবে না! সমাজপুরুষ গৃহস্থাশ্রমের ঘেরায় বসিয়া নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে; সন্ন্যাসী, যতি, মুমুক্ষু হিমালয় আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিঃশ্রেয়সের পথে চলিতে চায়। হায় মোহ! যদি অপথেই না পা পড়িবে, তবে বিশ্বের ভরণশক্তিশালিনী, মৃণ্ময়ী জগদ্ধাত্রী হিন্দুস্থান আজ প্রেতভূমি কেন! কেন ধর্ম্মহীন, কেন শান্তি-সিদ্ধি-কীর্ত্তিহারা কাঙ্গালিনীবেশে জগতের দুয়ারে ছিন্ন অঞ্চল বিছাইয়া বসিল! কণ্ঠে তার আর্ত্তেরই করুণধ্বনি—ভিক্ষা দাও! যাজ্ঞা অর্দ্দনা যে উঞ্ছবৃত্তি, কিন্তু নিরুপায়ের প্রাণরক্ষার আর তো উপায় নাই! হায়, প্রাণ-মর্য্যাদা-হীন, মহিমাহীন হিন্দুস্থান! আজ তোমার এ দুর্দ্দশা কেমন করিয়া হইল!

ধর্ম্মপ্রাণ ভারত, ধর্ম্ম তুমি রাখ নাই। আজ সারা বিশ্বের স্বার্থপর জাতিবৃন্দ রুশকে ধর্ম্মহীন প্রতিপন্ন করিতে চাহে; ইংলণ্ডের মনীষী বার্ণাড শ' বলেন—ধর্ম্মরাজ্য যদি কোথাও আজ দেখার আশা কর, যাও রুশে; নিঃস্বার্থ জীবনের ভিত্তি যদি ধর্ম্মক্ষেত্র হয়, তবে রুশই ইহার আজ চরম দৃষ্টান্ত!

সত্যই তো যে দেশের সারা জাতি আজ কটিতটে লজ্জানিবারণের বস্ত্রটুকু জড়াইয়া দেশের শ্রীসম্পদ্‌গৌরবরক্ষায় উদ্বুদ্ধ, সে দেশে ভাগবত-শক্তির অবতরণ হইয়াছে বৈ কি? ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে আছে সংশয়, আছে স্বার্থ, আছে পরশ্রীকাতরতা; তবুও বলিবে ভারত ধর্ম্মপ্রাণ!

ধর্ম্মের সঙ্গে শ্রদ্ধা সংজড়িত—শ্রদ্ধার অপত্য সত্য। কৈ আমরা শ্রদ্ধাবান্, কৈ ঋতময় জীবনের অমৃত? দ্বেষ হিংসায় জর্জ্জরিততনু অসত্যের পরশু হস্তে স্বজাতির কণ্ঠনালী কাটিয়া রক্তপানে রত রাক্ষসের জাতি আমরা, আমাদের আজ ধর্ম্ম কোথা!

সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া দৈত্যরাজ্যের অন্তর্গত ভারত আজ দিশেহারা—পশুবল, মাৎসর্য্য, রক্তপাত হইয়াছে শক্তির পরিচয়; দেবতার অস্ত্রবল আজ পরাক্রমহীন, ব্যবহারবিস্মৃতি আজ আমাদের আপাত-জয়ের অস্ত্রে প্রলুব্ধ করিয়াছে। আমরা যজ্ঞের অর্থ ভুলিয়াছি, যোগের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছি; তুষ্টি, পুষ্টি, মেধার ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত

হইয়াছি। হায় রে! এই নষ্টবুদ্ধি জাতিটার ভিতর হইতে ছ'নিয়া আজ কি সহস্র ব্যক্তি বাহির হয় না, যাহারা ভারতের অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন করিবে! ভারতের অস্ত্রাগার হইতে এক অহিংস বজ্রের ব্যবহার-কৌশলে ভারতের একজন দধীচি আজ যাহা করিল, সমগ্র জাতি যদি সে যন্ত্রশালার সন্ধান করে, অসংখ্য অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়, আবার ধরায় ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। দারুণ নিদাঘদগ্ধ মর্ত্ত্যের বুকে আজ একবিন্দু স্বর্গের অমৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতেই কত আশা! কি উৎসাহ!! একটা জাতি যদি আত্মশক্তি, আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হয়, জগতে যে যুগান্তর আসিবে, তাহা কি আর বিনাইয়া বিনাইয়া এমন করিয়া বলিতে হয়!

জাগ হিন্দুস্থান, জাগ! ধর্ম্ম বলিতে জড় পাষাণ-মূর্ত্তি শিবের মাথায় কেবল জল ঢালিলেই হইবে না, নিজের মধ্যে শিবত্বের দুর্জ্জয়শক্তি অনুভব কর। ধর্ম্ম বলিতে কালীঘাটে পাঁটা বলি দিয়া, ঢাকের বাজনার সঙ্গে জবাফুলের মালা গলায় ঝুলাইয়া, তসর গরদের কাপড় পরিয়া সান্ত্বনা লইও না; বলি দাও অধর্ম্মের অপত্য অনৃত ও নিকৃতিকে। এই দৈন্য হইতেই তো ভয় ও নরকের লাঞ্ছনা। তাই তো মায়া ও বেদনার কুহকে অভ্যুত্থানের পরিপন্থী অধোগতি হইয়াছে জীবনের স্বভাব—হারাইয়াছি ধৃতি, গর্ব্ব, অভয়, স্বর্গের অমৃত; পাইয়াছি—মৃত্যু, ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা। স্বখাত সলিলে আর ডুবিও না। উঠ জাগ, ভারতের ধর্ম্ম অবজ্ঞার বস্তু নয়।

ধর্ম্ম বলিতে অর্ব্বাচীনযুগের মার্জ্জিতবুদ্ধি তরুণ ভাবিয়াছে—ষষ্ঠী, মাখাল, ধর্ম্মঠাকুরের ভগ্নমন্দির-তলে, ঐ প্রাচীন মনসা বৃক্ষে, ডালিম গাছে, ছেঁড়া চুলের তাগিদ বাঁধা; ধর্ম্ম বলিতে বুঝিয়াছে বুঝি কেবলই ঘোলাজলে চুবান খাওয়া; ফাঁদপাতা ধর্ম্মব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আশ্রমে উপুড় হইয়া পড়া; কেবলই দেববিগ্রহের সম্মুখে গণিয়া গণিয়া হাজার বার নাক কাণ মলিয়া মাটীর উপর মাথা ঘষা! হাঁ, অধঃপতনের যুগে এইগুলিই চক্ষে পড়ে, এইগুলিই প্রধান হইয়া নূতন সংস্কারে ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে। পরন্তু সব দেশেই এই হেয়, ন্যক্কারজনক সংস্কার ও যাদু, জুয়াচুরি আছে। স্বাধীন দেশের মনোবৃত্তি এইগুলিকে অপদার্থ, অসমর্থের জীবনযাপনের উপায়স্বরূপ ভাবিয়া উপেক্ষা করে; অধম পরাধীন জাতি বুকে আঁকড়াইয়া ধরে, আত্মবিশ্বাসহীন, নৈরাশ্যময় জীবনে এই অসার মিথ্যার আবর্জ্জনা—ভারতের এইগুলি ধর্ম্ম নহে!

হিন্দু ভারতের উৎসব, আনন্দ, কৌতূহল, সবই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া। ধর্ম্মের নামে না হইলে কিছুতেই সে রস পায় না, তৃপ্তি পায় না। তাই তার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়াকৌতুক, যাবতীয় বস্তুই ধর্ম্মের নামে বিকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তুলসী, মনসা, অশ্বত্থ, বট, পদতললগ্ন দুর্ব্বাশীর্ষকেও এজাতি আদর করিয়া মাথায় তুলিত। ভূমার সন্ধান এ-জাতি পাইয়াছিল। অণু পরমাণুর ভিতরও যখন সৃষ্টির বিদ্যুৎ ইলেকট্রণের সন্ধান বিজ্ঞান-চক্ষুতে ধরা পড়িয়াছে, তখন সর্ব্বময় ব্রহ্ম বলিয়া পথের ধূলি যদি ভক্তের মাথায় উঠে, তাহা তো বিস্ময়ের বস্তু নহে; কিন্তু ধূলির সঙ্গে নিজের বস্তুর জ্ঞান হারাইলে চলিবে কেন! এইখানেই যে ফাঁকি দিয়াছি, এই আত্মগরিমার ধর্ম্ম হারাইয়া পঙ্গু হইয়াছি। আবার "অহং-ব্রহ্ম" মন্ত্রে পাইয়া অণুতে আপনার অধিষ্ঠান ভুলিয়া ধরাকে সরা দেখিয়াছি; একচক্ষু হরিণের মত নিজের বুদ্ধির দোষেই যে আমরা মারা গিয়াছি! ইহার

কারণ তো আর অন্য কিছু নহে, ধর্ম্মকে পাইতে গিয়াছি, শিক্ষার আশ্রয় না লইয়া। শিক্ষা নাই, ধর্ম্মসাধনা হইবে—এমন অদ্ভুত যুক্তি কেহ দিবে না। ইহার জন্য দায়ী কে? যদি বলি ভারতের ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আমায় তাঁহারা গালি দিবেন কি? কি মর্ম্মজ্বালায় যে এমন পরুষবাণী লেখনী দিয়া বাহির হয়, তাহা কি এমন কেহ দরদী নাই যিনি বুঝিবেন. তৎপর হইবেন; এত বড় সভ্যতা ও আদর্শের দেশকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইবেন!

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিকে কি আহ্বান করা হয় নাই; সেখানে কি জাতিবিচার ছিল? ইহার উত্তর আজ যাহা শুনিব তাহা আর গর্ব্বের বিষয় নহে। আজ এই যে শুনি, হিন্দু আজ আত্মবুদ্ধিহারা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবান্বিত, তাহার জন্য দায়ী কে? আর এই বিদেশীয় শিক্ষা-বিস্তার আপামর সর্ব্বসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দৈত্যবংশ কি আত্মপুষ্টি করে নাই? তাহাদের বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিক্ষা. আদর্শ যদি রেলের গাড়ীর ন্যায় কেবল ইংরাজের জন্য, (অবশ্য এক্ষণে ইহা তাহাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনায় উঠিয়া গিয়াছে) এইরূপ ভেদ রাখিত, তাহা হইলে ভারতের অর্দ্ধেক মানুষ আজ এমন ভাবে ভ্রষ্টবুদ্ধি হইত না; স্বজাতিদ্রোহী হওয়ার চরিত্র পাইত না। শিক্ষায় মানুষের মন গড়িয়া উঠে। ইউরোপে সেণ্ট লুথারের এই শিক্ষার বিস্তার সাধন অসংখ্য কোটী লোককে আজ একধর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিয়াছে; হিন্দুর ব্রাহ্মণ, তোমরা অধিকারিভেদ রাখিতে গিয়া আজ নিজের পায়ে কি কুঠার মার নাই! হিন্দু, সংখ্যা-নির্ণয়ে যদি আজ নগণ্য হও, তাহার জন্য এই অতীত পাপের ইহা কি প্রায়শ্চিত্ত বলিব না। স্বদেশ ও স্বজাতিকে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব না দিয়া, অব্রাহ্মণ বোধে বিধান দিয়াছিলে—"রথে চ বামনম্ দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নানের বিধি দিয়া, ভূমিদান, স্বর্ণদানের সহিত যতই উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করাও—"কর্ম্মচণ্ডাল যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম"—কত শত বৎসর শেষ হইল, বৎসরে বৎসরে অসংখ্য লোক পাপক্ষয়ের জন্য পুরশ্চারণ, স্নান, দান, তপস্যা কত করিল, ইহা যে প্রত্যক্ষ—জাতি তবুও ডুবিয়া অতলে নামিয়া যায়; ধর্ম্ম যায়, কর্ম্ম যায়, করাল রাহুগ্রাসে বিশ্ব হইতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হয়। আশা ও বিশ্বাস আজ মুখের বাণী মাত্র, হৃদয় দুরু দুরু করে; —"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে" শ্রীহরি হয় তো আসিবেন, কিন্তু সে তোমাদের কণ্ঠের তাগিদে নয়; একটা নূতন জাতির জন্য—তাই নূতন বিধানে এ জাতির বনিয়াদ তাহার জন্য গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ইচ্ছা করিয়া এমন প্রবঞ্চনা কেহ কখন করিতে পারে না। মোহ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অধিকার আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির অভ্যুত্থানকামনায় ব্যবহৃত না হইয়া আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিয়াছে। কুলগৌরবে আমরা জাতির-ভিত্তিরক্ষায় উদাসীন হইয়াছি; সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অধিক করিয়া তাই ভারতের ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে। আজ আর সান্ত্বনার ভাষা নাই, আত্মপ্রতারণার সুযোগ নাই, যুক্তিহীন কথায় কেহ আর কান দেয় না; যদি ভারতের ব্রাহ্মণকে আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া এই জাতিকে রক্ষা করিতে হয়, তবে ধর্ম্মের অক্ষয় তূণ হইতে ব্রহ্মাস্ত্রই বাহির করিতে হইবে। এ ঘোরতর তমিস্রা দূর করিয়া আবার আলোর ঝরণায় এ জাতিকে অভিষিক্ত করিতে হইবে।

ক্রিয়া ধর্ম্মের সঙ্গিনী। সে ক্রিয়া পিতৃশ্রাদ্ধই শুধু নয়, কলসী উৎসর্গ করাও নয়; গয়ায় পিণ্ড

দেওয়া, কামাখ্যার মন্দিরে ডোর বাঁধা নয়। কি মর্ম্মান্তিক কথা বল তো! এই সব দিয়া এত বড় প্রকাণ্ড বিশাল জাতিকে আমরা হেয় অপদার্থ করিলাম; অন্যদিকে ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ভ্রান্তি ধরা পড়িল—কিন্তু ইহার মূলে সত্যের সন্ধান না থাকায় আমরা স্বধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইলাম, আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তির উপর আস্থা হারাইলাম। আবার বলি—হে ভারতের ব্রাহ্মণ, কি প্রচণ্ড স্বার্থ তোমাদের অন্ধ করিয়াছিল, ভারতীয় শিক্ষায় এজাতির নারীপুরুষকে নারায়ণ-রূপে গড়িয়া তোল নাই!

ক্রিয়াই যোগ—এই যোগযুক্ত জীবনই আমাদের বপু। এই বপু যখন ধর্ম্মসিদ্ধ হয়, তখনই ইহা নরনারায়ণরূপে মূর্ত্ত হয়। এই বিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞান; কয়জন হিন্দু এই বিজ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছে! ধর্ম্ম বলিতে মালা ফিরাইতে শিখিয়াছি, আর হাজার বার তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কি বিড়ম্বনা বল তো!

আজ আমরা হিন্দুর বরণীয় পুরুষদের ডাকিয়া বলি—দেশ গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে; জাতি উৎসন্নপ্রায়। এখনও যে দধীচির অস্থিটুকু আছে, হে ব্রাহ্মণ, তাহা দিয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া, আর একবার কুলিশগর্জ্জনে ভারতের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ কর। তাদের ধর্ম্ম দাও, বিজ্ঞান দাও, বেদ দাও। তাদের কাম দাও, দর্প দাও, নিয়ম দাও, সন্তোষ দাও। তাদের গড়িয়া তোলার জন্য সর্ব্বত্যাগী হও। এখনও ভারতের শিরায় শিরায় যে তপস্তেজঃ আছে, তাহা সুপ্ত রাখিও না; উদ্যত কর, উদ্বুদ্ধ হও। বার বার বলি - শিক্ষার পুণ্যবেদী এখনও গড়িয়া তোল। ডাক—এস শূদ্র, এস নারী, এস পুরুষ, এস অস্পৃশ্য; এস ভারতের সর্ব্বজাতি! আমি তোমাদের ধর্ম্মামৃত সিঞ্চনে অমর জীবন দিব। আবার পল্লীতে পল্লীতে ঋকের মধুচ্ছন্দধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলুক, ধর্ম্মমেঘ হইতে অমৃতবর্ষণ হইবে। ভারতের মূল উদ্দেশ্য—আত্মার অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়স; তাহা বুদ্ধিপ্রসূত কল্পনাজাল বিদীর্ণ করিয়া ভাস্বর মূর্ত্তি ধরিবে। আজ ধর্ম্মকে হারাইয়াছি; যদি ইহা আবার ফিরিয়া পাই, তবে বুঝিব—এই অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়স বন্ধন ও মুক্তির রেখাঙ্কিত একটা চিত্র নয়; ইহা সেই জীবন্মুক্ত আত্মার অবিনশ্বর রূপ, যেখানে অগ্নি অনুজ্জ্বল হয়, আকাশের বিদ্যুৎ মলিনমূর্ত্তি ধরে। সেখানে রথচক্রের ন্যায় ঘর্ঘর রবে জীবন গতিশীল। নিত্যক্রিয়ারত, যোগযুক্ত নরনারায়ণের এই জাগ্রতপ্রতিমা আর কোথায় দেখিব রে! হে ভারত, তুমি আজ উন্নতশিরে হিমালয় উল্লঙ্ঘন কর! হে ভারতের ব্রাহ্মণ, দর্পহীন হও; আবার তোমার অস্থি দিয়ে বৃত্র-সংহার হউক! দেবরাজ ইন্দ্র ভারতের সিংহাসনে সমারূঢ় হউন।



আয়ুর্ব্বেদ

[ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভিষগাচার্য্য বি-এ, এম-ডি এফ-এ, এস-বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঔষধ পরিচয়

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা, একজন নব্য নির্ঘণ্টকার কুক্‌শিমের ব্যবহার সম্বন্ধে কি লিখেন, পাঠ করুন :—

১। "কুক্‌শিমে—Celsia Coromandaliana

বক্তব্য :—ডিমক্ বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ) কুক্‌শিমের সংস্কৃত নাম কুলাহল। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানে ইহাকে কুকুন্দর বলা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে কুকুন্দর নামে যে উদ্ভিদের গুণপর্য্যায় লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে "তাম্রচূড় ও "সূক্ষ্মপত্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুক্‌শিমাতে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানকার, কুকুন্দরের পর্য্যায়ে ভাবমিশ্রোক্ত "তাম্রচূড়" ও "সূক্ষ্মপত্র" শব্দ গোপনপূর্ব্বক স্বরচিত "পীতপুষ্প" ও "কুক্কুরদ্রু" শব্দের যোজনা করিয়া কুকুন্দর, কুক্‌শিমা অর্থে গৃহীত হইবার যে বিঘ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট অপসারিত করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, গুণোল্লেখেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

ভাবপ্রকাশে আছে :—কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানে আছে—"কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। রক্তপীতমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ॥" বলা বাহুল্য, ভাবপ্রকাশোক্ত কুকুন্দর কুক্‌শিমা নহে। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানকার কৃত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থের আবশ্যকমত পাঠ পরিবর্ত্তন, বিদ্যার্থীর বস্তুতত্ত্বলাভের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। ডিমক্ কোথায় "কুলাহল" শব্দ কুক্‌শিমা অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন, লেখেন নাই।"

—বনৌষধিদর্পণ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭৬।

২। অক্ষোট্ রেচক কি সংগ্রাহী, তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। উভয় মত গ্রন্থে লিখিত আছে।

৩। অপামার্গের আর একটী নাম অধ্বশল্য। Dymock অনুবাদ করিয়াছেন—Road-side rice। এই অনুবাদ যেন গোপাল উড়ের যাত্রা—Flying journey of Gopala-এর মত। শল্য অর্থাৎ বেদনাকর দ্রব্য—যেমন কাঁটা, কুরুই ইত্যাদি। অপমার্গমঞ্জরী কর্কশ এবং বস্ত্রে ও গাত্রে লাগিলে ক্লেশকর হয়; এজন্য ইহাকে পথের শল্য বলে।

খোরি অনুবাদ করিয়াছেন—অপা—water; মার্গ—washerman (রজক) অর্থাৎ বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য। এ অর্থ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত।

৪। ইশের মূল (Aristolochia Indica)। আর এক নাম রুদ্রজটা। রাজনির্ঘণ্টুতে রুদ্রজটা সুগন্ধাপত্রা পঠিত হইয়াছে; কিন্তু ইশের মূলের পত্রে সুগন্ধি নাই।

৫। ওলট্‌কম্বল (Abromum augustum) ব্যবহার কোন নির্ঘণ্টুতে নাই, অথচ ইহা একটা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শাস্ত্রীয় না হইলেও, বৈদ্য মহাশয়েরা ব্যবহার করিতেছেন।

৬। ইসব্‌গুল সোমেশ্বরের বৈদ্যামৃতে প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। চোবচিনি ও চা নির্ঘণ্টুতে স্থান পাইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের আসব, অরিষ্ট পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; না করিলে ঔষধের গুণ পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। Percolater, Tincture Press ব্যবহার করিলে সুবিধা হইতে পারে। আসব ও অরিষ্ট চক্রপাণি ও শার্ঙ্গধর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাবপ্রকাশে ইহার ব্যবহার নাই। পর্পটীর ব্যবহার চক্রদত্তে আছে, তাহার পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই। ঔষধার্থে আমরা যন্ত্র সাহায্যে সহজেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি। চূর্ণার্থে Disintegrator, Seives; ছাঁকিবার জন্য Filter Paper, Filter Press; বড়ি পাকাইবার জন্য Pill Machine, Pill Tile; ট্যাবলেট তৈয়ারীর জন্য Tablet Machine ইত্যাদি যন্ত্র-সাহায্যে সহজেই অল্প সময়ে বহু ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে।

রোগনির্ণয়ার্থে যন্ত্রব্যবহার

আয়ুর্ব্বেদে রোগনির্ণয়ের জন্য রোগীকে পরীক্ষা করিতে হয়। রোগমাদৌ পরীক্ষেত।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সাধ্য উপায় দ্বারা রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। রোগীর বুকে সর্দ্দিকাশি হইলে বৈদ্য বুকে হাত দিয়া ঘড় ঘড়্ শব্দ বা ঘর্ষণ শব্দ অনুভব করিতে পারেন। পেটের অসুখে ভুট-ভাট শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; স্পর্শ দ্বারা শারীরিক উত্তাপ, শোথ ইত্যাদি জানিতে পারা যায়। চেহারা দেখিলে বিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক সময়ে রোগনির্ণয় করিতে পারেন। এই সকল বিষয় জানিবার জন্য যে সকল যন্ত্রাদির প্রচার হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করিব না, করিলেই আয়ুর্ব্বেদ মাটি হইল। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইলে কবিরাজ মহাশয়ের উপচক্ষু বা চশমা ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই, তাহাতে তাঁহার নিজের সুবিধা। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আরও বর্দ্ধিত করে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র; তবুও তাহা ব্যবহার করিব না; কেন না, তাহা ডাক্তারেরা ব্যবহার করে, বোধহয় তাহার জাতি গিয়াছে। যে শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনা যায়, তাহা স্পষ্ট শুনিবার জন্য Stethoscope, Binaural, Stethophone-এর সৃষ্টি; কিন্তু তাহা ব্যবহার করিব না, আয়ুর্ব্বেদ মাটি হইবে। আমি অনেক গোঁড়া কবিরাজের বাড়ী Gramophone, Radio-setting, Electric fan, Ice-cream-machine, Sewing machine, Type-writer, Motor Car, Harmonium প্রভৃতি বহু আধুনিক যন্ত্র দেখিয়াছি, তাহা তাঁহার নিজের ও পরিবারবর্গের সুবিধার ও আনন্দের জন্য; কিন্তু যে রোগীদের পয়সায় তাঁহাদের উপার্জ্জন হয়, তাহাদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদির ব্যবহার—কি সর্ব্বনাশ!! ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদ মাটী হইবে। আজ যদি ঋষিরা বিরাজমান থাকিতেন, তবে তাঁহারা এই যন্ত্রসৃষ্টি দেখিয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ও শস্ত্রের ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদে নূতন নহে। কবিরাজ মহাশয়েরা

তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায়, লিখিত 'Surgical Instruments of the Hindus' গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্র ও শস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদে সমস্যা

ইদানীং আয়ুর্ব্বেদে অনেকগুলি সমস্যার উদয় হইয়াছে; তাহা অদ্যাপি মীমাংসিত হয় নাই।

১। ক্লোম কি? সমালোচনার্থে ক্লোম-নির্ণয় নামক একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। সমালোচনা করিতে পারি নাই। এক ক্লোম-কথাটীর আট রকম মীমাংসা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কোন্‌টী সত্য তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। ক্লোম অর্থে কেহ স্বাদু পিণ্ড, কেহ তিল (Pancreas), কেহ ফুস্ ফুস্ (Lungs), কেহ বা বৃক্ক (Kidneys), অন্য কেহ গলনাড়ী (Œsophagus), অপরে শ্বাসপথ (Trachæa), একমতে গোলনাড়ী বা পিত্তাশয় (Gall-bladder), কেহ বা যকৃৎ ও হৃদয়পার্শ্বে বক্ষস্থিত যন্ত্র (an organ by the side of Liver and Heart) ধরিয়াছেন। কোন্‌টা সত্য তাহা স্থির করিতে পারি নাই, স্থির করাও দুরূহ। বেদের ভাষা চরক ও সুশ্রুতের ভাষা নহে। পালকাপ্য ও অশ্বায়ুর্ব্বেদে একই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের ত কথাই নাই। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের যখন এইরূপ মতভেদ, ছাত্রগণ আর কি করিবে?

২। কলায়খঞ্জ একটী রূঢ় সংজ্ঞা বলিয়া বৈদ্যগণ রোগের নাম জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বহু গবেষণার পর স্থির করিতে পারিয়াছি, যে কলায়খঞ্জ Lathyrism বা Khesaridal Poisoning। সেই বিষয় লইয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছি।

৩। মূত্রক্ষরণ সম্বন্ধে গোলযোগ। নব্য গ্রন্থকার মূত্রক্ষরণ প্রণালীর পাশ্চাত্যমত আয়ুর্ব্বেদের পুস্তকে লিখিয়াছেন; সে মত গৃহীত হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

৪। আয়ুর্ব্বেদে হিরা, শিরা, নাড়ী, ধমনী, স্নায়ু এই সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না ইউরোপেও Artery, Vein, Nerve লইয়া এইরূপ গোলমাল। একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নার্থক রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

স্নায়ু সন্ধিবন্ধনী রজ্জু সম। ইংরাজীতে Ligament, বাঙ্গালাতে Nerve-এর প্রতিশব্দ স্নায়ু হইয়াছে, ধমনী হইবে। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার সময় হইয়াছে, কি করিলে আয়ুর্ব্বেদ উন্নত বা তাহার উদ্ধার সাধিত হয়, তাহা সকলেরই চিন্তা করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদের অভাব কি?

ইহার উন্নতির অন্তরায় কি? এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও একবার ঋষিসমাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহারা তাহা মীমাংসা করিয়াছিলেন। কোনও কিছু ভাল করিতে গেলে সঙ্ঘগঠনই শক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ঋষিরা এই সঙ্ঘগঠন কার্য্য বৈদ্যজাতির উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতি একটী চিকিৎসক সঙ্ঘ (Medical Club)। ফল যে মন্দ হইয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য বৈদ্যজাতির চেষ্টা ও দান বড় কম নহে। এখন বৈদ্যজাতি সে পথ হইতে পরিভ্রষ্ট। ধীমান বৈদ্যবংশীয়েরা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। ফলে বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করিতেছেন। ইহার প্রতিকার যাহা চেষ্টা

হইতেছে তাহাও ঠিক নহে। ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ-সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ত আছেই। ব্রাহ্মণও তাঁহার স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট বলিতে হইবে—সে বিদ্যা, ত্যাগ ও দয়া কোথায়? কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য দুইদল ভুলিয়া গিয়াছেন, যে আয়ুর্ব্বেদে শূদ্রেরও অধিকার আছে। "কুলগুণ-সম্পন্ন শূদ্রমপি অধ্যাপয়েৎ"।—সুশ্রুত এই কথা বলিয়াছেন; তাহা হইলে কি কায়স্থ আয়ুর্ব্বেদ, ক্ষত্রিয় আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি সভা হইবে? তাহা পূর্ব্বের মত জাতিবিশেষদ্বারা ইহার আর উন্নতি হইবে না। এ ভার সাধারণ মানব-সমাজের উপর দিতে হইবে—তিনি যে জাতি হউন, যে ধর্ম্মী হউন, ক্ষতি নাই। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিতে যাঁহার চেষ্টা, তিনিই আয়ুর্ব্বেদীয় বৈদ্য। বাগ্‌ভট বৌদ্ধ ছিলেন, সুশ্রুত ক্ষত্রিয় ছিলেন, জীবকের জন্ম রহস্যপূর্ণ, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয়গণের নমস্য হইয়াছেন।

সাধারণে ব্রাহ্মণজাতিকে স্বার্থপর বলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা নাকি নিজেদের পক্ষে সুবিধা-জনক ও অপরের পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছে; শ্রাদ্ধে অশৌচগ্রহণ ব্রাহ্মণের ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১৫ দিন, শূদ্রের ১ মাস। বেদপাঠ তাঁহাদের একচেটীয়া; বেদাঙ্গও প্রায় তাহাই। জ্যোতিষ সম্বন্ধে বচন শুনুন—শূদ্রস্য পাঠ নিষেধ—যথা

স্নেহাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ যো বিপ্রোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
শূদ্রানামুপদেশন্তু দদ্যাৎ স নরকং ব্রজেৎ॥ —গর্গ

অর্থাৎ জ্যোতিষ শূদ্রকে শিখাইব না। কিন্তু জ্যোতিষবেত্তা ম্লেচ্ছকে গুরুর আসন দিয়াছেন। যাহাই হউক, আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। এই শাস্ত্রের শূদ্রদিগেরও অবারিত দ্বার। কিন্তু কয়জন শূদ্র আয়ুর্ব্বেদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিতে পারি না।

২। আয়ুর্ব্বেদের Pharmacopœia—

সাধারণের বিশ্বাস আয়ুর্ব্বেদের Pharmacopœia নাই। Pharmacopœia বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থসমূহে তদ্বৃত্তান্ত লিখিত আছে; কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সজ্জীভূত নাই। শার্ঙ্গধরসংহিতার পঞ্চম খণ্ডে ঔষধপ্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী Pharmacopœia বলিতে যাহা বুঝি, ইহা তদ্রূপ গ্রন্থ। ইহাতে—

স্বরস—Succus
ক্বাথ—Decoction
হিম—Macertion
ফাণ্ট—Infusion
চূর্ণ—Powder
বটক, বটী—Pills
লেহ—Syrup, Confection
তৈল—Oil, Liniment

—সমূহ বর্ণিত আছে।

দেশের রাজা বা রাজকীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসক সম্প্রদায় দ্বারা স্থিরীকৃত ঔষধাবলী ও তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী যে গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাই Pharmacopœia। ইহা ছাড়া অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে বাধা নাই। তবে ঐ গ্রন্থে নিবদ্ধ ঔষধগুলি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য। এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকার মীমাংসা না করিয়া নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। এই সকল ঔষধ প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান।

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ॥
—সুশ্রুত।

চরকেও লিখিত আছে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্যগণোদ্দিষ্ট

ঔষধের যোগ বিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু মন্দবুদ্ধিগণের পক্ষে শাস্ত্রপথই অনুসরণীয়।

মন্দবুদ্ধেস্তু যথোক্তানুগমনেশ শ্রেয়ঃ।

চক্রদত্ত তাঁহার টীকায় সুশ্রুত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষ চাগম সিদ্ধত্বাৎ তথৈব ফলদর্শনাৎ।

মন্ত্রবৎ সংপ্রযোজ্যা ন মীমাংস্যাঃ কথঞ্চন॥

কিন্তু তীক্ষ্নবুদ্ধিদিগের গতি অবারিত—

বুদ্ধিমতামূপাহোঽবিতর্কনঃ॥

এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ দ্বারা লিখিত ঔষধগ্রন্থ প্রচার আবশ্যক; তাহা সকলের মান্য হইবে। Indian Pharmacopœia সম্বন্ধে আমি Drug Enquiry Committee'তে সাক্ষ্য দিবার কালে বলিয়াছি; এখানে আর বলিলাম না।

৩। গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার—

কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রকাশ বা প্রবন্ধ লিখিতে হইলে গদ্যে লিখাই ভাল। পদ্যে লিখিলে মুখস্থ করিবার সুবিধা হয়, সেইজন্য ছাত্রদের পক্ষে স্থলবিশেষে পদ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে—যেমন দ্রব্যগুণ পাঠে। কিন্তু কোন বিষয় বিস্তারভাবে আলোচনা করিতে গদ্য ব্যবহারই যুক্তিসিদ্ধ। চরক-সুশ্রুতে গদ্য পদ্যময়ী অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যগ্রন্থনিচয় পদ্যময়ী। টীকাকার সুভাষিত, গদ্যে লিখিত, প্রাঞ্জল বর্ণনা ত্যাগ করিয়া পদ্যময়ী শ্লোক শ্রুতিসুখকর বোধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। আয়ুর্ব্বেদের ভাষা কি হইবে, ইহা ভাবিবার বিষয়। আয়ুর্ব্বেদপঠন পাঠন এখনও সংস্কৃত ভাষায় হয়, কিন্তু ছাত্রগণকে বুঝাইতে হইলে দেশীয় ভাষার প্রয়োজন হয়। বৈদ্যগ্রন্থসমূহ সংস্কৃতভাষায় রচিত; কিন্তু কোন বিদ্যার উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় ভাষার প্রয়োগ না হইলে তাহার প্রচার কার্য্য ভালরূপে হয় না। মাতৃভাষা ব্যবহার না করিলে স্বাভাবিকভাবে লেখাপড়া আলোচনা করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থমূল সংস্কৃত না হইলে ভারতীয় বিভিন্ন দেশ মধ্যে তাহার প্রচার হওয়া সুকঠিন। ইংরাজীতে আয়ুর্ব্বেদালোচনা সম্যক্‌রূপে সংসাধিত হয় না! কিন্তু আপাততঃ তদ্ভিন্ন উপায় নাই। সেই জন্য 'Journal of Ayurveda' ইংরেজীতে পরিচালিত। কিন্তু দেশীয় ভাষাতে ইহার আলোচনা না হইলে কোন স্থায়ী উন্নতি হওয়া সুকঠিন।

৫। আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা—

সংস্কৃত ভাষায় সুবিধা এই, যে পারিভাষিক শব্দ গঠন করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। বৈদ্যকগ্রন্থ সংস্কৃত লিখিত বলিয়া পারিভাষিক শব্দের অভাব নাই। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত শব্দ বেদে ও বৈদ্যগ্রন্থে আছে, নিজ সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া "প্রকৃতি" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি;—"আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা"—তাহা অসম্পূর্ণ, নির্ভুলও নহে; তবে একটু চেষ্টা করিয়াছি।

৬। অনুবাদ গ্রন্থ—

সংস্কৃত বা দেশীয় ভাষার খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ অনুবাদ করা প্রয়োজন। যতদিন সংস্কৃত অস্ত্র-চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন না হয়, ততদিন ছাত্রদের জন্য আয়ুর্ব্বেদের উপযোগী করিয়া কোন ইংরেজী Surgery'র অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ কলেজে যেভাবে অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বৈদ্যকশাস্ত্রের উন্নতিবিধায়ক নহে।

৭। গ্রন্থ প্রণয়ন—

ছাত্রদের বর্ত্তমান কালোপযোগী আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণয়ন করিতে হইবে; দেশীয় ভাষায়

লিখিলেও ক্ষতি নাই, তবে তাহার সংস্কৃতসংস্করণ প্রয়োজন হইবে। এইরূপ গ্রন্থের অভাবে ছাত্রগণ অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

৮। গ্রন্থসংস্কার—

প্রচলিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিতে হইবে; যদি বর্ণনার কোন অভাব থাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে; নূতন রোগের চিকিৎসা লিখিতে হইবে।

৯। পুস্তকালয় স্থাপন—

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের পুস্তকালয় নাই বলিলেই হয়। ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত পুস্তকে অপরের কোন সাহায্য হয় না। পুস্তক না পাইলে, কোনরূপ আলোচনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকের ও গ্রন্থকারদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি; (An Index Catalogue of Ayurvedic Authors & their Works) পুস্তকদান পূর্ব্বে আমাদের দেশে একটী মঙ্গলময় অনুষ্ঠান ছিল; এখন লাইব্রেরীতে পুস্তকদান অপেক্ষা, পুস্তক লইয়া গিয়া ফেরৎ না দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

১০। আয়ুর্ব্বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা— আয়ুর্ব্বেদের একটা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত; সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁসপাতাল হওয়া চাই। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতার তিনটী কলেজের একত্রীকরণ প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। একটা Museum হইলে ভাল হয়।

১১। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস— ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন যুগে ইজিপ্ট, গ্রীস্, রোম, আরব, চীন, তিব্বত, জাপান ও ব্রহ্মদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রচারের অনুসন্ধান করিতে হইবে; হিন্দু উপনিবেশ জাভা বালী দ্বীপের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সুফল লাভ হইবে।

১২। আয়ুর্ব্বেদ কোন "প্যাথি" নহে; কোন সম্প্রদায় বিশেষের চিকিৎসাশাস্ত্র নহে। আয়ুর্ব্বেদ নর-পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি জীবিত পদার্থ মাত্রের চিকিৎসা। যে ঔষধ উপকারী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার সেই গুণ প্রমাণ করিতে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় সফল হইলে অবশ্যই তাহা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে। কুইনাইন পরীক্ষিত ঔষধ; কুইনাইন বৈদ্যরাজ ব্যবহার না করিলেও, তাহাদের রোগীগণ ব্যবহার করেন; তখন কুইনাইন ব্যবহারে বৈদ্যের আপত্তি থাকা অন্যায়। অবশ্য কুইনাইনের দোষ যাহা তাহার প্রতিষেধক ঔষধাদি বা দোষ প্রতিকারার্থ শোধনাদি প্রক্রিয়া করিলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কালাজ্বরে এণ্টিমণি, ফিরঙ্গরোগে পারদ এবং অন্যান্য ধাতব ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

১৩। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধগুলির (Identification) প্রয়োজন। একই বৃক্ষের বিভিন্ন উদ্ভিদ্‌বেত্তা বিভিন্ন নাম লিখিয়াছেন, তাহা সংশোধিত হইয়া যথার্থ বৈজ্ঞানিক নাম লিখিত হওয়া উচিত। বৃক্ষ ও লতাগুলির ছবি থাকিলে ভাল হয়। Glossary of Indigenous Medicinal Plants বলিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছি, এখনও তাহা ছাপাইতে পারি নাই। মেজর বসু ও ডাঃ কৃত্তিকার প্রণীত "Indian Medicinal Plants." সে অভাব পূরণ করিয়াছে।

১৪। আয়ুর্ব্বেদোক্ত যন্ত্র, শস্ত্র, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যন্ত্রাদি ঔষধি প্রস্তুত করণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলির বিবরণ ও প্রতিকৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমার 'Surgical Instruments of the Hindus' পুস্তকে হিন্দুদের যন্ত্র, শস্ত্র ও অন্যান্য জাতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্র, শস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি।

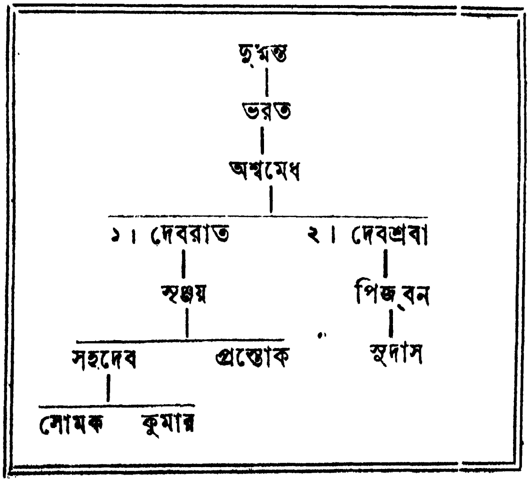
বৈদিক-যুগ

[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋগ্বেদের ৪।১৫।৪ ও ৭ মন্ত্রে দেবরাতের পুত্র সৃঞ্জয় নাম পাওয়া যায় এবং সহদেবের পুত্র কুমার, যাহাকে সায়নাচার্য্য "সোমক" রাজা বলিয়াছেন; ইঁহাদিগের দানের বিষয় উক্ত আছে; ঐঃ ব্রাঃ সাহদেব্য সোমককে দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত রাজসূয়ে অভিষিক্ত করেন—বর্ণিত আছে এবং সহদেবকে সারঞ্জয় অর্থাৎ সৃঞ্জয় পুত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ৫।২৭ মন্ত্রের ঋষি অশ্বমেধকে ভারত বলিয়াছেন। এই অশ্বমেধ দাতা ছিলেন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আমরা ঋঃ ৬।২৭।৭ মন্ত্রে ইন্দ্র, সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্ব্বস্‌কে সমর্পণ করেন, দেখিতে পাই এবং ঋঃ '।১৮।২২ মন্ত্রে সুদাস দেবরাতের পৌত্রও পিচ্‌বনের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ সুদাসের পুরোহিত ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সৌদাস কোশলাধিপতি বর্ণিত আছে। ঐঃ ব্রাঃ সুদাসকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্ত করেন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুদাসকে "তৃৎসু" বলা হইয়াছে এবং কোথাও "ভারত" বলা হইয়াছে। ঋঃ ৭।১৮।১৪ মন্ত্রে অণুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছেন—লিখিত আছে। সুদাস দ্রুহ্যপুত্রগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া মৎস্যরাজাধিপতি তুর্ব্বসকে বধ করেন! ঋঃ ৭।১৯।৮ মন্ত্রে সুদাস তুর্ব্বস ও যদুর পুত্রগণকে বধ করেন, বর্ণিত আছে। ঋঃ ৭।১৮।১০ মন্ত্রে সুদাস পিতা পিজ্‌বন দরিদ্র ছিলেন। সুদাসের দ্বারা এই সকল রাজগণের অভিভাবকে সূচী দ্বারা জুপকাষ্ঠ ছেদন, বলা হইয়াছে। ঋঃ ৭।১৮।১৫ মন্ত্রে তৃৎসুগণ অজ্ঞতাবশতঃ ইন্দ্রসহ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পশ্চাৎ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সর্ব্বস্ব ভোজ্যবস্তু প্রদান করে এবং তৃৎসুবিজয়ী "তৃৎসু" উপাধি গ্রহণ করেন। সুদাস পুরোহিত বশিষ্ঠগণও ঋঃ ৭।৩৩।২—৩) তৃৎসু বংশীয় বা দেশীয় বলিয়া "তৃৎসু" নামেই অভিহিত হইয়াছেন। ঋঃ ৭।৮৩।৪ মন্ত্রে তৃৎসুগণের পৌরোহিত্যের সফলতা বর্ণনে তাহা জানা যায়। তৃৎসু যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাহাতে ৩।৫।১১ ও ৭।১৮।৯ মন্ত্র হইতে অশ্ব ছাড়ার বিষয় জানা যায় এবং ৩।৫৩।৭—৯ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঐ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন এবং ঋঃ ৭।৮৩।৬—৮ মন্ত্রে ঐ অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য ফলবান দশ রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ সুদাস-যজ্ঞ সমাপন করেন। ঋঃ ৭।১৮।৫ মন্ত্রে ইন্দ্র সুদাসের জন্য নদীমুখ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঋঃ ৭।২০।২ সুদাসের জন্য ইন্দ্র নূতন জনপদ সৃষ্টি করেন; সম্ভবতঃ উহা যমুনা নদী তীরে হইবে (ঋঃ ৭।১৮।১৯ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)। দেবরাত বংশীয় চয়মান পুত্র কবি সুদাস কর্তৃক হত হয়েন। ঋঃ ৭।১৮।১২ মন্ত্রে দুই জনপদের প্রজা বিদ্রোহী হইলে সুদাস তাঁহাদের ২১ জনের প্রাণদণ্ড করেন। ঋঃ ৭।১৮।১১ মন্ত্রে শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে যুদ্ধে জলমগ্ন করেন। ঋঃ ৭।১৮।১৪ মন্ত্রে অণু ও দ্রুহ্যু পুত্রগণ

বিরোধী হইলে তাহাদিগকে ৬৬৬৬ সৈন্যসহ ধরাশায়ী করেন। ঋঃ ৭।৫৩।৭ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র সুদাসকে ভোজ অর্থাৎ দাতা বলিয়াছেন। ঋঃ ৭।১৯।৩ মন্ত্রে সুদাস, পুরুকুৎস পুত্র ত্রসোদস্যু ও পুরুকে রক্ষার প্রার্থনা দেখা যায়। সুদাস ঋঃ ১০।১৩৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহাতে ভারত বংশীয়-গণের এক ধারাবাহিক বংশাবলী মিলিতেছে। ভরতের পুত্র অশ্বমেধ স্থলে মহাভারতে ভূমন্যু ও ভাগবতে বিতথ্য নাম দেখা যায়। ঋঃ ৩।২৩ সূক্তের ঋষি দেবরাত ভারত থাকা দৃষ্ট হয়; তাহতে ভরতবংশীয় অর্থে গ্রহণ করিতে হইয়াছে;



ভরতবংশ

কারণ অশ্বমেধ যে ভরতপুত্র তাহার কারণ, অত্রি উঁহার যজ্ঞে ঋষি। অত্রির প্রাচীনতা ও বিশ্বামিত্রের অর্ব্বাচীনতা তুলনায় দেবরাতকে ভরতের পৌত্র করিতে হয়। পৌরাণিক নামাবলীসহ তাহার কোন মিল দেখা যায় না। সম্ভবতঃ এই দেবরাত বংশেই পৃথু নামক রাজার অপত্য চয়মান পুত্র সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহার দান-স্তুতি ঋঃ ৬।২৭।৭—৮ মন্ত্রে ঋষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। চয়মানের অপর পুত্র কবি-মহারাজ সুদাস কর্ত্তৃক হত হন। (ঋঃ ৭।১৮।৮ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য) ঋগ্বেদের ২০।১৪৮ সূক্তে এক বেণপুত্র পৃথুর নাম দেখা যায়; সম্ভবতঃ, ইনি পৃথক ব্যক্তি হইবেন। ভারতগণ সরস্বতী দৃশদ্বতী অধ্যুষিত দেশে বাস করিতেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। মহারাজ সুদাস সম্ভবতঃ যমুনাকূলে তৃৎসুতে বাস করিতেন। ঋঃ ৩।৩৩।১০ মন্ত্রে যেরূপ শতদ্রু ও বিপাশা বিশ্বামিত্রকে প্রীতি ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রূপ ঋঃ ৭।১৮।১৯ মন্ত্রে যমুনা নদী স্বীয় তীরস্থ অজশিগ্রু ও চক্ষু জন-পদত্রয় সুদাসের উপভোগের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করেন। উক্ত তিন জনপদের সন্নিহিত প্রদেশেই তৃৎসু ছিল। রামায়ণ মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—সরযূ নদী তীরে অযোধ্যা নগরীতে মহারাজ ইক্ষ্বাকু রাজত্ব করিতেন। উক্ত ইক্ষ্বাকুর নাম ঋঃ ১০।৬০।৪ মন্ত্রে পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু হরিশ্চন্দ্রের নাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত না থাকিলেও, ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের যূপবদ্ধ শুনশেপের দৃষ্টমন্ত্রে "মহর্ষি বিশ্বামিত্র হোতা" এরূপ বর্ণিত আছে।

ঐতেরেয়ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র ও তদীয় পুত্র রোহিতাশ্বের যজ্ঞবিষয়ক যে আখ্যান আছে, তাহা যে ঐ একই বিষয়ের বর্ণন করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অতি সন্নিহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থ। ঋঃ ১০।১৭৯ সূক্তে রোহিতাশ্বপুত্র বসুমনোর দৃষ্ট মন্ত্র আছে। ঐক্ষাক শব্দ ভারত শব্দের ন্যায় গোত্রাপত্যবাচী। ইহা হইতে বলা যায় না যে, হরিশ্চন্দ্র রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র।

ঋঃ ১০।১৩৪ সূক্তে ঋষি মান্ধাতা যৌবনাশ্ব-পুত্র; ইহার উল্লেখ ঋঃ ৮।৩৯।৮ ও ৮।৪০।১২ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহারাও ঐক্ষাকু। শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্দের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২—৩৮ শ্লোকে যে বংশাবলী বর্ণিত আছে, তাহাতে মান্ধাতার

অন্য নাম ত্র্যসদস্যু ও তৎপুত্র পুরুকুৎস লিখিত আছে। ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রের বিরোধী বলিয়া গ্রাহ্য নহে; কারণ ঋঃ ৮।১৯।৩৬ মন্ত্রে সম্রাট্ ত্র্যসদস্যু যে পুরুকুৎসের পুত্র, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঋঃ ৫।২৭ সূক্তের সম্রাট্ ত্র্যসদস্যু পৌরুকুৎস বলিয়া পাওয়া যায়।

ঋঃ ৪।৩৮।১ মন্ত্রে রাজা ত্র্যসদস্যুর দানের কথা উল্লেখ আছে, এবং তিনি ঋঃ ৯।১০ ও ৪।৪২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ঋঃ ৪।৪২।৮ মন্ত্রে উক্ত পুরুকুৎসতনয় ঋষি ত্র্যসদস্যু এবং ঐ মন্ত্রে পুরুকুৎসের পিতার নাম দুর্গহ ও ত্র্যসদস্যু তাঁহার পুত্র বলিয়া জানা যায়। ঋঃ ৬।২০।১০ মন্ত্রে ইন্দ্র পুরুকুৎসকে দস্যু শরতের সপ্তপুরী প্রদান করেন। দেখা যায়, ঋঃ ১।১৭৪।২ মন্ত্রে উক্ত শরত রাজার সপ্তপুরীভেদের এবং তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে।

ঋঃ ৮।২২।৭ ও ৬।৪৬।৮ মন্ত্রদ্বয়ে ত্র্যসদস্যু পুত্র ত্রিক্ষুকে ও অশ্বিনীদ্বয়কে বহু ধন দান করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। ঋঃ ১০।৩৩।৪ মন্ত্রে ত্র্যসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার দানের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ঋঃ ৫।৩৩ সূক্তে পুরুকুৎস পুত্র ত্র্যসদস্যু কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার দানের বিষয় বর্ণিত আছে

ঋঃ ৫।৩৩—৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা প্রাজাপাত্য সম্বরণ। ঋঃ ৮।৫১।১ মন্ত্রে সম্বরণপুত্র মনুর বর্ণন আছে। ঋঃ ৯।১০১ সূক্তে সাম্বরণ মনু, মানব নহুষ ও নাহুষ যযাতি, ইহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। রাজা নহুষ গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরস্বতীতীরস্থ প্রদেশ দোহন করিতেন। ঋঃ ৮।৬ সূক্তে রাজা নহুষ শীঘ্রগামী অশ্বগমনে প্রজাগণকে দমন করিতেন। ঋঃ ৭।৬ সূক্তে অগ্নি প্রজাগণকে বল দ্বারা নিহত করিয়া রাজা নহুষের করপ্রদ করিয়াছেন। ঋঃ ৯।৯১।২ মন্ত্রে নহুষসন্তানগণের সোমযাগ উল্লিখিত আছে। রাজা নহুষ অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, তাহা আমরা ঋঃ ৫।১২।৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই। ১০।৮০।৬ মন্ত্রে নহুষপুত্র মানবশব্দবাচী হইয়াছে এবং ঋঃ ৫।৭৩।৩ ও ১।১১।১৬। মন্ত্রে বিক্রমা শব্দের ন্যায় "নাহুষ-যুগা" বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ১০ ৮০।৬ ও অন্যান্য বহু মন্ত্রে নহুষ শব্দ মনুষ্যবাচী আছে। ঋঃ ৯।১১ ও নাহুষের উল্লেখ আছে। ঋঃ ১০।৬৩।১ মন্ত্রে নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞের উল্লেখ আছে। মহারাজ যযাতি গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজত্ব করিতেন, এইরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

যযাতির পুত্র পুরু, অনু ও দ্রুহ্য, যদু ও তুর্ব্বস্। ঋঃ ৭।১৩।৩ ৮।৩।১২, ৬।৪।৬৮, ৮।৪।২ মন্ত্রে রাজা পুরু ও তৎপুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে, ঋঃ ৮।৪৬।৯, ৭।১৮।১৪ মন্ত্রে অনু বিষয়ে উল্লিখিত। ঋঃ ৭।৮।১২ মন্ত্রে দ্রুহ্য বিষয় বর্ণিত আছে; ঋঃ পুরু নামক এক দস্যু (৭।৮।৪) ও অত্রিবংশে পুরু নামা এক ঋষি দৃষ্ট হন; ইনি ৫।১৬। ১৭ সূক্তের দ্রষ্টা।

যযাতির অপর দুই পুত্র যদু ও তুর্ব্বস্ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ষোড়শাধিক স্থানে উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ঋঃ ৭।১৮।৫ মন্ত্রে তুর্ব্বস্, মৎস্যদেশ জয় করেন, দেখা যায়। ঋঃ ৬।২০।১২ মন্ত্রে যদু ও তুর্ব্বস্‌কে সমুদ্র পার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়, বর্ণিত আছে এবং ঋঃ ৭।৪৫।১ মন্ত্রে পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়, লিখিত আছে; ঋঃ ১।১০৪।৯ মন্ত্রে যদু ও তুর্ব্বসের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র সমুদ্রকে জলে পূর্ণ করেন। ঋঃ ৪।৩০।১৭ মন্ত্রে তুর্ব্বস্ ও যদুকে ইন্দ্র অভিষেকের যোগ্য করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও মহাভারতে নহুষের পিতা মনু নহেন, কিন্তু আয়ু বলিয়া বর্ণিত আছে এবং আয়ুর পিতা ঐল পুরুরবা দৃষ্ট হয়। ঋঃ

৩।২৭।১০ মন্ত্রে দক্ষকন্যা ইলা ও ঋ: ১।৩১।১১ ও ১।১২৮।১ মন্ত্রদ্বয়ে দেবী ইলা মনুর শাস্ত্রবাক্য-রূপিণী। ঋ: ১০ ৯৫।১৮ মন্ত্রে ইলাপুত্র পুরুরবা বলা হইয়াছে। ইলা মনুর কন্যা, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে মনুর শাসনবাক্য-সম্বন্ধীয় ইলা—মনুকন্যা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋ: ৬।১৮।১৩ মন্ত্রে পুরুরবাপুত্র আয়ুর উল্লেখ আছে।

ঋ: ১।১৩।৯ মন্ত্রে ও ১।৪২।৯ মন্ত্রে ইলা "পার্থিব বাণীরূপিণী দেবী" এবং ইহা হইতেই 'ইলা-বৃতবর্ষ' প্রদেশের নাম। পুরাণাদিতে মনুকন্যা ইলা হইতে পুরুরবার জন্ম দেখা যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৭৫ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর পুরুরবা বিপ্রধনে লোভ করিলে মহর্ষি সনৎকুমার তাহাকে 'অনুদর্শ' যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে চাহেন, পুরুরবা অস্বীকার করায় শাপগ্রস্ত হইয়া বিনষ্টপ্রায় হন, বর্ণিত আছে। ঋ: ৫।৪১।১৯ মন্ত্রে গোসমূহের মাতা ইলা বলা হইয়াছে। ঋ: ১০।৯৫ সূক্তের পুরুরবা ও উর্ব্বশী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। পুরুরবার পুত্র আয়ু অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঋ: ১।৩১।৪ মন্ত্রে অগ্নির পরিচর্য্যাকারী পুরুরবাকে অগ্নি বিশেষ অনুগৃহীত করেন, লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

গান

(আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন জাগিল রে—সুরে গেল)

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

আমি দুর্গম পথ সদা বাছিব গো !
অন্তরে অন্তরে ধ্বংসের সংসারে
ধাপে ধাপে নেমে যেতে নাচিব গো।

শোকে দুখে অপমানে,
কেঁদে মরি অভিমানে,
আজি সদা জলে-মরা যাচিব গো।!

ভুলে গেছি ভয়-ভীতি,
সমাজের রীতি-নীতি,
ফিরাইতে পারিবে না মায়া মোহ, প্রেম প্রীতি,
মরিয়া মরিয়া আজ বাঁচিব গো !

দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী

[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

(৮)

ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের আদর আপ্যায়নের অভাব হইতেছে না। গভর্ণমেণ্ট সেলুন গাড়ী দিয়াছে, আমাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বত্র মোটরের ব্যবস্থা করিয়াছে, এক জন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে (Emigration officer Hartshouse) সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়াছে। ভারতবাসীরা সন্দেহ করে, যে এ ব্যক্তি গুপ্তচর; হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের গোপনীয় কাজ ত কিছুই নাই; আমরা অনুসন্ধান-কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা করিতেছি। অনুসন্ধানের ফলে কিছু হইবে না, তাহা গুপ্তচরের অপরাধ নয়। এ ব্যক্তি আমাদের যথেষ্ট সেবা করিতেছে। প্রিন্স্ অফ ওয়েলস্ যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন এই ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিল। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট খাতির করিয়া তাহাকে আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন, এই ধারণা; ভারতবাসী-দিগের ধারণা অন্যরূপ। অতএব আমাদের বিশেষ সাবধান থাকিতে হইয়াছে।

ডার্ব্বান, প্রিটোরিয়া, জোহানেসবার্গ, কিম্বার্লি, কেপটাউন, সকল জায়গাতেই আমরা ভারতবাসি-গণের মধ্যে ও তাহাদের সহিত থাকিবার বন্দোবস্তই হইয়াছিল। আপ্যায়নের অভাব কোথাও হয় নাই। দেশী রকমের পাইখানা যেখানে সেইখানেই ময়লা।—ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ইহাই প্রধান অভিযোগ। কথাও সত্য। মধ্যবিত্ত ভারতবাসিগণ খাঁটি বিলাতী ধরণে বাস করে না; বাহিরের ঘরের সাজসজ্জা বিলাতী ধরণের; কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থা বড় সুবিধার নয়।

সকল জায়গায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী; বাঙ্গালী প্রায়ই দেখা যায় না। কেবল কেপটাউনে ১৫।২০ জন হুগলী জেলার বাঙ্গালী মুসলমান দেখিয়াছি। তাহারা বিশেষ যত্ন করিয়াছে। প্রথমে তাহারা চিকণের কার-বার উপলক্ষে আসিয়াছিল; প্রথমে লাভও খুব করিয়াছিল। ক্রমে চিকণের দাম বাড়িয়া গেল, চিকণ ব্যবহার কমিয়া গেল; সুতরাং এই ব্যবসা আর চলিল না, অন্য ব্যবসা করিতেছে।

কেপটাউনে ভারতবাসীর নির্য্যাতন ও অত্যাচার আছে; কিন্তু ট্রেন্সভাল ও নেটালের মত নয়; কাজেই ইহারা পয়সা করিয়াছে, বাড়ী ঘর করিয়াছে; কেহ মালয় মুসলমান, কেহ ইংরাজ, কেহ ডচ্ বিবাহ করিয়াছে। প্রায় একশত বাঙ্গালী কেপ-টাউন ও কিম্বার্লিতে ছিল, এখন ১০।১৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। তাহারাও আমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়াছে।

সকল জায়গাতেই ভারতবাসীরা মিটিং করিয়াছে, বক্তৃতা করিয়াছে, মালা তোড়া দিয়াছে, কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে; কিন্তু কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে আমরা এখনও ত পারিলাম না!

ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও পথে দেখিবার যথেষ্ট বস্তু আছে—যথাসাধ্য তাহা দেখা হইয়াছে; কিন্তু

প্রাণে একটা বোঝা, মনে একটা দারুণ ভারের জন্য সে সব দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ সুখোদয় হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই।

জায়গার তালিকা, নামের তালিকা, স্থানের বর্ণনা, আতিথ্যের বর্ণনা, রাস্তাঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, মিটিং, বক্তৃতা আলোচনা, আন্দোলন ইত্যাদির বর্ণনা বিশদভাবে করিতে গেলে যথার্থ একটা প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে। তাহার সময় পাওয়া দুষ্কর। রেলেই অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে। পূর্ব্বে চলন্ত গাড়ীতে লিখিতে কষ্ট হইত না। এখানকার রেলওয়ে অন্যান্য বিষয়ে মন্দ নয়; কিন্তু মিটার গজ রেলওয়ে ও পার্ব্বত্য রেলওয়ের যে সব দোষ, তাহা সমস্ত আছে। চলন্ত গাড়ীতে লেখা অসাধ্য। জমিতে পা দিয়া অবধি ও পুনরায় রেলে উঠা পর্য্যন্ত স্নান আহার নিদ্রার পর্য্যন্ত সময় থাকে না—হয় অভ্যর্থনা, না হয় মিটিং, না হয় কাহারও না কাহারও সঙ্গে দেখাশুনা, না হয় ভোজ, না হয় কোথাও যাওয়া—এই সব লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শুধু ব্যস্ত নয়, বিপর্য্যস্ত থাকিতে হয়। তাহাতেও মন সকলের পাওয়া যায় না। ইংরাজ, ডচ্, কলার (coloured people) কাফ্রী (Native) ও ভিন্ন ভিন্ন দলের ভারতবাসী সকল স্থানেই আদর আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা ইত্যাদিতে এইরূপ "বিপন্ন" করিয়া রাখিয়াছে। ভ্রমণ-কথা লেখা দূরে যাউক, বাড়ীর চিঠিপত্র লেখাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

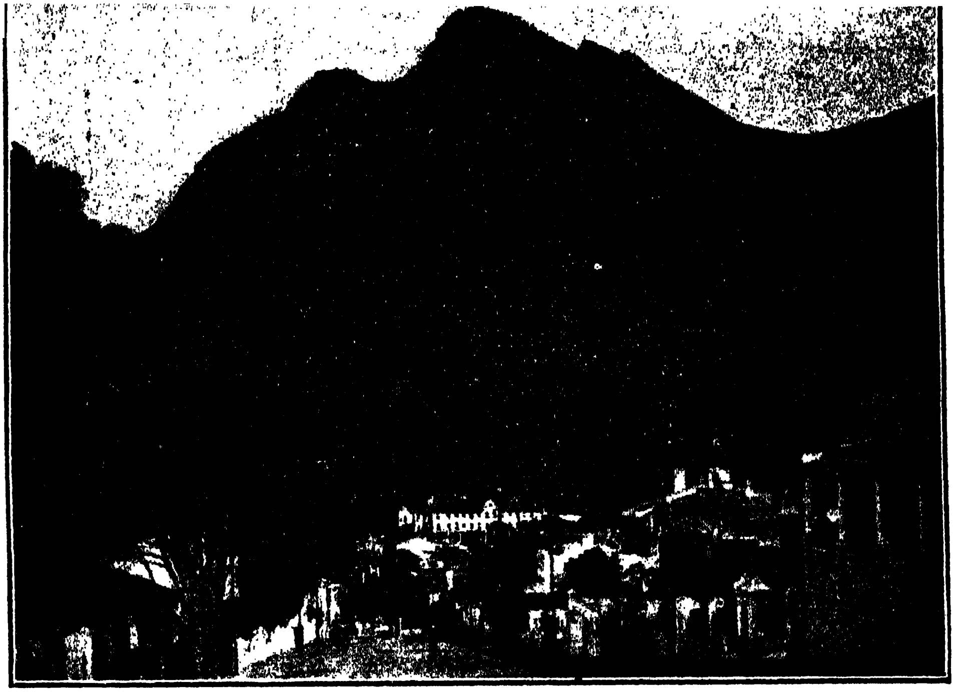


সিটিহল—ইষ্ট-লণ্ডন

কেপটাউন হইতে ১৯শে জানুয়ারী ১৯২৬ রওয়ানা হইয়া পরদিন পোর্ট এলিজাবেথে পৌছান হয়। সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়া ইষ্ট লণ্ডনে তিন দিন থাকা হয়। এত বড় দেশ, অথচ প্রত্যহ সকল জায়গার ট্রেণ নাই। সেই জন্য ইষ্টলণ্ডনে দুই দিনের জায়গায় তিন দিন থাকিয়া কেপটাউনে ফিরিবার জন্য ট্রেনে উঠিয়াছি। সমস্ত দিন ট্রেনে থাকিতে হইবে, পরদিন অপরাহ্নে কেপটাউনে পৌছিবার কথা। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে এত দীর্ঘ সময় লাগে, যে ভারতবর্ষে তাহা অসম্ভব মনে হয়। ডার্ব্বান হইতে জোহানেসবার্গ যাইতে

প্রায় ২১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। জোহানেসবার্গ হইতে প্রিটোরিয়া ও প্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ বেশী দূর নয়। প্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরিতে হইয়াছিল। জোহানেসবার্গ হইতে কিম্বার্লী ১২ ঘণ্টার পথ; কিম্বার্লী হইতে কেপটাউন, কেপটাউন হইতে পোর্ট এলিজাবেথ, পোর্ট এলিজাবেথ হইতে ইষ্ট লণ্ডন এবং ইষ্ট লণ্ডন হইতে পোর্ট এলিজাবেথেরপথে না ফিরিয়া স্থানীয় লোকের মধ্যে দলাদলি থাকিলেও সকল দলেই আমাদিগকে সমান যত্ন ও আদর করিয়াছে।

ইষ্টলণ্ডনে আতিথ্যের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। স্থানীয় ভারতবাসিগণ ও ইংরাজগণের মধ্যে এখানে যথেষ্ট আনুগত্য আছে; তাহার কারণ, Cape Colonyতে ভারতবাসিগণের ভোট আছে এবং ভোটের খাতিরে ইংরাজ ও ডচ্ তাহাদের মুখ চায়।



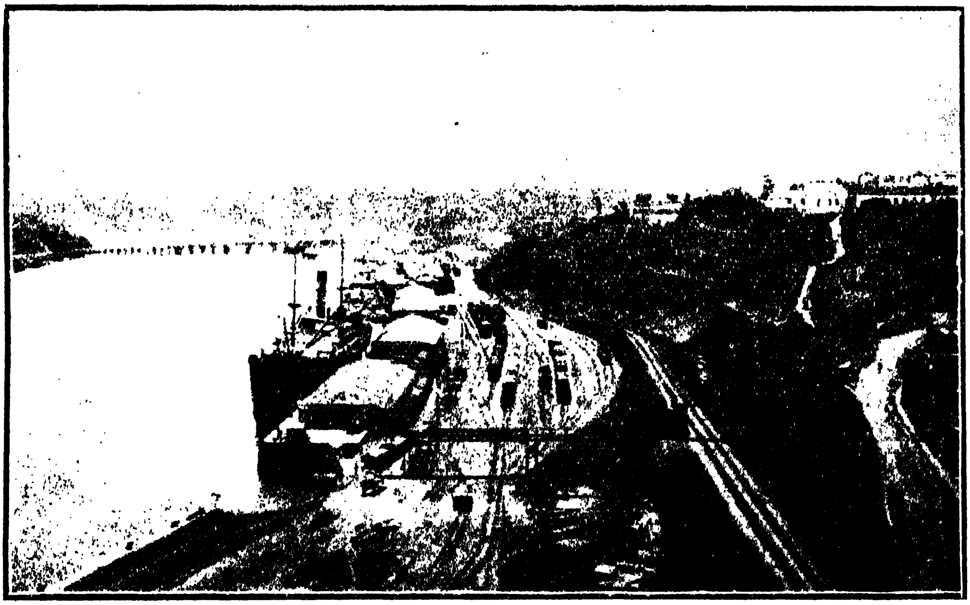
ডেভিল্‌স পীক, কেপটাউন

ব্লানি ষ্টরম্বার্গ, রোসনাড, ডেয়ার, কারু, অরচেস্টার পথে পুনরায় কেপটাউনে চলিয়াছি। সমস্ত Cape Colony Provinceটা এই বার চক্র দেওয়া হইতেছে। শুদ্ধ ট্রেণের গোলমালের জন্য ও সময় বাঁচাইবার জন্য 'টেকিশাল দিয়া কটক' যাওয়া হইতেছে। ভারতবাসীর যত্ন ও উৎসাহ তাহাদের দুঃখের কথা ভুলিয়াছে ও ভুলাইয়াছে।

ডার্ব্বান সহরে আমাদের জন্য মার্টিয়াম হোটেলে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ঘর স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে না গিয়া ভারতবাসীর ঘরে গিয়া উঠিয়াছিলাম। জোহানেসবার্গ সহরেও কার্‌ল্‌টন হোটেলে ঘর স্থির ছিল, তাহা অফিসরূপে ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর ঘরে ছিলাম। কিম্বার্লীতেও তাই। কেপটাউনে মুসলমান গুল্ সাহেবের

বাড়ী আমাদের বাসা এবং হিন্দু সিংহ সাহেবের বাড়ী মুসলমান রেজা আলির বাসা; পোর্ট এলিজাবেথে টিকম্‌দাশ সাহেবের বাড়ী আমাদের বাসা হইয়াছিল। ইষ্টলণ্ডনেও ভারতবাসীর বাড়ীতেই স্থাননির্দ্দেশ হইয়াছিল; কিন্তু ইষ্ট লণ্ডনের মেয়র ও সিটি কাউন্সিলার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, যে তাঁহাদের সহরের ইহাতে অপমান হইবে। তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন এবং ভারত-অল্প। ভারতবাসীর দুঃখের কারণ যে একেবারেই নাই তাহা নহে; কিন্তু নেটাল ও ট্রেন্সভালের মত নয়।

সকল স্থানেই অল্পবিস্তর বক্তৃতা করিতে হইতেছে; কিন্তু যে কাজের জন্য আমাদের আসা, সে বিষয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। অতএব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভারতবর্ষের ইতিকথা, ভারতবাসীর সাধারণ উপকার-সংক্রান্ত কথা লইয়াই বক্তৃতা করিতে হইতেছে; আমাদের মুখ বন্ধ বলিয়া সাধারণ



সমৃদ্ধিশালী ইষ্ট-লণ্ডনের একটী স্বাভাবিক বন্দর

প্রতিনিধিগণকে যথেষ্ট সম্মান ও আতিথ্য প্রদর্শন করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা। এইজন্য তাঁহারা সহরের ব্যয়ে ডিল হোটেল নামক বড় হোটেলে আমাদের বাসা স্থির করিয়া নিজেরা ষ্টেশনে থাকিয়া অভ্যর্থনা করেন এবং ফিরিবার দিন ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া যান। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কেপটাউনে ভারত-বাসীর প্রতি অত্যাচার ও অমর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত ভারতবাসীর মুখ ত বন্ধ নয়! জোহানেস-বার্গ, কেপটাউন প্রভৃতি স্থানে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট সভাসমিতির আয়োজন হইতেছে, সংবাদপত্রেও যথেষ্ট তীব্র আলোচনা চলিয়াছে; ভারতবর্ষে—বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় যে সকল সভাসমিতি হইতেছে, তাহার সংবাদও আসিতেছে; এণ্ড্রুজ সাহেব, প্রিটোরিয়ার বিশপ্ নেভিন প্রভৃতি সংবাদপত্রে

ভারতবাসীর অনুকূলে বিশেষ সহায়তাসূচক পত্র লিখিতেছেন।

কেপটাউন ও পোর্টএলিজাবেথে রোটারী ক্লাবের পক্ষ হইতে বিশেষ নিমন্ত্রণ হইয়াছে; ভোজের পর উভয় স্থানেই বক্তৃতা হইয়াছে। সকল স্থানেই Free Mason ও ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষগণের সহিত আলাপ হইয়াছে এবং তাঁহাদের সাহায্যে ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও হইয়াছে।

কেপটাউনের Board Casting Company'র নিমন্ত্রণে সত্তর হাজার দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীর নিকট ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা সে দিন করিয়াছি। কথাগুলো লোকের মন্দ লাগে নাই; "Cape Times" প্রভৃতি ভারতবিদ্বেষী কাগজেও তাহা বাহির হইয়াছে। যে সব ক্লাব ও হোটেলে ভারতবাসীর প্রবেশ অধিকার নাই, সেখানেও সাদর নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা হইয়াছে; কিন্তু হইলে কি হয়—আসল কথার কোন সুবিধাই হইতেছে না।

জ্বলন্ত মরুতুল্য "কারু" নামক মহাপ্রান্তরের মধ্যে দারুণ গ্রীষ্মে রেল দ্রুতগতিতে চলিয়াছে; ডাক ধরিতে হইবে বলিয়া নিশীথে চলন্ত গাড়ীতে যাহা হয় দুই চারি লাইন লিখিয়া পাঠাইতেছি। চক্ষে ও মনে কোন দৃষ্টি আসিতেছে না; কারণ দারুণ চিন্তায় মন নিতান্ত ভারাক্রান্ত।

ডার্বান যাইবার চেষ্টা এখন স্থগিত রাখিতে হইল। ডেপুটেশনের মেম্বরেরা মনে করেন, যে আমার এখন কেপটাউন ত্যাগ করা উচিত নয়। কখন কি খবর আসে, কখন কি ব্যবস্থা করিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত কি পত্র কিম্বা "তার" ব্যবহার করিতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই; অতএব সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া অবধি Rotary, Theosophy, Temperance, Free Masonry, University প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বহু লোকের সহিত আলাপপরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতেছে। বহুতর লোকের সহিত আলাপপরিচয়ের অবকাশ ইহাতে ঘটিতেছে এবং ভারতবাসীর স্বপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টার সহায়তা ইঁহাদের যথেষ্ট হইতেছে। ইঁহারা পূর্ব্বে দেখাই করিতেন না, কথাই কহিতেন না; এখন আকর্ষণ করিতেছেন এবং আকৃষ্ট হইতেছেন।

স্থানীয় পাব্লিক লাইব্রেরীর হলে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন; ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার ক্যারাদার্স বিটি (Sir Caruthers Beatte.) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুগ্ধ হইয়া বহু ইংরাজ এবং ডচ্ পুরুষ ও মহিলা বক্তৃতা শ্রবণ করেন। পূর্ব্বে এণ্ড্রুজ সাহেব ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও বক্তৃতা করিয়াছেন। এইরূপে ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া সংবাদপত্রে লিখিয়া ও রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া তিনি ভারতবাসীর যথেষ্ট উপকারের চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা এণ্ড্রুজ যথার্থ ভারতপ্রেমিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধী মহাত্মার ভক্তসেবক ও ভারতবন্ধু। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-নিগ্রহ নিবারণ জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন; কাগজে অক্লান্তভাবে লেখালেখি করিতেছেন, অপমান ও তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছেন; আততায়ীকে বুঝাইয়া স্ব-দলে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা ও নিভৃতে মন্ত্রণা ও আলোচনা করিতেছেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ সাল তাঁহার জন্মদিন—ছাপান্ন বৎসরে তিনি পড়িলেন। জন্মদিন উপলক্ষে

আমরা যে বাড়ীতে আছি, তাহার কর্ত্তা, গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা মিলিয়া জন্মোৎসবের আয়োজন করে। তাহাতে ডেপুটেশনের মেম্বর ও অন্যান্য লোককে আহ্বান করিয়া মিঃ এণ্ড্রুজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। নিখিলের হাত দিয়া আমি "Imitation of Chirist" নামক অপূর্ব্ব ভক্তি-রসাত্মক পুস্তক উপহার দিলাম ও ইংরাজীতে কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে "রাবণ গৃহে বিভীষণ ও কুরুগৃহে বিদুরের" সহিত তুলনা করিলাম। তিনি পরম আপ্যায়িত হইলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুবান্ধব অনেকে অন্যান্য উপহার প্রদান করিলেন।

এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুরোধ তাঁহার সহিত স্থানীয় Theosophical Societyতে দুই দিন গিয়াছিলাম এবং ভারতের পুরাতন কথা সম্বন্ধে দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছি। এ দেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ, যে একদিন নিখিলচন্দ্র কোন এক স্থানে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, তাহারা বিশ্বাস করিতেই চাহিল না, যে নিখিল ভারতবাসী এবং কোন্ দেশ হইতে সে আসিয়াছে তাহা জানিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিল। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ্'এর সহিত কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাদের সভাপতি পেডিসন সাহেবকে বলিয়াছেন, যে আমি ভারতবাসী,—এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না এবং আমার সামান্য লেখাপড়া যাহা হইয়াছে, তাহা বিলাতেই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। আমার কথাবার্ত্তার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যাথলোনকে তিনি জানাইয়াছেন। গভর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী আমাদের সভাপতিকে সে কথা বলেন।

এসব কথা শুনিতে ব্যক্তিগতভাবে মিষ্ট; কিন্তু কোথায় কাজে কি লাগিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। আর এই সকল ধারণা ও বিশ্বাস লইয়া যে সকল রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক নেতাগণ ভারতবাসী মাত্রকেই কুলী জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের নির্য্যাতনের ব্যবস্থা আইন সাহায্যে চেষ্টা করেন—তাহাদের কথা কি বলিব!

যেখানে যখন অবকাশ পাইতেছি, সকলকেই বলিতেছি, যে আমরা যেমন এখানে আসিয়া সকল বিষয়ে দেখাশুনা করিতেছি, সেইমত এখানকার কয়েকজন সদাশয় সাধু "আফ্রিকান" রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষে গিয়া স্বয়ং আমাদের অবস্থা দেখিয়া আসিলে এ অজ্ঞতা এবং নির্য্যাতন-স্পৃহা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিল পাশ হইয়া গেলে, আর তাহা হইবে না।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর বক্তৃতা উপলক্ষে Mahenjadaro, Nal, Haroppo প্রভৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক ফোটগ্রাফ সব দেখাইয়াছিলাম; সভা সে সকল ফটোগ্রাফ দেখিয়া ও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতসভ্যতার নিদর্শন পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে আইন লইয়া এখানে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। টেম্পারেন্স দলের অধিনায়ক মিঃ ব্ল্যাক্ওয়েল, রেভারেণ্ড মিঃ কুক প্রভৃতির সহিত বিস্তর কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সম্প্রতি মদ্যপান-নিষেধ আইন সম্বন্ধে সিটি হলে বিরাট্ সভা হইয়াছে; আমাকে সে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহার প্রধান সর্ত্ত হইতেছে, যে ডেপুটেশনের মেম্বারগণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনরূপ উত্তেজনার সাহায্য করিবে না। আমরা এই সর্ত্ত বিধিমত পালন করিতেছি;

তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পার্ল্যামেণ্টে ডাক্তার ম্যালান (Malan) আমাদের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং সংবাদপত্রেও সুখ্যাতি হইয়াছে। শুধু ভারত-নির্য্যাতন-আইনের বিরুদ্ধে নয়, এখানকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথাতেই আমরা এখন সংলিপ্ত হইতে পারি না ও চাহি না। সৌভাগ্যবশতঃ টেম্পারেন্স সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এ কথা বুঝিয়া আমায় অব্যাহতি দিয়াছেন; তবে ভারতবর্ষে মদ, আফিমের বিরুদ্ধে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করিয়া আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি নাই।

Unitarian Church সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে Rev. Balonforth একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে হিন্দুমতের ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মমতের সে ক্রমবিকাশের ফল কি, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।—তাহাতে আমি স্বীকৃত হইয়াছি।

ইউনিভারসিটীর পক্ষ হইতে প্রোফেসার ক্লার্ক প্রমুখ অধ্যাপকগণ ভারত সম্বন্ধে ব্যাখ্যানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। রাত্রে না হইলে ইঁহাদের সময় হয় না, আমিও নৈশপর্য্যটনে পরাঙ্মুখ—এইজন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের সম্যক্ সংঘটন হইয়া উঠিতেছে না; বিশেষতঃ ডেপুটেশনের পক্ষ হইতে যে সকল তদ্বির তাগাদা প্রয়োজন হইতেছে, তাহাতেই সময় অনেক যাইতেছে। সময় করিয়া এ সকল লোকের আহ্বান যেমন করিয়া হউক রক্ষা করিতেই হইবে।

ডেপুটেশনের কাজের সামান্য সুরাহা হইয়াছে, আমারও কাজ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে; সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছে, বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তাহার কারণ, ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বরের গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সহিত গুরুতর মতভেদ। আমার মত-পার্থক্য যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত হইবার পর যাহা স্থির হইয়াছে, তাহা শিরোধার্য্য ও প্রাণপণে অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার মতের মত কোন কাজ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল না বলিয়া, সে কাজে তিলমাত্র ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য আমার দ্বারা সম্ভব নহে; বরং এই মতপার্থক্যবশতঃই অধিকতর পরিশ্রম করিয়া কাজের সুরাহা চেষ্টা কর্ত্তব্য। রাজপ্রতিনিধির প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সে বিষয়ে পত্র লিখিলাম।

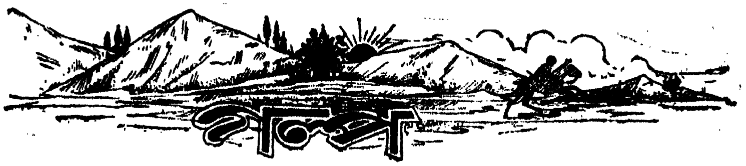
যতদূর বোঝা যাইতেছে, আমাদিগকে আরও পাঁচ সপ্তাহ এখানে থাকিতে হইবে। কয়েকদিন সামান্য মেঘলা ও বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডা আনিয়াছে। ফল ফুলের প্রাচুর্য্য ও উৎকর্ষ তাহাতে বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা। বেড়াইতে যাইবার বিশেষ অবকাশ পাওয়া যায় না; সামান্য বৃষ্টি হইয়া প্রাকৃতিক শোভার উৎকর্ষ জন্মিতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সব 'তার' আসিতেছে তাহাতে বোঝা যায়, যে গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যে সম্মত, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষে জনপ্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ হইয়া কার্য্য স্থির হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল জননায়ক স্থানীয় নায়কগণকে তারযোগে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে বারণ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ডেপুটেশনকে সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা নিষেধ করেন না; বরং ডেপুটেশনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ায়াছেন, অথচ নিজেরা সাক্ষ্য দিতে অসম্মত—এ মতবৈচিত্র্যের কারণ কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে ডেপুটেশনের বলহানি ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মতদ্বৈধ সত্ত্বেও

আমি ডেপুটেশনের কার্য্য দ্বিগুণ পরিশ্রমের সহিত করিতে প্রস্তুতও হইতেছি, অথচ যে সকল জননায়কের সম্মতিক্রমে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মত করিলেন, তাঁহারা স্থানীয় জনসাধারণকে এরূপ উপদেশ দিলেন কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে ও মতপ্রকাশ করিতে হয়। বিলের জন্য যিনি বিশেষ দায়ী, সেই ডাক্তার ম্যালন তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতায় ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে প্রসংশা করিয়াছেন যে সকল সংবাদপত্র ভারতববাসিগণের বিশেষ বিরোধী, যথা:—"Cape Times" "Cape Argos", "Johannesburg Star" "Johannesburg Rand Mail", "Natal Observer" প্রভৃতিও ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে এ বিষয়ে প্রসংশা করিয়াছেন।

দুই তিন দিন ধরিয়া মুসলমানগণের মধ্যে এখানে খুব সমারোহ উৎসাহ চলিয়াছে। London-এর নিকট Woking নামক স্থানে মুসলমানদিগের যে মসজিদ ও বিদ্যালয় আছে, সেই স্থানের মৌলভী খাজা কামালুদ্দীন ও হাজি ফারুক Lord Headley নামে একজন ইংরাজ লাটকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। লাট সাহেব মক্কা তীর্থ করিয়া হাজি হইয়াছেন; লোক-তিরস্কার গ্রাহ্য করেন নাই। ধর্ম্মমতের বিভিন্নতাবশতঃ তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে আদালতের সাহায্য লইয়া ডাইভোর্স করিয়াছেন। Lord Headley ও হাজি কামালুদ্দিন (Kamaluddin) স্থানীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। গত সোমবার তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ৭নং Beuten scyngle, হাজি গুলের বাড়ীতে আমরা আছি। তাঁহারাও সেই বাড়ীতে উঠিয়াছেন। বাড়ীর কর্ত্তা, গৃহিণী, কন্যাগণ ও কর্ত্তার পুত্র Dr. Gool সমগ্র কেপের মুসলমানের তরফ হইতে আথিত্য-সৎকারে ব্যস্ত। মিঃ গোখলে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ রুস্তমজী অব্ ডার্ব্বান, মিঃ এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক - যাঁহারাই কেপটাউনে আসেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের আথিত্যলাভে সুখী হন। আপাততঃ মিঃ এণ্ড্রুজ যেখানে রহিয়াছেন, নিখিল ও আমি সেখানে রহিয়াছি; তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরোধে গুল পরিবার লর্ড হেড্লী ও খাজা কামালুদ্দীনকে তাঁহাদের গৃহে আহ্বান করিয়াছেন; নিজেদের শুইবার ঘর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। দিবারাত্র অতিথিসেবায় তাঁহারা সপরিবারে প্রাণপণ করিতেছেন। ডাক্তার গুল সস্ত্রীক বাড়ীতে থাকেন, আমাদের সেক্রেটারী মিঃ জি, এস, বাজপাই তাঁহারই পুত্রের বাড়ীতে আছেন। হাজী গুল সাহেব তাঁহার অপর স্ত্রী (ভারতবর্ষে বিবাহিত) লইয়া অন্য বাটীতে থাকেন, প্রায়ই আমাদের সহিত রাত্রে আহারাদি করেন ও কোন কোন দিন এই বাটীতে রাত্রিযাপন করেন। গৃহিণী যেমন পরিশ্রমী তেমনি সুগৃহিণী, তেমনি সদালাপী। তাঁহার পিতামাতা Cape Malaya সম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁহার ভগিনী ও ভগিনী-কন্যা ও পুত্রগণও Cape Malaya সম্প্রদায়ভুক্ত। ডাক্তার গুলও সংসারপালনে সাহায্য করেন। বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা কন্যাগণ দিবারাত্র সাহায্য করিতেছে। পড়াশুনা নাচ গানে যেমন দক্ষ, গৃহকার্য্যেও তেমনি; সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহকার্য্য ও উদ্যানকার্য্য দিবারাত্র করিতে তাঁহারা লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন; ধর্ম্মচর্চ্চাও সকলেই বিশেষভাবে করেন। (ক্রমশঃ)



নারী-প্রগতি

—:০:—

— ৮ —

সুধীর ভাবিতেছিল, বিন্দুর একটা ব্যবস্থা হইলে সে মাথা হইতে এই অনাবশ্যক বোঝাটা নামাইয়া নিষ্কৃতি পায়। আশ্রম হইতে সে একাই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বিন্দুর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সে যখন কারামুক্তির দিনে তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তখন বিন্দুর উচিত ছিল, পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আহ্বান উপেক্ষা করা; কিন্তু সে তাহা করে নাই, সুধীরের আশ্রয় অবাধেই গ্রহণ করিয়াছিল। কেন যে সে তাহাকে আশ্রয় দিতে চায়, বিন্দু কি ইহা বুঝে নাই! জগতে নিরাশ্রয়ার তো অভাব নাই—সুধীর কেন বাছিয়া বাছিয়া বিন্দুকেই মাথায় তুলিয়া লইবে! বিন্দু সুধীরের হৃদয়ের দাবী জানে, এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে সে তাহা পূরণ করিতে নিশ্চয় প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ কেন সে বিমুখ হইল, তাহার খেই খুঁজিয়া পায় না। এই কয় মাসে ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে সে নিরাশ হইয়াই পড়িয়াছিল; সে যেন আজ অব্যাহতিই চাহিতেছিল।

আজ আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে। রবিবার স্কুল যাওয়া নাই; ছুটীর দিনেই যন্ত্রণা অধিক পাইতে হয়। সারাদিন দুইজনে মুখ বুজিয়া এক ঘরে বাস করা কি যে দুর্ব্বিসহ দুঃখ, তাহা সুধীর ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। বিন্দুও কি ইহাতে সুখী হইয়াছে! সে তবু বাহিরে বেড়াইয়া আসে, স্কুলের কাজে সময় অতিবাহিত করে, কত লোকের সহিত আলাপ করে; ঘরের দম-বন্ধ-হওয়া বিষণ্ণ হাওয়ায় সে যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন ছুটিয়া বাহির হইতে পারে। বিন্দু মলিন মুখে দিনের পর দিন এই যে যন্ত্রের মত জীবনযাপন করিয়া চলে, তাহার তলে তলে কি মর্ম্মান্তিক ব্যথার প্রবাহই না বহিয়া যায়! কেন এই দুঃখ-ভোগ! সুধীর স্থির করিল—ভুল অনেক হয়, সে ভুলকে সত্য করার জিদ্‌ দু'জনেরই মরণতুল্য হইয়া দাঁড়ায়; মনুষ্যত্বের জন্যও সে ইহার প্রতিকার করিবে। সুধীরের হৃদয়ে যে ক্ষত হইয়াছে, তাহা আর শুখাইবে না; সে এই অন্তর্দাহে মরণকেই আলিঙ্গন দিবে—কিন্তু তাহার জন্য একজন অবলাকে দগ্ধ করা কেন? বিন্দুকে সে মুক্তি দিবে। কিন্তু মুক্তি দিতে চাহিলেই যে আজ তাহা সহজ, তাহাও নহে। বিন্দু যদি স্বেচ্ছায় কোথাও চলিয়া যায়, সুধীরের অন্তরে আজীবন বৃশ্চিক-জ্বালার দংশন নিরস্ত হইবে না; তবুও তাহাতে নুনের ছিটা আর পড়িবে না—এই সোয়াস্তিটুকুও তো পাওয়া যাইবে! কিন্তু বিন্দুর সে দিকে আদৌ চিন্তা নাই; সে সুধীরের আহ্বানে সেই যে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, তারপর তাহার বুক জুড়িয়া বসিয়াছে, সেখান হইতে আর নড়িতে চাহে না। অথচ সুধীরের যে অন্তরের দাবী সেখানে তার নিষ্ঠুর মাথা নাড়া—উঃ, এ কি ভীষণ অত্যাচার!

পথ নাই। এ সমস্যার মীমাংসা জীবনে আর আর সম্ভব নয়। একবার মনে হয়, স্কুল হইতে

ফিরিবার এই যে চিহ্নিত পথটুকু, তাহা যদি কেহ মুছিয়া তাহাকে অন্য পথে লইয়া যায়, সে যেন নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু কেহ এ সাহায্য করিতে আগায় না। পণ্ডিত মহাশয় মুখ ভারী করিয়া থাকেন; বোধহয় তিনি নস্যের ডিবা হইতে অন্যকে নস্য দিবার ছলে ঐ পুরাতন আম গাছের তলে দাঁড়াইয়া অন্যান্য শিক্ষকদের সহিত তার সম্বন্ধেই কথা কহিতেছে; ঐ যে কেহ কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে, ইহা তাহাদের কৌতূহলদৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়—যে সম্মান, শ্রদ্ধা প্রধান শিক্ষক বলিয়া ছিল, তাহার যেন লাঘব হইয়াছে। চাকুরী ছাড়িয়া দিলে স্বভাবতঃ অবস্থাটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, দেখিলে হয় নাকি! ভাবনার কথা সমুদ্রের অপেক্ষা বিশাল গভীর, এই অন্তহীন ভাবনার ছেদ নাই। সে আজ কিন্তু ইহাই স্থির করিল—বিন্দুর একটা ব্যবস্থা হউক, তাহা হইলেই সে মুক্তি পায়। আসলে ভগবান টগবান বস্তুটার উপর তার তেমন বিশ্বাস না থাকিলেও, কাকাবাবুর কড়া নিয়মে তাহাকে নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় উপাসনার ঘরে চক্ষু বুজিয়া বসিতে হইত৷ সেদিন ছিল তাগিদের দায়—ভিতরটা বিপ্লবী হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু দিবারাত্রির মধ্যে একটী মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ তাহাকে এ বিষয়ে মন দিতে বলে না; তবুও বার বার মনে হয়, আপনা হইতেই এমন একটা দুর্ব্বলতা সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলে, মর্ম্মে মর্ম্মে প্রার্থনার বাণীই গুমরিয়া উঠে; কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, তাই সব বলাটা যেন সেই অলক্ষ্য অবস্তর নির্দ্দেশে বাধ্য হইয়াই বাহির হয়—"হে ভগবান্, আমায় রক্ষা কর।"

এই দুর্ব্বলতার ভিতর কি শক্তি আছে সে জানে না। দুঃখের বোঝাটা যখনই তাহাকে বড় পীড়িত করিয়া তুলে, তখনই তার অন্তরের ছিন্ন তারে ঝঙ্কার দিয়া ভাঙ্গা সুরে এই কথাটাই বার বার বাজিয়া উঠে, আর তখনই যে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার চক্ষের কোণ ঠেলিয়া গণ্ডে গড়াইয়া পড়ে, তাহাই যেন অন্তরের ক্লেদ বাহির করিয়া দেয়, চক্ষে দীপ্তি, অন্তরে শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভাবিতে ভাবিতে আজও তাহার সেই দুর্দ্দশাই ঘটিল; কিন্তু অশ্রুমালা শুখাইবার পূর্ব্বেই বিন্দু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সুধীর সজলনয়নে চাহিল; সে চাহনীর দাবী বিন্দু বোধহয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে নীরবে তাহার পাশে বসিয়া অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছাইয়া, তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

নারীর অস্ত্রই শুধু অশ্রু নয়, নারীকে জয় করারও বোধহয় ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। সুধীরের চক্ষে এবার আশার প্রবাহ অনর্গল ছুটিয়া বাহির হইল। বিন্দু অধীর হইয়া বলিল—"ছিঃ, কাঁদ কেন, চুপ কর—বল, তুমি কি চাও!"

ীর স্তম্ভিত; হিয়ায় কিন্তু দুন্দুভি ধ্বনি খুব জোরে জোরেই বাজিয়া উঠিল। সে চাহিল—হৃদয় নিঙড়াইয়া চাহিল—ভাষায় যাহা সম্ভব নয়, নয়নের চাহনি চাহিয়া চাহিয়া অনিমেষ হইল; বিন্দুর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল—আজ বুঝি তার পরাজয়ের দিন!

সে সুধীরের এই নীরব অস্ত্রাঘাত হৃদয় পাতিয়া লইল; প্রথম আঘাতে সে বিহ্বল হইয়াছিল, তারপর আঘাত সহিয়া গেল, প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"এক কাজ কর, আমায় না হয় পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী দিয়ে এসো, একমুঠা ভাত দিবার সাধ্য তাঁর আছে; আমার ইচ্ছা, তাঁর কাছে কিছু শাস্ত্র পড়ি। কি বল—তুমিও নিষ্কৃতি পাও!"

সুধীর ভাবিয়া ভাবিয়া কুলহারা হইয়াছিল। বিন্দুকে কোথায় রাখিয়া সে অব্যাহতি পাইতে পারে, সেই চিন্তাই ছিল আজিকার মূল সুর। তারপর অকস্মাৎ বিন্দুর স্পর্শে তার হৃদয়যন্ত্র সুরহারা পাগল রাগ আলাপ করিতেছিল। সে এত ভাবিয়া যে পথের সন্ধান পায় নাই, বিন্দুর কথায় তাহা খুব সহজ ও অনায়াসসাধ্য মনে হইল। আপত্তি কি, পণ্ডিত মহাশয় রাজী হইবেন কি— মনে এই চিন্তা হইল; কিন্তু ভাষায় বাহির হইল অন্য কথা—কেন এমন হয়!

"বিন্দু, আমায় আর যন্ত্রণা দিও না। ক্ষতে নুনের ছিটা দিয়া তোমার কি সুখ হয় বল তো!" —এই বলিয়া আবেগে বিন্দুর হাতখানা টানিয়া তার উলঙ্গ বুকের উপর স্থাপন করিল।

বিন্দু নিথর, পাথরপ্রতিমা!

সুধীরের নয়নে অবিরল ধারা; বিন্দু ধীরে ধীরে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল—"কেঁদো না, তুমি জান না, নারীর হৃদয় শুধু আপনার জনের ক্রন্দন দেখ্‌লে আকুল হয় না, বিশ্বের ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে' উঠে; এই অশ্রু আমায় তোমার কাছে এনেছে, এই অশ্রু মুছাবার কাজ দিয়ে আমায় কি কাছে রাখ্‌তে চাও—ছিঃ, কেঁদো না!"

সুধীরের নয়নবারি বারণ মানিতেছিল না।

সুধীর আবার একটানা চিন্তার মাঝে যে ছেদ পড়িয়াছিল তাহা জোড়াতাড়া দিয়া গোড়ার কথাটা বলার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্পষ্ট হইল না।

"বিন্দু, তুমি যেতে চাও যেয়ো, ধরে' রাখা যায় না, সে আমি বুঝেছি, কিন্তু—"

আবার কান্না।

বিন্দু একটু সরিয়া বসিল।

চক্ষের জল আপনা হইতেই বন্ধ হইল।

এইবার বিন্দু বলিল—"আমার কথার উত্তর দিলে না!"

সুধীর আত্মস্থ হইয়া বলিল—"পণ্ডিত মহাশয় যদি রাজী না হন। জান তো তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু!"

বিন্দু—"গৃহস্থ সংসারে লোক যে দাসী রাখে, বাঁদী রাখে, তাদের চেয়েও কি আমি হীন, নীচ?"

সুধীর এই কথার কোন উত্তর দিল না।

বিন্দু বলিল—"পণ্ডিত মহাশয়ের কথা ছেড়ে দিই। তুমি কি মনে কর?"

সুধীর—"রাগ করো' না, তুমি নারী, আশ্রয়হীনা; জীবনের উপর দিয়ে একটা অতিবড় দুর্ঘটনা বয়ে' গেছে, আমি তোমায় ছোট চক্ষে দেখি না তাই বলে'—"

বিন্দু গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—"সে তোমার দয়া, পতিতার প্রতি অসাধারণ মমতা—তাই ব'লে লোকের কাছে আমি স্থান পাবো কেন, এই না তোমার কথা!"

সুধীর বলিয়া ফেলিল—"হাঁ"।

বিন্দু আর কোন কথা বলিল না, হঠাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

এই ঘটনার পর আবার দুইজনের মধ্যে কয়েক দিন কথা বন্ধ রহিল। কথার প্রয়োজন হয় না; বিন্দু সংসারের যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই এমন ভাবে গুছাইয়া রাখে, যাহার উপর সুধীরকে একটীও কথা কহিতে হয় না। সংসারটা যেন যন্ত্রের ন্যায় নিয়মবদ্ধ। আহার নিদ্রার ব্যবস্থার মধ্যে এমন গুরুতর ব্যাপার কিছু নাই, যাহা লইয়া কথা চলিতে পারে; দুই একটা 'হাঁ' 'না'ই যথেষ্ট। সুধীর ছুঁতা-নাতা ধরিয়া বিন্দুর সহিত সংসার সম্বন্ধে অনেক কথার অবতারণা করিত; কিন্তু এই দুইটা লোকের

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে ব্যবস্থা, তাহা এমনই সহজ, যাহা লইয়া ক্রমেই সে দেখিল, কথাটা বিড়ম্বনা মাত্র; কেননা, সুধীর হাঁ করিতেই বিন্দু বুঝিয়া লয়, কি করিতে হইবে; সে এক বিন্দু হাসিয়া তাহা এমন কৌশলে সম্পন্ন করে, যাহার উপর কথা চলে না। সুধীর সোজাসুজি মনের ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়াও যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্যটা ঘুরাইয়া আদায় করাও যে এই ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য, তাহা বুঝিয়া হতাশ হইয়াছিল। নৈরাশ্যের যে মাত্রা তাহারও একটা সীমা আছে, সুধীর তাহা একপ্রকার অতিক্রম করার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; পণ্ডিতজীর কথাটা যদি এবার উঠে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া বিন্দুর নিকট হইতে বিদায় লইবে, ইহাই স্থির করিয়াছে। কিন্তু সে অবসর এই কয়দিনের মধ্যে আর পাওয়া যায় নাই; থমথমে আকাশের মত ক্ষুদ্র সংসারটা খুবই ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

স্কুলে যে সময়টুকু পূর্ব্বে একপ্রকার সুখের ছিল, এখন তাহাও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত-মহাশয়ের সহিত একপ্রকার কথাই বন্ধ, অন্যান্য শিক্ষকেরা তাহার সহিত ভাল করিয়া যেন মিশিতে চাহে না; একান্ত স্কুল পরিচালনের জন্য যে সম্পর্কটুকু না রাখিলে নয়, তাহাই তাহারা রাখিয়া চলে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার স্বভাব চরিত্র লইয়া নাকি একখানি দরখাস্তও পড়িয়াছে! সে তাহার জন্য এক বিন্দুও বিচলিত নয়; বরং এইদিক্ হইতে যদি তাহার এই চাকুরীটুকু খসিয়া যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সমস্যার একপ্রকার মীমাংসার পথ হয়তো পাওয়া যাইবে; অন্ততঃ বিন্দুর সহিত এই নূতন ঘটনা লইয়া অনেকখানি আলাপের সুযোগ হইবে। সে বহুবার আলাপ করিতে গিয়া নিজের বুদ্ধি ও ধৈর্য্যহীন চিত্তের দোষে সমাধানের সুযোগ হারাইয়াছে, আর একবার চাকুরী যাওয়া-রূপ একটা বড় ঘটনা উপলক্ষে আলোচনার সুবিধা হইলে সে পর পর কি কথা বলিবে, তাহা মনে মনে গাঁথিয়া তুলিয়াছিল।

সে দিন স্কুলে আসিয়া সুধীর সেক্রেটারী মহাশয়ের একখানি পত্র পাইল; তাহাতে সুধীরকে সেক্রেটারী মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ ছিল। সুধীর বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহারই বিচার হইবে এবং সম্ভবতঃ পদত্যাগের তাগিদ দেওয়া হইবে। সে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল; স্কুলের ছুটী হইলে সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল।

সেক্রেটারী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে সুধীরকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া স্কুল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধীর বুঝিল, এইগুলি আসল কথা নহে, মূল প্রসঙ্গের গৌড়চন্দ্রিকা মাত্র; সে যথারীতি উত্তর দিল, তারপর উভয়েই কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া সেক্রেটারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুধীরবাবু, একটা অপ্রিয় প্রশ্ন আছে।"

সুধীর মুখখানা কাল করিয়া বলিল—"বলুন, প্রশ্ন থাক্‌লে তার উত্তরও আছে।"

সেক্রেটারী—"আপনার পরিচয়পত্র যথার্থ নহে।"

সুধীর—"না।"

সেক্রেটারী সোজা উত্তর পাইয়া বলিলেন—"কেন বলুন দেখি, আপনি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তবুও প্রতারণা করলেন!"

সুধীর—"তার উত্তর আপনি আগেই পেয়েছেন, আমায় ডাকাও তারই জন্য; এখন এই অপরাধের যে দণ্ডবিধান করবেন, তা' মাথা পেতেই নেব।"

সেক্রেটারী—"কি বলেন আপনি! দণ্ড দেবার মালিক আমি নই, বড় জোর আপনাকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে চাকুরী থেকে সরিয়ে দিতে পারি।

আপনি শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি, আবার চাকুরী যোগাড় করে' নেবেন—সে আর শাস্তি কি বলুন! কিন্তু ব্যাপার জান্‌বার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, অথচ জোর করে' আপনাকে সব কথা খুলে বলার অনুযোগ করি, এ অধিকারও নেই—বুঝছেন আমার কথা!"

সুধীর হাসিয়া বলিল—"সদাশয় ব্যক্তি আপনি, আমার এই জীবন-সমস্যার কথা জেনে আপনার লাভ কি!"

সেক্রেটারী—"আমি আশ্চর্য্য হই, এমন গর্হিত কাজ এমন শিক্ষিত, সুন্দর লোকের পক্ষে সম্ভব কেমন করে' হয়! সেই 'সাইকলজি'টা বুঝ্‌তে চাই।"

সুধীর ঘাড় তুলিয়া বলিল—"ব্যাপারটা একটু তির্য্যক, কিন্তু গর্হিত বল্‌ছেন কেন!"

সেক্রেটারী—"গর্হিত বৈকি! শুন্‌ছি আপনি একজন বিধবাকে নিয়ে আছেন, অথচ বিবাহ করেন নি; এর চেয়ে অপরাধ সমাজের চক্ষে আর কি হ'তে পারে সুধীর বাবু!"

সুধীরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"আমি সমাজ ছেড়েই আছি। বিধবার বিবাহ আর সমাজে অচল নয় তা আপনি জানেন, একদিন কিন্তু ইহা অচলই ছিল; তেমনি বিবাহ না ক'রেও থাকা যদি সমাজ সয়ে' নেয়, আমার মনে হয়, কাজটা এত বড় গর্হিত বলে' যে আপনাদের মনের সংস্কার, তা' মুছে যাবে। বিধবার গতি হওয়ায় সমাজের কল্যাণই হয়েছে; এই ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না।"

সেক্রেটারী মহাশয় প্রবীণ নন, অর্ব্বাচীন যুগের নবীন, শিক্ষিত; কিন্তু তবুও তিনি কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বলেন কি, আপনারা দেখ্‌ছি সাংঘাতিক সংস্কারক, সমাজের কল্যাণটাকে একেবারেই উল্টে দেখতে চান্; কিন্তু এ বিপ্লবে আমরা যে একেবারেই অকূলে ভাসবো—দেশ গেছে, তবুও সমাজবিধান আমাদের একত্র সংহত রেখেছে, তা' যদি ভাসে, একেবারে যে ছন্নছাড়া হবো!"

সুধীর—"দেশ যাদের নিয়ে, তাদের যদি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে চিরযুগ কণ্ঠাগত প্রাণ করে রাখেন, তবে সে বাঁধনও ঘুচ্‌বে; দেশ নিয়েই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হবে না, সমাজও ভাঙ্‌বে। কল্যাণ-বস্তুটা মানুষের অন্তরের তৃপ্তি নিয়ে; আজ সে তৃপ্তি কারু চক্ষে আগুনের মত ছিট্‌কে বাহির হয় কৈ? সব যে অন্তরমরা হয়ে চলেছে—কেমন পরিতোষ-বাবু, একথা কি সত্য নয়!"

সেক্রেটারী মহাশয়ের নাম পরিতোষ বন্দ্যো-পাধ্যায়। তিনি উৎসাহ সহকারে বলিলেন—"তার কারণ এই সব উদ্ভট বস্তু নয়; সে কথা পরে হবে। আপনাকে বড় অদ্ভুত লোক বলে' মনে হচ্ছে; আপনি সমাজের যে কি অমঙ্গল করতে বসেছেন তা' নিজে না বুঝ্‌লে আমার বুঝাবার সাধ্য নাই—এ ভুল একদিন ভাঙ্‌বেই!"

সুধীর—"ভাঙার ভয়ে হৃদয় যদি মুষ্‌ড়ে পড়ে, তবে গড়্‌বে কে? তাজা বুক না হলে' কল্যাণই বা কোথায় ভর ক'রে দাঁড়াবে, তাও তো বুঝি না! সেই হৃদয়ের সন্ধানে যদি সমাজ ভেঙেই পড়ে, সেটা আবার নূতন করে'ই গড়ে' উঠবে; জাতি দেশ যদি গিয়ে থাকে, সমাজও যাবে—তাতে ভয় কি? দেশ গেছে বলে' আজ আমাদের ব্যথা কৈ? ঘটনা পুরাতন—স'য়ে গেছে; এটাও স'য়ে যাবে। দেশ যদি আবার ফিরে, সমাজও ফিরবে—দুই-ই অন্য রূপ নিয়ে। যে মানুষ ম'রে, সে যদি সত্যই আবার ফিরে আসে, পূর্ব্ব রূপ সে আর ফিরে পায় না।"

পরিতোষবাবুর চক্ষু স্থির হইল; তাঁহার মুখে কথা বাহির হইল না। এরূপ যুক্তির উপর সাবেকী কথাগুলি যেন শক্তিহীন বলিয়া মনে হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সুধীরবাবুকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় দিবেন; কিন্তু আজই সেটা যদি ঘটাইয়া তুলেন—হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ তাহা যেন রুদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি সুধীরবাবুর মুখ হইতে এইরূপ নির্ভীক উত্তরের প্রত্যাশা করেন নাই; কাজেই উত্তরটা ভাবিয়া দিতে হইবে—এইজন্য চেয়ার ছাড়িয়া বলিলেন, "আজ আসুন, আপনাকেও অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌লুম, মনে কিছু কর্‌বেন না।"

সুধীর নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার চাকুরী যাওয়ার কথাটা যেন চাপা পড়িয়া গেল। ঘটনাটা কেবল কথার সমষ্টি—ইহা লইয়া বিন্দুর সহিত বুঝাপড়া করার আলাপের সুযোগ হইবে কি! সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না, এতগুলি কথা কেমন করিয়া বাহির হইল! অন্তরে চিন্তা-স্রোতঃ কোন্ দিকে বহে, আর রসনায় কি কথা উচ্চারিত হয়, তাহার ঠিকানা নাই; সব যেন বেসুরা—এ-জীবনটা স্থির হয় কোন্ কৌশলে! ভাবিতে ভাবিতে সে বাসার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

* * *

অন্যদিন ফিরিতে বিলম্ব হইলে সুদর্শন বাসার দোরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে, আজ তাহার অন্যথা হইয়াছে। সুদর্শন নাই, দরজাও ভিতর হইতে বন্ধ। একবার সে ছাদের দিকে চাহিল, তাহার মনে পড়িল, সেই বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ফিরিবার পথে, তাঁহার পত্নী ছাদে কি উৎকণ্ঠার সহিত বসিয়াছিল পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষায়। সে সৌভাগ্য তাহার নহে। পরিতোষবাবুর সহিত এত যে কথা, তাহার মূল কোথা! শূন্য হইতে যে ভাব ভাসিয়া আসে, হৃদয়খানা শূন্য বলিয়া সবই আসিয়া তাহা পূর্ণ করে; কিন্তু তাহাতে সোয়াস্তি কোথা! কেবল বাহিরের বাজে জিনিষে ভারী হইয়া থাকা। তাহার অপূর্ণ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এ-জীবনে বুঝি মূর্ত্তি পাইবে না!

একান্ত নিরাশ হইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এরূপ একদিনও হয় না; কাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে—সুদর্শন! সে আহাম্মুখ দোর বন্ধ করিয়া করে কি? বিন্দু উদাসীন হইয়া হয় রুমাল সেলাই করিতেছে, নয় তো টিয়া পাখীটার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে; রাত্রি কাবার করিয়া আসিলেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই—সুধীরের এ বোঝা বহিবার প্রয়োজন কি!

এই ভাবনাই বার বার আসে—একই প্রশ্ন, তার একই উত্তর; কিন্তু একেবারেই অকেজো! যে বাঁধন গলায় জড়াইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাকৃত হইলে আবার তো ইচ্ছা করিলে খুলিয়া ফেলা যায়; কিন্তু তাহার উপায় যখন নাই, বলীবর্দ্দের মত এ বোঝা লইয়াই জীবন শেষ করিতে হইবে। কতক্ষণ সে দাঁড়াইবে! ভিতরে যে মানুষটা বসিয়া আছে, সে বাহিরের মানুষটার খোঁজ লইবে, এ আশা দুরাশারই নামান্তর। সে কপাটের শিকল ধরিয়া একান্ত অবহেলার সহিত ঝুন্ ঝুন্ করিয়া নাড়া দিল।

ভিতর হইতে বীণাধ্বনির চেয়েও সুমধুর আওয়াজ আসিল—"যাই!"

কথা এই একটী; কিন্তু সপ্তসুরের মূর্চ্ছনা বুঝি হার মানে! একটী রেখায় রঙের রামধনুর মত এই "যাই" কথাটী তার সবখানিকে পুলকিত করিল; শব্দের তরঙ্গ শুধু যে শ্রুতিকে আরাম দেয় তা' নয়, সে ঝঙ্কার তুলিয়া আলোকের

ঝরণা সৃষ্টি করে। সে রূপ তো এ চক্ষে দেখা যায় না। সুধীরের অন্তঃপুর ও শ্রুতি দুইই এই শব্দসমুদ্রে ডুব দিয়া ধন্য হইল। দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যে মানস-প্রতিমার ধ্যানে সে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দুয়ার মুক্ত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সে একেবারে বিভোর হইয়া পড়িল —একি রূপ!

এমন তো কোনদিন হয় না! হাস্যাননা ব্রীড়াবতী দুয়ার খুলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। যে রূপের ঢেউ খেলিয়া গেল, তাহাতে আজ তার বাসাবাড়ীখানি জয়শ্রীতে ভরিয়া উঠিল; মনের উপর যে প্রাবৃটের ঘন মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, দখিণার দমকা বাতাসে উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চিত্তখানি নির্ম্মল ভাস্বর হইয়া উঠিল। সে দেখিল কি?

একখানি খাটো কাপড়ে যথাসাধ্য লজ্জা রক্ষা করিয়া বিন্দু ছুটিয়া পলাইল। রমণীর রূপ পরিচ্ছদে কত যে অস্পষ্ট হইয়া থাকে, আজ সে তাহা প্রত্যক্ষ করিল। আজ সে বুঝিল—শ্বেতাঙ্গ রমণীরা কেন গাউন ছাড়িয়া স্কার্টে অধিক অনুরাগী। যে ফুল ফুটিয়া বিশ্বের শোভা বর্দ্ধন করে না, সে ফুলের জন্মই বৃথা। রমণীর সৌন্দর্য্যই তো উপভোগ্য, জগতের ঐশ্বর্য্য। সে এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ রূপের ধ্যান করিতে করিতে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সুদর্শন কোথা! তাহার মনে হইল, সুদর্শন আজ কাজ কামাই করে নাই তো! হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"সুদর্শন!"

এবার সঙ্গীতের স্রোতঃ বহিয়া গেল। —"সে মরেছে, ব্যাটা ভূত! তুমি কাপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে, বারান্দায় একটু দাঁড়াও; আমি রুটী কয়খানা সেঁকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুধীর অস্থির হইয়া একপ্রকার উন্মনা ভাবেই বারান্দার প্রান্তে আসিয়া রন্ধনশালার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—"বল কি! এত কষ্টের দরকার কি ছিল!"

বিন্দুর ললাট বিরক্তিতে কুঁচ্‌কাইয়া গেল; কিন্তু কেন যে তবুও অধরে হাসির রেখা ফুটিল, তাহা নারীচরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বলিতে পারেন। হাঁটুর কাপড় টানিবে কি পৃষ্ঠে দোদুল্যমান ক্ষুদ্র বস্ত্রাঞ্চলটুকু টানিয়া মাথায় দিবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। উনানে রুটীখানাও ফুটবলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে, না উঠাইলে নয়; সে তাড়াতাড়ি চিম্‌টা দিয়া তাহা জলন্ত উনানের বক্ষ হইতে টানিয়া একখানা পাথরের উপর রাখিয়া, দুই হাতে কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে বলিল—"আচ্ছা যা হোক্‌, এখনও দাঁড়িয়ে—কি আপদ্‌ বাপু!"

বিরক্তির সহিত এমন ভুবনভুলান হাসি কেন! সুধীর প্রশ্রয় পাইল। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপীবর্ণ মুখমণ্ডল অগ্নির রাঙা আঁচে কি সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সে নির্লজ্জের ন্যায় তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। বিন্দুর এত রূপ সে কখনও দেখে নাই। বিন্দু বড় সতর্ক, বড় লজ্জাশীলা—কোন দিন এমন করিয়া উলঙ্গ সৌন্দর্য্য লইয়া সুধীরের সম্মুখে সে দাঁড়ায় নাই; আজ তার লোভসংবরণ হইল না, স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে বিন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু এইবার অস্থির হইয়া বলিল—"যাক্‌, উনুনের আঁচ ব'য়ে—থাক্‌লো খাবার করা। বলি, যাও না—দেখ্‌ছো কি হাঁ-করে'!"

সুধীরের ভাষা নাই; বিন্দুর কটাক্ষ তাহাকে আরও মাতাল করিল, সে বাক্যহীন মূকের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু এবার সত্যই কোপপ্রকাশ করিয়া বলিল —"মরেছ, পতঙ্গের ন্যায় মরেছ; আমায় জ্বালাও কেন! মনে রেখো, এ-দেহ চিরদিনের নয়।"

সুধীর কথা খুঁজিয়া পাইল, বলিল—"তা' জানি; কিন্তু আজ রূপের প্রয়োজন বলে' চিরদিন যে এই প্রয়োজনেই মর্‌বো, তার কি মানে আছে; সেদিন এ রূপ হয় তো থাক্‌বে না, প্রয়োজনের সঙ্গে অন্য রূপ ফুটে উঠ্‌বে—এই সত্যটা থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌বে না।"

বিন্দু আবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"হয়েছে —এখুনি মহাভারত আউড়ে আমায় নাকাল কর্‌বে। তোমায় বেগোত্তা করি, একটু সর'; কাজ আর বাকী বেশী নেই, আমি যাচ্ছি, যত পার রূপের শ্রাদ্ধ করো'।"

সুধীর এইবার ভিতর হইতেই অপ্রস্তুত হইল। এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে সে বেহুঁষ হইয়াছিল; বিন্দুর সম্মুখে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকা তার একান্ত অভদ্রতা বলিয়াই মনে হইল। গম্ভীরভাবেই সে নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

* * *

আজ তাহার সব মৎলব উল্টাইয়া গেল। সে বুঝিল, ধৈর্য্য বস্তুটাকে সীমার মধ্যে বন্দী করা অক্ষমের কাজ। মানুষের হৃদয় জয় করিতে হইলে ধৈর্য্যই সহায়। আজ বিন্দুর গৃহিণীপনায় তার এই বাসাবাড়ী আনন্দপূর্ণ হইল।

বিন্দু যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রন্ধনশালার সে নগ্ন বেশ নাই; বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একখানি সাড়ী সে পরিধান করিয়াছে। গায়ে সেমিজ, ব্লাউজ কিছু ছিল না, অতিশয় শ্লীলতায় পরিধেয় বস্ত্রখানি অঙ্গের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে; মৌলিক রূপে বসনখানি অনিন্দনীয় রূপই মাখাইয়াছে। অধরে এত হাসি সে আর কোনদিন দেখে নাই; এত স্নেহ ও দরদের সহিত তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহাকে খাওয়ান, বিন্দুর এ-বাড়ীতে আসিয়া এই নূতন। সুধীর খাইতে খাইতে বলিল—"বিন্দু, আমার মনে আনন্দের সহিত বড় ভয় হচ্ছে!"

বিন্দু পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল, বলিল— "কেন?"

সুধীর—"এত সুখ সইবে না।"

বিন্দু—"এই জন্যই তো দূরে থাকি!"

সুধীর মাথা তুলিয়া চাহিল। কে বলিল তোমার প্রেমের ভার বইতে আমি অক্ষম, মুখের কথাই কি অন্তরের সত্য পরিচয়! কিন্তু কেন তবে এমন বেফাঁস কথা বাহির হয়? সে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করে, যাহা বলিবার তাহা বলা হয় না; এবার সে সতর্ক হইয়া বলিল—"না বিন্দু, দূরে আর থেকো না; সর্ব্বস্বহারাকে রক্ষা ক'র।"

বিন্দু মুখ ভারী করিয়া বলিল—"খাও, আর রুটী দেবো? আছে, সত্যি আছে; মিথ্যে বল্‌ছি না।"

সুধীর—"না থাক্, রাক্ষসের মত সবই যদি উদরগহ্বরে ঢুকিয়ে দিই, তোমার দশা হবে কি!"

বিন্দু—"পোড়া কপাল! তুমি এমনই মনে কর'; মেয়ে মানুষের আবার খাওয়া, উনুনের ছাই বেড়ে খেলেও গতর রাখ্‌বার যায়গা জুটবে না! আমার মাথা খাও—বসো' রুটী আন্‌ছি।"

সুধীর অস্থির হইয়া বলিল—"মাপ করো বিন্দু, যা ভাবি না, তাই বলি। আমার পেটে আর এক বিন্দু ঠাঁই নেই, যে জল-গেলাসটায় হাত দিই—এমন তৃপ্তির সহিত কোন দিন খাই নি!"

বিন্দু—"কপালখানা! তাড়াতাড়ি কি আর কর্‌বো, হতভাগা যদি আস্‌বে না জান্‌তুম, আগে থেকেই যোগাড় করতুম্। তবুও তোমার আজ আস্‌তে দেরী হয়েছে, তাই রক্ষে।"

সুধীর—"তাড়াতাড়ি এই রকম রোজ দু-দশ খানা রুটী, বেগুন ভাজা আর কুমড়ার তরকারী আমায় খাইও, সঙ্গে সাম্‌নে ব'সে একটু হেসে কথা ব'লো—আমার শ্রী ফিরে যাবে।"

বিন্দু কথার উত্তর দিল না; তার মুখখানার উপর যেন একখানা অস্বচ্ছ বস্ত্র ঢাকা পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া বলিল—"হাত মুখ ধোও, পান খাবে!" সুধীর বিন্দুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না, হাসিয়া বলিল—"দিলে আর ছাড়ে কে!"

বিন্দু ঘরের মেঝেয় বসিয়া পান সাজিতে বসিল। আজ শরতের আকাশের মত বিন্দুর মুখখানা একবার মেঘঢাকা পড়ে, আবার চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে—সুধীর এই দুই প্রকার রূপবিলাস অপলকে দেখিয়া আজ বড় তৃপ্তিবোধ করিতেছিল। এমন হইলে সংসার তো মরুময় নয়, নিত্য আনন্দের হাটে সে কেনা-বেচার খেলায় মাতিয়া থাকিতে পারে।

বিন্দু একটা ডিবার খোলে দুই খিলি পান দিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছিল, সুধীর বলিল—"বিন্দু, একটু দাঁড়াও।"

বিন্দু থমকিয়া দাঁড়াইল।

সুধীর বলিল—"আজ আমার চাকুরী যাওয়ার ডাক এসেছিল; তা' হ'লে হয়তো আজিকার এই হাসি, এই কথার অন্য আকার হ'তো। ভবিষ্যতের গর্ভে যে ঘটনা লুকিয়ে থাকে, তার আভাস পূর্ব্বেই পাওয়া যায়। চাকুরীটা এখন বোধহয় কিছু দিনের মত রইলো। বোধহয়, তোমার অন্তরে আমি আজ যেটুকু স্থান পেলুম, তা' থেকে আর বঞ্চিত হবো না।"

বিন্দু বলিল—"এই জন্যই কি দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে চলি—কেন আপনাকে তো সেই আশ্রম থেকেই ভালবাসি!"

সুধীর—"হাঁ, তা' আমি জানি; কিন্তু তার চেয়েও চাই তোমায় অতি নিবিড়ে, খুব কাছে, অন্তরে অন্তরে।"

বিন্দুর মুখ শুখাইল, বলিল—"আচ্ছা!"

আবার সে চলিয়া যাইতেছিল, সুধীর বলিল—"যেয়ো না, একটু কাছে এস। ব্যথার শুষ্ক বালু পর্ব্বতপ্রমাণ হৃদয়ের কূলে কূলে জমে উঠেছে; যদি সাহস না দাও, আমায় চাপা দেবে। আমি আর সহ্য করতে পারি না।"

কথার সুরে কাতরতা ছিল। বিন্দুর মুখ আরও বিষণ্ন হইল। একটু কাছে গিয়া বলিল—"আমায় তুমি কি ক'রতে বল?"

সুধীর ভরসা পাইয়া বিন্দুকে নিজের এমন কাছে আনিবার জন্য হাত বাড়াইল, যাহা বিন্দুর ভাল লাগিল না—সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"ভালবাসার শেষ কোথায়! বোধহয় এই নশ্বর শরীরের আহুতিতে—তুমি তাই চাও কি!"

সুধীর ইহার কি উত্তর দিবে! বিন্দুর উৎকণ্ঠিত চক্ষের দাবী সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, এক নিমিষেই বলিল, "না"—বিন্দু হাসিয়া বলিল, "তবে তোমার ভয় নাই। তুমি একটু ব'স, হেঁসেল সেরে আসি।"

বিদ্যুতের মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীর আবার নিজেকে ধিক্কার দিল; এই "না" কথাটা তার অন্তরবীণার সুরের সহিতে এক হয় নাই। (ক্রমশঃ)



বিলাতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট—

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র দলনীতির দ্বারাই সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। যে দল যখন প্রবল হয় তখন সেই দলই শাসনভার গ্রহণ করে। লিবারেল (উদারনীতিক), কন্‌জারভেটিভ (রক্ষণশীল) ও লেবার (শ্রমিক)—প্রধানতঃ এই তিনটী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে দল প্রবল হইয়া উঠে, পার্ল্যামেণ্টের মন্ত্রীসভা তাঁহাদেরই প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়। শ্রমিক দল অপেক্ষাকৃত আধুনিক—মধ্য ইউরোপের চরম সমাজতন্ত্রবাদিগণের ইহারাই বিলাতের দ্বৈপায়নী সংস্করণ। বহু দিনের সংগ্রামান্তে ইহারা পরিশেষে জয়লাভ পূর্ব্বক গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন। মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড ইঁহাদেরই নেতৃরূপে বৃটীশ পার্ল্যামেণ্টের কর্ণধার অর্থাৎ মহামন্ত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন।

মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক নেতৃরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদের মূলভাব হইতে সরিয়া সরিয়া সাম্রাজ্যবাদের দিকেই যে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, এইরূপ সংশয় অনেকেরই মনে তিলে তিলে জাগিয়া উঠিতেছিল। এবার বিলাতের ফাজিল বজেটকে সামলাইবার জন্য যে প্রয়োজনের তাগিদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ববিভাগে ব্যয়সঙ্কোচের দ্বারা তাহার আশু পূরণের ব্যবস্থা করিতে গিয়া তিনি শ্রমিকদলের বুঝি একেবারেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। শ্রমিকদল দ্বিধাবিভক্ত। প্রধান অংশ ব্যয়সঙ্কোচ আদৌ চাহেন না; পক্ষান্তরে সঙ্কোচের কাটারী জনসাধারণের উপর না চালাইয়া ধনি-বর্গের উপর চালাইতে গেলেই, ধণিকতন্ত্র অবধারিত বাঁকিয়া দাঁড়াইবেই। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং তিন জন মাত্র সহকারী দলনীতি ভঙ্গ করিয়াই সর্ব্বদল-সমন্বয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন।



(১) মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, (২) মিঃ ষ্ট্যান্‌লী ব্যালডুইন, (৩) মিঃ ফিলিপ স্নোডেন, (৪) স্যার হাবার্ট স্যামুয়েল (৫) লর্ড স্যাঙ্কি

তাঁহাদের এই আচরণ বিশ্বাস-ভঙ্গেরই সমতুল্য জ্ঞান করিয়া অন্যতম শ্রমিক নেতা মিঃ হেণ্ডার্সন প্রমুখ অধিকাংশ শ্রমিকদল তাঁহাদিগকে দলচ্যুত করার জন্য উদ্যোগী হইবেন, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়।

অতঃপর নূতন শাসনতন্ত্র পুনর্নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্ততঃ ছয় মাস কাল নির্ব্বিঘ্নেই চলিবে মনে হয়। নির্ব্বিঘ্নে এইজন্য—ভগ্ন শ্রমিক দলের বড় জোর ২০০ প্রতিনিধি আছেন; তদ্বিরুদ্ধে এই যুক্ত দলের ৪০০ প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে অনায়াসেই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলে, হিতৈষিতার জন্যই পদচ্যুত হইলেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 'ভারতবন্ধু" "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" তাই সাহ্লাদে বলিতে পারিয়াছেন "Mr W. Benn who meant well but did not do very . well, disappears"—মিঃ মণ্টেগুর পতন ঘটনা যেমন, তেমনি মিঃ বেনেরও এই পদচ্যুতি এবারও কোন্ দিকে হাওয়া বহিতেছে, তাহারই সূচনা নির্দ্দেশ করে না কি?

মিঃ ওয়েজ্‌উড বেনের স্থানে নূতন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট হইলেন—মিঃ স্যামুয়েল হোর। ইনি রক্ষণশীল নেতা। অতঃপর ভারতের ভাগ্যচক্র কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা ভারতের অন্তর্ম্মুখ



(১) লর্ড রীডিং, (২) স্যামুয়েল হোর, (৩) মিঃ জে, এইচ, টমাস, (৪) মিঃ নেভিল চেম্বালেন, (৫) স্যার পি, কুনলিফ লিষ্টার

ইঁহারা জাতির বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া ছয়মাসের পরেও নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা।

ইংলণ্ডের এই শাসকদল পরিবর্ত্তনে ভারত সম্বন্ধে কি সুবিধা অথবা অসুবিধা তাহা মনীষী রাষ্ট্রনীতিকবৃন্দের বিবেচ্য। ভারতের অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলেন, "It is too high politics for me!" বস্তুতঃ, ইহাতে তিনি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তনের আশা করেন না।

মিঃ ওয়েজ্‌উড বেন তাঁহার অকপট ভারত-তপস্যার উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেছে, ইহা নিঃসন্দেহ।

মনীষীর সমর্থন—

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রুষিয়ায় পর্য্যটন করিয়া উচ্চ প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, আর একজন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্য-সম্রাট্ মিঃ বার্ণার্ড শ'ও সে দিন সোভিয়েট রুষিয়া ঘুরিয়া আসিয়া শতমুখে নববিপ্লবের জয়ঘোষণা করিয়াছেন। দুইজন মহামনীষীর এই সগৌরব আশীর্ব্বাদলাভে রুষিয়ার সাধনা আজ সত্যই বিশ্বের হৃদয়ে প্রত্যয়ের অগ্নিশিখা

জ্বালাইয়া তুলিবে। শত্রুপক্ষের সমস্ত সংশয়-সৃষ্টি ও গভীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সত্য তপস্যার এই বিজয়বার্ত্তায় কাহার না হৃদয়ে তৃপ্তি ও পুলক সঞ্চার য়? আজ কবির কথা জ্বলন্ত সত্য হইয়াই মর্ম্মে বাজিয়া উঠে—

"যে তপস্যা সত্য—
তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।"

—রুষিয়ার আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠা অস্পষ্টতার সকল অন্ধকার দূর করিয়া আজ মুক্তির আলোকপ্রদীপরূপে পীড়িত মানবজাতির প্রাণে নব আশার কিরণ সঞ্চার করিবে, ইহা কি দুরাশা?

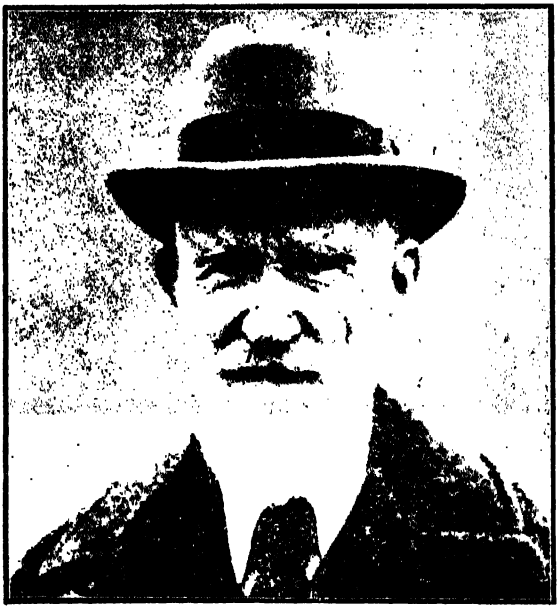
মিঃ বার্ণাড শা' বলেন—"The five-year plan will save the world"—এত বড় পরিচয়-পত্র আর কোন জাতি এই শ্রেষ্ঠ মনীষীর নিকট প্রত্যাশা করে? তাঁহার মতে ইংলণ্ড নিরেট মূর্খ, তাই সারা ইউরোপ যখন রুষিয়ার নব সমাজনীতি সাগ্রহে বরণ করিয়া লইবে, তাহার পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংলণ্ড উহার মহিমা ও উপকারিতা উপলব্ধি করিবে। তাঁহার মতে, ইংলণ্ড, ততোধিক আমেরিকায় এই পঞ্চবার্ষিক কর্ম্মনীতির অনিবার্য্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মনীষী শ' একটু বেশী মাত্রায় আশাবাদী—তাঁহার আশার পূরণ বণিক্‌রাজ ইংরাজ ও ধনকুবের আমেরিকা কতখানি করিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু লেনিনের জীবন-ব্যাপী সাধনা তাঁহার মরণের পরে যে বিজয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা সমষ্টি মানবাত্মারই ললাট গৌরবোদ্ভাসিত করিবে, ইহা সর্ব্ববাদিস্বীকার্য্য। বিশ্বের হৃদয় খাঁটি তপস্যার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

রাষ্ট্রনেত্রী—

রাষ্ট্রক্ষেত্রেও নারীপ্রতিভা কত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে, আইসল্যাণ্ড দ্বীপের শ্রীমতী থোরালসেন তাহার এক সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

আইস্‌ল্যাণ্ড সুদূর উত্তর অতলান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপ—ইহার উত্তর প্রান্তসীমা আর্টিক চক্ররেখা স্পর্শ করিয়াছে। এই তুষারাচ্ছন্ন দ্বীপের পরিধি ২৯৮ × ১৯৪ বর্গ মাইল ও সমুদ্রতট ৩,৭৩০ মাইল ব্যাপী। লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় এক লক্ষ।

আইস্‌ল্যাণ্ড স্কান্দিনোভিয়ানদের দ্বারা ৮৫০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় ও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ৪০০০ অধিবাসী সেখানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া



মিঃ বার্ণাড শ'

বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তৎপূর্ব্বে আইরিশ কুলডিসদের কয়েক ঘর মাত্র সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ৮৯০ খৃঃ ডাবলিনের বিধবা রাণী আউড এখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ১০০০ খৃঃ নরওয়ে হইতেই ঠিক রীতিমত খৃষ্টধর্ম্মের এখানে আমদানী হয়। ১৩ শতাব্দীতে পুরোহিতের অধিকার লইয়া যে বিবাদ তাহা ক্রমে গুরুতর হইয়া প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশগুলিকে একে একে চূর্ণ করিয়া দেয় ও পরিশেষে ১২৬২-৬৪ খৃঃ ইহা পাকাপাকি নরওয়ের শাসনাধীন হইয়া পড়ে।



আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের নারী-মন্ত্রী—মাদাম থোরালসেন

১২৮০ খৃষ্টাব্দে ত্রি-মুকুটের সম্মিলনের ফলে আইস্‌ল্যাণ্ড কার্য্যতঃ ডেন্‌মার্কের অধীন হয়; কিন্তু এই সম্মিলনের সন্ধি-সূত্র উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র দিনেমার রাজগণ যে অপ্রতিহত শাসন বিস্তার করেন, তাহাতে আইস্‌ল্যাণ্ডবাসিগণ শান্তিলাভ করিলেও, সুখী হয় নাই। আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীর বহির্বাণিজ্য একপ্রকার নিরুদ্ধ হয় ও কৃষি, পশু-পালন প্রভৃতির অবস্থাও খুব অবনত হইয়া পড়ে।

খ্রীষ্টীয় রিফর্মেশন আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিলেও, তাহাদের বিশেষ অবস্থাগত পরিবর্ত্তন সাধন করে নাই। রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতা আরও বাড়ে, কিন্তু লুথারীয় পুরোহিতবৃন্দ ক্রমে ক্রমে বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

ইউরোপের নবীন ভাবধারা ধীরে ধীরে এই দ্বীপবাসীরও মর্ম্মস্থল অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ম্যাগনাস ষ্টিফেন্‌সন নামে একজন দেশপ্রেমিক "যুক্তিবাদী আন্দোলনে"র সূচনা করেন। তাহার ফলে আর কিছু বিশেষ ক্ষতি না হইলেও, শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে নব উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রসমূহ প্রকাশিত হয়। জন সিগার্ডসন প্রভৃতি দেশপ্রাণ নেতৃগণের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে, ৩০ বৎসর পরে ডেন্‌মার্কের শাসনতন্ত্র-পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক পরিণামে, আইস্‌ল্যাণ্ডবাসী ১৮৭৪ খৃঃ "হোমরুল" বা স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হন। গত ১৯১৮ খৃঃ যে "যুক্তি-বিধান" (Act of Union) স্বীকৃত হয়, তদনুযায়ী ১৯৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত ডেন্‌মার্করাজ অভিভাবক-স্বরূপ মাত্র বহিরঙ্গ পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবে। অন্যথা, সর্ব্বপ্রকারেই আইস্‌ল্যাণ্ডবাসী দিনেমার প্রজাবৃন্দের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন।

১৯১৫ খৃঃ হইতে আইস্‌ল্যাণ্ডের নিজস্ব বাণিজ্য-পতাকা উত্তোলিত হয় ও ১৯১৮ খৃঃ হইতেই তাহার নিজ সেনাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজ আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ শিক্ষায় রাষ্ট্রীয়-সাধনায় এতখানি অগ্রসর, যে একজন মনীষাশালিনী নারীই আইরিস্ পার্ল্যামেণ্টের প্রধান কর্ণধাররূপে মহামন্ত্রীর পদগ্রহণ করিয়া শাসনদণ্ড চালনায় অধিকারিণী হইয়াছেন। কবির মর্ম্মরাগিণী স্বতঃই কি অন্তর নিঙড়াইয়া নির্গত হয় না—

"চীন ব্রহ্মদেশ ক্ষুদ্র দ্বীপস্থান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

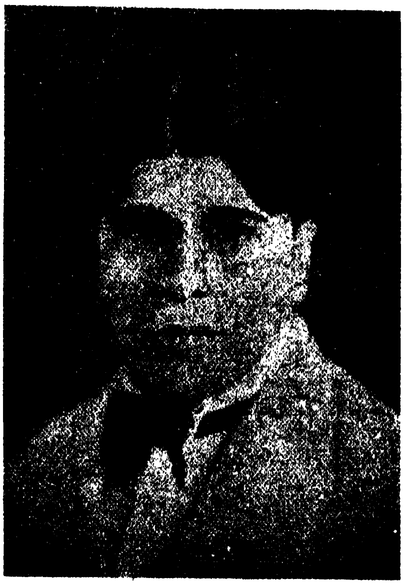


জলচর বাইসাইকেল

২২ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই তিনি অভিনয়-জগতে ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করার যে অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে পাশ্চাত্যের বিশ্ব-বিখ্যাত কাম-রূপ-ধারী অভি-নেতা লনচ্যানিরই সহিত তুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

জলচর বাইসাইকেল—

মানুষের সৃজনীশক্তি অপ্রয়োজনের মধ্যেও সহস্র প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া প্রচুর আনন্দ পায়। ইহাই সভ্যতার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। হাতে পায়ে দ্বিচক্রযান চালাইয়া যেমন স্থলে একজন মানুষ স্বেচ্ছায় গমনাগমন করে, তেমনি জলের ভিতরে যন্ত্র বসাইয়া আমেরিকায় এই নূতন ধরণের নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কেহ অনায়াসে সাইকেলের ন্যায় ইহা হাতে পায়ে চালাইয়া স্বচ্ছন্দে জলবিহার করিতে পারিবে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যই এই প্রতিভার বিচিত্র লীলাবিলাসের উৎস নয় কি? পাশ্চাত্য আজ আনন্দের জয়গান গাহিয়া জীবনের নব নব উৎসব রচনা করিতেছে—কিন্তু প্রাচ্যের বিষাদরজনী যে আজও ভোর হয় না!



মিঃ আর, এস, রামকুমার

মোহিনী-বিদ্যা—

এস, আর রামকুমার একজন প্রতিভাবান্ ভারতীয় যুবক। তাঁহার বয়স মাত্র

শ্রীমান্ রামকুমার নিজে ১৩টী ভাষা জানেন। তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি মোহিনীবিদ্যায়

সত্যই অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার বিশপ্রস্ত কৃত্রিম দন্তশ্রেণী আছে, ইহারই সাহায্যে তিনি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারীকে হুবহু নকল করিয়া সকলকেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তরুণ রামকুমার বিলাতে লর্ড বার্কেনহেড, কুব্জপৃষ্ঠ নতর্‌দামের ভূমিকায় স্বয়ং লনচ্যানী ও ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিঃ মালব্য, ৺লাজপত রায়, ৺নেহেরু এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এমন সফল অনুকরণ করিয়াছেন, যাহা দেখিয়া ইউরোপ ও ভারতের বিশেষজ্ঞ মনীষিবৃন্দ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রতিভাশালী রামকুমার দিন দিন স্বীয় বিদ্যার চরমোৎকর্ষে সুনাম অর্জ্জন করুন, ইহাই কামনা করি।



জর্ম্মনীর ব্যায়াম-বীর

ব্যায়াম-বীর—

জর্ম্মনীর এই পঞ্চমবর্ষীয় বালক তাহার পিতার দেহভার মস্তকে বহন করিয়া আশ্চর্য্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। সারা জর্ম্মনীতে এই ঘটনা যথেষ্ট কৌতুক ও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল।



মিঃ আর, ই, ম্যাড্‌সেন

লম্বা মানুষ—

পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা মানুষ বলিয়া প্রখ্যাতির দাবী করেন—মিঃ আর, ই, ম্যাড্‌সেন। তিনি হলিউডের সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রের "তারা" বিলী ডভের সহিত এই চিত্রখানি তোলাইয়াছেন। তুলনায় তাঁর দাবী স্পষ্টতরই হইয়াছে।



সঙ্কলন ও সমালোচনা

সঙ্কলন

—:০:—

রাষ্ট্র না জাতি ?—

প্রশ্নটী আমরা "প্রবর্ত্তকের" কয়েক সংখ্যা ধরিয়া ধারাবাহিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি। মহাকবির মুখে ইহারই সমর্থন পাইয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। মহাত্মাজী নিজেও ক্রমশঃ এই জাতি-গঠনপ্রধান চিন্তাধারাকেই স্ফুটতর করিয়া আমাদের সাধ্যরূপে পুরোভাগে স্থাপন করিতে "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" স্তম্ভে মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিতেছেন। এ সকলই আশার কথা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই কথাই স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন—(প্রবাসী, শ্রাবণ)

"রাষ্ট্রিক মহাসন নির্ম্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড় কথা, এ কথা বলা বাহুল্য।"

হিন্দুমুসলমানঘটিত সমস্যার মূলেও এই দৃষ্টি-ভঙ্গী স্থাপন করিয়াই তিনি কহিয়াছেন—

"আমাদের মিল্‌তে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।"

কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্মবিদ্বেষের যে অবধারিত সম্বন্ধ আছেই, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার ফরাসী বিপ্লব বা আধুনিক রুষবিপ্লবের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা গিয়াছে বটে; কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস সারা মানবজাতির সনাতন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার শিক্ষা ও মর্ম্ম বলিয়া আমরা স্বীকার করার কারণ খুঁজিয়া পাই না। স্পেন বা মেক্সিকোর সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তবে ধর্ম্মমোহ আর তার প্রতি যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ তাহা যে অপ্রয়োজনীয়, একথা আমরা বলিতেছি না। ধর্ম্মকে মূল করিয়াই দেশ-গত বা জাতি-গত অনৈক্যসৃষ্টি ভারতে প্রধান কথা নয়। ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা—দরদেরই সমস্যা। ভারতের মাটির প্রতি যে অখণ্ড দরদ দিয়াই জাতীয়তার উপলব্ধি করিতে হয়, সেই খাঁটি দরদের অভাবেই ভারতজাতির সৃষ্টি বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হইতেছে। হিন্দুর এই দরদ সহজ ও স্বাভাবিক; তাই ভারত আর হিন্দুস্থান ভিন্নার্থ-বোধক নয়। এই দরদের টান আরবের মরুভূমি বা পারস্যের গোলাপবাগে রাখিয়া, ভারতের মাটীকে আপন করা যায় না। আজ ইংরাজও আমাদের পর, সে খৃষ্টান বলিয়া নয়; পরদেশী বলিয়া, অভারতীয় বলিয়া। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ভারতকে মা বলিয়া চিনিলেই, এই দরদের টানেই সেখানে প্রেমের বন্ধন সহজভাবেই দেখা দিবে। এখানে ধর্ম্মবিদ্বেষের স্থান নাই—হিন্দুর হিন্দুস্থান তার ধর্ম্মস্থান না হইলে চলিবে কেন? মুসলমান কি তেমনি ভারতকেই তার কাবা মক্কার চেয়ে পুণ্যতর মাতৃ-তীর্থ বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে? তবে একই ভারত হিন্দু-স্থান হইয়াও আবার ইসলামেরও মহাতীর্থ হইবে। খৃষ্টানেরও মহাতীর্থ হইবে। ইহা আজও যদি সম্ভব

না হইয়া থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মভেদের জন্য নহে—ভারতীয় সত্তার ও মাটির প্রতি, এক কথায় ভারত-ধর্ম্মের প্রতি বিশুদ্ধ ও ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গেরই অভাবে। জাতিসৃষ্টির মূলে চাই—দেশ-সত্তায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভারতের নবজাতি এই আত্মসমর্পণের অভেদানুভূতি লইয়াই জাগিয়া উঠিবে। আমরা এই স্বপ্নই দেখিয়াছি। কবি, ঋষি, কর্ম্মী—সকল ভারতসন্তান মিলিয়া এই মহাভারত-রচনার বেদ-গান এক কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেই ইহা সার্থক হইবে।

নারী-প্রগতি—

আষাঢ়ের "উপাসনায়" চিন্তাশীল লেখক শ্রীযতীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত নারীসংগতি প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার অধিকার নারী চাহিয়াছে। কিন্তু নারী অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে.. তাহার গতিও স্বভাবতঃ মন্থর। মন্থরতার লক্ষ ও সর্ব্ববিধ হেতু বর্জ্জন না করিলে সে পুরুষের নাগাল পাইবে না।

"ইহার উপর নাচিবার অধিকার, গাহিবার অধিকার, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিবার অধিকার, বুক খুলিয়া জামা আঁটিবার অধিকার, ঘাড় কামাইয়া চুল ছাঁটিবার অধিকার, সিগারেট খাইবার, কুস্তি লড়িবার, জোরা খেলিবার ইত্যাদি নানা অধিকার সে নরের হাত হইতে চাহিয়া বা ছিনাইয়া লইতে চাহে।"

চাহে ঠিক, কিন্তু কেন চাহে ও কি করিয়া অধিকার পাইতে চাহে, তাহাই আলোচনার বিষয়। এ সম্বন্ধেও লেখকের প্রশ্ন উত্তর শুনিবার মত—

"বিলাসের অধিকারের কথা বাদ পড়িলে চলিবে না। নারী হাঁটু তুলিয়া, বুক খুলিয়া সজ্জিত হইবার অধিকার চাহে কেন? ইহা সেই দুর্জ্জয় মহাশক্তির নূতন লীলা, নারীকে অধিকারের লোভ দেখাইয়া তাহার ললাটে লজ্জাতিলক আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার যুগোপযোগী ফাঁদ। সমগ্র মানবাত্মার দুরদৃষ্টক্রমে নারী কি আজও আব্দার করিয়া, ফাঁদ পাতিয়া অথবা ধৃষ্টতার দ্বারা অধিকার লাভ করিতে চাহিবে? নিষ্ঠার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা নহে? মুক্তিসাধিকা না হইয়া মুক্তিবিলাসিনী হওয়াই তাহার অভিপ্রেত?"

কথাগুলি নারীকেই চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। ইহার প্রকৃত উত্তর নারকেই জীবন দিয়া দিতে হইবে।

বিধবার ভাগ্য ও নারীর আদর্শ—

মিস মেয়ো ভারতীয় বিধবার ভাগ্যে যথেচ্ছা কলঙ্কলেপ করিয়াছেন। তাহার উত্তরে ভারতের পক্ষ হইতে বিধবার মর্য্যাদা গরিমা যোগ্য ভাবেই দিবার আছে; দেওয়াও হইয়াছে বা এখনও হইতেছে। "রাষ্ট্রবাণী"তে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত "সৌভাগ্যবতী" বলিয়াই তাঁহাদের আবাহন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"স্বামীর মৃত্যুতেই সৌভাগ্য নাই, কিন্তু সেই মৃত্যু যদি ব্রহ্মচর্য্য আনিয়া দেয়, তবে স্বামীবিয়োগের মত নিতান্ত দারুণ দুঃসহ দুঃখের ঘটনাও সৌভাগ্যেই পরিণত হয়। সেই সৌভাগ্য বাংলায় অনেক হিন্দু বিধবার আছে। সেই সৌভাগ্যে আজ সমাজ সৌভাগ্যশালী।"

এ নবযুগে বাংলার সৌভাগ্যবতী শুধু বাংলার বিধবা নহে, বাংলার কুমারী ও কুললক্ষ্মী সকলেই। বাংলার মেয়ে সীতা সাবিত্রী-সতীর তপোমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগাইয়া আজ নবজাতিকে জন্ম দিবার ডাক পাইয়াছে। শুধু বিধবা হইয়া শুদ্ধচারিণী সমাজ-সেবিকার বেশে সমাজের মধ্যে নির্ম্মল সেবা ও সাত্ত্বিকতার প্রভাব বিকীরণ করাই নহে, নারীকে আজ সাবিত্রী সমান মরা পতিকে জীবন দান করার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, মরা জাতিকে বাঁচাইবার ভার যে তাঁহাদেরই। বাংলার কুললক্ষ্মীও আজ শুদ্ধ সংযম ও তপস্যার উপর দাম্পত্য প্রেম ও নবসংসারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। বাংলার নারী হইবে শিবময়ী অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী মহালক্ষ্মী, আবার

দ্রৌপদী ও সুভদ্রার মত বীরজায়া, বীরপ্রসূতি। বাংলায় আজন্মব্রহ্মচারিণী কুমারীর দলও শক্তির অপর মূর্ত্তি-রূপে সমাজের নূতন বিশুদ্ধ রূপ ফুটাইয়া তুলিবে। সবই হইবে পবিত্র, শুভ্র-সুন্দর, শুচি, কল্যাণ ও উৎসর্গেরই স্বরূপ-মূর্ত্তি। বাংলার এই নবজাতির স্বরূপ বা কল্পমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছি—মাগো, কোথায় তোরা, এই মহাশক্তির উপাদানরূপে আত্মোৎসর্গের মহাতীর্থ সার্থক করিয়া তুলিবি না!

নারী-শিক্ষা—

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে ভাদ্রের "স্বদেশে" শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রয়োজনীয় কথাটী লিখিয়াছেন :—

"নারীদের সব চেয়ে প্রয়োজন—ধর্ম্মশিক্ষা। এই ধর্ম্মশিক্ষা নানা কারণ বশতঃ স্কুল কলেজে বাদ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু নারীদের মধ্যে যে বিশিষ্টতা এখনও বর্ত্তমান আছে, তা' শুধু ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে। নারীই এখনও সনাতন ধর্ম্মের ভাবধারা বজায় রেখে আসছে, তা' সে নারী শিক্ষিতাই হউক আর অশিক্ষিতাই হউক। আমাদের অতীত জ্ঞান ও ধর্ম্মভাণ্ডারের চাবী সংস্কৃত ভাষা। মেয়েদিগকে সংস্কৃত শিখতেই হবে। আমরা কি ছিলাম না জানতে পারলে, আমাদের কি হওয়া দরকার তা' বুঝব কেমন করে'? ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হ'লে তখন সংস্কৃত না শিখলেও চল্‌তে পারে। ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট গুণ আছে। কিন্তু তার অপরিহার্য্য দোষ—ভাববিলাসিতা ও কলাবিলাসিতা। সংস্কৃত শিক্ষা ব্যতীত এই দুই দোষের মোহ থেকে থেকে নারীরা মুক্তি পাবে না। নারীকে মনে রাখতে হবে, যে তার মনের সঙ্গে, প্রাচীন ভারতের আর্য্যনারীদের মনের সম্পর্ক পাতাতে হবে। তা' হলেই নারীরা দেখতে পাবে—তাদের জীবন বিলাসিতায় পঙ্কিলময় নয়, তাদের জীবন কঠোর কর্ম্মময়।"

কথাটী চিন্তনীয়। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ থাকিলেই সংস্কৃত-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া যায় না।

সমাজব্রতী—

হিন্দুর জীবনে আজও সত্তার জাগরণের সাড়া বুঝি ফুটে নাই! তাই বড় দুঃখেই "হিন্দুমিশন" সমাজসেবকের মর্ম্মবেদনা জানাইতেছেন :—

"একদিন না একদিন জাতির এই ভুল সংশোধিত হইবেই; কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্কুল কলেজ, জলাশয় স্থাপন, দুর্ভিক্ষনিবারণাদি কার্য্যে আত্মদান করিতে হইবে। ততদিন হিন্দু সভা ও হিন্দু মিশনের কর্ম্মিগণকে অর্দ্ধাশনে অনশনে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। ততদিন বাংলা মায়ের আত্মোৎসর্গী সন্তানদলকে অর্দ্ধাশনে অনশনেই ভলাণ্টিয়রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কারাবরণ করিতে হইবে। নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

কুমারটুলীর মৃৎশিল্প—

ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" কলিকাতার এই স্বদেশীয় শিল্পটীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লেখক ভালই করিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় চিরদিনের জন্য মিউজিয়মের দর্শনীয় সামগ্রী না হইয়া দেশীয় শিল্পীর দ্বারা ইহার বহুল প্রচার হইলে, এইগুলির সংরক্ষণের সার্থকতা হইবে এবং তৎসঙ্গে দেশের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। কলিকাতা নগরীতে প্রাচীন পদ্ধতিতে যে কয়েকখানি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ কারুকার্য্যই এই শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

শুনিলাম, ইঁহারা এতদ্ভিন্ন নানারূপ বিদেশীয় উন্নত ধরণের মডেল প্রস্তুত করিতেছেন, যথা paper-pulp দ্বারা ডাক্তারী শিক্ষার সহায়ক anatomical model, শিক্ষাবিষয়ক Relief-map ইত্যাদি। নানারূপ advertising model ও ইঁহারা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমেরিকা, জার্ম্মানী ও জাপান সেলুলয়েড চীনামাটি, কাঠ, টিন ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত নানারূপ পুতুল খেলনা ইত্যাদি রপ্তানী করিয়া এ দেশ হইতে কোটী কোটী টাকা শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই সমুদায় শিল্পের অনুকরণে ইঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইঁহারা বলেন, এই ধরণের শিল্পগুলি এ দেশের মেয়েদের দ্বারাও অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, যে আমাদের প্রাচীন প্রথানুগত কেবল মাটীর পুতুল খেলনা ইত্যাদি লইয়া থাকিলে চলিবে না—উন্নত জগতের নিত্য নূতন শক্তির সাধনা না করিলে, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া সুদূরপরাহত।"

পাহাড়পুর—

পাহাড়পুর, বাণগড়, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে নবাবিষ্কৃত প্রত্ন-কীর্ত্তিগুলি বাংলার অতীত মহিমার জাগ্রত নিদর্শন। এই লুপ্ত ঐতিহাসিক পুণ্যতীর্থগুলির পুনরুদ্ধার জাতিসাধনার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। "পাহাড়পুর' সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতীশ-সরকার এম. এ, বি এল ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" লিখিয়াছেন—

"পর্ব্বতহীন নদীমাতৃকা বাংলা দেশে স্থায়ী প্রত্নসম্পদ্ দুর্লভ। বাংলার বিলুপ্ত কীর্ত্তিকাহিনী এই সকল ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত। ইহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়াই আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি তাহার অতীত গৌরবের, আশা আকাঙ্খার ও উচ্চ কল্পনার পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন।"

কথাগুলি সত্য। লেখক গর্ব্বকণ্ঠেই বলিয়াছেন, "যে বাঙ্গালী জাতির সভ্যতার ইতিহাস সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবস্থল ছিল, যাহার অতুল বিক্রম

উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃতদ্রাবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পম্।

......বাংলার এই সমুজ্জ্বল কীর্ত্তিকাহিনী কল্পনা বা ভাবুকের উচ্ছ্বাস নহে—ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত পরম সত্য।'

তাঁহার এ গর্ব্ব সারা বাঙ্গালী জাতিরই হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিষ। বাংলার তরুণ এ সম্বন্ধে আরও সজাগ, সচেতন হইয়া উঠুক—ইহাই প্রার্থনা।

হিন্দুসভায় সভাপতির অভিভাষণ—

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের সভাপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর অভিভাষণে হিন্দুর মর্ম্মকথাই ফুটিয়াছে। আমরা স্থানাভাবে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"......বিরোধ ও আত্মকলহের অবসানে উদারতা ও মহানুভবতায়—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য যাহাতে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ভবিষ্যতের সেইদিকে চাহিয়া হিন্দুসভার বর্ত্তমান কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে—

আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে দেশবাসী জনসাধারণের কাছে পরিচিত করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্যকে তাহাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।

ধর্ম্মের যে সর্ব্বব্যাপী বিশ্বজনীন মূর্ত্তি সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে! নিজের ধর্ম্ম দিয়া অন্যের ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে।

......ভবিষ্য হিন্দুকে প্রচারশীল হইতে হইবে। নিজের জন্য নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অনুদার সঙ্কীর্ণতার আবর্জ্জনা দেশবিদেশে জমিয়া উঠিতেছে তাহারই উচ্ছেদকল্পে ভারতবাসী হিন্দুকে আজ প্রচারে বাহির হইতে হইবে। হিন্দুত্বের গণ্ডীতে অন্যকে আবদ্ধ আবদ্ধ করিবার জন্য নহে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বমানবকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে।

......পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদ আজ মানবকে ক্লিষ্ট, ক্লান্ত ও অন্ধ করিয়াছে—পাপ পুণ্যে আস্থাহীন হইয়া, পরলোকে বিশ্বাস হারাইয়া, বিশ্বমানব আজ নিজের আঘাতে নিজেই ক্ষত বিক্ষত—সেই ক্ষত নিরাময় করার মহান্ কর্ত্তব্য নব্য হিন্দুর। সারল্য, বিশ্বাস ও নির্ভরতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ জ্ঞান, সমস্তই তাহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যে কল্যাণ একদিন হিন্দু দর্শন প্রচার করিয়াছিল, সেই কল্যাণ আজ বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে নব্য হিন্দু প্রচারককে বহন করিয়া ফিরিতে হইবে। একদিন যেমন যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, কাম্বোজ প্রভৃতি সম্পর্কে সে দরদী হইয়াছিল—আজও তাহাকে সেইরূপ দরদ পোষণ করিতে হইবে।

হিন্দু, তুমি ভুলিও না—

বিশ্ব মানবকে যে উদ্ধার করিবে তাহার জন্ম হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে অনুভব কর—তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়শৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্ব-মানবের হৃদয় হইতে জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দু সমাজ তোমারই জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারই কৈশোরের মধুবন, তোমারই সম্পদের দ্বারকা, তোমারই ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারই শেষ শয়নের সাগর-সৈকত।

দেশে দেশে তোমাকে তপোবনের সেই বাণী বহন করিয়া ফিরিতে হইবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽনায়॥"

কবিতা—

"হিন্দুমিশনে" প্রকাশিত এই কবিতাটী প্রাণের তারে একটু ছোঁয়া দিল—

"কঙ্কাল-মঙ্গল

ওই হেমগিরি কন্যাকুমারী গুর্জ্জর হইতে কামাখ্যা শেষ,
আরাবল্লীর মরু ও পল্লী মালব মারাঠা বঙ্গদেশ;
পঞ্চনদের নদ জনপদ, কোশল কেরল অন্ধ্র ময়
যত কঙ্কাল দেহ সবে নাড়া। শোন পুরোহিত মন্ত্র কয়,
কথা কহ, কথা কহ!
চিতাভূমে আজি জ্বলে হোমানল, শব-কঙ্কাল
নবীন জীবন লহ!
উজ্জয়িনীর টুটেছে প্রাচীর, কাঞ্চীর শির চুমিছে ভূম,
গান্ধার—সে তো অন্ধ কারার মাঝারে ঘুমায় মরণ-ঘুম;
আজি বিদর্ভ বিগত গর্ব্ব, মগধ দগধ শ্মশান আজ
ইন্দ্রপ্রস্থ রাহুর গ্রস্ত মরুর ধূলায় লুটায় আজ।
ভুবনবন্দ্যা নাহি নালন্দা—জ্ঞানের অলকনন্দা বহি
মাটির ধূলায় রচিল স্বর্গ—জগৎ আনিল অর্ঘ্য বহি;
লক্ষ জ্ঞানের প্রদীপ-উজলা তক্ষশিলা সে কোথায় কহ!
শ্মশান! শ্মশান শবধূম-ম্লান! জ্বলে কালানল সর্ব্বদহ!
মহাগরিমায় মহাশ্মশানের জড়কঙ্কাল
ডাকি আমি আজ ডাকি—
চিতাভূমে আজি জ্বলে হোমানল, উদিল প্রভাত,
মেল আঁখি, মেল আঁখি!
ঝঞ্ঝা তুফানে শঙ্কা মানে নি, মহাসাগরের ফেনতরঙ্গ মথি
যব সুমাত্রা শ্যাম কাম্বোজ মাণিক তুলিয়া মা'র গলে গাঁথি।
চীন মহাচীন সিরিয়া জাপান আপনার হাতে
পরাল জ্ঞানের টীকা,
মানবহৃদয়দেউলে যাহারা প্রথম জ্বালিল ত্যাগ ধরমের শিখা;
যাহাদের রথ গড়ি নিল পথ জয়গৌরবে জগতের দিকে দিকে,
যাদের পতাকা শতযুগ ধরি তপন সমান ভাতিল গগন-বুকে।
বিধির মানবে নূতন করিয়া নীতিবন্ধনে
যে বিধাতা দিল বাঁধি—
তাদের অস্থি কহ, কথা কহ! দুঃখ দিনের কবি
আমি আজি সাধি!
কঙ্কাল লহ প্রাণ!
ওই শোন গাহে পুরোহিত আজি সঞ্জীবনীর অমর মন্ত্রগান!
ত্যাগী দধীচির তুমি কঙ্কাল, জাগো!
বজ্রভয়াল তুমি মহাকাল, জাগো!
ভাগ্যগগনে যুগসঞ্চিত ঘনতমিস্রারাশি
দহ! দহ, তারে দহ!
কথা কহ! কথা কহ!
সঞ্জীবনীর অমর মন্ত্রে শবকঙ্কাল নবীন জীবন লহ।"

সমালোচনা

অদ্বৈতসিদ্ধি—অনাদি অনন্তকাল হইতে ভারতে অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে, সেই সঙ্গে তাহার প্রতিযোগী দ্বৈতেরও উপলব্ধি মানবের মনে স্থান পাইতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত—কোনটী সত্য আর কোনটী মিথ্যা? অথবা উভয় সত্য, কিংবা উভয়ই মিথ্যা! এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুইটী বিষয় লইয়া যখন চিরকাল বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তখন উভয়ই সত্য। আবার এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন—যখন দ্বৈতই

সর্ব্বদা উপলব্ধ হইতেছে, তখন দ্বৈতই সত্য। আর বেদে বহুমন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, জীবও জগতের ভেদ প্রতীত হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে অল্পজ্ঞ জীব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিয়া জানিলে, তাহা 'গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুরেবমহেশ্বরঃ'—ইত্যাদির ন্যায় আরোপিত জ্ঞান হইবে; আরোপ কখনও সত্য হইতে পারে না, অতএব দ্বৈতই সত্য।

দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই উভয়টীকে সত্য বলা চলে না, কারণ দ্বৈত সত্য হইলে তাহার বিরোধী অদ্বৈত মিথ্যা হয় এবং অদ্বৈত সত্য হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বৈত মিথ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং উভয়ের অন্যতরকে সত্য বলিতে হইবে। জনমত গ্রহণ করিলে দ্বৈতের পক্ষে ভোট অধিক হইবে সত্য কিন্তু তাহার দ্বারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইতে পারে না। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ মিথ্যার মূলে একটী সত্য বস্তু নিহিত থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে মিথ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজের রূপ সকলকে দেখাইবে?

দ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—ব্রহ্ম, জীব, জগৎ সমস্তই সত্য ও পরস্পর ভিন্ন। এই বিচিত্র বৈচিত্র্যময়, নদনদীসমুদ্রাদি পরিশোভিত, সকলের অনুভূত, অসন্দিগ্ধ ও অবাধিত জগৎপ্রপঞ্চ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না; সত্য জগৎ যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ অবিতথ অদ্বৈততত্ত্বও বিরাজমান আছে, উভয়ের বিদ্যমানতায় বিরোধ কি? আরও এক কথা—প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং অনুমান ও শ্রুতির অবলম্বনীয়, সেই প্রত্যক্ষ যখন জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তখন জগৎকে মিথ্যা বলা প্রলাপ মাত্র। জগৎ আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ হইলে তাহা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয় কিরূপে হইবে, এবং তাহাতে সর্ব্বসাধারণের অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞাই বা কিরূপে হইবে? সুতরাং সর্ব্ববাদীর নির্ব্বিবাদ প্রত্যক্ষের অপলাপ করা উচিত নহে।

এইরূপ নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষ উদিত হইলে অদ্বৈতবাদিগণ তাহার উত্তরে বলিয়া থাকেন—"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন আত্মা একমাত্র বেদান্তগম্য। রূপাদিবিহীন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রাহ্য নহেন, প্রত্যক্ষের বিষয় না হওয়াতে অনুমানেরও বিষয় হইতে পারেন না; সুতরাং একমাত্র শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ ইহা "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় স্তুতিপরত্ব বলা যায় না। কারণ, উপক্রম ও উপসংহারের এক-বাক্যতা, পৌনঃপুন্য, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি (যুক্তি) রূপ ছয়প্রকার তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা এই সকল বাক্যের জীব ও ব্রহ্মের একত্বে তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া না জানা এবং পৃথক্ জানার পক্ষে অনাদি অজ্ঞান প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এবং সেই অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে এই বিচিত্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে। যেমন রজ্জুর স্বরূপ না জানায় তাহাতে সর্প, বস্ত্র ইত্যাদি বিবিধ বস্তুর কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে না জানিতে পারায় এই বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাসমান হইতেছে। যেরূপ রজ্জুর রজ্জুস্বরূপ জানিলে আর সর্পাদি ভ্রম থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হইলে আর জগদ্ ভ্রম থাকিতে পারে না। যদ্যপি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকলের জ্যেষ্ঠ, তথাপি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা তাহার বাধ হইতে পারে। শুক্তিতে মিথ্যা রজত

জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও 'ইহা রজত নহে'—এই পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদ্যপি শ্রাবণ প্রত্যক্ষ দ্বারা শ্রুতিবাক্যের পদপদার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে, তথাপি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রপঞ্চের পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদন করে না, বরং ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারিক সত্যত্ব বলিতেছে, প্রত্যক্ষের সত্যত্বাংশ শ্রুতিজ্ঞানের হেতু নহে, কিন্তু ব্যবহারিক অংশ; সুতরাং প্রত্যক্ষের সহিত শ্রুতির বিরোধ না হওয়ায় জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল।

মিথ্যা ও তুচ্ছ এক পদার্থ নহে। আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি তুচ্ছ বা অলীক; ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রাহ্য নহে এবং কোনরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল অবস্থিত থাকে না; কেবল শব্দের দ্বারা ইহাদের প্রতীতি হয় মাত্র। ভগবান্ পতঞ্জলি ইহাদিগকে 'বিকল্প' বলিয়াছেন। শুক্তিতে প্রতিভাসমান রজতাদি এবং রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্পাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রাহ্য, ইহারা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল অবস্থিত থাকে এবং অনন্তর যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ যে একভাবে থাকে না, প্রতিক্ষণ পরিণামশীল, সুতরাং ইহার নশ্বরত্ব—মিথ্যাত্ব অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

যুক্তির দ্বারাও অদ্বৈতের সত্যত্ব ও দ্বৈতের মিথ্যাত্ব অবগত হওয়া যায়। একের উপর দুই বা বহু আরোপিত, অতএব নিরপেক্ষ এক সত্য, সাপেক্ষ দুই বা বহু মিথ্যা। লোকজননী ভগবতী শ্রুতিও স্বয়ং দ্বৈতের নিন্দা করিয়া অদ্বৈতের সত্যত্ব ও দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বর্ণন করত স্বমত বিবৃত করিয়াছেন।

এই অদ্বৈতবাদ শাস্ত্রের পরম রহস্য। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মানবের অদ্বৈততত্ত্বে বাসনা হইয়া থাকে। অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। উপাসনার ফলে স্বর্গাদি ব্রহ্ম-লোকান্ত লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; বেদান্তবেদ্য অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয় না। উপাস্য-উপাসক ভাব, গুরুশিষ্যভাব প্রভৃতিতে দ্বৈত থাকিলেও তাহা ব্যবহারিক, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তত কাল থাকে, অদ্বৈতজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে সংশয় ও তাহার কারণ বিলয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন এক আকাশ ঘটগৃহাদি উপাধির ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির ভেদে জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন। ঘট, গৃহাদি উপাধির নাশপ্রাপ্তি ঘটিলে যেমন মহাকাশ ব্যতীত পৃথক্ আকাশ থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধির নাশ হইলে একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত জীব বলিয়া অন্য কিছুই থাকে না। জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত বা আরোপিত; অধ্যস্তের অধিষ্ঠান ব্যতীত পৃথক্ সত্তা নাই, ব্রহ্ম অধিষ্ঠান আর জগৎ আরোপ্য। সুতরাং অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধ হইল।

সমস্ত উপনিষৎ অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তদনুযায়ী পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিও তাহার অনুসরণ করিতেছে। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মে। কালক্রমে এই অদ্বৈতবাদের প্রচার হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে শিবাবতার ভগবৎ-পূজ্যপাদ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এই বেদান্তবেদ্য অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদ্‌ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং উপদেশসহস্রী প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থদ্বারা তিনি যে অমৃত জগদ্বাসীকে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা কোন যুগেই সম্ভবপর

নহে। দ্বৈতরসাস্বাদে অভিনিবিষ্ট, ভোগবিলাস-পরায়ণ, সুকৃতিবিহীন মানব ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া ইহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে তাহারা কৃপার পাত্র। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অনন্তর পদ্মপাদাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণ অদ্বৈতবাদের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞমুনি বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখ আচার্য্যগণ নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া আচার্য্যের প্রদর্শিত পন্থাকে রাখিয়াছেন; কিন্তু অদ্বৈতদ্বেষী দ্বৈতবাদিগণের আঘাত পুনঃ পুনঃ নিপতিত হইলেও স্বপ্রকাশ সত্যবস্তু চিরকালই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

কালক্রমে মধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্-ব্যাসতীর্থ 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের উপর ভীষণ অশনি নিপাত করেন। এই গ্রন্থ নব্যন্যায়ের ভাষায় রচিত এবং বিবিধ কূটতর্কজালে পরিপূর্ণ ও দুর্বোধ। এই গ্রন্থের প্রতিবাদ না করিলে বিদ্বান্ ও অদ্বৈতবাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইবেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া তদানীন্তন ৺শ্রীকাশীধামস্থ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর উপর তাহার প্রতিবাদের ভার ন্যস্ত করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণকুলের রত্ন, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্তাদি শাস্ত্রের আধার, যোগনিষ্ঠ, ভক্তি ও জ্ঞানের এক-নিকেতন, সন্ন্যাসিপ্রবর মধুসূদন 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নাম অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের উপর আপত্তি খণ্ডনে এমন অনুমানাদির প্রয়োগ করিলেন যে অদ্বৈতবাদ-সাম্রাজ্যের বিজয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র উড্ডীন হইল, ফলতঃ দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল। এই গ্রন্থে ব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃতে'র প্রতি অক্ষর ধরিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। 'ন্যায়ামৃত' ও 'অদ্বৈতসিদ্ধি' এই দুইখানি গ্রন্থ একস্থানে রাখিয়া তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতবাদে দ্বেষপরায়ণ হইয়া সম্প্রদায়-রক্ষার মানসে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, আর বেদের রহস্য অদ্বৈতবাদরূপ প্রকৃততত্ত্বের উপর যে বাধা পড়িয়াছে মধুসূদন তাহা অপনয়ন করিয়াছেন মাত্র, কোথাও কোনরূপ কটাক্ষপাত করেন নাই। বঙ্গদেশে বেদান্তীর সংখ্যা অতিবিরল হইলেও একমাত্র মধুসূদন সরস্বতী সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী জগৎকে যে মহার্ঘ্য রত্ন দান করিয়াছেন, আজ আমরা ভারতের সর্ব্বত্র তজ্জন্য সমাদৃত। পাশ্চাত্যজগৎ বা আধুনিক মায়ামরীচিকাময় বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্ লোকের ইহার এক পংক্তি বুঝিবার শক্তি নাই।

যদ্যপি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মভিন্ন আত্মা উপনিষদ্গম্য, তথাপি উপনিষদের তাৎপর্য্যে সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তর্কের প্রয়োজন। যদবধি ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চিত না হইবে, ততকাল কাহারও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইবে না। অতএব তর্কপরায়ণবাদীকে বুঝাইতে গেলে তর্কের সাহায্য আবশ্যক। এই গ্রন্থে এমনভাবে অদ্বৈতের অনুকূল সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থদর্শন ব্যতীত জানিবার উপায় নাই।

এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় চারিটী অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে ৬৪টী পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয়ে ৩৪টী পরিচ্ছেদ, তৃতীয়ে ৮টী পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থে ৬টী পরিচ্ছেদ বিদ্যমান আছে। প্রথম অধ্যায়ে জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরূপণ, দ্বিতীয়ে আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন, তৃতীয়ে শ্রবণ, মননাদি আত্মসাক্ষাৎ-কারের সাধননিরূপণ এবং চতুর্থে ফলস্বরূপ মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্রহ্মসূত্রের আদর্শ রাখিয়া অধ্যায়াদির বিভাগ করিয়াছেন। অদ্বৈতের

বিরুদ্ধে যত আপত্তি উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যত আপত্তি হইতে পারে, এই গ্রন্থে অতি নিপুণতার সহিত তৎসমুদায়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বৈতের সর্ব্বথা উপমর্দ্দন করতঃ অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা বাঙ্গালী হইলেও বঙ্গদেশে ইহার আদর ছিল না বা নাই; বরং অনেকে তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাঁহার মতের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; তাহার একমাত্র কারণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার উপকরণ ও সৌভাগ্যের অভাব। আমি ৺কাশীধামে অবস্থান কালে পূজ্যপাদ ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের নিকট 'অদ্বৈতসিদ্ধি' ও তাহার টীকা 'গৌড়ব্রহ্মানন্দী' অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। অতঃপর পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করি। সৌভাগ্যক্রমে অদ্বৈতমূর্ত্তি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অবতার পূজনীয় ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রীজী কৃপাপূর্ব্বক কয়েক বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুগ্রহে নানা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য কয়েকজন বিদ্যার্থী অদ্বৈতসিদ্ধির মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তন্মধ্যে সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের কিয়দংশের বিশদ অনুবাদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য এবং সরল সংস্কৃত ভাষায় একটী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের গুরুত্বানুসারে পণ্ডিত মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন ভাষায় প্রশংসা করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি নানাবিধ আদিব্যাধির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের অমূল্যদানস্বরূপ নবকলেবর-যুক্ত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' পাইয়া যে শান্তিলাভ করিয়াছি, তাহাও প্রকাশ করা যায় না। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে অবশিষ্ট গ্রন্থের প্রচার করুন, ইহা ভগবানের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

আরও বক্তব্য যে, বিবিধগ্রন্থলেখক, দর্শনাস্বাদ-চতুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদক। সম্পাদকের সুবিস্তৃত ভূমিকা ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদনকার্য্য অতি নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় মধুসূদনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আখ্যায়িকা, কিংবদন্তী ও সমসাময়িক বিদ্বদ্মণ্ডলীর সহিত ব্যবহারের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করা হইয়াছে এবং তৎপক্ষে বিবিধ যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। এইরূপে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত না হইলেও সত্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারা যায়।

৬নং পাশিবাগান লেন্ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু রাজেন্দ্রবাবুর অনুজ, অগ্রজের ন্যায় অনুজও শাস্ত্ররসিক। এই গ্রন্থ প্রকাশে যেরূপ অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ-রূপে প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থের বিষয়সূচীর পরিপাটী প্রভৃতির দ্বারা এবং উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপার দ্বারা গ্রন্থের যেরূপ সৌষ্ঠব হইয়াছে, তাহাতে উভয় ভ্রাতাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যে তাঁহারা দীর্ঘজীবনলাভ করতঃ এবংবিধ অমূল্য-গ্রন্থের প্রচার দ্বারা সমাজের উন্নতিবিধান করুন। পরিশেষে সহৃদয় বঙ্গবাসিগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা এই গ্রন্থের সমাদর করিয়া অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকের উৎসাহবর্দ্ধন করুন এবং বঙ্গভাষাভাণ্ডারের রত্নরাজির স্থিতির সহায়তা করুন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

শ্রীভঁাওতা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বইখানিতে স্বাধীনচিন্তার বেশ জোরাল প্রয়াস আছে। স্বাধীনচিন্তার দাম আছে। দেশবাসীর চিত্ত অনেকদিক্ থেকেই নানা কুসংস্কারমুক্ত হওয়া দরকার। লেখক এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণায় গতানুগতিক চিন্তা ও ধারণাসমূহের উপর উলঙ্গ সমালোচনার অসিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে তাঁহার অন্তরের সাহস ও নির্ভীকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সকল সংস্কারই ভ্রান্ত কুসংস্কার না হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার এই উক্তি—"ঈশ্বরের সংস্কার আমাদের আত্ম-শক্তিতে অবিশ্বাস, আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকারে সন্দেহ এনে দেবে"—কথাটা গায়ের জোরেই যেন বলা মনে হয় অথবা দূর দেশের তথাকথিত 'যুগবাণীর'ই প্রতিধ্বনি মাত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁহায় আছে, তিনি নিশ্চয়ই জানেন—এতবড় অসার কথা আর নাই। এখানে লেখক নিজের অজ্ঞাতসারেই অনধিকার চর্চ্চা করিয়া ফেলিয়াছেন, যে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ জানেন না সে সম্বন্ধে কথা কহিতে গিয়া নিজের অনভিজ্ঞতা—চলিত ভাষায় "আনাড়ীত্বে"রই পরিচয় দিয়াছেন। সাহসের ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিলেই তাহাকে দুঃসাহস বলে। লেখক দুঃসাহসিক, তবুও তাঁর চিন্তার আন্তরিকতাকে আমরা প্রশংসা করি। জ্ঞানের সাধনায় তাঁহার এই যৌবনের শক্তি নিজের সুসীম তল নিজেই খুঁজিয়া পাইয়া স্বস্থ ও সুস্থ হইবে, ইহাই আশা করি।

নিরনব্বই বনাম এক—(জাতীয়বাদী ও সাম্যবাদীদের আদর্শের বিরোধ) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মল্লিক সম্পাদিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাও পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনচিন্তাবাদের আর এক নমুনা। এই ধরণের ভাব ও ভাষা আমাদের কাণে একটু নীরস কচাকচির মতই যেন লাগে। হয়ত সেটা ভিন্ন ভাবেও সাধনায় অভ্যস্ত প্রাণের ও কাণেরই দোষ; কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ না বলিয়াও উপায় নাই। গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধেই অন্যতম লেখক শ্রীদুর্গাপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা—এইটাই মুক্তিপ্রয়াসী-জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কথা—শতকরা নিরনব্বই জন নয়।" কথাটা খুব তেজের কথা হইলেও খুব বড় কথা নয়। একজনের শুভচিন্তা ও ইচ্ছা দশজনকে, বিশ্বজনকে সংক্রামিত করে, ইহা জগতের নিয়ম। নিরনব্বই মানে majority—ইহা পাশ্চত্যের চিন্তা। ভারত সমষ্টির সত্তাই মানে। ব্যষ্টিকে সেই সমষ্টির চেতনা ও অনুভূতির সুরে সুর মিলাইয়া চলিতে হইবে। তাই ব্যষ্টির জীবন হইবে যজ্ঞ-স্বরূপ—অর্থাৎ উৎসর্গময়। ইহাই ধর্ম্ম। স্বাধীনতা অর্থে যদি স্বেচ্ছাতন্ত্র না হয়, তবে এই ধর্ম্মনীতি ক্ষুন্ন বা অস্বীকার করিয়া তাহা সিদ্ধ করার প্রয়াস বাতুলতা। আধুনিক শিক্ষার আবহাওয়া ও প্রভাবে এই আত্মহননকারী বীজের চতুর্দ্দিকে প্রচার ও প্রসার দেখিয়া আমরা সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠি; কিন্তু যুগের হাওয়া অস্বীকার করি না। তাই এরূপ গ্রন্থের আবির্ভাব সেই হাওয়ারই অনিবার্য্য লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চিন্তায় কবে আপনার গভীর সুরটীকে চিনিতে ও ধরিতে শিখিবে?



ভারতের আর্থিক সমস্যা

ভারতের ভীষণ আর্থিক দুর্গতির সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই মর্ম্মে লিখিতেছেন :—

"ভারতের খাদ্য দ্রব্য আজ সস্তা হইলেও পূর্ব্ব কালের ন্যায় দ্রব্যাদির বিনিময়ের অভাববশতঃ ও বর্ত্তমান নিদারুণ আর্থিক কৃচ্ছ্রতার দরুণ সস্তা জিনিষও ভারতবাসী ক্রয় করিতে পারিতেছে না। লর্ড আরউইন প্রমুখ ইংরাজ মনীষিগন পর্য্যন্ত ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইংলণ্ডজাত পণ্যের এই প্রধান বাজারটীকে বজায় রাখিতে হইলে, ভারতবাসী জনসাধারণের ক্রয়শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।……বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির ফলে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকই যে কেবল বিপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। উহাদের ঘরে অর্থাভাব হেতু জমিদারদের ঘরেও খাজনার টাকা উঠিতেছে না। ইহার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা মন্দা পড়ায়, সকল দিকেই অভাব ও দৈন্য দেখা দিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। রেলে, কাষ্টমে, পোর্টে, সকল বিভাগেই আয় হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় সমস্ত বিভাগেই ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা হইতেছে—চাকুরীয়ার বেতন বা সংখ্যাহ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছে। ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতিহেতু ব্যবসাদারগণও তাঁহাদের কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতেছেন।"

লেখক বলেন,

"শুধু চাকুরী ও কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে এই আর্থিক দুর্গতির সমাধান হইবে না। জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।……যাহাতে জনসাধারণ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীপরিচালিত নিখিলভারত কাটুনী-সমিতি, বাংলায় খাদিপ্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ ইতিপূর্ব্বেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের একটা সাড়া

আসিয়াছে। বস্তুতঃ, দেশের ধনসম্পদ্ ও খনিজ সম্পদ্ হইতে কত পণ্য যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলে যদি মাত্র চাকুরী ও কৃষির উপর নির্ভর না করিয়া এইদিকেও নজর দেন, তাহা হইলে অবস্থার অনেক উন্নতি সম্ভবপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সেই বিদ্যা এইদিকে প্রয়োগ করা যে একেবারে অসম্ভব তাহা মনে হয় না।

এই সঙ্গে, অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিলাস বর্জ্জন করিতে হইবে।......খাদ্যদ্রব্য কম হইলে যে দুর্ভিক্ষ তাহা নৈমিত্তিক; কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যখন দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন এই সঙ্কটজনক অবস্থায় ভোগলালসাজনিত অনাবশ্যক প্রয়োজন সৃষ্টি করা উচিত নহে। অর্থকৃচ্ছ্রতার কারণ যে অন্নাভাব তাহা সহজে দূরীভূত হইতে পারে না, যদি পাশ্চাত্যের আমদানী ভোগমূলক জীবনাদর্শের পরিবর্ত্তন না হয়। তাই ডাঃ রায় বলেন,

'... ..আর আমাদের দেশের শ্রীমানেরা ধোপায়, নাপিতে, সিনেমায় পয়সা দিয়ে আরামে দিন কাটায়। কলিকাতার অলিতে গলিতে শেভিং সেলুন, চা-বিস্কুটের দোকান ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজিয়ে উঠেছে। কলিকাতায় সিনেমা কি রকম হয়েছে? এসব চল্‌ছে কিসে? আমি দেখি আর ভাবি—হায় রে, তোদের এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই—বাজে-খরচ করে' নিজের দারিদ্র্য ঘরে টেনে আন্‌ছিস্!'

এই বিলাস ও আরামপ্রিয়তা কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সঙ্ঘ বা জাতির তেজঃ ও জীবনীশক্তি হরণ করে, উদ্যম, শ্রমশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা লোপ পায়, সে মানুষ, সংহতি ও জাতি ক্রমে ক্রমে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়া পরের অঙ্গুলীহেলনে চলিতে বাধ্য হয়।

আমরা কথায় কথায় ইউরোপের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। কিন্তু বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক যুধ্যমান জাতিকেই অতিপ্রিয় চা চিনির খরচও কমাইতে হইয়াছিল। হিন্দুকুলসূর্য্য রাণা প্রতাপও স্বদেশের মুক্তির জন্য নিজ ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়াছিলেন ও রাজপুত জাতির সম্মুখে কঠোর ত্যাগব্রতের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব, মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ও জাতীয় জীবন প্রাণবান্ ও বীর্য্যসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইলে, আমাদের এই ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।"

চরকা ও খাদি

যুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন পালিত চরকা সম্বন্ধে আমাদের যে পত্রখানি দিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া অবিকৃত তুলিয়া দিলাম। তাঁর প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বসাধারণের জন্যও প্রযুজ্য; এই হেতু আমরা চরকা সম্বন্ধে যাহা বুঝি তাহা "প্রবর্ত্তকে"ই প্রকাশ করিলাম। ২০ নং সূতা দিয়া ৮ নম্বরের কাপড় পাওয়ার ব্যবস্থা কেন হয়—তাহার উত্তর ইহার মধ্যেই আছে। খাদির দোকানে সকল সময়ে

"সঙ্ঘের" কর্ত্তৃপক্ষ না থাকায় হয়তো তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সে ত্রুটি আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি।

"মাননীয়,

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সমীপেষু—

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ আশ্রম" চন্দননগর।

মহাশয়,—

আমি কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতে চরকা চালাইতেছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সুতা কাটিয়া তাহার কি সার্থকতা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি আপনার প্রতিষ্ঠিত "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রিকার গ্রাহক। তাহাতে আপনি মাঝে মাঝে চরকা সম্বন্ধে উপদেশ দেন; সেই সম্বন্ধে আপনাকে ২।৪টী কথা আমি লিখিতেছি। আশা করি, যে আপনি তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিবেন।

১৩৩৭ সালের শ্রাবণ মাসের "প্রবর্ত্তকে" আছে যে "খাদি প্রতিষ্ঠান, অভয় আশ্রম প্রভৃতি সুতা খরিদ করিতে অথবা সুতার বিনিময়ে কাপড় দিতে পারে।" আপনাদের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কলিকাতার দোকানে আমি দুইবার সুতা লইয়া গিয়াছিলাম; একবার সুতা খারাপ বলিয়া লয় নাই, আর একবার আমার ২০নং সুতার বদলে আপনারা ৮ নং সুতার কাপড় দিতে চাহিয়াছিলেন।

আপনার ১৩৩৭ সালের ভাদ্র মাসের "প্রবর্ত্তকে" ভুবনবাবুর পত্র ও আপনার উত্তর পড়িলাম। ভুবনবাবুর যাহা সমস্যা আমারও প্রায় সেই সমস্যা, এবং আপনি তাহার যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, আমার মনে হয় তাহাতে আপনি ভুবনবাবুর সমস্যার স্থানে স্থানে উপেক্ষা করিয়া আপনার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সংখ্যায় ৪৫৬ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিয়াছেন, যে 'নিকৃষ্ট সুতায় কাপড় বুনান চলে না'। একথা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু সুতা নিকৃষ্ট বলিয়া আপনারা যত সহজে ফেরৎ দিতে পারেন, যাহার সুতা সে তত সহজে সুতা ফেলিয়া দিতে পারে না, এবং সুতা যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় তাহার জন্যই বা আপনারা কি ব্যবস্থা করিতেছেন? মহাত্মা গান্ধী হইতে আপনারা সকলেই সুতা কাটিতে বলেন; কিন্তু তাহাতে যে সমস্যা আছে তাহার সমাধানের উপায় কি? আপনি "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছেন, যে 'সতীশবাবু, প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি খাদির জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন বলিয়াই আজ খাদির বিজয়শ্রী লক্ষ্যে পড়ে।' খাদির সহিত চরকা কাটার কোন নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। খাদির উন্নতি হইলে যাহারা কিনিবে তাহাদের সুবিধা হইতেছে; কিন্তু যাহারা চরকা কাটিতেছে তাহাদের কোন সুবিধা হয় তাহা আমার মনে হয় না। 'দেশ ইহাদের বোঝা মাথায় যদি বহিয়া লয় তবেই ত ব্রত পূর্ণ হয়'। দেশ মাথায় বোঝা বহিবার পূর্ব্বে যে সকল সমস্যা আছে তাহা সমাধানের উপায় কি?

১৩৩৭ সালের পৌষ মাসের "প্রবর্ত্তকে" ৮১৭ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিয়াছেন—আপনারা কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং আপনাদের তাঁত আছে এবং তাহা সমবায়মূলক করিতে পারেন। গত পৌষসংক্রান্তির মেলার সময় ত্রিবেণীতে আপনারা যে হ্যাণ্ডবিল বিলাইয়াছিলেন তাহাতেও সমবায়মূলক তাঁতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আপনাদের কলিকাতার দোকানে জিজ্ঞাসা করায় তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। ৮১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'আপনাদের এই পল্লীর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ খানি চরকা প্রবর্ত্তিত হউক'। আমার একলার বাটীতেই পাঁচ খানি চরকা চলে এবং তাহাতে দৈনিক ৩।৪ হাজার গজ সুতা প্রস্তুত হয়, সেই সুতার বদলে কাপড় লইতে যাহা খরচ হয় তাহাতে খদ্দর ক্রয় করিয়া পড়িলে আর্থিক বিষয়ে সুবিধা হয়। সে কারণ আপনাকে জানাইতেছি, যে অপেক্ষাকৃত সুলভে কাপড় বুনাইবার কোন ব্যবস্থা আপনারা করিতে পারিবেন কি না? আশা করি, আমার এই পত্রের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। আমি চরকা সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র এবং আপনিও একজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। সে কারণ আপনাকে পত্র দিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতেছি এবং আশা করি, তজ্জন্য আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

বিনীত—

শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন পালিত।"

খাদির কাজে আমরা প্রায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আছি—পূর্ণখাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে; মহাত্মা মিশ্র খাদির পরিপন্থী, এবং আমরাও তাহা পরে বুঝিয়াছি। যাহা সহজ, তাহা তপস্যা নয়; খাদিকে সফল করিতে হইলে কঠোর

তপস্যারই প্রয়োজন আছে। মহাত্মা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড কটিতটে জড়াইয়াছেন দেশের বস্ত্রাভাব দূর করিতে। অন্নে বস্ত্রে যে জাতি স্বাবলম্বী সে জাতির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। সুতরাং যাঁরা চরকা ধরিবেন, তাঁহাদের বুঝিতে হইবে—শ্রম ও অর্থের হিসাব এই ক্ষেত্রে মারাত্মক। আমরা এই দুই দিয়া একপ্রকার দেউলিয়া হইয়াছি; কিন্তু তবুও ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হই নাই। কেন? আমরা ইহার ভাল ও মন্দ দুই দিকই দেখাইতেছি। আশা করি, লেখক আমাদের কথা মর্ম্ম দিয়া বুঝিবেন।

ভারতে চিরদিন কাপড়ের কল ছিল না, বিলাত হইতেও কাপড় আসিত না; অথচ এই কোটী কোটী নরনারীর বস্ত্র সংকুলান করার ব্যবস্থাটা যে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, ব্যবসায়ী ইংরাজ তাহা বুঝিয়াছিল এবং ঘরে ঘরে চরকা চলিলে সে ব্যবসা যে অচল হইবে তাহাও জানিয়াছিল। এ দেশের বস্ত্রশিল্প-উচ্ছেদের ইতিহাস নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। অতএব চরকা যে দেশের বস্ত্র যোগান দেওয়ার ব্রহ্মাস্ত্র, ইহা না বলিলেও চলে। কিন্তু এই যন্ত্রযুগে তাহার প্রয়োজন আছে কিনা এই লইয়াই সমস্যা।

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৫৮৪ কোটী গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। আমাদের বেশভূষার আড়ম্বর আজ যত বাড়িয়াছে, পূর্ব্বে তত ছিল না, এবং তাহাতে আমাদের সভ্যতা ও আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহার কারণও দেখা যায় না। আজ মহাত্মা অর্দ্ধ উলঙ্গ বেশেই সভ্যদেশে অভিযান করিলেন। আমরাও দেখিতেছি—ধুতি চাদর ব্যবহার করিতে কোনই আপত্তি নাই; বরং এ দেশের আবহাওয়ায় ইহাতে শরীরের সচ্ছন্দতাই রক্ষা হয়; এই হেতু উক্ত কাপড়ের পরিমাণ যদি এক তৃতীয়াংশ করা যায়, তাহাতেও আমাদের ক্ষতি হইবে না। যদিও বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কাপড়ের চাহিদা শুধুই ভারতবাসী নয়; তবুও আমরা বেশভূষার আড়ম্বর কম করিলে, অন্ততঃ ২০০ কোটী গজ কাপড় হইলেই চালাইয়া লইতে পারিব। আমাদের দেশের তাঁতে এই বৎসরে ১১০ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তাঁতগুলি যদি চরকার সুতায় চলে এবং এই দিকে জোর দেওয়া যায়, ২০০ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন করা ইহাতে অসম্ভব হইবে না।

'নিখিলভারত-চরকাসঙ্ঘ' হইতে এই বছর যত খাদি উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার পরিমাণ ৫৪,৯১,৬১০ গজ। কিন্তু ইহা ব্যতীত ভারতে চিরদিনই চরকার সুতায় কাপড় বুনার ব্যবস্থা আছে। অন্ধ্র, বেহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য স্থানে চরকার কাপড়ের পরিমাণ যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়—আমরা এই বৎসরে ১,১৬,৭৬,৯৩০ গজ কাপড় উৎপাদন করিয়াছি, ইহা আশার কথা বলিতে হইবে। যদি ভারতবাসী বসনবিলাস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে পারিব। এমন কি, ভারতে কাপড়ের কলগুলিকেও তখন কারবার বন্ধ করিতে হইবে। 'বয়কট' অস্ত্র সিদ্ধ করার জন্য কলের প্রচলন, এ যুক্তি ধনী বণিকের। 'বয়কট' শব্দের ভারতীয় অর্থ ভূদেব বাবুর কমঠ-ব্রত। জাতি আত্মরক্ষার জন্য যদি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে, তবে স্বল্প বস্ত্র ব্যবহারে আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই খাদির দ্বারাই দেশের বস্ত্রাভাব দূর করিতে পারিব।

খাদি রাষ্ট্রনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেই হইবে না। বস্ত্র-ব্যবহার বাবদে আমরা কত টাকা বিদেশীর হাতে উঠাইয়া দিই তাহার হিসাব সকলেই জানেন। ক্রমেই আমরা অর্থহীন হইয়া পড়িতেছি; এই অবস্থায় অর্থব্যয়ের

পথ রোধ করার উপায়—তাঁত ও চরকার বিস্তৃত স্থান করিয়া দেওয়া। মহাত্মার মুখ চাহিয়া ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইলে চলিবে না—দেশের স্থায়ী শ্রী ও সম্পদ্ রক্ষার জন্যই প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে খাদিপ্রীতি অটুট রাখিতে হইবে।

খাদির চাহিদা ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দেই অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল—তাহার কারণ, মহাত্মার প্রতি দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। সে শ্রদ্ধা স্থায়ী ও দৃঢ় হইলে আমরা অচিরে ইহার বিজয়শ্রী দেখিতাম। উত্তেজনার পর অবসাদ আছেই। আজ খাদির বিক্রয় একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে, এবং ইহা ব্যতীত অন্নসঙ্কটও উপস্থিত—এদিকেও আমাদের সতর্ক হইতে হইবে

রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুণ তুলার দর সম্ভবতঃ খুব পড়িয়া গিয়াছে; এমনকি, তুলা উৎপাদন করার খরচ তুলা বিক্রয় করিয়া দুই তৃতীয়াংশও উঠে না। এই অবস্থায় কৃষকেরা সূতা করিয়া খরচ তুলিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে বাংলার বাহিরের খাদির দর কমিয়া যায়। কাজেই বাংলার খাদি এই হারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়, অথচ বাংলার উপরোক্ত সুবিধা থাকে নাই—এই অবস্থায়, আমাদের খাদি প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ক্ষতি সহজেই অনুমান করা যায়।

মহাত্মার সত্যাগ্রহ সংগ্রামে খাদির চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হয়। খাদির উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে যে হারে খাদি প্রস্তুত হয়, তাহা অকস্মাৎ চতুর্গুণ হওয়া সম্ভব নহে; অন্যদিকে আবার মহাত্মা সূতার বিনিময়ে খাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে নূতন কাটা সূতা মিহি হইলেও তাঁতের অনুপযোগী হওয়ায়, যত নম্বরের সূতা তদনুপাতে কাপড় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যাঁহারা সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত খাদিব্রতীদের এইজন্যই বিরোধ বাধিয়াছিল। সূতা কাটিবামাত্র বয়নোপযোগী হওয়া সহজ নহে। উত্তেজনার সময়ে একথা অনেকেই বুঝেন নাই, কাপড়ের তাগিদই বড় হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহা করিয়া, খাদিব্রতীরা যখন দেখিলেন—এইরূপ ব্যবস্থা হইলে মূলধন ক্ষয় হইবে, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহারা সূতার বিনিময়ে কাপড় দিতে কুণ্ঠা করিয়াছিলেন।

অন্য দিকে বিদেশ হইতেও খাদির আমদানী হইল এবং খাদির কাটতি দেখিয়া দেশী মিলওয়ালারা মোটা সূতায় খাদি প্রস্তুত করিয়া ছড়াইয়া দিল। এই অবস্থায় খাদির সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, সস্তায় খাদিপরিধানের সহজ তৃপ্তিতে খাঁটী খাদিপ্রস্তুতির কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

অভয় আশ্রম ও খাদিপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ দেখিলে, খাদি অধিক বিক্রয়ের যুগে এইরূপ হওয়ার কারণ সহজেই চক্ষে পড়িবে। এইবার বাংলায় খাদিব্যবসায়ীর অবস্থাটার দিক্‌টা দেখাই:—

৬ হইতে ১০ নম্বর প্রতি সের সূতার দাম ৸০, হইতে ১৫ নম্বরের সূতা ৸৵০, এইরূপ ৵০ হারে যত সূতা সূক্ষ্ম হইবে দর তত অধিক হইবে। ২৫ নম্বর হইতে ৩০ নম্বরের সূতা ১৷৷০ টাকায় খরিদ করা যায়।

একখানি ৮×৪৫ ইঞ্চি কাপড় ১০ নম্বরের সূতায় যে খরচ পড়ে তাহার তালিকা দিতেছি:—

৮×৪৪, কাপড়ে ১৪ ছটাক সূতার দাম		৷৷৵১০
বুনাই খরচ	... ...	।৵০
রঙের খরচ	... ...	⁄০
ধোলাই খরচ	... ...	⁄৫
রেলওয়ে মাশুল প্রভৃতি	...	৵০
ব্যবসায়ীর মুনাফা	...	৵০
		১৷৵১৫

এক জোড়া কাপড়ের দাম ২৸৴১০, এইরূপ অধিক মূল্য দিয়া খাদি-ব্যবহারের উৎসাহ আর নাই ; এক্ষণে এই খরচ দিয়া খাদিব্রতীদের এইরূপ এক জোড়া কাপড় ২৲ দরে বিক্রয় করিতে হইতেছে। যদি ইহার শীঘ্র প্রতিকার না হয়, খাদি ব্যবসা-রূপে চলা কোনরূপে আর সম্ভব হইবে না।

কাজেই খাদিকে যদি দাঁড়াইতে হয়, তুলা হইতে সূতা. বুনাই প্রভৃতি প্রতি গৃহস্থের দৈনন্দিন কার্য্যরূপে দাঁড় করাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আমরা আর অন্য উপায় দেখি না। বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ লোক তাঁত চালাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। আমাদেরই প্রায় ২০০ তাঁত আছে; কিন্তু ইহাদের খাদি বুনাইতে প্রবৃত্ত করা যে কি বিষম ব্যাপার, তাহা যাঁহারা কাজে নামিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। চরকার সূতা ৸০, ৸৵, ১৷০ টাকা এই হারে খরিদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখিয়া, তাঁতীকে যথারীতি পারিশ্রমিক দিয়া, বাজারের প্রতিযোগিতায় ইহা যে কোনদিন দাঁড়াইবে না—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি ; কিন্তু ইহা দেশের রুচিসঙ্গত হইলে এবং দেশ আরও কিছুদিন স্বার্থত্যাগ করিলে গৃহশিল্পরূপে খাদি দাঁড়াইয়া যাইবেই ; সেদিকে আমাদের চেষ্টার কথাটা এইখানেই বিবৃত করিব।

আমরা খাদিকে অতঃপর গৃহশিল্পরূপে কি ভাবে দাঁড় করান যায়, তাহার জন্য ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ধারাবাহিকরূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। পৌষ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত আশ্রমের অনেকেই অবসর-মত সূতা কাটিয়া প্রায় এক মণ একত্রিশ সের তের ছটাক সূতা উৎপাদন করে। আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন অর্দ্ধ ঘণ্টা সূতা কাটি। ইহার জন্য তুলা খরিদ করা হইয়াছিল ২৯ সের, পাঁজ খরিদ হইয়াছিল ১ মণ ২২ সের ১১ ছটাক, তুলায় সূতা কাটিতে ১৩ সের ১৫ ছটাক তুলা নষ্ট হইয়াছে ; তুলা, পাঁজ, পেঁজা ও চরকা মেরামতের খরচ পর পর ১৪৲, ৫৪৸৵১০, ৮৴ [illegible] ও ৮৶৵১০, একুনে ৮৫৷৵০ ; তাহা হইলে এক মণ [illegible] সের ১৩ ছটাকের দাম অনুযায়ী সূতার সের হয় ১৶০,—এই অবস্থায় দেখা যায়, সূতা কাটিলে, বাজারে যে সূতা বিক্রয় হয় তাহার দর অপেক্ষা ইহাতে অধিক পড়িয়া যায়। পাঁজ না কিনিলে, কোনপ্রকারে যথাদরে সূতা প্রস্তুত হইতে পারে।

আমরা শ্রাবণ মাসে নিজেরা তুলা পিঁজিয়া ও তুলা নষ্ট না করিয়া সূতা কাটার ব্যবস্থার দ্বারা যে সূতা উৎপন্ন করিয়াছি, তাহা গড়ে ১১ নম্বর সূতা ধরিলে সেরপ্রতি ৸৶১০ মূল্য হয়। ইহা কতকটা বাজারের সূতা খরিদের কাছাকাছি আসিয়াছে ; অবশ্য এই সূতার মধ্যে ১০ হইতে ২৫, ৩০ নম্বরের সূতাও আছে।

কিন্তু ইহাতেও খাদির মূল্যহ্রাস হয় না। পূর্ব্বে যে ৮ × ৪৪″ কাপড়ের বাণী ।৵০ ধরা হইয়াছে, উহার মধ্যে সূতা-পাটের সকল প্রকার পারিশ্রমিক আছে। সহর অঞ্চলে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; এমন কি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতার বাজারে কাপড় আনিতে যে ৵০ আনা মাশুল পড়ে, তাহা বাদ দিলে যদি তাঁতীরা এই সূতায় ৷০ বাণীতেও কাপড় বুনে, তাহা হইলেও কাপড়ের মূল্যহ্রাস হইবে না।

আমরা অতঃপর এই ব্যবস্থা করিয়াছি—তুলা ৷০ আনা সের যদি খরিদ হয়, প্রত্যেকে আধঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া আমরা সূতা পাইয়াছি প্রায় ⁄৮ সের। পরিশ্রমের মূল্য না লইলে এক সের সূতার দর মাত্র কিছু কম ৷০ আনাই হইবে। সূতা যদি ২০ হইতে ৩০ নম্বরের হয়, তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য অনেক বাড়িবে, কিন্তু কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা দাঁড়াইবে না।

এইজন্যই মহাত্মা বলিয়াছেন—হোটেলের সহিত গৃহস্থের রন্ধনশালার যেমন তুলনা হয় না, তদ্রূপ কলের সহিত খাদি উৎপাদন করার ব্যবস্থা তুলনার বাহিরে। এক একটি সংসারের মাথা প্রতি মাত্র ১২।১৩ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়; এই কাপড়টুকুর জন্য, পূর্ব্বে যেমন ঢেঁকিছাঁটা চাউল খাওয়ার ব্যবস্থায় ঘরে ঘরে ঢেঁকির ব্যবস্থা ছিল, বাংলাদেশে তদ্রূপ তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখনও আসামে ইহার প্রচলন আছে; ভদ্রসম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও তাঁতের কাজ গৌরবের সহিত করিয়া থাকে—আমরা কেন পশ্চাৎপদ হইব?

সূতাকাটা প্রত্যেকেই করিতে পারে, নারী পুরুষের ইহাতে বাধা থাকা উচিত নয়। বাড়ীতে একখানি তাঁত রাখিলে, মাসে কয়েকখানা কাপড়ের টানা করিয়া লইলে, একমাস বুনিবার মত ব্যবস্থা হইতে পারে। কোন সংসারেই দশখানি কাপড় প্রতি মাসে প্রয়োজন হয় না। ২০।২৫ নম্বরের সূতার ৮ ছটাকে একখানি কাপড় হয়; ৴৪ সের সূতা হইলে ৮ খানি কাপড়ের টানা দেওয়া যায়। কয়েক ঘর গৃহস্থ মিলিয়া প্রতিমাসে ৴৪ সের সূতা কাটার ব্যবস্থা হইলে সেই কয়েক ঘরের কোনক্রমে একখানি তাঁত চলিতে পারে—আমরা এই কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। গৃহস্থ সংসারে খদ্দর চালাইতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই; তবে ধনীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা চিরদিন অধিক মূল্য দিয়াই তাঁতের কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহাদের এদিকে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

যাহারা সূতা কাটে, তারা গাছ হইতেই তুলা সংগ্রহ করিয়া যদি এই কার্য্য করে, তবে তাহা যথেষ্ট উপায় বলিতে হইবে এবং ইহা একেবারে অসম্ভব নহে; আমরা এ বৎসরে কয়েক শত তুলাবৃক্ষে কতখানি তুলা হয় তাহার হিসাব রাখিয়া দেখিব, খাদিকে আমরা আরও কত অল্প মূল্যে ব্যবহারের বস্তু করিতে পারি।

উপসংহারে বলিবার বিষয় হইতেছে—খাদি কেবল অর্থসমস্যার বিষয় না করিয়া, জাতি-গঠনের অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পরস্পরের সহিত পরস্পরের কতখানি নিবিড় পরিচয় থাকিলে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে বিরোধ বাঁচাইয়া চলিতে পারি, তাহা সকলেই বুঝেন। এই খদ্দরকে আশ্রয় করিয়া গঠন-যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করা অসম্ভব নয়; কিন্তু জাতি-গঠনের তাগিদ যদি না থাকে, তাহা হইলে সূতা কাটিয়া তাহার হিসাব কষাকষিতে আমরা কোনদিন ইহাতে সফলকাম হইব না। সংযুক্ত শ্রমের ভিতর দিয়া আমাদের সংযুক্ত প্রাণের পারিবারিক অভেদ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে হইবে। এক তারে ঝঙ্কার দিলে কোটি হৃদয়ের তন্ত্রে আঘাত পড়ার এই সূত্রযজ্ঞ অবজ্ঞেয় নহে। আমরা খাদিকে জাতি-গঠনের উপায় বলিয়া লইয়াছি এবং ইহার ভিতর জাতির আর্থিকসমস্যার মীমাংসাও যে নাই, তাহা নহে; ধান্য ও কার্পাসশিল্পে যে জাতি স্বাবলম্বী, সে জাতির মৃত্যু নাই।

সূতা ভাল করা কাটুনীর অভ্যাস ও শিক্ষার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সর্ব্ব বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রার্থীকে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা ইহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি; কিন্তু তেমন আকুলতা কৈ এবং আমরা বার বার বলিব—সূতা কাটিয়া শুধু কড়ির হিসাব সে ধৈর্য্য দিবে না। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ জীবন চাই, তবেই খাদি তার পুণ্য-পতাকা-স্বরূপ আমাদের ঘরে ঘরে উড়িবে; নতুবা ইহা ধীরে ধীরে তাঁতী জোলার কুঁড়ে ঘর পরিপূর্ণ করিয়া বাংলার বস্ত্রাভাব দূর করিবে—সে বহুদিন; কিন্তু আমাদের সে ধৈর্য্যও আছে। আমাদের মনে রাখিতেই হইবে, এ বৎসরেই খাদির কর্ম্মে সূতাকাটুনী পাইয়াছে ১১,০২,২৪৫৲ আর জোলা পাইয়াছে ১২,২০,৪৭৫৲ টাকা; ইহা জাতির সৌভাগ্য বলই বাড়াইয়াছে। যদি খাদি ব্যবহারও করি, তাহা হইলে ঘরের কড়ি ঘর হইতে যে এক কড়াও বাহিরে যাইবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

সন্তবাসি

(উপন্যাস)

[শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়]

৬

কখন সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিছুই বুঝিতে পারে নাই, ঝাড়ুওয়ালারা গাড়ী পরিষ্কার করিতে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দিল।

শশিশেখর অবাক্!

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাত্রীরা কেহ আর গাড়ীতে বসিয়া নাই, মোট-পোঁটলা ছেলেমেয়ে লইয়া দু'একজন মাত্র প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া তখনও ঘোড়ার গাড়ীর দালালদের সঙ্গে বচসা করিতেছে। প্রকাণ্ড ষ্টেশন, গাড়ীখানা যেন একটা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছে। শশিশেখর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কল্‌কাতা?'

ঝাড়ুদার একজন বলিল, 'হাব্‌ড়া টীশন্— উতার্ যাইয়ে।'

ভয়ে ভয়ে শশিশেখর গাড়ী হইতে নামিয়া একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ফটক পার হইয়া প্রকাণ্ড ষ্টেশনের ভিতর দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখে গঙ্গা। পুলের উপর অসংখ্য যান-বাহন এবং লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এই কর্ম্ম-কোলাহলময় জনবহুল মহানগরীর কোথায় তাহার স্থান কিছুই সে জানে না, তবু সে পুলের উপর লোকজনের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণে মনে হইল—টিকিট তাহার কাছে কেহ চাহে নাই। মনে হইল, মা তাহার নিজে আসিয়া দেখা দিতে হয়ত' পারে না; কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত বিপদ্-আপদ্, সমস্ত অকল্যাণ হইতে তাহাকে রক্ষা করে।

সোজা চলিতে চলিতে শশিশেখর দেখিল, একটা রাস্তার ধারে পাগ্‌ড়ি-ওয়ালা একজন লোক টিনের তৈরী লম্বা একটা ঠোঙার মুখে জল ঢালিয়া দিতেছে, আর তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা অঞ্জলি পাতিয়া তাহাই পান করিয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

পিপাসার্ত্ত শশিশেখর চুপ করিয়া সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। যে-লোকটি জল দিতেছিল, সে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কতকগুলি ভিজা ছোলা ও খানিকটা গুড় তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'খা লেও বেটা।'

এই অযাচিত অনুগ্রহে শশিশেখরের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল, চোখদুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

তাহার পর গুড় ছোলা আর জল খাইয়া সেই যে পথে পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখা গেল, তখনও সে তেমনি ঘুরিতেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শশিশেখর তখন টলিতেছে, পায়ে যেন আর জোর নাই। পথে

পথে এমন করিয়া আর কতক্ষণই বা সে ঘুরিবে! না খাইয়া এইবার শরীর তাহার অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। শশিশেখর ভাবিল, এম্‌নি করিয়া আর দু'দিন যদি সে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে তিন দিনের দিন হয়ত সে আর চলিতে পারিবে না। চারদিনের দিন হয়ত সে এই ফুটপাথের উপরেই পড়িয়া থাকিবে। পাঁচদিনের দিন মরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই মৃত্যুর কথা ভাবিতে গিয়া তাহার মনে হইল, না, মা তাহাকে মরিতে কিছুতেই দিবে না। মা'র অদৃশ্য স্নেহ এবং করুণা তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া তাহাকে রাখিবেই, এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

এম্‌নি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে শশিশেখর হঠাৎ একসময়ে দেখিল, পথের ধারে একটী দোকানের সুমুখে অনেকগুলা লোকের ভিড় জমিয়াছে।

মস্ত বড় একটা কাপড়ের দোকান এবং সেই দোকানের ভিতর গ্রামোফোন বাজিতেছে, আর তাহাই শুনিবার জন্য এত লোক!

গান শুনিবার জন্য জনতার এক পাশে শশিশেখরও চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ সেই জনতার মধ্যে 'চোর' 'চোর' বলিয়া একটা চীৎকার উঠিতেই লোকগুলা সব এদিক্ ওদিক্ একটুখানি সরিয়া গেল। কে যেন কাহার পকেট কাটিয়া টাকা চুরি করিয়াছে!

দেখা গেল, দোকানের আলোর সুমুখে একজন ভদ্রলোক তাঁহার কাটা পকেটে হাত চালাইয়া কি কি বস্তু তাঁহার চুরি গিয়াছে কাঁদ কাঁদ মুখে তাহাই বলিতেছেন আর কয়েকজন শ্রোতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া শুনিতেছে।

গ্রামোফোন বন্ধ হইয়া গেছে। শ্রোতারা তখন চোর লইয়া ব্যস্ত!

কেহ প্রশ্ন করিতেছে,—'ধর্‌তে পার্‌লেন না মশাই? আচ্ছা বোকা ত' আপনি…'

আবার কেহ বলিতেছে,—'পাকা হাত মশাই ওদের, কোন্ সময় যে চুরি করে কিছু বুঝবার উপায় নেই।'

'চোর আর যাবে কোথায় মশাই? আছে নিশ্চয়ই এরই মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে।'

'ঠিক বলেছেন দাদা, চোর অনেক সময় ভিড়ের মাঝখানেই সাধু সেজে দাঁড়িয়ে থাকে।'

দোকানের 'শো-কেস্'টার পাশে চুপ করিয়া নিতান্ত নিরীহের মত শশিশেখর দাঁড়াইয়াছিল। একটা লোক পট্ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তুমি কে হে?'

শশিশেখরের মুখখানি তখন শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। কি যে বলিবে কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নিতান্ত করুণ দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

লোকেরা একটা হুজুগ পাইলে হয়। সকলেই যেন তাহার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়!

'বাড়ী কোথায় রে, এই! কি নাম কি তোর?'

কে একজন মাথায় তাহার এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'কথা বলিস্ না কেন, বোবা নাকি?'

শশিশেখর বলিল, 'আমার নাম শশী।'

'এই বয়েসেই পকেট মার্‌তে শিখেছ বাবা?'

বলিয়া আর এক ব্যক্তি আগাইয়া আসিয়া তাহার গেঞ্জিটা তুলিয়া এদিক্ ওদিক্ নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিল। বলিল, 'কাঁচিটা কোথায় চালান করে' দিলে বাবা এরই মধ্যে? সঙ্গে আরও সাক্‌রেদ্ ছিল বুঝি?'

ব্যাপার দেখিয়া আশ-পাশের দোকানীরাও তখন ছুটিয়া আসিয়াছে। শশিশেখরের ম্লান মুখখানি দেখিয়া তাহাদেরই মধ্যে একজনের বোধকরি দয়া হইল। বলিলেন, 'পাগল হয়েছেন মশাই? চোর এতক্ষণ পালিয়েছে। দেখছেন না— ছেলেমানুষ, ভদ্দরলোকের ছেলে……'

'তাই হবে। যা বাড়ী যা, ভাগ্।' বলিয়া যে-লোকটা শশিশেখরকে সন্দেহ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আগাইয়া আসিয়াছিল সে-ই সকলের আগে চলিয়া গেল।

শশিশেখরের চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছিল। কি যেন সে বলিতেও চাহিল; কিন্তু ঠোঁট দুইটি তাহার অসম্ভব রকম কাঁপিয়া উঠিতেই বলা তাহার আর হইয়া উঠিল না, দর্ দর্ করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া আসিল মাত্র।

কিন্তু একজন চলিয়া গেলেও সেখানে লোকের অভাব ছিল না। আর একজন অম্‌নি বলিয়া উঠিল,—

'এঁ:, আবার কান্না দ্যাখো! দাও হে একটা পুলিশ ডেকে দাও ত'—কান্না ওর আমি বার কর্‌ছি।' বলিয়া বোধ করি পুলিশের জন্যই সে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছে, এমন সময়ে দুই হাত দিয়া ভিড় ঠেলিয়া কালো কিম্ভূতকিমাকার মোটা সোটা একটা লোক পান চিবাইতে চিবাইতে শশিশেখরের কাছে আসিয়া টপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, 'আয়!'

'আয়' বলিয়াই সে আর কাহারও দিকে না তাকাইয়া শশিশেখরকে টানিতে টানিতে আবার তেমনি ভিড় ঠেলিয়া দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া বলিল, 'বোস্।'

শশিশেখর অবাক্!

লোকগুলাও তখন হাঁ করিয়া সেই দিক পানে তাকাইয়া আছে।

ছেলেটাকে সে কেমন করিয়া মারে তাহাই দেখিবার জন্য কয়েকজন লোক তাহার পিছু পিছু হুড়্‌মুড়্ করিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিতে যাইতেছিল, মোটা লোকটি হাতজোড় করিয়া নিষেধ করিল,—'দোহাই আপনাদের! দোকানে ঢুক্‌বেন না,—ওইখান থেকেই বাড়ী যান।'

দোকানের মালিক বোধকরি তিনি নিজেই। বলিলেন, 'ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে টানাটানি কর্‌ছেন,—লজ্জা করে না?'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান গুর্খা দরোয়ানটাকে হুকুম করিলেন,—

'তাড়িয়ে দাও সব এখান থেকে। কেউ যেন গোলমাল না করে।'

বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। লোকগুলা তখন আপনা হইতেই সরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাহার চুরি গিয়াছে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশিশেখরের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিয়া গেল,—'তিনটে টাকা ছিল মণি-ব্যাগে। খা ব্যাটা কতদিন খাবি!'

শশিশেখরের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

দোকানের মালিকের নাম মাখন সান্যাল। দেখিতে কদাকার, গায়ের রং কালো, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, বড় বড় গোঁফ্ পাক খাইয়া খাইয়া মুখের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, দেহের সর্ব্বত্র ভাল্লুকের মত লোমে ঢাকা।

বাড়ী তাঁহার বেশি দূরে নয়। পাশের একটা গলির ভিতর দোতলা একখানি বাড়ী। বাড়ীখানি নিজের। সংসারে লোক বলিতে তাঁহার বুড়ী মা, স্ত্রী এবং এক অবিবাহিতা কন্যা। পুত্রসন্তান নাই, এবং সেইজন্যই বোধ করি ওই ছেলেটার উপর নির্য্যাতন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিন হইতে তাঁহারই সংসারে শশিশেখরের একটুখানি স্থান হইয়াছে।

শশিশেখর তাঁহারই বাড়ীতে দু'বেলা খায় আর দোকানে কাজ করে।

কাজ এমন বিশেষ কিছুই নয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গিয়া কাঠের মাচানের উপর বসিয়া থাকিতে হয়।

নীচে বসিয়া বসিয়া যাহারা কাপড় বিক্রি করে, তাহারা হাঁকে হয়ত'— 'ল' চুড়ি পাড়, কালোর ধাক্কা, সাত শ' বিরানব্বই!'

কাপড়টা বাহির করিয়া মাচানের উপর হইতে নম্বর দেখিয়া ঠিক সেই লোকটার হাতের কাছে কাপড়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

শিখিতে মোটেই দেরী হয় না। কোথায় কি কাপড় আছে, কোন্ কাপড়ের কি নাম, দু' দিনেই সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

মাখনবাবু বসিয়া বসিয়া দেখেন আর বলেন, 'ছোঁড়াটা খুব কাজের লোক হবে দেখ্‌ছি,—না কি বল হে জিতু?'

জিতু তাহার মুখখানা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া বলে, 'নাঃ, ও আপনি বসে' রয়েছেন বলে'। নইলে দশটা ডাকে সাড়া দেয় না।'

আর একজন খাতা লিখিতে লিখিতে হুঁকা টানিতেছিল, বলিল, কি যে একখানা বই পেয়েছে মশাই সেখানা পড়্‌ছে ত' পড়্‌ছেই।'

উপরের দিকে তাকাইয়া সান্যাল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বই রে—? ওরে ও ছোঁড়া!'

শশিশেখরেরই বয়সী একটা ছেলে ঠিক বাঁশীর মত কণ্ঠস্বরে উপর হইতে জবাব দিল, 'ফাষ্টোবুক্!'

'ফাষ্টোবুক্! কই দেখি, নিয়ে আয় দেখি বইখানা, ওরে ও শশী' বলিয়া মাখন সান্যাল তাহার হাতের ইসারায় শশীকে নীচে নামিবার ইঙ্গিত করিলেন।

বইখানা হাতে লইয়া শশিশেখর নীচে নমিয়া আসিল।

দেখা গেল, বইখানি 'ফাষ্টবুক্' নয়, ছবিওয়ালা একখানি ইংরাজি বই। বইখানি উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'এ বই কোথায় পেলি রে তুই?'

ভয়ে ভয়ে শশিশেখর বলিল,—'দিদিমণির কাছে।'

'এ বই তুই পড়তে পারিস? কোথাও আট্‌কায় না?'

শশিশেখর বলিল, 'না।'

সান্যাল বলিলেন, ' 'ফাষ্টোবুক্ তাহ'লে পড়তে পারিস তুই?'

শশিশেখর বলিল, 'এটা ফাষ্টবুক্ ত' নয়—এটা রবিন্‌সন্ ক্রুশো।'

'সে আবার কি! তবে যে ওই ছোঁড়া বল্‌লে ফাষ্টোবুক্!'

'না। ফাষ্টবুক্ আমার অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে।'

সান্যাল বলিলেন, 'তাহ'লে তুই অমলার সমান সমান পড়িস্ বল্!'

অমলা তাঁহার মেয়ের নাম। গাড়ী করিয়া সে স্কুলে পড়িতে যায়।

শশিশেখর বলিল, 'দিদিমণির চেয়েও এক ক্লাস উঁচুতে পড়তাম আমি। এ বইখানা দিদিমণিই আমাকে দিয়েছে।'

সান্যাল বলিলেন, 'হুঁ। অমলা খুব ভালো ইংরাজি পড়ে। বুঝলে জিতু, অমলা—আমার বড় মেয়েটা হে, স্কুলে ফাষ্টো হচ্ছে বরাবর। বুঝলে? মাষ্টারনীরা ভারি ভালবাসে—পুরস্কার পেয়ে পেয়ে ঘর বোঝাই করে' ফেলেছে। আমার মা বলে—মেয়েকে পড়াতে হবে না, সেকেলে লোক কিনা! আমার কিন্তু বাবা সেই এক জিদ্। ওকে আমি পড়াবই। বিয়ে আমি এখন ওর দিচ্ছি নে। বুঝলে?

এই বলিয়া তিনি তাহার কর্ম্মচারী জিতুর সঙ্গে কন্যা অমলার গল্পে এম্‌নি মশ্‌গুল্ হইয়া পড়িলেন, যে শশিশেখর যে কাছে দাঁড়াইয়া আছে সেদিকে তাঁহার আর খেয়ালই রহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাপড়ের একজন খরিদ্দার আসিতেই বইখানা তিনি শশীর হাতে ফিরিয়া দিয়া গল্প বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'যা পড়গে যা বসে' বসে'।'

খুশী হইয়া শশিশেখর আবার তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উঠিল।

কোন্ দিক দিয়া কি যে হয় কিছুই বলা যায় না। সেইদিনই বাড়ী গিয়া সান্যাল-মশাই ডাকিলেন, 'ওরে ও অমলা, শোন্!'

অমলা তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। 'কি বলছ বাবা?'

'হাঁরে ওই শশী শুনছি নাকি ইংরাজী পড়তে পারে!'

অমলা হাসিল। বলিল, 'থার্ড ক্লাসে পড়তো হে!'

সান্যাল বলিলেন, 'বটে! তাহ'লে তোর চেয়ে নীচে—বল্।'

অমলা বলিল, 'না বাবা, আমার চেয়ে ওপরে।'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'বিদ্যে দানের ওপরে আর দান নেই—জানিস্ অমলা! ছেলেটা বামুনের ছেলে, ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিই—না কি বল্! ডাক্ দেখি তোর মাকে।'

মাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। সান্যাল-গৃহিণী পাশের ঘরেই ছিলেন। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, যেমন রোগা তেম্‌নি লম্বা, চোখে রূপায়-বাঁধানো চশমা,—ঝঙ্কার দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন,—

'কেন গো, বলেছি না, যেদিন এসেছে সেইদিনই ত' বলেছি,—দাও স্কুলে ভর্ত্তি করে' দাও, বামুনের ছেলে ধর্ম্ম পুণ্যি হবে; তা ধর্ম্ম পুণ্যিতে কি মন আছে তোমার, তুমি শুধু ভাবছ—কার গলায় ছুরি দেবে, একটাকার কাপড় পাঁচটাকায় বিক্রি করবে,.....নরকে কোথাকার! খাবে নরকে হাবুডুবু, তখন বল্‌বে যে হ্যাঁ, বলেছিল বটে!'

'সেই ভালো।'

পরদিন নরকের ভয়েই বোধকরি সান্যাল মহাশয় জামাজুতা পরিয়া হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি লইয়া গাড়ী চড়িয়া শশিশেখরকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। এবং তাহার পর হইতে শশিশেখরও অমলার সঙ্গে আহারাদি করিয়া কাপড়ের দোকানে না গিয়া স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল।

সান্যাল-গিন্নী ডাকেন, 'ওরে ও শশী, আয় বাবা আয়, খেয়ে নিবি আয়! বামুনের ছেলে—না খেয়ে খেয়ে শেষে আমার নরকের ব্যবস্থা করে' দিস না বাবা; আয়।'

আসিবে কি, সে তখন অমলার সঙ্গে কত দেশ-বিদেশের কত মজার মজার গল্প করিতেছে।

শশী বলে, 'মা ডাকছে যে! চলো।'

অমলা তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে। বলে, 'চুপ্! আরও ডাকুক্। ডেকে ডেকে যখন গালাগালি দেবে তখন যাব।'

গালাগালি দিতে তাঁহার বিশেষ দেরি হয় না। বার কতক ডাকিয়াও যখন সাড়া পান না, তখন সুরু করেন, 'হাজার হোক্ পরের ছেলে ত'! ওই কাপুড়ে মিন্সেই যত নষ্টের মূল। কেন বাপু, পরের গলায় ছুরি দিয়ে পরকালের পথ ঝর্‌ঝরে কর্‌ছ তাই কর, আবার এই বামুনের ছেলেটিকে ঘরে এনে পাপের বোঝা বাড়াবার দরকার কি! কখন্ কি অপরাধ হয়—হে ঠাকুর, অপরাধ নিয়ো না বাবা!'

বলিয়া যুক্তকরে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার তাঁহার মেয়েকে লইয়া পড়েন।

'বলি ও অমলা, অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, বাপ্ না হয় জুতো-মোজা পরিয়ে খিরিস্তানী করবার মতলবে আছে, তাই বলে' কি সময়ে চারটে খেতেও হবে না ছাই! নিজেও খাবি না আর ওই ছেলেটাকেও খেতে দিবি না?'

এইবার তাহারা দু'জনেই হাসিতে হাসিতে মা'র কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। শশিশেখর বলে, 'আমার কিছু দোষ নেই মা, এই অমলা আমায় আসতে দেয় নি।'

হাসিতে হাসিতে অমলা বলে, 'খবরদার বলছি, শশী মিছে কথা বোলো না! না-মা, ওই শশীই বরং বলছিল—মা'র গালাগালি বড় ভাল লাগে।'

সান্যাল্-গৃহিণী বলেন, 'হ্যাঁ তা লাগ্‌বে বই-কি বাছা, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাই আর তোমরা দিব্যি...... নিজের মা হ'লে এতক্ষণ ঠ্যাঙাতো তোমায়, তা জানো!'

নিজের মা'র কথায় শশিশেখরের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসে এবং তাহাই সে গোপন করিবার জন্য জানালার কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। একে রাত্রিকাল, স্যান্যাল-গিন্নী চোখে ভাল দেখিতে পান না; সেজন্য চিন্তা নাই, কিন্তু অমলার চোখ বড় তীক্ষ্ণ। তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া ওঠে, 'মা আমাদের বড় ভুলে যায় বাপু, কিছু মনে থাকে না। বলেছি হাজারবার তুমি ওর মা'র কথা বোলো না, বললেই কাঁদে, তবু সে কিছুতেই...... কই দেখি—!' বলিয়া অমলা শশিশেখরের কাছে গিয়া দুইহাত দিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইয়া সত্যই সে কাঁদিতেছে কিনা দেখিতে চায়।

শশিশেখর বলে, 'ধেৎ! কাঁদব কেন?'

বলিয়াই সে তাহার হাত দুইটা সরাইয়া দিয়া ম্লানমুখে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসি দিয়া অশ্রু ঢাকানো বড় দায়। ধরা পড়িয়া গিয়া শেষে হাতের ইসারায় অমলাকে চুপ করিতে বলিয়া, কাপড় দিয়া চোখ দুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলে, 'কাঁদ্‌ব কেন? চোখে একটা—'

'হাতী ঢুকেছিল, না?' বলিয়া অমলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে মৃদু ভৎসনা করিয়া বলে, 'ছিঁচ্‌কাঁদুনে!'

সান্যাল-গৃহিণী খাবার ধরিয়া দিয়া শশিশেখরকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলেন, 'না না

কাঁদে নি, তুইও যেমন! কেন রে শশী, ছি, কাঁদতে আছে? আমি যেমন অমলার মা, তোরও তেমনি মা হই শশী, তোর কিছু ভাবনা নেই, কাঁদিসনে। আমার ছেলে নেই, তুই-ই আমার ছেলে।'

শশীর কান্না ইহাতে থামা দূরে যাক্, আরও যেন বেশী করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চায়।

প্রাণপণে তাহা সে দমন করিয়া এম্‌নি আঁর একজনের কথা ভাবে। সন্তান ত' তাহারও ছিল না। কিন্তু সে ত' তাহাকে এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই!

মা তাহাদের দু'পাশে বসাইয়া খাওয়ান। খাওয়া শেষ হইলে বলেন, 'যাও তোমরা এবার নাচো, গাও, গপ্প কর, ফুর্তি কর, আমি সেই কাপুড়ে মিন্সেকে দেখি।'

অমলা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে, 'হ্যাঁ-মা, বাবাকে তুমি কাপুড়ে'-মিন্সে বল কেন বল ত?'

মাও হাসেন। বলেন, 'বলব না? কাপড় কাপড় করেই জনম গেল; ধর্ম্ম নেই, পুণ্যি নেই, কাপুড়ে বলব না ত' কি বলব বাছা!'

এমন সময়ে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বেঁটে সান্যাল-মশাই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার সেই মোটা রূপা-বাঁধানো লাঠি, গায়ে সাদা ধপ্‌ধপে লংক্লথের ডবল্-ব্রেষ্ট্ সার্ট, একহাতে একটা কাগজের মোড়কে বাঁধা কয়েকখানা বই।

তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলেন, 'শুনেছি গো সব শুনেছি। আমায় কাপুড়ে বলা হচ্ছিল; না রে?'

অমলা বলে, 'হ্যাঁ বাবা, আমি বারণ করি, মা তবু কিছুতেই শোনে না। কাপুড়ে' যেন তোমার ডাক-নাম!'

মা বলেন, 'কাপুড়ে নয় ত' কি! ওই দোকান হলো গিয়ে ওদের তিনপুরুষের দোকান। তিন পুরুষ ধরে' কাপড় যারা বিক্রী করে তারা কাপুড়ে' নয় ত' কী বাছা?'

সান্যাল-মশাই-এর হাতে কাগজের পোঁট্‌লাটা অমলা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এইবার সেটা দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'বাবা, এটা কি?'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'যাও আগে হাত ধুয়ে এসো মা, দেখাচ্ছি, ওটা তোমাদেরই জন্যে এনেছি।'

হাত না ধুইয়াই এঁটো হাতে লাফালাফি করিতেছে দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'বেশ কর্‌ছে, দিক্ ওই এঁটো হাত তোমার গায়ে লাগিয়ে। তুমিই ত' ওকে খিরিস্তানী করে' তুললে, নইলে বামুনের মেয়ে—এঁটোকাঁটা জ্ঞান থাকে না গা! ছি! ছি!'

শশী ও অমলা দু'জনেই হাত ধুইয়া আসিয়া কাগজে মোড়া পোঁট্‌লাটা খুলিতে বসিল।

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'খাতা, জলছবি, পেন্সিল, দু'জনে সমান-সমান ভাগ করে' নাও। আর ওই যে ছবিওলা ইংরেজি বই দু'খানা—একখানা তোমার, একখানা শশীর।'

খাতা, পেন্সিল, জলছবি—অমলা ভাগ করিতে বসিল, আর শশিশেখর বই দেখিতে লাগিল।

দেখিল, বই দু'খানির মধ্যে একখানি হোয়াইট্‌এওয়ে লেড্‌ল' কোম্পানীর দোকানের ছবিওয়ালা মূল্য তালিকা আর একখানি—কয়েকটি বাড়ী ও পুলের ছবিওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারিংএর বই।

শশিশেখর বলিল, 'এ বই দুটো কেন এনেছেন?''

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'সে কি রকম? দু' টাকার এক পয়সা কমে ছাড়লে না বেটা, বললে,

খুব ভালো গল্পের বই বাবু, আপনি নিয়ে যান—ছেলেরা খুশী হবে। তাহ'লে ত' ঠকিয়েছে দেখ্ছি।'

অমলাও বই দু'খানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া হাসিতে লাগিল।—'বাবা ভারী ঠকে' আসে বাপু! কাল কি আর সে দোকান-দারটার তুমি দেখা পাবে?'

ঘরের ভিতর হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, 'ঠক্‌বে না? কাপড় কিনতে যারা আসে তাদের পেলে যে তোর বাবা ঠকায়! সেই জন্যেই ত' নিজে ঠকে। বেশ করেছে ঠকিয়েছে ওকে, আচ্ছা হয়েছে!' বলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, তিনিও হাসিতেছেন।

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'কাল তোর মাকে দিস্ ও বই দু'খানা, বদলে নিয়ে আসবে। আমি ত' আর ইংরেজি জানি না যে, প'ড়ে নিয়ে আস্‌ব; তোর মা জানে, ও কিছুতেই ঠক্‌বে না।'

এই ইংরেজি জানা লইয়া কতদিন কত বচসা তাহাদের হইয়া গেছে।

মা বলিলেন, 'জানিই ত'। তোমার চেয়ে ভাল জানি। দ্যাখ্ শশী, কই ওয়াটার মানে ওকে জিজ্ঞেস্ কর দেখি, কিছুতেই বলতে পারবে না, আর আমি দ্যাখ্ বলে' দিচ্ছি।'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'জানি না? দেখবে বল্‌ব? আন্ ত' বাবা শশী এক গ্লাস ওয়াটার, ভারী পিপাসা পেয়েছে।'

শশী ও অমলা দু'জনেই হাসিয়া উঠিল।

শশিশেখর বলিল, 'মা হেরে গেলেন।'

মা বলিলেন, 'আচ্ছা, আর-একদিন হারিয়ে দেবো দেখিস্। ওটা আমারই কাছে শেখা। যাক্; জামা জুতো খুলে তুমি এসো ত' দেখি, ওগো, শুন্‌ছো! এ-সময় আর ওয়াটার খেয়ো না,—খেলে আর ভাত খেতে পারবে না কিন্তু।'

সান্যাল মশাই বলিলেন, 'আসি। ওরে বই দুটো তাহ'লে তুলে রাখ্—কাল দেখব,—বদলে দেয় ত'.....'

শশিশেখরের বলিতে কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল, তবু সে বলিল, 'বদ্‌লে একটা রামায়ণ .....'

কথাটা মা বোধকরি শুনিতে পাইয়াছিলেন, বলিলেন, 'দেখ্‌লে—শশীর কেমন বুদ্ধি দেখেছ? বা রে শশী, হিন্দুর ছেলে—রামায়ণ মহাভারতই ত' পড়তে হয় বাবা! আর ওই খিরিস্তানী পোড়ার-মুখী—ওর মুখ দিয়ে বেরোলো না, তুই ইংরেজি পড়ে পড়েই মর্! বাপ্ তোর সায়েবের সঙ্গে বিয়ে দেবে, মেম্ সায়েব হবি।—ওগো শুনছো, শশীর জন্য কাল একটি ভাল রামায়ণ এনে' দিয়ো। রামায়ণখানি তুমি আমায় পড়ে' পড়ে' শুনিয়ো বাবা শশী, কেমন? আহা, বামুনের ছেলের মুখে রামায়ণ শুনব কাল থেকে, ওই নরুকের সংসার করার পাপ হয়ত' তাতে একটুখানি কমবে বাছা! ও না আনিয়ে দেয়, কাল তোমাকে রামায়ণ একখানি আমি নিজে আনিয়ে দেবো।'

লাল রঙের পেন্সিলটার ওপর ইলেক্‌ট্রিকের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া শশিশেখর তাহাই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অমলা তাহাকে একটা চিমটি কাটিয়া দিয়া তাহার দিকে শশিশেখরকে ফিরিয়া তাকাইতে বাধ্য করিয়া, চোখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার কানে-কানে বলিল,

'তবে আর কি, সব দুঃখই ঘুচে গেল তোমার!'

বলিয়া সে তাহাকে সেখান হইতে উঠিয়া আসিবার ইঙ্গিত করিয়া নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ—)

কামাখ্যার কথা

—:০:—

বাংলার ইতিহাস নাই। বাঙ্গালীর পা রাখিবার প্রাচীন ভিত্তি ছিল না—এ জাতিটা একপ্রকার ভুঁইফোড় হইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। আদর্শের জন্য ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রদেশে চাহিতে হয়। অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, বৃন্দাবন, গুজরাট, রাজপুতনা ছাড়া আমাদের গর্ব্বের স্থান নাই; রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, নানক, প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতির চরিত্র ছাড়া অনুসরণ করার মানুষ বাংলায় মিলে না। সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস আজ যাহা বাহির হয়, তাহা অপূর্ব্ব; ধর্ম্ম, বীরত্বের অমর-কাহিনী—বাঙ্গালীর শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া আমরা আজ ধন্য হই।

ঋগ্বেদে 'আপতো য তু পনয়োঽস্মন্না দেব পীয়বঃ" অর্থাৎ দেবতাদের শত্রু পণিগণ দূর হও—তখন কত গর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামের কথা পড়িতাম, আজ সে ভুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই সংঘর্ষ সেদিন আর্য্যজাতির, দেবজাতির গৌরবকাহিনী হইতে পারে; কিন্তু আজ তাহারই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় ভারতের আর্য্যসভ্যতা নিঃশেষপ্রায়। প্রতিহিংসার বীজ, অত্যাচারের বীজ জাতি উৎসন্ন হইলেও ধ্বংস হয় না, নূতন মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রতিশোধ লয়। ভারতের সে দেবাসুর সংগ্রামের ইতিহাস আর হেঁয়ালী নয়, একটা আদিম জাতিকে উৎসন্ন করিয়া একটা জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার মধ্যে লক্ষ্যে পড়ে। আজ সে পণিগণ নাই, আর্য্যজাতিই বা কোথা! সে বিক্রম, সে আদর্শবাদই বা কোথায় গেল!

হত্যা করিয়া, বিতাড়িত করিয়া, মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া কোন জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য স্থায়ী হয় না। যে জাতির অভ্যুত্থান-যুগে যত অত্যাচার হয়, সে জাতির অধঃপতনের কাল তত দীর্ঘ হয়। ভারতে আজ এই হিন্দুজাতির মূলে এমনই মহাপাপ আশ্রয় করিয়াছিল; তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরও কত দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিবে তাহা কে বলিতে পারে!

বৈদিকযুগে আর্য্যসভ্যতার জয়ডঙ্কা পিটিয়া যে জাতিটা 'গান্ধার হইতে জলধি শেষ' রাজ্য জয় করিল, সে অসুর, ম্লেচ্ছ, পণি—ভারতের আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদসাধন অথবা আত্মসাৎ করিয়া জগজ্জয়ী হইল—সে রাজা, সে জাতি আজ গেল কোথা! এই প্রশ্ন আজ যে বার বার মনে গুমরিয়া উঠে।

'আছি' বলিলে আর শুনিব কেন? তাহারা যেমন একটা বিশাল জাতিকে ভারতের বক্ষ হইতে মুছিয়া দিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তদ্রূপ আজ সেদিনকার সেই বিজয়ী জাতিটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া, ভারতে অন্য এক জাতি তাহাদের বিশিষ্ট সভ্যতা লইয়া সিংহাসন পাতিয়াছে। আর শতাব্দী পরে দেখিও, তোমাদের প্রাচীন স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইবে, নিজেদের হিন্দু বলিতেও বাধিবে। তোমরা চাহিবে, লাঙ্গুল-কাটা শৃগালের ন্যায় সকল জাতিই লাঙ্গুলহীন হউক; কিন্তু সেকথা, যে জাতির প্রাণ আছে, তাহারা শুনিবে না—তোমাদের মাথা মুড়াইয়া তাহাদের ধর্ম্মে ও আদর্শে তোমাদিগকে দীক্ষা দিবে; আপত্তি করিলে ছলে, বলে, কৌশলে তোমাদের অস্তিত্বটুকু মুছিয়া দিবে।

তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দাঁড়াইয়া এই কথা মনে হইল; মনে পড়িল, বামনপুরাণের কথা—অনধিকারী বোধে, কি রূপক দিয়াই না জাতির প্রতিভাবান্ পুরুষেরা দেশকে বুঝাইয়াছিল, দৈত্যরাজ বলির পাতালপ্রবেশ বৃত্তান্ত! ইহা যে নিছক বৈদিকভারতের সমরাভিযানের ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়কাহিনী! দৈত্যরাজ বলিকে বলপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিদায় করার কাহিনী আজ আর হীন, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যজাতিও স্বীকার করিবে না—অতিদানে বলির মাথায় বামনদেব পা দিয়া তাঁহাকে রসাতলে পাঠাইয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। এমন বোকা বুঝান কথা আর কেহ শুনিতে চাহে না; যাদুবাক্যে দীর্ঘযুগ দেশকে ভুলাইয়া, হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্মাকীর্ত্তন যে শ্রেয়ঃ ফল দেয় নাই, তাহা আজিকার এই সংশয়চিত্তপ্রাণ জাতিকে দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। সত্য কথাটা সত্যরূপে প্রকাশ করিলে কি যে হানি হইত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই; মিথ্যা দিয়া মানুষের মন আচ্ছন্ন রাখিলে—যেদিন সত্যের আলোক আসিয়া পৌছিবে, সেদিন অতীতের এই দুর্ব্বুদ্ধিকে হেয় করার জন্য জাতি আত্মদ্রোহী হইলে, দোষ দিবার কিছু থাকে না। আজ হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা—কালপ্রভাব বলিয়া সান্ত্বনা লইলে কি হইবে? একদল শ্রেষ্ঠপুরুষের আত্মম্ভরিত্বই ইহার কারণ বলিতে হইবে। স্বদেশ, স্বজাতিকে অন্ধকারে রাখিয়া, দলবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার এই উগ্রপ্রয়াস, এই বিশাল হিন্দুজাতিটার মূলে বড় গুরুতর আঘাত দিয়াছে—আমরা আত্মদোষেই আজ উৎসন্ন হওয়ার পথে।

কামরূপ রাজ্য সুদূর চীন হইতে লোহিত সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র লোহিত সাগরের ক্ষীণস্মৃতিচিহ্ন, বাংলার অর্দ্ধাংশ সেদিন সমুদ্রগর্ভেই নিহিত ছিল। আর্য্যসভ্যতা গৌড়দেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়া নিঃশেষ হয় নাই; সমুদ্র-পাড়ি দিয়া কামরূপ জয় করিতেও যে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আজ অন্বেষণ না না করিলেও মিলে—আর্য্যসভ্যতার সহিত প্রাচীনযুগের আসুরিক রীতিনীতির এমন সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় না।

সমগ্র ভারত যখন অসুররাজ্য ছিল, তখন শুনা যায়, গান্ধার হইতে এই জলধি শেষ, অর্থাৎ লোহিত সাগর অবধি তাহাদের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই জাতির ভিতর হইতেই একটা নূতন সভ্যতার অভ্যুত্থান হউক, অথবা মধ্যএশিয়া হইতেই আর্য্যজাতির আগমন সত্য হউক, এই নূতন সভ্যতার পীড়নে সেই আদিম জাতিটা লোহিতসাগরে ভাসিয়া কতক কামরূপে আসিয়া আশ্রয় লইল, কতক বা অনির্দ্দিষ্ট পারাবারে ভাসিতে ভাসিতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। এই অসুরজাতিই নাকি 'আসেরিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। পণিগণ হইতেই ফনিসিয়ান জাতির উৎপত্তি; ইহাদের পণি কালকেয় নামেও অভিহিত করা হইত। নিবাতকবচ পাণ্ডুপুত্রের বিক্রমে সমুদ্রগর্ভে স্থান করিয়া লয়; ইহারাই ম্লেচ্ছ, কচ। পশ্চিমভারতে কচ্ছপ্রদেশ কি ইহাদেরই আদিপুরুষের স্মৃতি বহন করে!

কামরূপে যাহারা আশ্রয় লইল, তাহাদের উপর আর্য্যজাতির আক্রমণ—কেবল ইন্দ্রাদি দেবতারাই করেন নাই; ধারাবাহিক আক্রমণে ইহাদের বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল। বামনদেবের পর পরশুরামও কামরূপে অভিযান করেন; এই লোহিতসাগরের উপকূলেই মাতৃহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এইখানেই তিনি ব্রহ্মকুণ্ডতীর্থ স্থাপন করেন; কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া তিনি কামরূপে আর্য্যসভ্যতা প্রচারে উদ্যোগী হয়েন।

কিন্তু কালে তাঁহারা ম্লেচ্ছজাতির আচার গ্রহণ করিয়া পতিত হন। এই ব্রাহ্মণের রক্তধারা আশ্রয় করিয়া এখনও মিশ্‌মি, দাফ্লা ও মিরিজাতি আসামের পর্ব্বতে, অরণ্যে, উপত্যকায় বাস করে। ব্রহ্মকুণ্ডতীর্থে এই মিশমিজাতিই পৌরহিত্য চলিতেছে

বলির "পাতাল" প্রদেশ পশ্চিমভারতেই অবস্থিত আছে বলিয়াই শুনা যায়। বলির পুত্র বাণ। তাঁহার দুহিতা উষার সহিত কৃষ্ণ-সুত অনিরুদ্ধের গোপনপ্রণয় উপন্যাসের অপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ। বাণরাজ খুব সম্ভবতঃ ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পুনরায় পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়েন; কেননা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত তেজপুরে তাঁর কীর্ত্তিগাথা এখনও লোকবিশ্রুত—এমন কি অনিরুদ্ধের কারাগার কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বাণরাজার সংগ্রামক্ষেত্র তীর্থস্থানরূপে আজিও বর্ত্তমান। এই সকল দেখিয়া ভাবিয়া কত যে মনে হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না। ভারতের আদিম-জাতি—অসুর, পণি, ম্লেচ্ছ, কোচ, নিবাতকবচ, কালকেয় যে নামেই অভিহিত হউক, তাঁহারা যে বন্যপশু ছিলেন না, ইহা পৌরাণিক কাহিনী পাঠে বিশেষভাবেই অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদেরও একটা বিশিষ্ট শিক্ষা, সভ্যতা ছিল, ধর্ম্ম ছিল, সমাজবিধান ছিল; কিন্তু আর্য্যজাতির ধারা তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই, সহজে আর্য্যজাতির মধ্যে আত্মবৈশিষ্ট-বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হন নাই। তাই উভয় সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। এই অগ্নিগর্ভ হইতেই বুঝি জগজ্জাতির সৃষ্টি হইয়াছে! যাযাবর, ফিনিসিয়ান, আসিরিয়ান প্রভৃতি জাতির মৌলিক নাম ভারতের আদিম জাতির সংজ্ঞা হইতেই পাওয়া যায়।

নরকাসুর হইতেই কামরূপের মহাতীর্থ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। অসুরেরা লিঙ্গোপাসক ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কামরূপে ইঁহারা রাজ্যস্থাপন করিয়া, স্ত্রীযোনি স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। ঋষি বশিষ্ঠ মহাতান্ত্রিক ছিলেন; নরকাসুরের প্রতিষ্ঠিত কামাখ্যা যোনিপীঠে তিনি প্রধান পূজকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৌহাটীতে এখনও বশিষ্ঠাশ্রমের স্মৃতিচিহ্ন আছে। সুদূর চীন পর্য্যন্ত তন্ত্রসাধনা ঋষি বশিষ্ঠের মহিমায় প্রচারিত হয়। ব্রহ্মণ্যগর্ব্ব অসুরেরা সহিতেন না; বশিষ্ঠের প্রভাব খর্ব্ব করার জন্যই নরকাসুর বশিষ্ঠদেবকে কামরূপ হইতে বিতাড়িত করেন। চাণক্য যেমন গুপ্ত-বংশের ধ্বংস সাধন করিয়া প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করেন, ঋষি বশিষ্ঠও যেমন এই অপমান নীরবে সহ্য করেন নাই, শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইয়া অভিশাপ-বজ্রে নরকাসুরকে নিহত করেন। কিন্তু আসল কথা, আত্মধর্ম্মরক্ষক, মহাপ্রতাপবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমরাভিযান নরকাসুরের অধঃপতনের কারণস্বরূপ হইয়াছিল—অবশ্য বশিষ্ঠদেব এই সংগ্রামসূচনার মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয়। দেবী কামাখ্যার পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠা এই নরকাসুর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। রূপকচ্ছলে নরকাসুরের নিধনকাহিনীর অপরূপ বর্ণনা শুনা যায়। দেবীর রূপমুগ্ধ নরক তাঁহাকে অঙ্কশায়িনী করিতে চাহিলে, তিনি দুর্গম পর্ব্বতে আরোহণ করার চারিটী পথ একরাত্রির মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন—ইহা হইলেই দেবী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। নরক রাত্রি মধ্যে কামাখ্যা পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে পথ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলেন। কার্য্য সমাধা হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না; দৈবী মায়ায় প্রভাত-সূচনা হইল। মোরগকুল ডাকিয়া উঠিল, তিনি ধৈর্য্যহীন হইলেন; মোরগদের বিনাশ করিয়া দেবীর মন্দিরে

উন্মত্তবেশে প্রবেশ করিবামাত্র কামাখ্যা দেবী তাঁর বিনাশসাধন করেন। এই নরক হইতেই পুলোমা, মায়া ও বৃষপর্ব্ব জন্মগ্রহণ করেন। পুলোমার কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা কুরুরাজপত্নী, মায়ার কন্যা উপদানবী—ইনিই ভারতরাজ্যেশ্বর দুষ্মন্তের জননী; অতএব দেখা যায়, কামরূপরাজ্য দৈত্যবংশাধীন হইলেও, ভারতের আর্য্যজাতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

নরকের পুত্র দুর্য্যোধনের জামাতা ছিলেন। বৃকোদর যে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন, তিনিও কামরূপরাজ্যের মহিলা। ঘটোৎকচ কচজাতির আদি-পুরুষ; সুতরাং কোচ জাতিকে অনার্য্য শ্রেণীতে ঠেলিয়া রাখার হেতু নাই। কামরূপ-রাজ্যের পার্শ্বেই মণিপুর। বভ্রুবাহনের কাহিনী হিন্দু-জাতির নিকটে অবিদিত নাই। আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণে ভারতের আর্য্যজাতি পুষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ বাঙ্গালী জাতির সহিত কামরূপ-রাজ্যের নিবিড় সম্বন্ধ থাকায়, বাংলার প্রান্তে প্রান্তে অসংখ্য গিরিমালায় যে সকম অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বাস করে, তাহারা আমাদের অনাত্মীয় নহে; উপেক্ষায়, উদাসীনতায় আমরা তাহাদের হারাইয়াছি। তাহাদের প্রতিভাশক্তি আমাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে। আসামপ্রদেশে আজ প্রায় এক কোটী লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অধিক হইলেও, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের দিন দিন সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া আতঙ্ক হয়; হিন্দু-সভ্যতা চাতুর্ব্বর্ণ্য রক্ষার দায়ে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বুঝি লোপ পায়!

ভারতের বরেণ্য বিশ্বামিত্র; তাঁর পিতামহ ছিলেন—অমূর্ত্তরাজ; তিনিও কামরূপের অধিপতি ছিলেন। কত আর বলিব! বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইতিহাস-রচনার জন্য নহে। কামরূপতীর্থে দাঁড়াইয়া অচল নীল পর্ব্বতের মাথার দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইল—হায়, হিন্দুজাতি! কি বিপুল, কি বিশাল দেশের উপর তোমরা বিশ্বজয়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলে! কি কালক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আত্মকলহের কালানল না জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহা এখনও ধূমায়িত হইয়া তুষানলের ন্যায় আমাদের নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে!



কামাখ্যা পাহাড় হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের দৃশ্য।

পৌরাণিক কথা ছাড়িয়া দিলেও, পুষ্যবর্ম্ম ক্ষত্রিয় নরপতিকে আমরা ২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে রাজত্ব করিতে দেখি। ভাস্করবর্ম্মা ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবল কামরূপ-রাজ্যেরই অধীশ্বর ছিলেন না, বাংলার হিন্দুরাজা শশাঙ্কদেবকে বিতাড়িত করিয়া অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন; তিনি হর্ষবর্দ্ধনের মিত্র

হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১০৩৫ ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপাল কামরূপের রাজা ছিলেন; তারপর কামরূপ-রাজ্য কুচবিহারের অধিপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। বিশ্বসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা শিবসিংহ ম্লেচ্ছ ও কোচ্ জাতির বিদ্রোহদমন করিতে কামাখ্যা পাহাড়ে উপনীত হয়েন। তাঁহারা স্বদলভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু



কামাখ্যা দেবীর মন্দির

সহসা পাহাড়শীর্ষে এক মৃত্তিকাস্তূপ হইতে অজস্র জলধারা নির্গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারা হৃষ্ট ও পুলকিত চিত্তে সেই উৎসমূলে গিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধা সেইখানে উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিলেন, ইহা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা; পূজাবিধিও জানিলেন—ছাগ, মহিষ, কুক্কুট, পারাবত বলি; সিন্দুর, রক্তাবস্ত্রালঙ্কারাদি উপকরণ সাহায্যে দেবীর পূজা হয়। জানিয়া তাঁহারা ইহা শক্তিপীঠ বলিয়া অবধারণ করিলেন। তারপর মৃত্তিকাস্তূপ অপসারিত করিয়া দেবী কামাখ্যার পীঠ প্রকটিত হইল। এই মহামুদ্রা হইতেই জলধারা উৎসৃত হইতেছিল। রাজা বিশ্বসিংহ দেবীর বরেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, এবং কামাখ্যাদেবীর মন্দির রচনা করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় এই মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। সেই প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে পাহাড়ের



ব্রহ্মকুণ্ডের পুরোহিত—দিজু মিশ্‌মি

উপর পথের উপাদান হইয়াছে। কালাপাহাড়ের উপদ্রব শান্ত হইলে, পরে কুচবিহারের অধিপতি নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের চেষ্টায় মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়; ইহা ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মন্দিরটী যে অতি প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

মন্দিরের মধ্যে শুক্লধ্বজ ও নরনারায়ণের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। কুচবিহারের রাজবংশ মন্দিরে আসেন না; এইক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণের অভিশাপ আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী—কেন্দুকলাই নামে একজন সিদ্ধ

মহাপুরুষ কামাখ্যাদেবীর পূজক ছিলেন। দেবী প্রতি রাত্রে তাঁহাকে দেখা দিতেন। কুচবিহারাধিপতি ব্রাহ্মণকে দেবীসন্দর্শনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, ব্রাহ্মণ প্রথমে রাজী হয় নাই; শেষে রাজার আদেশ অবজ্ঞার বিষয় নহে মনে করিয়া, রাত্রে মন্দিরসংলগ্ন ছিদ্র দিয়া রাজাকে দেবীদর্শনের আদেশ দেন।

দেবী ইহা জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করেন এবং রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন —পীঠস্থান দূরে থাকুক, মন্দিরে আরোহণ করিলে তোমার বংশলোপ হইবে। এই ঘটনার পর কুচবিহারের রাজবংশধরগণ আর কামাখ্যা পর্ব্বতে আগমন করেন না। বশিষ্ঠ ও নরকাসুরের ন্যায় ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ—ইহা বোধহয় না বলিলে চলে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সংক্ষেপে ইতিহাস অনুবৃত্ত হইল; পাঠকদের আর ধৈর্য্যচ্যুত করিব না। বাঙ্গালীর আদিম সাধনা আর্য্যধর্ম্মে মুছে নাই; বরং উহা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া হিন্দু নরনারীর তীর্থক্ষেত্র হইয়াছে। স্ত্রী-যোনি ছাড়া মন্দিরে আর কোন প্রতীক নাই। অষ্টধাতুর পিত্তলের মূর্ত্তি উৎসবে পর্ব্বে বাহির করা হয়; কিন্তু আসল দেবতা যোনি-মূর্ত্তি।

কেবল কামাখ্যার মন্দিরই এই চিহ্নপূজার পীঠস্থান নহে; দশমহাবিদ্যার যোনি-মূর্ত্তি মেদিনী-গাত্রে আঁকা আছে। প্রাচীরবেষ্টিত নয়টি মন্দির কামাখ্যা পাহাড়ে অবস্থিত—একটী পীঠ গৌহাটীতে আছে, নদীবক্ষে কত দীর্ঘযুগের উমানন্দ শিব বর্ত্তমান, নদীস্রোতঃ তাহা নিশ্চিহ্ন করে নাই। কামাখ্যা পাহাড়ের শীর্ষদেশে ভুবনেশ্বরীর পীঠস্থান —কি মনোরম দৃশ্য, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। পাহাড়ের তলে ব্রহ্মপুত্র আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; দূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গৌহাটী সহর—আমরা এই দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ মোহিত হইয়াছি।

দেবীর প্রধান উৎসব—অম্বুবাচী। নারীধর্ম্মানুসারে এই সময়ে তিনি রজঃস্বলা হন; এমন মানবপ্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, সাধনার ধারা প্রাচীন জাতির পক্ষেই শোভা পাইয়াছিল। কে জানে আর্য্যসভ্যতার শাসনে জাতি খাঁটী প্রাণশক্তি হারাইয়া মেকী হইয়াছে কি না! কামরূপের ব্রাহ্মণগণ এখনও মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন; সেদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বিধবা ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় উদাসীন ছিল—জীবনের ধর্ম্মে এই জাতিটা যেন মাতোয়ারা! মদ্যপান-বিধি এখনও প্রবর্ত্তিত আছে।

১৪৪০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেব নামে একজন বৈষ্ণব-ভক্তের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে তন্ত্রসাধনার বিরুদ্ধে কামরূপে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কামরূপবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তন্ত্রকে স্থান দিয়া বিরোধ দূর করিয়াছে। কামাখ্যা পাহাড়ে দুই হাজার লোকের বাস। দেবী কামাখ্যাকে ঘিরিয়াই তাহাদের প্রতিপত্তি; তাহারা বাহিরের সংবাদ রাখে না, দেবীর প্রসাদে আনন্দেই বাস করে। সুন্দর ও সুশ্রী নরনারী—পর্ব্বতের উপর সরলপ্রাণ পল্লীবাসীর মধ্যে আমরা কয়দিন বাস করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

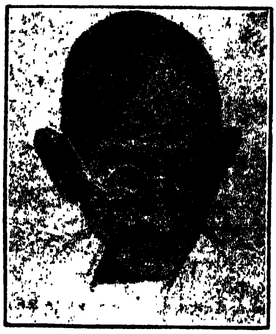


মত ও পথ

মহাত্মার বিলাতযাত্রা—

কংগ্রেস্ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়পক্ষের মধ্যে যে সংশয় ও অস্পষ্টতা থাকায় মহাত্মার গোলটেবিলে যোগ দেওয়া অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ দূর হওয়ায় মহাত্মা সবেগে বিলাতযাত্রায় ধাবিত হইয়াছেন। ডাণ্ডীর দিকে যুদ্ধযাত্রার মতই রাউণ্ড টেবিল সভায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ তুল্য বলিয়াই মনে হয়। সেই একই আশা ও বিশ্বাসে মহাত্মা "রাজপুতানা" জাহাজে উঠিয়াছেন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার মনে কি আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই; মহাত্মা কিন্তু বিশ্বাস করেন—বিলাত হইতে তাঁহাকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইলেও, ইহার ফলও ভারতের পক্ষে অশুভ হইবে না; তাঁর বিলাত যাওয়া বন্ধ হওয়ার সময়েও এই কথাই বলিয়াছিলেন, যে ইহা ভারতের কল্যাণের কারণ হইবে। তিনি বিশ্বাসী, ভগবানের হাতের যন্ত্র, ঈশ্বরের নির্দ্দেশ ধরিয়া চলিয়াছেন—মানুষের হিসাব এক্ষেত্রে ভুলই হইবে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। এই সকল বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁর পরম ইচ্ছাই সফল হইবে। ভারতের মুক্তি আসন্ন—এই বিশ্বাসই মহাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ভারতবাসীকেও এই বিশ্বাসের মন্ত্র জপিতে হইবে, আশায় নৈরাশ্যে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবই—এই অগ্নি-আকাঙ্খা আমাদের মনে যেন নিত্য জাগরূক থাকে। মহাত্মার এই অভিযানে লাভক্ষতির অঙ্ক কষিয়া ইহার ফলাফল নির্দ্ধারণ করি না। ভারতের মুক্তিপথে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ছুটিয়াছেন; তাঁর এই সিদ্ধগতি কোন মতেই ব্যর্থ হইবে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং তাঁর এই বাণীই আমরা যেন স্মরণে রাখিতে পারি

'The horizon is as black as it possibly could be. There is every chance of my



মহাত্মা গান্ধী

returning empty-handed. That is just the state which realisation of weakness finds one in. But believing as I do, when God has made the way to London clear for me through the second settlement, I approach the visit with hope, and feel that any result that comes out of it would be good for the nation, if I do not prove faithless to the mandate given to me by the Congress."

মহাত্মার সহযাত্রী—

পণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং শ্রীযুক্ত প্রভাশঙ্কর পট্টনী মহাত্মার সহযাত্রী হইয়াছেন। পণ্ডিত মালব্য স্বরাজপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যে নিঃসংশয়, তাহা তাঁহার বাণী হইতেই বুঝা যায়; তিনি বলেন--"Keep your hopes high and hearts strong and Swaraj is coming." জাতির আশা ও হৃদয় যদি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সে জাতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কোন বিঘ্নই দাঁড়াইতে পারে না—পণ্ডিতজীর কথা আমরা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বাণী—তিনি ভারতের অখণ্ড রূপই দেখিতে চাহেন; হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রয়াস পৃথিবীর বাধা বিচূর্ণ করিয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস এবং এই মিলনের পথ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—হিন্দু এবং মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক বোধ যখন দূর হইবে, ভারতের গৌরব ও মর্য্যাদার জন্য যখন আমরা যুক্তভাবেই দেশের কাজে আত্মদান করিতে পারিব, তখনই ভারতের শক্তি জাগ্রত হইবে।



পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

অবশ্য মানুষের অহমিকার গণ্ডী আছে বলিয়াই অনন্ত শক্তি আমাদের আশ্রয়ে লীলায়িত হইতে হইতে পারে না; তদ্রূপ হিন্দু মুসলমান বোধ যখন দূর হইবে, আমরা অখণ্ড ভারতশক্তির আধার বলিয়া পরস্পরকে পরস্পর যখন জড়াইয়া ধরিব, তখনই ভারতের মুক্তি বাধাহীন হইবে—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতের স্বাধীনতা যদি ইহার উপরই নির্ভর করে, ইহাই যদি ভগবানের বিধান হয়, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে মূলগত আদর্শ ও সভ্যতা তাহা দূর হইবে, আমরা অখণ্ড জাতিরূপে মাথা তুলিব। কিন্তু তবুও তো সেই ভবিষ্যজাতির একটা অভেদ আদর্শ ও সভ্যতার

প্রকাশ হইবে, তাহা আজ কল্পনায় আনা সম্ভব নয়; এবং সত্যকথা বলিতে হইলে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ভেদ, তাহাও ভারতের মুক্তি লক্ষ্য করিয়া দূর হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় ভারত পূর্ণ-স্বাধীনতা কেমন করিয়া পাইবে, তাহা সমস্যার কথা। যত দিন শক্তি অমিশ্র না হয়, ততদিন অখণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভব নহে, এই যুক্তি অকাট্য। এইজন্যই ভাবিতে হয়, এই উভয় সম্প্রদায়ের মূলগত আদর্শ যদি কাল্পনিক হয়, তাহা অবস্থাচক্রে ধূমের ন্যায় তিরোহিত হইবে; আর তাহা না হইলে ঘটনাই প্রমাণ করিবে—এই দুই সম্প্রদায়ের, দুই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন দেহের মত, পরস্পরের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে, একই স্থানে দুইটি মৌলিক সত্য মিলনের আদর্শে একাকার যে হয় না, এই বিজ্ঞান রাজনীতিক আদর্শের দায়ে আমরা ভুলিতে পারি না। তবে জাতি যে স্বাধীনতার পথে, ইহা আমরা স্বীকার করি, এবং মিশ্রশক্তির অস্তিত্ব থাকে বলিয়া আমরা অচিরে পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আশা মনে স্থান দিই না। যে জাতি স্বাধীন হইবে, সে জাতির পথ এই সকল ঘটনার দ্বারা প্রশস্ত হইবে, সুগম হইবে, ইহা বড় অল্প আশার কথা নহে।

শ্রীযুক্ত প্রভাশঙ্করের উক্তি—সৈনিকের মর্ম্মবাণী। ভারতে আজ মুক্তিকামী একদল এইরূপ বীর সৈনিকের আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের স্বাধীনতালাভের পথ যে অব্যর্থ, তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়। তিনি বলিয়াছেন—"I have no message to give, because I believe in following Mahatmaji."

ডাক্তার সুরেশচন্দ্রের পত্র—

দেশের এই সমস্যার দিনে রোগ-শয্যায় বাংলার বরেণ্য-সন্তান যাহা ভাবিতেছেন, তাহা তাঁর একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম :—

"বিপ্লবী দলের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে ধরণের বীভৎস মারামারি বাংলার প্রায় প্রতি সহরে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সবের কথা ভাবিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠে। এখানকার তরুণদের মধ্যেও কয়েকদিন অবধি উন্মুক্ত রাস্তায় দিনে দুপুরে মারামারি ও মাথা-ফাটাফাটি চলিয়াছে। নিজের দল বাড়ানো ও অপরের দলের ভাঙ্‌চি দেওয়াই এ সব মারামারির একমাত্র কারণ। বিদেশী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ এ সব দেখে, আর প্রাণ ভরিয়া হাসে। এ সম্বন্ধে আপনার কাগজে তীব্র প্রতিবাদ বাহির হওয়া উচিত। প্রতিবাদ বাহির হইলেই যে এ সব বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠাতারা তাহাদের গুণ্ডাপ্রায় ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইবে, তাহা আমার মনে হয় না; তবে নূতন ছেলেরা এ-সব দলের ভিতরের কথা যাহাতে বুঝিতে পারে, এবং বুঝিতে পারিয়া এ-সব দলে যোগ দেওয়ার আগে যাতে বিশেষ করিয়া ভাবিতে পারে, সেজন্যই এ সবের প্রতিবাদ লেখা।

"ভারতের অনেকখানি স্বাধীনতা শীঘ্রই লাভ হইবে, এ সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ হইতে খুব বেশী দেরী হইবে না। চারিদিকে অবস্থা এমনই দাঁড়াইতেছে, কিন্তু এ সব দলাদলির ফলে স্বাধীনতালাভের পরেও হয়তো আমাদের উন্নতি খুব বেশী হইবে না, এ আশঙ্কায় আমার প্রাণ অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হয়; তাই আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত, দেশে যাতে তরুণদের প্রাণে সত্যিকার সেবার ভাব জাগে; কারণ সেবার ভাব জাগিলে, এ সব দলাদলি টিকিয়া থাকা অসম্ভব। মিথ্যা প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা

এ সব দলাদলির তলায় আছে অনেকখানি। আমার মত আমি খুলেই লিখ্‌লাম, এ সম্বন্ধে আপনার মত লিখিয়া জানাইলেই সুখী হইব।"

ডাঃ সুরেশচন্দ্রের পত্রখানি এমনই সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি, যাহা আমাকে সত্যই লজ্জা দেয়; এমন সরল উদার না হইলে ভারতের ত্যাগ ও তপস্যা আর কোথায় আশ্রয় লইবে?

প্রথম বিপ্লববাদীদের কথা। আমাদের ভুলিলে চলিবে না,'গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে'। জাতি জাগিয়াছে। ভালমন্দ প্রকৃতির মানুষ স্বভাববশেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলে; প্রকৃতির রূপান্তর কথায় যে সম্ভব নয়, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। তাহার একটা সাধনা আছে, সে সাধনা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, পরাধীনতার পীড়নে আমাদের শিক্ষার মূলে সে ভারতীয় চরিত্র-গঠনের উপাদান নাই। তবুও যে অর্ব্বাচীন যুগের শিক্ষিত মহলে একটু আধটু মহানুভবতার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা এ জাতির স্বধর্ম্মের প্রভাব; শিক্ষার আরোপ ভেদ করিয়া স্বরূপই মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় এবং অনুকূল অবস্থায় তাহার স্বচ্ছন্দ মূর্ত্তি আমাদের ধন্য করে—এইরূপ সৃষ্টির আশ্রয়েই আমরা এতদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছি।

ইহা তো বর্ত্তমান যুগের কথা। অতীতে আমরা আরও ভুল করিয়াছি। তাহা লইয়া ভট্টপল্লীর শীর্ষমণি পণ্ডিত পঞ্চাননের সহিত আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছে। যদি সুদিন আসে, আমরা নিজেদের ভুল ভাঙ্গিয়া জাতির স্বরূপ-সাধনাকে স্পষ্ট করার ব্যাপক প্রয়াস করিতে পারিব। সে ত্রুটি আর অন্য কিছু নয়, ভারতের অধিকারি-ভেদের দুর্ব্বুদ্ধি। ইউরোপের শিক্ষা-সাধনার ব্যাপক ব্যবস্থায়, জগতের অর্দ্ধেক লোক আজ পাশ্চাত্য আদর্শের অনুরাগী। ভারতের শাসন-যন্ত্রটা ভারতীয়দের হাতেই চলিয়া থাকে, পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদের কাছেই অধিক হাস্যাস্পদ; কেন না, তাহাদের বিশ্বাস ও ধারণা শিক্ষার গুণে বিপরীত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। "ষ্টেটস্‌ম্যান" কাগজে ভারতীয় লেখকের যুক্তিপূর্ণ লেখা আমার বড় ভাল লাগে, বড় কৌতূহলে তাহা পাঠ করি—অন্য কিছুর জন্য নহে, মস্তিষ্কবৃত্তি ইংরাজ যেভাবে গড়িয়া দিয়াছে, চিন্তাপ্রণালী ঠিক সেই খাদেই স্বতঃ স্বচ্ছন্দভাবে পরিচালিত হয়; ভারতের দিক্‌টা আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা যায় না। আমার মনে হয়, পাঠান মোগলের যুগে আমরা প্রাণে আঘাত পাইয়াছিলাম, কিন্তু বুদ্ধি বিকৃত হয় নাই; তাই আবার মাথা তুলিবার উপক্রম করিয়াছি—ইংরাজের শাসনে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। যে রোগীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাহার পীড়া সঙ্কটজনক বলিতে হইবে। শিক্ষার ফলে আজ আমাদের মস্তিষ্কের গঠন উল্টাইয়া গিয়াছে। এ জাতিকে মুক্তিব্রত সিদ্ধ করিতে হইলে, বাহিরের অপেক্ষা অন্তর্বিপ্লবের আয়োজন অধিক করিতে হইবে।

ভারত যদি তার অপূর্ব্ব শিক্ষা সাধনার বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেণীতে ভারতের আদর্শ ও সভ্যতার মানুষ গড়িয়া তুলিত, তাহা হইলে কি হিন্দুস্থান ভারত আজ সাম্প্রদায়িক সমস্যায় এমন করিয়া বিচলিত হয়! হিন্দুধর্ম্মটাই এ জাতির অধিকাংশ লোক বুঝে না; ইহার কারণ তো আর কিছু নয়, ভারতের ব্রাহ্মণ শাস্ত্র, যুক্তি ও বিজ্ঞান অন্ত্যজ ও শূদ্রজাতির পক্ষে দুর্লভ নিষিদ্ধ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। এই আচোট ক্ষেত্রেই তো অন্যের শিক্ষা সাধনা তাই ফলপ্রসূ হইল। কয়জন হিন্দু জানে তার অধ্যাত্মসাধনার বিজ্ঞান! বার মাসে তের পার্ব্বণ দিয়া এই একটা বিপুল

জাতিকে আত্মধর্ম্মে এমন অজ্ঞ করিয়া রাখা যে কি গুরুতর মারাত্মক ব্যাপার হইয়াছে তাহা আজও অনেকে বুঝিতে চাহেন না। মানুষকে শিক্ষার দ্বারাই গড়া যায়, শিক্ষা না হইলে সাধনা ব্যর্থ হয়; এই সহজ কথাটা সেদিন তারা কুল ও বংশমর্য্যাদার মোহে বুঝেন নাই। আজ বাংলা হইতে হিন্দু মুছিয়া যায়—হিন্দু সভ্যতার দরদ-জ্ঞান যে এক মুঠা মানুষেরও নাই!

আত্মবৈশিষ্ট্য ও আত্মমর্য্যাদা মুখের কথা নয়, উহা একটা মর্ম্মানুভূতি। মহাত্মার কথা বিকৃত করিয়া সেদিন ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিটা স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে, তাহা ভাবিয়া কিরূপ আকুল হইয়াছিল, তাহা আমরা ভুলিব না; কিন্তু হিন্দুপ্রধান অনেক নেতা আজ হিন্দুত্ব ছাড়িতেও অকুণ্ঠ; কেননা স্বাধীনতালাভের ইহা পরিপন্থী। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় তাহা সহজে ছাড়িবে কেন? আমরা স্বধর্ম্মচ্যুত, জলস্রোতে শৈবাল হইয়া ভাসিতেছি; ভারতীয় শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া বিশ্বের আকাশে যাহা নূতন দেখি, তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইতেছি। অন্য সম্প্রদায়বিশেষের যে বৈশিষ্ট্য, যে স্বাতন্ত্র্য, তাহা আমূল শক্ত ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্‌লামধর্ম্মীর গলা জড়াইয়া সোহাগ করিলেই সে-ও তোমার মত নিজের আত্মমর্য্যাদা হারাইতে চাহিবে না; আরব তুর্কের মত ভারতকে সে আত্মধর্ম দিয়া জয় করিয়া লইবে —অস্ত্রবলে না হউক, আত্ম-বিশ্বাসের প্রভাবেও ইহা সিদ্ধ করিবে। আজ বাংলার অবস্থা দেখিয়া ইহা অপ্রত্যয় করিবার কারণ নাই।

আমাদের মধ্যে দলাদলির কারণই হইতেছে, নিজেরা আত্মপ্রতিষ্ঠাহীন হইয়াছি বলিয়া। দলাদলির হলাহল যে কি উৎকট, প্রাণঘাতী, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী গড়িতে গিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। আমরা কাজ না করিলে আর স্থির থাকিতে পারি না, অথচ কর্ম্মশক্তি যে তপস্যায় অর্জ্জিত হয়, তাহাতে আস্থা নাই। এই অবস্থায় কোথাও কিছু গড়িয়া উঠিতে দেখিলে, তাহা ধ্বংস করার যত প্রকার হীনবৃত্তি, তাহা অস্ত্রস্বরূপ প্রয়োগে বাধে না; এত মিথ্যা অবাধে এই সকল ক্ষেত্রে প্রশ্রয় পায়—যাহা দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত হই। মানুষ ধর্ম্মহীন বলিয়াই বিদ্বেষ-বস্তুকে পোষণ করে—ইহাই হইয়াছে তাই সাধারণ লোকের মনের খাদ্য, পরশ্রী-কাতরতা হইয়াছে জীবন; কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ভাল নহে, বুঝাইলে কেহ বুঝিবে না। আমার মনে হয়, এই সকল আবর্ত্ত ভেদ করিয়া তাহারাই উঠিবে যাহারা ভগবানের মানুষ, যুগের চিহ্নিত। তাহাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের কোলাহল থাকিবে না। সমালোচনার বাণী বাহির হইবে না; তাহারা আত্মস্থ হইয়া ভগবানের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবে। এই সংহতিশক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎ। লোকবলের পূর্ব্বে আমাদের অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সে শক্তিলাভের ক্ষুরধার পথে মিথ্যা, পরশ্রীকাতরতা চলে না; কাজেই বিরুদ্ধবাদী আপনার পাপে আপনি আচ্ছন্ন হইয়া জড় মূক হইবে। সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ যে জাতির অভ্যুত্থান দেখিতেছি, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ভাগবত কার্য্য সিদ্ধ করিবে।

ইহা হওয়ার বিলম্বেরও একটা কারণ আছে। এইরূপ বিশুদ্ধ সঙ্ঘশক্তি দেশে যতটুকু দেখা দিয়াছে, তাহারা নিজেদের শক্তির পরিমাপ স্থির না করিয়া কাজের নেশায় প্রমত্ত হয়। ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে মিশ্র-শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে হয়। অমিশ্র সদ্‌গুণ-সম্পন্ন মানুষের সংহতির কার্য্য অল্প হইলেও তাহার প্রত্যবায় নাই; অন্যত্র অপচয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। তাহাতে খাটী সত্যপরায়ণ সঙ্ঘশক্তি প্রকাশ পায় না, প্রতিকুল ঘটনায় বন্দী হইয়া থাকে। ভারতের

আসন্ন স্বাধীনতার কথাও তাই ভাবিতে ভয় হয়! আজ কবিগুরু রবীন্দ্রের মুখেও শুনিতেছি, রাষ্ট্রমুক্তির অগ্রে, মহাজাতির সৃষ্টি চাই, একথা "প্রবর্ত্তকের" জন্মকাল হইতে বলা হইতেছে—কোথায় সে জাতি, যাহারা স্বাধীনতার ভার মাথায় বহিবে!

আজ স্বাধীনতার জন্য আমরা অসংখ্য বিপরীত-ধর্ম্মী ও ভিন্ন চরিত্রযুক্ত লোকেদের ডাকিয়া মুক্তিপথে যাত্রা করিয়াছি। লোকবল যে নগণ্য তাহা নহে; তবে ইহা যে মিশ্রশক্তি, এই হেতু অবিকৃত মুক্তি আমরা পাইব কেন? আশ্রয়-ক্ষেত্র যত উজ্জ্বল নির্ম্মল হইবে, ততই তো আশ্রিত বস্তুর বিমল প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হইবে। আজ আমাদের দরকার হইয়াছে সংহতিবদ্ধ হওয়া এবং এমন সংহতি গড়া যাহা অটুট, ব্যক্তিগত অহঙ্কার বা ভোগাকাঙ্ক্ষায় তাহা ভাঙ্গিবে না; নিজ নিজ অশুদ্ধি গোচর করিয়া আমরা প্রেম ও ঐক্য দিয়া জাতিটাকে গড়িয়া তুলিব। যতই এই পথে অবহিত হইব, ততই মণ্ডলে মণ্ডলে এই শক্তির দ্যোতনা অসত্যকে, প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্রকে দুর্ব্বল ও অশক্ত করিয়া তুলিবে। হয়তো এই সকল প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন আছে, সমালোচনার বস্তু আছে; কিন্তু ডাঃ সুরেশচন্দ্রের অভয় পাইয়া আমার কথা খুলিয়াই বলিলাম। আমরা কথার প্রতিবাদ অপেক্ষা জীবন দিয়াই জাতির সত্যমূর্ত্তি গড়িব; এই পথে যাঁরা চিহ্নিত, ভগবানের মানুষ, তাঁহাদেরই সহযোগিতা চাই।

চট্টগ্রাম—

ইন্‌স্পেক্টর আসানুল্লা বিপ্লবী কর্ত্তৃক নিহত হইলে, চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে—যদিও এই আহবে হিন্দু যোগ দেয় নাই, মাথা পাতিয়া মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অত্যাচার সহিয়াছে, রাজার রাজাকে মর্ম্মনিবেদন জানাইয়া নিঃস্ব হইয়াছে। ইহারা প্রস্তুত হইয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

আমাদের চট্টল-সঙ্ঘ হইতে যে পত্রখানি পাই, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"চট্টগ্রামের অবস্থা বড় সাংঘাতিক হইয়াছে। ৩রা তারিখের "Liberty"তে তাহার আভাস পাইয়াছেন। পত্রে সব কিছু লেখা সম্ভব নয়। ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে খেলার মাঠে আসানুল্লা বিপ্লবপন্থীর হস্তে নিহত হন। সেদিন রাত্রেই অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়, এবং অনেক যুবককে থানায় নিয়া মারপিঠের পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরদিন সকাল ৮টার সময়ে শুনিতে পাই, আসানুল্লার শব শোভাযাত্রা করিয়া লওয়া হইবে, কবর দেওয়ার পূর্ব্বে ময়দানে নমাজ হইবে; এইজন্য গ্রাম হইতে দলে দলে মুসলমান আসিতে আরম্ভ করে; ৯টার সময়ে একজন মুসলমান সাইকেল চড়িয়া বলিয়া গেল, ১০টার মধ্যে দোকান বন্ধ কর, নতুবা লুঠ হইবে। সাড়ে নয়টার সময়ে সহরের অবস্থা গুরুতর বুঝিয়া আমরা আশ্রমে আসি, ১২টার সময়ে দেখিলাম, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া বহু মুসলমান বাড়ী ফিরিতেছে। ৪টার পর সহরের দিকে গিয়া বীভৎস দৃশ্য দেখিলাম।

শুনিলাম, নমাজের সময় প্রায় ৫০ হাজার লোক জমা হইয়াছিল। নমাজের পরই তাহারা লুট-তরাজ আরম্ভ করে; লুটের ভয়ে সকলে দোকানপাট বন্ধ করিয়া কেহ কেহ ভিতরে বসিয়াছিলেন, কেহ বা বাসায় চলিয়া আসিয়াছিল। লুণ্ঠনকারীরা দা, সাবল, কুড়াল, হাতুড়ী ইত্যাদি লইয়া হিন্দুদের দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া দোকানের সকল জিনিষ-পত্রাদি একেবারে নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকাকড়ি এবং

Jewllerদের সমস্ত সোনারূপার অলঙ্কারাদি লইয়া গিয়াছে; কোন কোন দোকানের জিনিষ পত্রাদি বাহির করিয়া ঘরে আগুন দিয়াছে, দুইটী দোকান একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। তিনজন বাঙ্গালী মার্চ্চেণ্টের প্রত্যেকের নগদ ও জিনিষ পত্রাদিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা করিয়া লুণ্ঠিত ও নষ্ট হইয়াছে; একজনের নগদ ৭৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। বিকাল বেলায় আমরা সকল স্থান ঘুরিয়া যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত! যেখানে এত পুলিশ, মিলিটারী সেখানে এইরূপ অমানুষিক কার্য্য কি রকমে ঘটিল, তাহা কল্পনাও করা যায় না। শুনা যায়, মিলিটারীর সম্মুখেই মুসলমানেরা ঘরে আগুন দিয়াছে এবং জিনিষ পত্রাদি লুট করিয়াছে। কোথাও কোথাও পুলিশ নাকি নিজেই জিনিষপত্রাদি দোকান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে! স্থানে স্থানে হিন্দুর বাসা বাড়ী ইত্যাদিও লুণ্ঠিত হইয়াছে। ৩১শে তারিখে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে; তারপর হইতে সব এক রকম শান্ত হইয়া আসিয়াছে। মুসলমান নেতাদের মত, এই সব ব্যাপার Communal নয়। হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধি লইয়া এক Enquiry কমিটী হইয়াছে।

গ্রামে মুসলমানেরা কোন উৎপাত করে নাই; কিন্তু মিলিটারী গিয়া পটিয়া ও সারোয়াতলী স্কুলের অনেক ছাত্রকে খুব মারিয়াছে এবং কোন কোন বাড়ীতে গিয়া মারপিট করিয়া গৃহাদি জ্বালাইয়া দিয়াছে! সব দিক্ দিয়া চট্টগ্রামবাসীর জীবন আজ খুব আতঙ্কগ্রস্ত—কেহ আজ আর নিজেকে নিরাপদ্ মনে করিতে পারিতেছে না; এই অবস্থার পরিবর্ত্তন কখন কি করিয়া হইবে, ভগবান জানেন।''

চট্টগ্রামের ঘটনা যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে, তাহা সকলের কাছেই স্পষ্ট হইয়াছে; মুসলমান হিন্দু কাহারও মনে এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। বিপ্লবপন্থীরাও সাম্প্রদায়িকতার তোয়াক্কা রাখে না; চাঁদপুর ষ্টেশনে সেদিন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইঁহাদের হস্তে নিহত হিন্দু-সংখ্যাই বোধহয় অধিক হইবে।

চট্টগ্রামে পুলিশ ও মিলিটারীর সংখ্যা অত্যধিক বাড়ান হইয়াছে; তবুও কেন এমন ভীষণ কাণ্ড ঘটিল, এ প্রশ্ন আজ যে নিরর্থক তাহাও সকলে বুঝিয়াছে। মুসলমানদের এই বীভৎস ভাবে হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ প্রত্যেক হিন্দু-প্রাণেই আঘাত দিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের কোন হিন্দুই বুঝিতে চাহে না—মুসলমানদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। এ ব্যথার মূলে যে একেবারেই সত্য নাই, তাহা নহে; স্বদেশীযুগ হইতে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ হিন্দুর প্রাণে নিরন্তর আঘাত দিয়া আসিয়াছে—কৈ এ পর্য্যন্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দ তো ইহার প্রতিকার করেন নাই! মুখের কথায় আর যে হিন্দুর প্রাণে সান্ত্বনা পৌছায় না। বর্ত্তমান বন্যায় শতকরা ৮০।৯০ জন মুসলমান বিপন্ন; হিন্দু নেতারা দেশবাসীর ঘোরতর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আর্ত্ত দেশবাসীর সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন। মুসলমান নেতাদের আন্তরিকতার সত্যই যেন অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

আসানুল্লার হত্যা সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে কোন কারণেই দোষী করা চলে না; বিপ্লববাদীরা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর উপর আঘাত দিয়া চলিয়াছে; তাহাদের এই নৃশংস আচরণ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ ভেদ রাখে নাই; অতএব এই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিবার কারণ নাই। স্পষ্ট দিবালোকে পুলিশ-মিলিটারীবেষ্টিত সহরের বুকে হিন্দুর দোকানপাট,

গৃহ জ্বালান যাহার প্ররোচনায় সম্ভব হইয়াছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এইজন্যই হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের করুণ নিবেদন—এই ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের উপর বিরুদ্ধ হইলেই আমরা বিপন্মুক্ত হইব না; বরং নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করিব। ইহার প্রতিকারের উপায় আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান স্থান; এইহেতু প্রতিশোধপ্রবৃত্তিবশতঃ আমরা মুসলমানদের প্রতি বিমুখ হইতে পারি; কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থার কথাটা আমাদের আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে—তাহা ছাড়া আমাদের মনে হয়, যে মন্ত্রে আজ মুসলমান গুণ্ডারা এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে উদ্যত হইয়াছে, সেই মন্ত্র হিন্দু গুণ্ডাদের কানে দেওয়া হইলে হয় তো এই একই প্রকার ফল ফলিবে। আমাদের আজ বিডন ষ্ট্রীটের দাঙ্গার কথা মনে পড়ে—মিউনিসিপ্যালিটীর হিন্দু ঝাড়ুদার মেথর যে অনর্থ বাধাইয়াছিল তাহার পশ্চাতে চট্টগ্রামের মতই অভয়মন্ত্র কানে ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিপ্লবপন্থী চাহে—শান্তশিষ্ট দেশবাসীর জীবনে যেমন করিয়াই হউক আগুন জ্বলিয়া উঠুক; তাহাদের সমাজ-সম্প্রদায়-বোধ নাই, অশান্তি সৃষ্টি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। চট্টগ্রামের পুলিশ যদি ইহা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব না কি তাহারা বিপ্লবপন্থীরই সহকারী; এরূপ চরিত্র শান্তিরক্ষার পরিপন্থী। আমরা সুচতুর বুদ্ধিমান্ রাজকর্ম্মচারীদের এই দুষ্টবুদ্ধির কুহক হইতে জিলার পুলিশ কর্ম্মচারীরা যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলি। নতুবা ঘটনার ফলে বিপ্লবপন্থী মর্ম্মাহত, নিরাশ হইবে না, দেশবাসীর মন ইহাতে রাজ্যশাসননীতির উপর চিরদিনের জন্য আস্থা দূর হইবে, এবং তাহাই হইতেছে। যাহারা প্রাণ দেয়, তাহারা অন্যের প্রাণের মমতা রাখে না বা ধন-সম্পদ্‌হীন হইল বলিয়া দুঃখও করে না; অতএব এরূপ কর্ম্মে দেশবাসীকে শাসন করার বিধি একেবারেই নিরর্থক।

বিপ্লবপন্থীদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করার তাগিদ যাঁহারা দেন, যাঁহারা সংবাদপত্রে হত্যাকারীর দুঃসাহসের প্রশংসা করিতে দেখিলে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য কঠোর প্রেস-আইন প্রবর্ত্তনে উদ্যত হন, তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়া যে বিপ্লবের সহায়তা করেন, সে অপরাধের কি দণ্ড-বিধান করিবেন—দেশবাসী এই কঠোর প্রশ্ন করিতেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসন্তোষের বহ্নি এইভাবে জ্বলে বলিয়াই, বিপ্লবপন্থী তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সমূহ সুযোগ পায়; ইহা সপ্রমাণ করা আদৌ দুঃসাধ্য নহে।

আমরা হতাশ হইয়াছি—বিপ্লবীর কার্য্য ভারতের আসন্ন মুক্তির পরিপন্থী; ইহাতে মহাত্মার উপর প্রত্যয় ভঙ্গ হয়; বিরুদ্ধপক্ষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইহাই অনুকূল অবস্থা। আজ গঠনের কাজে যে অসংখ্য তরুণের প্রাণ দিতে হইবে, সেদিকে তাহারা যদি উদাসীন থাকে, হত্যা করিয়া আমরা স্বরাজলাভের অধিকারী হইব কেমন করিয়া?

রক্তপাতে ভারতের আদর্শ যদি সিদ্ধ হইত, বৈদিক-যুগের দেবাসুর সংগ্রাম হইতে কুরুক্ষেত্র, তারপর ভারতের কত প্রান্তর বীররক্তে যুগে যুগে রঞ্জিত হইয়াছে—আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ? হে তরুণ! আত্মস্থ হও; ধৈর্য্য, বিশ্বাস, অক্লান্ত শ্রম দিয়া জাতিকে গড়িয়া তোল, ভাঙ্গার রুদ্রনীতি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও পরিহার কর।

আবার প্রেস-আইন—

প্রেস-আইন প্রকট করিতে গিয়া যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহাতে চক্ষের সম্মুখে বিপ্লবীদের বুদ্ধির দিক্‌টা ফুটিয়া উঠে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে ১৮টী রাষ্ট্রঘটিত হত্যাকাণ্ড অথবা হত্যার প্রচেষ্টা হইয়াছিল; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৬৩টী; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ এখনও শেষ হয় নাই, এই বীভৎস গুপ্ত-হত্যার সংখ্যা হইয়াছে ১১৭টী।

বিপ্লবীদের দমন করার ব্যবস্থায় কেহ বিচলিত নহে। কিন্তু এই বিপ্লবের নিদান লইয়াই কথা। কংগ্রেস দেশের একমাত্র রাষ্ট্র-সাধনার কেন্দ্র; সুতরাং বিপ্লবপন্থীদের কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উপরেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও বিপ্লবী সঙ্ঘ দুইটী পৃথক্ বস্তু, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিতে চাহেন না। মহাত্মার ন্যায় আত্মপক্ষ ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকা অনেক নেতার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, অন্যপক্ষ কংগ্রেসের উপর দোষারোপের সুবিধা পায়। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস যখন অহিংস-ব্রতী, তখন ভবিষ্যতে এইরূপ আদর্শের মিশ্রণ না হওয়াই সঙ্গত।

কাগজের প্ররোচনায় কেহ যে হিংসাকর্ম্মে অগ্রসর হয়, ইহা আদৌ সমীচিন নহে, এবং দমন-নীতি প্রবল হইলেই যে ইহার মাত্রা হ্রাস পায়, তাহাও ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট হয় না। প্রেস-আইনের কঠোর শাসন যেমনই উঠাইয়া লওয়া হয়, অমনি বিপ্লবীরা সংবাদপত্র মারফতে উত্তেজনামূলক সন্দর্ভ পাঠ করিয়া ধ্বংসনীতি আশ্রয় করে—ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। আসলে দেশের মধ্যে শাসনতন্ত্রের গোলযোগে যে অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করার ইচ্ছা রাজ-কর্ত্তৃপক্ষের নাই; কেন না, তাহাতে পররাজ্য-শাসনের অনেকখানি স্বার্থ ছাড়িয়া দিতে হয়। সূচ্যগ্র-মেদিনী না ছাড়িয়া ভারতে ব্রিটিশশাসন অব্যাহত রাখার কৌশল ভারতবাসীর মনের উপর নিরন্তর আঘাত দিতেছে; ইহার ফলেই বিপ্লবীদের কার্য্য অবাধেই চলিতে সুযোগ পায়। যাহা করিলে বিপ্লববিষ নিরুদ্ধ হইতে পারে, সেদিকে কেহ দিবেন না। আমাদের মনে হয়, ইচ্ছা করিয়াই সেদিকে নজর দেওয়া হয় না—কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার অনেকে বলেন, হিন্দু তরুণেরা অভাগবত শিক্ষার দোষে বিশৃঙ্খল হইয়াছে। এই সকল কোন কথারই মূল্য নাই; বরং তাহারা ইহার উত্তরে বলিবে—ভালই হইয়াছে। ধর্ম্মভীরু যতদিন ছিলাম, ততদিন ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের তো কোনই আশা দেখা যায় নাই, আজ তবু পূর্ণস্বাধীনতার ধুঁয়াও উঠিয়াছে!

যাহা নাই, তাহা দিয়া রোগ নিরাময় হইবে না। আমরা বলি, তাড়াতাড়ি প্রেস-আইন না করিয়া গোলটেবিলের ফলাফল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হউক। ভারতবাসীর হস্তে শাসন-যন্ত্রের কতকটা যদি পরিচালিত হয়, অহিংস-ধর্ম্মী মহাত্মা যদি শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের অধিকার আদায় করিতে পারেন, ভারতবাসীই ভারতের অশান্তি দমনে অগ্রসর হইবে। তখন এইরূপ নৃশংস হত্যার জন্য ভারতকে দায়ী করিলে বলিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু একথা আমাদের অরণ্যে রোদন তুল্যই হইবে। একটা কিছু না করিলে যে ভারতে অশান্তির আগুন রক্ষা করা যায় না; অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, দেশের সংবাদপত্র অথবা কংগ্রেসপন্থীরা বিপ্লবের পথ যত না পরিষ্কার করুক, শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় তাহা দ্রুত সাধিত হইতেছে। প্রচলিত আইনের দ্বারাই প্রেস ও সংবাদপত্রের দমনকার্য্য যখন চলিতে পারে, তখন বিষব্রণের ন্যায় এই অবস্থায় আবার প্রেস-আইন প্রবর্ত্তন করা কেন?

চুক্তি রহিল না বলিয়া এখনও যাঁহারা মহাত্মার অনুগত, তাঁহারা তাই অছিলায় অশান্তির ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করারই সুযোগ পাইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রেস-আইন তবুও বারণ মানিবে না। ভারতীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিলেই ভারতে শান্তি—এই ধারণা কর্ত্তৃপক্ষদের মন হইতে মুছিবার নয়।'

অভয় আশ্রম—

অভয় আশ্রমের ১৯২৯—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট বহিখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। অভয় আশ্রম বাংলার অন্যতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—নিঃস্বার্থ দেশকর্ম্মী সৃজন করা। অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই দিকে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন—ভগবানের নিকট তাঁহাদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি প্রার্থনা করি।

১৯১১-১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ডাঃ সুরেশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রের জীবনে এইরূপ প্রেরণা জাগিয়া উঠে; বাংলায় স্বদেশী যুগ ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদানই এই বৃহৎ সৃষ্টির বীজাঙ্কুর। প্রথমে ঢাকায় ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। মহাত্মাই ইহার নামকরণ করেন, এবং তাঁর নির্দ্দেশ-মতই তাঁহারা নিয়মিত সংযত জীবনযাপন, প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনা, চরকাকাটা ও হিন্দীভাষাশিক্ষা, এবং সৎসাহিত্য আলোচনা করায় ব্রতী হন। এক্ষণে আশ্রমের কেন্দ্রস্থান কুমিল্লায়, শাখাকেন্দ্র সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আশ্রমের একমাত্র ধর্ম্ম—জন্মভূমির সেবা; খাদি, কৃষি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ভিতর দিয়া অভয় আশ্রম এই পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশ্রমের সভ্য আঠার জন, কর্ম্মীর সংখ্যা ২৫০ জন; আশ্রমের সহিত একাত্ম হইলে কর্ম্মীরাই সভা-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। অভয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় চালিত হইতেছে; আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ জাতীয় কলেজ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপ্রেরণা অব্যর্থ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

দুঃস্থ ও আর্ত্তের সেবার জন্য হাঁসপাতাল ও সেবা-সমিতি হইয়াছে; কৃষি ও গো সেবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে—পুস্তক বিভাগের কার্য্যও বিশেষ প্রশংসার সহিত পরিচালিত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অভয় আশ্রমের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে কত প্রয়োজন, তাহা না বলিলেও চলে। ইহাদের আদর্শে সর্ব্বত্র এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গে ভীষণ বন্যা

সেবাকার্য্যে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ

দেশের কণ্ঠে আবার এক করুণ আর্ত্ত আহ্বান আসিয়াছে। দেশযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত ধর্ম্মী "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" গঠনাত্মক সহস্র কর্ম্মে অহর্নিশি নিবিষ্ট থাকিয়াও পুনঃ এই দুর্দ্দিনের নূতন আহ্বানে অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। উত্তর বঙ্গের প্লাবনাবর্ত্তা যখন বীভৎস নিষ্ঠুর মর্ম্মবিদারক মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া পৌছিল, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীমতিলাল রায় অবিলম্বে এই বিপন্নদের সাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট নিবেদন করেন।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহায্য সমিতি

সঙ্গে সঙ্গে ২২শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার ২৬১ নং বহুবাজারস্থিত ভবনে চন্দননগর ও কলিকাতার বিশিষ্ট বন্ধুদের লইয়া এক সভার আহ্বান হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহায্য সমিতি" গঠন করা হয়—

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, স্বামী চিদানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী অমৃতানন্দ।

অতঃপর এই সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীমতিলাল রায় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এবং স্বামী চিদানন্দ ও স্বামী অমৃতানন্দ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দেশের এই সঙ্কটযুগে, অখণ্ড জাতিসৃষ্টির পথে যে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র উপাদানমূলক সমষ্টি বা সংহতি-শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, সেইগুলির আত্মবিকাশই অতি প্রয়োজনীয় বোধ হওয়ায়, সংঘর্ষ নয়, সহযোগিতাকেই মূল করিয়া দেশসেবার প্রেরণা বর্ত্তমানে সার্থক হইতে চায়। বন্যামুখে বাংলার এই উদ্যত কর্ম্মশক্তিকে কর্ম্মক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ও সুগঠিত করিয়া তুলিতে যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদিগেরই ন্যায় আহ্বান পাইয়াছে, তাহারা সহতীর্থেরই ন্যায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর দুর্দ্দিনের বোঝা নামাইয়া দিতে আজ বদ্ধপরিকর—ইহা সত্যই আশার কথা। তাই ২৯শে আগষ্ট "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বন্যা সাহায্য সমিতি"র দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়—সমিতি বন্যাপ্লাবিত ক্ষেত্রে স্বীয় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উপযুক্ত সেবা করিবে ও তজ্জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবে। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বন্যা-সাহায্য সমিতির" পক্ষ হইতে অন্যান্য সমধর্ম্মী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকেও এই মর্ম্মে পত্রে জানান হয়, "এই "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ রিলিফ কমিটী" পাবনা জেলার অন্তর্গত "স্থল" নামক স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিবেন ও সমিতির সেবকগণ তথায় যাইবেন।

কমিটী যে অর্থ সংগ্রহ করিবেন তাহা তথায় ব্যয় করা হইবে। এই অবস্থায়, এই সমিতির পক্ষ হইতে আমাদের নিবেদন—আপনাদের পরামর্শাদি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না। আপনাদের অর্থ-সাহায্য যাহা পাওয়া যাইবে তাহার হিসাব দাখিল করিব। অতএব আশা করি, সর্ব্বতোভাবে এই সমিতিকে আপনাদেরই সহকারী অনুষ্ঠান রূপে দেখিয়া, ইহা যাহাতে সার্থক হয়, সেইরূপ বিধান করিবেন।"

অতঃপর সমিতি সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত এই নিবেদনটুকু সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন :—

নিবেদন

দেশের অর্থকষ্টের উপর বন্যাপ্লাবনে এবার ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরে হাহাকার উঠিয়াছে। মাঠের পাট, আউষ ধান আর ঘরে উঠিল না; ছাগল, গরু ভাসিয়া গেল, অসংখ্য লোক গৃহহীন, আশ্রয়হীন, পেটে খোরাক নাই, জলে ও কর্দ্দমের উপর নারী পুরুষ বালক বালিকা দাঁড়াইয়া বিধাতার উপর দোষ দেয়। এই দুর্যোগের দিনে যাহার যাহা সামর্থ্য তাহা লইয়া আগাইতে হইবে, দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের উত্তরবঙ্গের বন্যার অপেক্ষা ইহা ভীষণ হইয়াছে। সেদিন সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহায়তায় দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারী রক্ষা পাইয়াছিল, এবারও যেন সে সাহায্য হইতে তাহারা বঞ্চিত না হয়। আজ কর্ম্মীর অপেক্ষা টাকা, চাউল, কাপড়, গৃহনির্ম্মাণের আসবাবপত্রের অধিক দরকার। এই জন্য যাহার যাহা সাধ্য তাহা অতি ক্ষুদ্র হইলেও, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া এই বিপদ্ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করুন। দান যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে এবং যথাসময়ে চার্টার্ড অডিটার কর্ত্তৃক পরীক্ষার পর সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহার হিসাব প্রদর্শিত হইবে।

ঠিকানা :—

সম্পাদক—প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহায্য সমিতি।
২৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কর্ম্মী-প্রেরণ ও কেন্দ্র-স্থাপন

অতঃপর সমিতির অন্যতম সভ্য ও সেবক স্বামী বোধানন্দ অবিলম্বে কর্ম্মস্থল অভিমুখে রওনা হন। ঘটনাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি লিখিতেছেন—

"সিরাজগঞ্জ, সাহা চৌধুরী গদী।

"আমি আসিয়া দেখি—"স্থলে" রামকৃষ্ণ মিশন কার্য্য করিতেছে, সুতরাং উহা ছাড়িয়া দেশের অভ্যন্তরাভিমুখে গমন করি। তারপর "নিমগাছি"র অধিবাসীদের নিদারুণ অবস্থার কথা অবগত হইয়া ঐ স্থানেই কেন্দ্র স্থাপন করিবার মনস্থ করি।

'.........আমাদের centre রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমগাছী'তে—তাহা আটঘরিয়া হইতে ছয় মাইল আর তাড়াস হইতেও মাইল ছয় এবং সিরাজগঞ্জ হইতে ২০ মাইল দূরে। ...নিমগাছিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ৪ মাইলের ভিতরে গ্রামগুলিতে প্রায় ৮,০০০ হইতে ১০,০০০ হিন্দু আছে। সব শ্রেণীর হিন্দুই আছে। ঐখানে বৎসরে মাত্র একটা ফসলই হয়—সেটা প্রধানতঃ ধান। আর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কতক আউসধান্যও হইয়া থাকে। বন্যার জলে উভয় শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আউস ধান্য যদিও কিছু কিছু পাইয়াছিল—আমন ধান্য পাওয়ার আশা নাই বলিলেই হয়। Work করিতে হইলে সমস্ত areaটাই লইতে হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহে ৬০ হইতে ৬৫ মণ চাউল দরকার হইবে। সুতরাং প্রথম মাসে অন্ততঃ ২৫০ মণ চাউল লাগিবে। সাহায্য ক্রমান্বয়ে অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে হইবে। প্রথম মাসের পর স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া ধান ভানার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা আছে। তাহাতে দ্বিতীয় মাসে প্রথম মাস হইতে আরও কম খরচে চলিতে পারিবে, আশা করা যায়। লোকের অবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ গৃহস্থ কেবল কচুর ডাঁটা সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মাঝে মাঝে গৃহহীন অবস্থা, পরিধানের শীতবস্ত্রও প্রয়োজন।

অসুখও দেখা দিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও কলেরাই সাধারণতঃ বেশী। ঔষধ লইয়া আমাদের ডাক্তারকে আগামী কালই রওনা করাইয়া দিবেন। সঙ্গে কাপড় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও পাঠাইয়া দিবেন।

স্থানটী হিন্দুপ্রধান ও খুব affected. শুধু হিন্দু নয়, তারা আবার Depressed Class হিন্দু—সেইজন্য বোধহয় কেহ এখনও সেইদিকে যায় নাই।"

ইতি

স্বামী বোধানন্দ।"

এই পত্র পাইয়াই সমিতি—স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সঙ্ঘের ডাক্তার হারাণচন্দ্র রায়কে অর্থ, কাপড় ও অন্য রসদাদি লইয়া কর্ম্মস্থানে প্রেরণ করেন।

আমরা বন্ধুবর্গের নিকট হইতে ইতিমধ্যে যাহা দানস্বরূপ পাইয়াছি তাহা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদসহ জ্ঞাপন করিতেছি :—

কলিকাতা—

মিসেস্ কিরণ বসু ২৫৲ অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৫৲ ডাঃ চারুচন্দ্র বসু ৫০৲ মিসেস্ সুনীতি বসু ১০৲ শ্রীমান্ অসীম বসু ৩৲ ভৃঙ্গেশ্বর শ্রীমানী ১০৲ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫৲ কিষণচাঁদ বড়াল ৫০৲ গণপতি নন্দী ৫৲ এস, এন, নন্দী (১ম দফা) ৫০৲ পান্নালাল বসাক ১০৲ বিপিনচন্দ্র মল্লিক ৫৲ কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় ৫০৲ ডাঃ এস, এন, রায় ৫০৲ কুঞ্জবিহারী ঘোষ ৫০৲ এস, এম, বসু ২৫৲ সুবিমল চ্যাটার্জ্জি (১ম দফা) ৫০৲ অমরশঙ্কর মিত্রের ভগ্নী ১০৲ অমরশঙ্কর মিত্রের খুড়ী ৫৲ গ্লোব নার্শারি ১০৲ বার এসোসিয়েশন, জোড়াবাগান ৪৬৲ করমচাঁদ দোশাভাই ২৫৲ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত ১০৲ এস্,. জি, হোসেন ৫৲ রায়বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি ২৲ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৫৲ কৃষ্ণচৈতন্য ঘোষ ১০৲ জে, ভালজি ২৲ বি, এল্ বসু মল্লিক ১৲ জি, এস্ মুখার্জ্জি ১৲ পূর্ণচন্দ্র কয়েল ১৲ খিমজী ৭৲ বল্লভী ১৲ রজনীকান্ত দে ১৲ রাজেন্দ্রলাল সরকার ২৲ ডাঃ শরৎচন্দ্র নন্দী ২৲ হিঙ্গরী ব্রাদার্স ১৲ মতিলাল ব্যানার্জ্জী ১৲ দেবেন্দ্রনাথ সরকার ৫০৲ ভারত ইন্সিউরেন্স কোং মাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৫০৲ মাঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ৭১৲।

লোডলো বাজার হইতে ৬৷৷১০, চেঙ্গাইল গ্রাম হইতে মাঃ ডাঃ কে, এল, বসু মল্লিক ১০৲ গুলজার বাগ মুষ্টি ভিক্ষাভাণ্ডার মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ পাটনা, ১০৲, সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ ২৲ ভোলানন্দ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ মাঃ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি ১০৲ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ১৲ বিশ্বনাথ ঘোষ ১৲ ভবানীচরণ শীল ৲ যুবকসমিতি বৈদ্যবাটী, মাঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ মাঃ মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫।৴০ বৈদ্যবাটী—মাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৶.০ কৃষ্ণচন্দ্র সুর ১৲ মৃগেন্দ্রনাথ বক্সী ১৲, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বর (বৈদ্যবাটী ও চাঁপদানী হইতে সংগৃহীত) ৪৮৷৷১০।

চন্দননগর ও চুঁচুড়া—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বন্যা-সাহায্য সমিতি চন্দননগর মাঃ ডাঃ যজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী, কোষাধ্যক্ষ ১৫০৲। সতীশচন্দ্র নন্দী ১৲ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ১৲ বিপিন বিহারী কবিরাজ ১৲ কিশোরীমোহন ঘোষ ১৲ বারুইচরণ ঘোষ ২৲ হুটুমুরারী দে ১৲ ডাঃ বি, সি, শীল ১৲ গৌরমোহন শীল ১৲ আশুতোষ দত্ত ১৲ কালিপ্রসন্ন বসু ১৲ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ২৲ নবীনচন্দ্র পাল ১৲ ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি ১৲ বনবিহারী মণ্ডল ১৲ হরিপদ নিয়োগী ৫৲ আশুতোষ নিয়োগী ১৲ সত্যকিশোর ব্যানার্জ্জি ৫৲ হরিহর শেঠ ১০৲ বটকৃষ্ণ শেঠ ১৲ প্রহ্লাদ চক্রবর্ত্তী ১৲ গগনচন্দ্র ভড় ১৲ গোবর্দ্ধন শীল ১৲ গোপালদাস ঘোষ ১৲ মণীন্দ্রনাথ সাধু ১৲ অমূল্যধন মুখার্জ্জি ১৲ প্রসাদদাস সেন ১৲ সতীশচন্দ্র কুণ্ডু ১৲ উপেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲ নরেন্দ্রনাথ সেন ১৲ কানাইলাল নন্দী ১৲ কুঞ্জলাল ধর ১৲ বাসুদেব চ্যাটার্জ্জি ১৲ দেবেন্দ্রনাথ দাস ২৲ শ্যামাপদ চ্যাটার্জ্জি ১৲ যতীন্দ্রনাথ দাস ২৲ সতীশচন্দ্র ভড় ১৲ নন্দলাল ব্যানার্জ্জি ১৲ দাশরথী ব্যানার্জ্জি ১৲ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৲ জ্ঞানেন্দ্রনাথ শীল ১৲ প্রফুল্লকুমার ঘোষাল ১৲ রামচন্দ্র শীল ১৲ রায় সাহেব ভোলানাথ দে ২৲ মণীলাল ভট্টাচার্য্য ১৲ নন্দলাল দাস এণ্ড কোং ১৲ অবিনাশ চন্দ্র ভড় ১৲ অমৃতলাল চন্দ্র ১৲ প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৲ সন্তোষচন্দ্র দে ১৲ শীবেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲ সেবকদাস শীল ২৲ দশভূজা সেবক সমিতি বারাসত

৩০৻৫০, মন্মথনাথ মিত্র ১৲, বিজয়কৃষ্ণ কাব্য-স্বাস্থ্য তীর্থ ১৲।

লিলুয়া ওয়ার্কশপ—H. C. Wallace 10/- পি, সি, বসু ৫৲ এস্, এন্ সর ১৲ A. L. Thompson 2/- C. S. Buika 1/- E. Billetty 1/- ডি, সি, এম্, ই, অফিস ৪৲ ইউ, এন্, মুখার্জ্জি ১৲ E. Tubles 2/- ড্রয়িং অফিস ২৵০ এন্, সি, মুখার্জ্জি ২৲ মোহনলাল ২৲ W. F. Taylor 1/- এচ্, কে, চৌধুরী ১৲ Mr. Ball 1/- A. Low 1/- E. C. Watner 3/- খাদারাম ৪৲ এস্, পি, গাঙ্গুলী ২৻৹ Rolling Stock Section 5/- J. M. Campbell 2/- H. Adams 2/- Martin 1/- Chapman 1/-

ব্যারাকপুর ও টিটাগড় :—

ক্ষেত্রমোহন সাধুখাঁ ১৲ হরিচরণ সাধুখাঁ ১৷৹ পি, এন্, সেন ১৲ এস্ রায় ১৲ অবিনাশচন্দ্র বৈরাগী ১৲ গোপালচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ১৲ রামবিলাস আর্য্য ১৲ শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৲ রঘুনাথ প্রসাদ সরদার ১৲ মন্মথনাথ সাধুখাঁ ১৲ গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ ১৲ মন্মথনাথ সরকার ২৷৵১০ মতিলাল সেন ১৲ বিনয়কুমার গুপ্ত ১৲ নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি ১০৲ বিম্বাধর মাহান্তী ১৷৹ রাজেন্দ্রসুন্দর গাঙ্গুলী ১৲ অমরনাথ বন্দ্যো ১৲ সুশীলকুমার সরকার ১৲।

এক টাকার কম আদায়—

চন্দননগর ১৬৶৫, লিলুয়া ৸৹, ভাটপাড়া ৸৵৹ মাহেশ ৫৷৶৹ কলিকাতা ১৷৶৹ ব্যারাকপুর ও টিটাগড় ৮৸৶১৫।

মোট ১২৭০৻১০ (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত দ্রব্যাদি—

জিয়নলাল মতিচাঁদ ২০০ জোড়া নূতন কাপড়, পূর্ণচন্দ্র কয়েল ১২ খানা পুরাতন কাপড় ও ২ খানা গামছা, জনৈক হিতৈষী কলিঃ ৫ পাউণ্ড সিনকোনা মূল্য ৫০৲ টাকা; সুবোধ ব্রাদার্স এক পাউণ্ড চা, ক্লিনিক্যাল রিশার্চ, কলেরা ভ্যাক্‌সিন—আনুমানিক মূল্য ১০০৲ টাকা, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর পুরাতন কাপড় ৮৪ খানা।

ইহা ছাড়া চাউল ও কাপড় যাহা প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার সঠিক পরিমাণ জানিতে পারা যায় নাই, তাহা এবার প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

স্বামী চিদানন্দ ও স্বামী অমৃতানন্দ
সম্পাদক, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহায্য সমিতি,
২৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

আমরা পাবনা জিলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ পোষ্ট অফিসের অধীনে "নিমগাছি" নামক স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। এই কেন্দ্রটী একটী বিপুল হিন্দু পল্লীর কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে আট দশহাজার হিন্দুজাতির বাস, কিছু কিছু অন্যান্য জাতিও আছে। ইহারা কচুর ডাঁটা সিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। অনেকেই গৃহহীন এবং অর্দ্ধনগ্ন; ইহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নিদারুণ অবস্থা হইতে ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে হইলে আমাদের তিন মাসে অন্যূন পক্ষে চারি হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমরা আজ পর্য্যন্ত যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বড়ই অপ্রচুর। দেশবাসীর নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা আমাদের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া এই বিপন্নের যথোচিত সেবা দান করিতে সহায়তা করুন। যাঁহার যাহা সাধ্য তাহা—সম্পাদক "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ সাহায্য সমিতি" ২৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীমতিলাল রায় (সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ)
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীচারুচন্দ্র রায়
স্বামী বোধানন্দ
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ডাঃ চারুচন্দ্র বসু
জে, চৌধুরী
শ্রীসত্যানন্দ বসু
শ্রীহরিহর শেঠ
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ
শ্রীকিরণচাঁদ বড়াল
স্বামী চিদানন্দ } সম্পাদক
স্বামী অমৃতানন্দ }

ডাকঘর

সাধনার নামে যে একটা মোহ, তাহা যেন বাঙ্গালীকে না পাইয়া বসে। সাধনা এমন কিছু নয়, যাহা জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। জীবনযন্ত্রে ভগবানের সাড়া পাওয়ার জন্যই সাধনা। যোগ জীবনকেই ভগবানের সহিত যুক্ত করে।

আত্মসমর্পণ—যোগ; কেন না, ইহার আশ্রয়ে আমরা জীবনে ভাগবত রসাস্বাদ করিয়া থাকি। বাংলায় যোগকামী সাধক সাধিকা এই যুগবিধান অনুসরণ করিয়া, মহাদেবীর সত্ত্বরূপে সিদ্ধজীবন লাভ করিবে ও সেই জীবনের সমষ্টি একটা সংহতিবদ্ধ অখণ্ড জাতিরূপে দাঁড়াইয়া উঠিবে, ইহাই ভগবানের নির্দ্দেশ। তাই এই যোগকামনা স্বাভাবিক। বসন্তসমাগমে প্রকৃতির নবরূপপরিগ্রহণের ন্যায় বাংলায় এই যোগজীবনের প্রভাব ও প্রসার অচিরে আমরা চারিদিক্ জুড়িয়া দেখিতে পাইব, জীর্ণ, গলিত, কলুষিত স্বার্থমূর্ত্তি পরিহার করিয়া বাঙ্গালী একটা শুদ্ধ নিঃস্বার্থ নবজীবন লাভ করিবে—ইহা স্বপ্ন নহে, দুরাশা নহে, পরন্তু জাতির অন্তর্বাহী অভ্রান্ত অমোঘ আত্ম-প্রেরণা, এ অনাহত ফল্গুপ্রবাহ কোনও বাধায় নিরুদ্ধ হইবার নহে। বাংলার সনাতন বিদ্যুৎশক্তি এই অধ্যাত্ম জাগরণের মধ্য দিয়াই সফল হইবে।

আজ চারিদিক্ হইতেই জাগরণের সাড়া আসিতেছে। ইহা প্রাণের ক্ষণিক উত্তেজনা নয়, রঙ্গীন ভাব-বিলাস নয়, কঠোর বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে, অহর্নিশি কর্ম্মযন্ত্রের নিষ্পেষণেও মানুষের প্রাণে যে মুক্তি ও যুক্তির স্পৃহা শিহরিয়া উঠে, যে আগুন কখনও নিভে না, সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকণা কুড়াইয়া একটা বিরাট্ যজ্ঞের হোমকুণ্ড রচনা করিতে চাই। "ডাকঘরে"—যে চিঠিপত্র প্রশ্নোত্তরগুলি প্রকাশিত হইবে, তাহাতে এইরূপ মুমুক্ষু সাধনার্থী নরনারীর প্রাণের সমস্যাগুলিই যাহাতে আলোচিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা থাকিবে। প্রশ্ন ও উত্তর একার হইলেও সকলেরই কাজে লাগিতে পারে, ইহাই সম্ভাবনা; তাই ইহা যথাসম্ভব সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইবে। কাগজে নাম বা লেখা প্রকাশ করার যখন ইচ্ছা নয় তখন যথার্থ হৃদয়ের প্রশ্ন ও সমস্যা থাকিলে, সেইগুলিই বাছিয়া আমরা এই স্তম্ভে উদ্ধৃত করিব ও যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, বাংলার তরুণজাতির মর্ম্মস্পর্শ যেমন নানাদিক্ দিয়া পাইতেছি, তেমনি এই নূতন সূত্রটুকু তাহারই আর একটা সুযোগ দিবে ও আমাদের এই উদ্যম তাঁহাদের সত্যই কাজে লাগিবে।

জেমসেদপুর হইতে শ্রীঅমলচন্দ্র বসু আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

"সকাল ৬টা হইতে ১১॥০টা পর্য্যন্ত ও বৈকাল ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত লোক খাটিয়ে ও খেটে শরীর মন এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যে চিঠি লেখা দূরের কথা, কোন কার্য্যই ভাল লাগে না। ......তবু অবসর সময়ে শ্রীমতিবাবুর আত্মসমর্পণযোগ, অরবিন্দ-মন্দিরে, শ্রীঅরবিন্দবাবুর দুই চারিখানা বই পড়ি। আত্মসমর্পণ-যোগে প্রবর্ত্ত-দশায় গুরুতেই ইষ্ট আরোপ করে' আত্মসমর্পণ করতে হয়, ইহাতেই শুদ্ধি, শুদ্ধভাব ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। সুতরাং ইহা সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। তা'হলে যাঁরা সঙ্গে না থেকে যোগ অভ্যাস করতে চান, তাঁদের উপায় কি? গুরুকে সাক্ষাৎভাবে না পাইলে শ্রদ্ধার উদয় কি প্রকারে হইবে?

আর একটী কথা আমাদের জানিবার ইচ্ছা হয়, যে আপনারা ধ্যান করেন—'হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং' ইত্যাদি—অথচ আপনাদের ইষ্টের পঞ্চতত্ত্বসমন্বিত সুগঠিত রসঘন কৃষ্ণমূর্ত্তি। দয়া করিয়া আমাকে এই বিষয়ে দুই চারি লাইন লিখিয়া বুঝাইয়া দিবেন।"

উত্তর

ক। যোগক্ষেত্র জীবন। তাই জীবনের কোনও অবস্থাই যোগের অনুপযোগী নয়। কিন্তু যোগযুক্ত জীবনের যে বিধান, সে বিধানটুকু যদি ধরিয়া লইতে না পারি, নোঙ্গরহীন তরীর ন্যায় জীবন স্বভাবের টানেই ভাসিয়া চলিবে। এই টান প্রকৃতির। যাহা স্বভাবের প্রেরণা বা নিয়ম, তাহাকে আর একটা উচ্চতর শক্তি ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করাই যোগের উদ্দেশ্য। কেন না, যোগ চায় বিচ্ছিন্নকে সংযুক্ত করিতে। জীবের যে স্বভাব-ধর্ম্ম তাহা সেই পরম ভাবের সহিত সম্মিলিত হইলেই, মহিমাময়,

সুন্দর ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মানুষ ধন্য হয়। এই ভগবৎ-যুক্তির নানা পথ ও উপায় আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রোক্ত এমনই প্রত্যেক পথটাই এক একটী বিশিষ্ট প্রকৃত ও অনুমাংশের উপযোগী। পরন্তু সমগ্র আমূলস্বভাবকে বিশুদ্ধ রূপান্তরিত করিয়া, মানবজীবনকে দেবজীবনে পরিণত করাই—আত্মসমর্পণযোগের সম্পূর্ণ লক্ষ্য। তাই সর্ব্বক্ষেত্রেই যোগী থাকেন ও থাকিতে পারেন। তবে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একটা অনুকূল ক্ষেত্র ও আব্‌হাওয়ার প্রয়োজন থাকিতে পারে ও আছেও। এই দিক্ দিয়া যোগগ্রহণের জন্য সঙ্ঘাবাস অন্ততঃ সাময়িকভাবেও প্রয়োজনীয় ও তাহাতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া অন্যত্র অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও যোগাভ্যাস অসম্ভব নয়, যদিও কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে। আসলে দরকার—যোগশক্তির পরিচয় লাভ ও যোগের আচরণ। এই পরিচয়ই শিক্ষা ও দীক্ষা। মূলমন্ত্র—গুরু ও শাস্ত্রের আনুগত্য। এখানে শাস্ত্র বলিতে বিধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণযোগ গ্রহণের যে প্রণালী ও নির্দ্দেশ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। জীবনে ভগবদিচ্ছার অনুভূতির জন্যই যখন যোগের প্রয়োজন, তখন তাঁহারই ইচ্ছায় গুরুলাভ অনিবার্য্য। অকপট আনুগত্যই সাধকের জীবন নবভাবে গড়িয়া তুলে। সাক্ষাতে শ্রদ্ধার উদয়, এ সাক্ষাৎকার জন্মজন্মান্তরীণ সম্বন্ধের টানেই সহজভাবেই একদিন ঘটিয়া যায়। যেমন স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি, তেমনি গুরুশিষ্য, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধও নিত্য—ইহাও হৃদয়ের বিকাশসূত্রেই অনুভূতিগম্য হইয়া উঠে। তখন আর তাঁহাকে ইষ্টজ্ঞানে আত্মনিবেদন না করিয়া থাকা যায় না। উপায়ের ভাবনা ততক্ষণ যতক্ষণ ইহা না হয়। হৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধা যেখানে ঢালিতে পারিবেন সেইখানে স্বতঃই আপনার কল্প-নির্দ্দিষ্ট গুরু-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইবে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে এই সম্বন্ধের টানকে মানুষ ইচ্ছা করিয়াও উপেক্ষা বা উল্লঙ্ঘন করিতে, শত চেষ্টা করিয়াও সে প্রেমের প্লাবন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

খ। তারপর, উপাসনার কথা। আমাদের উপাসনা ও ধ্যানমন্ত্র সঙ্ঘ-সাধনার আনুষ্ঠানিক উপকরণ। কাজেই সমষ্টি-ভাবনার উপযোগী নির্দ্দেশই উহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। এখানে তত্ত্বভেদে উপাস্যভেদের সম্ভাবনা নাই; কেন না ইষ্ট একই, হৃদয়ের রঙে তাহা বিচিত্র রস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। যেমন একই ব্যক্তি হৃদয়ের সম্বন্ধ-ভেদে কোথাও স্বামী, কোথাও পিতা, কোথাও ভ্রাতা বা বন্ধুরূপে নানাভাবে প্রতীয়মান হইলেও, মূলতঃ তিনি একই—অতএব বিশেষ হইয়াও নির্ব্বিশেষ অনায়াসেই বলা যায়; এই উপাসনা-তত্ত্বও তাহাই। যিনি পরম, তিনি অখণ্ড নির্ব্বিশেষ হইয়াও, সাধকের হৃদয়পদ্মে বিচিত্র রসাস্বাদনে অবতরণ করেন; ধ্যানে, জ্ঞানে তাঁহারই রসঘন চিন্মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটে—তাই সম্বন্ধ যত নিবিড় হয়, তত সেই একই ব্রহ্মাখ্য সদ্বস্তু বিচিত্র চেতনায় বিচিত্র রস-রূপে বিগ্রহান্বিত হইয়াই দেখা দেয়, কাছে আরও কাছে আসিয়া ধরা দেয়, প্রেমের আপূর্য্যমান উচ্ছ্বাসে বুকখানি কূলে কূলে ভরিয়া তুলে। মরমী যে, সাধনার বিন্দু পরিমাণ রসাস্বাদ পাইয়াছে, যে তাহার নিকট এই বিশেষ নির্ব্বিশেষের ভাষা-ভেদ দূর হইয়া, সহজেই অখণ্ড রসে চিত্ত-লয় হয়। এই লয়ই খাঁটী উপাসনা। আশা করি, এই উপাসনা-রসের আস্বাদে বাংলার হিন্দু এক হইবে, অমর হইবে, নবীন জীবন-ধর্ম্মে উন্মাদ হইয়া বরণীয় জাতি-রূপে শ্রীভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ ধরা-বক্ষে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে।

—"আশ্রমী"

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস্‌,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।